মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশ্কাতুল মাসাবীহ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

[প্রথম খণ্ড]

মূল

হযরত হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফ্তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বদায়ূনী

[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বঙ্গানুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়

ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ خَالِقِ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ

আল্লাহ্'র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি যমীন ও আস্‌মানসমূহের স্রষ্টা

مِشْكٰوةُ الْمَصَابِيْح

মিশকাতুল মাসাবীহ্

কিতাবুল মাসাবীহ

কৃত ঃ ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ্ আবূ মুহাম্মদ হোসাঈন ইবনে মাস্'উদ আল-ফার্‌রা আল-বাগ্‌ভী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

ও

মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্

কৃত ঃ শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-খাতীব আত্‌তাব্‌রীযী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

مرآۃ المناجیح اردو ترجمہ وشرح مشکوۃ المصابیح (جلداول)

মিরআতুল মানাজীহ্ শরূহে মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ

[উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা]

ঐতিহাসিক নাম : যুল্‌মিরআত [১৩৭৮ হিজরী]

[প্রথম খণ্ড]

মূল

হযরত হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বদায়ূনী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বঙ্গানুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়

ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম

মিশকাতুল মাসাবীহ্

কিতাবুল মাসাবীহ

কৃত ঃ ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ্ আবূ মুহাম্মদ হোসাঈন ইবনে মাস্'উদ আল-ফার্‌রা আল-বাগ্‌ভী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

ও

মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্

কৃত ঃ শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-খাতীব আত্‌তাব্‌রীযী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

মির্‌আতুল মানাজীহ্ শর্‌হে মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ [উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা]

ঐতিহাসিক নাম : যুল্‌মির্‌আত [১৩৭৮ হিজরী]

[প্রথম খণ্ড]

মূল ঃ হযরত হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বদায়ূনী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বঙ্গানুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

সহযোগিতায় ঃ নিরীক্ষণ ও প্রুফ রিডিং
মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল-ক্বাদেরী
মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন
মাওলানা কাজী মুহাম্মদ কামরুল আহসান
মাওলানা মুহাম্মদ রিদ্বওয়ান
মাওলানা মুহাম্মদ খোরশেদুল আলম
হাফেজ ক্বারী মুহাম্মদ ফোরকান উদ্দীন

প্রকাশকাল ঃ ১২ রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৪৩০ হিজরী
২৬ ফাল্গুন, ১৪১৫ বাংলা
১০ মার্চ, ২০০৯ ইংরেজী

শব্দ বিন্যাস ঃ মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, কিউট কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স (জেড এণ্ড জেড কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স)
১৮২, আল ফতেহ শপিং সেন্টার (৩য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০১৮১৮-০৬৫৯১০
মুহাম্মদ শু'আঈব ও মুহাম্মদ ইক্ববাল

মুদ্রণ ঃ নিও কনসেপ্ট লিমিটেড ৭, সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম

বাইন্ডিং ঃ সালাম বুক বাইন্ডিং, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

হাদিয়া ঃ ৪৭০/- টাকা মাত্র।

Miraatul Manajeeh, Urdu translation & commentary of Mishkatul Masaabeeh-1st Vol., (Historical name Dhul Miraat-1378 H.) by Hazrat Hakeemul Ummah Allama Mufty Ahmad Yar Khan Naeimy Ashrafi Badayuny, Translated into Bengali by Moulana Muhammad Abdul Mannan, Published by Imam Ahmad Reza Research Academy, Chittagong, Sabuj Bhaban, Khaja Road, Kulgaon, P.O. Jalalabad-4214, Bayezid Bostamy, Chittagong, Bangladesh. Phone : 031-684224, Mob. 01199-224403. Hadiya : Tk. 470 only.

প্রকাশনায় ঃ ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম
সবুজ ভবন, খাজা রোড, কুলগাঁও, ডাকঘর-জালালাবাদ-৪২১৪, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০৩১-৬৮৪২২৪, মোবাইল ঃ ০১১৯৯-২২৪৪০৩

যাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ
TO WHOM WE ARE GRATEFUL

❖

হাজী আবদুল আযীয, দুবাই, ইউ.এ.ই.

Haji Abdul Aziz, Dubai, UAE

❖

আলহাজ্ব মুহাম্মদ নাসের মুহাম্মদ ইক্ববাল, দুবাই, ইউ.এ.ই

Alhaj Muhammad Nasir Muhammad Iqbal, Dubai, UAE

❖

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান হাকীম, দুবাই, ইউ.এ.ই

Alhaj Moulana Muhammad Loqman Hakim, Dubai, UAE

❖

আলহাজ্ব হাফেয ক্বারী মাওলানা মুহাম্মদ এয়াকুব, দুবাই, ইউ.এ.ই

Alhaj Hafiz Qari Moulana Muhammad Yakub, Dubai, UAE

সূচীপত্র

মিরআতুল মানাজীহ্ শরূহে মিশ্কাতুল মাসাবীহ্

প্রথম খণ্ড

সূচীপত্র

অভিমত

تقریظ متبرک

امام اہل سنت استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر والفقہ حضرۃ العلامہ الحاج
قاضی محمد نورالاسلام ہاشمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی حَبِیْبِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِیْنَ

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مشکوۃ المصابیح شریف علم حدیث کی ایک جامع کتاب ہے۔ فن حدیث کی یہ جامع کتاب عرب وعجم کے ہر ملک میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس سے اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، نیز علماء طلباء اور عامۃ المسلمین کی ضرورت اور چاہت کی بنا پر عربی، فارسی اوراردو وغیرہ زبانوں میں انکی بہت سی شرحیں لکھی جاچکی ہیں، مرقاۃ المفاتیح، لمعات اور اشعۃ اللمعات وغیرہ اس کتاب کی مشہور (عربی اور فارسی) شرحیں ہیں، ان شارحین حضرات نے اپنے اپنے اوقات کی ضرورتوں کے لحاظ سے یہ شرحیں لکھیں اور اب تک نہایت مقبول بھی ہیں، اب دور بھی کچھ اور ہے، زمانے کے تبدل کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، حتی کہ نئے نئے مذاہب اور احادیث پر انکے نئے نئے اعتراضات بھی وجود میں آنے لگے، علاوہ بریں ہمارے عوام اور بعض مقامات پر جولوگ عربی اور فارسی سے خاص واقف نہیں ہیں وہ ان شرحوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، لہذا مفسر قرآن، محدث زمان، مفتی دوران حضرت علامہ حکیم الامۃ حضرت احمد یارخان نعیمی اشرفی بدایونی علیہ الرحمہ نے مشکوۃ المصابیح شریف کی اردو زبان میں ایسی شرح لکھ دی جو بلا شبہ طلباء، علماء اور عامۃ المسلمین کیلئے یکساں مفید ہے، انہوں نے آٹھ ضخیم جلدوں پر مشتمل اس شرح کا نام مرآۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصابیح رکھا، واقعی یہ کتاب اسم بامسمّٰی ثابت ہو چکی ہے، انہیں وجوہ سے اس کا بنگلہ ترجمہ ہونا اس دور کا ایک نہایت اہم تقاضا ہے۔

مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ عزیزم مولانا محمد عبد المنان کتاب مذکور کا بنگلہ زبان میں ترجمہ کر کے شائع کر رہے ہیں۔ موصوف نے ازیں قبل صحیح ترین ترجمہ وتفسیر قرآن کنزالایمان مع خزائن العرفان اور کنزالایمان مع نورالعرفان کا بھی بنگلہ زبان میں ترجمہ کر کے شائع کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ موصوف کا یہ اقدام علوم احادیث نبویہ کے میدان میں ایک اہم ضرورت کو بھی پورا کرے گا۔

اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقے مترجم اور تمام معاونین کی اس عظیم خدمت کو قبول فرمائے اور انھیں نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین ---

قاضی محمد نورالاسلام ہاشمی

تقریظ بابرکات

رہنمائے شریعت وطریقت زینت قادریت عالمبردار اہلسنت ہادئ دین وملت مرشد برحق
حضرۃ العلامہ سید محمد طاہر شاہ صاحب
دامت برکاتہم العالیہ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نُحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی حَبِیْبِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِیْنَ

مشکوۃ شریف فن حدیث میں ایک نہایت معروف ومشہور کتاب ہے۔ یہ کتب احادیث کی ایک جامع کتاب ہے۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ عرب وعجم میں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت اور ضرورت کی بناء پر عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں اس کی بہت شرحیں لکھی جا چکی ہیں۔ مشہور مفسر قرآن محدث دوران مفتی شرع اسلام حکیم الامت حضرت العلام احمد یار خان نعیمی اشرفی بدایونی علیہ رحمۃ الرحمٰن نے اردو زبان میں اس کتاب کی ایسی شرح لکھ دی جو طلباء، علماء اور عوام المسلمین کو یکساں مفید ثابت ہو چکی ہے، جو احادیث رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ترجمہ اور شرح کے ساتھ ساتھ نئے نئے مذاہب اور انکے احادیث پر نئے اعتراضات کے جوابات پر بھی مشتمل ہے۔ بلاشبہ حضرت موصوف کی یہ شرح (مرآۃ المناجیح ترجمہ وشرح مشکوٰۃ المصابیح) اس زمانہ کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ لہٰذا بنگلہ زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہونا وقت کا اہم تقاضا ہے۔

مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ عزیزم مولانا محمد عبد المنان نے کتاب مذکور کا بنگلہ زبان میں ترجمہ کر کے شائع کر رہا ہے۔ موصوف کا یہ اقدام علوم احادیث نبویہ کے میدان میں ایک اہم ضرورت کو پورا کرے گا جس طرح موصوف کا، صحیح ترین ترجمہ وتفسیر قرآن (کنزالایمان مع خزائن العرفان اور کنزالایمان مع نورالعرفان) کا بنگلہ زبان میں ترجمہ امت مسلمہ کے لئے مفید ثابت ہو چکا ہے، اسی طرح مرآۃ مناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح کا ترجمہ بھی انشاء اللہ مفید ثابت ہوگا۔

مترجم موصوف اور اس خدمت میں جنہوں نے تعاون کیا سب کو اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقے نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین اور ایسی متبرک خدمتوں کو جاری رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے ثم آمین۔

احقر العباد **محمد طاہر شاہ**

রাহ্‌নুমা-ই শরীয়ত ও ত্বরীকত, যীনাতে
ক্বাদেরিয়াত, আলমবরদারে আহলে সুন্নাত, হাদী-ই
দ্বীন ও মিল্লাত, মুর্শিদে বরহক্ব, হযরতুল আল্লামা

সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ
মুদ্দাযিল্লুহুল আলী'র

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং দুরূদ ও সালাম নিবেদন করছি তাঁরই মহা মর্যাদামণ্ডিত হাবীবের প্রতি আর তাঁর হাবীবের পবিত্র বংশধর ও সাহাবীদের প্রতিও। তাঁদের সবারই উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক!

'মিশ্‌কাত শরীফ' হাদীস শাস্ত্রের এক অতীব প্রসিদ্ধ কিতাব। এটা হাদীসশাস্ত্রের কিতাবাদির মধ্যে একটি ব্যাপক কিতাব। কিতাবটির গ্রহণযোগ্যতার এমন অবস্থা যে, আরব ও অনারবীয় দেশগুলোতে সেটা সর্বত্র পড়ানো হয়।

প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় এর বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। পবিত্র ক্বোরআনের প্রসিদ্ধ তাফসীরকার, যুগশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ, ইসলামী শরীয়তের বিখ্যাত ফিক্বহ-বিশেষজ্ঞ (মুফতী) হাকীমুল উম্মত হযরত **আল্লামা আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বদায়ূনী** রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি উর্দু ভাষায় এ কিতাবের এমন এক ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, যা শিক্ষার্থী, আলিম সমাজ ও মুসলিম সাধারণের জন্য সমভাবে উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে। এতে রয়েছে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ ও সেগুলোর ব্যাখ্যা এবং মুসলিম বিশ্বে আত্মপ্রকাশকারী নতুন নতুন মতবাদে বিশ্বাসী ও হাদীস-ই রসূলের উপর তাদের কৃত বিভিন্ন আপত্তির সপ্রমাণ খণ্ডন। নিঃসন্দেহে বুযুর্গ প্রণেতার এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ **মিরআতুল মানাজীহ,** তরজমা ও শরহে **'মিশকাতুল মাসাবীহ'** এ যুগের চাহিদা পূরণ করেছে। সুতরাং বাংলা ভাষায়ও এর অনুবাদ হওয়া যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা।

আমি জেনে অত্যন্ত খুশী হলাম যে, আমার স্নেহের **মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান** উপরোল্লিখিত কিতাবটির বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁর এ উদ্যোগ হাদীসে নবভী শরীফের জ্ঞানের ময়দানে দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করবে। যেভাবে বিশুদ্ধ তরজমা ও তাফসীর-ই ক্বোরআন (কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান এবং 'কানযুল ঈমান ও নূরুল ইরফান)-এর সরল বাংলায় অনুবাদ প্রকাশ করে তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র বড় উপকার করেছেন, অনুরূপ, 'মিরআতুল মানাজীহ তরজমা ও শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ্'র এ অনুবাদও ইন্‌শা-আল্লাহ্ বিশেষ উপকারী সাব্যস্ত হবে।

অনুবাদক ও এ মহান খিদমতে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন- সবাইকে মহামহিম আল্লাহ্ আপন হাবীবে পাক আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্‌সালাম-এর ওসীলায় এর উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন! আর এমন বরকতময় খিদমতসমূহ অব্যাহত রাখার তাওফীক্ব দান করুন। সুম্মা আমিন!

(সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ)

ইমামে আহলে সুন্নাত, উস্তাযুল ওলামা, শায়খুল হাদীস ওয়াত্ তাফসীর ওয়াল ফিক্বহ, পীরে তরীক্বত, রাহনুমা-ই শরীয়ত

হযরতুল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী
[দামাত বরকাতুহুমুল আলীয়া]'র

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

'মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফ' ইল্‌মে হাদীসের একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব। এটা 'দরসে হাদীস'-এর প্রথম কিতাব। এ পূর্ণাঙ্গ হাদীস গ্রন্থ আরব ও অনারবীয় দেশগুলোতে সর্বত্র পড়ানো হয়। এ থেকে এ কিতাবের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার অনুমান করা যেতে পারে। তাছাড়া, আলিম সমাজ, শিক্ষার্থীগণ ও মুসলিম সাধারণের প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ইত্যাদি ভাষায় এর বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে।

'মিরক্বাতুল মাফাতীহ্' (সংক্ষেপে 'মিরক্বাত'), 'লুম'আত', 'আশি''আতুল লুম'আত' ইত্যাদি 'মিশকাতুল মাসাবীহ'র যথাক্রমে প্রসিদ্ধ আরবী ও ফার্সী ব্যাখ্যা-গ্রন্থাবলী। এসব ব্যাখ্যা-গ্রন্থের সম্মানিত প্রণেতাগণ আপন আপন যুগের চাহিদানুসারে এর ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো লিখেছেন। আর এখনো সেগুলো সর্বজন সমাদৃতও। তবে এখন যুগ ভিন্নতর। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেটার চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে, অবস্থায়ও এসেছে অনেক পরিবর্তন। নতুন নতুন মতবাদ যেমন সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি ইল্‌মে হাদীসের বিপক্ষেও তাদের দিক থেকে বিভিন্ন অমূলক আপত্তি ধেয়ে আসতে থাকে। হাদীসের অপব্যাখ্যাও চলছে অহরহ বিভিন্ন অনভিপ্রেত মহল থেকে। সুন্নী মাতদর্শের আলোকে সেগুলোর খণ্ডন এবং অপনোদনও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, যাঁরা আরবী-ফার্সী ভাষা সম্পর্কে তেমন ওয়াকিফহাল নয়, তাঁরা উল্লিখিত (আরবী ও ফার্সী) ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলো থেকে তেমন উপকৃত হতে পারছেন না। সুতরাং এসব অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রসিদ্ধ ও যুগশ্রেষ্ঠ তাফসীর, হাদীস ও ফিক্বহ্ বিশারদ, হাকীমুল উম্মত হযরত আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বদায়ূনী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি মিশ্‌কাত শরীফের উর্দু ভাষায় এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, যা নিঃসন্দেহে ছাত্র-শিক্ষক, আলিম সমাজ ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য সমভাবে উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি বড় বড় আট খণ্ডে এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত করেছেন। আর এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম রেখেছেন 'মিরআতুল মানাজীহ তরজমা ও শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ' [অনুবাদ ও ব্যাখ্যা]। এ গ্রন্থ উর্দুভাষীদের নিকট সেটার প্রকাশকাল (১৩৭৮ হিঃ / ১৯৫৯ ইং) থেকে অত্যন্ত সমাদৃত হয়ে আসছে। বলা বাহুল্য, একই কারণে গ্রন্থখানার বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়াও একান্ত জরুরী ছিলো, যাতে বাংলাভাষীরাও তা থেকে উপকৃত হতে পারেন। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ ওই চাহিদা অপূর্ণই থেকে যায়।

আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি যে, আমার স্নেহের আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ) আলোচ্য কিতাব (মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্)'র সরল বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছেন। তার এ প্রশংসনীয় উদ্যোগ যুগের আরেকটি চাহিদা পূরণ করল। ইতোপূর্বে প্রসিদ্ধ ও নির্ভুল দু'টি তরজমা ও তাফসীর-ই-ক্বোরআন 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' এবং 'কানযুল ঈমান ও নূরুল ইরফান' বাংলায় অনুবাদও প্রকাশ করে মুসলিম মিল্লাতের বিরাট চাহিদা পূরণ করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। হাদীস-ই পাকের এ পূর্ণাঙ্গ কিতাবের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হলে ক্বোরআনের সাথে সাথে হাদীস-ই পাকের জ্ঞান-পিপাসুরাও নিঃসন্দেহে পরিতৃপ্ত হবেন। আমি যতটুকু দেখেছি অনুবাদ সরল ও সঠিক হয়েছে।

সম্মানিত মূল লেখকগণ ও বঙ্গানুবাদক এবং এ বরকতময় প্রকাশনার সাথে যাঁরা জড়িত আছেন, পরম করুণাময় তাঁদেরকে এর যথাযথ প্রতিদান দিন! আর তাঁরই দরবারের কিতাবটির বহুল প্রচারের জন্য দো'আ করছি-

দো'আন্তে-

(কাজী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী)

গায্যালী-ই যমান, ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল হাজ আল্লামা অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন সাহেব মুদ্দাযিল্লুহুল আলী'র

অভিমত

বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ 'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্'র উর্দু অনুবাদসহ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ্' লিখে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হাদীস শরীফ থেকে সত্যসন্ধানীদের সঠিক জ্ঞানার্জন এবং তাঁদের ঈমান ও আক্বীদার হিফাযতের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন। আমার স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান এ 'মিরআতুল মানাজীহ্'র সরল বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এতে মুসলমানদের জন্য সহজে পবিত্র হাদীস শরীফ বুঝার ব্যবস্থা রয়েছে।

আল্লাহ্র রহমতে বাংলা অনুবাদের কিয়দংশ দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। অনুবাদ শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল হয়েছে। এটা যাঁরা পাঠ করবেন, তাঁরা হাদীসের সঠিক মর্মার্থ বুঝার সাথে সাথে ভাল-মন্দ এবং হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতেও সক্ষম হবেন। এটা সুন্নী সমাজের জন্য মাওলানার আরেকটা বড় উপহার ও অবদান হয়ে থাকবে।

এ বরকতময় প্রয়াস পরম করুণাময়ের দরবারে কবূল হোক। এ অতি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের বহুল প্রচার ও এর অনুবাদকের দীর্ঘায়ু এবং দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপক খিদমতের তাওফীক্ব কামনা করছি। আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যাত কবূল করুন! আমীন! বিহুরমতে সাইয়্যেদিনা মুরসালীন।

(আলহাজ্ব মাওলানা) মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন
সাবেক অধ্যক্ষ, ছোবহানিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম-এর শায়খুল হাদীস শেরে মিল্লাত, শাহবাযে খেতাবত, ফক্বীহে যমান, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মুফতী মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী (মুদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র

অভিমত

'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ' একটি পূর্ণাঙ্গ হাদীসগ্রন্থ। হাকীমুল উম্মত হযরতুল আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি-এ পবিত্র গ্রন্থের উর্দু অনুবাদসহ ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। এর নাম দিয়েছেন 'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ', যা ওলামা, মাশা-ইখ এবং উর্দু জানে এমন শিক্ষার্থী ও পাঠকদের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত। কারণ, এতে মূল গ্রন্থে স্থান পাওয়া হাদীস শরীফগুলোর সঠিক অর্থ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা অতি সহজ ও সরলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। হাদীস শরীফের প্রকৃত মর্মার্থ ও আনুষঙ্গিক বিধি-বিধান, আক্বাইদ, ইসলামের ইতিহাস, হাদীস শরীফগুলোর বর্ণনাকারীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইত্যাদি যেভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, অন্য কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থে সেভাবে খুব কমই পাওয়া যায়। উর্দু ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন আমার স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। এরই মাধ্যমে বাংলাভাষীগণ এক্ষেত্রে আশাতীত উপকৃত হলেন। মাওলানা ইতোপূর্বে দু'টি বিশুদ্ধতম তরজমা ও তাফসীরগ্রন্থ ('কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' এবং 'কানযুল ঈমান ও নূরুল ইরফান')-এর বঙ্গানুবাদ করে পবিত্র ক্বোরআনের জ্ঞান-পিপাসুদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারনের ব্যবস্থা করেছেন।

আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি, সর্বোপরি অনূদিত গ্রন্থখানার বহুল প্রচার কামনা করছি। আমীন। বিহুরমতি সাইয়্যেদিল মুরসালীন-সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

(মুফতী মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী ক্বাদেরী)

বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট'র সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'র সাবেক পরিচালক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশ'র মহাসচিব, ওস্তাযুল আসাতিযাহ হযরতুল আল্লামা

হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলীল
[দামাত বরকাতুহুমুল আলীয়া]'র

অভিমত

আমার প্রিয়ভাজন মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেবের অনুবাদকৃত 'মিরআত শরহে মিশকাত' গ্রন্থটির কিছু অংশ পাঠ করে খুবই আনন্দিত হলাম। মিরআত অর্থ 'আয়না' আর 'মিশকাত' হলো হাদীসগ্রন্থ। হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) মিশকাত শরীফের উর্দু অনুবাদ করেছিলেন 'মিরআত' নামে। সত্যি মিরআতের দর্পণে মিশকাতের সত্যিকারের ব্যাখ্যা ফুটে ওঠেছে। তারই সার্থক বঙ্গানুবাদ করেছেন স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। ইতোপূর্বে তিনি 'কানযুল ঈমান'-এর সাথে 'খাযাইনুল ইরফান' ও 'নূরুল ইরফান'-এ দু'টি তাফসীর গ্রন্থের অনুবাদ করে বাংলাভাষী সুন্নী জনতার একটি অভাব পূরণ করেছিলেন। 'মিরআত' বঙ্গানুবাদ করে পূরণ করলেন দ্বিতীয় অভাব। আমি অত্র গ্রন্থখানার বহুল প্রচার কামনা করি এবং ভবিষ্যতে আরো মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদ করার তার জন্য তাওফীক্ব চেয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করি।

(অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেয মোহাম্মদ আবদুল জলীল)

পেশাওয়া-ই মিল্লাত মুনাযিরে আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ শেখ মুহাম্মদ আবদুল করীম সিরাজনগরী-(দামাত বরকাতুহুমুল আলীয়া)'র

অভিমত

বিগত নব্বইর দশকে পরপর দু'টি বিরাটাকার বিশুদ্ধ তরজমা ও তাফসীর-ই ক্বোরআনের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ('কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' এবং 'কানযুল ঈমান ও নূরুল ইরফান') লিখে প্রকাশ করে মুসলিম সমাজ ও ক্বোরআন-প্রেমিকদেরকে বিশেষভাবে ঋণী করেছেন– বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান।

আমাদের মুসলিম সমাজে দীর্ঘদিন যাবৎ একটি পূর্ণাঙ্গ হাদীস গ্রন্থের বাংলায় বিশুদ্ধ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে আসছে। বিশ্ববিখ্যাত অন্যতম পূর্ণাঙ্গ হাদীস গ্রন্থ 'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্'র উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন হাকীমুল উম্মত হযরতুল আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। তাঁর ওই গ্রন্থের নাম 'মিরআতুল মানাজীহ শরহে মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ'। গ্রন্থটি গুণগত উঁচু মানের জন্য উর্দু ভাষী ও উর্দুজানা ওলামা ও শিক্ষার্থীদের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত। এ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান হাদীস শরীফের ক্ষেত্রে এ চাহিদাটুকুও পূরণ করলেন।

আমি বঙ্গানুবাদকের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। এতদসঙ্গে গ্রন্থটির বহুল প্রচারও একান্তভাবে কামনা করছি।

(অধ্যক্ষ শেখ মুহাম্মদ আবদুল করীম সিরাজনগরী)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর
এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও সিনেট সদস্য
ড. আ.ন.ম. মুনির আহমদ চৌধুরী'র

অভিমত

উপমহাদেশের খ্যাতনামা দার্শনিক, লেখক, গবেষক, তাফসীরকারক, ফিক্বহবিদ ও হাদীস বিশারদ হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কৃত 'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্' (সংক্ষেপে 'মিরআত') হাদীস শাস্ত্রের একটি অনন্য গ্রন্থ। এতে বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ 'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্' ('মিশ্‌কাত শরীফ')তে সন্নিবিষ্ট প্রতিটি হাদীস শরীফের বিশুদ্ধ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়াদির উপর সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি, ইসলামী বিধানাবলীর সাথে সাথে আহলে সুন্নাতের আক্বাইদগত বিষয়াদিও প্রামাণ্যরূপে আলোচনা করা হয়েছে এ (মিরআত) গ্রন্থে। আট খণ্ডে বিন্যস্থ কিতাবটি (মিরআত)'র সরল বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে আমার স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান মুসলিম সমাজকে আরেকবার ঋণী করলেন। ইতোপূর্বে তিনি ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী কৃত বিশুদ্ধ তরজমা-ই ক্বোরআন 'কানযুল ঈমান'-এর সাথে সংযোজিত দু'টি তাফসীর গ্রন্থ 'খাযাইনুল ইরফান' ও 'নূরুল ইরফান'-এর অনুবাদ করে পবিত্র ক্বোরআনপ্রেমী বাংলাভাষী পাঠকদের জ্ঞানতৃপ্ত করেছেন। আমি বঙ্গানুবাদককে এসব অবদানের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এসব ক'টি গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করছি।

(ড. আ.ন.ম. মুনীর আহমদ চৌধুরী)

পীরে ত্বরীক্বত হযরতুল হাজ্জ মাওলানা
সৈয়দ মছিহুদ্ দৌলা
[মুদ্দাযিল্লুহুল আলী]'র

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

ইলমে হাদীসের এক অতি প্রসিদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব হচ্ছে 'মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফ'। এ গ্রন্থ দিয়েই আরব ও অনারবীয় দেশগুলোতে হাদীস শাস্ত্রের বরকতময় দরসের সূচনা করা হয়। মুসলিম সমাজের জন্য কিতাবটির অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই বিশ্বের বিজ্ঞ ওলামা-ই কেরাম আরবী, ফার্সী ও উর্দু ইত্যাদি ভাষায় এর বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, প্রসিদ্ধ ও যুগশ্রেষ্ঠ তাফসীর, হাদীস ও ফিক্বহ বিশারদ হাকীমুল উম্মত হযরত আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বদায়ূনী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'মিশ্‌কাত' শরীফের উর্দু ভাষায় এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, যা 'মিশকাতুল মাসাবীহ'তে সন্নিবিষ্ট বিশুদ্ধ হাদীস শরীফগুলোর সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা মুসলিম সমাজের সামনে অতি উত্তমরূপে উপস্থাপন করে। তদুপরি, প্রতিটি হাদীস-সংশ্লিষ্ট আক্বাইদ ও ফিক্বহ বিষয়ক সমাধানও দেওয়া হয়েছে এ কিতাবে। তিনি উর্দু ভাষায় বড় বড় আট খণ্ডে এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত করেছেন। তাঁর এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম 'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ' [অনুবাদ ও ব্যাখ্যা]। এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ উর্দুভাষীদের নিকট সেটার প্রকাশকাল (১৩৭৮ হিঃ/১৯৫৯ ইং) থেকে অত্যন্ত সমাদৃত হয়ে আসছে।

আজ অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও অনুবাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ) আলোচ্য কিতাবের সরল বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়ে যুগের ওই চাহিদা পূরণ করেছেন।

পরম করুণাময়ের পবিত্র দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছি যেন তিনি তাঁদেরকে এর যথাযথ প্রতিদান দেন! তদ্‌সঙ্গে কিতাবটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আমীন।

(মাওলানা সৈয়দ মছিহুদ্ দৌলা)

উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় সুন্নী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম-এর উপাধ্যক্ষ উস্তাযুল ওলামা হযরতুল আল্লামা
মুহাম্মদ সগীর ওসমানী সাহেব
(মুদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র

অভিমত

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার প্রাক্তন কৃতিছাত্র, বিশিষ্ট আলিম-ই দ্বীন, লেখক ও গবেষক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেব হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কৃত 'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্' (উর্দু)র সরল বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করছেন জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। মূল কিতাবে উল্লেখিত হাদীস শরীফগুলোর অনুবাদ ও মর্মার্থ এবং ওইগুলোতে এরশাকদকৃত বিধানাবলী ও আক্বাইদ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়াবলী অনুধাবনের জন্য 'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ্' (সংক্ষেপে 'মিরআত') একটি অনন্য গ্রন্থ।

উর্দু ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থের সরল বাংলায় অনুবাদ, আমি যতটুকু দেখেছি, সঠিক ও প্রাঞ্জল হয়েছে। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

(আল্লামা মুহাম্মদ সগীর ওসমানী)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রশীদ-এর

অভিমত

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বরেণ্য আলিম-ই দ্বীন, মুফাস্‌সির-ই ক্বোরআন হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ এয়ার খান নঈমী কর্তৃক উর্দু ভাষায় লিখিত 'মিরআতুল মানাজীহ্‌'র (মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ)'র অনবদ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন, প্রখ্যাত অনুবাদক, লিখক ও গবেষক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (চট্টগ্রাম)। বাংলাভাষী জ্ঞান-পিপাসু গবেষক ও পাঠক সমাজের জন্য এ কিতাবের বঙ্গানুবাদ সময়ের দাবী।

উল্লেখ্য, বিগত ১৯৯৫ ইংরেজীতে বিশুদ্ধ তরজমা ও তাফসীর-ই ক্বোরআন 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর প্রকাশনা উৎসবে আমি মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নানকে 'সাইয়্যেদুল মুতারজিমীন' (অনুবাদকদের অগ্রণী) উপাধি দিয়েছিলাম। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম ও একমাত্র ব্যক্তি, যিনি বৃহত্তর চট্টগ্রামে সম্পূর্ণ ক্বোরআনের তাফসীরসহ অনুবাদ করেছেন। এর কয়েক বছরের ব্যবধানে তিনি 'কানযুল ঈমান ও নূরুল ইরফান'র অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এর মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তিনি এ 'মিরআত' (আট খণ্ড বিশিষ্ট)-এর বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিলেন।

আমি তাঁর দীর্ঘায়ু এবং গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

(ড. মুহাম্মদ রশিদ)

চট্টগ্রাম গহিরা আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট আলিম-ই দ্বীন
আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল-ক্বাদেরী'র

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ইল্‌মে হাদীসের এক অতি প্রসিদ্ধ ও অন্যতম পূর্ণাঙ্গ কিতাব হচ্ছে 'মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফ।' এগ্রন্থ দিয়েই আরব ও অনারবীয় দেশগুলোতে হাদীস শাস্ত্রের বরকতময় দরসের সূচনা করা হয়। মুসলিম সমাজের জন্য কিতাবটির প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞ ওলামা-ই কেরাম আরবী, ফার্সী ও উর্দু ইত্যাদি ভাষায় এর বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

যুগশ্রেষ্ঠ তাফসীর, হাদীস ও ফিক্বহ্ বিশারদ হাকীমুল উম্মত হযরত আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বদায়ূনী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'মিশ্‌কাত' শরীফের উর্দু ভাষায় এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, যা 'মিশকাতুল মাসাবীহ'তে সন্নিবিষ্ট বিশুদ্ধ হাদীস শরীফগুলোর সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা মুসলিম সমাজের সামনে অতি উত্তমরূপে উপস্থাপন করেছে। তিনি তাতে মিশকাতুল মাসাবীহ শরীফের প্রতিটি হাদীস-সংশ্লিষ্ট আক্বাইদ ও ফিক্বহ্ বিষয়ক সমাধানও দিয়েছেন অতি প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে। তিনি বড় বড় আট খণ্ডে এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত করেছেন। আর এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম রেখেছেন 'মিরআতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ' [অনুবাদ ও ব্যাখ্যা]

বন্ধুবর আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ) আলোচ্য কিতাবের সরল বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমি যতটুকু দেখেছি অনুবাদ সরল, সহজ, সঠিক ও প্রাঞ্জল হয়েছে।

এ অনুবাদ গ্রন্থ ও এ বিষয়ের জ্ঞান-পিপাসুদেরকে পরিতৃপ্ত করবে- এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি বিজ্ঞ বঙ্গানুবাদক ও তাঁর সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তদ্‌সঙ্গে কিতাবটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আ-মী-ন।

[মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল-ক্বাদেরী]

জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার প্রধান ফক্বীহ্ হযরতুল আল্লামা
সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আল-ক্বাদেরী সাহেবের

অভিমত

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

ইল্‌মে হাদীসের এক অতি প্রসিদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব হচ্ছে 'মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফ'। মুসলিম সমাজের জন্য কিতাবটির প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞ ওলামা-ই কেরাম আরবী, ফার্সী ও উর্দু ইত্যাদি ভাষায় এর বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

যুগশ্রেষ্ঠ তাফসীর, হাদীস ও ফিক্বহ্ বিশারদ হাকীমুল উম্মত হযরত আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বদায়ূনী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'মিশ্‌কাত' শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রসিদ্ধ 'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ' লিখেছেন। এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ উর্দু ভাষীদের নিকট সেটার প্রকাশকাল থেকে অত্যন্ত সমাদৃত হয়ে আসছে। আমি আজ এ কথা জেনে অতি আনন্দিত হয়েছি যে, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ) আলোচ্য কিতাবের সরল বাংলায় অনুবাদ করে তা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমি যতটুকু দেখেছি অনুবাদ সরল, সঠিক ও প্রাঞ্জল হয়েছে।

হাদীস-ই পাকের এ পূর্ণাঙ্গ কিতাবের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এ বিষয়ের জ্ঞান-পিপাসুদেরকে পরিতৃপ্ত করবে। আমি সম্মানিত মূল লেখকগণ ও বিজ্ঞ বঙ্গানুবাদক এবং এ বরকতময় প্রকাশনার সাথে যাঁরা জড়িত আছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তদ্‌সঙ্গে কিতাবটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আ-মী-ন।

[সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আল-ক্বাদেরী]

ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস
আল্লামা কাজী মঈন উদ্দীন আশরাফী সাহেবের

অভিমত

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

আরব ও অনারবীয় দেশগুলোতে হাদীসশাস্ত্রের বরকতময় দরসের সূচনা করা হয় 'মিশকাত শরীফ' দিয়েই। মুসলিম সমাজের জন্য কিতাবটি অতিমাত্রায় প্রয়োজনীয়।

সুখের বিষয় যে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে যুগশ্রেষ্ঠ তাফসীর, হাদীস ও ফিক্বহ্ বিশারদ হাকীমুল উম্মত হযরত আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বদায়ূনী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'মিশ্‌কাত' শরীফের উর্দু ভাষায় এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, যা 'মিশকাতুল মাসাবীহ'তে সন্নিবিষ্ট বিশুদ্ধ হাদীস শরীফগুলোর সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা মুসলিম সমাজের সামনে অতি উত্তমরূপে উপস্থাপন করেছে। তিনি তাতে মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফের প্রতিটি হাদীস-সংশ্লিষ্ট আক্বাইদ ও ফিক্বহ বিষয়ক সমাধানও দিয়েছেন অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে। তিনি বড় বড় আট খণ্ডে এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত করেছেন। আর গ্রন্থটির নাম রেখেছেন 'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ্'। এটা বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়াও একান্ত জরুরী এবং দীর্ঘদিন যাবৎ এক গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হিসেবে দেখা দিয়েছে। আল্‌হাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ) আলোচ্য কিতাবের সরল বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করে যুগের চাহিদাটুকু পূরণ করলেন।

কিতাবটি এ বিষয়ে জ্ঞান-পিপাসুদেরকে জ্ঞানতৃপ্ত করুক এবং সম্মানিত মূল লেখকগণ, বঙ্গানুবাদক ও এ বরকতময় প্রকাশনার সাথে যাঁরা জড়িত আছেন, তাঁদের সবাইকে পরম করুণাময় এর যথাযথ প্রতিদান দিন। আমীন! তদ্‌সঙ্গে আমি কিবাতাটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

[কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী]

জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা
হাফেজ মুহাম্মদ সোলায়মান আন্‌সারী সাহেবের

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ 'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ'র বিভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের মনীষীগণ আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় এর বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, হাকীমুল উম্মত মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মিরআতুল মানাজীহ' শরহে 'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ' অন্যতম।

বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা অপ্রতুল। এখনও বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক হাদীসগ্রন্থ নেই বললেই চলে। এমতাবস্থায় ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক ভিত্তি হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরআতুল মানাজীহ'-এর বঙ্গানুবাদ লিখন ও প্রকাশনা অত্যন্ত যুগোপযোগী পদক্ষেপ। বিশুদ্ধ তরজমা-ই কোরআন 'কান্‌যুল ঈমান'-এর সাথে তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান' ও 'নূরুল ইরফান'-এর সফল বাংলা অনুবাদক বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, সুন্নীয়তের প্রাতিষ্ঠানিক রূপকার, চলমান যুগের কলমসম্রাট, বাতিলের আতঙ্ক, বহু গ্রন্থের প্রণেতা, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 'মিরআতুল মানাজীহ'-এর বঙ্গানুবাদ করে বর্তমান যুগের এক বিরাট চাহিদা পূরণ করেছেন।

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ অনুবাদে হাদীসের সঠিক মর্মার্থ পরিলক্ষিত হয় না। অধিকন্তু, এমন বহু বই-পুস্তকও দেখা যায়, যেগুলোতে হাদীস-ই পাকের বিকৃত ও মনগড়া অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঈমান-আক্বীদার পরিপন্থী, যার ফলশ্রুতিতে অনেক সময় সরলপ্রাণ মুসলমানগণ ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকা পড়ছে।

মহান রাব্বুল আলামীন ও তদীয় রসূলে পাকের দরবারে প্রার্থনা করি যেন মিশকাত শরীফের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'মিরআতুল মানাজীহ' সকল স্তরের মুসলমানের কাছে পৌঁছে যায় ও আশাতীত সমাদৃত হয়। আমীন! বেহুরমতে সায়্যিদিল মুরসালীন।

দোয়া কামনায়-

[আলহাজ্ব মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ সোলায়মান আন্‌সারী]

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ-এর

অভিমত

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে এ উপমহাদেশের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী'র 'মিরআতুল মানাজীহ' 'মিশকাতুল মাসাবীহ'র যথাযথ অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এটা সর্বস্তরের উর্দু পাঠকদের নিকট অতীব সমাদৃত। কারণ, তাতে মূল কিতাবে সন্নিবিষ্ট হাদীস শরীফগুলোর সঠিক মর্মার্থ তুলে ধরা হয়েছে, তদুপরি, প্রতিটি হাদীস শরীফ সংশ্লিষ্ট মাসআলা-মাসাইল, আকাইদ, ইতিহাস, হাদীস বর্ণনাকারীদের সংক্ষিপ্ত জন্ম-বৃত্তান্ত তথা পরিচিতি, সর্বোপরি, নবীপাকের শান ইত্যাদি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

এ গ্রন্থখানা বাংলায় অনুবাদ করে এ অমূল্য কিতাব দ্বারা বাংলাভাষী পাঠকদেরকেও সবিশেষ ও সমানভাবে উপকৃত করেছেন বিশিষ্ট লেখক গবেষক ও আলিমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান।

আমি এ মহান খিদমতের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তৎসঙ্গে অনূদিত গ্রন্থখানার বহুল প্রচার কামনা করছি।

ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ

'দিনাজপুর ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার'র সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, সুন্নী মতাদর্শের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, বিশিষ্ট আলিম-ই দ্বীন, পীর-ই ত্বরীকৃত, হযরতুল আল্লামা

ড. সাইয়্যেদ এরশাদ আহমদ বোখারী'র

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

মুসলিম বিশ্বে আজ একথা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রসিদ্ধ যে, 'মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফ' হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম পূর্ণাঙ্গ ও অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য কিতাব। এ হাদীস গ্রন্থ আরব ও অনারবীয় দেশগুলোতে সর্বত্র পড়ানো হয়। তাছাড়া, আলিম সমাজ, শিক্ষার্থীগণ ও মুসলিম সাধারণের প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে আরবী, ফার্সী ও উর্দু ইত্যাদি ভাষায় এর বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে।

প্রসিদ্ধ ও যুগশ্রেষ্ঠ তাফসীর, হাদীস ও ফিক্বহ্ বিশারদ, হাকীমুল উম্মত হযরত আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বদায়ূনী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিও 'মিশকাত' শরীফের উর্দু ভাষায় এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, যা নিঃসন্দেহে ছাত্র-শিক্ষক, আলিম সমাজ ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য সমভাবে উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে। গ্রন্থখানা বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়াও একান্ত জরুরী, যাতে বাংলা ভাষীরাও তা থেকে উপকৃত হতে পারেন; কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ এ চাহিদা অপূর্ণই থেকে যায়।

আজ অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে– আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ) আলোচ্য কিতাবের সরল বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়ে যুগের ওই চাহিদা পূরণ করেছেন।

আমি সম্মানিত মূল লেখকগণ ও বঙ্গানুবাদক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরম করুণাময় তাঁদেরকে এর যথাযথ প্রতিদান দিন! আর কিতাবটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আমীন।

(ড. সাইয়্যেদ এরশাদ আহমদ বোখারী)

সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাই'র কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 'বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল ও বাংলাদেশী মুসলিম জনকল্যাণ সংস্থা'র সম্মানিত সভাপতি, বৃহত্তর সিলেট উন্নয়ন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, সমাজ সেবক ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিত্ব

জনাব মকবূল হোসেন'র

অভিমত

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

ইলমে হাদীসের এক অতি প্রসিদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব 'মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফ'র উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত ও আট খণ্ডে বিন্যস্ত গ্রন্থ 'মিরআতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ'র সরল বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অতি আনন্দিত হলাম। বিশ্বখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও মুহাক্বক্বিক্ব আলিমে দ্বীন হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী প্রণীত এ 'মিরআত'-এর বঙ্গানুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, যিনি দুবাইতে অবস্থানকালে আমাদের অত্র 'ফোরাম' ও 'সংস্থা'র অফিসে সদয় অবস্থান করে ইতোপূর্বে দু'টি প্রসিদ্ধ তরজমা ও তাফসীর-ই ক্বোরআন (কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' এবং 'কানযুল ঈমান ও নূরুল ইরফান)'র বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করেন এবং দ্বীনী বিষয়ে যুগোপযোগী ও অত্যন্ত উপকারী লেখনীর কাজে মসি চালনা করেছেন। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান স্বদেশে গিয়েও তাঁর ক্ষুরধার লেখনী অব্যাহত রেখেছেন এবং আজ দীর্ঘদিন যাবত অহর্নিশ প্রচেষ্টার মাধ্যমে রসূলে পাকের বরকতময় হাদীস শরীফের এ বিরাটাকার গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন করে সেটা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তদ্সঙ্গে কিতাবটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আমীন।

(মুহাম্মদ মকবুল হোসেন)

স্বত্বাধিকারী, আল-মদীনা পারফিউম্স, দুবাই, ইউ.এ.ই

সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাই'র 'বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল' ও 'বাংলাদেশী মুসলিম জনকল্যাণ সংস্থা'র সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও শিক্ষানুরাগী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিত্ব

জনাব আলহাজ্ব নূরুল আবছার চৌধুরী'র

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

হাদীস শাস্ত্রের এক অতি প্রসিদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব 'মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফ'র উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত আট খণ্ডে বিন্যস্ত গ্রন্থ 'মিরআতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ'র সরল বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অতি আনন্দিত হলাম। বিশ্বখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সুবিজ্ঞ আলিমে দ্বীন হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী প্রণীত এ 'মিরআত'-এর বঙ্গানুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। তিনি দুবাইতে অবস্থানকালে ইতোপূর্বে দুটি প্রসিদ্ধ তরজমা ও তাফসীর ('কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' এবং 'কানযুল ঈমান ও নূরুল ইরফান')-এর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করেন এবং যুগোপযোগী লেখালেখীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান স্বদেশে গিয়েও তাঁর ক্ষুরধার লেখনী অব্যাহত রেখে এবং আজ দীর্ঘদিন যাবত অহর্নিশ প্রচেষ্টার মাধ্যমে রসূলে পাকের বরকতময় হাদীস শরীফের এ বিরাটাকার গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন করে সেটা প্রকাশ করার প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তাঁকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

তদ্সঙ্গে কিতাবটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আমীন!!

(মুহাম্মদ নূরুল আবছার চৌধুরী)

স্বত্বাধিকারী, ইউনাইটেড ফুডষ্টাফস্, দুবাই, ইউ.এ.ই

The great Islamic Scholar

Alhaj Sufi **Mohammed Mijanur Rahman's**

OPINION

Allah, in the name of The Most Kind, The Most Merciful

It is obvious like midday sun that, 'Mishkatul Masabeeh Shareef' is a perfect work of Ilm-e Hadith. In fact, it is the first book of Ilm-e Hadith in famous 'Dars-e Nizami', which is taught everywhere in Arab and non Arabian countries. It is an accepted book. Apart from that, many analytical books on it have been composed in Arabic, Persian and Urdu etc. depending on the necessity and demand of Muslim Alims, learners, general Muslims and even Islamic Schollars.

'Mirqaatul Mafateeh' (Mirqaat in brief), 'Lum'at', 'Ashi''atul Lum'at' are the Arabic and Persian respectively are the famous analysis of 'Mishkatul Masabeeh'. Still they are highly praised too. As new doctrines or schools has been created, many baseless objections against Ilm-e Hadith started coming from them. It has become essential to eliminate these objections. In other hand, the learners are not sufficiently acquinted to Arabic, Persian and Urdu. As a result they can not be benefited from the aforementioned books composed in Arabic, Persian and Urdu etc.. With a view to overcoming this crisis, the most well acclaimed, the best Tafseer, Hadith and Fiqh specialist of the age Hakimul Ummah Hazratul Allama Mufti Ahmad Yar Khan Naeemi Ashrafi Badayuni Rahmatullahi Alaihi has composed such an analytical book on `Mishkat Shareef' (a famous and complete Hadith Book) in Urdu, which has been accepted as of equal benefit for the general Muslims, learners and Alims.

Allama Mufti Ahmad Yar Khan Naeemi has completed it's translation and analysis in large eight volumes and this has been entitled `Miraatul Manajeeh Sharh-e Mishkatul Masabeeh'. This analytical text has been acclaimed by the Urdu-speakers (Published in Hij. 1378/1959 A.D). For the same point of view this text should be translated so that Bangla-speakers can be benefited equally. But in this long peroid it remained an incomplete demand only. And it is a matter of great delight that Alhajj Moulana Muhammad Abdul Mannan of Chittagong, Bangladesh, Successful Translator of famous Tarjamah and Tafseer-e Quraan 'Kanzul Iman & Khazainul Irfan' and 'Kanzul Iman & Nurul Irfan' has taken an initiative to translate the aforementioned text in Bangla and publish it thereby. This praiseworthy effort of Moulana Muhammad Abdul Mannan has fulfilled another demand of the decade.

May Allah repay the original writers, the Bengali translator and persons related to this auspicious publication of the text properly. We do pray to the Almighty for this book wide propagation and acclamation among the readers. May Allah bestow his divine peace, happiness and prosperity (PHP) upon all of us. Ameen.

Mohammed Mijanur Rahman

[Mohammed Mijanur Rahman]★

★ **Alhaj Sufi Mohammed Mijanur Rahman** was born in a very pious and renowned Muslim family at Kanchana in the District of Narayangonj on the 12th March, 1943. He graduated in the discipline of Commerce from the University of Dhaka in year 1965.

Divine blessings mixed with hard work, backed by good intention make miracles. These are the words Mr. Mohammed Mijanur Rahman, Chairman of PHP group, believes in starting his career with a humble beginning as an employee of a nationalized bank in 1965. Mr. Mijan has indeed been able to create miracles as an entrepreneur. With his vision, honoesty and hard work today PHP group's annual turnover stands at almost BDT 20 Billion. Mr. Mijan joined hand with his brother-in-law in 1971 and formed RM Corporation Limited which proliferated to become one of the largest business conglomerates in the country having investment in several diversified sectors such as trading, steel, ship-breaking etc. In 1999 business of RM group was divided and the concerns located at Chittagong were transferred to Mr. Mijan under the umbrella of PHP group. The group has so far successfully established 16 different business concerns

in different sectors which include CR Coil and CI/GP Sheet manufacturing, Traidng, Ship Breaking, Fisheries, Rubber plantations etc. Recently, the group has embarked on a Float Glass project, which will be one of its kinds in the private sector.

PHP group has banking relationship with four foreign banks. 16 PCBs and One NCBs. In the banking community Mr. Mijan is known for his commitments through times thick and thin. Corporate Governance is given the highest priority in PHP group, which contributes almost BDP 3 Billion per annum as VAT, Duty and income Taxes to the Government exchequer. Mr. Mijan belives that `the best people make the best organization.' To attain this excellence in the organization efficient human resources has been sourced from within as well as outside the country. Presently 67 expatriates are working with the group in various capacities. PHP group is run as per a clearly structured organogram where the Board of Directors comprising of seven sons of Mr. Mijan take collective decision through directly involving the working management, which is comprised of efficient work force. All the sons of Mr. Mizan have their expertise in business and are graduates in business from various universities of the USA and Australia.

Mr. Mijan is committed to work for a better society and he is directly involved in various voluntary organization like Lions and Rotary towards fulfilment of his commitments. As a part his pledge he has established Alhaj Sufi Daemuddin Hospital, 30 bed general hospital in Rupgonj, Narayangonj. He is also a donor of Chittagong Eye Infirmary, which aids patients with ophthalmologic ailments with minumum expenses. Mr. Mijan bears the expenditure of two orphanages in Chittagong namely Chittagong Jamiah Ahmadia Sunnia Alia and Sobhania Alia Madrasah. Mr Mijan is also keen to see Bangladesh as a country of educated mass and for this he has been very supportive in establishing a number of schools, colleges and universities. The Cider International School, Chittagong. Independent University, University of Information, Technology and Sceience, Dhaka can be mentioned. He is a follower of Sufism. Mr. Mijan is also a regular speaker of Islam as a religion and its philosophy in the Chittagong Televesion and ATN Bangla.

Mr. Mijan is an astute follower of principle in his personal life as well as in business, four of the group's unites were among the top duty payers list. These four companies paid BDT 492.3 MM duty alone in 2001-2002 period. In 2003 they have paid almost BDT 3.5 Billion as duty, tax and VAT to the Government. So as far as regulatory compliance is concerned PHP group holds its position very high in compliance to these issues.

Under the leadership of Mr. Mijanur Rahman PHP group strives of achieve peace, happiness & prosperity through fulfilling of its commitment to the society and people.

At present Mr. Mijan apart from his business activities is involved with tow missionary works to ignite own young generation with the touch of human values alongwith institutional education and a green revolution for grwoing more foods for own population with a view to making our Bangladesh complete self sufficient in all types of food items.

Alhahj Nur Muhammad's

VERDICT

Allah, in the name of The Most Kind, The Most Merciful

The 'Mishkatul Masabeeh Shareef' is a perfect book of Ilm-e Hadith. It is the first book of Ilm-e Hadith in famous 'Dars-e Nizami'. It is taught everywhere in the world. It is a accepted book.

'Mirqaatul Mafateeh', 'Lum'aat', 'Ashi'atul Lum'aat' writen in the Arabic and Persian Language respectively are the famous analysis of 'Mishkatul Masabeeh'. As new doctrines or shcools has been created, many baseless objections against Ilm-e Hadith started coming from them. It has become essential to remove these objections. In other hand, who has no knowledge in Arabic, Persian and Urdu, they can not be benefited from the aforementioned books. With a view to overcoming this crisis, the most well acclaimed, the best 'Tafseer, Hadith and Fiqh specialist of the age Hakimul Ummah Hazratul Allama Mufti Ahmed Yar Khan Naeemi Ashrafi Badayuni Rahmatullahi Alaihi has written such an analytical book on 'Mishkat Shareef' (a famous and complete Hadith Book) in Urdu, which has been accepted as of equal benefit for the general Muslims, learners and Alims. Allama Mufti Ahmad Yar Khan Naeemi has completed it's translation and analysis in large eight volumes and this has been entitled `Miraatul Manajeeh Sharh-e Mishkatul Masabeeh'. This analytical text has been acclaimed by the Urdu-speakers. For the same point of view this text should be translated so that Bangla-speakers can be benefited equally. But in this long period it remained an incomplete demand only. I have the great delight that Alhajj Moulana Muhammad Abdul Mannan of Chittagong, Bangladesh, Successful Translator of Famous Tarjamah and Tafseer-e Quraan 'Kanzul Iman & Khazainul Ifran' and 'Kanzul Iman & Nurul Irfan' has taken an initiative to translate the aforementioned text in Bangla and publish it thereby. This praiseworthy effort of Moulana Muhammad Abdul Mannan has fulfilled another demand of the decade.

May Allah repay the original writers, the Bengali translator and persons related to this auspicious publication of the text properly. We do pray to the Almighty for this book wide propagation and acclamation among the readers. thanks...

Alhahj Nur Muhammad*

★ **Alhaj Nur Muhammad** is a reputed pious, wellwisher of mankind, great patron of education and a well-known business person. His respected father late Hajee Abdul Kader was also a pious and very social person.

Alhaj Nur Muhammad entered in family business under his father and started import business in 1987 with the help to his uncle Mr. H.M. Idris. Mr. Nur Muhammad is carrying out the responsibility of Managing Director of Khan Jahan Ali Limited, Khan Jahan Ali Trading Company, Prime Shrimps Hatchery Limited, Prime Builders Limited. Sea Queen Containers Limited and Gausia Poultry & Hatchery Limited. For expansion of business he has visited serveal countries such as India, Bhutan, Pakistan, Singapore, Australia, Thailand, China, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Dubai (UAE) and Soudi Arabia.

He is a honourable Memeber of :

1. Chittagong Chameber of Commerce & Industry, 2. Bangladesh Shirmp Development Alliance, 3. Shrimp Hachery Association of Bangladesh and 4. Khatungonj Trade & Industry Association.

His Voluntary Social works are :

1. EC Member of Anjuman-e Rahmania Ahmadia Sunnia, 2. EC Memebr of Bangladesh Shrimp Development Alliance. 3. EC Member of Shrimp Hatchey Association of Bangladesh, 4. EC Member of Khatuongonj Trade Association, 5. Joint Secretary of Chattagram Maa O Shishu Hospital & Medical College, Chittagong, 6. Former Dierctor of Chittagong Chamber of Commerce & Industry, 7. President of Rahmania Muhammadia Qaderia Madrasah, Chittagong and 8. Patron of Shah Gadi Complex, Chittagong, Bangladesh.

Sunni Mission

England
159 Church lane, Aston, Birmingham, B6, 5UG

Bismillahir Rahmanir Raheem

Alhamdu lillahi Rabbil 'Alameen.

Hazrat Allama Mufti Ahmad Yar Khan Naeemi Rahmatullahi Alaihi, the author of Miraatul Manajeeh Sharh-e Mishkatul Masabeeh, the undisputed Translation & Explantation of 'Hadith' in Urdu has been translated and completed respectfully into the Bengali language by Hazrat Mounala Muhammed Abdul Mannan Sahib of Chittagong, Bangladesh. Also Kanzul Iman, the correct Urdu translation of the Holy Quran by A'la-Hazrat Imam Ahmad Reza Khan Fazil-e-Breilvi Rahmatullahi Alaihi and the Khazainul Irfan by Sayyeduna Hazrat Sheikh Naeem Uddin Muradabadi Rahamatullahi Alaihi and 'Tafseer-e Nurul Irfan' by Hakeemul Ummah Mufti Ahmad Yar Khan Rahamatullahi Alaihi have also been successfully and correctly translated into the Bengali language by Hazrat Moulana Muhammed Abdul Mannan Sahib.

It is purely due to Allah Subhanahu wa Ta'ala to accept his hard work, efforts and dedication for the Ahle-Sunnat wal Jama'at and the Bengali readers in the world, so that Allah Subhanhu wa Ta'ala rewards him in this world and the hereafter and help him to do more work for Ahle Sunnat wal Jama'at. Ameen, Summa Ameen.

I sincerly and respectfully request to all Bangali language readers, please kindly read Kanzul Iman the correct translation of the Holy Quran and the recent translation of 'Miraatul Manajeeh Sharh-e Mishkatul Masabeeh'.

Muhammad Ataur Rahman

Alhaj Muhammed Abu Bakar Chowdhury's
OPINION

Bismillahir Rahmanir Raheem

I have the great pleasure to know that, Alhaj Mounala Muhammed Abdul Mannan of Chittagong, Bangladesh has taken an initiative to translate into Bengali and publish the text of the 'Miraatul Manajeeh Sharh-e Mishkatul Masabeeh' which is composed by Hakeemul Ummah Mufti Ahmed Yar Khan Naeemy Ashrafi Badayuni Rahmatullah Alahi in Urdu. The Miraat is an analytical book on the Miskhat Shereef, a famous and complete Hadith book . As it is written in Urdu language, so this analytical text has been acclaimed by the Urdu-speakers. Because it is composed according to the demand of the age. For the same point of view, this text (Miraat) should be translated into Bengali, so that Bangla speakers can be benefited by the same equally. But in this long period it remained an incomplete demand only. It is to be mentioned that, this is a praiseworthy effort of Moulana Muhammed Abdul Mannan, as he fulfilled a demand of the decade by the same, as well as, his other noteworthy faultless and pure Tarjamah and Tafseerul Quran 'Kanzul Iman & Khazainul Erfan' and 'Kanzul Iman & Nurul Erfan' have fulfilled & satisfied the great demand of the Muslim Ummah.

May Allah repay the translator and publisher properly for this auspicious effort. I do pray the Almighty for these books wide propagation and acclamation among the readers. Thanks.

(Alhaj Muhammed Abu Bakar Chowdhury)
Managing Director, Bayezid Steel Industries Ltd.

Alhaj Sufi Mohammad Rashedul Karim's
VERDICT

Allah, in the name of The Most Kind, The Most Merciful

'Mishkatul Masabeeh Shareef' is a perfect book of Ilm-e Hadith, it is the first book of Ilm-e Hadith in famous 'Dars-e Nizami, which is taught everywhere in the world. It is an accepted book.

The most well acclaimed, the best, "Tafseer, Hadith and Fiqh Specialist of the age Hakimul Ummah Hazratul Allama Mufti Ahmed Yar Khan Naeemi Ashrafi Badayuni Rahmatullahi Alaihi has composed an analytical book on 'Mishkat Shareef' (a famous and complete book of Hadith) in Urdu, which has been accepted as on equal benefit for the general Muslims, learners and Alims.

Allama Mufti Ahmad Yar Khan Naeemi has completed it's translation and analysis in large eight volumes and has been entitled 'Miraatul Manajeeh Sharh-e Mishkatul Masabeeh'. This analytical text has been acclaimed by the Urdu-speakers. For the same point of view this text should be translated so that Bangla-speakers can be benefited equally. But in this long period it remained an incomplete demand only. I have the great pleasure to know that Alhaj Mounala Muhammed Abdul Mannan of Chittagong, Bangladesh, successful Translator of famous Tarjamah and Tafseer-e Quran 'Kanzul Iman & Khazainul Irfan' and 'Khanzul Iman & Nurul Irfan' has taken an initiative to translate the aforementioned text in Bangla and publish it thereby. This praiseworthy effort of Moulana Muhammad Abdul Mannan has fulfilled another demand of the decade.

May Allah repay the original writes, the Bengali translator and persons related to this auspicious publication of the text properly. We do pray to the almighty for this book wide propagation and acclamation among the readers. Thanks...

[Alhaj Sufi Mohammad Rashidul Karim]
Khatongonj, Chittagong, Bangladesh

The Verdict of Alhaj Mohammed Nizam Uddin, son of
Hazratul Allamah Alhaj Moin Uddin Ahmad
Rahmatullahi Alaihi, the great patron of Mazhar Ulum Fazil Madrasah, Nanupur, Fatickchari, Chittagong may Allah shower his blessings upon him and admit him into the garden of the Heaven, Ameen

Allah, in the name of The Most Kind, The Most Merciful

We have the great delight to know that the 'Miraatul Manajeeh Sharh-e Mishkatul Masabeeh' (a famous analytical book on Mishkat Shareef) is going to publish after being translated into Bengali by famous Islamic Scholar Alhaj Mounala Muhammed Abdul Mannan of Chittagong, Bangladesh, in eight volumes.

Today it is obvious like midday sun that 'Mishkatul Masabeeh Shareef' is a perfect and complete book of Ilm-e Hadith. It is taught everywhere in Arab and non Arabian countries. From this, the acceptance of this book can be easily bejudged; as well as, the best Tafseer, Hadith and Fiqh specialist of the age Hakeemul Ummah Mufti Ahmed Yar Khan Naeemi Ashrafi Bedyani has composed the 'Miraat' as an wide analytical book on the Mishkat Shareef in Urdu; which has been accepted by the Urdu speakers. For the same point view this text (Miraat) should be translated into our mother language (Bengali) so that Bangla speakers can be benefited equally. So Moulana Muhammed Abdul Mannan has fulfilled the demand of the decade by this auspicious and praiseworthy effort.

May Allah repay the translator and publisher properly for this auspicious effort. I do pray the Almighty for these books wide propagation and acclamation among the readers. Thanks.

Alhaj Muhammed Nizam Uddin
Dubai, UAE

Alhaj Muhammed Nurul Aziz Chowdhury
and
Alhaj Mafzal Ahmed
Fajairah, UAE's

OPINION

Allah, in the name of The Most Kind, The Most Merciful

We are highly pleased to know that Mounala Muhammed Abdul Mannan of Chittagong, Bangladesh is continuing his writings for the benefit of the Muslim Ummah. He has completed the translation of a famous analytical book of holy Hadith named 'Miraatul Manajeeh Sharh-e Mishkatul Masabeeh' into Bangla, which is composed by the Tafseer Hadith and Fiqh specialist Hakimul Ummah Mufti Ahmad Yar Khan Naeemy in Urdu and published in eight volumes. By the translation of this complete book of Hadith and publication the learners of the holy Quran & Hadith would be undoubtedly benefited. It is to be mentioned that, Moulana Muhammad Abdul Mannan has translated two other noteworthy faultless and pure Tarjamah and Tafseerul Quraan 'Kanzul Iman & Khazainul Irfan' and 'Kanzul Iman & Nurul Irfan'. He fulfilled the great demand of Muslim Ummah.

We do pray to the Almighty for the hon'ble translator, may He repay him properly and for the books wide propagation and acclamation among the readers. Thanks.

Alhaj Muhammed Nurul Aziz Chowdhury
&
Alhaj Mafzal Ahmed

A wellwisher of Islam & Mankind and great patron of education

Alhaj Muhammad Nazrul Islam (RAK)'s

VERDICT

Bismillahir Rahmanir Raheem

I have the great pleasure to know that now the 'Miraatul Manajeeh Sharh-e Mishkatul Masabeeh' the Urdu analytical book composed in eight volumes on the famous Hadith book 'Mishkatul Masabeeh' is being translated into bengali and published by Moulana Muhammad Abdul Mannan, the honourable translator and publisher of two faultless and pure Tarjamah & Tafseer of the holy Quran named 'Kanzul Iman & Khazainul Irfan' and 'Kanzul Iman & Nurul Irfan'.

This praiseworthy auspicious publication of Miraatul Manajeeh sharh-e mishkatul Masabeeh also shall fulfill another demand of the decade and the learners, general Muslims, even Alim-Olamas shall be benefited by this holy book.

May Allah repay the writers and the persons related to this auspicious effort properly. I do pay the Almighty for this books wide propagation among the readers. Thanks

Alhaj Muhammad Nazrul Islam

বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের সম্মানিত কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য, কুমিল্লার প্রসিদ্ধ সাবৃরী দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা ও সাজ্জাদানশীন, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সেবক পীর-ই তরীক্বত গাজী এম. এ. ওয়াহিদ সাবূরী সাহেব মুদ্দাজিল্লুহুল আলী'র

অভিমত

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রত্যয়ী একমাত্র দল বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট'র সম্মানিত চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান বিগত শতাব্দির নব্বইর দশকে ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি লিখিত 'কানযুল ঈমান' এবং এর সাথে সংযোজিত 'খাযাইনুল ইরফান' ও 'নূরুল ইরফান' তাফসীর দু'টির বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী মুসলমানদের এক দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করেছেন। অতঃপর হাদীস শাস্ত্রেও বাংলাভাষীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ কিতাবের চাহিদা থেকে যায়, যা পূরণে 'মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফ'র উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ 'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশ্কাতুল মাসাবীহ্' যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। কিতাবটি উর্দু ভাষায় লিখিত বিধায় উর্দুভাষীরা তা থেকে সম্যক উপকৃত হয়ে আসছে। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে, জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান কয়েক বছর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওই 'মিরআত' গ্রন্থেরও বাংলায় অনুবাদ সমাপ্ত করে অতি যত্ন সহকারে তা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী লিখিত 'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশ্কাতুল মাসাবীহ্'। কিতাবটিতে তিনি সুন্নী মতাদর্শের আলোকে 'মিশকাতুল মাসাবীহ্'তে সন্নিবিষ্ট হাদীস শরীফগুলোর সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাছাড়া, তা'তে আক্বাইদ-ই আহলে সুন্নাত ও ইলমে হাদীসের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদের আনীত আপত্তিগুলোর অতি হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে খণ্ডন করেছেন। সুতরাং তিনি কিতাবটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশনার মাধ্যমে এক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের আরেক চাহিদাও পূর্ণ হলো।

আমি সম্মানিত বঙ্গানুবাদক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কিতাবটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আমীন!!

ধন্যবাদান্তে-

গাজী এম. এ. ওয়াহিদ সাবূরী

অভিমত

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ্'। উর্দু ভাষীদের নিকট সেটার প্রকাশকাল থেকে একটি অত্যন্ত সমাদৃত কিতাব। বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ মিশকাত শরীফের এ ব্যাখ্যাগ্রন্থে হাদীস শরীফের সঠিক মর্মার্থ, ব্যাখ্যা, আক্বাইদ, ইসলামের ইতিহাস, হাদীস বর্ণনাকারীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও শরীয়তের বিধানাবলী অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। উর্দু ভাষার এ কিতাব বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ায় বাংলা ভাষী শিক্ষক, ছাত্র ও সব ধরনের পাঠকগণ তা থেকে সবিশেষ উপকৃত হবেন। প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, আ'লা হযরত গবেষক, পরম শ্রদ্ধেয় আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (মাঃজিঃআঃ) (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ) আলোচ্য কিতাবের সরল বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশনার এক অতি প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

এ অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশনার মাধ্যমে যুগের একটি বিরাট চাহিদা পূরণ হলো। আমি এ মহান উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে-

মাওলানা বদিউল আলম রিজভী
অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-এ তৈয়্যবীয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল,
মধ্য হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম

নানুপুর মহিলা মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দক্ষ আলিমে দ্বীন
আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হোসাঈন আহমদ ফারুকী সাহেবের

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

হাদীস শাস্ত্রেও বাংলাভাষীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ কিতাবের চাহিদা থেকে যায়, যা পূরণে 'মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফ'র উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ 'মিরআতুল মানাজীহ শরহে মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ' যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। কিতাবটি উর্দু ভাষায় লিখিত বিধায় উর্দুভাষীরা সেটা থেকে সম্যক উপকৃত হয়ে আসছে। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে, বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন ও প্রসিদ্ধ লেখক জনাব আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান কয়েক বছর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওই 'মিরআত' গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ সমাপ্ত করে অতি যত্ন সহকারে তা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

বিশ্বখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সুবিজ্ঞ আলিমে দ্বীন হাকীমুল উম্মত মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী 'মিরআতুল মানাজীহ শরহে মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থটির মূল লিখক। কিতাবটিতে তিনি সুন্নী মতাদর্শের আলোকে 'মিশকাতুল মাসাবীহ'-তে সন্নিবিষ্ট হাদীস শরীফগুলোর সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাছাড়া, তিনি তা'তে আক্বাইদ-ই আহলে সুন্নাত ও ইলমে হাদীসের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদের আনীত আপত্তির অতি হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে খণ্ডন করেছেন। সুতরাং কিতাবটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশনার মাধ্যমে এক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের একটি চাহিদাও পূর্ণ হলো। তদুপরি, তা হাদীস শাস্ত্রে বাংলাভাষী জ্ঞান-পিপাসুদেরকেও জ্ঞানতৃপ্ত করবে নিঃসন্দেহে।

আমি সম্মানিত মূল লেখক, স্নেহের বঙ্গানুবাদক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পরম করুণাময়ের পবিত্র দরবারে দো'আ করছি- তিনি তাঁদেরকে এর যথাযথ প্রতিদান দিন! তদ্‌সঙ্গে কিবাতাটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আমীন।

(আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হোসাঈন আহমদ ফারুকী)

বিশিষ্ট আলিম-ই দ্বীন, প্রসিদ্ধ দ্বীনী বক্তা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও
সংগঠক মেসার্স গ্রীনডোম টাইপিং ইষ্ট, দুবাই'র সত্ত্বাধিকারী
আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল কবীর চৌধুরী'র

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাভাষী সুন্নী মুসলমানদের জন্য পবিত্র ক্বোরআনের বিশুদ্ধ তরজমা ও তাফসীরের প্রয়োজন ছিলো। অনুরূপ সরল বাংলায় পবিত্র হাদীস শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাগ্রন্থের চাহিদাও অপূর্ণ থেকে যায়। আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান বিগত শতাব্দির নব্বই'র দশকে ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহির লিখিত বিশুদ্ধতম তরজমা-ই ক্বোরআন 'কানযুল ঈমান' এবং এর সাথে সংযোজিত 'খাযাইনুল ইরফান' ও 'নূরুল ইরফান' দু'টি তাফসীর গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে প্রথমোক্ত চাহিদাটি পূরণ করেছেন। এর মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তিনি হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম পূর্ণাঙ্গ প্রসিদ্ধ কিতাব 'মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফ'র উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ 'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে 'মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফ'র'ও বাংলায় অনুবাদ সমাপ্ত করে অতি যত্ন সহকারে তা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

বৃহৎ পরিসরের আট খণ্ডে লিখিত 'মিরআত' কিতাবটিতে সুন্নী মতাদর্শের আলোকে 'মিশকাতুল মাসাবীহ'-তে সন্নিবিষ্ট হাদীস শরীফগুলোর সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, তা'তে আক্বাইদ-ই আহলে সুন্নাত ও ইলমে হাদীসের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদের আনীত সব আপত্তির অতি হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে খণ্ডন রয়েছে। সুতরাং কিতাবটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশনার মাধ্যমে এক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের আরো একটি চাহিদা পূরণ হলো। তদুপরি, তা হাদীস শাস্ত্রে বাংলাভাষী জ্ঞান-পিপাসুদেরকেও জ্ঞানতৃপ্ত করবে নিঃসন্দেহে।

আমি শ্রদ্ধেয় বঙ্গানুবাদককে মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং অনূদিত কিতাবটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আমীন।

মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল কবীর চৌধুরী

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ'। উর্দু ভাষীদের নিকট সেটার প্রকাশকাল থেকে একটি অত্যন্ত সমাদৃত কিতাব। বিশ্ববিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মিশকাত শরীফের এ ব্যাখ্যাগ্রন্থে হাদীস শরীফের সঠিক মর্মার্থ, ব্যাখ্যা, আক্বাইদ, ইসলামের ইতিহাস, হাদীস বর্ণনাকারীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও শরীয়তের বিধানাবলী অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। উর্দু ভাষায় এ কিতাব বাংলা ভাষায় অনূদিত হলে বাংলা ভাষীগণও তা থেকে সবিশেষ উপকৃত হবে। আল্‌হাজ্জ্ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ) আলোচ্য কিতাবের সরল বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশনার এক অতি প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

এ অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হলে যুগের একটি বিরাট চাহিদা পূরণ হবে। আমি এ মহান উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(হাফেয আশরাফুজ্জামান আল-ক্বাদেরী)
মুহাদ্দিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

সংযুক্ত আরব আমীরাতের রাস আল খাইমাহ প্রবাসী বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন,
দ্বীন ও মাযহাবের খিদমতে নিবেদিত প্রাণ, বিশিষ্ট সংগঠক আলহাজ্ব
মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ খালেদ আজম (আল্লাহ্ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন)-এর

অভিমত

প্রসিদ্ধ ও যুগশ্রেষ্ঠ তাফসীর, হাদীস ও ফিক্বহ্ বিশারদ হাকীমুল উম্মত হযরত আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বদায়ূনী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। তিনি 'মিশ্‌কাত' শরীফের উর্দু ভাষায় এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, যাতে 'মিশকাতুল মাসাবীহ'তে সন্নিবিষ্ট বিশুদ্ধ হাদীস শরীফগুলোর সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা মুসলিম সমাজের সামনে অতি উত্তমরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তদুপরি, প্রতিটি হাদীস সংশ্লিষ্ট আক্বাইদ ও ফিক্বহ বিষয়ক সমাধানও দেওয়া হয়েছে এ কিতাবে। তিনি উর্দু ভাষায় বড় বড় আট খণ্ডে এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত করেছেন। তাঁর ওই ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম 'মিরআতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ' (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা)। এটা তার প্রকাশকাল (১৩৭৮ হিঃ/১৯৫৯ ইং) থেকে উর্দুভাষীর নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হয়ে আসছে। একই কারণে গ্রন্থখানার বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়াও একান্ত জরুরী ছিলো, যাতে বাংলাভাষীরাও তা থেকে উপকৃত হতে পারেন; কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ এ চাহিদা অপূর্ণই থেকে যায়। আজ অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও অনুবাদক আলহাজ্জ্ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ) আলোচ্য কিতাবের সরল বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়ে যুগের ওই চাহিদাও পূরণ করেছেন। উল্লেখ্য, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ইতোপূর্বে প্রসিদ্ধ ও নির্ভুল দু'টি তরজমা ও তাফসীর-ই ক্বোরআন 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' এবং 'কানযুল ঈমান ও নূরুল ইরফান' বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে মুসলিম মিল্লাতের বিরাট চাহিদা পূরণ করেছেন।

'মিরআত'-এর আলোচ্য বাংলা-অনুবাদ হাদীস-ই পাকের জ্ঞান-পিপাসুদেরকে পরিতৃপ্ত করবে এতে সন্দেহ নেই। পরম করুণাময়ের পবিত্র দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছি- তিনি তাঁদেরকে এর যথাযথ প্রতিদান দিন! তদ্‌সঙ্গে কিতাবটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আ-মী-ন।

মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ খালেদ আজম
রাস-আল-খাইমাহ্, ইউএই

লেখক পরিচিতি
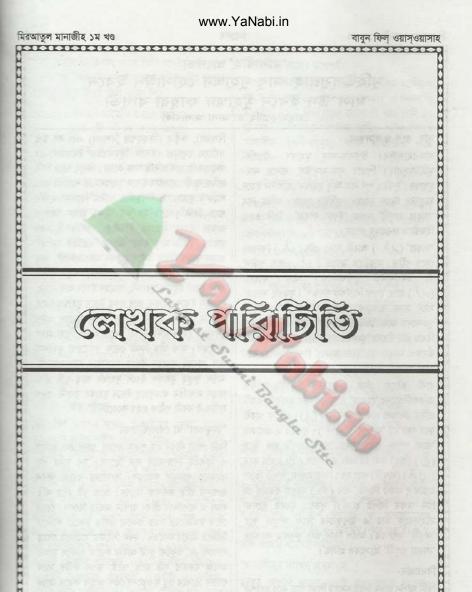
'মাসাবীহ' প্রণেতা

মুহিউস্‌সুন্নাহ্ আবূ মুহাম্মদ হোসাঈন ইবনে মাস'উদ ইবনে মুহাম্মদ ফার্‌রা বাগ্‌ভী

[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

নাম, বংশ ও বাসস্থান

নাম-হোসাঈন। উপনাম-আবূ মুহাম্মদ। উপাধি-মুহিউস্‌সুন্নাহ। পিতার নাম-মাস্'উদ, দাদার নাম-মুহাম্মদ। সুতরাং পূর্ণ নাম-আবূ মুহাম্মদ হোসাঈন ইবনে মাস্'উদ ইবনে মুহাম্মদ, মুহিউস্ সুন্নাহ্। প্রসিদ্ধ নাম 'ফার্‌রা বাগ্‌ভী' অথবা 'ইবনে ফার্‌রা'। তিনি ৪৩৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

'ফার্‌রা' (فرّاء) আরবী শব্দ। এটা (فرو) (ফার্‌ভ) থেকে গৃহীত। আরবীতে 'ফার্‌ভ' (فرو) বলে 'পুস্তীন' বা চর্ম-নির্মিত পোষাককে। আর 'ফার্‌রা' (فرّاء) হচ্ছে 'পেশা নির্দেশক শব্দরূপ'। সুতরাং 'ফার্‌রা' মানে হলো 'চামড়ার পোষাক নির্মাতা'। তাঁর পিতৃ-পুরুষদের মধ্যে কেউ এ পেশার সাথে জড়িত ছিলেন বিধায় এটা তাঁদের 'কুলনাম' (Surname) হয়েছে। আর তাঁকেও 'ফার্‌রা' বা 'ইবনে ফার্‌রা' (ফার্‌রা-তনয়) বলে ডাকা হতো।

বাকী রইলো তাঁর জন্মভূমি। তদানীন্তনকালীন আফগানিস্তানের 'হেরাত' ও 'মার্‌ভ'-এর মধ্যবর্তী একটি প্রসিদ্ধ এলাকার নাম 'বাগকূর' (باغ كور)। এটাকে আরবী করে বলা হয় 'বাগশূর' (بغشور)। সুতরাং এ এলাকার সাথে সম্পৃক্ত করার সময় 'শূর' অংশটি বাদ দিয়ে (بغ) (বাগ) করা হয় এবং এর সাথে (واؤ) বৃদ্ধি করে (بغوى) (বাগ্‌ভী) করা হয়। (বলা বাহুল্য, শব্দটি ছিলো প্রথমে দু'অক্ষর বিশিষ্ট, আর (واؤ) সংযুক্ত হওয়ায় তা তিন অক্ষর বিশিষ্ট হলো।) সুতরাং হযরত প্রণেতা মহোদয়কে তাঁর এ জন্মস্থানের দিকে সম্পৃক্ত করে 'বাগ্‌ভী' বলা হয়। অর্থাৎ তিনি তাঁর কুলনাম সহকারে 'ফার্‌রা বাগ্‌ভী' হিসেবেও প্রসিদ্ধ।

বিদ্যার্জন

তিনি আপন যুগের নিয়মানুসারে শিক্ষা লাভ করে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস (হাদীস বিশারদ), মুফাস্‌সির (তাফসীর বিশারদ), ফক্বীহ্ (ফিক্বহ্‌শাস্ত্র বিশারদ) এবং বহু উচ্চ পর্যায়ের ক্বোর্‌রা (ইল্‌মে ক্বিরআতের ইমামগণ)-এর অন্যতম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফিক্বহ শাস্ত্রে তিনি প্রসিদ্ধ ক্বাযী হোসাঈন ইবনে মুহাম্মদ-এর শাগরিদ এবং শাফে'ঈ মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলিম ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আবুল হাসান আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ দাউদীর শাগরিদ ছিলেন। তাছাড়া, তিনি আবূ ওমর আবদুল ওয়াহিদ মালীহী, আবূল ফাদ্বল যিয়াদ ইবনে মুহাম্মদ আল-হানাফী, আবূ বকর ইয়াক্বূব ইবনে আহমদ সায়রাফী, আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়ূসুফ জুয়ায়নী, আহমদ ইবনে আবূ নাস্‌র, হাস্‌সান ইবনে মুহাম্মদ, আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হায়সাম, আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ প্রমুখ যুগখ্যাত মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আর তাঁর নিকট থেকে যুগবরেণ্য মুহাদ্দিস আবূ মান্‌সূর মুহাম্মদ ইবনে আস্'আদ আল-আত্তারী, আবুল ফুতূহ্ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আত্ব-ত্বাঈ এবং আবুল মাকারিম ফাদ্বলুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ তূক্বানী প্রমুখ হাদীস-ই নবভী শরীফ গ্রহণ করেছেন।

'তাক্বওয়া' বা খোদাভীরুতা

তিনি গোটা জীবন গ্রন্থ-পুস্তক প্রণয়ন, রচনা এবং হাদীস ও ফিক্বহ্‌র শিক্ষাদানে রত ছিলেন। সব সময় ওযূ সহকারে পাঠদান করতেন। সংসারের বর্ণাঢ্য জীবন যাপনের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। অল্পে তুষ্ট র'য়ে অতি সরল ও সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। রোযা রেখে ইফতারের সময় শুক্‌নো রুটির টুকরো পানিতে ভিজিয়ে আহার করতেন। যখন লোকেরা বারংবার বলতে লাগলো যে, শুক্‌নো রুটি আহার করতে থাকলে মাথার মগজে শুষ্কতার সৃষ্টি হতে পারে, তখন রুটির সাথে ব্যাঞ্জন হিসেবে শুধু যায়তূনের তেল আহার করতে আরম্ভ করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, তাঁর স্ত্রী বড় ধনবতী ছিলেন।

বিবি সাহেবা ইন্তিকাল করলে তিনি যথেষ্ট সম্পদ রেখে যান; কিন্তু তিনি (হযরত প্রণেতা মহোদয়) স্ত্রীর ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে কিছুই গ্রহণ করেন নি।

ধন যদি নাইবা র'য় দুঃখ কিসের?
হৃদয় যদি ধনী হয় চাওয়া কিসের?

'মুহিউস্ সুন্নাহ' উপাধি লাভ

তিনি যখন 'শরহুস্ সুন্নাহ' প্রণয়ন করলেন, তখন তিনি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য লাভ করলেন। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন, "তুমি আমার হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা লিখে আমার সুন্নাতকে জীবিত করে দিয়েছো।" সুতরাং ওই দিন থেকে তাঁর উপাধি 'মুহিউস্ সুন্নাহ' (সুন্নাতকে জীবিতকারী) হয়ে গেলো।

ওফাত

৫১৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে 'মারভ্-দুর্রূয' নগরীতে তিনি ওফাত পান। আপন ওস্তাদ হযরত ক্বাযী হোসাঈনের পাশে প্রসিদ্ধ 'তালেক্বানী কবরস্থান'-এ তাঁকে দাফন করা হয়। সেখানে তাঁর মাযার শরীফ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁর বয়স শরীফ ৮০ বছর অতিক্রম করেছিলো।

লেখনী ঃ গ্রন্থ-পুস্তক

তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে- 'মাসাবীহুস্ সুন্নাহ', যা'তে ৪,৪৮৪টি হাদীস শরীফ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তন্মধ্যে তিনি 'সিহাহ'র বোখারী ও মুসলিম হতে ২,৪৩৪টি হাদীস শরীফ আর 'হিসান'র সুনান-ই আবূ দাঊদ ও তিরমিযী ইত্যাদি হতে ২০৫০টি হাদীস সংকলন করেছেন।

অবশ্য, 'কাশ্ফুয্ যুনূন' প্রণেতা 'মাসাবীহ্'র হাদীসগুলোর যে সংখ্যা কোন কোন বিজ্ঞ হাদীস বিশারদের বরাতে উল্লেখ করেছেন তা ভিন্নতর। তাঁরা ওই হাদীসগুলোর সংখ্যা বলেছেন- ৪,৭১৯টি। তন্মধ্যে ৩২৫টি বোখারী শরীফের, ৮৭৫টি মুসলিম শরীফের, ১০৫১টি 'মুত্তাফাক্ব আলায়হি' (বোখারী ও মুসলিম-এর)। আর অবশিষ্টগুলো অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

'মাসাবীহ' গ্রন্থের তাৎপর্য

'কাশ্ফ' প্রণেতা মহোদয় কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ আলিমের বরাতে লিখেছেন যে, তাঁর (গ্রন্থ প্রণেতা) এ কিতাবের 'মাসাবীহ' নামটি তিনি নিজে রাখেন নি, বরং তিনি এর ভূমিকায় এ কিতাবে সংকলিত হাদীস শরীফগুলোকে 'মাসাবীহ' (প্রদীপসমূহ) বলে আখ্যায়িত করে লিখেছেন-

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اَحَادِيْثَ هٰذَا الْكِتَابِ مَصَابِيْحُ

(অতঃপর, এ কিতাবের হাদীসগুলো হচ্ছে একেকটি প্রদীপ)। এ কারণে, গোটা কিতাবটার নাম 'মাসাবীহ্' (প্রদীপসমূহ) হিসেবে নির্ণীত হয়ে গেছে।

এ গ্রন্থের প্রশংসা কবির ভাষায় ঃ

'মাসাবীহ্'র হরেক হাদীস 'সহীহ্-হাসান',
বদ্ধ-কুটিরের কুঞ্জিপুঞ্জ, দানিবে কল্যাণ।
বিধি-বিধান শরীয়তের এতে অম্লান,
হিদায়তের রাজপথে করে আলো দান।
সৃষ্টিকুলের সব কথার আদর্শ-ইমাম,
হরেক বাণী যে তার সত্যের নিশান।
যার অধ্যয়নে জ্ঞানী হয় ইস্পাত সমান,
প্রবৃত্তির পূজারী হয় ছারখার-খানখান।
ইচ্ছার আলো ছুটে তমসায় 'প্রদীপ' পানে,
সামর্থ্যধন্য বিজ্ঞতর নির্ঘাত বিধান জেনে।

বিজ্ঞ প্রণেতা হযরত মুহিউস্ সুন্নাহ্‌র লিখিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী

১. তাফসীর-ই মা'আলিমুত্ তানযীল, ২. শরহুস্ সুন্নাহ্, ৩. ফাতা-ওয়া-ই বাগ্ভিয়্যিাহ্, ৪. ইরশাদুল আন্ওয়ার ফী শামা-'ইলিন্ নবীয়্যিল মুখ্তার, ৫. তারজামাতুল আহকাম (ফিল ফুরূ'ই), ৬. তাহযীব (ফিল ফুরূ'ই) ও ৭. আল-জাম'উ বায়নাস্ সহীহাঈন।

'মাসাবীহ্'র ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ

হযরত আল্লামা ফার্রা বাগ্ভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির এ যুগশ্রেষ্ঠ কিতাব 'মাসাবীহ্'র ব্যাখ্যা করে

বহু যুগবরেণ্য আলিম-মুহাদ্দিস গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. আল-মুয়াস্‌সির শরহে মাসাবীহ, কৃত ঃ শায়খ শিহাব উদ্দীন ফাদ্বল ইবনে হোসাঈন তাওরিশ্‌তী হানাফী [ওফাত ৬৬১ হিজরী]। এটা এর সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

২. তালভীহ শরহে মাসাবীহ্ , কৃত ঃ শায়খ সদর উদ্দীন আবুল মা'আলী মুফাফ্‌ফর ওমরী [ওফাত ৬৮৮ হিজরী]।

৩. শরহে মাসাবীহ, কৃত ঃ আবুল ফারাজ মুহাম্মদ ইবনে দাউদ ইবনে ইয়ূসুফ তাবরীযী।

৪. শরহে মাসাবীহ্ , কৃত ঃ শায়খ ইয়াক্বূব ইবনে ইদ্রীস ইবনে আবদুল্লাহ্ রূমী ক্বিরমানী হানাফী [ওফাত ৮৩৩ হিজরী]।

৫. শরহে মাসাবীহ , কৃত ঃ শায়খ আলাউদ্দীন আলী ইবনে মাহমূদ ইবনে মুহাম্মদ বোস্তামী হারাভী হানাফী [ওফাত ৮৭৫ হিজরী]।

৬. শরহে মাসাবীহ, কৃত ঃ আল্লামা যায়নুদ্দীন আবুল 'আদল ক্বাসেম ইবনে ক্বাত্‌লুবগা হানাফী [ওফাত ৮৭৫ হিজরী]।

৭. তোহফাতুল আবরার, কৃত ঃ ক্বাযী নাসির উদ্দীন আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর আল-বায়দ্বাভী [ওফাত ৬৮৫ হিজরী]।

৮. আত্‌-তানভীর, কৃত ঃ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুযাফ্‌ফর আল-খালী [ওফাত ৭৪৫ হিজরী]।

৯. শরহে মাসাবীহ, কৃত ঃ শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-ওয়াসেত্বী আল-বাগদাদী ওরফে 'ইবনুল আকূলী' [ওফাত ৭৯৭ হিজরী]।

১০. তাস্‌হীহুল মাসাবীহ, কৃত ঃ শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-জাযারী [ওফাত ৮৩৩ হিজরী]।

১১. শরহে মাসাবীহ, কৃত ঃ শায়খ যহীর উদ্দীন মাহমূদ ইবনে আবদুস সামাদ।

১২. তালফীক্বাতুল মাসাবীহ, কৃত ঃ শায়খ কুত্বব উদ্দীন মুহাম্মদ আযনীক্বী [ওফাত ৮৮৪ হিজরী]।

১৩. 'আল-মানাজীহ ওয়াত্‌-তাফাতীহ্' ফী শরহে আহা-দীসিল মাসাবীহ্, কৃত ঃ শায়খ সদর উদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম।

১৪. শরহে মাসাবীহ, কৃত ঃ শামসুদ্দীন আহমদ ইবনে সুলায়মান ওরফে ইবনে কামাল পাশা।

১৫. শরহে মাসাবীহ, কৃত ঃ আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ওরফে যায়নুল আরব।

১৬. আল-মাফাতীহ্ শরহে মাসাবীহ, কৃত ঃ শায়খ মাযহারুদ্দীন হোসাঈন ইবনে মাহমূদ ইবনে হোসাঈন যায়দানী।

১৭. শরহে মাসাবীহ, কৃত ঃ শায়খ আবদুল মু'মিন *ইবনে আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ আয্‌-যা'ফরানী।*

১৮. শরহে মাসাবীহ, কৃত ঃ শায়খ আবদুল্লাহ্ ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইসমাঈল ইবনে আবদুল মালিক ইবনে ওমর, ওরফে, 'আশরাফুল ফাক্বা'ঈ'

'মুখতাসারাত' ও 'তাখারীজ'·
[সংক্ষেপিত ও সংকলিত]

১. মুখতাসারুল মাসাবীহ্, কৃত ঃ শায়খ আবুল খোবায়ব আবদুল ক্বাহের ইবনে আবদুল্লাহ্ সোহ্‌রাওয়ার্দী [ওফাত ৫৬৩ হিজরী]। এটা এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ।

২. দ্বিয়াউল মাসাবীহ, কৃত ঃ শায়খ তক্বী উদ্দীন আলী ইবনে আবদুল কাফী আস্‌ সুবকী [ওফাত ৭৫৬ হিজরী]।

৩. আত্তাখারীজ ফী ফাওয়াইদা মুতা'আল্লিক্বাতিন্ বিআহা-দীসিল মাসাবীহ, কৃত ঃ শায়খ মাজদুদ্দীন আবূ তাহের মুহাম্মদ ইবনে এয়া'কূব আল- ফায়রূযাবাদী।

[সূত্র ঃ মিফতাহুস্‌ সা'আদাহ, কৃত- ইবনে খালকান, বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন ও কাশফুয্‌যুনূন]

****

'মিশ্কাত' প্রণেতা
ওয়ালী উদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ / মাহমূদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ওমরী খতীব-ই তাবরীযী
[রাহমাতুল্লাহ্ তা'আলা আলায়হি]

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম-মুহাম্মদ (কিংবা মাহমূদ), উপনাম-আবূ আবদুল্লাহ্, উপাধি-ওয়ালী উদ্দীন। পিতার নাম-আবদুল্লাহ্। বংশীয়ভাবে 'ওমরী' এবং 'খাতীব-ই তাব্রীযী' হিসেবে প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাঁর পূর্ণ নাম-ওয়ালী উদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ (কিংবা মাহমূদ) ইবনে আবদুল্লাহ্ ওমরী খাতীব-ই তাবরীযী [রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]।

তিনি আপন যুগের বিজ্ঞ মুহাদ্দিস (হাদীস বিশারদ) ও আরবী অলংকার শাস্ত্র (ফাসাহাত ও বালাগত)'র ইমাম ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় 'মিশ্কাত' শরীফ লিখার মাধ্যমে। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুবারক শাহ সা'দী প্রমুখ তাঁর শাগরিদ হবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

লেখনী

তাঁর লিখিত গ্রন্থ-পুস্তকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 'সিহাহ্ সিত্তা' ইত্যাদির বিরাটাকার সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ্', যাতে সিহাহ্' ছাড়াও অন্যান্য কিতাবের হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে।

'মিশ্কাতুল মাসাবীহ' একটি অতীব গ্রহণীয় ও বহুল প্রচলিত হাদীসগ্রন্থ। পাক-বাংলা-ভারত উপমাদেশে তো শুধু 'মিশ্কাত' ও 'মাশারিকুল আনোয়ার'ই দরসে হাদীসের পাঠ্য হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হয়ে আসছে। এমনকি এখনও। হাদীস শাস্ত্রের পাঠ্য হিসেবে শীর্ষে 'সেহাহ সিত্তাহ্' (বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীসগ্রন্থ) হলেও ইতোপূর্বে পাঠ্য হিসেবে 'মিশ্কাতুল মাসাবীহ'-ই পড়ানো হয়। বলা বাহুল্য, এ উপ-মহাদেশে হাদীস শাস্ত্রের পাঠদান ও অধ্যয়নের সূচনা করা হয় 'মিশ্কাতুল মাসাবীহ্'র মাধ্যমে। এমনকি, উপমহাদেশে এমন একটি যুগ ছিলো, যখন মিশকাত শরীফকে ক্বোরআন মজীদের মতো হেফয করানো হতো। সুতরাং যারা মিশ্কাত শরীফ হেফয (কণ্ঠস্থ) করে নিতেন তাঁদেরকে 'মিশ্কাতী' উপাধিতে ভূষিত করা হতো, যেভাবে গোটা ক্বোরআন মজীদের হেফযকারীকে 'হাফেয-ই ক্বোরআন' (সংক্ষেপে হাফেয সাহেব) বলা হয়ে থাকে।

বিন্যাসরীতি

'মাসাবীহ'-এ শুধু হাদীস শরীফগুলো উল্লেখ করা হয়েছিলো। বর্ণনাকারীর নাম, হাদীসের উৎস, 'সহীহ্', 'হাসান' কিংবা 'দ্ব'ঈফ' (দুর্বল) কিনা ইত্যাদির উল্লেখ ছিলো না। 'মিশ্কাত' প্রণেতা এ সব ক'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি একথাও বলে দিয়েছেন যে, ওই হাদীস কোন্ কিতাবের। সুতরাং তাতে ১৩টি হাদীস-গ্রন্থ প্রণেতার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- সিহাহ্ সিত্তাহ্'র ইমামগণ, ইমাম মালিক, ইমাম শাফে'ঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম দারেমী, ইমাম দারুকুত্বনী, বায়হাক্বী এবং আবুল হাসান রযীন ইবনে মু'আবিয়া। অতঃপর শুধু মাসাবীহ্ প্রণেতার লেখার উপর নির্ভর করে ক্ষান্ত হননি, বরং উসূলে হাদীসের ওইসব কিতাবের মধ্যে বর্ণনাগুলোর ভিন্নতা যাচাই করে তাও উদ্ধৃত করেছেন। অবশ্য যেখানে 'মাসাবীহ্' প্রণেতা হাদীসগুলো 'গরীব' কিংবা 'দ্ব'ঈফ' অথবা 'মুনকার' সাব্যস্ত করেছেন, সেখানে এ মিশ্কাত প্রণেতা মহোদয় সেটার কারণও উল্লেখ করেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর 'মিরক্বাত শরহে মিশ্কাত'-এ উল্লেখ করেছেন যে, প্রণেতা মহোদয়ের হস্ত লিখিত 'মিশ্কাত'র কপি ৯৫৫ হিজরী পর্যন্ত অক্ষত ছিলো। তারপর কপিটা নষ্ট হয়ে যায়।

মাসাবীহ্র পরিচ্ছেদগুলো এবং মিশ্কাতের সংযোজন

'মাসাবীহ' প্রণেতা প্রতিটি 'অধ্যায়' (بَاب)'র অধীনে দু'টি পরিচ্ছেদ (فصل) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম পরিচ্ছেদে 'সহীহাঈন' (বোখারী ও মুসলিম)'র হাদীস এনেছেন, যেগুলোকে 'সিহাহ্' বলে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ ইত্যাদির হাদীসসমূহ এনেছেন, যেগুলোকে তিনি 'হিসান' বলে উল্লেখ করেছেন। আর 'মিশ্কাত' প্রণেতা প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে 'তৃতীয় পরিচ্ছেদ' সংযোজন করেছেন, যাতে তিনি 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' ব্যতীত হাদীসের অন্যান্য কিতাবের

হাদীসসমূহ এনেছেন। তদুপরি, 'মারফূ' (مرفوع) হাদীসসমূহ ছাড়া সাহাবা ও তাবে'ঈনের বাণী এবং কর্মসমূহও, যেগুলো অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো, সন্নিবিষ্ট করেছেন।

মিশ্‌কাত ও মাসাবীহ্‌র হাদীসসমূহের সংখ্যা

হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন'-এ বর্ণনা করেছেন যে, মাসাবীহ্'র হাদীসসমূহের সংখ্যা ৪,৪৮৪। ইবনে মালিকও এ সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। এর উপর মিশকাত প্রণেতা আরো ১,৫১১টি হাদীস সংযোজন করেছেন। সুতরাং 'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্'র হাদীসসমূহের সংখ্যা দাঁড়ালো সর্বমোট ৫,৯৯৫। কিন্তু 'মাযাহিরে হক্ব' প্রণেতা ও 'তা'লীক্বুস্ সাবীহ্' প্রণেতা 'মাসাবীহ্'র হাদীসসমূহের সংখ্যা লিখেছেন ৪,৪৩৪। এতদ্ভিত্তিতে 'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্'র হাদীসগুলোর সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বমোট ৫,৯৪৫। 'তারীখুল হাদীস' (হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিশ্‌কাত শরীফে ২৯টি 'কিতাব' (পর্ব), ৩২৭টি 'বাব' (অধ্যায়) এবং ১,০৩৮টি 'ফস্‌ল' (فصل) বা পরিচ্ছেদ রয়েছে।

ওফাতের সাল

মিশকাত প্রণেতার জন্ম কিংবা ওফাত কোনটার সাল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবুও ওফাত সম্পর্কে এতটুকু বলা যায় যে, ৭৩৭ হিজরীর পরেই তাঁর ওফাত হয়েছে। কারণ, ৭৩৭ হিজরীর রমযান মাসের জুমু'আর দিনই 'মিশ্‌কাত' শরীফ প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেছেন বলে তিনি মিশ্‌কাত শরীফের শেষ ভাগে উল্লেখ করেছেন। এরপর বিভিন্ন অবস্থার উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ অনুমান করে বলেছেন যে, তিনি ৭৪৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। অবশ্য, 'তারীখে হাদীস' প্রণেতা তাঁর ওফাতের সাল ৭৪০ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন।

মিশ্‌কাত শরীফের ব্যাখ্যা এবং পাদ ও পার্শ্বটীকা

বিশ্বের মুসলিম সমাজে মিশ্‌কাত শরীফ এতোই গ্রহণযোগ্য হয়েছে যে, বিশ্ববরেণ্য বহু বিজ্ঞ হাদীস বিশারদ এ কিতাবের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন কিংবা এর সাথে পাদ ও পার্শ্বটীকা সংযোজন করেছেন। নিম্নে এ ধরনের প্রসিদ্ধ কতিপয় গ্রন্থের উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি–

১. **মিরক্বাত শরহে মিশ্‌ক্বাত, কৃত ঃ** শায়খ নূর উদ্দীন আলী ইবনে সুলতান ইবনে মুহাম্মদ হারাভী, ওরফে 'মোল্লা আলী ক্বারী' রাহমাতুল্লাহি আলায়হি [ওফাত ১০১৪ হিজরী]।

২. **আল কাশিফু 'আন হাক্বা-ইক্বিস্ সুনান, কৃত ঃ** আল্লামা হাসান ইবনে মুহাম্মদ আত্বতীবী [ওফাত ৭৪৩ হিজরী]।

৩. **শরহে মিশ্‌কাত, কৃত ঃ** আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ওরফে আলামুদ্দীন সাখাভী।

৪. **মিনহাজুল মিশ্‌কাত, কৃত ঃ** শায়খ আবদুল আযীয আবহারী [ওফাত ৮৯৫ হিজরীর কাছাকাছি]।

৫. **শরহে মিশ্‌কাত, কৃত ঃ** শায়খ শিহাব উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আলী ইবনে হাজর হায়তামী [ওফাত ৯৭৩ হিজরী]।

৬. **হিদায়তুর রুয়াত ইলা তাখরীজিল মাসাবীহি ওয়াল মিশকাত, কৃত ঃ** শায়খ আবুল ফদ্বল আহমদ ইবনে আলী ওরফে ইবনে হাজার আসক্বালানী [ওফাত ৮৫৩ হিজরী]।

৭. **লুম'আতুত্ তানক্বীহ (আরবী), কৃত ঃ** শায়খ আবুল মাজদ আবদুল হক্ব ইবনে সাইফুদ্দীন বোখারী দেহলভী [ওফাত ১০৫২ হিজরী]।

৮. **আশি''আতুল লুম'আত (ফার্সী), কৃত ঃ** শায়খ আবুল মাজদ আবদুল হক্ব ইবনে সাইফুদ্দীন বোখারী দেহলভী [ওফাত ১০৫২ হিজরী]।

৯. **মিরআতুল মানা-জীহ্ তরজমা ও শরহে মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ, কৃত ঃ** হাকীমুল উম্মাত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী। [ওফাত ১৩৯১ হিজরী ১৯৭১ ইংরেজী]

১০. **হাশিয়া-ই মিশ্‌কাত, কৃত ঃ** সাইয়্যেদ শরীফ আলী ইবনে মুহাম্মদ জুরজানী।

১১. **হাশিয়া-ই মিশ্‌কাত, কৃত ঃ** শায়খ মুহাম্মদ সা'ঈদ ইবনুল মুজাদ্দিদ আলফে সানী [ওফাত ১০৭০ হিজরী]।

১২. **মাযা-হিরে হক্ব (উর্দু), কৃত ঃ** নবাব কুত্বব উদ্দীন খান বাহাদুর [ওফাত ১২৮৯ হিজরী]।

১৩. **যারী'আতুন্ নাজাত শারহে মিশকাত, কৃত ঃ** শায়খ আবদুন্ নবী ইমাম উদ্দীন মুহাম্মদ শাত্তারী [ওফাত ১২২০ হিজরী]।

****

হযরত শায়খ মুহাক্বক্বিক্ব
মুহাম্মদ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বংশীয় পরম্পরা

হযরত শায়খ মুহাক্বক্বিক্ব মুহাম্মদ আবদুল হক্ব দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির পূর্বপুরুষগণ বোখারার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আগা মুহাম্মদ তুর্ক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দিতে (১২৯৬ খ্রি.) ভারতে তাশরীফ আনেন। তদানীন্তনকালে ভারতের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান আলা উদ্দীন খাল্‌জী। শাহী দরবারে আগা মুহাম্মদ তুর্ককে অতি সম্মানের সাথে স্বাগত জানানো হলো। সুলতান আলাউদ্দীন খালজী তাঁকে আমীরদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। এর কিছুদিন পর তাঁকে অন্যান্য আমীরদের সাথে গুজরাত অভিযানে প্রেরণ করলেন। অভিযান সফলকাম হলে আগা মুহাম্মদ তুর্ক গুজরাতেই বসবাস করতে থাকেন।

আগা মুহাম্মদ বহু সন্তান-সন্ততির পিতা ছিলেন। তাঁর ১০১ সন্তান ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র তা'আলার হুকুম! এক দুর্ঘটনায় তাঁর ১০০ সন্তান মারা যায়। মু'ইয্ উদ্দীন নামক একটি মাত্র সন্তান বেঁচে যান, যাঁর মাধ্যমে তাঁর উত্তরসূরীদের পরম্পরা অব্যাহত থাকে। তাঁর জীবনে এ দুর্ঘটনা এতই দুঃখজনক ছিলো যে, তিনি ওই শোকাহত হৃদয় নিয়ে আর গুজরাতে থাকতে পারেন নি। তিনি সেখান থেকে দিল্লীতে চলে আসলেন। এখানে এসে তিনি হযরত শায়খ সালাহ উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির খানক্বায় ই'তিকাফরত হয়ে গেলেন। এভাবে তিনি ৭৩৯ হিজরীর ১৭ রবিউল আউয়াল ওফাত পান। ওখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। আগা মুহাম্মদ তুর্কের একমাত্র উত্তরসূরী মু'ইয্ উদ্দীনের সন্তান মালিক মূসা অতি প্রসিদ্ধ ও নামকরা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে শায়খ ফিরোয পুঁথিগত এবং বৈষয়িক জ্ঞানেও বহুমুখী দক্ষতায় সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। ৯২৮ হিজরীতে কোন এক যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়ে যান। তিনি শাহাদত বরণের সময় তাঁর গর্ভবর্তী স্ত্রীকে রেখে যান, যাঁর গর্ভে শায়খ সা'দ উল্লাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিও অতি কামিল বুযুর্গ ছিলেন। তিনি যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর দু'পুত্র সন্তানের মধ্যে শায়খ সায়ফ উদ্দীনের বয়স ছিলো মাত্র ৮ (আট) বছর। শায়খ সায়ফ উদ্দীনও অতি নামকরা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন ওই সৌভাগ্যবান পিতা যাঁর ঔরশে আল্লাহ্ তা'আলা শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মতো সন্তান দান করেছেন। তাঁর মাধ্যমে পুরো খান্দান, বরং গোটা ইসলামী দুনিয়া ধন্য ও গৌরবান্বিত হয়েছে।

জন্ম ও শিক্ষার্জন

হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ৯৫৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে র'য়ে লালিত হন ও শিক্ষা লাভ করেন। পবিত্র ক্বোরআনের প্রাথমিক জ্ঞান আপন পিতার নিকট থেকেই অর্জন করেছেন। তাঁর স্মরণশক্তি ও মেধা ছিলো অতি প্রখর। মাত্র তিন মাসে পবিত্র ক্বোরআন মজীদ সম্পূর্ণরূপে পড়ে নেন। এরপর মাত্র এক মাসে তিনি লিখন-পদ্ধতি আয়ত্ব করেন। এতে হযরত শায়খ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মেধা, দূরদর্শিতা ও খোদা প্রদত্ত যোগ্যতার প্রমাণ মিলে। আরবী-ফার্সী ভাষার শিক্ষা তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কোন বিষয়ের পাঠ আরম্ভ করার অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে তা সমাপ্ত করে নিতেন। তিনি যখন শরহে আক্বাইদ ও শরহে শাম্‌সিয়্যাহ্'র মতো অতি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন, তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র তের বছর। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি 'মুখ্‌তাসার' ও 'মুত্বাওয়াল' (আরবী অলংকার শাস্ত্রের দু'টি অতি উচ্চ পর্যায়ের কিতাব)'র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। মোট কথা, মাত্র আঠার বছর বয়সে তিনি সব বিষয়ের শিক্ষা লাভ করে শিক্ষা জীবনের ইতি টানেন।

ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনা

যাহেরী পুঁথিগত শিক্ষার সাথে সাথে তিনি ইল্‌মে বাত্বেনী (আত্মার পরিশুদ্ধি)'র দিকে মনোনিবেশ করেন। ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনায়ও তিনি রত হন। বলাবাহুল্য, এসবই তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হতে থাকে। তদ্‌সঙ্গে তিনি অন্যান্য ওলামা-মাশাইখের সান্নিধ্যেও যেতে থাকেন। কিন্তু সাধারণ লোকদের সংস্পর্শ থেকে তিনি সব সময় দূরে থাকতেন। তখন মুঘল সম্রাট আকবর ভারত শাসন করছিলো। সুতরাং তখন 'শরীয়তে মুহাম্মদী'র মানহানির যুগ ছিলো। (না'উযুবিল্লাহ্!) অন্যদিকে নানা ধরণের শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ জোরেশোরে চলছিলো। এতে খোদ্ বাদশাহ্ আকবর ও তার আমীর-উমারাগণের প্রত্যক্ষ হাত ছিলো। হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভীকেও তাদের সাথে সম্পৃক্ত করার জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়; কিন্তু এ মর্দে হক্বের হৃদয়-মন থেকে ইসলামের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও শরীয়তে মুহাম্মদীর প্রতি পূর্ণ আন্তরিকতা উপচে পড়ছিলো। সুতরাং তাদের প্রচেষ্টা তাঁর ক্ষেত্রে কোনরূপ সাফল্য লাভ করে নি। তাদের ওইসব অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের প্রতি অতিমাত্রায় বিরক্ত হয়ে তিনি হিজাযের দিকে চলে যান।

মক্কা শরীফের দিকে রওনা

হযরত শায়খ ৩৮ বছর বয়সে মক্কা মুকার্‌রামায় পৌঁছেন। ওই বছর রমযান মাস পর্যন্ত তিনি মক্কা মুকার্‌রমার মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমের পাঠ গ্রহণের মর্যাদা লাভ করেন। এরপর তিনি যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ-আলিম শায়খ আবদুল ওহাব মুত্তাক্বীর খিদমতে হাযির হন। তাঁর নিকট থেকে হযরত শায়খ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এবং তরীক্বতের শিক্ষা ও দীক্ষা অর্জন করেন। তাঁর উপর হযরত শায়খ আবদুল ওহাব মুত্তাক্বীর বিশেষ প্রভাব প্রতিফলিত হয়। তিনি তাঁর সাথে রমযান শরীফ অতিবাহিত করলেন। তাঁর সাথে হজ্বও পালন করেন। এরপর তাঁরই তত্ত্বাবধানে হেরম শরীফের একটি হুজুরা (কামরা)'য় ইবাদত ও রিয়াযত (আধ্যাত্মিক সাধনা)'য় রত হয়ে যান।

রসূল-ই মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইশ্‌ক্ব

হযরত শায়খ মুহাক্বক্বিক্ব নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যিকারের আশিক্ব ছিলেন। হুযূর মাহবূব-ই খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নগরীতে খালি পায়ে চলাফেরা করতেন। রসূলে পাকের মহান দরবারে হাযির হতেন। ইত্যবসরে তিনি চারবার হুযূর করীম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দীদার (সাক্ষাৎ) লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তিনি তিন বছর যাবৎ পবিত্র হেযায ভূমিতে অবস্থান করেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তন

হযরত আবদুল ওহাব মুত্তাক্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এক পর্যায়ে হযরত শায়খকে ভারতে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিলো যে, ভারত প্রত্যাবর্তনের সময় বাগদাদ শরীফের পথে রওনা হয়ে হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর রওযা শরীফের যিয়ারত করবেন। কিন্তু শায়খ আবদুল ওহাব মুত্তাক্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁকে এরও অনুমতি দিলেন না; বরং সোজা ভারতে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত এ আশা ও দুঃখ হৃদয়ে বহন করে হযরত মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মুবারক থেকে অশ্রু সজল নয়নে ৯৯৯ হিজরীতে ভারতের দিকে রওনা হলেন।

তিনি ১০০০ হিজরীতে পুনরায় ভারত পৌঁছেন। ততোদিনে সম্রাট আকবর তার তথাকথিত 'দ্বীন-ই ইলাহী'র প্রবর্তন করে বসেছিলো। ইসলামের বিশেষ নিদর্শনগুলো নিয়ে উপহাস চলছিলো চরম আকারে। এসব কিছুই হযরত শায়খের নিকট সম্পূর্ণ অসহনীয়ই ঠেকলো। সুতরাং তিনি শরীয়তে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পুনঃ প্রচলন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিলেন এবং একটি 'দারুল উলূম' (দ্বীনী বিদ্যাপীঠ)'র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে তাতে পাঠ দান আরম্ভ করলেন।

পীর-মুর্শিদ

হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী জ্ঞানাকাশের এক অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তদুপরি, তিনি যুগবরেণ্য আউলিয়া-ই কেরামেরও অন্যতম ছিলেন। তরীক্বতপন্থীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অতি উচ্চাসনে সমাসীন। তরীক্বতের প্রাথমিক দীক্ষা তিনি তাঁর পিতার নিকট পেয়েছিলেন। তাছাড়া, তদানীন্তনকালে হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মূসা গীলানী ক্বাদেরিয়া সিল্‌সিলার এক প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। হযরত শায়খ তাঁকে খুব ভক্তি করতেন। তাঁর বরকতময় হাতে তিনি বায়'আত গ্রহণ করলেন। যেদিন তিনি তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন ওই দিনটি ছিলো– ৬ শাওয়াল, ৭৮৫ হিজরী। হযরত মূসা পাক গীলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হযরত শায়খকে আপন খিলাফত দ্বারাও ধন্য করলেন। ওদিকে হযরত শায়খ আবদুল ওহাব মুত্তাক্বী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিও তাঁর পথ-নির্দেশকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁর কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তখনকার দিনে নক্বশবন্দিয়া সিলসিলার অতি প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ওলী হযরত খাজা বাক্বী বিল্লাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হিও দিল্লীতে তাশরীফ রাখছিলেন। তিনিও সুন্নাত-ই রসূলকে পুনর্জীবিত ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ উৎখাত করার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টারত ছিলেন। গোটা জীবনই তিনি এ মহান ব্রতে অতিবাহিত করেন। হযরত শায়খ তাঁর বরকতময় হাতেও বায়'আত গ্রহণের বরকত হাসিল করেছিলেন।

হযরত শায়খ-ই মুহাক্বক্বিক্বের ওফাত শরীফ

হযরত শায়খ ৯৪ বছর বয়স পান। তার এ দীর্ঘ জীবনের পুরোটাই শরীয়তে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র প্রচলন ও প্রসারেই ব্যয়িত হয়েছে। গোটা ভারত উপমহাদেশে রসূলে মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস শরীফের প্রসার ও প্রচারের সূচনাকারীদের তালিকায় হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভীর নাম শরীফ একেবারে শীর্ষে। এ মহান ব্রত তিনি অতি উত্তম পন্থায় পালন করেছেন। পরিশেষে, ২১ রবিউল আউয়াল ১০৫২ হিজরীতে ভারত উপমহাদেশের আকাশকে আলোকিতকারী এ জ্ঞানসূর্য অবিনশ্বর জগতের দিকে পাড়ি জমালো। ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না---ইলায়হি রা-জি'উ-ন।

তাঁকে তাঁর ওসীয়ৎ মুতাবেক 'হাউযে শামসী'র (দিল্লী) পাশে দাফন করা হয়। তাঁর সুযোগ্য সন্তান হযরত শায়খ নূরুল হক্ব তাঁর জানাযার নামায পড়ান। 'আবজাদ'-এর হিসাবানুযায়ী, তাঁর জন্ম সাল হলো ( ) (শায়খুল আউলিয়া) এবং ওফাতের সাল ( ) (ফখরুল আলম) যথাক্রমে, 'ওলীগণের শিরমণি' ও 'বিশ্বের গৌরব'।

লেখনী

হযরত শায়খ শুধু মৌখিকভাবে দ্বীনী ইল্‌ম, শরীয়ত ও তরীক্বতের ঐতিহাসিক খিদমত আঞ্জাম দেননি, বরং তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমেও তিনি এ ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখে যান। গোটা জীবনই তিনি পাঠদানের সাথে সাথে প্রামাণ্য গ্রন্থ-পুস্তক রচনা করে যান। যে বিষয়েই তিনি হাত দিয়েছেন সেই বিষয়কে অতিমাত্রায় সমৃদ্ধ করে ছেড়েছেন। তিনি সুক্ষ্ম ও সঠিক গবেষণার ময়দানে সফলভাবে অশ্ব চালনা করেন।

তিনি একাধিক বিষয়ে গ্রন্থ-পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ-পুস্তকের সংখ্যা ৬০ পর্যন্ত পৌঁছে। ছোট কলেবরের পুস্তিকাসহ এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৬তে। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটা গ্রন্থ-পুস্তকের তালিকা পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি–

১. মুক্বাদ্দামাতুল মিশকাত (হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা ঃ আরবী), ২. আশি''আতুল লুম'আত ফী শরহিল মিশকাত (হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা ঃ ফার্সী), ৩. লুম'আ-তুত্ তানক্বীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ্ (হাদীস), ৪. মা সাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্ ফী আইয়্যামিস্ সানাহ্ (হাদীস শরীফ ঃ আরবী), ৫. মাদারিজুন্নুবূয়ত (সীরাত ঃ ফার্সী), ৬. জযবুল ক্বুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবূব (ইতিহাস ঃ ফার্সী), ৭. শরহে সফরুস্ সা'আদাহ্ (ইতিহাস ঃ ফার্সী), ৮. আখবারুল আখিয়ার ফী আহওয়ালিল আবরাব (বুযুর্গদের জীবনী ঃ ফার্সী), ৯. আ-দা-বুস্ সা-লিহীন (উন্নত চরিত্র ঃ ফার্সী), ১০. আদাবুল লিবাস (উন্নত চরিত্র ঃ ফার্সী), ১১. যুবদাতুল আ-সা-র মুন্তাখাবে বাহজাতুল আসরার

(সিয়র ঃ ফার্সী), ১২. তাকমীলুল ঈমান ওয়া তাক্বভিয়াতুল ঈ-ক্বান (আক্বাইদ ঃ ফার্সী), ১৩. তাওসীলুল মুরীদ ইলাল মুরাদ (তাসাওফ ঃ ফার্সী), ১৪. শরহে ফুতুহুল গায়ব (তাসাওফ ঃ ফার্সী), ১৫. মারাজাল বাহরাঈন (তাসাওফ ঃ ফার্সী), ১৬. নুকাতুল হক্বক্বি ওয়াল হাক্বীক্বত (তাসাওফ ঃ ফার্সী), ১৭. কিতাবুল মাকাতীব ওয়ার রাসা-ইল (চিঠিপত্র ঃ ফার্সী), ১৮. ফিহ্‌রাসুত তাওয়া-লীফ (ব্যক্তিগত ঃ ফার্সী-আরবী)।

চিঠিপত্র আদান-প্রদান

হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি আপন যুগের শীর্ষস্থানীয় ওলামা-মাশাইখের সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগও রক্ষা করতেন। নিম্নলিখিত বুযুর্গদের নামে তাঁর লিখিত বিভিন্ন চিঠিপত্রের হদিস পাওয়া যায়-

হযরত শাহ আবদুল মা'আলী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, হযরত শায়খুশ্ শুয়ুখ খাজা বাক্বী বিল্লাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, হযরত শায়খ আবদুল্লাহ্ নিয়াযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, হযরত খানেখানাঁ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, হযরত শায়খ আবুল খায়ের মুবারক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, নবাব মুরতাদ্বা খান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, শায়খ আবুল ফয়য ফক্বীর রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, শায়খ ইসমাঈল রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, তাঁর সাহেবযাদা শায়খ নুরুল হক্ব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রমুখ।

তাঁর সমসাময়িক কতিপয় প্রসিদ্ধ ওলামা-মাখাইখ

হযরত শায়খ মুহাক্বক্বিক্বে দেহলভীর সমসাময়িককালে নিম্নলিখিত মহান বুযুর্গগণ তাঁদের জীবদ্দশায় ছিলেন-

হযরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, হযরত আবুল মু'আলী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, হযরত শায়খ আবদুল্লাহ নিয়াযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, নবাব মুরতাদ্বা খান, শেখ ফরিদ, আবদুর রহীম খানেখানাঁ, ফয়যী, মোল্লা আবদুল ক্বাদের বদায়ূনী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, মীর্যা নিযাম উদ্দীন আহমদ বখ্‌শী, মীর সাইয়্যেদ তাইয়্যেব বলগ্রামী এবং মুহাম্মদ গাউসী শাত্তারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম প্রমুখ।

হযরত শায়খ মুহাদ্দিসের সন্তানগণ

হযরত শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলভীর তিনপুত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সাহেবযাদা শায়খ নূরুল হক্ব মাশরিক্বী বড় জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন- যেমন ছিলেন তাঁর পিতা মহোদয়। হযরত শায়খ মুহাদ্দিস রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর এ সন্তানকে নিজেরই দ্বিতীয় সত্তা বলে আখ্যায়িত করতেন। তাঁকে খুব ভালবাসতেন। শায়খ নূরুল হক্বও লেখনী জগতে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর লেখনীগুলোর মধ্যে 'তায়সীরুল ক্বারী শরহে সহীহ বোখারী' (৬ খণ্ডে লিখিত) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আপন পিতার জীবদ্দশায়ই সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে আকবরাবাদের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। আপন পিতা মহোদয়ের ওফাত শরীফের পর ত্বরীকতে তিনিই তাঁর খিলাফত প্রাপ্ত হন।

হযরত শায়খের দ্বিতীয় পুত্র শায়খ আলী মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হিও পুথিগত ও তর্কশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞ আলিম ও বুযুর্গ ছিলেন। তিনিও কয়েকটা প্রামাণ্য পুস্তক প্রণয়ন করে যান।

হযরত শায়খ রাহমাতুল্লাহির তৃতীয় পুত্র শায়খ মুহাম্মদ হাশিম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। তিনিও হযরত শায়খের অতি প্রিয় সন্তান ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত শায়খ মুহাদ্দিস-ই দেহলভীকে জান্নাতুল ফিরদাউসে অতি উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমাদেরকেও তাঁর এবং এ সমস্ত বুযুর্গের রূহানী ফুয়ূয ও বরকত দ্বারা উভয় জগতে ধন্য করুন!! আ-মীন! বিহুরমতে সাইয়্যিদিন মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আলায়না মা'আহুম আজমা'ঈন!

****

ফখরে আহলে সুন্নাত, হাকীমুল উম্মত, শায়খুত্ তাফসীর ওয়াল হাদীস হযরত আল্লামা

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী

[রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বংশ পরিচিতি

হাকীমুল উম্মত মুফাস্‌সিরে ক্বোরআন মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ছিলেন 'ইউসুফ যাঈ' বংশীয় পাঠান। তাঁর পূর্বপুরুষদের কিছু সংখ্যক লোক খুব সম্ভব মুঘল শাসনামলে আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে হিন্দুস্থান চলে এসেছিলেন। তাঁর দাদা মরহুম মুনাওয়ার খান (রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) 'উজাহানী' (বদায়ূন, হিন্দুস্থান)-এর শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত লোকদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি সেখানকার পৌরসভার সম্মানিত সদস্যও ছিলেন।

তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ ইয়ার, যিনি এক দ্বীনদার ইবাদতপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উজাহানী (বদায়ূন)-এর জামে মসজিদের ইমামত, খেতাবত এবং ব্যবস্থাপনা– সবকিছু নিজের দায়িত্বে নিয়েছিলেন। তিনি এসব দায়িত্ব নিয়মিতভাবে দীর্ঘ ৪৫ বছর যাবৎ কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই পালন করেছিলেন।

জন্ম

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়ার (রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)-এর ঔরশে পরপর পাঁচটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিলো। পাঁচ কন্যা সন্তানের পর মাওলানা মুহাম্মদ ইয়ার রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পুত্র সন্তানের জন্য বিশেষ দো'আ করলেন। সাথে সাথে এ মান্নতটিও করেছিলেন, "যদি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে, তবে তাকে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া 'আলা আ-লিহী ওয়াসাল্লাম-এর রাস্তায়, দ্বীনের খিদমতের পরম্পরায় ওয়াক্বফ করে দেবো।" আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যাত ওই দো'আ কবূল করলেন আর তাঁকে পুত্র সন্তান দান করলেন। তাঁর নাম রাখা হলো– 'আহমদ ইয়ার'। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়ার (রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) তাঁর মান্নত অনুসারে এ সন্তানকে ইল্‌মে দ্বীন অর্জন ব্যতীত অন্য কোন কাজে নিয়োগ করেন নি। এ সন্তানও সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর কর্মজীবনে একথা প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি বাস্তবিকপক্ষেই 'আহমদ ইয়ার' বা 'নবী প্রেমিক'। সত্যি সত্যি তিনি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল-ই মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রাস্তায় ওয়াক্বফকৃত হবার উপযোগী ছিলেন। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান (রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)'র জন্ম ১৩২৪ হিজরীতে।

ছাত্র জীবন

মুফতী সাহেবের ছাত্র জীবনকে পাঁচটি সোপানে বিভক্ত করা যায় ঃ ১. উজাহানী, ২. বদায়ূন শহর, ৩. মীনঢু, ৪. মুরাদাবাদ ও ৫. মীরাঠ।

জন্মস্থান উজাহানীতে তিনি তাঁর সম্মানিত পিতার নিকট ক্বোরআন মজীদ পড়েন। এরপর ফার্সী ভাষার পাঠ্য পুস্তকগুলো, দীনিয়াত এবং 'দরসে নিযামী'র প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাবাদিও তাঁর নিকট পড়ে নেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে অতি ছোট বয়সেই তিনি দ্বীনি শিক্ষা লাভের খাতিরে জন্মভূমি থেকে বের হয়ে পড়েন এবং বছরের পর বছর বদায়ূন ও মীনঢুতে 'দরসে নিযামী'র উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। উল্লেখ্য যে, মীনঢুর মাদ্‌রাসায় দেওবন্দী চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণও পড়াতেন।এক পর্যায়ে মুরাদাবাদের প্রসিদ্ধ বিরাট দ্বীনী প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া ন'ঈমিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা সদ্‌রুল আফাযিল মাওলানা মুহাম্মদ ন'ঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। সদ্‌রুল আফাযিল রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিও এ অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে লুক্কায়িত যোগ্যতা দেখতে পেলেন। তিনি সাথে সাথে মুফতী সাহেবের উচ্চ শিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়ে ছিলেন।

তখনকার সময়ে কানপুরের আল্লামা মুশ্‌তাক্ব আহমদ

(মরহুম) ইসলামী যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র এবং অংকশাস্ত্রের যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসেবে গণ্য হতেন। মাওলানা মুরাদাবাদী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি মাসিক যুক্তিসঙ্গত বেতন ধার্য করে আল্লামা মুশ্তাক্ব আহমদ সাহেবকে জামেয়া ন'ঈমিয়া, মুরাদাবাদে নিয়ে আসলেন। অতঃপর মুফ্তী সাহেবের উচ্চ শিক্ষার পরম্পরা শুরু হয়ে গেলো। কিছুদিন পর আল্লামা মুশ্তাক্ব আহমদ সাহেব মীরাঠ তাশরীফ নিয়ে যান। তখন মুফ্তী সাহেবও তাঁর একজন বিশেষ শাগরিদ হিসেবে তাঁর সাথে সেখানে চলে গেলেন। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আযাদী আন্দোলনের একজন নামকরা সৈনিক শায়খুল ক্বোরআন মাওলানা আবদুল গফুর হাযারভী (মরহুম)ও কানপুর, মুরাদাবাদ ও মীরাঠে আল্লামা মুশ্তাক্ব আহ্মদ সাহেবের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করতে থাকেন।

অনুরূপভাবে, আল্লামা হাযারভী শায়খুত্ তাফসীর মুফ্তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র ওস্তাদভাই ছিলেন। মুফ্তী সাহেব নিজেও বলতেন, "মুরাদাবাদে অবস্থান হচ্ছে আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। সদরুল আফাযিল মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র ভালবাসা, স্নেহ, বিশেষ দৃষ্টি এবং কৌশলপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপালন আর প্রশিক্ষণ মুফতী সাহেবের জীবনের উপর গভীর ও চির অম্লানভাবে রেখাপাত করেছিলো।

তাঁর ছাত্র জীবনের দ্বিতীয় সোপান বদায়ূন শহরে অতিবাহিত হয়। সেখানে তিনি এগার বছর বয়সে (অর্থাৎ ১৩৩৫ হিজরী/১৯১৬ খ্রিঃ) এসে 'মাদ্রাসা-ই শামসুল উলূম'-এ ভর্তি হলেন। এ মাদ্রাসায় তিনি তিন বছর যাবৎ (অর্থাৎ ১৩৩৫ হিজরী থেকে ১৩৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৯১৬ ইং থেকে ১৯১৯ ইং পর্যন্ত) শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। এটা ছিলো ওই যুগসন্ধিক্ষণ, যখন 'মাদ্রাসা-ই শামসুল উলূম' (বদায়ূন)-এ আল্লামা ক্বাদীর বখ্শ বদায়ূনী শিক্ষক ছিলেন। মুফতী সাহেব তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হন। ওই দিনগুলোতে মুফতী আযীয আহমদ সাহেব বদায়ূনীও ওই মাদ্রাসায় দরসে নিযামীর শেষ পর্যায়ের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।

'মাদ্রাসা-ই শামসুল উলূম'-এর যেই কামরায় মুফতী সাহেব স্থান পেয়েছিলেন তা'তে আরো বহু ছাত্রও থাকতো। তাই, বেশীর ভাগ সময় কামরায় শোরগোল থাকতো, যা মুফতী সাহেবের মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এক রাতে এত বেশী শোরগোল ও হাঙ্গামা হয়েছিলো যে, মুফতী সাহেব মোটেই পরবর্তী দিনের পাঠ তৈরী করতে পারেন নি। সকালে আল্লামা ক্বাদীর বখ্শ রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ক্লাশে 'নাহ্ভ মীর'-এর সবক পড়ানোর জন্য বসলেন। তখন পূর্ণ মনযোগ ও একাগ্রতা সত্ত্বেও তিনি সেদিনকার সবক একেবারেই বুঝতে পারেন নি। সম্মানিত উস্তাদ সবক পড়াতে পড়াতে সামনে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিলেন। আর মুফ্তী সাহেব সবকের প্রথমাংশও বুঝতে না পারার কারণে খুবই ইতস্ততঃ বোধ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কেঁদে ফেললেন। সম্মানিত ওস্তাদ এ অবস্থা দেখে বললেন, "আহমদ ইয়ার! এ কি ব্যাপার? নিজের কৃতকর্মের তো চিকিৎসা নেই। পূর্ব-পর্যালোচনা তো করো নি, আর এখন পাঠ বুঝারও চেষ্টা করছো?"

একথা বলে হযরত আল্লামা সবকগুলো পড়ার জন্য ওযূ সহকারে বসার শিক্ষা দিলেন। তিনি সম্মানিত ওস্তাদের এই অন্তর্দৃষ্টি ও কাশ্ফ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। আর মনে মনে স্থির করে নিলেন যে, আগামীতে তিনি ওযূ সহকারেই ক্লাশে বসবেন। তিনি ওস্তাদজিকে গত রাতের সব ঘটনা খুলে বললেন, যা তাঁর পাঠ-পর্যালোচনা করতে না পারার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সাথে সাথে ওস্তাদজি তাঁর জন্য আলাদা কামরায় অপর ভালো ছাত্র আযীয আহ্মদ বদায়ূনীর সাথে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ফলে, তাঁর সব দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে গেলো। তিনি আযীয আহ্মদ সাহেবের মতো মেধাবী ছাত্রের সঙ্গ পেয়ে আরো বেশী উপকৃত হলেন। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিলেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। মুফতী আযীয আহমদ বদায়ূনীর বর্ণনামতে, মুফতী আহমদ ইয়ার খান ছাত্র জীবনে নিয়মিত পাঠ-পর্যালোচনায় খুব অভ্যস্থ ছিলেন। নিয়মিতভাবে দেরীক্ষণ রাত্রি জাগরণ করে পরদিন সকালের ক্লাশের পাঠ শিক্ষা করতেন। ক্লাশ ছুটির পর সঙ্গীদের নিয়ে ক্লাশে দেয় সবক পুনরায় পর্যালোচনা

করতে বসে যেতেন। কোন বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হলে সাথে সাথে ওস্তাদের নিকট থেকে তা বুঝে নিতেন। যদি কখনো মুফতী সাহেবের উপস্থাপিত কোন তথ্য ওস্তাদের মতে ভুল প্রমাণিত হতো, তবে সাথীদের নিকট এসে তাঁর ভুল স্বীকার করে নিতেন, আর ওস্তাদের মতটিই বলে দিতেন। আর তিনি বলতেন, "এমতাবস্থায় আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের ভুল স্বীকার করে নিতাম ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মন-মেজাজ ঠিক হতো না।" মোট কথা, তিনি মাত্র তিন বছর যাবৎ 'মাদ্রাসা-ই শামসুল উলূম'-এ লেখাপড়া করে সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে বের হয়ে আসলেন। মুফতী আযীয আহমদ সাহেবের বর্ণনামতে, তিনি এ মাদ্রাসায় 'নূরুল আন্ওয়ার'-এর সবক পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

বদায়ূনের পর মুফতী সাহেবের ছাত্র জীবনের তৃতীয় পর্যায় মীনঢু রাজ্যে অতিবাহিত হয়। এখানে রাজ্য-প্রধানদের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি 'দারুল উলূম' (মাদ্‌রাসা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এর শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে ভালো অভিমতই পাওয়া যায়। মুফতী আযীয আহমদের বর্ণনানুসারে, এ মাদ্‌রাসা তখন দেওবন্দী ভাবধারায় পরিচালিত হতো। এ মাদ্‌রাসায়ও মুফতী সাহেব তিন/চার বছর লেখাপড়া করেন– ১৩৩৮ হিজরী থেকে ১৩৪১ হিজরী পর্যন্ত, মোতাবেক ১৯১৯ ইং থেকে ১৯২২ ইং পর্যন্ত। এর ফলে তিনি দেওবন্দী ভাবধারার ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার সাথে আ'লা হযরত ও সদরুল আফাযিলের অধিকতর জ্ঞান-গভীরতার তুলনামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করারও সুযোগ পান। খোদ্ মুফতী সাহেব বলেন, "আমি দেওবন্দী ওস্তাদদের নিকট একটা বিশেষ সময়সীমা পর্যন্ত লেখাপড়ার সযোগ পাই। এর ফলে একথা বুঝতে পারলাম যে, শিক্ষাগত গবেষণার ব্যবস্থাটুকু তাদের নিকট আছে বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইত্যবসরে সদ্‌রুল আফাযিল মুরাদাবাদী কুদ্দিসা সির্‌রুহুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। তিনি আমাকে আ'লা হযরতের লেখা 'আত্বোয়া-য়াল ক্বাদীর ফী আহ্কা-মিত্ তাস্‌ভীর' নামক একটা 'রিসালা' (পুস্তক) পাঠ-পর্যালোচনার জন্য দিলেন। তা দেখে আমি যারপর নাই হতবাক হলাম। এই রিসালা মীনঢুতে শিক্ষার্জনকালীন সময় থেকে আমার উপর প্রভাব ফেলে এসেছে।"

মুফতী আহ্মদ ইয়ার খান সাহেবের সম্মানিত পিতা মাযহাব ও আক্বীদার ক্ষেত্রে কট্টর সুন্নী-হানাফী ছিলেন। তাই, তাঁর ছেলে (মুফ্তী সাহেব) মীনঢুর উক্ত মাদ্‌রাসায় পড়ুক তা তাঁর নিকট অপছন্দনীয় ঠেকলো। একদা মুফতী সাহেব বার্ষিক ছুটিতে বাড়ীতে আসলেন। তখন তিনি তাঁদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারলেন। মুফতী সাহেবের এক চাচাত ভাই মুরাদাবাদে চাকুরী করতেন। তিনি কিছুদিন বাড়ীতে থাকার পর মুরাদাবাদ চলে যাচ্ছিলেন। তিনি মুফতী সাহেবকে জোর দিয়ে বললেন, "আমার সাথে চলো। সেখানে মুরাদাবাদে মাওলানা মুরাদাবাদীর সাথে সাক্ষাৎ করো।" সুতরাং তিনি তার সাথে মুরাদাবাদ পৌঁছুলেন।

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আহমদ ইয়ার খান মুরাদাবাদে হযরত সদরুল আফাযিলের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সদরুল আফাযিল তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। তিনি সেগুলোর সঠিক উত্তর দিলেন। মুফতী সাহেবও এরপর সদরুল আফাযিলের নিকট কয়েকটা বিষয়ে জানতে চাইলেন। তিনি সদ্‌রুল আফাযিলের নিকট সেসব বিষয়ের তৃপ্তিদায়ক জবাব পেলেন। সুতরাং একদিকে মুফ্তী সাহেব (মুরাদাবাদে) তাঁর সামনে ইল্‌ম ও হিকমত বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুদ্র ঢেউ খেলতে দেখতে পেলেন, অন্যদিকে সদরুল আফাযিলও সম্ভাবনাময় মেধাবী শিক্ষার্থীর পূর্ণ যোগ্যতা মুফতী সাহেবের মধ্যে দেখতে পেলেন। অতঃপর সদরুল আফাযিল বললেন, "ভাই, মাওলানা! জ্ঞানের সাথে জ্ঞানের মাধুর্যও যদি অনুভব করা যায়, তবে স্থিরতা দান করা হয় এবং 'বক্ষ-প্রশস্ততা'রূপী অমূল্য ধন পাওয়া যায়।" মুফতী সাহেব আরয করলেন, "জ্ঞানের মাধুর্য বলতে কি বুঝায়?" হযরত বললেন, "জ্ঞানের মাধুর্য হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের পবিত্র সত্তার সাথে সম্পর্ক ক্বায়েম রাখলেই হাসিল হতে পারে। শব্দাবলীর মাধ্যমে বর্ণনা করা যায় না।" এ কথোপকথন মুফ্তী সাহেবের হৃদয়ে গভীর ও অবিস্মরণীয়ভাবে রেখাপাত করেছিলো।

মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব উল্লিখিত সাক্ষাতের পর 'জামেয়া ন'ঈমিয়া' মুরাদাবাদে ভর্তি হয়ে গেলেন। সদরুল আফাযিল মুফতী সাহেবের চাহিদানুসারে যুক্তি ও দর্শন শাস্ত্রের উচ্চ পর্যায়ের পাঠ দান করতে আরম্ভ

করলেন। কিন্তু হযরত মুরাদাবাদীর অতি ব্যস্ততার কারণে পাঠদান অনিয়মিত হতে লাগলো। ফলে মুফতী সাহেব অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। একদিন তিনি মুরাদাবাদ থেকে বের হয়ে গেলেন। সদ্‌রুল আফাযিল তা জানতে পেরে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ফিরে আসলে তাঁকে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হলো যে, ভবিষ্যতে যাতে তাঁর পাঠ গ্রহণে অনিয়ম না হয় সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি ইসলামী দর্শনের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ও বহু উচ্চ পর্যায়ের ওস্তাদ আল্লামা মুশ্‌তাক্ব আহমদ কানপুরীর নিকট 'জামেয়া ন'ঈমিয়া'য় অধ্যাপনার পদ অলঙ্কৃত করার জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। প্রস্তাব পেয়ে আল্লামা কানপুরী তা গ্রহণ করতে এ শর্তে রাজী হলেন যে, তখন তাঁর নিকট পড়ুয়া সকল ছাত্রকেও 'জামেয়া ন'ঈমিয়া'য় ভর্তি এবং তাদের ভরণ-পোষণ ও অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে। সদ্‌রুল আফাযিল ওই শর্তটি মেনে নিলেন। অতঃপর আল্লামা কানপুরী 'জামেয়া ন'ঈমিয়া' মুরাদাবাদে তাশরীফ নিয়ে আসলেন। মুফতী সাহেবের বর্ণনা মতে, আল্লামা কানপুরীর তখন মাসিক বেতন ধার্য হয়েছিলো ৮০ রুপিয়া।

তখন থেকে মুফতী সাহেবের ছাত্র জীবনের আরেক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। একদিকে ওস্তাদ ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা ও বরেণ্য ইমাম, অন্যদিকে ছাত্র ছিলেন অনন্য মেধাবী ও শিক্ষার প্রতি অসাধারণ আগ্রহী। একদিকে ওস্তাদের একথা জানা ছিলো যে, ইনি হলেন এমনই এক ছাত্র, যাঁর জন্যই তাঁকে সুদূর কানপুর থেকে আনা হয়েছে, অন্যদিকে ছাত্রেরও একথা ভালোভাবে জানা ছিলো যে, এ আল্লামা-ই যমান ওস্তাদকে বিশেষ করে তাঁকে পড়ানোর জন্য এখানে আনা হয়েছে।

কয়েক বছর পর আল্লামা মুশ্‌তাক্ব আহমদ কানপুরীর কয়েকটি অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্তভাবে মীরাঠ চলে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়লো। তিনি সদ্‌রুল আফাযিলকে একথা বলে তাতে তাঁর অনুমতি লাভ করলেন যে, তিনি তাঁর এ প্রিয় ছাত্র 'আহমদ ইয়ার খান'কেও সাথে মীরাঠ নিয়ে যাবেন। সদ্‌রুল আফাযিলের অনুমতি পেয়ে জ্ঞানের এই অনন্য কাফেলা মুরাদাবাদ থেকে মীরাঠের দিকে রওনা হয়ে গেলো। উল্লেখ্য যে, কানপুর, মুরাদাবাদ ও মীরাঠে শায়খুল ক্বোরআন, আবুল হাক্বাইক্ব আল্লামা আবদুল গফূর হাযারভীও আল্লামা মুশ্‌তাক্ব আহমদের ছাত্র ছিলেন।

মীরাঠে মুফতী সাহেব কমবেশী তিন বছর যাবৎ লেখাপড়া করেন। এটা ছিলো তাঁর ছাত্রজীবনের শেষ পর্যায়। সর্বমোট, বিশ বছরে তিনি লেখাপড়া শেষ করলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর চাচাত ভাই জনাব আযীয খান মরহুম এক ঐতিহাসিক পংক্তি রচনা করেছেন, যাতে তিনি মুফতী সাহেবের ছাত্র জীবনের শেষবর্ষ (১৩৪৪ হিজরী/১৯২৫ ইংরেজী) আয়াত–

لَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

থেকে বের করেছেন ঃ

جواحمد کہ بایاروخان است منضم ☆ بہ نوک زبان سال ہفتم
شدہ فارغ ازعلم دین شکرحق ☆ بگفتم لَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیْمًا

ছাত্র জীবনের এ' শেষ পর্যায়টি মুফতী সাহেবের জীবনের উপর অম্লান নক্বশা এঁকে দিয়েছে। ইসলামী দর্শনে দক্ষতা আল্লামা মুশ্‌তাক্ব আহমদ কানপুরী থেকে পেয়েছেন। তিনি দ্বীনী শিক্ষার সাথে সবিনয় সম্পৃক্ততা এবং সত্য ও নিষ্কলুষ ধর্ম ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অসাধারণ ভালবাসার মতো উভয় জাহানের অমূল্য সম্পদ হযরত সদ্‌রুল আফাযিলের নিকট থেকে লাভ করেছেন। হযরত সদরুল আফাযিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুফতি সাহেবকে কিছুটা পাঠদান করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি ও (হাদীসে পাকের অমীয় ভাষায়) 'মু'মিনসুলভ অন্তর্দৃষ্টি' মুফতি সাহেবের সমগ্র ব্যক্তিত্বে সুন্দর পরিবর্তন এনে দিয়েছে। মুফতী সাহেব এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন, "আমার নিকট যা কিছু আছে সবই সদরুল আফাযিল দান করেছেন।" তিনি সদরুল আফাযিল মাওলানা ন'ঈম উদ্দীন মুরাদাবাদীর নামের সাথে সম্পৃক্ত করে আপন নামের সাথে 'নঈমী' লিখতেন। মুফতী সাহেবকে হাদীস শরীফ বর্ণনা করার অনুমতি ও সনদ প্রদান করেছেন– খোদ্ সদ্‌রুল আফাযিল সাইয়্যেদ মাওলানা নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী কুদ্দিসা সির্‌রুহু। পরবর্তীতে মুফতী সাহেব তাঁর ছাত্রদেরকে এ সনদই প্রদান করতেন।

আ'লা হযরতের সাথে সাক্ষাৎ

বদায়ূনে অধ্যয়নকালে মুফতী সাহেব আ'লা হযরত ফাযিলে বেরলভীর পবিত্র দরবারে হাযির হবার জন্য বেরিলী শরীফ তাশরীফ নিয়ে যান। খোদ্ মুফতী সাহেব বলেন, "মাত্র ১০/১২ বছর বয়সে আমি আ'লা হযরতের দীদারের জন্য বেরিলী শরীফ হাযির হয়েছিলাম। তখন ২৭শে রজব নিকটবর্তী ছির্লো। তাই, আ'লা হযরতের দরবারে মি'রাজ শরীফ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছিলো। সুতরাং এ ব্যস্ততার কারণে শুধু একটিবার মাত্র মজলিসে হাযির হবার সুযোগ হয়, যা'তে আ'লা হযরতের দীদার বা সাক্ষাতের সৌভাগ্য নসীব হয়েছিলো। সর্বোপরি, আ'লা হযরতের প্রতি পূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধাই আমার যিন্দেগীর বড় মূল্যবান মূলধন হয়ে রয়েছে।"

লেখনী

ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ফাযিলে বেরলভীর পর মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হলেন আহ্‌লে সুন্নাত ওয়া জমা'আতের জন্য অতি গৌরবোজ্জ্বল লেখক। যদি একথা বলা হয় যে, আ'লা হযরত ফাযিলে বেরলভীর পর মুফতী সাহেব সর্বাপেক্ষা বড় লেখক, তবে তাও মোটেই অত্যুক্তি হবে না। আ'লা হযরত ফাযিলে বেরলভীর দ্বীনী লিটারেচারের মান হচ্ছে 'আলিমানা ও মুহাক্কিক্বা-না' (অর্থাৎ গভীর জ্ঞান ও গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে বহু উঁচু) তিনি বিশেষ করে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মানসদেশকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে নিজের লেখনীগুলোতে উচ্চ শিক্ষাগত মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আলিম সমাজ ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জাগরণের জন্য একান্ত জরুরী ও বুনিয়াদী দ্বীনী বই-পুস্তকগুলো আ'লা হযরতের কলম থেকে বের হয়েছিলো। এরপর প্রয়োজন ছিলো সরল-সহজ ও সাদাসিধে হৃদয়গুলোকে প্রভাবিত করার মতো লেখনীর। সুতরাং এ অঙ্গনে মুফতী সাহেব তাঁর মহান মসি দ্বারা এমনই প্রজ্ঞা দেখিয়েছেন এবং তিনি এমনসব যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছেন, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। মুফতী সাহেব ক্বেবলা নিজেই বলেছেন, "আমি যখন লিখতে বসি, তখন একথা সামনে রাখি যে, আমি ছোট ছেলে-মেয়ে, মহিলা এবং গ্রাম ও মরুভূমির অল্পশিক্ষিত লোকদেরকেই সম্বোধন করছি। তাফসীর লিখতে বসার সময়ও উদ্দেশ্য এটাই ছিলো যে, ক্বোরআন করীমের এমনই সহজ-সরল তাফসীর লেখা হোক, যা দ্বারা ক্বোরআন-ই হাকীমের কঠিন মাসআলা-মাসাইলও সহজে বুঝা যায়।" তিনি তাফসীর-ই নঈমী'র ভূমিকায় আরো লিখেছেন, "খুব চেষ্টা করা হলো যেন ভাষা সহজ হয় এবং কঠিন মাসআলাগুলোও বুঝা যায়।" বস্তুতঃ সরলতা ও সহজবোধ্যতা শুধু 'তাফসীর-ই নঈমী'র বৈশিষ্ট্য নয়, বরং মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ'সহ তাঁর সমস্ত লেখনীতেই এমন ধরন ও বর্ণনাভঙ্গি বিদ্যমান।

মুফতী সাহেব চূড়ান্ত পর্যায়ের জটিল বিষয়বস্তুকেও অতি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য করে দেন। তিনি উচ্চ শিক্ষাগত মানদণ্ড ও জ্ঞান-গবেষণার উচ্চ মান বজায় রাখার পরিবর্তে নিজের লেখনী ও বর্ণনা উভয়টিকে বিশেষ ও সাধারণ– উভয় ধরনের লোকদের একেবারে নিকটে নিয়ে এসেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এটা ছিলো যে, অল্পশিক্ষিত মানুষও তাঁর বর্ণনা বুঝতে সক্ষম হোক! তিনি ইল্‌মে 'তাসাওফ' ও 'মা'রিফাত'-এর গূঢ় রহস্য ও ইঙ্গিতগুলোর সুতীক্ষ্ণ মাহাত্ম্যকে পর্যন্ত এক বিশেষ শ্রেণীর 'ইজারাদারী' থেকে বের করে সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করে দেন। এর একটি উদাহরণ দেখুন– সূরা বাক্বারার আয়াত–

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ

قَسْوَةً وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ

তরজমা : "অতঃপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে। কাজেই, তারা পাথরগুলোর মতোই, বরং সেগুলোর চেয়েও কঠিন। আর পাথরগুলোর মধ্যে কিছু এমনও রয়েছে, যেগুলো থেকে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়।"

মুফতী সাহেব উপরোল্লিখিত আয়াতের সূফীসুলভ তাফসীরে লিখেছেন, "প্রত্যেক হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্‌র ভয় ও সৃষ্টির প্রতি স্নেহ-মমতার পানি মওজূদ রয়েছে। গুনাহ্ ও বে-দ্বীনদের সঙ্গ হচ্ছে– ওই মানবহৃদয়কে শুকিয়ে দেয় এমন রোদের মতো। যখন মানুষ গুনাহ্‌য় লিপ্ত হয়ে যায়, তখন ধীরে ধীরে এ দু'প্রকারের পানি শুকে যায়, যার ফলে তার হৃদয় শুষ্ক

কঙ্কর ও পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়।"

মুফতী সাহেব বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও সহজভাবে বর্ণনা করার জন্য দৈনন্দিন জীবনের বহু উদাহরণ চয়ন করে নিতেন। তিনি তাঁর লেখনীগুলোতে বিশেষ শ্রেণীর ও সাধারণ মানুষের এতোই নিকটবর্তী হয়ে যেতেন যে, তাঁর ও পাঠকদের মধ্যখানে কোন অন্তরাল বা দূরত্বই অবশিষ্ট থাকে না। মুফতী সাহেবের জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি নিজের অনুসৃত আদর্শের বই-পুস্তকের সংখ্যার নগণ্যতাটুকুও দেখে নিয়েছিলো। কারণ, আমাদের আদর্শ-ভিত্তিক তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যাবলী খুব কমই লেখা হয়েছে। বিগত অর্ধ শতাব্দি থেকে 'তাফসীর-ই ক্বোরআন'-এর পরম্পরায় আ'লা হযরতের 'তরজমা' ও সদ্‌রুল আফাযিলের 'তাফসীরী হাশিয়াগুলো' (পার্শ্ব ও পাদটীকারূপী তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান')-কেই যথেষ্ট বলে মনে করা হতো। মুফতী সাহেব প্রায়শঃই বলতেন, "আহা! আমি যদি আ'লা হযরতের নিকট থাকতে পারতাম, তবে তাঁর খিদমতে আরয করতাম, ক্বোরআন-ই করীম-এর তাফসীরও আপনার কলম থেকে বের হওয়া দরকার।" উল্লেখ্য যে, মুফতী সাহেব ক্বেবলাই সদরুল আফাযিলকে 'তাফসীর-ই খাযাইনুল ইরফান' লেখার জন্য বারংবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সদ্‌রুল আফাযিল অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে বিস্তারিত তাফসীরের কাজে হাত দিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত মুফতী সাহেব আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং সরকার-ই মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রূহানী ফয়যের বদৌলতে এ মহান কাজ সমাধা করেন। সুতরাং তিনি 'তাফসীর-ই নঈমী' লিখতে আরম্ভ করলেন। প্রথম ১১ পারার উপর উর্দু ভাষায় ১১টি বিরাটাকার খণ্ড লিখে ফেললেন। এ 'তাফসীর-ই নঈমী' অসাধারণ জনপ্রিয় হলো। সহস্রকোটি মানুষের জন্য ক্বোরআন বুঝার দ্বার খুলে গেলো। এ বিষয়েও (অর্থাৎ ক্বোরআন বুঝা) তিনি একটি কিতাব 'ইলমুল ক্বোরআন' লিখেছেন।

'তাফসীর-ই নঈমী' ছাড়াও তিনি 'তরজমা কান্‌যুল ঈমান'-এর উপর বিস্তারিত 'হাশিয়া' (তাফসীর) লিখেছেন, যা 'তাফসীর-ই নূরুল ইরফান' নামেই প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থটি সারল্য ও সহজবোধ্যতার কারণে গ্রহণযোগ্যতার একেবারে শীর্ষে পৌঁছেছে।

তিনি সহীহ বোখারী শরীফের উপরও আরবী 'হাশিয়া' (টীকা) সংযোজন করেছেন, যার নাম 'ইনশিরাহ্-ই বোখারী' প্রকাশ 'নঈমুল বারী'। এ কিতাবটিও (পাকিস্তানে) মুদ্রণের জন্য যন্ত্রস্থ হয়েছে বলে জানা গেছে। হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ কিতাব 'মিশকাতুল মাসাবীহ্'-এর উর্দু অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা, আট খণ্ডে সমাপ্ত বিরাটাকার গ্রন্থ 'মিরআ-তুল মানাজীহ্' হযরত মুফতী সাহেবেরই আরেকটি অম্লান অবদান। তাঁর অন্যান্য লেখনীর মধ্যে 'ইলমুল মীরাস', 'জা-আল হক্ব', 'শানে হাবীবুর রহমান', 'ইসলামী যিন্দেগী', 'রহমতে খোদা ব-ওসীলা-ই আউলিয়া', 'মু'আল্লিম-ই তাক্বরীর', 'মাওয়া-'ইয-ই নঈমিয়া', 'সফরনামা-ই হিজায ও ক্বিবলাতাঈন' (হজ্জ্ ও যিয়ারত), 'হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া পর এক নযর', 'ফাত্ওয়া-ই নঈমিয়া', 'রসাইলে নঈমিয়া' এবং খোৎবারাজির সমষ্টি 'খোৎবাত-ই নঈমিয়া'ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত কিতাবগুলো দ্বীনী ইল্‌ম ও ধর্মীয় সভা-মজলিসসমূহে অত্যন্ত আগ্রহ, ভালোবাসা ও ভক্তি সহকারে পড়া হয়।

মুফতী সাহেবের সমস্ত কিতাবের প্রকাশনার মহান কাজটি তাঁর স্নেহের দৌহিত্র সাহেবযাদা ইফতিখার আহ্‌মদ খান ও মুফতী ওলী শওক্ব ধারাবাহিকভাবে অতি পরিশ্রম ও আগ্রহ সহকারে চালিয়ে আসছেন। সর্বদা তাঁদের ইচ্ছাও এটাই রয়েছে যেন মুফতী সাহেবের এ অতি জনপ্রিয় কিতাবগুলো উন্নত থেকে উন্নততর আঙ্গিকে পাঠক সমাজের নিকট নিয়মিতভাবে পেশ করা হয়। আল্লাহ্‌রই জন্য সকল প্রশংসা। তাঁরা সফলতার সাথে তাঁদের এ মহান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষাদান ও শিক্ষকতা

মুফতী সাহেব বিদ্যার্জন শেষ করা মাত্রই বিভিন্নস্থানে শিক্ষাদানের মহান ব্রত পালনে আত্মনিয়োগ করলেন। হযরত সদরুল আফাযিল তাঁকে 'জামেয়া ন'ঈমিয়া, মুরাদাবাদ'-এ শিক্ষাদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনিও নিজেকে একজন 'উপযুক্ত শিক্ষক' হিসেবে প্রমাণ করে দিলেন। মুরাদাবাদে শিক্ষক থাকাকালে ধূরাজীর কাঠিয়াওয়ারে প্রতিষ্ঠিত 'মাদ্‌রাসা-ই মিসকীনিয়া'র

পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সদ্রুল আফাযিলের দরবারে ধূরাজীতে এমন একজন বহুগুণে গুণী ও উঁচু মানের আলিমে দ্বীন পাঠানোর জন্য দরখাস্ত করা হলো, যিনি শিক্ষাদান, ফাত্ওয়া ও খোৎবা প্রদানসহ যাবতীয় ধর্মীয় দায়িত্বাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনে সক্ষম হন। সদ্রুল আফাযিল মুফতী সাহেবকে ধূরাজী চলে যাবার হিদায়ত করলেন। মুফতী সাহেবও তাই করলেন। 'মাদ্রাসা-ই মিসকীনিয়া', ধূরাজীতে, বাহ্যিকভাবে দেখতে কমবয়স্ক মুফতী সাহেব মাদ্রাসা ব্যবস্থাপকদেরকে তাঁর জ্ঞানগত পূর্ণতা ও মহাগুণীজনসূলভ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একেবারে হতবাক করে দিয়েছিলেন। তখনই তাঁরা বলে উঠলেন, "সদ্রুল আফাযিল' তো আমাদের নিকট 'বাহ্রুল উলূম' (জ্ঞান-সমুদ্র) পাঠিয়েছেন।" কিছুদিন পর শিক্ষাদানের খাতিরেই মুফতী সাহেব পুনরায় 'জামেয়া ন'ঈমিয়া', মুরাদাবাদে তাশরীফ নিয়ে যান। মুরাদাবাদ থেকে তাঁকে ভক্কি শরীফ, জিলা গুজরাত (পাকিস্তান)-এর সাইয়্যেদ জালাল উদ্দীন শাহ সাহেবের 'দারুল উলূম'-এ প্রেরণ করা হলো। এখানে তাঁর মন বসলো না। তাই তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার জন্য লাহোর আসলেন। তখনকার দিনে সাহেবযাদা সাইয়্যেদ মাহমূদ শাহ সাহেব (পীর বেলায়ত শাহ সাহেবের পুত্র) 'হিযবুল আহ্নাফ' লাহোরে শিক্ষার্জন করছিলেন। তিনি সাইয়্যেদ আবুল বরকাত সাহেবের মাধ্যমে মুফতী সাহেবের খিদমতে দরখাস্ত করলেন যেন তিনি মাতৃভূমিতে ফিরে না গিয়ে গুজরাতের 'আঞ্জুমানে খোদ্দামুস্ সূফিয়্যাহ্'র 'দারুল উলূম'-এ শিক্ষাদানের মহান দায়িত্বটি গ্রহণ করেন। কারণ, সেখানে একজন দক্ষ আলিমে দ্বীনের প্রয়োজন ছিলো। সুতরাং গুজরাতবাসীদের সৌভাগ্য যে, মুফতী সাহেব তাতে রাজী হয়ে যান। অতঃপর তিনিও গুজরাতের এবং গুজরাতও তাঁর হয়ে র'য়ে গেলেন।

উপরিল্লিখিত দারুল উলূমে তিনি অন্ততঃ ১২/১৩ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করেন। গুজরাতেই তিনি 'মসজিদ-ই গাউসিয়া' (চক, পাকিস্তান)-এ নিয়মিতভাবে বছরের পর বছর ক্বোরআন মজীদের শিক্ষা দিতে থাকেন। দীর্ঘ ১৯/২০ বছরে প্রথমবারের মতো গোটা ক্বোরআন মজীদের শিক্ষা দেওয়া হলো। অতঃপর দ্বিতীয়বার আরম্ভ করা হলো। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দারুল উলূম গাউসিয়া ন'ঈমিয়া'ও দীর্ঘকাল যাবৎ গুজরাতে ইল্মে দ্বীনের আলো ছড়াতে থাকে।

ব্যক্তিত্ব

মুফতী সাহেবের ব্যক্তিত্বের অনন্য দিক এটাই ছিলো যে, তিনি সময়ের প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিতেন। আর নিজ কার্যাবলীতে সময়ের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। প্রতিটি কাজ খুবই সুন্দরভাবে নিজের নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করে নিতেন। এমনকি, তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলো সম্পন্ন হতে দেখে মানুষ সময় নির্ণয় করে নিতে পারতেন। সব সময় সঠিক সময়ে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। বলাবাহুল্য, তিনি ওই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, শরীয়ত যাঁদের স্বভাবে পরিণতি হয়ে গেছে। নামায, ক্বোরআন তিলাওয়াত, দুরূদ শরীফ পাঠ এবং হজ্জ্ ও যিয়ারতের প্রতি তাঁর অসাধারণ আগ্রহ ছিলো। তিনি কয়েকবার হজ্জ্ করেছিলেন এবং যিয়ারতের জন্যও তাশরীফ নিয়ে যান। তিনি সফররত থাকাকালেও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করতেন। মোটকথা, তাঁর ব্যক্তিত্বকে পুরোপুরিভাবে বর্ণনা করার জন্য এই কয়েকটা পৃষ্ঠা অতি নগণ্যই।

হৃদয়-বিদারক ওফাত

৩রা রমযানুল মুবারক, ১৩৯১ হিজরী মোতাবেক ১৪ই অক্টোবর, ১৯৭১ ইংরেজী মুফতী সাহেব কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পর আপন প্রকৃত স্রষ্টার সাথে মিলিত হন। তাঁর ইন্তিকালের কারণে ইসলামী বিশ্ব এক অতি উঁচু মানের দ্বীনী ব্যক্তিত্ব ও গৌরবময় লেখককে হারালো বটে, কিন্তু তাঁর জ্যোতিষ্মান প্রদীপ সব সময় আলো বিকিরিত করতে থাকবে। তাঁর ওরস প্রতি বছর ২৪ ও ২৫শে অক্টোবর তাঁরই মাযার শরীফে, মুফতী আহমদ ইয়ার খান রোড, চক পাকিস্তান, গুজরাতে, অতি জাঁকজমক ও পূর্ণ ভক্তি সহকারে শরীয়তের আলোকে অনুষ্ঠিত হয়।

****

বঙ্গানুবাদক পরিচিতি

[মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান]

জন্ম

'কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' এবং 'কান্‌যুল ঈমান ও নূরুল ইরফান'-এর অনুবাদক আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থানার ডাবুয়া গ্রামে, এয়াসীন নগর এলাকার আবাদকারী হিসেবে খ্যাত হযরত গাযী খলীফার★ পুত্র হযরত গোলাম আলী খলীফার সম্ভ্রান্ত বংশে, চলতি (বিংশ) শতাব্দির ষাটের দশকের এক শুভদিনে (বৃহস্পতিবার) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ্ব মৌলভী মুহাম্মদ এজহারুল হক, পিতামহ মৌলভী নযীর আহমদ এবং প্রপিতামহ স্বনামধন্য জনাব আসাদ আলী খলীফা। অনুবাদক, যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলার ইমামে আহলে সুন্নাত, রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত, ওস্তাযুল ওলামা, শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ ক্বাযী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুল আলী'র জামাতা।

শিক্ষা

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেই সমাপ্ত করেন। তারপর উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া' থেকে 'দাখিল', 'আলিম', 'ফাযিল' ও 'কামিল' (মুহাদ্দিস) (১৯৭৮ সন), অতঃপর চট্টগ্রামের প্রাচীনতম দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা' থেকে 'কামিল' (ফক্বীহ) (১৯৭৯ সন) অত্যন্ত কৃতিত্বের (মেধা তালিকাভুক্তি) সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৮০ সনে চট্টগ্রাম সরকারী মহসিন কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করেন এবং ১৯৮৩ সনে আলাওল কলেজ থেকে বি, এ (পাশ) সনদ লাভ করেন।

বলা বাহুল্য তিনি শায়খুল হাদীস ওস্তাযুল ওলামা ইমামে আহলে সুন্নাত, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ ক্বাযী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব, গায্‌যালী-ই-যমান শায়খুল হাদীস ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ অধ্যক্ষ মুসলেহ উদ্দীন সাহেব, মুফ্‌তী-ই-যমান ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ অধ্যক্ষ মুযাফ্‌ফর আহমদ সাহেব, ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ হাফেয ক্বারী অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল জলীল সাহেব, মুহাদ্দিসে যমান শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লামা মরহুম ফয্‌লুল করীম নক্বশবন্দী সাহেব, মুহাদ্দিসে যমান হযরতুল আল্লামা মরহুম ইয়াহ্‌য়া সাহেব, মুহাদ্দিসে যমান হযরতুল আল্লামা আবদুল আউয়াল ফোরক্বানী সাহেব, খতীবে আহ্‌লে সুন্নাত মুহাদ্দিসে যমান হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আলক্বাদেরী সাহেব এবং মুফ্‌তী-ই-আহলে সুন্নাত শেরে মিল্লাত আলহাজ্ মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী সাহেব প্রমুখ দেশবরেণ্য ও যুগশ্রেষ্ঠ ওলামা কেরাম ও বুযর্গানে দ্বীনের ছাত্রত্ব লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

কর্মজীবন ঃ

দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা থেকে তাঁর কর্মজীবনের শুভ সূচনা হয়। ১৯৭৯ ইং থেকে ১৯৮৭ ইং পর্যন্ত এ মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে দ্বীনী শিক্ষাদানের মহান ব্রত পালন করেন। এরপর ১৯৯৫ ইংরেজীতে চট্টগ্রামস্থ আহছানুল উলূম আলীয়া মাদ্‌রাসায় কিছুদিন আরবী সাহিত্যের পাঠ দান করেন। তারপর ১৯৯৭ ইংরেজীতে চট্টগ্রাম গহিরা আলীয়া মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

ইত্যবসরে, তিনি দেশের সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক মাসিক পত্রিকা 'তরজুমান-ই-আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াত'-

★ খলীফা (প্রতিনিধি) ঃ তদানীন্তন নবাব কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। তাঁর অগাধ ধর্মীয় জ্ঞান-পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি এ সম্মানজনক উপাধি ও প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত হন।

এর সহ সম্পাদক ও পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৭ সালে সংযুক্ত আরব আমীরাতের (ইউ, এ, ই) দুবাইতে একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে তিনি তাঁর কর্মজীবনের আরেক অধ্যায়ের সূচনা করেন। ১৯৯১ সনে দুবাইর কেন্দ্রস্থলে একটি প্রাইভেট যৌথ ব্যবসাও আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে স্বদেশেও একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ক্বায়েম করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৯৯১ ইংরেজীতে দুবাইর কেন্দ্র স্থলে 'সাদিয়া টাইপিং ইষ্টাব্লিশ্‌ম্যান্ট' নামের একটা প্রাইভেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তিনি সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৯৯৮ ইংরেজীতে একই ইমরাতের দেরা দুবাইতে 'আল-মারজান টাইপিং ইষ্টাবলিশ্‌ম্যান্ট' নামের আরেকটা প্রতিষ্ঠান ক্বায়েম করে বিগত ২০০৩ ইংরেজী পর্যন্ত তা পরিচালনা করেন।

লেখালেখি ঃ

১. চট্টগ্রাম ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতাকালে চট্টগ্রাম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত 'মাসিক তরজুমান-ই আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত'-এর সহকারী ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। (১৯৭৯-১৯৮৭ ইং)

২. ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে 'ধর্মীয় কথিকা' লিখন ও পঠনের সুযোগ পান। (১৯৮০-১৯৮৭ ইং)

৩. তা'ছাড়া পত্র-পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে স্বনামে ও ছদ্মনামে লেখালেখি করেন।

৪. এ পর্যন্ত কয়েকটা ধর্মীয় বই-পুস্তক অনুবাদ সম্পাদনা ও প্রণয়ন করেছেন। তম্মধ্যে নিম্নলিখিত বইগুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

ক) অনূদিত ঃ

১. তরজমা-ই ক্বোরআন ও তাফসীর 'কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান', মূল লেখক- আ'লা হযরত ইমাম শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী ও সদরুল আফাযিল সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (ভারত) [রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিমা]। ১২০০ পৃষ্ঠায় ১ ও ৩ খণ্ডে প্রকাশিত। ২. তরজমা-ই ক্বোরআন ও তাফসীর 'কান্‌যুল ঈমান ও নূরুল ইরফান'। মূল লেখক- যথাক্রমে, আ'লা হযরত ইমাম শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী ও হাকীমুল উম্মত মুফতী আল্লামা আহমদ ইয়ার খান নঈমী (পাকিস্তান) [রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিমা] ১৮০০ পৃষ্ঠায় ২ খণ্ডে প্রকাশিত। ৩. মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্ (৮ খণ্ড), মূল ঃ হযরত হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী। ৪. 'ফয়যানে সুন্নাত'। মূল লেখক- আমীর-ই আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ক্বাদেরী (পাকিস্তান) [মুদ্দাযিল্লুহুল আলী] ১১৮৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত। ৫. 'ফয়যানে রমযান'। মূল লেখক- আমীর-ই আহলে সুন্নাত, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ক্বাদেরী (পাকিস্তান) [মুদ্দাযিল্লুহুল আলী], ৫১০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত। ৬. 'বরকাতে মীলাদ শরীফ' মূল লেখক- মাওলানা শফি উকাড়ভী (পাকিস্তান)। ৭. নূরের নবীই মানবরূপে' [পায়করে নূর (উর্দু)], প্রকাশিত। ৮. 'আঁধার থেকে আলোর দিকে' (আন্ধেরে সে উজালে কী তরফ (উর্দু)], প্রকাশিত। ৯. 'দেওবন্দী আলিমগণও যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ' (ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী] প্রকাশিত।

খ) প্রণীত

১. হজ্জে বাইতুল্লাহ ও যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারাহ্' [সচিত্র পূর্ণাঙ্গ হজ্জ্ব গাইড]। ২. মৌং দেলাওয়ার হোসাঈন সাঈদীর ভ্রান্ত তাসফীরের স্বরূপ উন্মোচন', ৩. 'শিয়া ও মওদূদী মতবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক'।

বহির্বিশ্ব সফর

১, চাকুরী ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে দুবাই (ইউ.এ.ই) যাত্রা করেন ১৯৮৭ ইংরেজীর ১৬ই মে। আজ পর্যন্ত সেখানকার ভিসা ধারণ করছেন। চাকুরী ও ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে সেখানেই বেশীর ভাগ সময় অবস্থান করেন।

২. ১৯৮৯ ইং, ১৯৯০ ইং, ১৯৯৩ ইং ও ১৯৯৮ ইংরেজীতে পবিত্র হজ্জ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনা শরীফ (সৌদি আরব) সফর করেন।

৩. ১৯৯৯ ইংরেজীতে 'এরাবিয়ান গাল্ফ'-এর অন্যতম রাষ্ট্র কাতার সফর করেছেন।

৪. ২০০২ ইংরেজীতে 'দাওয়াতে ইসলামী' কর্তৃক বিশ্ব ইজতিমায় আমন্ত্রিত হয়ে পাকিস্তানের মুলতান, লাহোর ও করাচি সফর করেন।

সামাজিক / প্রাতিষ্ঠানিক অবদান

১. 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা'র প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও পরে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন। (১৯৮০-১৯৮৬) বর্তমানে এ সংগঠন 'বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট' নামক রাজনৈতিক দলের সহযোগী (ছাত্র) সংগঠন।

২. 'গুলশান-ই হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স', চট্টগ্রাম-এর প্রতিষ্ঠাতা সিনিয়র সহ-সভাপতি। (১৯৯০ ইংরেজীতে প্রতিষ্ঠিত)

৩. ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও কর্মের গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান আ'লা হযরত ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টা।

৪. 'রেযা রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশান্স, চট্টগ্রাম'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। (স্থাপিত ২০০০ ইং সালের ১লা জানুয়ারী।) বর্তমানে 'ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম'।]

৫. প্রেসিডিয়াম সদস্য, বর্তমানে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট।

খ) বিদেশে

দুবাই নগরীর কেন্দ্রস্থলে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে 'বাংলাদেশী মুসলিম জনকল্যাণ সংস্থা' (স্থাপিত-১৯৮৯ ইং) নামে একটি ধর্মীয় ও সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করেন। আর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

বায়'আত

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ও কামিল ওলী, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ ইত্যাদির লক্ষ লক্ষ মুসলমানের আধ্যাত্মিক পেশোয়া (পথ-নির্দেশক) হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র হাতে বায়'আতের সুন্নাত পালন করেন বিগত ১৯৭৬ ইংরেজীতে। আপন মুর্শিদে বরহক্বের আধ্যাত্মিক নির্দেশনা ও দো'আ তাঁর জীবনের অন্যতম পথ-নির্দেশক ও পাথেয় বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

গুণীজন হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্তি

কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কৃত 'কানযুল ঈমান'-এর সাথে সংযোজিত দু'টি তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান' এবং 'নূরুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদসহ বহুমুখী খিদমতের নিরিখে তিনি নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে সম্মাননা লাভ করেন ঃ

❒ আদর্শ লিখক ফোরাম (আলিফ) ঃ ১৯৯৫ ইং

❒ ড. মোহাম্মদ রশিদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৯৯৫ ইং 'সাইয়্যেদুল মুতারজিমীন' [খেতাব]।

❒ রেযা ইসলামিক একাডেমী, বাংলাদেশ ঃ ২০০৪ ইং

❒ আ'লা হযরত ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঃ ২০০৫ ইং

❒ বরকাতী ফাউণ্ডেশন (দুবাই-ভারত)-এর পক্ষে ইসলামিক সেন্টার, দিনাজপুর ঃ ২০০৭ ইংরেজী [স্বর্ণপদক লাভ]

❒ হালিম-লিয়াকত স্মৃতি সংসদ-রাউজান হলদিয়া জোন ঃ ২০০৮ ইংরেজী

❒ মেট্রোপোল স্কলারশীপ পরিষদ, চট্টগ্রাম ঃ ২০০৮ ইং

[উল্লেখ্য, বৃহত্তর চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত সর্বপ্রথম ও একমাত্র পবিত্র ক্বোরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ও তাফসীর লিখে প্রকাশ করেছেন- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান।]

হাদীস শরীফ

পবিত্র ক্বোরআনের পর হাদীস শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সুন্নী মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রকাশ করার চাহিদা দীর্ঘদিনের। এ চাহিদাও তিনি পূরণ করলেন- প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ'র সরল বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করার উদ্যোগও গ্রহণ করে।

****

বঙ্গানুবাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

ইসলামের চতুর্দলীলের মধ্যে হাদীস শরীফের স্থান পবিত্র ক্বোরআনের পরই। ইসলামের প্রথম দলীল পবিত্র ক্বোরআনকে বুঝার মাধ্যম ও ক্বোরআন মজীদের বিধানাবলীর প্রকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে হাদীস শরীফ। আল্লাহ্ পাকের পরিচিতি লাভ ও ক্বোরআন মজীদের জ্ঞানার্জন, শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে অবগতি অর্জন, মোট কথা ইহ ও পরকালীন সব বিষয়ে জেনে আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত ও প্রদর্শিত মত ও পথ সম্পর্কে যথাযথ অবগতি লাভ ও যথাযথভাবে আমল করার জন্য হাদীস শরীফের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অনস্বীকার্য। মোদ্দা কথায়, পবিত্র ক্বোরআনকে বাদ দেওয়ার যেমন কোন উপায় নেই, তেমনি পবিত্র হাদীসকে উপেক্ষা করারও উপায় নেই। ইসলামের অন্যান্য দলীলের (ইজমা' ও ক্বিয়াস ইত্যাদি)ও উৎস হচ্ছে- পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীস শরীফ। তাই পবিত্র ক্বোরআনের সাথে হাদীস শরীফের জ্ঞানার্জনও একান্ত অপরিহার্য।

বলা বাহুল্য, ঈমান-আক্বীদা থেকে আরম্ভ করে শরীয়তের যাবতীয় বিধানের বর্ণনা সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ হিসেবে 'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্'র খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা আজ বিশ্বব্যাপী। আলিম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে কিশ্‌কাত শরীফের নাম শুনেনি। দ্বীনী শিক্ষার পরম্পরায় আহলে সুন্নাত সহ প্রায়সব চিন্তাধারার মাদ্‌রাসাগুলোতে ইল্‌মে হাদীসের শিক্ষা দান এ কিতাব দিয়েই আরম্ভ হয়। ইসলামী বিশ্বের প্রসিদ্ধ প্রায়সব হাদীসগ্রন্থের বরাতে অতি সুন্দর পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ সম্বলিত একটি অতি ব্যাপক কিতাব হচ্ছে 'মিশকাতুল মাসাবীহ্'। আক্বাইদ, ফিক্বহী মাসাইল, আদাব ও মানাক্বিব ইত্যাদির অতি উত্তম সমাহার এ কিতাবে। 'জামে' ও 'সহীহ' হাদীস গ্রন্থাবলীর প্রায় সব বিষয়বস্তু এ কিতাবে অতি উত্তমরূপে বিন্যস্থ হয়েছে। সুতরাং হাদীস-ই নবভী শরীফের এ অতি নির্ভরযোগ্য কিতাবের সহজ-সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভূত হয়ে আসছে।

বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝিতে (১৯৫৯ ইং) অতি সহজ-সরল ভাষায় সঠিকভাবে এ কিতাবের উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন- প্রসিদ্ধতম তরজমা-ই ক্বোরআন কান্‌যুল ঈমানের সাথে সংযোজিত 'তাফসীর-ই নূরুল ইরফান'সহ বহু ধর্মীয় গ্রন্থের প্রণেতা হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশ্‌রাফী বদায়ূনী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। তিনি পূর্ণ কিতাবের উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পূর্ণ আট খণ্ডে সমাপ্ত করেছেন। এতে তিনি প্রতিটি হাদীসের সরল অনুবাদ ও সুদক্ষ মুহাদ্দিস সুলভ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় সংশ্লিষ্ট হাদীস-ই রসূল শরীফের সঠিক মর্মার্থ, হাদীস শরীফে নিহিত আক্বাইদে আহলে সুন্নাত ও ফিক্বহের মাসআলাদি অতি সহজ ও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে। তিনি তাতে প্রতিটি হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী ও তাবে'ঈ প্রমুখের সংক্ষিপ্ত জীবনী, আক্বাইদ (সুন্নী আক্বীদা) এবং ফিক্বহী মাস্'আলায় হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য, উৎকৃষ্টতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে অতি প্রজ্ঞার সাথে তুলে ধরেছেন। মোট কথা, প্রতিটি হাদীসের সঠিক মর্মার্থ অনুধাবনে একজন সাধারণ পাঠক থেকে আরম্ভ করে একজন মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থী, এমনকি হাদীসের শিক্ষক এবং বিজ্ঞ ওলামা-ই ক্বেরামকেও যথেষ্ট সাহায্য করবে এ কিতাব। তাই, আজ মূল কিতাব মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্‌র মতো এর অনুবাদসহ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরআতুল মানাজীহ'ও সর্বস্তরের পাঠক সমাজে অতীব সমাদৃত।

আমরা বহুদিন যাবৎ বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি যে, অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ-পুস্তকের মতো সহীহ বোখারী শরীফ থেকে আরম্ভ করে হাদীস শরীফের বহু গ্রন্থ বাংলায়ও অনূদিত হয়েছে। ওইগুলোর বেশীর ভাগ নিছক 'বঙ্গানুবাদ' (ব্যাখ্যাবিহীন) হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে সেগুলোতে হাদীস শরীফের প্রকৃত মর্মার্থ, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং নাসিখ-মানসূখ নির্ণীত না হওয়ায় ওই নিছক অনুবাদ পাঠ

করে সরলমনা পাঠকগণ, ক্ষেত্র বিশেষে আহলে হাদীস, লা-মাযহাবীদের কু-প্ররোচনায়, অপব্যাখ্যার শিকার হয়ে বিভ্রান্ত হতে চলেছেন। বিশেষতঃ মাযহাবের ইমামগণের মত-পার্থক্য ও তাঁদের স্বতন্ত্র ইজতিহাদের প্রকৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনা হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য একান্তভাবে জরুরী। অন্যথায় সাধারণ মুসলমান সরাসরি হাদীস শরীফের অনুবাদ থেকে ফিক্বহের সঠিক মাস্আলা নির্ণয় করতে পারে না। ফলে তারা নানা বিভ্রান্তির শিকার হওয়া স্বাভাবিক; কোন কোন ক্ষেত্রে এসব অনুবাদ পড়ে পথচ্যুত, অন্য ভাষায়, সুন্নী মতাদর্শ থেকেও সিটকে পড়ছে কেউ কেউ। এ কারণে, হাদীস শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাবের সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক বঙ্গানুবাদসহ ব্যাখ্যা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে আজ থেকে অনেক দিন আগে।

আল্লাহ্ পাকের মেহেরবাণীক্রমে একই ধরনের প্রয়োজনের তাগিদে, প্রিয়নবীর কৃপাদৃষ্টিতে, আমি অধম আমার মুর্শিদে বরহক আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির খাস দো'আর বরকতে এ পর্যন্ত দু'টি তরজমা ও তাফসীর 'কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' এবং 'কান্‌যুল ঈমান ও নূরুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ করে পাঠক সমাজে পেশ করতে সক্ষম হয়েছি। ওই দু'টি গ্রন্থ পবিত্র ক্বোরআনের তরজমা ও তাফসীরের সম্মানিত পাঠকদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাকী রইলো প্রিয়নবীর পবিত্র হাদীস শরীফ। আমি অধম সহীহ্ বোখারী শরীফ ও মিশ্কাতুল মাসাবীহ্'র অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বাংলা ভাষায় লিখতে সংকল্প করি। সুতরাং প্রথমে শেষোক্ত কিতাবের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য মনস্থ করি। যেহেতু এ ক্ষেত্রে হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফতী আহমদ এয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির লিখিত 'মিরআতুল মানাজীহ্ তরজমা ও শরহে মিশ্কাতুল মাসাবীহ্'র বঙ্গানুবাদই যথেষ্ট, সেহেতু সেটার অনুবাদে হাত দিই। দীর্ঘ আট খণ্ডের এ কিতাবের অনুবাদের ক্ষেত্রে কতিপয় হিতাকাঙ্ক্ষীর সহযোগিতা কামনা করেছি। যাঁরা এ মহান কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের নাম এ কিতাবের প্রতিটি খণ্ডের শুরুতে উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছি। আর এর ব্যয় বহুল প্রকাশনার জন্য আমি কিছু কিছু বন্ধু-বান্ধব ও দ্বীন এ মাযহাবের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা কামনা করেছি। সুতরাং যাঁরা এ মহান কাজে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে আমাদেরকে ঋণী করেছেন, আবারও তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে ও অন্যান্য সহযোগিদেরকে এর যথাযথ প্রতিদান দিন। আমীন!!

বিগত ২০০৪ ইংরেজী সালের শেষ প্রান্তে 'চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট'-এ 'কান্‌যুল ঈমান ও 'নূরুল ইরফান'-এর প্রকাশনা উৎসবে আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর ক্বেবলা হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ সাহেব মুদ্দাযিল্লুহুল আলী প্রধান মেহমান হিসেবে সদয় উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি এ বিরাটাকার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনা যথাযথভাবে সম্পন্ন হবার জন্যও বিশেষভাবে দো'আ করেছিলেন। আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবাণী, হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কৃপাদৃষ্টি ও আমার হুযূর ক্বেবলার দো'আর ফসল হচ্ছে এ অতি বরকতময় প্রকাশনাও।

মোটকথা, আল্লাহ্ পাকের উপর ভরসা করে অতি যত্নসহকারে এ মহা বরকতময় কিতাবের বঙ্গানুবাদ কর্ম ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালাই, তবুও ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়, তজ্জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবে পাকের দয়ালু দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তদুপরি, এ ক্ষেত্রে হিতাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিক ও গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পরিশেষে, কিতাবখানা আশা করি, উর্দু ভাষীদের ন্যায় বাংলাভাষীদের জন্যও হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞানার্জনে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। সম্মানিত পাঠক সমাজের সমীপে সবিনয় আরয, অনুগ্রহ করে পরম করুণাময়ের মহান দরবারে দো'আ করবেন যাতে আমাদের এ প্রয়াসকে তিনি ক্বূল করেন এবং পরকালে তাঁর রহমত, তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কৃপাদৃষ্টি ও শাফা'আত নসীব করেন। সর্বোপরি, এটা যেনো আমাদের প্রত্যেকের নাজাতের ওসীলা হয়। আমীন!! তাছাড়া, এ পরম্পরায় আমাদের অন্যান্য প্রয়াসগুলোও যাতে পূর্ণতা লাভ করে। সুম্মা আমীন!!

ইতি

(মাওলানা) মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মুক্বাদ্দামাতুল মিশ্‌কাত

মূল ঃ হযরত শায়খ মুহাক্বক্বিক্ব মুহাম্মদ আবদুল হক মুহাদ্দিস-ই দেহলভী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বঙ্গানুবাদক ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

مُقَدَّمَةُ الْمِشْكٰوةِ

لِلشَّيْخِ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْحَقِّ الدِّهْلَوِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ الْبَارِيُّ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مُقَدَّمَةٌ فِىْ بَيَانِ بَعْضِ مُصْطَلَحَاتِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ مِمَّا
يَكْفِىْ فِىْ شَرْحِ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ وَ اِطْنَابٍ

اِعْلَمْ اَنَّ الْحَدِيْثَ فِىْ اصْطلاحِ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِيْنَ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ وَمَعْنَى التَّقْرِيْرِ اَنَّهٗ فَعَلَ اَحَدٌ اَوْ قَالَ شَيْئًا فِىْ حَضْرَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يَنْهَهٗ عَنْ ذٰلِكَ بَلْ سَكَتَ وَقَرَّرَ وَكَذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلٰى

মুক্বাদ্দামাতুল মিশ্‌কাত

কৃত ঃ হযরত শায়খ মুহাম্মদ আবদুল হক্ব দেহলভী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

ইল্‌মে হাদীসের এমন কতিপয় পরিভাষার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যেগুলো জেনে নিলে এ গ্রন্থের[১] ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট হয়।

জেনে রেখো– 'জুমহূর' তথা প্রায়সব মুহাদ্দিসের পরিভাষায় 'হাদীস' শব্দটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, কর্ম এবং 'তাক্বরীর' বা নীরব সমর্থনকে বলা হয়।

'তাক্বরীর' (تقرير) বা 'নীরব সমর্থন'-এর অর্থ হলো– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে কেউ কোন কাজ করেছেন কিংবা কোন কথা বলেছেন; কিন্তু তিনি তা (উক্ত কথা ও কাজ)-কে মন্দ বলেন নি এবং তাকে উক্ত কথা কিংবা কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন নি (নিষেধ করেন নি); বরং তিনি নীরব রয়েছেন এবং নীরব সমর্থন দিয়েছেন। অনুরূপ,

১. এখানে 'গ্রন্থ' বলতে 'লুম'আত ফী শরহিল মিশ্‌ক্বাত' বুঝায়। মিশ্‌কাত শরীফের প্রণেতা হলেন- আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ মাহমূদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ওরফে খতীব-ই তাবরীযী রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। (ওফাত মতান্তরে ৭৪০ হিজরী)। বস্তুতঃ 'মিশ্‌কাত' হচ্ছে মুহিউস্ সুন্নাহ্ আবূ মুহাম্মদ হোসাঈন ইবনে মাস্'উদ ইবনে মুহাম্মদ ফাররা বাগভী রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কৃত 'মাসাবীহুস্ সুন্নাহ্' (সংক্ষেপে মাসাবীহ)'র বর্ধিত সংস্করণ। এ কিতাবে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌সহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীস সংকলন করা হয়েছে। এ কিতাবে প্রতিটি হাদীসের সাথে উসূলে হাদীসের বিভিন্ন পরিভাষা উল্লেখ করা হয়েছে। এর অন্যতম ব্যাখ্যাগ্রন্থ হচ্ছে 'আল্-লুম'আত ফী শরহিল মিশ্‌কাত'। তাই এ মূল কিতাবটি ও সেটার ব্যাখ্যাগ্রন্থ বুঝার জন্য ওইসব পরিভাষার সাথে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। তাই হযরত শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলভী 'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্'র মুক্বাদ্দামাহ্ বা ভূমিকা স্বরূপ একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ কিতাব প্রণয়ন করে এর প্রারম্ভে সংযোজন করেছেন, যা অধ্যয়ন করলে আলোচ্য কিতাব ব্যাখ্যাসহ সহজে বুঝা যাবে।

قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ وَعَلٰى قَوْلِ التَّابِعِيِّ وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ ـ فَمَا انْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْمَرْفُوْعُ . وَمَا انْتَهٰى اِلَى الصَّحَابِيِّ يُقَالُ لَهُ الْمَوْقُوْفُ كَمَا يُقَالُ قَالَ اَوْ فَعَلَ اَوْ قَرَّرَ اِبْنُ عَبَّاسٍ اَوْ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا اَوْ مَوْقُوْفٌ عَلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ وَمَا انْتَهٰى اِلَى التَّابِعِيِّ يُقَالُ لَهُ الْمَقْطُوْعُ وَقَدْ خَصَّصَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيْثَ بِالْمَرْفُوْعِ وَالْمَوْقُوْفِ اِذِ الْمَقْطُوْعُ يُقَالُ لَهُ الْاَثَرُ

'হাদীস' শব্দটি সম্মানিত সাহাবীদের কথা, কাজ ও নীরব সমর্থন এবং তাবে'ঈদের কথা, কাজ ও নীরব সমর্থনকেও বলা হয়।

হাদীস-ই মারফূ', মাওকূফ ও মাক্বতূ'

হাদীস-ই মারফূ'

যে হাদীসের সনদ (বর্ণনাকারীদের সূত্র বা পরম্পরা) রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, ওই হাদীসকে 'মারফূ'[২] বলা হয়।

হাদীস-ই মাওকূফ'

যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে ওই হাদীসকে 'মাওকূ ফ' বলা হয়। যেমন বলা হয়, "হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেছেন কিংবা করেছেন কিংবা নীরব সমর্থন দিয়েছেন।" কখনও বলা হয়, "ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে 'মাওকূফান' (মাওকূফ হিসেবে) বর্ণিত।" আবার কখনও বলা হয়, "হাদীসটি ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমার উপর মাওকূফ।"

হাদীস-ই মাক্বতূ'

যে হাদীসের সনদ তাবে'ঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে ওই হাদীসকে 'মাক্বতূ' বলা হয়।[৩]

কেউ কেউ 'হাদীস' শব্দটিকে 'মারফূ' ও 'মাওকূফ'-এর জন্য খাস করেছেন। কারণ, 'মাক্বতূ'কে বলা হয় 'আসর'।

---

২. যেমন– عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ فَعَلَ كَذَا اَوْ قَرَّرَ كَذَا অর্থাৎ... হযরত আবূ হোরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন কিংবা এমন করেছেন অথবা নীরব সমর্থন দিয়েছেন। এখানে হযরত আবূ হোরায়রার উক্তি পর্যন্ত সনদের পরম্পরা খতম হয়েছে। এরপর হুযূর সুল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, কর্ম ও সমর্থন মুবারকের উল্লেখ রয়েছে। এজন্য এ হাদীস 'মারফূ'।

৩. যেমন– عَنْ فُلَانٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ كَذَا اَوْ فَعَلَ كَذَا اَوْ قَرَّرَ كَذَا অর্থাৎ... হিশাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওরওয়াহ্ এমন বলেছেন, কিংবা করেছেন কিংবা নীরব সমর্থন দিয়েছেন। সুতরাং এ তিন প্রকারের হাদীসের নকশা নিম্নরূপ ঃ

হাদীস
- মারফূ'
  - ক্বাওলী (বাণীগত)
  - ফে'লী (কর্মগত)
  - তাক্বরীরী (সমর্থনগত)
- মাওকূফ
  - ক্বাওলী (বাণীগত)
  - ফে'লী (কর্মগত)
  - তাক্বরীরী (সমর্থনগত)
- মাক্বতূ'
  - ক্বাওলী (বাণীগত)
  - ফে'লী (কর্মগত)
  - তাক্বরীরী (সমর্থনগত)

(পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

وَقَدْ يُطْلَقُ الْاَثَرُ عَلَى الْمَرْفُوْعِ اَيْضًا كَمَا يُقَالُ الْاَدْعِيَةُ الْمَاثُوْرَةُ لِمَا جَآءَ مِنَ الْاَدْعِيَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالطَّحَاوِيُّ سَمّٰى كِتَابَهُ الْمُشْتَمِلُ عَلٰى بَيَانِ الْاَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ وَآثَارِ الصَّحَابَةِ بِشَرْحِ مَعَانِى الْاٰثَارِ وَقَالَ السَّخَاوِىُّ اَنَّ لِلطَّبَرَانِىْ كِتَابًا مُسَمّٰى بِتَهْذِيْبِ الْاٰثَارِ مَعَ اَنَّهُ مَخْصُوْصٌ بِالْمَرْفُوْعِ وَمَا ذُكِرَ فِيْهِ مِنَ الْمَوْقُوْفِ فَبِطَرِيْقِ التَّبَعِ وَالتَّطَفُّلِ.

وَالْخَبَرُ وَالْحَدِيْثُ فِى الْمَشْهُوْرِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَبَعْضُهُمْ خَصُّوا الْحَدِيْثَ بِمَا جَآءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْخَبَرَ بِمَا جَآءَ عَنْ اَخْبَارِ الْمُلُوْكِ وَالسَّلَاطِيْنِ وَالْاَيَّامِ الْمَاضِيَةِ وَلِهٰذَا يُقَالُ لِمَنْ يَّشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ مُحَدِّثٌ وَلِمَنْ يَّشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيْخِ اَخْبَارِىٌّ۔

হাদীসে মারফূ'র জন্য কখনও কখনও 'আসর' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। যেমন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দো'আসমূহকে 'আল-আদ'ইয়াতুল মা'সূরাহ্' ('আসার' থেকে নির্গত করে) বলা হয়। অনুরূপ, ইমাম ত্বাহাভী তাঁর ওই কিতাবের নাম 'শরহু মা'আ-নিল আ-সা-র' রেখেছেন, যাতে তিনি নবী করীমের হাদীসসমূহ ও সাহাবা-ই কেরামের 'আসরগুলো' বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা সাখাভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, ইমাম ত্বাবরানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি-এর 'তাহযীবুল আসার' নামক একটি কিতাব রয়েছে, অথচ সেটা বিশেষভাবে মারফূ' হাদীস সম্বলিত। আর তাতে যে সব 'মাওকূফ' হাদীস উল্লেখিত রয়েছে, সেগুলো মারফূ' হাদীসগুলোর অধীনে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

'খবর' ও 'হাদীস'

প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী, 'হাদীস' ও 'খবর' সমার্থক; তবে কেউ কেউ কেবল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা-ই কেরাম এবং সম্মানিত তাবে'ঈদের থেকে বর্ণিত বিষয়কে 'হাদীস' বলেছেন, আর রাজা-বাদশাহগণ এবং অতীতকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়, তাকে 'খবর' বলেছেন। এ কারণেই হাদীসশাস্ত্র নিয়ে যারা মগ্ন থাকেন, তাঁদেরকে 'মুহাদ্দিস' আর ইতিহাসশাস্ত্র নিয়ে যাঁরা মগ্ন থাকেন, তাঁদেরকে 'আখবারী' (ঐতিহাসিক/ইতিহাসবিদ) বলা হয়।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) উল্লেখ্য যে, হাদীসের দু'টি অংশ রয়েছে, প্রথমাংশে হাদীস গ্রহণের অবস্থাসহ তাঁদের নামের পরম্পরা থাকে, যাঁদের মাধ্যমে হাদীস পৌঁছেছে। দ্বিতীয় অংশে ওই বাণী, কর্ম কিংবা সমর্থনের উল্লেখ থাকে, যেগুলো তাঁরা উদ্ধৃত করেন। প্রথমাংশকে হাদীসের সনদ আর দ্বিতীয়াংশকে হাদীসের 'মতন' বলা হয়। আর ওইসব লোককে হাদীসের বর্ণনাকারী (রাভী/রিজাল) বলা হয়।

وَالرَّفْعُ قَدْ يَكُوْنُ صَرِيْحًا وَقَدْ يَكُوْنُ حُكْمًا. اَمَّا صَرِيْحًا فَفِى الْقَوْلِيِّ كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ كَذَا۔ اَوْ كَقَوْلِهٖ اَوْ قَوْلِ غَيْرِهٖ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَوْ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنَّهٗ قَالَ كَذَا۔

وَفِى الْفِعْلِيِّ كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَذَا اَوْ عَنْ رَّسُوْلِ صلى الله عليه وسلم اَنَّهٗ فَعَلَ كَذَا اَوْ عَنِ الصَّحَابِيِّ اَوْ غَيْرِهٖ مَرْفُوْعًا اَوْ رَفَعَهٗ اَنَّهٗ فَعَلَ كَذَا وَفِى التَّقْرِيْرِيِّ اَنْ يَّقُوْلَ الصَّحَابِىُّ اَوْ غَيْرُهٗ فَعَلَ فُلَانٌ اَوْ اَحَدٌ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَلَا يَذْكُرُ اِنْكَارَهٗ۔

মারফূ' (مرفوع) প্রসঙ্গ

হাদীস কখনো 'মারফূ' হয় সুস্পষ্টভাবে (صريحا), আবার কখনো হয় হুক্‌মীভাবে (বিধিমত/পরোক্ষভাবে)। সুস্পষ্টভাবে মারফূ' ক্বাওলী বা বাণীগত হাদীসে হলে তার উদাহরণ হচ্ছে- সাহাবীর একথা বলা-

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَذَا অর্থাৎ "আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি।"

অথবা তাঁর (সাহাবী) অথবা অন্য কারো একথা বলা-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ كَذَا

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" অথবা "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি এরূপ বলেছেন।"

আর (মারফূ') ফে'লী বা কর্মগত হাদীসে হলে, তার উদাহরণ হলো- সাহাবীর একথা বলা-

رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَذَا অর্থাৎ "আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।" অথবা (একথা বলা)

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ فَعَلَ كَذَا অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি এরূপ করেছেন।"

অথবা সাহাবী থেকে কিংবা সাহাবী ব্যতীত অন্যদের থেকে مَرْفُوْعًا (মারফূ'ভাবে) বর্ণিত হওয়া, অথবা সাহাবীর মারফূ'রূপে বর্ণনা করা- اَنَّهٗ فَعَلَ كَذَا। অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন।"

আর মারফূ' তাক্বরীরী বা নীরব সমর্থনগত হাদীসে হলে তার উদাহরণ হচ্ছে- সাহাবী অথবা অন্যদের ভাষ্য- فَعَلَ فُلَانٌ اَوْ اَحَدٌ بِحَضْرَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا অর্থাৎ "অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিংবা যে কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে এরূপ করেছেন।" আর তিনি (বর্ণনাকারী) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বারণ বা নিবৃত্ত করার কথা উল্লেখ করেন নি।

وَاَمَّا حُكْمًا فَكَاِخْبَارِ الصَّحَابِيِّ الَّذِىْ لَمْ يُخْبِرْ عَنِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَالاَ مَجَالَ فِيْهِ لِلْاِجْتِهَادِ عَنِ الْاَحْوَالِ الْمَاضِيَةِ كَاَخْبَارِ الْاَنْبِيَاءِ اَوِ الْاٰتِيَةِ كَالْمَلَاحِمِ وَالْفِتَنِ وَ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ عَنْ تَرَتُّبِ ثَوَابٍ مَخْصُوْصٍ اَوْ عِقَابٍ مَخْصُوْصٍ عَلٰى فِعْلٍ فَاِنَّه' لاَ سَبِيْلَ اِلَيْهِ اِلاَّ السَّمَاعَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اَوْ يَفْعَلُ الصَّحَابِىُّ مَالاَ مَجَالَ لِلْاِجْتِهَادِ فِيْهِ اَوْ يُخْبِرُ الصَّحَابِىُّ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ كَذَا فِىْ زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِاَنَّ الظَّاهِرَ اِطِّلَاعُه' صلى الله عليه وسلم عَلٰى ذٰلِكَ وَنُزُوْلُ الْوَحْيِ بِهٖ اَوْ يَقُوْلُوْنَ وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا لِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ السُّنَّةَ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّه' يَحْتَمِلُ سُنَّةَ الصَّحَابَةِ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ فَاِنَّ السُّنَّةَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ۔

আর 'হুকমী' বা বিধানগত হাদীস-ই মারফূ'-এর উদাহরণ হচ্ছে– এমন সাহাবী সংবাদ দেওয়া, যিনি পূর্ববর্তী (আসমানী) কিতাব থেকে (সংবাদটি) উদ্ধৃত করেন নি। খবরটিও এমন যে, তা'তে ইজতিহাদ করার কোনরূপ সুযোগই নেই, যেমন– অতীতকালের অবস্থাদি সম্পর্কিত সংবাদ, যেমন নবীগণের ইতিহাস। অথবা ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ, যেমন যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফিত্না-ফ্যাসাদ কিংবা ক্বিয়ামতের ভয়ানক পরিস্থিতি। অথবা বিশেষ কর্মের প্রতিদান হিসেবে বিশেষ পরিমাণ সাওয়াব লাভ অথবা বিশেষ কর্মের পরিণামে নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান আরোপ করা। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনা ব্যতীত এ বিষয়ে পরিজ্ঞাত হওয়ার বিকল্প কোন পথই নেই। অথবা সাহাবী এমন কোন কাজ করা, যাতে ইজতিহাদের কোন সুযোগ নেই। অথবা সাহাবীর এ সংবাদ দেওয়া যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এরূপ করতেন। কেননা, এটা স্পষ্টত একথা প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং এ ব্যাপারে ওহীও অবতীর্ণ হয়েছে।

অথবা সাহাবীগণ বলেন, "এমনটি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।" কেননা, স্পষ্টত 'সুন্নাত' দ্বারা 'সুন্নাত-ই রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'ই বুঝানো হয়। কারো কারো মতে, 'সুন্নাত' শব্দটি দ্বারা সাহাবা এবং খোলাফা-ই রাশেদীনের সুন্নাত বুঝানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। কারণ, 'সুন্নাত' শব্দটি এ মর্মেও ব্যবহৃত হয়।[৪]

৪. হাদীস-ই মারফূ'র প্রকারগুলো নিম্নে প্রদর্শিত নকশা থেকে সুস্পষ্ট হয়ঃ

হাদীস-ই মারফূ'
- ক্বাওলী
  - সারীহী
  - হুকমী
- ফে'লী
  - সারীহী
  - হুকমী
- তাক্বরীরী
  - সারীহী
  - হুকমী

فَصْلٌ ۰ اَلسَّنَدُ طَرِيْقُ الْحَدِيْثِ وَهُوَ رِجَالُهُ الَّذِيْنَ رَوَوْهُ وَ الْاِسْنَادُ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ يَجِئُ بِمَعْنٰى ذِكْرِ السَّنَدِ وَالْحِكَايَةِ عَنْ طَرِيْقِ الْمَتْنِ وَالْمَتْنُ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ الْاِسْنَادُ فَاِنْ لَّمْ يَسْقُطْ رَاوٍ مِّنَ الرُّوَاةِ مِنَ الْبَيْنِ فَالْحَدِيْثُ مُتَّصِلٌ وَيُسَمّٰى عَدَمُ السُّقُوْطِ اِتِّصَالًا وَاِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ اَوْ اَكْثَرُ فَالْحَدِيْثُ مُنْقَطِعٌ وَهٰذَا السُّقُوْطُ اِنْقِطَاعٌ وَالسُّقُوْطُ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ اَوَّلِ السَّنَدِ وَيُسَمّٰى مُعَلَّقًا وَهٰذَا الْاِسْقَاطُ تَعْلِيْقًا وَالسَّاقِطُ قَدْ يَكُوْنُ وَاحِدًا وَقَدْ يَكُوْنُ اَكْثَرَ وَقَدْ يُحْذَفُ تَمَامُ السَّنَدِ كَمَا هُوَ عَادَةُ الْمُصَنِّفِيْنَ يَقُوْلُوْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ সনদ, ইসনাদ ও মতন প্রসঙ্গ

সনদ ঃ হাদীস বর্ণনার সূত্র-পরম্পরাকে 'সনদ' বলা হয়। আর তা হলো, ওইসব ব্যক্তি, যাঁরা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (অন্য কথায়, কোন গ্রন্থকার বা হাদীস বর্ণনাকারী থেকে আরম্ভ করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত হাদীসের যতজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, তাঁদের সূত্র-পরম্পরাকে 'সনদ' বলা হয়।)

ইসনাদ ঃ এটা সনদের সমার্থক শব্দ। আবার কখনও সনদ বর্ণনা করাকে অর্থাৎ মতনের সূত্র বর্ণনা করাকেও 'ইসনাদ' বলা হয়।

মতন ঃ 'সনদ' বা বর্ণনাকারীদের সূত্র-পরম্পরা যেখানে গিয়ে শেষ হয় তাকে 'মতন' বলা হয়। (অথবা এভাবে বলা যায়– সনদ বর্ণনা করার পর মূল হাদীসের যেই পবিত্র বচনগুলো বর্ণনা করা হয়, সেগুলোকে 'মতন' বলা হয়।)

মুত্তাসিল, মুনক্বাতি' ও মু'আল্লাক্ব হাদীসের সংজ্ঞা

মুত্তাসিল ঃ বর্ণনকারীদের থেকে কোন একজন বর্ণনাকারীও যদি সনদের কোন স্তর থেকে বাদ না পড়ে, তাহলে ওই হাদীসকে 'মুত্তাসিল' বলা হয়। আর এ বাদ না পড়াকে বলা হয় 'ইত্তিসাল'।

মুনক্বাতি' ঃ সনদের কোন এক স্তর থেকে যদি এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে যায়, তাহলে ওই হাদীসকে মুনক্বাতি' বলে। আর এ বাদ পড়াকে ইনক্বিতা' বলা হয়।

মু'আল্লাক্ব ঃ সনদের প্রথম দিক থেকে যদি কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়েন, তাহলে ওই হাদীসকে 'মু'আল্লাক্ব' বলা হয়। আর এরূপ বাদ দেওয়াকে 'তা'লীক্ব' বলা হয়। সনদ থেকে কখনও একজন বর্ণনাকারী বাদ পড়েন, আবার কখনও একাধিক বাদ পড়েন, কখনো আবার পূর্ণ সনদকে বাদ দেওয়া হয়, যেমনটি গ্রন্থকারদের রীতি রয়েছে। তাঁরা (সনদ উল্লেখ না করে) বলেন, "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ...।"

وَالتَّعْلِيْقَاتُ كَثِيْرَةٌ فِيْ تَرَاجِمِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ وَلَهَا حُكْمُ الْاِتِّصَالِ لِاَنَّهُ الْتَزَمَ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ اَنْ لَّا يَاْتِيَ اِلَّا بِالصَّحِيْحِ وَلٰكِنَّهَا لَيْسَتْ فِيْ مَرْتَبَةِ مَسَانِيْدِهٖ اِلَّا مَا ذُكِرَ مِنْهَا مُسْنَدًا فِيْ مَوْضَعٍ اٰخَرَ مِنْ كِتَابِهٖ ـ

وَقَدْ يُفَرَّقُ فِيْهَا بِاَنَّ مَا ذُكِرَ بِصِيْغَةِ الْجَزْمِ وَالْمَعْلُوْمِ كَقَوْلِهٖ قَالَ فُلَانٌ اَوْ ذَكَرَ فُلَانٌ دَلَّ عَلٰى ثُبُوْتِ اِسْنَادِهٖ عِنْدَهٗ فَهُوَ صَحِيْحٌ قَطْعًا وَمَا ذَكَرَهٗ بِصِيْغَةِ التَّمْرِيْضِ وَالْمَجْهُوْلِ كَقِيْلَ وَيُقَالُ وَذُكِرَ فَفِيْ صِحَّتِهٖ عِنْدَهٗ كَلَامٌ وَلٰكِنَّهٗ لَمَّا اَوْرَدَهٗ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ كَانَ لَهٗ اَصْلٌ ثَابِتٌ وَلِهٰذَا قَالُوْا تَعْلِيْقَاتُ الْبُخَارِيِّ مُتَّصِلَةٌ صَحِيْحَةٌ ـ

সহীহ্ বোখারী শরীফের অধ্যায়গুলোর শিরোনামে এরূপ বহু তা'লীক্ব রয়েছে। অবশ্য সেগুলো 'মুত্তাসিল' হিসেবেই বিবেচ্য। কেননা, ইমাম বোখারী রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি শুধু সহীহ হাদীসই তাঁর এ কিতাবে বর্ণনা করবেন মর্মে নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তবে, সেগুলো তাঁর কিতাবের 'মুসনাদ' (সনদসহ বর্ণিত) হাদীসসমূহের সমমর্যাদার নয়। অবশ্য, যেগুলো তাঁর এ কিতাবের অন্যত্র সনদসহ উল্লেখ করেছেন, সেগুলো 'মুসনাদ' বা সনদ সহকারে বর্ণিত হাদীসগুলোর সমমর্যাদার হবে।

এগুলোকে আবার বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করা হয়। আর তাহলো, যেসব মু'আল্লাক্ব হাদীস দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের সাথে অর্থাৎ (مَعْرُوْف) ক্রিয়ারূপ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন 'অমুক বলেছেন' বা 'অমুক উল্লেখ করেছেন', যা দ্বারা এসব হাদীসের সনদ তাঁর নিকট নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত বলে জানা যায়, তাহলে ওই হাদীস অকাট্যভাবে সহীহ। আর যেসব মু'আল্লাক্ব হাদীস দৃঢ়তা বা প্রত্যয়হীনভাবে (مَجْهُوْل) ক্রিয়ারূপ দ্বারা উল্লেখ করেছেন; যেমন قِيْلَ (কথিত আছে) يُقَالُ (বলা হয়), ذُكِرَ (উল্লেখ করা হয়েছে) ইত্যাদি, তাহলে মনে করতে হবে যে, ওই হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে তাঁর কিছু বলার আছে। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর এ (সহীহ) কিতাবে সেটা উল্লেখ করেছেন, সেহেতু একথা বুঝা যায় যে, উক্ত (মু'আল্লাক্ব) হাদীসের সনদ তাঁর নিকট প্রমাণিত আছে। এ কারণেই, তাঁরা (মুহাদ্দিসগণ) বলেছেন, বোখারীর তা'লীক্বসমূহ 'মুত্তাসিল', বিশুদ্ধ (সহীহ)।[৫]

৫. ক. উল্লেখ্য যে, হাদীসের মতনের সাথে সনদের মিলিত অংশকে 'সনদের শেষপ্রান্ত' বলা হয়। এর বিপরীতে অপর প্রান্তের অংশকে সনদের প্রারম্ভ বলা হয়।

খ. কোন হাদীস প্রত্যাখ্যাত (মারদূদ) হওয়া দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল– ১. রাভী বা বর্ণনাকারীর মধ্যে এমন দোষ-ত্রুটির সন্ধান পাওয়া, যার কারণে তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করা যায় না। আর ২. সনদ থেকে কোন রাভী বাদ পড়া। এ শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে হযরত শায়খ-ই দেহলভী (প্রণেতা মহোদয়) বলেন, যদি সনদের প্রারম্ভিক দিক থেকে রাভী বাদ পড়েন, তবে হাদীসকে 'মু'আল্লাক্ব' বলা হয়। 'তা'লীক্ব' (تعليق) থেকে নির্গত।

'মু'আল্লাক্ব'-এর তিন অবস্থা ঃ ১. শুধু প্রথম রাভী বাদ পড়া, অথবা ২. প্রথম রাভীর সাথে তাঁর সংলগ্ন কিংবা তাঁর উপরের

[পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

وَاِنْ كَانَ السُّقُوْطُ مِنْ اٰخِرِ السَّنَدِ فَاِنْ كَانَ بَعْدَ التَّابِعِيِّ فَالْحَدِيْثُ مُرْسَلٌ وَهٰذَا الْفِعْلُ اِرْسَالٌ كَقَوْلِ التَّابِعِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ يَجِيْئُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ اَلْمُرْسَلُ وَالْمُنْقَطِعُ بِمَعْنًى وَالْاِصْطِلَاحُ الْأَوَّلُ اَشْهَرُ - وَحُكْمُ الْمُرْسَلِ التَّوَقُّفُ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَآءِ - لِأَنَّهُ لَا يُدْرٰى أَنَّ السَّاقِطَ ثِقَةٌ أَوْ لَا لِأَنَّ التَّابِعِيَّ قَدْ يَرْوِىْ عَنِ التَّابِعِيِّ وَفِى التَّابِعِيْنَ ثِقَاتٌ وَغَيْرُ ثِقَاتٍ -

وَعِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ اَلْمُرْسَلُ مَقْبُوْلٌ مُطْلَقًا وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا أَرْسَلَهُ لِكَمَالِ الْوُثُوْقِ وَالْاِعْتِمَادِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِى الثِّقَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهٗ صَحِيْحًا

'মুরসাল হাদীস' ও এর বিধান

মুরসাল ঃ যদি সনদের শেষপ্রান্ত থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়েন, তাও যদি তাবে'ঈর পর হয়, তাহলে উক্ত হাদীসকে 'মুরসাল' বলে। আর এভাবে বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করাকে 'ইরসাল' বলে। যেমন, একজন তাবে'ঈ বললেন, "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।" 'মুরসাল' ও 'মুনক্বাতি' শব্দ দু'টি মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় কখনো কখনো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে পূর্বোল্লিখিত পরিভাষা (অর্থাৎ উভয়টি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া) বেশী প্রসিদ্ধ।

বিধান ঃ জুমহুর (প্রায়সব) ওলামা-ই কেরামের মতে, 'মুরসাল' হাদীসের বিধান হলো 'তাওয়াক্কুফ' (অর্থাৎ তদনুযায়ী আমল করা থেকে এবং সেটাকে শরীয়তের কোন বিধানের দলীল হিসেবে দাঁড় করানো থেকে বিরত থাকা)। কেননা, যে বর্ণনাকারী সনদ থেকে বাদ পড়েছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য কিনা তা অজানা থেকে যায়। কারণ, তাবে'ঈ কখনো তাবে'ঈ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাবে'ঈদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য উভয় ধরনের বর্ণনাকারী রয়েছেন।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এবং ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির মতে, 'মুরসাল হাদীস' শর্তহীনভাবে গ্রহণযোগ্য। তাঁদের বক্তব্য হলো, হাদীস বর্ণনাকারী আস্থা ও যথাযথ যোগ্যতার কারণেই 'ইরসাল' করে থাকেন। (অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে থাকেন।) কেননা, আলোচ্য বিষয় হলো– নির্ভরযোগ্যতা; অর্থাৎ আস্থাভাজন বর্ণনাকারী কর্তৃক সনদে কোন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করা। অতএব, সনদটি যদি তাঁর মতে বিশুদ্ধ বিবেচিত না হতো,

---

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর] রাভীও বাদ পড়া, অথবা তাঁরা দু'জনের সাথে তৃতীয় ও চতুর্থ ইত্যাদি বর্ণনাকারী বাদ পড়া, এবং ৩. গোটা সনদই বাদ দেওয়া। যেমন্ গ্রন্থ প্রণেতাগণ বাদ দিয়ে থাকেন। তাঁরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সনদ বাদ দিয়ে قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেছেন) বলে ব্যক্ত করা। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রকাশ পেলো যে, 'মু'আল্লাক্ব' খাস আর-'মুনক্বাতি' আম (ব্যাপক)। কেননা, 'মু'আল্লাক্ব'– এ সনদের শুরু থেকে বাদ পড়া বিবেচ্য, আর মুনক্বাতি'র মধ্যে এ ধরনের কোন শর্তারোপ নেই; বরং সনদের যে কোন স্থান থেকেই রাভী বাদ পড়ুন, সেটাকে মুনক্বাতি' বলা হয়। সুতরাং মু'আল্লাক্ব ও মুনক্বাতি'র মধ্যে (عموم خصوص مطلق)-এর সম্পর্ক বিরাজিত। অর্থাৎ প্রত্যেক মু'আল্লাক্ব' মুনক্বাতি'ও; কিন্তু প্রত্যেক মুনক্বাতি' মু'আল্লাক্ব নয়।

لَمْ يُرْسِلْهُ وَلَمْ يَقُلْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ اِنِ اعْتُضِدَ بِوَجْهٍ آخَرَ مُرْسَلٌ اَوْ مُسْنَدٌ وَاِنْ كَانَ ضَعِيْفًا قُبِلَ وَعَنْ أَحْمَدَ قَوْلَانِ وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا عُلِمَ أَنَّ عَادَةَ ذٰلِكَ التَّابِعِيِّ اَنْ لَّا يُرْسِلَ اِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ وَاِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يُّرْسِلَ عَنِ الثِّقَاتِ وَعَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ فَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ بِالْاِتِّفَاقِ كَذَا قِيْلَ وَفِيْهِ تَفْصِيْلٌ أَزْيَدُ مِنْ ذٰلِكَ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ فِيْ شَرْحِ الْأَلْفِيَةِ وَاِنْ كَانَ السُّقُوْطُ مِنْ اَثْنَاءِ الْاِسْنَادِ فَاِنْ كَانَ السَّاقِطُ اِثْنَيْنِ مُتَوَالِيًا يُسَمّٰى مُعْضَلًا بِفَتْحِ الضَّادِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ يُسَمّٰى مُنْقَطِعًا

তাহলে তিনি 'ইরসাল' করতেন না। আর তিনি এভাবে সরাসরি বলতেন না, "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।"

ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র মতে 'মুরসাল হাদীস' যদি অন্য কোন 'মুরসাল' বা 'মুসনাদ' হাদীস দ্বারা শক্তিশালী হয়, যদিও তা দুর্বল হয়, তাহলে উক্ত 'মুরসাল হাদীস' গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছেঃ এক অভিমত অনুসারে গ্রহণযোগ্য হবে, অপর অভিমত অনুসারে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এসব অভিমত তখনই প্রযোজ্য, যখন জানা যাবে যে, উক্ত তাবে'ঈর স্বভাব হচ্ছে তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বেলায়ই 'ইরসাল' করে থাকেন। আর যদি নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য নির্বিশেষে সকলের বেলায় 'ইরসাল' করা তাঁর অভ্যাস হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এর বিধান হলো 'তাওয়াক্বুফ' করা; যেমনিভাবে (হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালার গ্রন্থসমূহে) উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আরো সুবিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। আল্লামা সাখাভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর 'শরহুল আল্‌ফিয়্যাহ'য় তা উল্লেখ করেছেন।

মু'দ্বাল হাদীসের সংজ্ঞা

মু'দ্বাল ঃ যদি সনদের মধ্যভাগ থেকে কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়েন, এখন যদি একই স্থান থেকে পরপর দুইজন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে, তাহলে উক্ত হাদীসকে 'মু'দ্বাল' বলে; (مُعْضَل শব্দটি) ض বর্ণে যবর সহকারে পাঠ্য।

মুনক্বাতি' ঃ আর যদি একজন বা একাধিক রাভী (বর্ণনাকারী) একাধিক স্থান থেকে বাদ পড়েন, তাহলে উক্ত হাদীসকে মুনক্বাতি' বলে।

وَعَلٰى هٰذَا يَكُوْنُ الْمُنْقَطِعُ قِسْمًا مِنْ غَيْرِ الْمُتَّصِلِ وَقَدْ يُطْلَقُ الْمُنْقَطِعُ بِمَعْنٰى غَيْرِ الْمُتَّصِلِ مُطْلَقًا شَامِلًا لِّجَمِيْعِ الْاَقْسَامِ وَبِهٰذَا الْمَعْنٰى يُجْعَلُ مُقْسَمًا ـ

وَيُعْرَفُ الْاِنْقِطَاعُ وَسُقُوْطُ الرَّاوِيِّ بِمَعْرِفَةِ عَدَمِ الْمُلَاقَاةِ بَيْنَ الرَّاوِيِّ وَالْمَرْوِيِّ عَنْهُ اِمَّا بِعَدَمِ الْمُعَاصَرَةِ اَوْ عَدَمِ الْاِجْتِمَاعِ وَالْاِجَازَةِ عَنْهُ بِحُكْمِ عِلْمِ التَّارِيْخِ الْمُبَيِّنِ لِمَوَالِيْدِ الرُّوَاةِ وَوَفِيَاتِهِمْ وَتَعْيِيْنِ اَوْقَاتِ طَلَبِهِمْ وَارْتِحَالِهِمْ وَبِهٰذَا صَارَ عِلْمُ التَّارِيْخِ اَصْلًا وَعُمْدَةً عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ ـ

এ হিসেবে মুনক্বাতি' হাদীস 'গায়র মুত্তাসিল' (মুত্তাসিল নয় এমন) হাদীসের প্রকারগুলো থেকে একটি প্রকার হবে। আবার কখনো মুনক্বাতি' শব্দটি নিঃশর্তভাবে 'গায়র মুত্তাসিল' অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা গায়রে মুত্তাসিলের সকল প্রকারকে শামিল করে। এ অর্থের দিক থেকে মুনক্বাতি' বিভাজ্য (مُقْسَم) হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইনক্বিতা' বা সনদের মধ্যস্থল থেকে কোন রাভী বাদ পড়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পন্থা হলো বর্ণনাকারী এবং যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে পরস্পরের দেখা সাক্ষাত না হওয়া। তাও হয়তো উভয়ে সমযুগীয় না হওয়া কিংবা পরস্পর মিলিত না হওয়া অথবা হাদীস বর্ণনার অনুমতি লাভ না করার কারণে হয়। এ সব বিষয়ে অবগত হওয়া যায় এমন ইতিহাস শাস্ত্রের ফয়সালা দ্বারা, যা রাভীদের জন্মকাল, ওফাতের সময়, শিক্ষালাভ এবং তাঁদের ভ্রমণ-পরিভ্রমণের সময়কাল বর্ণনা করে। এ কারণেই ইতিহাস শাস্ত্র মুহাদ্দিসগণের নিকট মৌলিক এবং নির্ভরযোগ্য হিসেবে পরিগণিত।[৬]

৬. নিম্নে প্রদর্শিত নক্‌শা এ প্রকারভেদকে অধিকতর স্পষ্ট করে দেয়–

হাদীস
- মুত্তাসিল
- মুনক্বাতি'
  - মু'আল্লাক্ব (সনদের প্রারম্ভ থেকে 'রাভী' বা বর্ণনাকারী বাদ পড়া)
  - মুরসাল (সনদের শেষ প্রান্ত থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়া)
  - সনদের মধ্যভাগ থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়লে
    - দু'জন বর্ণনাকারী পরপর একস্থান থেকে বাদ পড়লে 'মু'দ্বাল'
    - এক বা একাধিক বর্ণনাকারী একাধিক স্থান থেকে বাদ পড়লে 'মুনক্বাতি'

নোট ঃ 'মু'দ্বাল' এবং 'মুনক্বাতি'র মধ্যে (عموم مطلق)-এর সম্পর্ক বিরাজমান। অর্থাৎ 'মু'দ্বাল হচ্ছে اخص ও মুনক্বাতি' হচ্ছে اعم।

وَمِنْ أَقْسَامِ الْمُنْقَطِعِ الْمُدَلَّسُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَيُقَالُ لِهٰذَا الْفِعْلِ التَّدْلِيسُ وَلِفَاعِلِهِ مُدَلِّسٌ بِكَسْرِ اللَّامِ وَصُورَتُهُ أَنْ لَّا يُسَمِّيَ الرَّاوِيُّ شَيْخَهُ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ بَلْ يَرْوِي عَمَّنْ فَوْقَهُ بِلَفْظٍ يُوهِمُ السَّمَاعَ وَلَا يَقْطَعُ كِذْبًا كَمَا يَقُولُ عن فُلَانٍ وَقَالَ فُلَانٌ - وَالتَّدْلِيسُ فِي اللُّغَةِ كِتْمَانُ عَيْبِ السِّلْعَةِ فِي الْبَيْعِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِّنَ الدَّلَسِ وَهُوَ اخْتِلَاطُ الظَّلَامِ وَاشْتِدَادُهُ سُمِّيَ بِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْخِفَآءِ -

قَالَ الشَّيْخُ وَحُكْمُ مَنْ يَّثْبُتُ عَنْهُ التَّدْلِيسُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ قَالَ الشُّمُنِّيُّ التَّدْلِيسُ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ - رُوِيَ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ

তাদ্লীস ও এর বিধান

হাদীস-ই মুনক্বাতি'-এর এক প্রকার হলো 'মুদাল্লাস'; (مُدَلَّس শব্দটি) 'মীম' বর্ণে পেশ আর 'লাম' বর্ণে তাশ্দীদযুক্ত যবরসহ পাঠ্য। আর এ কাজটিকে বলা হয় 'তাদলীস'। এর কর্তাকে 'মুদাল্লিস' বলে। 'লাম' বর্ণে তাশ্দীদ্যুক্ত যের সহকারে পাঠ্য। 'তাদলীস'র রূপরেখা হচ্ছে রাভী যে শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাঁকে সূত্রে উল্লেখ না করা, বরং ঊর্ধ্বতন কোন শায়খ থেকে এমন শব্দে হাদীস বর্ণনা করা, যা দ্বারা সে তাঁর নিকট থেকে সরাসরি হাদীস গ্রহণ করেছেন মর্মে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, আবার মিথ্যা বলেও সুস্পষ্ট বা অকাট্যভাবে প্রকাশ করে না। যেমন বললেন, عَنْ فُلَانٍ (আমি অমুক থেকে বর্ণনা করেছি) এবং قَالَ فُلَانٌ (অমুক বলেছেন)। (কিন্তু سَمِعْتُ فُلَانًا أَوْ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ অর্থাৎ 'আমি অমুক থেকে শুনেছি কিংবা অমুক আমাকে খবর দিয়েছেন' বলেন নি। (تدليس)-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– বেচা-কেনার মধ্যে পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা। কারো কারো মতে تدليس শব্দটি دَلَس থেকে নির্গত; যার অর্থ অন্ধকার গাঢ় এবং ঘন হওয়া। (خفاء) বা গোপনীয়তার অর্থে উভয় শব্দ শরীক থাকার কারণে এ নামকরণ করা হয়েছে। (অর্থাৎ অন্ধকারে প্রতিটি জিনিষ গোপন থাকে। আর 'তাদলীস'-এও শায়খকে গোপন করা হয়। সুতরাং আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে পরস্পরিক সামঞ্জস্যও হলো)

শায়খ (উসূল-ই হাদীসবিদ ইবনে হাজর আস্ক্বালানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) বলেন, যে রাভী থেকে 'তাদলীস' প্রমাণিত হবে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না; হাঁ যদি তিনি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন (যেমন سَمِعْتُ ও حَدَّثَنِيْ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন), তাহলে সেটা গ্রহণ করা হবে।

আল্লামা (তক্বীউদ্দীন আহমদ) শুমুন্নী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি (ওফাত ৮৭২ হিজরী) বলেন, ইমামগণের মতে, 'তাদলীস' হারাম। ইমাম ওয়াকী' রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَا يَحِلُّ تَدْلِيْسُ الثَّوْبِ فَكَيْفَ بِتَدْلِيْسِ الْحَدِيْثِ وَبَالَغَ شُعْبَةُ فِي ذَمِّهٖ۔
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قُبُوْلِ رِوَايَةِ الْمُدَلِّس فَذَهَبَ فَرِيْقٌ مِّنْ اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ اِلٰى أَنَّ التَّدْلِيْسَ جُرْحٌ وَاِنَّ مَنْ عُرِفَ بِهٖ لَا يُقْبَلُ حَدِيْثُهٗ مُطْلَقًا وَقِيْلَ يُقْبَلُ وَذَهَبَ الْجُمْهُوْرُ اِلَى قُبُوْلِ تَدْلِيْسِ مَنْ عُرِفَ أَنَّهٗ لَا يُدَلِّسُ اِلَّا عَنْ ثِقَةٍ كَابْنِ عُيَيْنَةَ وَاِلٰى رَدِّ مَنْ كَانَ يُدَلِّسُ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ حَتّٰى يَنُصَّ عَلٰى سَمَاعِهٖ بِقَوْلِهٖ سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنَا أَوْ اَخْبَرَنَا۔
وَالْبَاعِثُ عَلَى التَّدْلِيْسِ قَدْ يَكُوْنُ لِبَعْضِ النَّاسِ غَرَضٌ فَاسِدٌ مِثْلُ اِخْفَاءِ السَّمَاعِ مِنَ الشَّيْخِ لِصِغَرِ سِنِّهٖ أَوْ عَدَمِ شُهْرَتِهٖ وَجَاهِهٖ عِنْدَ النَّاسِ وَالَّذِيْ

কাপড় বিক্রির ক্ষেত্রে যেখানে 'তাদ্‌লীস' (দোষ-ত্রুটি গোপন করা) হারাম, সেখানে হাদীসের ক্ষেত্রে 'তাদলীস' কি করে বৈধ হতে পারে? (অথচ প্রথমোক্তটি পার্থিব বিষয় আর এ শেষোক্তটি দ্বীনের অন্যতম মৌলিক বিষয়।) ইমাম শো'বাহ রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাদলীসের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

'মুদাল্লিস'র হাদীস গ্রহণ করা প্রসঙ্গে: বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম 'মুদাল্লিস রাভী'র হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং হাদীস বিশারদ এবং ফিক্বাহ্‌বিদদের একটি দল এ অভিমত দিয়েছেন যে, তাদলীস একটি দোষ, যার সম্পর্কে এরূপ দোষ প্রমাণিত হবে, তার হাদীস মোটেই গ্রহণ করা যাবে না। আর কেউ কেউ বলেছেন, গ্রহণ করা যাবে। জুমহুর বা অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, যে রাভীর ব্যাপারে একথা জানা যাবে যে, তিনি শুধু নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন রাভী থেকেই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদলীস করেন, তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন ইবনে ওয়ায়নাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। আর যারা দুর্বল ও দুর্বল নন এমন সবার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাদলীস করেন, তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা হবে। অবশ্য যদি তিনি سَمِعْتُ (আমি শুনেছি), حَدَّثَنَا (আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) অথবা اَخْبَرَنَا (আমাদেরকে হাদীসের খবর দিয়েছেন) ইত্যাদি শব্দে হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। (কেননা, এ'তে সুস্পষ্টভাবে ইত্তিসাল প্রমাণিত হয়, ইনক্বিতা' প্রত্যাখ্যাত হয় এবং বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা পাওয়া যায়।)

'তাদলীস' করার পেছনে কোন কোন রাভীর উদ্দেশ্য ভাল থাকে না। যেমন শায়খের বয়সের স্বল্পতা এবং মানুষের কাছে তাঁর পরিচিতি ও বংশীয় মর্যাদার সুপ্রসিদ্ধির অনুপস্থিতির কারণে তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করার কথা গোপন করা।

وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الْأَكَابِرِ لَيْسَ لِمِثْلِ هٰذَا بَلْ مِنْ جِهَةِ وُثُوقِهِمْ لِصِحَّةِ الْحَدِيْثِ وَاسْتِغْنَاءٍ بِشُهْرَةِ الْحَالِ قَالَ الشُّمُنِّيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَّكُوْنَ قَدْ سَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ الثِّقَاتِ وَعَنْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ فَاسْتَغْنٰى بِذِكْرِهٖ عَنْ ذِكْرِ أَحَدِهِمْ أَوْ ذِكْرِ جَمِيْعِهِمْ لِتَحَقُّقِهٖ بِصِحَّةِ الْحَدِيْثِ فِيْهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُرْسِلُ۔

وَاِنْ وَقَعَ فِىْ اِسْنَادٍ أَوْمَتْنٍ اِخْتِلَافٌ مِّنَ الرُّوَاةِ بِتَقْدِيْمٍ وَتَاخِيْرٍ أَوْ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ أَوْ اِبْدَالِ رَاوٍ مَكَانَ رَاوٍ آخَرَ اَوْ مَتْنٍ مَكَانَ مَتْنٍ أَوْ تَصْحِيْفٍ فِىْ اَسْمَاءِ السَّنَدِ أَوْ أَجْزَاءِ الْمَتْنِ أو بِاخْتِصَارٍ أَوْ حَذْفٍ أَوْ مِثْلِ ذٰلِكَ فَالْحَدِيْثُ مُضْطَرِبٌ فَاِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فِيْهَا وَاِلَّا فَالتَّوَقُّفُ۔

অবশ্য, কোন কোন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস[৭] থেকে যে তাদলীস সংঘটিত হয়েছে, তা পূর্বোল্লিখিত তাদলীসের মত নয়; বরং তাঁরা তাদলীস করেছেন হাদীসের বিশুদ্ধতার উপর পূর্ণ আস্থা এবং হাদীসের অবস্থার সুপ্রসিদ্ধিকে যথেষ্ট মনে করেই।

আল্লামা শুমুন্নী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, এমনও হতে পারে যে, তাদলীসকারী একদল নির্ভরযোগ্য রাভী থেকে উক্ত হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং একজন বিশেষ ব্যক্তি থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তার কাছে হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হওয়ার কারণে তিনি উক্ত রাভীর নাম উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। ফলে নির্ভরযোগ্য রাভীদের কোন একজনের নাম কিংবা সকলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন নি। যেমনটি 'মুরসিল রাভী' করে থাকেন।

মুদ্বতারাব হাদীস ও এর বিধান

মুদ্বত্বারাবঃ যদি হাদীসের সনদ ও মতনের মধ্যে রাভীদের বিরোধ সংঘটিত হয়, তাহলে উক্ত হাদীসকে 'মুদ্বত্বারাব' বলে। আর এ 'বিরোধ' হয় (হাদীসের সনদ বা মতনের অংশ বিশেষকে) অগ্র-পশ্চাৎ করা, কম বেশী করা, (সনদ ও মতনের গরমিল, যেমন) এক রাভীর স্থানে অন্য রাভী, অথবা এক মতনের স্থানে অন্য মতন উল্লেখ করা অথবা সনদে রাভীদের নাম বা মতনের কোন অংশে বিকৃতি সাধন করা অথবা সংক্ষেপ বা বিলুপ্ত করা অথবা অনুরূপ (কিছু) ঘটার কারণে এমন বিরোধপূর্ণ হাদীসকে 'মুদ্বত্বারাব' (مُضْطَرِب) বলা হয়।

বিধান ঃ এরূপ (مُضْطَرِب) হাদীসের মধ্যে যদি (تَطْبِيْق) দেওয়া (সামঞ্জস্য বিধান করা) সম্ভব হয়, তাহলে তদনুযায়ী (ওই হাদীস অনুসারে) আমল করা যাবে। অন্যথায় توقف বা তদনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৭. যেমন– হযরত ইবনে ওয়ায়নাহ্, হযরত সুফিয়ান সাওরী ও হযরত আ'মাশ রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমুখ।

وَاِنْ اَدْرَجَ الرَّاوِىُّ كَلَامَهٗ اَوْ كَلَامَ غَيْرِهٖ مِنْ صَحَابِيٍّ اَوْ تَابِعِيٍّ مَثَلًا لِغَرَضٍ مِّنَ الْاَغْرَاضِ كَبَيَانِ اللُّغَةِ اَوْ تَفْسِيْرٍ لِلْمَعْنٰى اَوْ تَقْيِيْدٍ لِلْمُطْلَقِ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ فَالْحَدِيْثُ مُدْرَجٌ-

فَصْلٌ : تَنْبِيْهٌ- وَهٰذَا الْمَبْحَثُ يَنْجَرُّ اِلٰى رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَنَقْلِهٖ بِالْمَعْنٰى وَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ فَالْاَكْثَرُوْنَ عَلٰى اَنَّهٗ جَائِزٌ مِمَّنْ هُوَ عَالِمٌ بِالْعَرَبِيَّةِ وَمَاهِرٌ فِىْ اَسَالِيْبِ الْكَلَامِ وَعَارِفٌ بِخَوَاصِّ التَّرَاكِيْبِ وَمَفْهُوْمَاتِ الْخِطَابِ لِئَلَّا يُخْطِئَ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ- وَقِيْلَ جَائِزٌ فِىْ مُفْرَدَاتِ الْاَلْفَاظِ دُوْنَ الْمُرَكَّبَاتِ وَقِيْلَ جَائِزٌ لِّمَنِ اسْتَحْضَرَ اَلْفَاظَهٗ حَتّٰى يَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ وَقِيْلَ جَائِزٌ لِّمَنْ يَّحْفَظُ

মুদ্‌রাজ হাদীস

আর যদি রাভী (হাদীস বর্ণনাকারী নবী করীমের হাদীসের মধ্যে) নিজের কিংবা অন্য কারো উক্তি, যেমন সাহাবী কিংবা তাবে'ঈর উক্তি, লিবিপদ্ধ করেন, তাও উদ্দেশ্যাবলী থেকে কোন উদ্দেশ্যে এমনটি করেন, যেমন কোন শব্দের আভিধানিক অর্থ কিংবা কোন অর্থের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা, অথবা কোন শর্তহীন শব্দকে শর্তযুক্ত করা, কিংবা অনুরূপ কিছু করা, তাহলে উক্ত হাদীসকে 'মুদ্‌রাজ' বলা হয়।[৮]

হাদীসের অর্থভিত্তিক বর্ণনা প্রসঙ্গে

পরিচ্ছেদ ঃ জ্ঞাতব্য

আমাদের এ আলোচনার গতি (رِوَايَةُ الْحَدِيْثِ وَنَقْلُهٗ بِالْمَعْنٰى) অর্থাৎ হাদীসের হুবহু শব্দ উল্লেখ না করে শুধু মর্মার্থ নিজের ভাষায় বর্ণনা করা (সংক্ষেপে, অর্থভিত্তিক বর্ণনা করা) সম্পর্কিত আলোচনার দিকে। 'অর্থভিত্তিক বর্ণনা' (رِوَايَةُ الْحَدِيْثِ بِالْمَعْنٰى)-এর সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে ঃ

অধিকাংশের অভিমত হচ্ছে- এটা ওই ব্যক্তির জন্য বৈধ, যে আরবী ভাষায় বিজ্ঞ, বক্তব্যের রীতি-নীতি ও রচনা শৈলীতে প্রাজ্ঞ, বাক্যের গঠন ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যাদি এবং বক্তব্যের মর্মার্থ ও মাহাত্ম্য বর্ণনার ক্ষেত্রে কমবেশী করার আশ্রয় নিয়ে ভুলে নিপতিত না হয়।

কারো কারো মতে, একক শব্দাবলীর ক্ষেত্রে (শাব্দিক মর্মার্থ বর্ণনা করা) বৈধ, কিন্তু বাক্যের ক্ষেত্রে তা বৈধ নয়।

কেউ কেউ বলেন, অর্থভিত্তিক বর্ণনা ওই ব্যক্তির জন্য বৈধ, যে হাদীসের শব্দগুলো মুখস্থ করেছে, এমনকি সে প্রয়োজনে হাদীসের মূল শব্দ স্মরণে এনে তা প্রয়োগ করতে পারে।

কেউ কেউ বলেন,

৮. মুদরাজের বিধান হচ্ছে- ইচ্ছাকৃত ইদরাজ হারাম। অবশ্য, বিরল শব্দাবলীর ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে হলে জায়েয।

مَعَانِى الْحَدِيْثِ وَنَسِىَ اَلْفَاظَهَا لِلضُّرُوْرَةِ فِىْ تَحْصِيْلِ الْاَحْكَامِ وَاَمَّا مَنِ اسْتَحْضَرَ الْاَلْفَاظَ فَلَا يَجُوْزُ لَهُ لِعَدَمِ الضُّرُوْرَةِ۔

وَهٰذَا الْخِلَافُ فِى الْجَوَازِ وَعَدَمِهٖ اَمَّا اَوْلَوِيَّةُ رِوَايَةِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيْهَا فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهٖ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَوَعَاهَا فَاَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ ... اَلْحَدِيْثَ وَالنَّقْلُ بِالْمَعْنٰى وَاقِعٌ فِى الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَغَيْرِهَا۔

وَالْعَنْعَنَةُ رِوَايَةُ الْحَدِيْثِ بِلَفْظِ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ وَ الْمُعَنْعَنُ حَدِيْثٌ رُوِىَ بِطَرِيْقِ الْعَنْعَنَةِ وَيُشْتَرَطُ فِى الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصَرَةُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَاللُّقِىُّ عِنْدَ

হাদীস থেকে বিধি-বিধান (আহকাম) আহরণ করা আবশ্যক হলে (رِوَايَةُ الْحَدِيْثِ بِالْمَعْنٰى) ওই ব্যক্তির জন্য জায়েয হবে, যার হাদীসের অর্থ স্মরণ আছে, কিন্তু মূল শব্দ ভুলে গেছে।

অতএব, যার মূল শব্দ স্মরণ রয়েছে তার জন্য হাদীসের অর্থভিত্তিক বর্ণনা (رِوَايَةُ الْحَدِيْثِ بِالْمَعْنٰى) বৈধ হবে না। কারণ, তার প্রয়োজন নেই।[৯]

এ মতানৈক্য জায়েয-নাজায়েয সম্বন্ধে; কিন্তু নিজের কোনরূপ যোগ্যতা প্রয়োগ ছাড়াই মূল শব্দে হাদীস বর্ণনা করা উত্তম হবার ক্ষেত্রে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা হর্ষোৎফুল্ল (তরুতাজা) রাখুন ওই ব্যক্তিকে, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, অতঃপর তা যথার্থরূপে মুখস্থ বা সংরক্ষণ করেছে এবং (অপরের কাছে) তেমনিভাবে বর্ণনা করেছে, যেমন সে শুনেছে।" – আল হাদীস। অবশ্য, (رِوَايَةُ الْحَدِيْثِ بِالْمَعْنٰى) (অর্থভিত্তিক বর্ণনা) সিহাহ সিত্তাহ্ (বিশুদ্ধ হাদীসের ছয়টি) গ্রন্থসমূহে ও অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে।

হাদীস-ই মু'আন্'আন ও এর বিধান

(اَلْعَنْعَنَه) 'আন'আনাহ্' বলা হয়– (عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ) (অমুক থেকে, তিনি অমুক থেকে) শব্দাবলী প্রয়োগ করে হাদীস বর্ণনা করা। আর 'মু'আন'আন' হচ্ছে এমন হাদীস, যা 'আন'আনাহ্'র পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

'আন'আনাহ্' পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস (মুত্তাসিলের পর্যায়ভুক্ত হওয়া)'র জন্য কয়েকটি পূর্বশর্ত রয়েছে–

ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র মতে, راوى (বর্ণনাকারী) বা ছাত্র এবং مروى عنه (যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে) বা শিক্ষক উভয়ে সমকালীন হওয়া পূর্বশর্ত। আর (ছাত্র ও শিক্ষকের) জীবদ্দশায় সাক্ষাৎ

---

৯. বিনা প্রয়োজনে হাদীসের মূল শব্দগুলো বাদ দিয়ে হাদীসের মর্মার্থ নিজের ভাষায় বর্ণনা করা তাঁদের মতে বৈধ নয়। কারণ, রসূলে পাকের ব্যবহৃত শব্দাবলীই সব দিক দিয়ে উত্তম ও তাৎপর্যবহ।

الْبُخَارِيّ وَالْأَخْذُ عِنْدَ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ وَمُسْلِمٌ رَدَّ عَلَى الْفَرِيْقَيْنِ اَشَدَّ الرَّدِّ وَبَالَغَ فِيْهِ وَعَنْعَنَةُ الْمُدَلِّسِ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ وَكُلُّ حَدِيْثٍ مَرْفُوْعٍ سَنَدُهُ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُسْنَدٌ هٰذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّىْ كُلَّ مُتَّصِلٍ مُسْنَدًا وَاِنْ كَانَ مَوْقُوْفًا أَوْ مَقْطُوْعًا وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّى الْمَرْفُوْعَ مُسْنَدًا وَاِنْ كَانَ مُرْسَلاً أَوْ مُعْضَلاً أَوْ مُنْقَطِعًا-

فَصْلٌ : وَمِنْ اَقْسَامِ الْحَدِيْثِ اَلشَّاذُّ وَالْمُنْكَرُ وَالْمُعَلَّلُ وَالشَّاذُ فِى اللُّغَةِ مَنْ تَفَرَّدَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَخَرَجَ مِنْهَا وَفِى الْاِصْطِلَاحِ مَارُوِىَ مُخَالِفًا لِّمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ رُوَاتُهُ ثِقَةً فَهُوَ مَرْدُوْدٌ وَاِنْ كَانَ ثِقَةً فَسَبِيْلُهُ التَّرْجِيْحُ

ইমাম বোখারীর মতে, প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

অপর একদল মুহাদ্দিসের মতে, ছাত্র কর্তৃক শিক্ষক থেকে হাদীস গ্রহণ প্রমাণিত হওয়া পূর্বশর্ত। ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ উভয় পক্ষের দাবী ও যুক্তির প্রচণ্ডভাবে খণ্ডন করেছেন এবং তাতে তিনি অতিশয়তা অবলম্বন করেছেন।

'মুদাল্লিস রাভী'র 'আনআনাহ্ পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

'মুসনাদ' হাদীসের সংজ্ঞা

মুসনাদ ঃ যেসব মারফূ' হাদীসের সনদ মুত্তাসিল, তাকে 'মুসনাদ' বলা হয়। এটাই সুপ্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য অভিমত।

কেউ কেউ প্রত্যেক 'মুত্তাসিল হাদীস'কে 'মুসনাদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন, যদিও তা 'মাওকূফ' কিংবা মাক্বতূ' হয়।

কেউ কেউ আবার মারফূ' হাদীসকে 'মুসনাদ' নামে আখ্যা দিয়েছেন– যদিও তা 'মুরসাল', 'মু'দ্বাল' কিংবা 'মুনক্বাতি'ও হয়।

পরিচ্ছেদ ঃ হাদীসের কয়েকটা প্রকার

হাদীসের প্রকারভেদের মধ্যে 'শায', 'মুন্‌কার' এবং 'মু'আল্লাল'ও রয়েছে।

শায ঃ আভিধানিক অর্থে 'শায' হলো সে-ই, যে দল ছেড়ে একাকী হয়েছে এবং দল থেকে বের হয়ে গেছে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় 'শায' এমন হাদীসকে বলে, যা নির্ভরযোগ্য রাভীদের বর্ণিত হাদীসের বিরোধিতা করে বর্ণনা করা হয়েছে। 'শায' হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যদি সিক্বাহ বা আস্থাভাজন না হন, তাহলে সেটা পরিত্যাজ্য। আর রাভীগণ যদি সিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য) হন, তাহলে সমাধানের পথ হচ্ছে এগুলোর একটাকে প্রাধান্য দেওয়া–

بِمَزِيْدِ حِفْظٍ وَضَبْطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ وَوُجُوْهٍ أُخَرَ مِنَ التَّرْجِيْحَاتِ فَالرَّاجِحُ يُسَمّٰى مَحْفُوْظًا وَالْمَرْجُوْحُ شَاذًّا وَالْمُنْكَرُ حَدِيْثٌ رَوَاهُ ضَعِيْفٌ مُخَالِفٌ لِّمَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ وَمُقَابِلُهُ الْمَعْرُوْفُ فَالْمُنْكَرُ وَالْمَعْرُوْفُ كِلَا رَاوِيْهِمَا ضَعِيْفٌ وَاَحَدُهُمَا أَضْعَفُ مِنَ الْاٰخَرِ وَفِي الشَّاذِّ وَالْمَحْفُوْظِ قَوِيٌّ أَحَدُهُمَا أَقْوٰى مِنَ الْاٰخَرِ وَالشَّاذُّ وَالْمُنْكَرُ مَرْجُوْحَانِ وَالْمَحْفُوْظُ وَالْمَعْرُوْفُ رَاجِحَانِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوْا فِي الشَّاذِّ وَالْمُنْكَرِ قَيْدَ الْمُخَالَفَةِ لِرَاوٍ اٰخَرَ قَوِيًّا كَانَ أَوْ ضَعِيْفًا وَقَالُوا الشَّاذُّ مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ وَتَفَرَّدَ بِهٖ وَلَا يُوْجَدُ لَهٗ اَصْلٌ مُوَافِقٌ وَمُعَاضِدٌ لَهٗ وَهٰذَا صَادِقٌ عَلٰى فَرْدِ ثِقَةٍ صَحِيْحٍ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوْا

রাভীর স্মরণশক্তি ও আয়ত্বকরণের আধিক্য, সংখ্যার প্রাচুর্য এবং প্রাধান্য দেওয়ার অন্যান্য পন্থা বা পদ্ধতির ভিত্তিতে। সুতরাং এমতাবস্থায় প্রাধান্যপ্রাপ্ত হাদীস (الراجح)-কে বলা হয় 'মাহফূয' আর যা প্রাধান্য পায়নি (مرجوح) সেটাকে বলা হয় 'শায'।

মুনকার ও মা'রূফ হাদীসের সংজ্ঞা

মুনকার ঃ এটা এমন হাদীস, যাকে কোন দুর্বল রাভী এমন রাভীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন, যার চেয়ে তিনি অধিকতর দুর্বল।

মা'রূফ ঃ মুন্‌কারের বিপরীত হাদীসকে 'মা'রূফ' বলে।

সুতরাং (একথা সুস্পষ্ট হলো যে), 'মুনকার' ও 'মা'রূফ' উভয় হাদীসের রাভী দ্ব'ঈফ বা দুর্বল। তবে তাঁদের উভয়ের একজন অপরজনের তুলনায় অধিক দুর্বল। অপর দিকে, 'শায' ও 'মাহফূয' উভয় প্রকার হাদীসের রাভী শক্তিমান (গ্রহণযোগ্য)। তবে তাঁদের উভয়ের মধ্যে একজন অপরজন অপেক্ষা বেশী শক্তিমান (গ্রহণযোগ্য)। অতএব, 'শায' ও 'মুনকার' উভয় প্রকারের হাদীস হলো প্রধান্যহীন (مرجوح) আর 'মাহফূয' ও 'মা'রূফ' হলো প্রাধান্যপ্রাপ্ত (راجح)।

কেউ কেউ 'শায' ও 'মুনকার' হাদীসের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে অন্য কোন দুর্বল কিংবা সবল রাভীর বিরোধিতার শর্তারোপ করেন নি। তাঁরা বলেন, 'শায' হচ্ছে ওই হাদীস, যা কোন নির্ভরযোগ্য রাভী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর অনুকূলে তা অন্য কোন সনদে পাওয়া যায় নি, যা সেটার অনুরূপ কিংবা সমর্থনকারী হয়। এটা কোন সহীহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য রাভীর এককভাবে বর্ণিত সনদের বেলায় প্রযোজ্য।

আবার কেউ কেউ 'শায' হাদীসের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে রাভীর নির্ভরযোগ্যতা ও (বর্ণনার ক্ষেত্রে অন্য রাভীর) বিরোধিতা কোনটাই বিবেচনায় আনেন নি।

الثِّقَةَ وَلَا الْمُخَالَفَةَ وَكَذٰلِكَ الْمُنكَرُ لَمْ يَخُصُّوهُ بِالصُّوْرَةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَسَمُّوا حَدِيْثَ الْمَطْعُوْنِ بِفِسْقٍ أَوْ فَرْطِ غَفْلَةٍ وَكَثْرَةِ غَلَطٍ مُنْكَرًا وَهٰذِهٖ اِصْطَلَاحَاتٌ لَا مَشَاحَةَ فِيْهِ۔ وَالْمُعَلَّلُ بِفَتْحِ اللَّامِ اِسْنَادٌ فِيْهِ عِلَلٌ وَأَسْبَابٌ غَامِضَةٌ خَفِيَّةٌ قَادِحَةٌ فِى الصِّحَّةِ يَتَنَبَّهُ لَهَا الْحُذَّاقُ الْمَهَرَةُ مِنْ أَهْلِ هٰذَا الشَّأْنِ كَاِرْسَالٍ فِى الْمَوْصُوْلِ وَوَقْفٍ فِى الْمَرْفُوْعِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَقَدْ يُقْتَصَرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّلِ بِكَسْرِ اللَّامِ عَنْ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلٰى دَعْوَاهُ كَالصَّيْرَفِيِّ فِى نَقْدِ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ۔

অনুরূপ, 'মুনকার হাদীস'কে তাঁরা উপরোক্ত কাঠামো (অর্থাৎ সংজ্ঞায় বর্ণিত ধরন-প্রকৃতি)'র সাথে সীমাবদ্ধ করেন নি; বরং 'ফিস্‌ক্ব' (পাপাচার) এবং অতিরিক্ত অসর্তকতা ও মাত্রাতিরিক্ত ভুলের অভিযোগে অভিযুক্ত রাভীর বর্ণিত হাদীসকে তাঁরা 'মুনকার' নামে অভিহিত করেছেন। এগুলো বিভিন্ন পরিভাষা। আর পরিভাষার ক্ষেত্রে কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ থাকে না।[১০]

মু'আল্লাল হাদীসের সংজ্ঞা

মু'আল্লাল হাদীস ঃ مُعَلَّل - لام - এ যবর সহকারে, এমন (হাদীসকে বলা হয়, যার) সনদের মধ্যে হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে দোষারোপকারী, অস্পষ্ট ও লুক্কায়িত এমন কারণ ও উপকরণাদি রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে এ শাস্ত্রের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল অবহিত হতে পারেন। যেমন 'মুত্তাসিল' হাদীসের মধ্যে ইসরাল করা, মারফূ' সনদের মধ্যে ওয়াক্বফ্ করা (মরফূ' সনদকে মাওকূফ করা) ইত্যাদি। কখনো কখনো মু'আল্লিল, لام -এর বর্ণ যের সহকারে পাঠ্য (অর্থাৎ মুআল্লাল সনদ নির্ণয়কারী মুহাদ্দিস)'র বক্তব্য তার দাবীর সপক্ষে দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হন। যেমন মুদ্রা ব্যবসায়ী স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রা পরখ করতে অক্ষম হয়।

---

১০. অথবা এভাবে বলা যায়– 'মুনকার' হচ্ছে ওই হাদীস, যার বর্ণনাকারী (রাভী) অধিকতর দুর্বল (আদ্ব'আফ), আর তার বর্ণনা (রেওয়ায়ত) ওই হাদীসের বিপরীত, যার বর্ণনাকারী 'দুর্বল' (ضعيف)। দু'টি বর্ণনা যখন পরস্পর এমনই বিরোধপূর্ণ হয় যে, উভয়ের একটির রাভী তো দুর্বল-ই এবং অপরটির কোন রাভী অধিকতর দুর্বল। অধিকতর দুর্বল রাভীর হাদীসকে 'মুনকার' আর সেটার বিপরীতে (অধিকতর কম) দুর্বল রাভীর হাদীসকে 'মা'রূফ' বলা হয়। উল্লেখ্য, 'মুনকার ও মা'রূফ– উভয় প্রকার হাদীসের বর্ণনাকারী দুর্বলই হন, কিন্তু 'মুন্‌কার'-এর রাভী 'মারূফ'-এর রাভী অপেক্ষা অধিকতর দুর্বল হন।

অপরদিকে, 'মাহফূয্' ও 'শায'- উভয়ের রাভী 'সিক্বাহ্' (নির্ভরযোগ্য) হয়ে থাকেন। কিন্তু 'মাহফূয'-এর রাভী অধিকতর নির্ভরযোগ্য হন 'শায'র রাভী অপেক্ষা। অতএব, সব মিলিয়ে এ চার ধরনের হাদীস হলো। ওইগুলোর রাভীগণের দু'টি দল হলো– এক. সিক্বাহ্ বা নির্ভরযোগ্য দল, অপরটি দূর্বলের দল। ওই উভয় দলের মধ্যে প্রাধান্য

[পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

وَاِذَا رَوٰى رَاوٍ حَدِيْثًا وَرَوٰى رَاوٍ آخَرُ حَدِيْثًا مُوَافِقًا لَّه' يُسَمّٰى هٰذَا الْحَدِيْثُ مُتَابِعًا بِصِيْغَةِ اِسْمِ الْفَاعِلِ وَهٰذَا مَعْنٰى مَا يَقُوْلُ الْمُحَدِّثُوْنَ تَابَعَهُ فُلَانٌ وَكَثِيْرًا مَّا يَقُوْلُ الْبُخَارِىُّ فِىْ صَحِيْحِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ وَلَهٗ مُتَابِعَاتٌ وَالْمُتَابَعَةُ يُوْجِبُ التَّقْوِيَةَ وَالتَّايِيْدَ وَلَا يَلْزِمُ أَنْ يَّكُوْنَ الْمُتَابِعُ مُسَاوِيًا فِى الْمَرْتَبَةِ لِلْاَصْلِ وَاِنْ كَانَ دُوْنَه' يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَةِ ـ وَالْمُتَابَعَةُ قَدْ يَكُوْنُ فِىْ نَفْسِ الرَّاوِىِّ وَقَدْ يَكُوْنُ فِىْ شَيْخٍ فَوْقَهٗ وَالْاَوَّلُ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ مِنَ الثَّانِىْ لِأَنَّ الْوَهَنَ فِىْ اَوَّلِ الْاِسْنَادِ

মুতাবি' হাদীস ও এর প্রকারভেদ

যখন কোন রাভী কোন একটি হাদীস বর্ণনা করেন, আবার অন্য কোন রাভী (পূর্বোক্ত) রাভীর অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেন, তবে পরবর্তী হাদীসকে মুতাবি' বলে। (متابع) শব্দটি اسم فاعل -এর শব্দরূপে পঠিত। মুহাদ্দিসগণ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'অমুক রাভী এ রাভীর অনুকরণ করেছেন' মর্মে যে কথা বলেন, তার মর্মার্থ এটাই। ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি স্বীয় সহীহ গ্রন্থে এরূপ মন্তব্য বহু জায়গায় করেছেন। মুহাদ্দিসগণ এভাবেও বলে থাকেন, "এ রাভীর অনেক মুতাবি' (হাদীস) রয়েছে।" 'মুতাবা'আত' হাদীসকে সুদৃঢ়করণ ও শক্তি যোগানোকে অনিবার্য করে। ('মুতাবাআত' কার্যকর হওয়ার জন্য) মুতাবি' হাদীস মর্যাদায় মূল হাদীসের সমমানের হওয়া জরুরী নয়; বরং তা যদি মর্যাদাগতভাবে মূল হাদীসের নিম্ন স্তরেরও হয়, তবুও মুতাবা'আতের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

'মুতাবা'আত' (এ অনুসরণ) কখনো স্বয়ং রাভীর হয়ে থাকে আবার কখনো তাঁর উর্ধ্বতন কোন শায়খ বা শিক্ষকেরও হয়ে থাকে। তবে প্রথম প্রকার মুতাবা'আত দ্বিতীয় প্রকার মুতাবা'আত অপেক্ষা অধিক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ। কেননা, সনদের অগ্রভাগেই অধিকতর ও সিংহভাগ দূর্বলতা হয়ে থাকে।[১১]

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর] প্রাপ্তের নাম 'মাহফূয' ও 'মা'রূফ' এবং প্রাধান্য পায়নি এমন দলের নাম হলো 'শায' ও 'মুনকার'। নিম্নে প্রদর্শিত নকশায় প্রাধান্য প্রাপ্ত ও প্রাধান্য পায়নি এমন উভয় দলের দু'টি দিকই দেখানো হলো–

'শায' ও 'মুনকার'-এর বর্ণনাকারী

- প্রধান্য প্রাপ্ত পক্ষ
  - মাহফূয (নির্ভরযোগ্য রাভী)
  - মা'রূফ (দূর্বল রাভী)
- প্রাধান্য পায়নি এমন পক্ষ
  - শায (নির্ভরযোগ্য রাভী)
  - মুনকার (দূর্বল রাভী)

প্রণেতা মহোদয় এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন তার এ বাক্যে– 'শায ও মুনকার হচ্ছে প্রাধান্যহীন পক্ষ আর মা'রূফ ও মাহফূয হচ্ছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত পক্ষ।"

أَكْثَرُ وَأَغْلَبُ وَالْمُتَابِعُ اِنْ وَافَقَ الْأَصْلَ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى يُقَالُ مِثْلُهُ وَاِنْ وَافَقَ فِي الْمَعْنٰى دُوْنَ اللَّفْظِ يُقَالُ نَحْوَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَابَعَةِ أَنْ يَّكُوْنَ الْحَدِيْثَانِ مِنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ وَاِنْ كَانَا مِنْ صَحَابِيَّيْنِ يُقَالُ لَهُ شَاهِدٌ كَمَا يُقَالُ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَيُقَالُ لَهُ شَوَاهِدُ وَيَشْهَدُ بِهٖ حَدِيْثُ

(نحوه) ও (مثله)-এর ব্যবহার

মুতাবি' হাদীস যদি শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়ে মূল হাদীসের অনুরূপ হয়, তাহলে (مثله) বলতে হয়। যদি শুধু অর্থগতভাবে মূল হাদীসের মতো হয়, শব্দগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়, তবে (نحوه) ব্যবহৃত হয়।

মুতাবি' ও শাহিদের মধ্যে পার্থক্য

মুতাবা'আতের জন্য পূর্বশর্ত হলো, উভয় হাদীস (অর্থাৎ মুতাবি' ও মুতাবা') একই সাহাবী থেকে বর্ণিত হওয়া। আর যদি উভয় হাদীস দু'জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়, তাহলে উক্ত হাদীস (দ্বিতীয় হাদীস)কে 'শাহিদ' বলে। যেমন (শাহিদ বুঝানোর জন্য) বলা হয়– "হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস এ হাদীসটির 'শাহিদ' রয়েছে।" আবার কখনো বলা হয়, "এ হাদীসের একাধিক 'শাহিদ' রয়েছে।" আবার কখনো বলা হয়, "অমুকের বর্ণিত হাদীস এ হাদীসের জন্য 'শাহিদ'।"

---

১১. এভাবেও বলা যায় যে, এ মুতাবা'আত (অনুসরণ) কখনো স্বয়ং রাভী অনুসারে হয়ে থাকে, অর্থাৎ রাভীর ওস্তাদ (যাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে) থেকে এ হাদীস অন্য রাভীও বর্ণনা করেছেন। আর কখনো রাভীর উর্ধ্বতন শায়খ কিংবা শায়খের শায়খ অনুসারেও (মুতাবা'আত) হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাভীর শায়খ কিংবা শায়খের ওস্তাদ থেকে অন্য রাভীও বর্ণনা করেছেন। যদি প্রথমোক্ত (স্বয়ং রাভী) অনুসারে মুতাবা'আত' পাওয়া যায়, তবে সেটাকে 'মুতাবা'আত-ই তাম্মাহ্' বা পূর্ণাঙ্গ মুতাবা'আত বলে। আর যদি রাভীর উর্ধ্বতন শায়খের কিংবা শায়খুশ্ শায়খ অনুসারে (শেষোক্ত) মুতাবা'আত পাওয়া যায়, তাহলে সেটাকে 'মুতাবা'আতে ক্বাসিয়াহ' (অসম্পূর্ণ) মুতাবা'আত বলা হয়।

যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনার পরম্পরা যত দূরবর্তী হতে থাকে ততোই দুর্বলতা ও ভুলের সম্ভাবনা বাড়তে থাকে। এ কারণে সনদের প্রারম্ভিক দিক থেকে রাভী মুতাবা'আত ও শক্তি সঞ্চয়ের বেশী মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। এ কারণে তার মুতাবা'আত মূল মুতাবা'আত হলো। এ জন্য এটাকে পূর্ণাঙ্গ মুতাবা'আত বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, বোখারী শরীফের প্রথম হাদীস প্রনিধানযোগ্য। তাহচ্ছে– ইমাম বোখারী বলেছেন–

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ الحديث

এ হাদীস সম্পর্কে যদি ইমাম বোখারী বলেন, له متابع (এর মুতাবি' রয়েছে), তবে দেখতে হবে যে, অন্য রাভী যদি হুমায়দী থেকে বর্ণনা করে থাকেন তবে সেটাকে পূর্ণাঙ্গ মুতাবা'আত বলা হবে। আর যদি সুফিয়ান অথবা ইয়াহ্য়া অথবা মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেন তাহলে সেটাকে অসম্পূর্ণ মুতাবা'আত বলে।

فُلَانٌ وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّوْنَ الْمُتَابَعَةَ بِالْمُوَافَقَةِ فِي اللَّفْظِ وَالشَّاهِدَ فِي الْمَعْنٰى سَوَاءٌ كَانَ مِنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ صَحَابِيَيْنِ - وَقَدْ يُطْلَقُ الشَّاهِدُ وَالْمُتَابِعُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَالْاَمْرُ فِيْ ذٰلِكَ بَيِّنٌ - وَتَتَبُّعُ طُرُقِ الْحَدِيْثِ وَاَسَانِيْدِهَا لِقَصْدِ مَعْرِفَةِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ يُسَمّٰى الْاِعْتِبَارُ .

فَصْلٌ : وَأَصْلُ أَقْسَامِ الْحَدِيْثِ ثَلٰثَةٌ صَحِيْحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيْفٌ - فَالصَّحِيْحُ أَعْلٰى مَرْتَبَةً وَالضَّعِيْفُ أَدْنٰى وَالْحَسَنُ مُتَوَسِّطٌ وَسَائِرُ الْاَقْسَامِ الَّتِيْ ذُكِرَتْ دَاخِلَةٌ فِيْ هٰذِهِ الثَّلَاثَةِ فَالصَّحِيْحُ مَا يَثْبُتُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ غَيْرَ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ ــ فَاِنْ كَانَتْ هٰذِهِ الصِّفَاتُ عَلٰى وَجْهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ فَهُوَ

কেউ কেউ মুতাবা'আতকে শব্দগত সামঞ্জস্যের জন্য এবং শাহিদকে অর্থগত সামঞ্জস্যের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন– উভয় হাদীস একই সাহাবী থেকে বর্ণিত হোক কিংবা দু'জন সাহাবী থেকে হোক।

আবার কখনো কখনো 'মুতাবি' ও 'শাহিদ' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এর কারণও সুস্পষ্ট।[১২]

ই'তিবার (اعتبار) ঃ আর 'মুতাবি' ও 'শাহিদ' জানার উদ্দেশ্যে হাদীসের সূত্র-পরম্পরা ও সনদ অনুসন্ধান করাকে 'ই'তিবার' বলে।[১৩]

পরিচ্ছেদ ঃ হাদীসের মৌলিক প্রকারভেদ

মৌলিকভাবে হাদীস তিন প্রকার ঃ ১. সহীহ, ২. হাসান এবং ৩. দ্ব'ঈফ।

মর্যাদাগতভাবে 'সহীহ' হচ্ছে সর্বোচ্চ, 'দ্ব'ঈফ' হচ্ছে সর্বনিম্ন। আর 'হাসান' হচ্ছে মধ্যম স্তরের। ইতোপূর্বে হাদীসের যে প্রকারগুলোর কথা আলোচনা করা হয়েছে, সবক'টিই হচ্ছে এ তিন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। 'সহীহ' (صحیح) হচ্ছে ওই মুত্তাসিল সনদবিশিষ্ট হাদীস, যা পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন ও 'আদালত' বিশিষ্ট' রাভী কর্তৃক বর্ণিত এবং সেটা 'মু'আল্লাল' ও 'শায' নয়। যদি এ বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্তভাবে পাওয়া যায়, তাহলে তাকে

১২. কেননা, উভয়টি বর্ণনায় শক্তি যোগায়; পার্থক্য শুধু নামে। অন্যথায় উভয়ের কার্যকারিতা একই। তা হচ্ছে হাদীসকে শক্তিশালী করা। [আল-কাওক্বাবুদ্ দুর্‌রী]

১৩. যেমন– মুহাদ্দিসগণ বলেন– اِعْتَبَرْنَا الْحَدِيْثَ وَاعْتَبَرْنَا الرَّاوِيَّ فَوَجَدْنَاهُ كَذَا اَوْ كَذَا (আমরা হাদীস ও রাভীর অনুসন্ধান করেছি। সুতরাং এমন এমন অবস্থায় পেয়েছি।)

الصَّحِيْحُ لِذَاتِهٖ وَاِنْ كَانَ فِيْهِ نَوْعُ قُصُوْرٍ وَوُجِدَ مَا يَجْبُرُ ذٰلِكَ الْقُصُوْرَ مِنْ كَثْرَةِ الطُّرُقِ فَهُوَ الصَّحِيْحُ لِغَيْرِهٖ وَاِنْ لَّمْ يُوْجَدْ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهٖ ـ وَمَا فَقَدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصَّحِيْحِ كُلًّا اَوْ بَعْضًا فَهُوَ الضَّعِيْفُ وَالضَّعِيْفُ اِنْ تَعَدَّدَ طُرُقُهٗ وَانْجَبَرَ ضُعْفُهٗ يُسَمّٰى حَسَنًا لِغَيْرِهٖ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اَنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ جَمِيْعُ الصِّفَاتِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي الصَّحِيْحِ نَاقِصَاتٌ فِي الْحَسَنِ لٰكِنَّ التَّحْقِيْقَ اَنَّ النُّقْصَانَ الَّذِيْ اُعْتُبِرَ فِي الْحَسَنِ اِنَّمَا هُوَ بِخِفَّةِ الضَّبْطِ وَبَاقِي الصِّفَاتِ بِحَالِهَا ـ

'সহীহ লিযা-তিহী' (صحیح لذاتہ) বলা হয়। আর যদি এ (গুণগুলোর) ক্ষেত্রে কোনরূপ ঘাটতি বা ত্রুটি থাকে এবং এমন কিছু পাওয়া যায়, যা উক্ত ঘাটতি পূরণ করে দেয়, যেমন– সনদের আধিক্য, তবে তাকে 'হাদীস-ই সহীহ লি-গারিহী' (صحیح لغیرہ) বলা হয়। আর যদি এমন কিছু পাওয়া না যায় (যা উক্ত ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম), তবে তাকে 'হাদীস-ই হাসান লিযা-তিহী' (حسن لذاتہ) বলা হয়।

যদি হাদীসের রাভীর মধ্যে, সহীহ হাদীসের জন্য গ্রহণযোগ্য সকল বা কিছু পূর্বশর্ত অনুপস্থিত হয়, তাহলে তাকে 'দ্ব'ঈফ হাদীস' বলা হয়। আর দ্ব'ঈফ হাদীসের সনদ যদি একাধিক হয় এবং তার দুর্বলতার ঘাটতি পূরণ হয়, তবে তাকে 'হাদীস-ই হাসান লিগায়রিহী' (حسن لغیرہ) বলা হয়।

হাদীস শাস্ত্রবিদদের বক্তব্যের সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে– সহীহ হাদীসের রাভীদের জন্য আবশ্যক পূর্বোল্লিখিত সকল বৈশিষ্ট্য, 'হাসান' হাদীসের রাভীদের মধ্যে অসম্পূর্ণ ও খুঁতযুক্তভাবে থাকা বৈধ হবে। কিন্তু সুক্ষ্ম গবেষণালব্ধ অভিমত হচ্ছে– 'হাসান' হাদীসের রাভীদের গুণাবলীর মধ্যে যে ঘাটতি বা খুঁত বিবেচ্য, তা কেবল দ্বাবৃত (ضبط)-এর অসম্পূর্ণতাই। আর অবশিষ্ট গুণাবলী সেগুলোর আপন অবস্থায় বিদ্যমান থাকা আবশ্যকীয়।[১৪]

---

১৪. গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা অনুসারে মূলতঃ হাদীস তিন প্রকার– সহীহ, হাসান ও দ্ব'ঈফ। কারণ (وجہ حصر) হচ্ছে– হাদীসকে দেখতে হবে তাতে গ্রহণযোগ্যতার মৌলিক সব বৈশিষ্ট্য আছে কিনা। যদি না থাকে তবে সেটাকে 'দ্ব'ঈফ' (দুর্বল) হাদীস বলে। যদি সব বৈশিষ্ট্য তাতে বিদ্যমান থাকে, তবে তাতে গ্রহণযোগ্যতার বৈশিষ্ট্যাবলী সর্বোচ্চ পর্যায়ের থাকলে ওই হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয়। অন্যথায় হাদীস 'হাসান' পর্যায়ের হবে।

মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বোচ্চ হচ্ছে সহীহ, সর্বনিম্ন হচ্ছে 'দ্ব'ঈফ' আর মধ্যম পর্যায়ের হচ্ছে– 'হাসান'। এ কিতাবে হাদীসের যত প্রকার, যেমন– মারফূ', মাওকূফ', মাক্বতূ', মুত্তাসিল, মুন্‌ক্বাতি', মু'আন'আন, মুসনাদ, শায, মুন্‌কার, মু'আল্লাল, মা'রূফ, মাহফূয ইত্যাদি, এ তিন প্রকারের কোন না কোন এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। [আল-কাওকাবুদ্ দুর্‌রী পৃ. ৩১, কৃত ঃ ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মুমতায উদ্দীন আহমদ]

وَالْعَدَالَةُ مَلَكَةٌ فِىْ الشَّخْصِ تَحْمِلُهٗ عَلٰى مُلَازَمَةِ التَّقْوٰى وَالْمُرُوَّةِ۔ وَالْمُرَادُ بِالتَّقْوٰى اِجْتِنَابُ الْاَعْمَالِ السَّيِّئَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْفِسْقِ وَالْبِدْعَةِ وَفِى الْاِجْتِنَابِ عَنِ الصَّغِيْرَةِ خِلَافٌ وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ اشْتِرَاطِهٖ لِخُرُوْجِهٖ عَنِ الطَّاقَةِ اِلَّا الْاِصْرَارَ عَلَيْهَا لَكَوْنِهٖ كَبِيْرَةً۔ وَالْمُرَادُ بِالْمُرُوَّةِ التَّنَزُّهُ عَنْ بَعْضِ الْخَسَائِسِ وَالنَّقَائِصِ الَّتِىْ هِىَ خِلَافُ مُقْتَضَى الْهِمَّةِ وَالْمُرُوَّةِ مثل بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ الدَّنِيَةِ كَالْاَكْلِ وَالشُّرْبِ فِىْ السُّوْقِ وَالْبَوْلِ فِى الطَّرِيْقِ وَاَمْثَالِ ذٰلِكَ۔

وَيَنْبَغِىْ اَنْ يُّعْلَمَ اَنَّ عَدْلَ الرِّوَايَةِ اَعَمُّ مِنْ عَدْلِ الشَّهَادَةِ فَاِنَّ عَدْلَ الشَّهَادَةِ مَخْصُوْصٌ بِالْحُرِّ وَعَدْلُ الرِّوَايَةِ يَشْتَمِلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ۔ وَالْمُرَادُ بِالضَّبْطِ

'আদালত' প্রসঙ্গ

আদালত (العدالة) ঃ ব্যক্তির মধ্যে বিরাজমান এমন যোগ্যতা, যা তাকে 'তাক্বওয়া' ও 'মুরুওয়াত'-এর[১৫] উপর অবিচ্ছিন্নভাবে লেগে থাকতে বাধ্য করে।

'তাক্বওয়া' মানে– শিরক, ফিস্ক্ব (পাপাচার), বিদ'আত (শরীয়তের দলীলবিহীন নব আবিষ্কৃত কাজ) ইত্যাদির মতো মন্দ কার্যাদি পরিহার করা।

আর 'সগীরা গুনাহ্' পরিহার করার আবশ্যকতা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে, তা (সগীরা গুনাহ) পরিহার করা পূর্বশর্ত নয়। কারণ, তা থেকে বিরত থাকা সাধ্যাতীত। তবে, সগীরা গুনাহর উপর অনড় থাকলে বা তা বারংবার করতে থাকলে তা তাক্বওয়ার পরিপন্থী হবে। কেননা, তখন তা 'কবীরাহ্ গুনাহ'-এ পরিণত হয়।

মুরুওয়াত (مروة) ঃ 'মুরুওয়াত' মানে এমন ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট কর্ম এবং নীচ স্বভাব পরিহার করা, যা আত্মমর্যাদাবোধ, মানবীয় আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার বিরোধী। যেমন, কিছুকিছু নিকৃষ্ট ও নীচ পর্যায়ের বৈধ কার্যকলাপ (পরিহার করা)। যেমন– হাটে-বাজারে পানাহার করা, রাস্তায় প্রশ্রাব করা ইত্যাদি।

জেনে রাখা চাই যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাভীর 'আদিল' (আদালত বিশিষ্ট) হওয়া বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সাক্ষীর আদিল হওয়া অপেক্ষা ব্যাপকতর। কেননা, শেষোক্ত সাক্ষীর ক্ষেত্রে 'আদিল হওয়া' স্বাধীন মানুষের জন্য নির্ধারিত; কিন্তু হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে 'আদিল হওয়া' স্বাধীন ও ক্রীতদাস উভয় শ্রেণীর মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

দ্বাবৃত্ব (ضبط) ঃ 'দ্বাবৃত্ব' মানে

১৫. মুরুওয়াত (مروة) মানে মনুষ্যত্ববোধ, শিষ্টাচার ও যাবতীয় মানবীয় আচার-আচরণ।

حِفْظُ الْمَسْمُوْعِ وَتَثْبِيْتُهٗ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْاِخْتِلَالِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهٖ وَهُوَ قِسْمَانِ ضَبْطُ الصَّدْرِ وَضَبْطُ الْكِتَابِ فَضَبْطُ الصَّدْرِ بِحِفْظِ الْقَلْبِ وَوَعْيِهٖ وَضَبْطُ الْكِتَابِ بِصِيَانَتِهٖ عِنْدَهٗ اِلٰى وَقْتِ الْاَدَاءِ.

فَصْلٌ : اَمَّا الْعَدَالَةُ فَوُجُوْهُ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا خَمْسٌ اَلْاَوَّلُ بِالْكِذْبِ وَالثَّانِىْ بِاِتِّهَامِهٖ بِالْكِذْبِ وَالثَّالِثُ بِالْفِسْقِ وَالرَّابِعُ بِالْجَهَالَةِ وَالْخَامِسُ بِالْبِدْعَةِ- وَالْمُرَادُ بِكِذْبِ الرَّاوِىِّ اَنَّهٗ ثَبَتَ كِذْبُهٗ فِى الْحَدِيْثِ النَّبَوِىِّ ﷺ اِمَّا بِاِقْرَارِ الْوَاضِعِ اَوْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْقَرَائِنِ- وَحَدِيْثُ الْمَطْعُوْنِ بِالْكِذْبِ يُسَمّٰى مَوْضُوْعًا وَمَنْ ثَبَتَ عَنْهُ تَعَمُّدُ الْكِذْبِ فِى الْحَدِيْثِ وَاِنْ كَانَ وُقُوْعُهٗ فِى الْعُمْرِ مَرَّةً وَاِنْ تَابَ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيْثُهٗ اَبَدًا بِخِلَافِ شَاهِدِ الزُّوْرِ

শ্রুত বিষয়কে সংরক্ষণ করা এবং হস্তচ্যুতি, বিস্মৃতি ও বিনষ্টতা থেকে এমনভাবে রক্ষা করা যেন তা যে কোন মুহূর্তে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারে।

দ্বাবৃত্ব দু' প্রকার ঃ ১. 'দ্বাবত্বুস্‌সদর' (বক্ষস্থিত স্মৃতিতে সংরক্ষণ) এবং ২. 'দ্বাবৃত্বুল কিতাব' (লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা)। দ্বাবৃত্বুস্‌সদর হয় (শায়খ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শব্দাবলীকে) হৃদয়ে সংরক্ষণ- মুখস্থ, কণ্ঠস্থ ও আত্মস্থ করা দ্বারা, আর 'দ্বাবৃত্বুল্ কিতাব' হচ্ছে হাদীস অন্যকে জানানোর পূর্বে নিজের কাছে লিখিতভাবে সংরক্ষিত রাখা।

পরিচ্ছেদ ঃ 'আদালত' সমালোচিত (ক্ষতিগ্রস্ত) হওয়ার কারণসমূহ, মনগড়া হাদীস ও তার বিধান

পাঁচটি কারণে 'আদালত' সমালোচিত হয় ঃ ১. মিথ্যাবাদিতা, ২, মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া, ৩. পাপাচারিতা (অর্থাৎ কবীরা গুনাহে অভ্যস্ত হওয়া), ৪. অজ্ঞাত ও অপরিচিত হওয়া এবং ৫, বিদ'আত (ভিত্তিহীন নব আবিষ্কৃত কার্যাবলী) সম্পন্নকারী হওয়া। রাভীর মিথ্যাবাদিতার অর্থ হলো- রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনায় তার মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হওয়া- মনগড়া হাদীস রচনাকারীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে কিংবা অন্যান্য আলামত-লক্ষণ দ্বারা।

মনগড়া হাদীস (الموضوع) ঃ মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত রাভীর হাদীসকে মাওদ্বূ' (মনগড়া হাদীস) বলা হয়। আর যে ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার সংঘটিত হয়, যদিও তা জীবনে একবার মাত্র সংঘটিত হয় এবং যদি সে তা থেকে তাওবা করে নেয়, তবুও তার হাদীস কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে, মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা

إِذَا تَابَ - فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيْثِ الْمَوْضُوْعِ فِى اِصْطَلَاحِ الْمُحَدِّثِيْنَ هٰذَا اِلَّا اَنَّهٗ ثَبَتَ كِذْبُهٗ وَعُلِمَ ذٰلِكَ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ بِخُصُوْصِهٖ - وَالْمَسْئَلَةُ ظَنِّيَّةٌ وَالْحُكْمُ بِالْوَضْعِ وَالْاِفْتِرَاءِ بِحُكْمِ الظَّنِّ الْغَالِبِ وَلَيْسَ اِلَى الْقَطْعِ وَالْيَقِيْنِ بِذَالِكَ سَبِيْلٌ فَاِنَّ الْكَذُوْبَ قَدْ يَصْدُقُ وَبِهٰذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيْلَ فِى مَعْرِفَةِ الْوَضْعِ بِاِقْرَارِ الْوَاضِعِ اِنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ كَاذِبًا فِى هٰذَا الْاِقْرَارِ فَاِنَّهٗ يُعْرَفُ صِدْقُهٗ بِغَالِبِ الظَّنِّ وَلَوْ لَا ذٰلِكَ لَمَا سَاغَ قَتْلُ الْمُقِرِّ بِالْقَتْلِ وَلَا رَجْمُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا فَافْهَمْ وَاَمَّا اِتِّهَامُ الرَّاوِىْ بِالْكِذْبِ فَبِاَنْ يَّكُوْنَ مَشْهُوْرًا بِالْكِذْبِ وَمَعْرُوْفًا بِهٖ فِى كَلَامِ النَّاسِ وَلَمْ يَثْبُتْ كِذْبُهٗ فِى الْحَدِيْثِ النَّبَوِىِّ وَفِىْ حُكْمِهٖ رِوَايَةُ مَا يُخَالِفُ قَوَاعِدَ مَعْلُوْمَةً ضَرُوْرِيَّةً فِى الشَّرْحِ كَذَا قِيْلَ

যদি তাওবা করে, তাহলে তার সাক্ষ্য পরবর্তীতে গ্রহণ করা হয়।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় মাওদ্বূ' বা মনগড়া হাদীস মানে এটাই। (অর্থাৎ যার দ্বারা জীবনে একবার হলেও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যাচার সংঘটিত হয়েছে তার বর্ণিত হাদীস মাওদ্বূ' বা মনগড়া।) এটা দ্বারা একথা বুঝানো আদৌ উদ্দেশ্য নয় যে, উক্ত রাভী থেকে মিথ্যাচার সংগঠিত হয়েছে এবং তা বিশেষভাবে উক্ত (মনগড়া) হাদীসের ক্ষেত্রে জানা গেছে। বস্তুতঃ এ বিষয়টি অনুমান ভিত্তিক। রাভীর উপর মনগড়া হাদীস রচনা করা ও বিষয়টি সাব্যস্ত করা প্রবল ধারনার ভিত্তিতেই। এ ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় প্রত্যয়ে বিষয়টি সাব্যস্ত করার কোন উপায় নেই। কেননা, মিথ্যাবাদীরাও কখনো কখনো সত্য কথা বলে ফেলে।

এ আলোচনার মাধ্যমে মনগড়াভাবে হাদীস রচনাকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা হাদীস মনগড়া হওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রসঙ্গে যে আপত্তি উথাপিত হয়, তার সমাধান হয়ে যায়। আপত্তিটা হলো মনগড়া হাদীস রচনাকারী তো তার উক্ত স্বীকারোক্তিতে মিথ্যাবাদীও হতে পারে। (উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেলো।) কেননা, স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে তার সত্যবাদিতা 'প্রবল ধারণা' থেকেই বুঝা যায়। যদি এমনটি না হতো, তাহলে হত্যার স্বীকারোক্তিদাতা ব্যক্তিকে (বিচারের শাস্তি স্বরূপ) হত্যা করা এবং যিনার স্বীকারোক্তিদাতাকে (বিবাহিত হলে) 'রাজম' বা প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা বৈধ হতো না। বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে হৃদয়ঙ্গম করো।

মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত বর্ণনকারী

মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত রাভী (বর্ণনাকারী) বলতে বুঝায়– মানুষের সাথে কথোপকথনে মিথ্যাচারীরূপে খ্যাত ও পরিচিত রাভী, কিন্তু রাসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার মিথ্যাচারিতা প্রমাণিত হয় নি। এ বিধানেরই অন্তর্ভুক্ত ওই হাদীস, যা শরীয়তের কোন সুবিদিত ও অপরিহার্য বিধানের বিরোধী। অনুরূপই বলা হয়েছে–

وَيُسَمّٰى هٰذَا الْقِسْمُ مَتْرُوْكًا كَمَا يُقَالُ حَدِيْثُهٗ مَتْرُوْكٌ وَفُلَانٌ مَتْرُوْكُ
الْحَدِيْثِ وَهٰذَا الرَّجُلُ اِنْ تَابَ وَصَحَّتْ تَوْبَتُهٗ وَظَهَرَتْ اِمَارَاتُ الصِّدْقِ مِنْهُ
جَازَ سَمَاعُ الْحَدِيْثِ وَالَّذِىْ يَقَعُ مِنْهُ الْكِذْبُ اَحْيَانًا نَادِرًا فِىْ كَلَامِهٖ غَيْرَ
الْحَدِيْثِ النَّبَوِىِّ فَذٰلِكَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِىْ تَسْمِيَةِ حَدِيْثِهٖ بِالْمَوْضُوْعِ اَوِ
الْمَتْرُوْكِ وَاِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً وَاَمَّا الْفِسْقُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْفِسْقُ فِى الْعَمَلِ دُوْنَ
الْاِعْتِقَادِ فَاِنَّ ذٰلِكَ دَاخِلٌ فِى الْبِدْعَةِ وَاَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ الْبِدْعَةُ فِى الْاِعْتِقَادِ
وَالْكِذْبُ وَاِنْ كَانَ دَاخِلًا فِى الْفِسْقِ لٰكِنَّهُمْ عَدُّوْهُ اَصْلًا عَلٰى حِدَةٍ لِكَوْنِ
الطَّعْنِ بِهٖ اَشَدَّ وَاَغْلَظَ.

وَاَمَّا جِهَالَةُ الرَّاوِىْ فَاِنَّهٗ اَيْضًا سَبَبٌ لِلطَّعْنِ فِى الْحَدِيْثِ لِاَنَّهٗ لَمَّا لَمْ يُعْرَفْ
اِسْمُهٗ وَذَاتُهٗ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهٗ وَاَنَّهٗ ثِقَةٌ اَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ كَمَا يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ اَوْ

এ প্রকার হাদীসকে 'মাতরূক' (পরিত্যক্ত) বলা হয়। যেমন বলা হয়, "তার হাদীস মাতরূক, অমুকের হাদীস মাতরূক।"

এমন ব্যক্তি যদি তাওবা করে, আর তার তাওবা সঠিক হয় এবং তার মধ্যে সত্যবাদিতার আলামতসমূহ প্রকাশ পায়, তাহলে তাঁর হাদীস শ্রবণ করা বৈধ। আর যে ব্যক্তি থেকে হাদীস-ই নবভী ছাড়া অন্য কোন সময় যৎসামান্য মিথ্যাচারিতা সংঘটিত হয়, তা তার বর্ণনাকৃত হাদীসকে 'মাওদ্বূ' বা 'মাত্‌রূক' বলে আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না; যদিও (তার) এরূপ করাটা গুনাহ্‌র কাজ।

হাদীস বর্ণনাকারীর পাপাচারিতা ও অজ্ঞাত হওয়ার অর্থ

ফিসক্ব (الفسق) বা পাপাচার মানে কর্মের দিক দিয়ে পাপাচারী হওয়া; ই'তিক্বাদী; (বিশ্বাসগত) পাপাচারী হওয়া নয়। কেননা, ই'তিক্বাদে পাপাচারী হওয়া বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। বিদ'আত শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্বাসগত বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। 'মিথ্যাচার' পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মুহাদ্দিসগণ সেটাকে স্বতন্ত্র প্রকার হিসেবে পরিগণিত করেছেন। কারণ, (হাদীস শাস্ত্রে) মিথ্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া গুরুতর ও জঘন্যতর অপরাধ। আর রাভী অজ্ঞাত এবং অপরিচিত হওয়াও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দূষনীয় হবার একটা কারণ। কেননা, যদি রাভীর নাম ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানা না যায়, তাহলে তার অবস্থাও জানা যায় না– তিনি নির্ভরযোগ্য, নাকি অনির্ভরযোগ্য। যেমন কোন এক রাভী (নাম উল্লেখ না করে) বললেন, "জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন", অথবা

اَخْبَرَنِىْ شَيْخٌ وَهٰذَا يُسَمّٰى مُبْهَمًا وَحَدِيْثُ الْمُبْهَمِ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ صَحَابِيًّا لِاَنَّهُمْ عُدُوْلٌ وَاِنْ جَآءَ الْمُبْهَمُ بِلَفْظِ التَّعْدِيْلِ كَمَا يَقُوْلُ أَخْبَرَنِىْ عَدْلٌ أَوْ حَدَّثَنِىْ ثِقَةٌ فَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ وَالْاَصَحُّ اَنَّهٗ لَا يُقْبَلُ لِاَنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ عَدْلًا فِىْ اِعْتِقَادِهٖ لَا فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ وَاِنْ قَالَ ذٰلِكَ اِمَامٌ حَاذِقٌ قُبِلَ وَأَمَّا الْبِدْعَةُ فَالْمُرَادُ بِهٖ اِعْتِقَادُ اَمْرٍ مُحْدَثٍ عَلٰى خِلَافِ مَا عُرِفَ فِى الدِّيْنِ وَمَا جَآءَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهٖ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَتَاْوِيْلٍ لَا بِطَرِيْقِ جُحُوْدٍ وَاِنْكَارٍ فَاِنَّ ذٰلِكَ كُفْرٌ وَّحَدِيْثُ الْمُبْتَدِعِ مَرْدُوْدٌ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ اِنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِصِدْقِ اللَّهْجَةِ وَصِيَانَةِ اللِّسَانِ قُبِلَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنْ

"জনৈক ওস্তাদ (নাম উল্লেখ না করে) আমাকে খবর দিয়েছেন।" এ ধরনের হাদীসকে (مبهم) ('মুবহাম' বা সন্দেহযুক্ত) বলা হয়। 'মুবহাম' (مبهم) রাভীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য অজ্ঞাত রাভী যদি কোন সাহাবী হন, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। কেননা সকল সাহাবী 'আদিল'। 'মুবহাম হাদীস' যদি 'আদালত' শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়, যেমন মুহাদ্দিসগণ বলেন, "আমার নিকট 'আদিল' রাভী হাদীস বর্ণনা করেছেন" অথবা "নির্ভরযোগ্য রাভী আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন", তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি-না সে সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং সর্বাধিক সঠিক অভিমত হচ্ছে– তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, হতে পারে তিনি তাঁর ই'তিক্বাদ বা বিশ্বাসে 'আদিল', কিন্তু বাস্তবে তেমনি নন। হ্যাঁ! যদি কোন তত্ত্বজ্ঞানী বিজ্ঞ ইমাম এরূপ বলেন, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

রাভী বিদ্'আতী হওয়ার অর্থ ও বিদ'আতীর বর্ণনার হুকুম

বিদ'আত (البدعة) দ্বারা বুঝানো হচ্ছে– নব উদ্ভাবিত এমন বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যা ধর্মের মধ্যে জ্ঞাত বিষয়াবলী এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম থেকে কোন প্রকার সংশয়যুক্ত ভিন্ন ব্যাখ্যানির্ভর সূত্রে বর্ণিত বিষয়ের পরিপন্থী; তবে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের পদ্ধতিতে নয়; কেননা তা কুফর।

বিধান ঃ বিদ'আত সম্পন্নকারীর হাদীস অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে প্রত্যাখ্যাত। কারো কারো মতে, যদি বিদ'আত সম্পন্নকারী রাভী সত্যভাষী ও সংযত রসনাসম্পন্ন হন, তাহলে তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। কারো কারো মতে, বিদ'আত সম্পন্নকারী রাভী যদি

كَانَ مُنْكِرًا لِأَمْرٍ مُتَوَاتِرٍ فِي الشَّرْعِ وَقَدْ عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ كَوْنُهُ مِنَ الدِّيْنِ فَهُوَ مَرْدُوْدٌ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ يُقْبَلُ وَاِنْ كَفَّرَهُ الْمُخَالِفُوْنَ مَعَ وُجُوْدِ ضَبْطٍ وَّ وَرَعٍ وَتَقْوٰى وَّاحْتِيَاطٍ وَّصِيَانَةٍ وَالْمُخْتَارُ اَنَّهُ اِنْ كَانَ دَاعِيًا اِلٰى بِدْعَتِهٖ وَمُرَوِّجًا لَّهُ رُدَّ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ قُبِلَ اِلَّا اَنْ يَّرْوِىَ شَيْئًا يُقَوِّىْ بِهٖ بِدْعَتَهٗ فَهُوَ مَرْدُوْدٌ قَطْعًا وَبِالْجُمْلَةِ الْاَئِمَّةُ مُخْتَلِفُوْنَ فِىْٓ اَخْذِ الْحَدِيْثِ مِنْ اَهْلِ الْبِدَعِ وَالْاَهْوَآءِ وَاَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الزَّآئِغَةِ وَقَالَ صَاحِبُ جَامِعِ الْاُصُوْلِ اَخَذَ جَمَاعَةٌ مِّنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ مِنْ فِرْقَةِ الْخَوَارِجِ وَالْمُنْتَسِبِيْنَ اِلَى الْقَدْرِ وَالتَّشَيُّعِ وَالرَّفْضِ وَسَآئِرِ اَصْحَابِ الْبِدَعِ وَالْاَهْوَآءِ وَقَدْ اِحْتَاطَ جَمَاعَةٌ اٰخَرُوْنَ وَتَوَرَّعُوْا مِنْ اَخْذِ حَدِيْثٍ مِنْ هٰذِهِ الْفِرَقِ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمْ نِيَّاتٌ اِنْتَهٰى وَلَا شَكَّ اَنَّ اَخْذَ الْحَدِيْثِ مِنْ هٰذِهِ الْفِرَقِ يَكُوْنُ بَعْدَ التَّحَرِّىْ

মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত এবং সন্দেহাতীতভাবে ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হিসেবে জ্ঞাত শরীয়তের কোন বিষয়কে অস্বীকারকারী হয়, তাহলে তার হাদীস প্রত্যাখ্যাত হবে।

আর যদি এমন দোষে অভিযুক্ত না হন, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে– যদিও বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে তাঁর মধ্যে 'দ্বাব্‌ত্ব' বা হাদীস বিস্মৃতি ও বিনাশ হতে সুরক্ষার ক্ষমতা থাকা, সংযম (পাপ ও সংশয়যুক্ত বিষয় পরিহার করার গুণ), আল্লাহ-ভীতি, (হারাম ও পাপ থেকে) সতর্কতা এবং মন্দ ও দূষনীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকার গুণ থাকা সত্ত্বেও তাকে কাফির আখ্যা দিয়ে থাকে। (কারণ, তখন বিরুদ্ধবাদীদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।) পছন্দনীয় অভিমত হচ্ছে– যদি সে বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী হয় এবং তার বিদ'আতের প্রচলনদাতা হয়, তাহলে তার হাদীস প্রত্যাখ্যাত হবে। অবশ্য, যদি এমন না হয়, তাহলে গ্রহণ করা হবে। যদি এমন কিছু বর্ণনা করে, যা দ্বারা সে তার বিদ'আতকে মজবুত করে, তাহলে সে অকাট্যভাবে প্রত্যাখ্যাত হবে। মোট কথা, ইমামগণ মতবিরোধ করেন বিদ্'আত সম্পন্নকারী, প্রবৃত্তির অনুসারী ও ভ্রান্তমতবাদীদের থেকে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে। সুতরাং 'জামি'উল উসূল' গ্রন্থের প্রণেতা মহোদয় বলেন, হাদীসের ইমামদের একটি দল খারেজী, ক্বদরিয়া, শিয়া, রাফেযীসহ সকল বিদ'আতী ও প্রবৃত্তির অনুসারী ফির্ক্বার বর্ণনাকারীদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে, অপর একদল মুহাদ্দিস তা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং এ সকল ফির্ক্বার লোকদের থেকে হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা পরিহার করেছেন। আর এর পেছনে তাঁদের প্রত্যেকের রয়েছে 'নিয়্যতসমূহ' বা সদুদ্দেশ্যাবলী।

তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব ফির্ক্বার লোকদের থেকে হাদীস গ্রহণ করা হবে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা (যাচাই-বাছাই)

وَالْاِسْتِصْوَابِ وَمَعَ ذٰلِكَ الْاِحْتِيَاطِ فِيْ عَدَمِ الْاَخْذِ لِاَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ اَنَّ هٰؤُلَاءِ الْفِرَقِ كَانُوْا يَضَعُوْنَ الْاَحَادِيْثَ لِتَرْوِيْجِ مَذَاهِبِهِمْ وَكَانُوْا يُقِرُّوْنَ بِهٖ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالرُّجُوْعِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

এবং সঠিক বলে নিশ্চিত হওয়ার পরেই। তা সত্ত্বেও তাদের থেকে হাদীস গ্রহণ না করার মধ্যেই সতর্কতা রয়েছে। কেননা, এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব ফির্ক্বার লোকেরা তাদের নিজেদের মতবাদকে প্রচলন দেওয়ার জন্য জাল হাদীস রচনা করতো। (এর প্রমাণ হলো এসব ভ্রান্ত মতবাদ থেকে) তাওবা ও (সত্য পথে) প্রত্যাবর্তনের পর তারা নিজেরাই এ কথা অকপটে স্বীকার করতো।[১৬] আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাতা।

১৬. বিদ'আত সম্পর্কিত আলোচনা

যে বিদ'আত'-এর কারণে হাদীসের রাভীর 'আদালত' বাকী থাকে না, তা দ্বারা এ কথা বুঝায় যে, দ্বীনী বিষয়ে, সন্দেহ ও ভিন্ন ব্যাখ্যারূপে এমন নতুন বিষয়ে বিশ্বাস রাখা, যা প্রসিদ্ধ দ্বীনী বিষয়াদির পরিপন্থী হয় এবং রসূল-ই পাকের প্রসিদ্ধ সুন্নাত ও সাহাবা-ই কেরামের অনুসৃত পথের বিরোধী হয়। আর যদি এ আক্বীদা বা বিশ্বাস সংশয় ও ভিন্ন ব্যাখ্যারূপে না হয়, বরং অবাধ্যতা ও অস্বীকাররূপে হয় তাহলে তো কুফরই। মুহাদ্দিসগণের মতে এমন বিদ'আতীর হাদীস প্রত্যাখ্যাত। তবে কেউ কেউ বলেন, যে বিদ'আতী সত্যবাদী ও সরলভাষী হয়, তার হাদীস অবশ্য গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, শরীয়তের যে বিষয় মুতাওয়াতির হিসেবে প্রমাণিত এবং যা দ্বীনী বিষয় বলে প্রকাশ্যে বুঝা যায়, শরীয়তের এমন মুতাওয়াতির বিষয় এবং প্রকাশ্য দ্বীনী বিষয় (যেমন- নামায, রোযা ও ক্বিয়ামত ইত্যাদি)'র অস্বীকারকারী বিদ'আতী হলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর বিদ'আতী যদি এ প্রকারের না হয়, যদিও তার বিরুদ্ধবাদীরা তাকে কাফিরও বলে ফেলে, তবে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে; তবে শর্ত হচ্ছে- যদি ওই বিদ্'আতী হাদীস স্মরণ ও সংরক্ষণ, খোদাভীরুতা, ধার্মিকতা, সতর্কতা এবং রসনাকে মিথ্যা থেকে বিরত রাখার গুণাবলীতে গুনান্বিত হয়। কিন্তু গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে যদি ওই বিদ'আতী তার বর্ণনা দ্বারা আপন অভিমতের দিকে আহ্বান করে এবং নিজের অভিমতকেই প্রচলন দিতে চায়, তবে তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হবে; অন্যথায় তার এ হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি ওই বিদ'আতী এমন হাদীস বর্ণনা করে, যা দ্বারা তার বিদ'আত আরো জোরদার হয়ে যায়, তবে তার বর্ণনা নিশ্চিতভাবে বর্জনীয়।

বিদ'আত কাকে বলে?

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীনী) বিষয়ে কোন নতুন কাজ করে, যা তা থেকে নয়, সেটা প্রত্যাখ্যাত। (বোখারী, মুসলিম) মুসলিমের বর্ণনায় আছে- রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী।

দ্বীনের বিষয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করাকে বিদ'আত বলে। প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী; কিন্তু দ্বীনী বিষয়ে যে নতুন কাজ উত্তম পর্যায়ের হয় আর তা ক্বোরআন, হাদীস (সুন্নাহ্), ইজমা' ও ক্বিয়াসের পরিপন্থী না হয়, আলিমগণ সেটাকে সাওয়াবের উপযোগী, বিদ'আতে হাসানাহ্ বলেছেন। পক্ষান্তরে, যে নতুন কাজ ক্বোরআন, সুন্নাহ, ইজমা' ও ক্বিয়াসের পরিপন্থী হয় আলিমগণ সেটাকে 'বিদ'আত-ই সায়্যিআহ্' (মন্দ বিদ'আত) বলেছেন। চতুর্দলীলের বিরোধী না হবার শর্তারোপ করার ফলে ওইসব কাজও বিদ'আতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে কোন প্রমাণ

[পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

فَصْلٌ: وَاَمَّا وُجُوْهُ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالضَّبْطِ فَهِىَ اَيْضًا خَمْسَةٌ اَحَدُهَا فَرْطُ الْغَفْلَةِ وَثَانِيهَا كَثْرَةُ الْغَلَطِ وَثَالِثُهَا مُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ وَرَابِعُهَا الْوَهْمُ وَخَامِسُهَا سُوْءُ الْحِفْظِ. اَمَّا فَرْطُ الْغَفْلَةِ وَكَثْرَةُ الْغَلَطِ فَمُتَقَارِبَانِ فَالْغَفْلَةُ فِى السَّمَاعِ وَتَحَمُّلِ الْحَدِيْثِ وَالْغَلَطُ فِى الْاَسْمَاعِ وَالْاَدَاءِ وَمُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ فِى الْاِسْنَادِ وَالْمَتْنِ يَكُوْنُ عَلٰى اَنْحَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ تَكُوْنُ مُوْجِبَةً لِّلشُّذُوْذِ وَجَعْلَهُ مِنْ وُجُوْهِ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالضَّبْطِ مِنْ جِهَةِ اَنَّ الْبَاعِثَ عَلٰى مُخَالَفَةِ الثِّقَاتِ اِنَّمَا هُوَ عَدَمُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَعَدَمُ الصِّيَانَةِ عَنِ التَّغَيُّرِ وَالتَّبْدِيْلِ وَالطَّعْنُ مِنْ

পরিচ্ছেদ ঃ 'দ্বাবৃত্ব' সমালোচিত হওয়ার কারণসমূহ

'দ্বাবৃত্ব' (হাদীস সংরক্ষণ) সমালোচিত হবার কারণও পাঁচটি ঃ ১. অত্যোধিক উদাসীনতা, ২. মাত্রাতিরিক্ত ভুল, ৩. নির্ভরযোগ্য রাভীদের বিরোধিতা, ৪. সংশয় এবং ৫. স্মরণশক্তির ক্রটি। তবে উদাসীনতার বাহুল্য এবং মাত্রাতিরিক্ত ভুল পরস্পর কাছাকাছি (সমার্থক)। সুতরাং উদাসীনতা ও অসতর্কতা হাদীস শ্রবণ ও হাদীস ধারণ করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর ভুল সংঘটিত হয় হাদীস অপরকে শুনানো ও অপরের কাছে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে। 'সনদ' ও 'মতন'-এ সিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য রাভীদের বিরোধিতা কয়েকভাবে হতে পারে, যা হাদীস 'শায' হওয়ার কারণ হয়। নির্ভরযোগ্য রাভীদের বিরোধিতাকে দ্বাবৃত সম্পর্কিত দোষের মধ্যে পরিগণিত করা হয়েছে এ হিসাবে যে, সেটা (নির্ভরযোগ্য রাভীদের বিরোধিতা) মূলতঃ দ্বাবৃত্ব ও স্মরণ না থাকা এবং রদ্‌বদল ও পরিবর্তন থেকে সংরক্ষণ না করার কারণে হয়ে থাকে।

সংশয় ও ভুলের বিবরণ

সংশয় ও ভুল সম্পর্কিত দোষ।

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর] পাওয়া যায় না- সৎকর্ম হাওয়ার শর্তে। যেমন হুযূর এরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম পদ্ধতি চালু করেছে, তার জন্য সেটার প্রতিদান রয়েছে এবং ওই ব্যক্তির সাওয়াবও যে তদনুযায়ী আমল করেছে। আর যে ব্যক্তি ইসলামে মন্দ পদ্ধতি চালু করেছে, তার জন্য রয়েছে সেটার প্রতিফল এবং ওই ব্যক্তির প্রতিফলও, যে তদনুযায়ী কাজ করেছে।"

সুতরাং বুঝা গেলো যে, সব বিদ'আত মন্দ নয়। কিছু বিদ'আত অপরিহার্যও বটে। যেমন- ফক্বীহগণ কিছু বিদ'আত সম্পন্ন করাকে ওয়াজিব বলেছেন, কিছু বিদ'আতে হাসানাহ্‌কে ফরযে কেফায়াও বলেছেন আর কিছু কিছু বিদ্'আতকে বলেছেন 'মানদূব' (মুস্তাহাব)। যেমন- ক্বোরআন-হাদীস ইত্যাদি বুঝার জন্য নাহ্‌ভ-সরফ ইত্যাদি অধ্যয়ন করা 'ওয়াজিব বিদ'আত', জবরিয়া, ক্বদরিয়া, শিয়া, খারেজী, রাফেযী ও ক্বাদিয়ানী ইত্যাদি ফির্ক্বার আক্বাইদ খণ্ডন করা, মুনাযারা ইত্যাদি করে সত্য দ্বীনকে রক্ষা করা বিদ'আত-ই ফরযে কেফায়াহ্। আর দ্বীনী শিক্ষার জন্য মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা, মুসাফিরখানা বানানো এবং এমন কোনো ভাল কাজ করা, যা প্রথম তিন যুগে ছিলো না, 'বিদ'আতে মুস্তাহাব্বাহ্। সুতরাং রাভীর ক্ষেত্রেও মন্দ বিদ'আতই ক্ষতিকর, উত্তম বিদ'আত নয়।

جِهَةِ الْوَهْمِ وَالنِّسْيَانِ الَّذِيْنَ اَخْطَأَ بِهِمَا وَرَوٰى عَلٰى سَبِيْلِ التَّوَهُّمِ اِنْ حَصَلَ الْاِطِّلَاعُ عَلٰى ذٰلِكَ بِقَرَآئِنَ دَآلَّةٍ عَلٰى وُجُوْهِ عِلَلٍ وَاَسْبَابٍ قَادِحَةٍ كَانَ الْحَدِيْثُ مُعَلَّلًا وَهٰذَا اَغْمَضُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ وَاَدَقُّهَا وَلَا يَقُوْمُ بِهٖ اِلَّا مَنْ رُزِقَ فَهْمًا وَحِفْظًا وَّاسِعًا وَّمَعْرِفَةً تَامَّةً بِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ وَاَحْوَالِ الْاَسَانِيْدِ وَالْمُتُوْنِ كَالْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ اَرْبَابِ هٰذَا الْفَنِّ اِلٰى اَنِ انْتَهٰى اِلَى الدَّارِ قُطْنِىْ وَيُقَالُ لَمْ يَاْتِ بَعْدَهٗ مِثْلُهٗ فِىْ هٰذَا لْاَمْرِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

وَاَمَّا سُوْءُ الْحِفْظِ فَقَالُوْا اِنَّ الْمُرَادَ بِهٖ اَنْ لَّا يَكُوْنَ اِصَابَتُهٗ اَغْلَبَ عَلٰى خَطَآئِهٖ وَحِفْظُهٗ وَاِتْقَانُهٗ اَكْثَرَ مِنْ سَهْوِهٖ وَنِسْيَانِهٖ يَعْنِىْ اِنْ كَانَ خَطَاؤُهٗ وَنِسْيَانُهٗ اَغْلَبَ اَوْ مُسَاوِيًا لِصَوَابِهٖ وَاِتْقَانِهٖ كَانَ دَاخِلًا فِىْ سُوْءِ الْحِفْظِ فَالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ صَوَابُهٗ وَاِتْقَانُهٗ وَكَثْرَتُهُمَا۔

وَسُوْءُ الْحِفْظِ اِنْ كَانَ لَازِمَ حَالِهٖ فِىْ جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ وَمُدَّةِ عُمْرِهٖ لَا يُعْتَبَرُ

যারা এ দু' কারণে ভুল করে এবং সন্দেহমূলকভাবে হাদীস বর্ণনা করে, পরবর্তীতে যদি এমন সব আলামত দ্বারা এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, যেগুলো হাদীস দুর্বল ও ক্রটিযুক্ত হবার প্রতি নির্দেশ করে, তাহলে উক্ত হাদীসকে 'মু'আল্লাল' বলে। এটা হাদীস শাস্ত্রের সর্বাধিক সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য অধ্যায়। এ বিষয়ে পারদর্শী কেবল ওই ব্যক্তিই হতে পারে, যাকে সঠিক বোধশক্তি, পরিব্যাপ্ত স্মরণশক্তি এবং হাদীস বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন স্তর, সনদগুলোর অবস্থাদি ও মতনসমূহ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি দান করা হয়েছে। যেমন, এ শাস্ত্রের পূর্ববর্তী বিজ্ঞ মনীষীগণ, যাঁদের আগমনের ধারা ইমাম দার-ই কুত্বনী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি (ওফাত ৩৮৫ হিজরী) পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে। আর কথিত আছে যে, তাঁর পরে তাঁর মতো এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কেউ আর আসে নি। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাতা।

স্মরণশক্তি ও সংরক্ষণজনিত দোষ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, নির্ভুলতা তার ভুলের চেয়ে অধিক না হওয়া এবং তার স্মরণশক্তি ও নির্ভুলতা তার বিস্মৃতি ও ভ্রমে পতিত হওয়ার চেয়ে বেশী না হওয়া। অর্থাৎ যদি তার ভুল ও বিস্মৃতি বেশী হয় কিংবা নির্ভুলতার সমান হয়, তাহলে তা স্মরণশক্তি ও সংরক্ষণজনিত দোষের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব, এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য হচ্ছে রাভীর নির্ভুলতা ও দৃঢ়তা এবং এ দু'এর আধিক্য। স্মরণশক্তি জনিত ক্রটি (سوء الحفظ) যদি রাভীর সর্বাবস্থায়, সব সময় এমনকি গোটা জীবনই লেগে থাকে (সারা জীবনে কখনো তা থেকে মুক্ত হতে পারে না) তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না ।

بِحَدِيْثِهٖ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُحَدِّثِيْنَ هٰذَا اَيْضًا دَاخِلٌ فِى الشَّاذِّ وَاِنْ طَرَأَ سُوْءُ الْحِفْظِ لِعَارِضٍ مِثْلُ اِخْتِلَالٍ فِى الْحَافِظَةِ بِسَبَبِ كِبَرِ سِنِّهٖ اَوْ ذَهَابِ بَصَرِهٖ اَوْفَوَاتِ كُتُبِهٖ فَهٰذَا يُسَمّٰى مُخْتَلِطًا فَمَا رُوِىَ قَبْلَ الْاِخْتِلَاطِ وَالْاِخْتِلَالِ مُتَمَيِّزًا عَمَّا رَوَاهُ بَعْدَ هٰذِهِ الْحَلِّ قُبِلَ وَاِنْ لَّمْ يَتَمَيَّزْ تُوُقِّفَ وَاِنِ اشْتَبَهَ فَكَذٰلِكَ وَاِنْ وُّجِدَ لِهٰذَا الْقِسْمِ مُتَابِعَاتٌ وَشَوَاهِدُ تَرَقّٰى مِنْ مَرْتَبَةِ الرَّدِّ اِلَى الْقُبُوْلِ وَالرُّجْحَانِ وَهٰذَا حُكْمُ اَحَادِيْثِ الْمَسْتُوْرِ وَالْمُدَلِّسِ وَالْمُرْسِلِ.

কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে, এটাও 'শায'-এর অন্তর্ভুক্ত।

'মুখতালাত্ব হাদীস'-এর সংজ্ঞা

আর যদি স্মরণশক্তিতে ত্রুটি কোন কারণবশত আপতিত হয়, যেমন স্মরণশক্তি ত্রুটিযুক্ত হওয়া- বয়োঃবৃদ্ধি কিংবা দৃষ্টিশক্তির বিলুপ্তি অথবা গ্রন্থাবলী হাত ছাড়া হওয়ার কারণে, তবে এমন অবস্থায় এরূপ হাদীসকে 'মুখতালাত্ব হাদীস' বলা হয়। সুতরাং এ মুখতালাত্ব হওয়া ও ত্রুটিযুক্ত হবার পূর্বে যেসব হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন, সেগুলো যদি এর পরবর্তী অবস্থায় বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে থাকে, তাহলে ওইসব হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি আলাদা করা না হয়, তাহলে তদনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আর যদি বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হয়, তাহলেও তা গ্রহণ করা থেকে অনুরূপ বিরত থাকতে হবে। যদি এ প্রকারের হাদীসের 'মুতাবি' ও 'শাহিদ' রেওয়ায়তসমূহ পাওয়া যায়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রাধিকারের মানে উন্নীত হবে। আর এটাই হচ্ছে- 'মাস্‌তূর', 'মুদাল্লিস' ও 'মুরসিল'র হাদীসসমূহের বিধান।[১৭]

১৭. 'মুখ্‌তালিত্ব'-এর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হওয়া নিম্নলিখিত চার অবস্থায় সীমাবদ্ধ হয়ঃ-

ক্রঃ নং	অবস্থা	বিধান
১.	যদি জানা যায় যে, এ বর্ণনাগুলো ইখ্‌তিলাত্ব'-এর পূর্বেকার, তাহলে-	নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য
২.	যদি জানা যায় যে, বর্ণনাগুলো 'ইখ্‌তিলাত্ব' -এর পরবর্তী, তাহলে-	নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত/বর্জনীয়
৩.	যদি বুঝা যায় যে, উভয় প্রকারের বর্ণনা রয়েছে তাহলে-	পূর্ববর্তী বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্য, আর পরবর্তীগুলো বর্জনীয়। [এ শর্তে যে, যদি পূর্ববর্তীগুলো ও পরবর্তীগুলো নির্ণয় করা যায়]
৪.	পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বর্ণনাগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা না গেলে-	গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

[পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

فَصْلٌ : اَلْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ اِنْ كَانَ رَاوِيْهِ وَاحِدًا يُسَمّٰى غَرِيْبًا وَاِنْ كَانَ اِثْنَيْنِ يُسَمّٰى عَزِيْزًا وَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ يُسَمّٰى مَشْهُوْرًا اَوْ مُسْتَفِيْضًا وَاِنْ بَلَغَتْ رُوَاتُهُ فِى الْكَثْرَةِ اِلٰى اَنْ يَّسْتَحِيْلَ الْعَادَةُ تَوَاطُئَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ يُسَمّٰى مُتَوَاتِرًا وَيُسَمّٰى الْغَرِيْبُ فَرْدًا اَيْضًا.

وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ رَاوِيْهِ وَاحِدًا كَوْنُهُ كَذٰلِكَ وَلَوْ فِىْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِّنَ الْاِسْنَادِ لٰكِنَّهُ يُسَمّٰى فَرْدًا نِّسْبِيًّا وَاِنْ كَانَ فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ مِّنْهُ يُسَمّٰى فَرْدًا مُّطْلَقًا.

وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِمَا اِثْنَيْنِ اَنْ يَّكُوْنَا فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ كَذٰلِكَ فَاِنْ كَانَ فِىْ مَوْضِعٍ وَّاحِدٍ مَّثَلًا لَّمْ يَكُنِ الْحَدِيْثُ عَزِيْزًا بَلْ غَرِيْبًا وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ مَعْنٰى اِعْتِبَارِ الْكَثْرَةِ فِى الْمَشْهُوْرِ اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْنِ وَهٰذَا

পরিচ্ছেদ ঃ গরীব, আযীয, মাশহুর ও মুতাওয়াতির হাদীসের বিবরণ

সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হলে তাকে 'গরীব' বলে। রাভী যদি দু'জন হয়, তবে তাকে 'আযীয' বলে। রাভীর সংখ্যা যদি দু'-এর অধিক হয়, তাহলে তাকে 'মশহুর' ও 'মুস্‌তাফীদ্ব' বলে। যদি রাভীদের সংখ্যাধিক্য এতজনে পৌঁছে যায় যে, তাঁদের মিথ্যা বলার উপর একমত হওয়া সাধারণতঃ অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তাকে 'মুতাওয়াতির' বলে। গরীব হাদীসকে 'ফরদ'ও বলা হয়।

(গরীব হাদীসের) রাভী একজন হওয়ার মানে হচ্ছে– রাভী একজনই হওয়া, যদিও সনদের কোন এক জায়গায় (স্তরে) হয়। কিন্তু তখন সেটাকে 'ফরদে নিসাবী' বলা হয়। আর যদি সেটার প্রতিটি স্থানে (যুগে) হয়, তাহলে সেটাকে 'ফরদ-ই মুত্বলাক্ব' বলা হয়।

আর রাভী দু'জন হওয়ার মানে হচ্ছে– প্রত্যেক স্থানে (যুগে) রাভীদের সংখ্যা তদ্রূপ হওয়া। যদি কোন এক স্থানে (যুগে) রাভী একজন হয়, তাহলে হাদীসটি 'আযীয' হবে না; বরং 'গরীব' হবে।

এ নিয়ম অনুসারে, মশহুর হাদীসের (রাভীর) সংখ্যাধিক্যের মানে হচ্ছে প্রত্যেক যুগে রাভীদের সংখ্যা দু'এর অধিক হওয়া। আর এটাই

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর] উল্লেখ্য, যে হাদীস রাভীর স্মরণ ও সংরক্ষণের (দ্বাবৃত) ত্রুটির কারণে অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হিসেবে পাওয়া যায়, তাহলে যদি সেটার 'শাওয়াহিদ' ও 'মুতাবি'আত' পাওয়া যায়, তবে ওই হাদীস 'প্রত্যাখ্যাত' থেকে 'গ্রহণযোগ্য'র মর্যাদায় উন্নীত হবে। উল্লেখ্য, 'মাসতূর', 'মুদাল্লাস' ও 'মুরসাল' হাদীসের বিধানও অনরূপ। অর্থাৎ মুতাবি'আত ও শাওয়াহিদ পাওয়া গেলে 'প্রত্যাখ্যাত' থেকে 'গ্রহণযোগ্য'র মর্যাদায় উন্নীত হবে ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

مَعْنٰى قَوْلِهِمْ اِنَّ الْاَقَلَّ حَاكِمٌ عَلَى الْاَكْثَرِ فِىْ هٰذَا الْفَنِّ فَافْهَمْ.

وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ اَنَّ الْغَرَابَةَ لَا تُنَافِى الصِّحَّةَ وَيَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ الْحَدِيْثُ صَحِيْحًا غَرِيْبًا بِاَنْ يَّكُوْنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رِّجَالِهٖ ثِقَةً وَالْغَرِيْبُ قَدْ يَقَعُ بِمَعْنَى الشَّاذِّ اَىْ شُذُوْذًا هُوَ مِنْ اَقْسَامِ الطَّعْنِ فِى الْحَدِيْثِ وَهٰذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الْمَصَابِيْحِ مِنْ قَوْلِهٖ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَمَّا قَالَ بِطَرِيْقِ الطَّعْنِ

মুহাদ্দিসগণের উক্তি-"এ শাস্ত্রে সংখ্যায় অধিকতর কম অধিকতর বেশীর উপর বিধান আরোপকারী" হওয়ার মর্মার্থ।[১৮]

পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা জানা গেলো যে, হাদীস 'গরীব হওয়া' সহীহ্ হওয়া'র পরিপন্থী নয়। একটি হাদীস একই সাথে 'সহীহ-গরীব' হতে পারে। তা এভাবে যে, তার প্রত্যেক রাভী নির্ভরযোগ্য হবে। আবার গরীব কখনও 'শায' অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এমন 'শায', যা হাদীস শাস্ত্রে ত্রুটির বহু প্রকারের একটি প্রকার। এটাই হচ্ছে 'মাসাবীহ' প্রণেতার উক্তি। 'এই হাদীসটি গরীব'-এর মর্মার্থ, যখন তিনি সমালোচনার দৃষ্টিতে বলেন।

---

১৮. হাদীস-ই 'গরীব', 'আযীয', 'মাশহুর' ও 'মুতাওয়াতির' চেনার বিবরণের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে- বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন স্তরে হাদীসের রাভী (বর্ণনাকারী)'র সংখ্যা কমবেশী হয়ে থাকে। কোন যুগে ওই সংখ্যা বেশী হয়ে যায়, আবার কোন যুগে কম হয়ে যায়। এর সংখ্যার ভিন্নতার ভিত্তিতে সংখ্যা কম হওয়ার অনুসারেই হাদীসের নাম রাখা হয়; সংখ্যাধিক্যের অনুসারে নয়। এ কারণেই বলা হয়- হাদীস শাস্ত্রে অধিকতর কম সংখ্যা বিধান আরোপকারী হয় অধিকতর বেশীর উপর। এ উক্তি নিম্নলিখিত নকশা থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠবে-

যুগ	স্তরসমূহ			
	বর্ণনাকারীর সংখ্যা	বর্ণনাকারীর সংখ্যা	বর্ণনাকারীর সংখ্যা	বর্ণনাকারীর সংখ্যা
১ম যুগ	১৫	১৫	২৫	অসংখ্য, গণনাতীত
২য় যুগ	৭	২	৩	অসংখ্য, গণনাতীত
৩য় যুগ	১	২৫	৩০	অসংখ্য, গণনাতীত
৪র্থ যুগ	১৫	৩০	২৪	অসংখ্য, গণনাতীত
হাদীস-ই	গরীব[১]	আযীয[২]	মাশহুর[৩]	মুতাওয়াতির[৪]

১. ৩য় যুগের সংখ্যানুসারে হাদীস গরীব হলো।

২. ২য় যুগের সংখ্যানুসারে হাদীস আযীয হলো।

৩. ২য় যুগের সংখ্যানুসারে হাদীস মাশহুর হলো।

৪. প্রতিটি যুগে রাভীর সংখ্যা অধিক ও অগণিত। তাই এ হাদীস মুতাওয়াতির। [আল কাওকাবুদ্ দুর্রী]

وَبَعْضُ النَّاسِ يُفَسِّرُوْنَ الشَّاذَّ بِمُفْرَدِ الرَّاوِىّ مِنْ غَيرِ اِعْتِبَارِ مُخَالَفَتِهِ لِلثِّقَاتِ كَمَا سَبَقَ وَيَقُوْلُوْنَ صَحِيْحٌ شَاذٌّ وَصَحِيْحٌ غَيْرُ شَاذٍّ فَالشُّذُوْذُ بِهٰذَا الْمَعْنٰى اَيْضًا لَا يُنَافِى الصِّحَّةَ كَالْغَرَابَةِ وَالَّذِىْ يُذْكَرُ فِىْ مَقَامِ الطَّعْنِ هُوَ مُخَالِفٌ لِلثِّقَاتِ.

فَصْلٌ : اَلْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ هُوَ الَّذِىْ فُقِدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِى الصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ كُلًّا اَوْ بَعْضًا وَيُذَمُّ رَاوِيْهِ بِشُذُوْذٍ اَوْ نَكَارَةٍ اَوْعِلَّةٍ. وَبِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ يَتَعَدَّدُ اَقْسَامُ الضَّعِيْفِ وَيَكْثُرُ اِفْرَادًا وَ تَرْكِيْبًا وَمَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ وَالْحَسَنِ لِذَاتِهِمَا وَلِغَيْرِهِمَا اَيْضًا بِتَفَاوُتِ الْمَرَاتِبِ وَالدَّرَجَاتِ فِىْ كَمَالِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمَاْخُوْذَةِ فِىْ مَفْهُوْمَيْهِمَا مَعَ وَجُوْدِ الْاِشْتِرَاكِ فِىْ اَصْلِ الصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ وَالْقَوْمُ ضَبَطُوْا مَرَاتِبَ الصِّحَّةِ وَعَيَّنُوْهَا وَذَكَرُوْا اَمْثِلَتَهَا مِنْ

কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস 'শায'-এর ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য রাভীদের বিরোধিতা করাকে গণ্য না করে শুধু রাভী একজন হওয়া দ্বারা করেন। যেমন- ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণেই তাঁরা এভাবে মন্তব্য করেন, "এ হাদীস 'সহীহ-শায্' অথবা হাদীসটি 'সহীহ' তবে 'শায' নয়।" অতএব, এ অর্থেও হাদীস 'শায হওয়া' 'সহীহ হওয়া'র পরিপন্থী নয়; যেমন হাদীস গরীব হওয়া সহীহ হওয়ার পরিপন্থী নয়। অবশ্য, সমালোচনার ক্ষেত্রে যে 'শায' উল্লেখ করা হয়, তা দ্বারা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিরোধিতা করে বর্ণনাকারী হওয়াই বুঝায়।

পরিচ্ছেদ ঃ দ্ব'ঈফ (الضعيف) হাদীস প্রসঙ্গ

দ্ব'ঈফ (দুর্বল) ওই হাদীসকে বলে, যার মধ্যে সহীহ ও হাসান হাদীসের মধ্যে বিবেচ্য সব ক'টি কিংবা কিছু শর্ত অনুপস্থিত। আর দ্ব'ঈফ হাদীসের রাভী 'শায' (নির্ভরযোগ্য রাভীর বিরোধিতাকারী), 'মুনকির' (দ্ব'ঈফ রাভী কর্তৃক অধিক দ্ব'ঈফ রাভীর বিরোধিতাকারী) এবং 'মু'আল্লিল' (ভ্রম ও বিস্মৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত) হিসেবে (অথবা 'শায', 'মুন্‌কার' কিংবা 'মু'আল্লাল হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে) নিন্দিত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দ্ব'ঈফ হাদীসের প্রকার অনেক হয়ে যায় এবং (দুর্বলতার কারণ) এক কিংবা একাধিক যুক্ত হওয়ার দিক দিয়েও (দ্ব'ঈফ হাদীসের প্রকার) অনেক হয়ে যায়। মৌলিকভাবে সহীহ ও হাসান হবার গুণ সুষ্ঠুভাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বে, এ দুটির মর্মার্থে বিবেচ্য ও গৃহীত গুণাবলীর পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর থাকার কারণে সহীহ এবং 'হাসান লি-যাতিহী ও লিগায়রিহী'র বহু স্তর রয়েছে।

মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীসের স্তরসমূহ সুবিন্যস্ত ও সুনির্দিষ্ট করেছেন। সাথে সাথে সনদের মাধ্যমে তার উদাহরণ

الْاَسَانِيْدِ وَقَالُوْا اِسْمُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ يَشْمَلُ رِجَالَهَا كُلَّهَا وَلٰكِنْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ.

وَاَمَّا اِطْلَاقُ اَصَحِّ الْاَسَانِيْدِ عَلٰى سَنَدٍ مَّخْصُوْصٍ عَلَى الْاِطْلَاقِ فَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَصَحُّ الْاَسَانِيْدِ زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ وَقِيْلَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَقِيْلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَالْحَقُّ اَنَّ الْحُكْمَ عَلٰى اِسْنَادٍ مَّخْصُوْصٍ بِالْاَصَحِّيَّةِ عَلَى الْاِطْلَاقِ غَيْرُ جَائِزٍ اِلَّا اَنَّ

উল্লেখ করে বলেন যে, এইগুলোর সকল রাভী দ্বাব্‌ত ও আদালত সম্পন্ন, তবে তাদের মধ্যে কেউ অন্যের তুলনায় উচ্চতর।[১৯]

বিশেষ কোন সনদকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ বলে আখ্যায়িত করা

বিশেষ কোন সনদকে শর্তহীনভাবে اَصَحُّ الْاَسَانِيْدِ (সর্বাধিক সহীহ্ সনদ) বলা হয় সে সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সর্বাধিক সহীহ্ সনদ হলো زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (ইমাম যায়নুল আবেদীন তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে)। কারো কারো মতে مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (ইমাম মালেক হযরত নাফি' থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে)। কারো কারো মতে الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (ইমাম যুহরী হযরত সালিম থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে।) বাস্তবসম্মত অভিমত হচ্ছে– কোন একটা বিশেষ সনদকে নিঃশর্তভাবে اَصَحُّ الْاَسَانِيْدِ (সর্বাধিক সহীহ্ সনদ) বলা বৈধ নয়। অবশ্য

১৯. দ্ব'ঈফ হাদীসের প্রকারভেদ এভাবেও বলা যায় ঃ

'সহীহ' ও 'হাসান' হাদীসের জন্য বিবেচ্য শর্তাবলী হচ্ছে নিম্নরূপ। ওইগুলোর মধ্যে যদি সব ক'টি কিংবা আংশিক শর্তাবলী অনুপস্থিত থাকে তবে 'হাদীস'কে দ্ব'ঈফ বলা হবে–

১. 'সহীহ' হাদীসের প্রথম শর্ত হচ্ছে সনদ মুত্তাসিল হওয়া। মুত্তাসিল না হলে হাদীস 'মুনক্বাতি' হয়ে যায়। 'মুনক্বাতি' হাদীসের সমস্ত প্রকারের মধ্যে 'দ্বু'ফ' বা দুর্বলতা থাকে।

২. দ্বিতীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে রাভীর 'আদালত'। এ আদালত ছুটে যাওয়ার পাঁচটি ধরন রয়েছে। তন্মধ্যে কোন একটি পাওয়া গেলে হাদীস দ্ব'ঈফ বা দুর্বল হয়ে যায়।

৩. তৃতীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে রাভীর মধ্যে 'দ্বাব্‌ত' (স্মরণ ও সংরক্ষণ)-এর গুণটি থাকা। এটা হাতছাড়া হবারও পাঁচটি পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে যে কোন একটি পাওয়া গেলেও হাদীসকে দূর্বল বলা যায়।

৪. চতুর্থ পূর্বশর্ত হচ্ছে 'শায' না হওয়া। 'শায' হলে 'হাদীস'-এ দুর্বলতা আসে।

৫. পঞ্চম পূর্বশর্ত হচ্ছে 'ইল্লাৎ' (সূক্ষ্ম ব্যাধি) মুক্ত হওয়া। সুতরাং হাদীসের 'মতন' বা 'সনদ'-এ বিশুদ্ধতা ক্ষতিগ্রস্তকারী ব্যাধি পাওয়া গেলে ওই হাদীসকে 'দ্ব'ঈফ' বা দুর্বল বলা হয়।

যেহেতু কোন অবস্থায় এক দিক দিয়ে 'দুর্বলতা' আসে, আবার কোন অবস্থায় একাধিক দিক দিয়ে দুর্বলতা আসে, সেহেতু 'দ্ব'ঈফ হাদীস' ৪২ প্রকারের রয়েছে। কেউ কেউ ৪৯ প্রকার, আবার কেউ কেউ ১২৯ প্রকার বলেছেন। প্রণেতা মহোদয়ের উক্তি (وَبِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ يَتَعَدَّدُ اَقْسَامٌ الخ)-এর অর্থ এটাই। অর্থাৎ দুর্বল হবার কারণ কখনো একক (مُنْفَرِدٌ) হয়, কখনো একাধিক (مُرَكَّبٌ) হয়।

فِى الصِّحَّةِ مَرَاتِبُ عُلْيَا وَعِدَّةٌ مِّنَ الْاَسَانِيْدِ يَدْخُلُ فِيْهَا وَلَوْ قُيِّدَ بِقَيْدٍ بِاَنْ يُّقَالَ اَصَحُّ اَسَانِيْدِ الْبَلَدِ الْفُلَانِىِّ اَوْفِى الْبَابِ الْفُلَانِىِّ اَوْ فِى الْمَسْئَلَةِ الْفُلَانِيَّةِ يَصِحُّ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

فَصْلٌ : مِنْ عَادَةِ التِّرْمِذِىِّ اَنْ يَّقُوْلَ فِىْ جَامِعِهٖ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ، حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ، وَلَا شُبْهَةَ فِىْ جَوَازِ اِجْتِمَاعِ الْحُسْنِ وَالصِّحَّةِ بِاَنْ يَّكُوْنَ حَسَنًا لِذَاتِهٖ وَصَحِيْحًا لِغَيْرِهٖ وَكَذٰلِكَ فِىْ اِجْتِمَاعِ الْغَرَابَةِ وَالصِّحَّةِ كَمَا اَسْلَفْنَا.

وَاَمَّا اِجْتِمَاعُ الْغَرَابَةِ وَالْحُسْنِ فَيَسْتَشْكِلُوْنَهٗ بِاَنَّ التِّرْمِذِىَّ اِعْتَبَرَ فِى الْحُسْنِ تَعَدُّدُ الطُّرُقِ فَكَيْفَ يَكُوْنُ غَرِيْبًا وَيُجِيْبُوْنَ بِاَنَّ اِعْتِبَارَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِى الْحُسْنِ لَيْسَ عَلَى الْاِطْلَاقِ بَلْ فِىْ قِسْمٍ مِّنْهُ وَحَيْثُ حَكَمَ بِاجْتِمَاعِ الْحُسْنِ

সহীহ হবারও বিভিন্ন উঁচু স্তর রয়েছে। আর এমন অনেক সনদ আছে, যেগুলো ওইগুলোতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ 'সর্বাধিক সহীহ্'র সাথে যদি কোন শর্ত যুক্ত করা হয়, যেমন যদি বলা হয় 'অমুক শহরের সর্বাধিক সহীহ সনদ' অথবা 'অমুক অধ্যায়ের সর্বাধিক সহীহ সনদ' কিংবা 'অমুক মাস্‌আলার সর্বাধিক সহীহ সনদ' তাহলে তাকে 'সর্বাধিক সহীহ' বলা যেতে পারে।

পরিচ্ছেদ ঃ একই হাদীস 'হাসান', 'সহীহ্' এবং 'গরীব' হওয়া প্রসঙ্গে

ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির রীতি হচ্ছে– তিনি তাঁর জামি' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি 'হাসান-সহীহ', হাদীসটি 'গরীব-হাসান', হাদীসটি 'গরীব-সহীহ্'। একই হাদীসে 'গরীব-সহীহ'র সমাবেশ সম্ভব। এতে কোন সন্দেহ নেই। এভাবে যে, সেটা (বর্ণনাকারীদের গুণাবলীর দৃষ্টিকোণ্ থেকে) 'হাসান লি-যা-তিহী' হবে, আর (সনদের আধিক্যের দৃষ্টিকোণ্ থেকে) সহীহ লিগাইরিহী। অনুরূপভাবে, 'গরীব' ও 'সহীহ্'র সমাবেশও অসম্ভব নয়। যেমন আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

অবশ্য, একই হাদীসে 'গরীব' ও 'হাসান'-এর সমাবেশ হওয়াকে মুহাদ্দিসগণ জটিল মনে করেন। কেননা, ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হাদীস 'হাসান' হওয়ার জন্য সনদের আধিক্যকে বিবেচনায় এনেছেন। অতএব, সেটা আবার 'গরীব'ও কিভাবে হতে পারে?

মুহাদ্দিসগণ উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছেন–

ইমাম তিরমিযীর বিবেচ্য 'হাসান'র মধ্যে সনদের আধিক্যের শর্তারোপ নিঃশর্তভাবে নয়; বরং 'হাসান'র এক প্রকারের মধ্যে। আর যেখানে তিনি 'হাসান' ও 'গরীব'র সমাবেশের

وَالْغَرَابَةِ الْمُرَادُ قِسْمٌ اٰخَرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ اَشَارَ بِذٰلِكَ اِلٰى اِخْتِلَافِ الطُّرُقِ بِاَنْ جَآءَ فِىْ بَعْضِ الطُّرُقِ غَرِيْبًا وَفِىْ بَعْضِهَا حَسَنًا وَقِيْلَ اَلْوَاوُ بِمَعْنٰى اَوْ بِاَنَّهُ يَشُكُّ وَيَتَرَدَّدُ فِىْ اَنَّهُ غَرِيْبٌ اَوْ حَسَنٌ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهٖ جَزْمًا وَقِيْلَ اَلْمُرَادُ بِالْحَسَنِ هٰهُنَا لَيْسَ مَعْنَاهُ الْاِصْطِلَاحِىَّ بَلِ اللُّغَوِىَّ بِمَعْنٰى مَا يَمِيْلُ اِلَيْهِ الطَّبْعُ وَهٰذَا الْقَوْلُ بَعِيْدٌ جِدًّا.

فَصْلٌ : اَلْاِحْتِجَاجُ فِى الْاَحْكَامِ بِالْخَبَرِ الصَّحِيْحِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَكَذٰلِكَ بِالْحَسَنِ لِذَاتِهٖ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَآءِ وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيْحِ فِىْ بَابِ الْاِحْتِجَاجِ وَاِنْ كَانَ دُوْنَهُ فِى الْمَرْتَبَةِ وَالْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ الَّذِىْ بَلَغَ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ مَرْتَبَةَ الْحَسَنِ لِغَيْرِهٖ اَيْضًا مُجْمَعٌ.

বৈধতা আরোপ করেছেন, সেটা দ্বারা 'হাসান'র অন্য প্রকার বুঝানো উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি এটা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সনদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তা এভাবে যে, কোন সনদে 'গরীব' আবার কোন সনদে 'হাসান' বর্ণিত হয়েছে।

কারো কারো মতে, এখানে (وَاوْ) অব্যয়টি (اَوْ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা এভাবে যে, তিনি এ মর্মে সংশয়বোধ করেছেন যে, হাদীসটি হয়তো 'গরীব' নতুবা 'হাসান'– সেটার পরিচিতি নিশ্চিতভাবে না পাবার কারণে।

কারো কারো মতে, এখানে 'হাসান' দ্বারা সেটার পারিভাষিক অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং আভিধানিক অর্থ বুঝানো (উদ্দেশ্য)। আর 'হাসান'র আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– এমন বস্তু, যার প্রতি স্বভাব আকৃষ্ট হয়। তবে এ অভিমত সম্ভাব্যতা থেকে একেবারেই বহুদূরে।

পরিচ্ছেদ ঃ সহীহ্, হাসান ও দ্ব'ঈফ হাদীস দ্বারা শর'ঈ বিধানের দলীল গ্রহণ প্রসঙ্গ

বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসকে দলীল-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা 'ইজমা' বা সর্বজন স্বীকৃত। অনুরূপ, 'হাসান লিযা-তিহী' দ্বারা (দলীল গ্রহণ করা)ও অধিকাংশ আলিমের মতে গ্রহণযোগ্য। আর 'হাসান লিযা-তিহী' দলীলরূপে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত; যদিও তা মর্যাদার দিক দিয়ে সহীহ হাদীস থেকে নিম্নতর। আবার 'হাদীস-ই দ্ব'ঈফ'ও যদি সনদের আধিক্যের দরুন 'হাসান লি-গায়রিহী'র সমস্তরে পৌঁছে যায়, তাহলে সেটা (দলীলরূপে উপস্থাপন)'র পক্ষেও সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন।

وَمَا اشْتَهَرَ اَنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ مُعْتَبَرٌ فِىْ فَضَآئِلِ الْاَعْمَالِ لَا فِىْ غَيْرِهَا، اَلْمُرَادُ مُفْرَدَاتُهٗ لَا مَجْمُوْعُهَا لِاَنَّهٗ دَاخِلٌ فِى الْحَسَنِ لَا فِى الضَّعِيْفِ. صَرَّحَ بِهِ الْاَئِمَّةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنْ كَانَ الضَّعِيْفُ مِنْ جِهَةِ سُوْءِ حِفْظٍ اَوْ اِخْتِلَاطٍ اَوْ تَدْلِيْسٍ مَعَ وُجُوْدِ الصِّدْقِ وَ الدِّيَانَةِ يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَاِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ اِتِّهَامِ الْكِذْبِ اَوِ الشُّذُوْذِ اَوْ فُحْشِ الْغَلَطِ لَا يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَالْحَدِيْثُ مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ بِالضَّعِيْفِ وَمَعْمُوْلٌ بِهٖ فِىْ فَضَآئِلِ الْاَعْمَالِ. وَعَلٰى مِثْلِ هٰذَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُّحْمَلَ مَا قِيْلَ اِنَّ لُحُوْقَ الضَّعِيْفِ بِالضَّعِيْفِ لَا يُفِيْدُ قُوَّةً وَّ اِلَّا فَهٰذَا الْقَوْلُ ظَاهِرُ الْفَسَادِ، فَتَدَبَّرْ.

فَصْلٌ : لَمَّا تَفَاوَتَتْ مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ وَالصِّحَاحُ بَعْضُهَا اَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ فَاعْلَمْ اَنَّ الَّذِىْ تَقَرَّرَ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ اِنَّ صَحِيْحَ الْبُخَارِىِّ مُقَدَّمٌ

প্রসিদ্ধি আছে যে, দ্ব'ঈফ হাদীস আমলগুলোর ফযীলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য; অন্যত্র নয়। এর মানে হচ্ছে- একক দ্ব'ঈফ হাদীস; একাধিক সনদে বর্ণিত দ্ব'ঈফ হাদীস নয়; কেননা, তা (একাধিক সনদে বর্ণিত দ্ব'ঈফ হাদীস) 'হাসান হাদীস'র অন্তর্ভুক্ত; দ্ব'ঈফ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ব্যাপারে ইমামগণ সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, রাভীর মধ্যে সত্যবাদিতা ও ধার্মিকতা বিদ্যমান থাকলে এবং স্মরণশক্তি 'মুখতালাত্ব সুলভ' হওয়া কিংবা তাদলীসজনিত ত্রুটির কারণে যদি হাদীস দ্ব'ঈফ হয়, তাহলে সনদের আধিক্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।

আর যদি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া অথবা শায হাওয়া কিংবা মাত্রাতিরিক্ত ভুলের কারণে হাদীস দ্ব'ঈফ হয়, তাহলে সনদের আধিক্য ক্ষতিপূরণ করবে না। ফলে হাদীসটিকে দ্ব'ঈফ বলে আখ্যায়িত করা হবে এবং আমলসমূহের ফযীলতের ক্ষেত্রে তা আমলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

আর 'দ্ব'ঈফ হাদীসের সাথে দ্ব'ঈফ হাদীস মিলিত হলে (দ্ব'ঈফ হাদীস) শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে উপকারী নয়' মর্মে যা বলা হয়েছে সেটাকে উক্ত (এ শেষোক্ত) প্রকারের উপর প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

অন্যথায় এ উক্তি স্পষ্টতই ফ্যাসাদ বা বাতিল। গভীরভাবে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে সেটা অনুধাবন করো।

পরিচ্ছেদ ঃ সহীহ বোখারী অপরাপর হাদীস গ্রন্থের চেয়ে অগ্রগণ্য

যখন সহীহ হাদীসের স্তরগুলো (শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে) ব্যবধানপূর্ণ বলে প্রমাণিত হলো, অর্থাৎ সহীহগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক অপর কিছু সংখ্যকের চেয়ে অধিক সহীহ বলে প্রমাণিত হলো, তখন জেনে রেখো যে, অধিকাংশ (জুমহুর) মুহাদ্দিসের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো যে, ইমাম বোখারীর সহীহ গ্রন্থটি

عَلٰى سَائِرِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ حَتّٰى قَالُوْا اَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللّٰهِ صَحِيْحُ الْبُخَارِىِّ۔

وَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ رَجَّحُوْا صَحِيْحَ مُسْلِمٍ عَلٰى صَحِيْحِ الْبُخَارِىِّ وَالْجُمْهُوْرُ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ هٰذَا فِيْمَا يَرْجِعُ اِلٰى حُسْنِ الْبَيَانِ وَجَوْدَةِ الْوَضْعِ وَالتَّرْتِيْبِ وَرِعَايَةِ دَقَائِقِ الْاِشَارَاتِ وَمَحَاسِنِ النِّكَاتِ فِىْ الْاَسَانِيْدِ وَهٰذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ وَالْكَلَامُ فِىْ الصِّحَةِ وَالْقُوَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا۔

وَلَيْسَ كِتَابٌ يُسَاوِىْ صَحِيْحَ الْبُخَارِىِّ فِىْ هٰذَا الْبَابِ بِدَلِيْلِ كَمَالِ الصِّفَاتِ الَّتِىْ اُعْتُبِرَتْ فِىْ الصِّحَةِ فِىْ رِجَالِهٖ وَبَعْضُهُمْ تَوَقَّفَ فِىْ تَرْجِيْحِ اَحَدِهِمَا عَلَى الْاٰخَرِ وَالْحَقُّ هُوَ الْاَوَّلُ۔

وَالْحَدِيْثُ الَّذِىْ اِتَّفَقَ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَلٰى تَخْرِيْجِهٖ يُسَمّٰى مُتَّفَقًا عَلَيْهِ

অপরাপর হাদীসের গ্রন্থগুলোর তুলনায় সর্বাপেক্ষা বেশী সহীহ্। এমনকি তাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের পর সর্বাপেক্ষা অধিক সহীহ্ কিতাব হচ্ছে ইমাম বোখারীর সহীহ্ গ্রন্থ।

কোন কোন মরক্কোবাসী মুহাদ্দিস সহীহ্ মুসলিমকে সহীহ-বোখারীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন; কিন্তু জুমহুর মুহাদ্দিসগণ বলেন, সহীহ মুসলিমকে প্রাধান্য দেওয়াটা সুন্দর বর্ণনা, উৎকৃষ্ট প্রণয়ন ও বিন্যাস, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং সনদে সূক্ষ্ম বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করার ভিত্তিতেই; অথচ এটা আলোচনা বহির্ভূত বিষয়। কেননা, আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে– হাদীসের বিশুদ্ধতা ও শক্তিশালী হওয়া এবং এ দু'য়ের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলী। আর এ পর্যায়ে ইমাম বোখারীর সহীহ গ্রন্থের সমমানের কোন কিতাব নেই। এর প্রমাণ হচ্ছে– হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে বিবেচিত গুণাবলী বোখারীর রাভীদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিবেচনায় আনা হয়েছে (এবং ওইগুলো তাঁদের মধ্যে বিদ্যমানও রয়েছে)। কোন কোন হাদীস বিশারদ (বোখারী ও মুসলিমের মধ্যে) একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য প্রদান থেকে বিরত রয়েছেন। অবশ্য প্রথম অভিমতটিই বাস্তবসম্মত।

'মুত্তাফাক্ব আলায়হি' হাদীসের সংজ্ঞা এবং সহীহ হাদীসের স্তরসমূহের বিবরণ

যে হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে বোখারী ও মুসলিম উভয়ই একমত হয়েছেন, (অর্থাৎ উভয়ই তাঁদের নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন) তাকে 'মুত্তাফাক্ব আলায়হি হাদীস' বলা হয়।

وَقَالَ الشَّيْخُ بِشَرْطِ اَنْ يَّكُوْنَ عَنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ وَقَالُوْا مَجْمُوْعُ الْاَحَادِيْثِ الْمُتَّفَقَةِ عَلَيْهَا الْفَانِ وَثَلْثُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَّعِشْرُوْنَ وَبِالْجُمْلَةِ مَا اتفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مُقَدَّمٌ عَلٰى غَيْرِهٖ ثُمَّ مَا تَفَرَّدَ بِهٖ الْبُخَارِيُّ ثُمَّ مَا تَفَرَّدَ بِهٖ مُسْلِمٌ ثُمَّ مَاكَانَ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ثُمَّ مَاهُوَ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ثُمَّ مَا هُوَ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ ثُمَّ مَا هُوَ رَوَاهُ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الَّذِيْنَ اِلْتَزَمُوْا الصِّحَّةَ وَصَحَّحُوْهُ فَالْاَقْسَامُ سَبْعَةٌ وَالْمُرَادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ اَنْ يَّكُوْنَ الرِّجَالُ مُتَّصِفِيْنَ بِالصِّفَاتِ الَّتِيْ يُتَّصَفُ بِهَا رِجَالُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنَ الضَّبْطِ وَالْعَدَالَةِ وَعَدَمِ الشُّذُوْذِ وَالنَّكَارَةِ وَالْغَفْلَةِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ رِجَالُهُمَا اَنْفُسَهُمْ وَالْكَلَامُ فِيْ هٰذَا طَوِيْلٌ ذَكَرْنَاهُ فِيْ

হযরত শায়খ (আল্লামা ইবনে হাজর আস্‌ক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, একই সাহাবী থেকে বর্ণিত হওয়ার শর্তে হাদীস 'মুত্তাফাক্ব আলায়হি' হবে। মুহাদ্দিসগণ বলেন, 'মুত্তাফাক্ব আলায়হি' হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা হলো দুই হাজার তিনশ' ছাব্বিশটি। মোট কথা, শায়খাঈন তথা ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে যে হাদীস সংকলনের ব্যাপারে একমত হয়েছেন সেটা অন্যগুলোর তুলনায় অগ্রগণ্য হবে। অতঃপর যে হাদীসটি একাকী ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বর্ণনা করেছেন, তারপর যেটা ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি একাকী বর্ণনা করেছেন, এরপর যেটা ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে, অতঃপর যেটা শুধু ইমাম বোখারীর শর্ত অনুযায়ী হয়, এরপর যেটা শুধু ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হবে, অতঃপর ওইসব হাদীস, যেগুলো ইমাম বোখারী ও মুসলিম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিমা ছাড়া অন্যান্য ওই সব ইমাম বর্ণনা করেছেন, যাঁরা সর্বদা সহীহ হাদীস বর্ণনা করাকে নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নিয়েছেন, আর তাঁরা যেসব হাদীসকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব সর্বমোট সাত প্রকার হলো।

ইমাম বোখারী এবং ইমাম মুসলিমের শর্তাবলীর প্রসঙ্গ

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তাবলী দ্বারা একথা বুঝানো হয়, 'দ্বাবৃত' (বা স্মরণ ও সংরক্ষণ), 'আদালত' (বা সত্যবাদিতা ও ধার্মিকতা বিশিষ্ট হওয়া) এবং শায হওয়া থেকে মুক্ত হওয়া, নির্ভরযোগ্য রাভীর বিরোধিতা বা মুনকার হওয়া থেকে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ দ্ব'ঈফ রাভীর আরেক দ্ব'ঈফ রাভীর বিরোধী না হওয়া, গাফলত বা ভ্রমমুক্ত হওয়া (ইত্যাদি) যে সব গুণে বোখারী ও মুসলিমের রাভীগণ গুণান্বিত, ওই সব গুণে অন্য কোন হাদীসের রাভীগণও অনুরূপ গুণসম্পন্ন হওয়া। কেউ কেউ বলেন, বোখারী ও মুসলিমের শর্তাবলী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বয়ং তাঁদের রাভীগণ। এ ব্যাপারে আলোচনা অতি দীর্ঘ। তা আমি উল্লেখ করেছি

مُقَدِّمَةِ شَرْحِ سَفَرِ السَّعَادَةِ-

فَصْلٌ : اَلاحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ لَمْ تَنْحَصِرْ فِىْ صَحِيْحَي الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ وَلَمْ يَسْتَوْعِبَا الصِّحَاحَ كُلَّهَا بَلْ هُمَا مُنْحَصِرَانِ فِىْ الصِّحَاحِ وَالصِّحَاحُ الَّتِىْ عِنْدَهُمَا وَعَلَى شَرْطِهِمَا اَيْضًا لَمْ يُوْرِدَا هُمَا فِىْ كِتَابَيْهِمَا فَضْلاً عَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمَا قَالَ الْبُخَارِىُّ مَا اَوْرَدْتُّ فِىْ كِتَابِىْ هٰذَا اِلَّا مَا صَحَّ وَلَقَدْ تَرَكْتُ كَثِيْرًا مِنَ الصِّحَاحِ وَقَالَ مُسْلِمٌ اَلَّذِىْ اَوْ رَدْتُّ فِىْ هٰذَا الْكِتَابِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ صَحِيْحٌ وَلَا اَقُوْلُ اِنَّ مَا تَرَكْتُ ضَعِيْفٌ وَلَا بُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ هٰذَا

'সফরুস্ সা'আদাসা'র ব্যাখ্যা গ্রন্থের ভূমিকায়।[২০]

পরিচ্ছেদ ঃ সহীহ হাদীসসমূহ বোখারী ও মুসলিমে সীমাবদ্ধ নয়

সহীহ হাদীসসমূহ শুধু বোখারী ও মুসলিমের সহীহ গ্রন্থ দু'টিতেই সীমাবদ্ধ নয় এবং তাঁরা দু'জন সমস্ত সহীহ হাদীসকে তাঁদের কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেন নি, বরং তাঁদের কিতাব দু'টিই সহীহ হাদীসে সীমাবদ্ধ। যেখানে তাঁদের সংগ্রহে যত সহীহ হাদীস ছিলো এবং তাঁদের শর্তানুযায়ী যে সব সহীহ হাদীস রয়েছে সবগুলোকে তাঁরা তাঁদের কিতাব দু'টিতে বর্ণনা করেন নি, সেখানে যে সব সহীহ হাদীস অন্যান্য মুহাদ্দিসের সংগ্রহে রয়েছে সেগুলো বর্ণনা করার প্রশ্নই আসে না।

ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, আমি আমার এ সহীহ গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছি এবং অনেক সহীহ হাদীস আমি উল্লেখ করি নি। ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, আমার এ গ্রন্থে যেসব হাদীস আমি উল্লেখ করেছি সেগুলোর সবই সহীহ, তবে এ কথা বলছি না যে, যা উল্লেখ করিনি তা দ্ব'ঈফ। তবে এ

২০. ইমাম বোখারী ও মুসলিম আপন আপন সহীহগ্রন্থে হাদীস লিপিবদ্ধ করার জন্য কতগুলো পূর্বশর্ত কায়েম করেছেন। ওইগুলো নিম্নরূপ ঃ

ইমাম বোখারীর শর্তাবলী ঃ

ইমাম বোখারী আপন 'সহীহ'তে হাদীস লিপিবদ্ধ করার জন্য এ পূর্বশর্ত কায়েম করেছেন যে, তাঁর শায়খ (ওস্তাদ) থেকে আরম্ভ করে সাহাবী পর্যন্ত সমস্ত রাভী (বর্ণনাকারী) 'সিক্বাহ্' নির্ভরযোগ্য হবেন এবং 'মুত্তাসিল' হবেন। 'সিক্বাহ্' মানে ওই হাদীসের সমস্ত রাভী মুসলিম, আদিল (আদালতের অধিকারী), কামিলুদ্ব দ্বাবৃতে ওয়াল ইতক্বান (হাদীস স্মরণ ও সংরক্ষণে পূর্ণাঙ্গ), শায়খের সাথে অধিক পরিমাণে সাক্ষাৎকারী ও সাহচর্যে অবস্থানকারী হবেন।

অবশ্য তিনি ওই রাভীর হাদীসও গ্রহণ করেন, যিনি (অন্যান্য গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও) ওস্তাদের সাথে কম সাক্ষাৎ ও কম সাহচর্যের অধিকারী। তবে তিনি এমন পর্যায়ের রাভীদের হাদীস একচ্ছত্রভাবে নেননি, বরং তাঁদের মধ্যে

[পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

التَرْكِ وَالْاِتْيَانِ وَجْهُ تَخْصِيْصِ الْاِيْرَادِ وَالتَرْكِ اِمَّا مِنْ جِهَةِ الصِّحَةِ اَوْ مِنْ جِهَةِ مَقَاصِدَ اُخَرَ وَالْحَاكِمُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ النِّسَافُوْرِىُّ صَنَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ اَلْمُسْتَدْرَكَ بِمَعْنٰى اَنَّ مَا تَرَكَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ مِنَ الصِّحَاحِ اَوْرَدَهُ فِىْ هٰذَ الْكِتَابِ۔

وتَلَافٰى وَاسْتَدْرَكَ بَعْضُهَا عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَبَعْضُهَا عَلٰى شَرْطِ اَحْدِهِمَا وَبَعْضُهَا عَلٰى غَيْرِ شَرْطِهِمَا وَقَالَ اِنَّ الْبُخَارِىَّ وَمُسْلِمًا لَمْ يَحْكُمَا

উল্লেখ করা ও পরিত্যাগ করার পেছনে অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ রয়েছে। হয়তো বিশুদ্ধতার বিষয় কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'আল মুস্তাদ্‌রাক' নামে একটি কিতাব প্রণয়ন করেছেন। এ নামে নামকরণের তাৎপর্য হলো– ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিমা যে সব সহীহ হাদীস বর্ণনা করেননি, তিনি সেগুলো এ কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

হাতছাড়া হয়েছে এমন কিছু হাদীস উল্লেখ করে প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ করেছেন– সেগুলোর কোনটি শায়খাঈনের শর্তানুযায়ী সহীহ, আবার কোনটি তাঁদের একজনের শর্ত মোতাবেক সহীহ। এমনও কিছু রয়েছে, যেগুলো তাঁদের উভয়ের শর্ত মোতাবেক সহীহ এবং তিনি বলেছেন, ইমাম বোখারী ও মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা এ ফয়সালা করেন নি যে,

---

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর] যাচাই-বাছাই করেছেন।

তাছাড়া, 'সিক্বাহ' বা নির্ভরযোগ্য রাভীদের জন্য এ পূর্বশর্তও কায়েম করেছেন যে, তিনি নিজ থেকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য রাভীদের বিরোধিতা করবেন না এবং তাঁদের মধ্যে কোন অস্পষ্ট ক্ষতিকর কারণ (ব্যাধি) থাকবে না।

আর 'মুত্তাসিল' হওয়া মানে প্রত্যেক রাভী হয়তো আপন শায়খ থেকে سَمِعْتُ (আমি শুনেছি) অথবা حَدَّثَنَا আমাদেরকে হাদীস বলেছেন) দ্বারা হাদীস শোনার বিষয়টি স্পষ্ট করবেন। অথবা এমন শব্দরূপ ব্যবহার করবেন, যা দ্বারা হাদীস শোনার বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন– عَنْ فُلَانٍ اَوْ اِنَّ فُلَانًا قَالَ (অমুক থেকে অথবা অমুক বলেছেন)। এ দ্বিতীয় অবস্থায় একথা আবশ্যকীয় যে, বর্ণনাকারী ও যাঁর থেকে বর্ণনা করছেন তিনি– উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হবে। আর ওই রাভী 'মুদাল্লিস' হবেন না।

ইমাম মুসলিমের শর্তাবলী

ইমাম মুসলিম আপন জামি'-সহীহ গ্রন্থে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য এ পূর্বশর্ত সাব্যস্ত করেছেন যে, হাদীস উদ্ধৃতকারী সমস্ত রাভী মুসলমান, আদালতের অধিকারী, নির্ভরযোগ্য, মুত্তাসিল, শায নন ও 'মু'আল্লাল' নন এমন হবেন।

ইমাম মুসলিম এ শর্তটিও কায়েম করেছেন যে, ওই হাদীস সহীহ হবার উপর ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

[পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

بِاَنَّهُ لَيْسَ اَحَادِيْثُ صَحِيْحَةٌ غَيْرَ مَا خَرَّجَاهُ فِيْ هٰذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ - وَقَالَ قَدْ حَدَثَ فِيْ عَصْرِنَا هٰذَا فِرْقَةٌ مِّنَ الْمُبْتَدِعَةِ اَطَالُوْا اَلْسِنَتَهُمْ بِالطَّعْنِ عَلٰى اَئِمَّةِ الدِّيْنِ بِاَنَّ مَجْمُوْعَ مَا صَحَّ عِنْدَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ لَمْ يَبْلُغْ زُهَاءَ عَشْرَةِ الْاٰفٍ وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ اَنَّهُ قَالَ حَفِظْتُ مِنَ الصِّحَاحِ مِائَةَ اَلْفِ حَدِيْثٍ وَمِنْ غَيْرِ الصِّحَاحِ مِاَتَىْ اَلْفٍ وَالظَّاهِرُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّهُ يُرِيْدُ الصَّحِيْحَ عَلٰى شَرْطِهٖ وَمَبْلَغُ مَا اَوْرَدَ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ مَعَ التَّكْرَارِ سَبْعَةُ الْاٰفٍ وَمِائَتَانِ وَ

তাঁরা দু'জন তাঁদের সহীহ কিতাব দু'টিতে যেসব হাদীস সংকলন করেছেন সেগুলো ছাড়া অন্য কোন সহীহ হাদীস নেই। তিনি বলেছেন, আমাদের এ যুগে বিদ্'আতসম্পন্নকারীদের একটি দলের উদ্ভব হয়েছে, যারা দ্বীনের মহা মনীষী ও ইমামদের সমালোচনায় তাদের রসনাকে দীর্ঘায়িত করেছে। (তারা বলে) তোমাদের সংগৃহীত হাদীসসমূহ হতে সহীহ্ প্রমাণিত হাদীসগুলোর সমষ্টি দশ হাজারের কাছাকাছি হবে না। ইমাম বোখারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি সহীহ্ হাদীস হতে এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছি। আর সহীহ নয় এমন হাদীস মুখস্থ করেছি দু'লক্ষ। সুস্পষ্ট কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাতা। (তাঁর উক্তিতে) 'সহীহ' দ্বারা তিনি তাঁর শর্তানুসারে 'সহীহ হাদীস' বুঝিয়েছেন। বস্তুতঃ তাঁর এ সহীহ কিতাবে তিনি যেসব হাদীস সংকলন করেছেন, সেগুলোর সংখ্যা পুনরাবৃত্তিসহ সাত হাজার দুইশত

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর] ইমাম মুসলিম 'সিক্বাহ' বা নির্ভরযোগ্য হবার মানদণ্ড সাব্যস্ত করেছেন- ওই রাভী প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের হবেন। অর্থাৎ 'দ্বারত্' ও 'ইত্ক্বান'-এ পূর্ণাঙ্গ এবং ওস্তাদের অধিক সাহচর্যপ্রাপ্ত হবেন। এটা হচ্ছে প্রথম স্তর, অথবা 'দ্বাবৃত' (স্মরণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা) পূর্ণাঙ্গ, তবে ওস্তাদের সাহচর্য কম। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর। বাকী রইলো তৃতীয় স্তর। তাহচ্ছে- দ্বাবৃত (স্মরণ-সংরক্ষণ) ত্রুটিপূর্ণ, তবে ওস্তাদের সাহচর্য বেশী পেয়েছেন। এ স্তরের রাভীদের থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে ইমাম মুসলিম বাছাই-নির্বাচন করেন। আর একচ্ছত্রভাবে হাদীস শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর থেকেই বর্ণনা করেছেন।

আর 'মুত্তাসিল' হবার মানদণ্ড তাঁর নিকট এ যে, বর্ণনাকারী ও যাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি- উভয়ের মধ্যে সমসাময়িকতার প্রমাণ থাকবে।

অর্থাৎ ইমাম মুসলিম হাদীস বর্ণনাকারীদের তিনটি স্তর করেছেন- প্রথম স্তর হচ্ছে যারা 'দ্বাবৃত' ও 'ইতক্বান'-এর মধ্যে সবার উর্ধ্বে হবেন। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে মাঝারী পর্যায়ের। আর তৃতীয় পর্যায়ের রাভীদের হাদীস পরিত্যাক্ত, তবে যাঁরা মিথ্যাবাদিতার অপবাদে অভিযুক্ত নন, তাঁরা (ব্যতিক্রম, অর্থাৎ তাদের হাদীস পরিত্যাক্ত হবে না।)। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্‌তে হাদীস আনার জন্য এ পূর্বশর্ত নির্দ্ধারণ করেছেন যে, ওই বর্ণনাকারী প্রথম দু'স্তরের হবেন। তবে উভয় স্তরের মধ্যে প্রথম স্তরের বর্ণনাগুলো প্রাধান্যপ্রাপ্ত হবে। আর তৃতীয় স্তরের রাভীর বর্ণনা গ্রহণ করা সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি এ (তৃতীয়) পর্যায়ের হাদীসসমূহ তাঁর কিতাবে আনবেন না।

উল্লেখ্য, এতদ্‌সত্ত্বেও সহীহ্ মুসলিম শরীফে তৃতীয় স্তরের মুহাদ্দিসের হাদীসও সন্নিবিষ্ট রয়েছে। তবে মৌলিকভাবে নয়, বরং আনুষঙ্গিকভাবে সমর্থনকারীর ভূমিকায় এনেছেন। অথবা এ পর্যায়ের বর্ণনাদি তখনই এনেছেন, যখন ওইগুলো কোন অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য (যেমন- উন্নত সনদ)-এর অধিকারী ছিলো।

তাছাড়া, একথাও বলা হয়েছে যে, যে দুর্বলতার কারণে ওইসব রাভীকে তৃতীয় স্তরে গণ্য করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ওই

[পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ حَدِيْثًا وبَعدَ حَذْفِ التَّكْرارِ أَرْبَعَةُ الافٍ وَلَقَدْ صَنَّفَ الْاٰخَرُوْنَ مِنَ الْأَئِمَّةِ صِحَاحًا مِثْلَ صَحِيْحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ الَّذِىْ يُقَالُ لَهٗ اِمَامُ الْاَئِمَّةِ وَهُوَ شَيْخُ اِبْنُ حِبَّانَ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِىْ مَدْحِهٖ مَارَأَيْتُ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدًا اَحْسَنَ فِىْ صَنَاعَةِ السُّنَنِ وَاَحْفَظَ لِلْاَلْفَاظِ الصَّحِيْحَةِ مِنْهُ كَاَنَّ السُّنَنَ وَالْاَحَادِيْثَ كُلَّهَا نَصْبُ عَيْنِهٖ وَمِثْلَ صَحِيْحِ اِبْنِ حِبَّانَ تِلْمِيْذِ اِبْنِ خُزَيْمَةَ ثِقَةٌ ثَبْتٌ فَاضِلٌ اِمَامٌ فَهَّامٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ كَانَ اِبْنُ حِبَّانَ مِنْ اَوْعِيَةِ الْعِلْمِ وَاللُّغَةِ وَالْحَدِيْثِ وَالْوَعْظِ وَكَانَ مِنْ عُقَلاءِ الرِّجَالِ وَمِثْلَ صَحِيْحِ الْحَاكِمِ اَبِىْ عَبْدِ اللهِ النِّسَافُوْرِىِّ الْحَافِظِ الثِّقَةِ الْمُسَمّٰى بِالْمُسْتَدْرَكِ وَقَدْ

পঁচাত্তর। আর পুনারাবৃত্তি বাদে চার হাজার হাদীস।

সিহাহ সিত্তা ব্যতীত সহীহ হাদীসের অন্যান্য কিতাব

'সিহাহ সিত্তা'র প্রণেতাগণ ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণও সহীহ (হাদীস সমৃদ্ধ) কিতাব প্রণয়ন করেছেন। যেমন– 'সহীহ-ই ইবনে খুযাইমা', যাঁকে ইমামুল আইম্মাহ বলা হয়। তিনি ইবনে হিব্বান-এর শায়খ বা ওস্তাদ ছিলেন। ইবনে হিব্বান তাঁর প্রশংসায় বলেন, হাদীস শাস্ত্রের শব্দাবলী প্রণয়নের কলা-কৌশলে এবং অধিক সংখ্যক সহীহ সংরক্ষণে তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে আমি দেখিনি। 'সুনান' এবং হাদীসসমূহই যেনো ছিলো তাঁর (জীবনের) অভীষ্ট লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত 'সহীহ-ই ইবনে হিব্বান'। তিনি হযরত ইবনে খুযাইমার ছাত্র; যিনি নির্ভরযোগ্য, আস্থাভাজন, প্রজ্ঞাবান, ইমাম ও অতিমাত্রায় মেধাবী ছিলেন। হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ নীশাপুরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, "ইবনে হিব্বান ইল্‌ম, ভাষাজ্ঞান, হাদীস শাস্ত্র ও উপদেশের আধার ছিলেন।" তিনি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাবান ইমামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তৃতীয়ত, যেমন– আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র 'সহীহ', যিনি ছিলেন 'হাফিয-ই হাদীস' ও হাদীসের নির্ভরযোগ্য ইমাম এবং তাঁর উক্ত সহীহ গ্রন্থকে বলা হয়– 'মুস্তাদ্‌রাক'। কিন্তু

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর] দুর্বলতা, যেমন ভুলে যাওয়া ও স্মরণ শক্তিতে ত্রুটিযুক্ত হওয়া ইত্যাদি সহীহ মুসলিমে তাঁদের হাদীসগুলো সন্নিবিষ্ট করার পর পাওয়া গেছে।

যেমন– তিনি হাদীস-ই আবূ হোরায়রা (اِذَا قُرِأَ فَاَنْصِتُوْا)-কে তাঁর সহীহ গ্রন্থে না আনার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে এ শর্তটার কথা বলেছিলেন। ইমাম সুয়ূত্বী বলেছেন– তাঁর এ ইজমা' ছিলো আনুপাতিক (اِضَافِىْ); অর্থাৎ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন, ওসমান ইবনে আবী শায়বাহ্ ও সা'ঈদ ইবনে মানসূরের ইজমা'। (তাযকিরাতু মুহাদ্দিসীন)

تَطَرَّقَ فِیْ کِتَابِہٖ ھٰذَا التَّسَاھُلَ وَاَخَذُوْا عَلَیْہِ وَقَالُوْا اِبْنُ خُزَیْمَۃَ وَاِبْنُ حِبَّانَ اَمْکَنُ وَاَقْوٰی مِنَ الْحَاکِمِ وَاَحْسَنُ وَاَلْطَفُ فِیْ الْاَسَانِیْدِ وَالْمُتُوْنِ وِمِثْلَ الْمُخْتَارَۃِ لِلْحَافِظِ ضِیَاءِ الدِّیْنِ الْمَقْدِسِیِّ وَھُوَاَیْضًاخَرَّجَ صِحَاحًالَیْسَتْ فِیْ الصَّحِیْحَیْنِ وَقَالُوْا کِتَابُہٗ اَحْسَنُ مِنَ الْمُسْتَدْرَکِ وَمِثْلَ صَحِیْحِ ابْنِ عَوَانَۃَ وَابْنِ السَّکَنِ وَالْمُنْتَقٰی لِاِبْنِ جَارُوْدَ وَھٰذِہِ الْکُتُبُ کُلُّھَا مَخْتَصَّۃٌ بِالصِّحَاحِ وَلٰکِنَّ جَمَاعَۃً اِنْتَقَدُوْا عَلَیْھَا تَعَصُّبًا اَوْ اِنْصَافًا وَفَوْقَ کُلِّ ذِیْ عِلْمٍ عَلِیْمٌ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ.

فَصْلٌ : اَلْکُتُبُ السِّتَّۃُ الْمَشْھُوْرَۃُ الْمُقَرَّرَۃُ فِیْ الْاِسْلَامِ الَّتِیْ یُقَالُ لَھَا

তিনি এ গ্রন্থে শিথিলতা ও নমনীয়তার পথ অবলম্বন করেছেন। তাই হাদীসের ইমামগণ তাঁর সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান হাকিম আবূ আব্দুল্লাহর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী এবং সনদ ও মতনে বেশী পারদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী।

চতুর্থত, যেমন– হাফেয যিয়াউদ্দীন মাক্বদেসী[২১] রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির রচিত 'মুখ্তারাহ্'। তিনিও ওইসব সহীহ হাদীস সংকলন করেছেন, যেগুলো বোখারী ও মুসলিমের সহীহ দু'টিতে নেই। (গবেষক) মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, তাঁর এ কিতাব (মুখ্তারাহ্)'মুস্তাদ্রাক' অপেক্ষা উন্নতর। পঞ্চমত, যেমন– সহীহ-ই ইবনে আওয়ানাহ্ (ইয়াকূব ইবনে ইসহাক্ব ইবনে আওয়ানাহ্)[২২] রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, ষষ্ঠত, সহীহ-ই ইবনিস্ সাকান, সপ্তমত, ইবনে জারূদ (আব্দুল্লাহ ইবনে জারূদ)[২৩] রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক সংকলিত 'মুন্তাক্বা'। এ কিতাবগুলোর সব ক'টিই বিশেষভাবে সহীহ হাদীস সমৃদ্ধ। কিন্তু একদল (হাদীস বিশারদ) তাঁদের কিতাবের সমালোচনা করেছেন– কেউ পক্ষপাতমূলকভাবে, কেউ আবার সুবিচারমূলকভাবে। আর এটা প্রসিদ্ধ কথা যে, প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছেন মহাজ্ঞানী।

পরিচ্ছেদ ঃ সিহাহ সিত্তা (ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থ)

ইসলামী শরীয়তে প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত ছয়টি গ্রন্থ, যেগুলোকে আখ্যায়িত করা হয়

---

২১. ওফাত ৭৪৩ হিজরী।

২২. ওফাত ৩১৬ হিজরী।

২৩. ওফাত ৩০৭ হিজরী।

اَلصِّحَاحُ السِّتُّ هِیَ صَحِيْحُ الْبُخَارِیِّ وَصَحِيْحُ مُسْلِمٍ وَالْجَامِعُ لِلتِّرْمِذِیِّ وَالسُّنَنُ لِاَبِیْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِیِّ وَسُنَنُ اِبْنِ مَاجَةَ وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْمُؤَطَّا بَدَلَ اِبْنِ مَاجَةَ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْاُصُوْلِ اِخْتَارَ الْمُؤَطَّا وَفِیْ هٰذِهِ الْكُتُبِ الْاَرْبَعَةِ اَقْسَامٌ مِّنَ الْاَحَادِيْثِ مِنَ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَالضِّعَافِ وَتَسْمِيَتُهَا بِالصِّحَاحِ السِّتِّ بِطَرِيْقِ التَّغْلِيْبِ وَسَمّٰى صَاحِبُ الْمَصَابِيْحِ اَحَادِيْثَ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ بِالْحِسَانِ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِّنْ هٰذَا الْوَجْهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمَعْنَى اللُّغَوِیِّ اَوْ هُوَ اِصْطِلَاحٌ جَدِيْدٌ مِّنْهُ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ كِتَابُ الدَّارِمِیِّ اَحْرٰی وَاَلْيَقُ بِجَعْلِهٖ سَادِسَ الْكُتُبِ لِاَنَّ رِجَالَهٗ اَقَلُّ ضُعْفًا وَّوَجُوْدُ الْاَحَادِيْثِ الْمُنْكَرَةِ وَالشَّاذَّةِ فِيْهِ نَادِرٌ وَلَهٗ اَسَانِيْدُ عَالِيَةٌ وَّثُلَاثِيَّاتُهٗ اَكْثَرُ مِنْ ثُلَاثِيَّاتِ الْبُخَارِیِّ -

'সিহাহ্ সিত্তাহ্' (বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীস গ্রন্থ) বলে ঃ ১. সহীহুল বোখারী, ২. সহীহ-ই মুসলিম, ৩. জামি-'ই তিরমিযী, ৪. সুনান-ই আবী দাঊদ, ৫. সুনান-ই নাসাঈ এবং ৬. সুনান-ই ইবনে মাজাহ্। কারো কারো মতে, ইবনে মাজাহ্'র পরিবর্তে 'মুআত্তা-ই ইমাম মালেক' সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত। 'জামি'উল উসূল' প্রণেতা (মাজদুদ্দীন মুবারক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আসীর জাযারী মুসিলী) রাহমাতুল্লাহি আলায়হিম মুআত্তাকে (সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করাকে) পছন্দ করেছেন।

আর এ চার কিতাবে (বোখারী ও মুসলিম ছাড়া শেষোক্ত চার গ্রন্থ) সহীহ, হাসান ও দ্ব'ঈফ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হাদীস রয়েছে। এতদসত্ত্বেও 'তাগলীব'-এর নিয়মে, অর্থাৎ অধিকাংশকে প্রাধান্য দিয়ে সব ক'টিকে সিহাহ সিত্তাহ্ বলে নাম রাখা হয়েছে। 'মাসাবীহ' গ্রন্থকার (মুহিউস্‌সুন্নাহ ইমাম বাগভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) সহীহাঈন অর্থাৎ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্য চার কিতাবের হাদীসসমূহের নাম 'হিসান' রেখেছেন। আর এটা উপরোল্লিখিত কারণের অধিক নিকটবর্তী, আভিধানিক অর্থের কাছাকাছি। অথবা এটা তাঁর প্রবর্তিত নতুন পরিভাষা।

কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম দারেমীর গ্রন্থটি 'সিহাহ সিত্তাহ'র ষষ্ঠ নম্বরে স্থান দেওয়া অধিকতর সুচিন্তিত বিষয় এবং সর্বাধিক উপযুক্ত। কেননা, তাঁর কিতাবে বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে অতি স্বল্প সংখ্যকই দুর্বল রয়েছেন এবং সেটার মধ্যে 'মুনকার' ও 'শায' হাদীসের অস্তিত্বও বিরল। তাঁর রয়েছে উচ্চ মর্যাদাশীল সনদসমষ্টি। তাঁর 'সুলাসিয়াত'[২৪] বোখারীর 'সুলাসিয়াত' থেকেও বেশী।

২৪. তিনজন রাভীর মাধ্যমে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যায় এমন সনদ।

وَهٰذِهِ الْمَذْكُوْرَاتُ مِنَ الْكُتُبِ اَشْهَرُ الْكُتُبِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ كَثِيْرَةٌ شَهِيْرَةٌ وَ لَقَدْ اَوْرَدَ السُّيُوْطِيُّ فِيْ كِتَابِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ كُتُبٍ كَثِيْرَةٍ يَتَجَاوَزُ خَمْسِيْنَ مُشْتَمِلَةً عَلَى الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَالضِّعَافِ وَقَالَ مَا اَوْرَدْتُّ فِيْهَا حَدِيْثًا مَّوْسُوْمًا بِالْوَضْعِ اِتَّفَقَ الْمُحَدِّثُوْنَ عَلَى تَرْكِهٖ وَرَدِّهٖ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمِشْكٰوةِ فِيْ دِيْبَاجَةِ كِتَابِهٖ جَمَاعَةً مِّنَ الْاَئِمَّةِ الْمُتْقِنِيْنَ وَهُمُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالْاِمَامُ مَالِكٌ وَالْاِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَالْاِمَامُ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارُ قُطْنِيْ وَالْبَيْهَقِيُّ

উল্লেখিত কিতাবসমূহ সর্বাধিক বিখ্যাত কিতাব। এগুলো ছাড়াও হাদীসের অনেক সুপ্রসিদ্ধ কিতাব রয়েছে।

ইমাম সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'জাম্'উল জাওয়ামি' কিতাবে অনেক সংখ্যক কিতাব থেকে হাদীস সংকলন করেছেন, যেগুলোর সংখ্যা পঞ্চাশোর্ধ। ওই কিতাবগুলোতে সহীহ, হাসান ও দ্ব'ঈফ– সবরকম হাদীস স্থান পেয়েছে। আর তিনি বলেছেন, আমি এতে এমন কোন হাদীস উল্লেখ করি নি, যাকে মুহাদ্দিসগণ বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন, যাকে হাদীস বিশারদগণ বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করার উপর ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।

হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণ

মিশকাত প্রণেতা তাঁর কিতাবের ভূমিকায় হাদীস শাস্ত্রের পরিপক্ক ইমামগণের একটি জামা'আতের উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন ঃ ইমাম বোখারী, (ওফাত ২৫৬ হি.), ইমাম মুসলিম (ওফাত ২৬১ হি.), ইমাম মালিক (ওফাত ১৭৯ হি.), ইমাম শাফে'ঈ (ওফাত ২০৪ হি.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (ওফাত ২৪১ হি.), ইমাম তিরমিযী (ওফাত ২৭৯ হি.), ইমাম আবূ দাঊদ (ওফাত ২৭৫ হি.), ইমাম নাসাঈ (ওফাত ৩০৩ হি.), ইমাম ইবনে মাজাহ্ (ওফাত ২৭৩ হি.), ইমাম দারেমী (ওফাত ২৫৫ হি.), ইমাম দারুক্বুত্বনী (ওফাত ৩৮৫ হি.), ইমাম বায়হাক্বী (ওফাত ৪৫৮ হি.)

وَرَزِيْنٌ وَّاَجْمَلَ فِىْ ذِكْرِ غَيْرِهِمْ وَكَتَبْنَا اَحْوَالَهُمْ فِىْ كِتَابٍ مُفْرَدٍ مُسَمّٰى بِالْاِكْمَالِ بِذِكْرِ اَسْمَآءِ الرِّجَالِ وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيْقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ فِى الْمَبْدَاِ وَالْمَالِ وَاَمَّا الْاِكْمَالُ فِىْ اَسْمَآءِ الرِّجَالِ لِصَاحِبِ الْمِشْكٰوةِ فَهُوَ مُلْحَقٌ فِىْ اٰخِرِ هٰذَا الْكِتَابِ -

এবং ইমাম রাযীন (ওফাত ৫২৫ হি.)। আর অন্যান্যদের আলোচনা করেছেন সংক্ষেপে। আমি তাঁদের জীবনালেখ্য 'আল-ইকমাল ফী যিক্‌রি আস্‌মাইর রিজাল' নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে। সূচনা ও পরিণতিতে তিনিই সাহায্য প্রার্থনার কেন্দ্রবিন্দু।

মিশ্‌কাত-প্রণেতার 'আল্‌-ইক্‌মাল ফী আস্‌মাইর রিজাল' গ্রন্থটি এ গ্রন্থের (মিশকাত শরীফ) শেষ ভাগে সংযোজিত হয়েছে।[২৫]

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

[মুক্বাদ্দামাতুল মিশ্‌কাত সমাপ্ত]

২৫. 'আল-ইকমাল গ্রন্থটি 'মিরআত'-এর ৮ম খণ্ডের সাথে সংযোজিত।

মুখবন্ধ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ خَالِقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡاَنۡبِيَآءِ وَالۡمُرۡسَلِيۡنَ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيۡنِ وَاَصۡحَابِهِ الطَّاهِرِيۡنَ ـ اَمَّا بَعۡدُ

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জগতের মালিক, আসমান ও যমীনসমূহের স্রষ্টা। আর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক নবী ও রসূলকুল সরদারের উপর এবং তাঁর পবিত্র বংশধর ও সাহাবীদের উপর। অতঃপর-

এ কথা জেনে রাখা চাই যে, ইসলামে মহামহিম আল্লাহ্'র কালাম (ক্বোরআন শরীফ)-এর পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কালাম বা বাণী (হাদীস শরীফ)-এর স্থান। তা হবেও না কেন? আল্লাহ্ তা'আলার পর রসূলুল্লাহ'র মর্যাদা। ক্বোরআন যেনো ল্যাম্পের ফিতা, আর হাদীস শরীফ যেনো সেটার রঙিন চিমনি। যেখানে পবিত্র ক্বোরআনের আলো আছে, সেখানে হাদীস শরীফের রং আছে। ক্বোরআন মজীদ হচ্ছে সমুদ্র, হাদীস শরীফ সেটার জাহাজ। ক্বোরআন মজীদ হচ্ছে মুক্তা, আর হাদীস শরীফের বিষয়বস্তুগুলো হচ্ছে সেগুলোর ডুবুরী। ক্বোরআন শরীফ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, আর হাদীস শরীফ হচ্ছে সেটার বিস্তারিত বিবরণ। পবিত্র ক্বোরআন হচ্ছে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকার্থক বচন, আর হাদীস শরীফ হচ্ছে সেটার ব্যাখ্যা। ক্বোরআন মজীদ হচ্ছে আত্মার খাদ্য, আর হাদীস শরীফ হচ্ছে রহমতের পানি। পানি ব্যতীত না খাদ্য তৈরি হয়, না খাওয়া যায়। হাদীস শরীফ ব্যতীতও না ক্বোরআন বুঝা যায়, না তদনুযায়ী আমল করা যায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দু'টি আলোর মুখাপেক্ষী করেছেন। চোখের জ্যোতির সাথে চাঁদের আলো ইত্যাদিও জরুরি। অন্ধের জন্য সূর্য কোন কাজের নয়। অন্ধকারে চোখও উপকারী নয়। অনুরূপ, ক্বোরআন সূর্যের মতো, আর হাদীস শরীফ মু'মিনের চোখের আলোর মতো। অথবা ক্বোরআন মজীদ হচ্ছে আমাদের চোখের জ্যোতি আর হাদীস শরীফ হচ্ছে নুবূয়ত-সূর্যের আলোকরশ্মি। তন্মধ্যে যদি একটিও না থাকে, তবে তো আমরা অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকবো। এ কারণে বিশ্ব প্রতিপালক ক্বোরআনকে 'কিতাব' বলেছেন। আর হুজূরকে বলেছেন 'নূর' (আলো)। এরশাদ করেছেন- قَدۡ جَآءَكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ نُوۡرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيۡنٌ (নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব [৫:১৫, তরজমা: কানযুল ঈমান])। নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করো যে, আল্লাহর কিতাব হচ্ছে নির্বাক ক্বোরআন, আর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবন হচ্ছে চলমান ও সবাক ক্বোরআন। ওটা হচ্ছে বাণী আর এটা হচ্ছে সেটার বাস্তব অবস্থা। হুযূরের প্রতিটি কর্ম শরীফ ক্বোরআনের আয়াতসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। কবির ভাষায়- ترے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں (আপনার কর্ম শরীফকেই ক্বোরআনের তাফসীর বলা হয়)।

মোটকথা, ক্বোরআন ও হাদীস ইসলামের গাড়ির দু'টি চাকা স্বরূপ অথবা মু'মিনের দু'টি বাহু; যে দু'টি থেকে কোন একটি ব্যতীত না এ গাড়ি চলতে পারে, না মু'মিন উড়তে পারে।

বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে ক্বোরআন ও হাদীসের অনুবাদের প্রতি ঝোঁক বেশি দেখা যায়। প্রত্যেকে চায়- 'আমি আপন রব ও আমার প্রিয়নবীর বাণীর মর্মার্থ অনুধাবন করবো।' এ উদ্দীপনা অতি মূল্যবান ও প্রশংসনীয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক জ্ঞানপাপী এ থেকে অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে। তা হচ্ছে- ক্বোরআন ও

হাদীসের অনুবাদের অজুহাতে তারা ভ্রান্ত আক্বাইদ ও ভুল চিন্তাধারা প্রসারিত করছে। আজকাল মুসলমানদের মধ্যে বহু দল-উপদল এবং পরস্পরের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুড়ি এ সব উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনুবাদেরই অশুভ ফলশ্রুতি। আরো দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এর কুফল স্বরূপ এমন এমন লোকও পয়দা হয়ে গেছে, যারা হাদীস শরীফের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তাকেও সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে শুরু করেছে। তাদের ফিৎনাও দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়ছে। হাদীস অস্বীকার করার পক্ষে বহু খোঁড়া যুক্তি-প্রমাণও দেখানো হচ্ছে। কিন্তু এ সবের বুনিয়াদও নিম্নলিখিত চারটি সংশয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি ওইগুলোর অপনোদন ঘটানো সম্ভবপর হয়, তবে তাদের সমস্ত সংশয়-আপত্তির ইমারতও নিজে নিজে ধ্বসে পড়বে।

সংশয়-১: ক্বোরআন হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ কিতাব। তাতে সব কিছুর বিবরণ রয়েছে। এতদসত্ত্বে হাদীসের প্রয়োজন কি? তাছাড়া, ক্বোরআন বুঝাও সহজ। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ (নিশ্চয় আমি ক্বোরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করে দিয়েছি।৫৪:১৭, তরজমা: কানযুল ঈমান))।

সংশয়ের অপনোদন : নিঃসন্দেহে ক্বোরআন একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব। তবে এ পূর্ণাঙ্গ কিতাব থেকে গ্রহণকারীও কোন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর তিনি হলেন নবী-ই আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সমুদ্র থেকে মুক্তা প্রত্যেকে আহরণ করতে পারে না। ডুবুরির প্রয়োজন হয়। ক্বোরআন মজীদও মুখস্থ করার জন্য সহজ। ছোট শিশুও মুখস্থ করতে পারে। কিন্তু তা থেকে মাসআলা-মাসাইল (সমাধান ও বিধিবিধান) বের করার জন্য সহজ নয়। এ কারণে لِلذِّكْرِ এরশাদ করেছেন, অর্থাৎ 'মুখস্থ করার জন্য' (ক্বোরআনকে সহজ করা হয়েছে)।

সংশয়-২: তাদের ভাষায়, 'রসূল' মহান রবের দূত, যাঁর কাজ ডাক-পিয়নের মতো মহান রবের পয়গাম পৌঁছানো; কিছু বুঝানোও নয়, বাতলিয়ে দেওয়াও নয়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ (নিশ্চয় তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন।৯:১২৮।)।

সংশয়ের অপনোদন : রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রসূলও, আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষাদাতা এবং মুসলমানদেরকে পাক-পরিচ্ছন্নকারীও। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (এবং (রসূল) তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন।।৩:১৬৪।) সংশয়কারী কি কোন কোন আয়াতের উপর ঈমান আনে, আর কোন কোনটি প্রত্যাখ্যানও করে? মেশিনের ব্যবহার শেখানোর জন্য মেশিনক্রেতা ও চালকদেরকে কারখানার পক্ষ থেকে নির্দেশিকা পুস্তকও দেওয়া হয়, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণদাতাও প্রেরণ করা হয়। আল্লাহর কুদরতের কারখানা থেকে আমাদেরকে দেহের মেশিন দেওয়া হয়েছে। সেটার ব্যবহার শেখানোর জন্য কিতাব 'ক্বোরআন শরীফ' এবং শিক্ষাদাতা 'হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'কেও প্রেরণ করা হয়েছে। একজন কবি বলেন-

معلم خدائی کے وہ بن کے آئے — جھکے انکے آگے سب اپنے پرائے

অর্থাৎ তিনি (হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর সৃষ্টিজগতের শিক্ষাদাতা হয়ে তাশরীফ এনেছেন। তাঁর সামনে সৃষ্টির মধ্যে আপন-পর সবাই ঝুঁকে পড়েছে।

সংশয়-৩ : তাদের ভাষায় বর্তমানকার হাদীসগুলো হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বাণীই নয়। এগুলোতো পরবর্তীতে লোকেরা রচনা করে নিয়েছে। কেননা, নবী পাকের যুগে লিখার এত প্রচলন ও ব্যবস্থা ছিলো না।

সংশয়ের অপনোদন : তাহলে তো তাদের মতে ক্বোরআনও নিরাপদ নয়। কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র যুগে সম্পূর্ণ ক্বোরআনও এক জায়গায় লিপিবদ্ধ করা হয় নি। কিতাবাকারেও সঙ্কলিত হয় নি। ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র খিলাফত-আমলে তা সঙ্কলিত হয়েছে। ওহে সন্দিহান! শুন, নবী পাকের পবিত্র যুগে কলম অপেক্ষা স্মরণশক্তি বেশি নির্ভরযোগ্য ছিলো। মহান রব সাহাবা-ই কেরামকে বিরল ও আশ্চর্যজনক স্মরণশক্তি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্রয়োজন হওয়ায় ক্বোরআনও হাফেযদের বক্ষগুলো এবং কাগজের পাতা ইত্যাদি থেকে সঙ্কলন করা হয়েছে। অনুরূপ, হাদীস শরীফগুলোও। হযরত আলী মুরতাদ্বা কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজ্‌হাহু'র নিকট বহু হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ অবস্থায় ছিলো, যেগুলোকে তিনি তরবারির খাপের ভিতর রেখেছিলেন এবং লোকজনকে পড়ে শুনাতেন। স্মর্তব্য যে, ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি'র জন্ম ৮০ হিজরিতে হয়েছে। তিনি 'মুসনাদ-ই ইমাম আ'যম' এবং তাঁর শাগরিদ ইমাম মুহাম্মদ 'মুআত্তা-ই ইমাম মুহাম্মদ' এবং তাঁর পরে ইমাম মালিক, যিনি ৯০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন, 'মুআত্তা-ই ইমাম মালিক' ইত্যাদি হাদীসের কিতাব লিখেছেন। তারপর তাঁর নিকটবর্তী যুগেরই ইমাম বোখারী প্রমুখের যুগ, যাঁরা একান্ত সতর্কতার সাথে হাদীস শরীফগুলো এমনভাবে যাচাই-বাছাই করেছেন এবং সঙ্কলন করেছেন, যাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ না থাকে।

সংশয়-৪ : কোন কোন হাদীস অপরাপর হাদীসের বিপরীত। কোন কোনটা যুক্তিরও বিরোধী। সুতরাং ওইগুলো মনগড়া।

সংশয়ের অপনোদন : হাদীসগুলো বিশুদ্ধ। তোমাদের বোধশক্তি ত্রুটিপূর্ণ। ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে ক্বোরআনের আয়াতগুলোও পরস্পর বিরোধী বলে মনে হবে। তখন সেগুলোকেও কি অস্বীকার করবে? ক্বোরআন ও হাদীস বুঝতে হলে নিয়মানুসারে বিজ্ঞ আলিমদের নিকট পড়তে হবে। নিছক অনুবাদ পড়লে বুঝে আসবে না।

সর্বশেষ আবেদন : হাদীস অস্বীকারকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা দীর্ঘ আলোচনায় যাবো না, যদি তোমরা বিপথে না থাক, তবে শুধু দু'টি মাসআলার, ক্বোরআনের মাধ্যমে তোমাদের দ্বারা সমাধান করাতে চাই:

১. ইসলামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বিধান(নির্দেশ) হচ্ছে أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ (নামায ক্বায়েম কর, যাকাত দাও [২:১১০])। সম্ভব হলে ক্বোরআনী নামায ও ক্বোরআনী যাকাত সম্পন্ন করে দেখাও, যেগুলোতে হাদীস শরীফের সাহায্য নেওয়া হয়নি! নামাযের সর্বমোট কয় ওয়াক্ত? কত রাক'আত? যাকাত কতটুকু সম্পদে ও কি পরিমাণ প্রদান করতে হয়?

২. ক্বোরআন শুধু শূকরের গোশ্‌ত হারাম করেছে। কুকুর, বিড়াল, গাধা এবং শূকরের কলিজা ও যকৃত ইত্যাদি হারাম হবার বিধান ক্বোরআন থেকে দেখিয়ে দাও।

মোটকথা, চাকড়ালভী মতবাদ নিছক মুখে আওড়ানোর মতবাদ, যা মোটেই কার্যকর নয়; তাদের দাবী অনুসারে কাজ করা কখনো সম্ভবপর নয়। এ সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি অধম আপন রবের দয়া ও তাঁর মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কৃপাদৃষ্টিতে ক্বোরআন শরীফের (এ পর্যন্ত) প্রথম তিন পারার উর্দূ ভাষায় একটি বিস্তারিত তাফসীর লিখেছি, যার নাম দিয়েছি 'আশ্‌রাফুত্ তাফা-সীর'। আর ত্রিশ পারার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকার্থক তাফসীর লিখেছি, যার নাম রেখেছি 'তাফসীর-ই নূরুল ইরফান'।

এতে যুগের চাহিদানুসারে জরুরি নোট ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি রয়েছে। এদিকে বোখারী শরীফের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ আরবী ভাষায়, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হাবীবের বাণী মুবারকের ব্যাখ্যাও আল্লাহর হাবীবের ভাষায়, ঐতিহাসিক শিরোনামেই লিখেছি। ওই নাম হচ্ছে 'ইন্‌শিরাহ্-ই বোখারী', প্রকাশ 'ন'ঈমুল বারী'। দীর্ঘদিন থেকে আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, 'মিশকাত শরীফ' (যা হাদীস শাস্ত্রে, দরসে নিযামী'র প্রথম কিতাব এবং পবিত্র হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে ব্যাপক, যার গ্রহণযোগ্যতার এমনি অবস্থা যে, সেটা আরব ও অনারব সর্বত্র পড়ানো হয়, আর আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় এর বহু ব্যাখ্যাও লিখা হয়েছে। এর উর্দূ ভাষায় এমন একটি ব্যাখ্যা লিখবো, যা শিক্ষার্থী, আলিম সমাজ এবং মুসলিম সাধারণ সমানভাবে উপকৃত হন, যাতে সত্য মাযহাবগুলোর বর্ণনা নতুন আঙ্গিকে করা হবে, নতুন নতুন মতবাদগুলোর বিবরণ থাকবে এবং হাদীসগুলোর উপর তাদের নতুন নতুন আপত্তিরও জবাব থাকবে। কেননা, এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরক্বাত' ও 'লুম'আত' প্রণেতাদের যুগে দুনিয়ার রং ভিন্ন ছিলো। তাঁরা ওই সময়কার চাহিদা অনুসারে ব্যাখ্যাসমূহ লিখেছেন। তাছাড়া, আমাদের পাঠক সাধারণ আরবী-ফার্সী সম্পর্কে অবগত না হবার কারণে ওইগুলো থেকে উপকৃত হতে পারছেন্ না। এখন সময় কিছুটা অন্য ধরনের। বাতাসও বইছে ভিন্নতর প্রবাহে। তাই এতে এ যুগের চাহিদাসমূহও পূরণ করা হবে। কিন্তু আমার মনে এমন বড় কাজের সাহস হচ্ছিলো না।

একদা সারগোদায় হযরত সাহেবযাদা ফয়যুল হাসান সাহেব (সাজ্জাদানশীন, আলুমাহার শরীফ) আমাকে জোরালোভাবে নির্দেশ দিয়েই বললেন, "জীবনের কোন ভরসা নেই, মিশকাত শরীফের উর্দূ ভাষায় একটি ব্যাখ্যা লিখে যাও।" এ মহান নির্দেশবাণী আমার মনে প্রেরণা যুগিয়েছে সত্য, কিন্তু অবস্থার প্রতিকূলতা এবং উপকরণাদি না থাকার কারণে বহুদিন যাবৎ এ ব্যাপারে ইতস্তত ছিলাম। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হাকীম সরদার আলী সাহেবও (চৌধুরী মীযান বখ্‌শ সাহেবের পুত্র, মুহাজির-ই পূর্ব পাঞ্জাব, জিলা অমৃতস্বর, গুজরাতের অধিবাসী) আমাকে একই ধরনের পরামর্শ দিয়ে বললেন, "মিশকাত শরীফের উর্দূ ব্যাখ্যার খুব প্রয়োজন।" তদ্‌সঙ্গে এ কথাও বলেছেন, "আরবী বচনগুলো আমিই কপি করে দেবো।" এতে আমার মনে সাহস কিছুটা বৃদ্ধি পেলো। কিন্তু তবুও বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখা এবং নিজের হাতে লিখা কষ্টসাধ্য ছিলো। তখন আমার কলিজার টুক্‌রো চোখের আলো (ছেলে) মুফতী মুহাম্মদ মুখতার খান, ওরফে মুহাম্মদ মিঞা (আল্লাহ্ তাকে শান্তিতে রাখুন) আমাকে বললো, "আপনি বলতে থাকুন, আমি লিখতে থাকবো।" তখনই আমার বুঝে আসলো এটাতো 'সরকারী ব্যবস্থাপনা', যার কথা এ প্রিয়পাত্রদের মুখে ধ্বনিত হচ্ছে। আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আর দোয়াত-কলম হাতে নিলাম।

বিশ্বাস করুন! আমি অধম এত বড় কাজের উপযোগী নই। কোথায় আমার মতো এক অপরিচিত (নগণ্য) লোক আর কোথায় ওই ভাষাবিদকুল সরদার হুযূর সাইয়্যেদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মহান বাণী! ওই পবিত্র আস্তানার সাথে আমার যোগ্যতার সম্পর্কই বা কিভাবে? কবি বলেন-

فہم رازش چہ کنم من عجمی او عربی
لاف مہرش چہ زنم من حبشی او قرشی

অর্থাৎ 'ওহে বন্ধু! আমি সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র রহস্যাদি, ইঙ্গিতসমূহ এবং পবিত্র বাণীগুলোর গূঢ় তত্ত্ব কীভাবে বুঝতে পারি? আমি তো অনারবীয়, গ্রাম্য, জ্ঞানশূন্য ও অদক্ষ লোক আর তিনি হলেন আরবের ভাষাবিদদের সরদার। কোন্ মুখে বলবো যে, আমি তাঁর প্রার্থী? আমি তো একজন

হাবশী-বিশ্রী, আর তিনি হলেন ক্বোরাঈশী সুন্দরদের মাহফিলের শোভা! তবুও কি করবো? অবস্থা তো এ-ই-

سُبْحٰنَ اللّٰہِ مَا اَجْمَلَکَ وَاَکْمَلَکَ مَا اَحْسَنَکَ

کتھے مہر علی شاہ کتھے تری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں

অর্থাৎ ওই আল্লাহর পবিত্রতা, যিনি ওহে আল্লাহর হাবীব! আপনাকে কত সুন্দর করেছেন, কত পরিপূর্ণ করেছেন, কতই লাবণ্যময় করেছেন। কোথায় মেহের আলী শাহ্! কোথায় তোমার প্রশংসা!

আমার নিয়্যত বা উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অধমের এ খিদমত দ্বারা কোন মুসলমান ভাইয়ের ঈমান বেঁচে যাক। আর ক্বিয়ামতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গোলামগণ ও তাঁর সমীপে প্রাণোৎসর্গকারীদের পাদুকাবাহী এবং হাদীস শরীফের ব্যাখ্যাকারীদের অনুসারীগণের মধ্যে আমার হাশর নসীব হোক! যে কেউ অধমের এ নগণ্য লেখনী দ্বারা উপকৃত হোন, তিনি যেন এ অসহায়-অধমের পাপরাশির ক্ষমা ও দুনিয়া থেকে উত্তমরূপে বিদায় গ্রহণের দো'আ করেন। এ আশায় আমি এ পরিশ্রমটুকু করলাম। মহান আল্লাহ্ এটা ক্বূল করুন। আর আমার জন্য গুনাহর কাফ্ফারা ও সাদক্বাহ্-ই জারিয়া হিসেবে গণ্য করুন। তাছাড়া, এ মহান কাজে যাঁরা সহযোগিতা দিয়েছেন, তাঁদেরকেও দ্বীন এবং দুনিয়ায় সানন্দে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখুন।

এ ব্যাখ্যাগ্রন্থে বিশেষতঃ 'মিরক্বাতুল মাফাতীহ্, লুম'আত ও আশি''আতুল লুম'আত থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এর নাম 'মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ' রাখলাম। মহান রব গ্রন্থটি 'যেমন নাম তেমন কাজ' হিসেবে ক্বূল করুন। 'মিশকাত' শরীফের ঝলক বা আলোকরশ্মি এ আয়নায় দৃষ্টিগোচর হোক আর এ নগণ্য ব্যাখ্যাও যেন সাফল্যের মাধ্যম হয়। এর ঐতিহাসিক নাম (লেখার সন-নির্দেশক নাম) ذُو الْمِرْاٰة (যুল্ মির্আত অর্থাৎ আয়না বিশিষ্ট) [১৩৭৮]। আ-মী-ন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِهٖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ-

মহান আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন তাঁর হাবীব সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ ও তাঁর আরশের আলো, আমাদের সরদার ও মুনিব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার উপর, তাঁর বংশধর এবং সাহাবীদের উপরও সবারই উপর তাঁর দয়া হোক; তিনি সর্বাধিক দয়াবান।

সোমবার, ২ রমযানুল মুবারক ১৩৭৮ হিজরি
মোতাবেক, ২২ মার্চ ১৯৫৯ ইংরেজী

আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বদায়ূনী
পৃষ্ঠপোষক, মাদরাসা-এ গাউসিয়া
গুজরাত, পাকিস্তান

বঙ্গানুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
পরিচালক, ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম
২৩ জুমাদাল উলা ১৪২৭ হিজরি, ২০ জুন ২০০৬ ইংরেজী

مرآۃ المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح (جلد اول)

মিরআতুল মানাজীহ্ শরহে মিশ্কাতুল মাসাবীহ

প্রথম খণ্ড

[বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা]
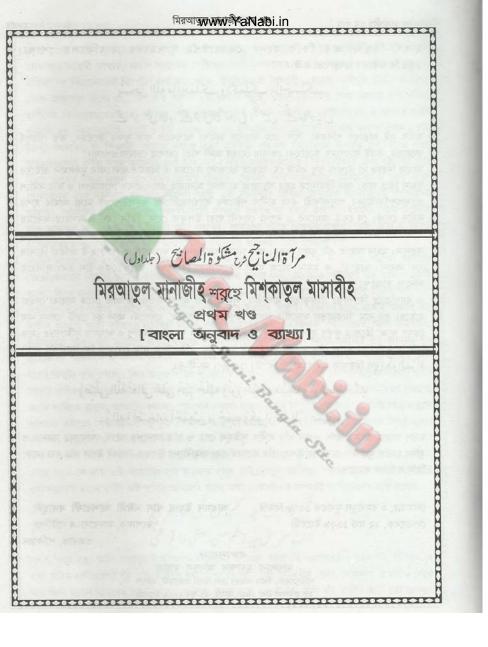
মিরআতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ نَحۡمَدُهٗ وَنَسۡتَعِیۡنُهٗ وَنَسۡتَغۡفِرُهٗ وَنَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنۡ شُرُوۡرِ اَنۡفُسِنَا وَمِنۡ سَیِّئَاتِ اَعۡمَالِنَا مَنۡ یَّهۡدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنۡ یُّضۡلِلۡ فَلَا هَادِیَ لَهٗ وَاَشۡهَدُ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ شَهَادَةً تَکُوۡنُ لِلنَّجَاةِ وَسِیۡلَةً وَلِرَفۡعِ الدَّرَجَاتِ کَفِیۡلَةً وَّ اَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهٗ وَرَسُوۡلُهُ الَّذِیۡ بَعَثَهٗ وَطُرُقُ الۡاِیۡمَانِ قَدۡ عَفَتۡ اٰثَارُهَا وَخَبَتۡ اَنۡوَارُهَا وَوَهَنَتۡ اَرۡکَانُهَا وَجُهِلَ مَکَانُهَا فَشَیَّدَ ـ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیۡهِ وَسَلَامُهٗ مِنۡ مَّعَالِمِهَا مَاعَفَا وَشَفٰی مِنَ الۡعَلِیۡلِ فِیۡ تَاۡیِیۡدِ کَلِمَةِ التَّوۡحِیۡدِ مَنۡ کَانَ عَلٰی شَفَا وَاَوۡضَحَ سَبِیۡلَ الۡهِدَایَةِ لِمَنۡ اَرَادَ اَنۡ یَّسۡلُکَهَا وَاَظۡهَرَ کُنُوۡزَ السَّعَادَةِ لِمَنۡ قَصَدَ اَنۡ یَّمۡلِکَهَا ـ

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই,[১] আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।[২] আর আপন মনের কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আপন মন্দকার্যাদির অনিষ্ট থেকে মহান রবের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩] আল্লাহ্ যাকে হিদায়ত দেন তার পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন তার হিদায়তকারী কেউ নেই।[৪] আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।[৫] এমন সাক্ষ্য, যা নাজাতের ওসীলা ও উচ্চ মর্যাদার জামিন হয়।[৬] আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র প্রিয়বান্দা[৭] ও তাঁর রসূল, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা তখনই প্রেরণ করেছেন, যখন ঈমানের রাস্তাগুলোর চিহ্নসমূহ ম্লান হয়ে গিয়েছিলো,[৮] সেগুলোর আলো নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিলো।[৯] সেগুলোর পার্শ্বদেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলো এবং সেগুলোর স্থান অজ্ঞাত হয়ে গিয়েছিলো।[১০] হুযূরের উপর আল্লাহর রহমতরাজি ও শান্তি বর্ষিত হোক।[১১] কারণ, তিনি ইসলামের বিলুপ্ত নিদর্শনগুলোকে বুলন্দ করে দিয়েছেন, কলেমা-ই তাওহীদকে শক্তিশালী করে সব রোগ-ব্যাধির নিরাময় করে দিয়েছেন, যেগুলো একেবারে প্রান্তে গিয়ে ঠেকেছিলো[১২] এবং হিদায়তের রাস্তা তাদেরই জন্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন, যারা সেগুলোতে চলতে আগ্রহী। আর সৌভাগ্যের ভাণ্ডারসমূহ তাদেরই জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন, যারা সেগুলোর মালিক হতে ইচ্ছুক।[১৩]

---

১. অর্থাৎ প্রত্যেক প্রশংসাকারীর প্রশংসিত বিষয়ের জন্য, প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি নি'মাতের জন্য, প্রত্যেক প্রকারের প্রত্যেক প্রশংসাই হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা। কারণ শিল্পের প্রশংসা শিল্পীর প্রশংসারই নামান্তর। কেননা, যে যা লাভ করেছে তা তাঁরই দান থেকে লাভ করেছে। কাজেই, তিনি প্রত্যেক প্রশংসাকারীর প্রশংসিত সত্তা, প্রত্যেক সাজদাকারীর সাজদাকৃত, প্রত্যেক ইবাদতকারীর মা'বূদ, প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য, প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষাকারীর আকাঙ্ক্ষিত এবং প্রত্যেক দিক থেকে উপস্থিত।

অথবা অর্থ এ যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা হচ্ছে তা-ই, যা তিনি নিজেই নিজের জন্য করেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- اَنۡتَ کَمَا اَثۡنَیۡتَ عَلٰی نَفۡسِکَ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি তেমনি, যেমন নিজের জন্য

নিজেই প্রশংসা করেছেন। সুতরাং তিনি নিজেই প্রশংসাকারী, নিজেই প্রশংসিত।
অথবা, (অর্থ এ যে,) তাঁর গ্রহণযোগ্য প্রশংসা হচ্ছে তা-ই, যা তাঁর খাস বান্দা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম করেছেন।
অথবা, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার পরিপূর্ণ প্রশংসা হচ্ছে তা-ই, যে প্রশংসা তাঁর প্রতিপালক করেছেন। সুতরাং তিনি হলেন আপন রবের সর্বাধিক প্রশংসাকারী এবং মহান রব হলেন তাঁর প্রশংসিত। আর মহান রব হলেন হুযূরের প্রশংসাকারী এবং তিনি হলেন মহান রবের অত্যন্ত প্রশংসিত (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।
মোটকথা, اَلْحَمْدُ-এর الف و لام হয়তো استغراقى (সমস্ত এককব্যাপী) অথবা عهدى (নির্দিষ্ট একক নির্দেশক)।

২. সমস্ত পার্থিব চাহিদা, বরং খোদ প্রশংসা করার ক্ষেত্রেও প্রকৃত সাহায্য তাঁরই নিকট থেকে প্রার্থনা করছি। আর প্রশংসা করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের থেকে হয়ে যায়, তা থেকেও ক্ষমাপ্রার্থী। স্মর্তব্য যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রশংসা করা বাস্তবিক পক্ষে মহান রবেরই সাহায্যের ফসল।

৩. 'কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট' দ্বারা স্বীয় গোপন অনিষ্ট এবং 'মন্দ কার্যাদির অনিষ্ট' দ্বারা প্রকাশ্য অনিষ্ট বুঝানো হয়েছে। আমাদের যাহির ও বাতিন বিভিন্ন দোষে দুষ্ট। ওই সব দোষকে আমরা নিজেরা নিবারণ করতে পারি না। নাফ্স ও শয়তান ঘোর শত্রু। বড় শত্রুর মোকাবেলায় বড় সাহায্যকারীর আশ্রয় নেওয়া আবশ্যক। কাজেই, ওই সব শত্রু থেকে মহান রবের আশ্রয় নিচ্ছি। শয়তানের অনিষ্ট থেকে 'নাফ্স-ই আম্মারা'র অনিষ্ট অধিকতর শক্তিশালী। আস্তিনের সর্প সর্বদা ওঁৎ পেতে থাকে। এ কারণে বিশেষভাবে নাফ্সের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. 'হিদায়াত'র দুই অর্থ: এক. সুপথ দেখানো এবং দুই. গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়া। পক্ষান্তরে- اِضْلَال (পথভ্রষ্ট করা)-এরও দু' অর্থ- এক. কুপথ দেখানো এবং দুই. মন্দ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া। প্রথম অর্থের ভিত্তিতে 'হিদায়াত'র সম্পর্ক নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও কামিল মুর্শিদ এবং ক্বোরআন মজীদের সাথে হবে। অনুরূপ, اِضْلَال বা পথভ্রষ্ট করার সম্পর্ক শয়তান, জিন, মানুষ অথবা 'নাফ্স-ই আম্মারা'র সাথে করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থের ভিত্তিতে هِدَايَة ও ضلالة -এর সম্পর্ক শুধু আল্লাহ'র প্রতি সাব্যস্ত হবে। এখানে এ দ্বিতীয় অর্থই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যাকে মুনিব গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেন, তাঁকে এরপর কেউ কুপথ দেখাতে পারে না। কারণ, তিনি তো সমস্ত পথ অতিক্রম করেই চলে গেছেন। আর যাকে তার মন্দ কার্যাদির কারণে তিনি নিশ্চিত কুফর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য এরপর কারো পথ প্রদর্শন কাজে আসে না। কাজেই, এ খুত্বার উপর এ অভিযোগের অবকাশ নেই যে, 'পথভ্রষ্ট করা'র সম্পর্ক আল্লাহ্'র সাথে কিভাবে রচনা করা হল? 'এ কথা বলারও অবকাশ নেই যে, 'যখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন তখন বান্দার দোষ কি?' বস্তুতঃ এখানে লক্ষ্যণীয় হচ্ছে- কর্ম সম্পাদনকারী হল বান্দা, আর মহান আল্লাহ্ হলেন ওই কর্মের স্রষ্টা। কর্ম সৃষ্টি করা দূষণীয় নয়, কিন্তু বান্দা অবলম্বন ও সম্পাদন করার কারণে অভিযুক্ত হয়। যেমন- তরবারি বানানো অপরাধ নয়, সেটাকে অপকর্মে ব্যবহার করাই অপরাধ।

৫. আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য সমস্ত সৃষ্টি দিয়েছে, বিবেকগতভাবে কিংবা শ্রুতিগতভাবে। কিন্তু আমাদের হুযূর সাক্ষ্য দিয়েছেন সচক্ষে দেখে। কাজেই, সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে পরোক্ষ সাক্ষী, আর হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী। (অথবা এভাবে বলা যায়- হুযূরের সাক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃত ও প্রথম শ্রেণীর আর অন্য সকলের সাক্ষ্য হচ্ছে পরবর্তী পর্যায়ের।) এজন্য মহান রব এরশাদ করেছেন- يَاۤاَيُّهَاالنَّبِىُّ اِنَّاۤاَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا (হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী), নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি হাযির-নাযির করে।[সূরা আহযাব: আয়াত ৪৫]) অর্থাৎ হুযূর আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী এবং বেহেশ্ত ও দোযখ ইত্যাদির দেখেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেহেতু চাক্ষুষ সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য পরিপূর্ণ হয়ে যায়, সেহেতু মহান রব এরশাদ করেছেন اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। [৫:৩]), لَاۤاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই) -এর অর্থ হচ্ছে لَامَعْبُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) অথবা لَامَقْصُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ব্যতীত কাঙ্ক্ষিত কেউ নেই); কিন্তু দৃষ্টিসম্পন্নরা বলেন- لَامَوْجُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ব্যতীত কারো অস্তিত্ব নেই)। মোটকথা, কলেমা পাঠকারী যেমন, তার অর্থও তেমন। কলেমা হচ্ছে একটি, কিন্তু রসনা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণে সেটার প্রভাব-প্রতিক্রিয়াও ভিন্নতর।

৬. অর্থাৎ মুনাফিক্বদের মত সাক্ষ্য দিচ্ছি না, যা কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়; বরং নিষ্ঠাও সততার সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছি। যার মাধ্যমে কাফির মু'মিন হয়ে যায়। মু'মিন 'আরিফ' হয়ে উন্নত মর্যাদা লাভ করে।

৭. হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেমন আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দা ও রসূল (পয়গাম্বর), তেমনি সমস্ত সৃষ্টিরও রসূল। অর্থাৎ আল্লাহর পয়গাম আনয়ন করে

তা মাখলূক্বের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। মহান রবের নিকট থেকে নিয়ে মাখলূক্ব (সৃষ্টি)কে দিয়ে থাকেন। এ কারণে, এটাও বলা যেতে পারে যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং এটাও যে, তিনি আমাদেরও রসূল। অতঃপর, হুযূর কাফিরদেরকে দেন শাস্তির পয়গাম, মু'মিনদেরকে সাওয়াবের এবং আশিক্বদেরকে মিলনের পয়গাম দেন। মোটকথা, হুযূরের রিসালত বিভিন্ন ধরনের। 'নবী' ও 'রসূল' কখনো সমার্থক হয়, কখনো ভিন্নার্থক। 'নবী' ব্যাপকার্থক, 'রসূল' বিশেষার্থক।

৮. কেননা, আরবে হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম'র পর কোন নবী তাশরীফ আনয়ন করেননি। এ চার হাজার বছরকালীন সময়ে হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম'র শিক্ষা লোকেরা ভুলে গিয়েছিলো। স্মরণ রাখা দরকার যে, আরবে এবং হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম'র বংশধরদের মধ্যে আমাদের হুযূর ব্যতীত কোন নবী আসেন নি। কারণ, যে আসমানে সূর্য উদীয়মান থাকে সে আসমানে কোন তারকা থাকে না (বনী ইসরাঈলের নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম'র শুভাগমন আরবের বাইরে হয়েছিলো)।

৯. এভাবে যে, 'বনী ইসরাঈল' (হযরত ইয়াকূব আলাইহিস্ সালাম'র বংশধর), যাঁরা অন্যান্য দেশে অবস্থানরত থাকেন, তাঁদের যৎসামান্য আলো আরবে পৌঁছেছিলো। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম'র পর তাও নিভে গিয়েছিলো। 'ইন্‌জীল' পরিবর্তিত হয়ে গেলো, ইহুদীদের ধর্মযাজক ও খ্রিষ্টানদের পাদ্রীগণ সেগুলোর শিক্ষা পাল্টিয়ে দিলো। কিছু প্রকৃত ঈসায়ী অবশিষ্ট থাকলেও তারা গুহা ও পাহাড়-পর্বতে আত্মগোপন করেছিলেন। তখন দুনিয়ায় শুধু অন্ধকারই বাকী রইলো। ওই যুগকেই 'জাহেলী যুগ' বলা হয়।

১০. এভাবে যে, প্রকৃত আক্বাইদের সাথে সাথে বিশুদ্ধ ইবাদতসমূহও হারিয়ে গিয়েছিলো। এ সব রোগ-ব্যাধির প্রতিষেধক কোথায় পাওয়া যায় তার হদিসও মিলতো না, সেগুলোর চিকিৎসক কোথায় তার খবরও পাওয়া যেতো না। মোটকথা, সমগ্র পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে ঢাকা ছিলো। তা' হবেও না কেন? হিদায়তের সূর্য তো অবিলম্বে উদিত হতে যাচ্ছিলো, যা দ্বারা পৃথিবীতে আলো উদ্ভাসিত ও অন্ধকার দূরীভূত হবার সময় ঘনিয়ে আসছিলো।

১১. দুরূদ শরীফে 'সালাত' ও 'সালাম' উভয়টি আরয করা উচিত। কারণ, ক্বোরআন করীম উভয়টিরই নির্দেশ দিয়েছে। কেবল 'সালাত' কিংবা কেবল 'সালাম' প্রেরণের অভ্যাস করা নিষিদ্ধ (মিরক্বাত)। এ কারণে, 'দুরূদ-ই ইব্রাহীমী' শুধু নামাযের জন্যই। কেননা, তাতে শুধু 'সালাত' আছে, 'সালাম' নেই। 'সালাম' 'তাশাহ্হুদ'র মধ্যে রয়েছে। নামায ব্যতীত এ দুরূদ (দুরূদ-ই ইব্রাহীমী) পরিপূর্ণ নয়। কারণ, 'সালাম' নেই। এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দুরূদ শরীফের অধ্যায়ে আসবে।

১২. এভাবে যে, হুযূর পৃথিবীকে বিস্মৃত সবক্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, মূর্তিপূজা দূরীভূত করেছেন, তাওহীদের কলেমার ঘোষণা দিয়েছেন। যারা একেবারে দোযখের প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলো, তাদের বাহু ধরে বাঁচিয়ে এনেছেন। আর প্রত্যেক রূহানী রোগীকে প্রত্যেক ধরনের আরোগ্য দান করেছেন। কাউকেও এ কথা বলেননি যে, তোমার ঔষধ আমার শেফাখানায় নেই। এমন কামিল ও পরিপূর্ণতম পথপ্রদর্শক না অতীতে এসেছেন, না ভবিষ্যতে আসবেন। স্মর্তব্য যে, এখানে প্রথম شَفٰى পদটি شِفَآءٌ ক্রিয়ামূলের مَاضِى (অতীতকাল বাচক ক্রিয়ারূপ) অর্থাৎ হুযূর সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য দান করেছেন। আর দ্বিতীয় شَفَا পদটি হচ্ছে اسم جامد (বিশেষ্য)। এর অর্থ 'প্রান্ত'। অর্থাৎ যারা ধ্বংস কিংবা জাহান্নামের কিনারায় গিয়ে পৌঁছেছিলো, তাদেরকে আরোগ্য (মুক্তি) দান করেছেন; কাফিরদের 'ঈমান' এবং ফাসিক্বদেরকে 'তাক্বওয়া' দান করেছেন। প্রণেতা মহোদয়ের এ বচন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'হুযূর আরোগ্য দান করেছেন' বলা যেতে পারে। এটা বলা শিরক নয়।

১৩. প্রকাশ্য অর্থ এ যে, এখানে 'হিদায়ত' দ্বারা 'শরীয়ত' বুঝানো হয়েছে, আর 'সা'আদাত' দ্বারা 'তরীক্বত'। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'শরীয়ত' ও 'তরীক্বত' উভয়ই দান করেছেন। অন্তর ও শরীরে এ দু'টিরই জন্য ব্যবস্থাপনা করেছেন। কেউ অস্বীকার করে স্থায়ী দুর্ভাগ্য অর্জন করে নিয়েছে। কেউ তা গ্রহণ করে উভয় জগতের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। হুযূর ওই মক্কাবাসীদের থেকে 'সিদ্দীক্ব' ও 'ফারূক্ব' তৈরী করেছেন, রাহাজানিকারীদেরকে পথ নির্দেশক, পথভ্রষ্টদেরকে পথপ্রদর্শক, জ্ঞানহীনদেরকে সারা দুনিয়ার শিক্ষকে পরিণত করে দিয়েছেন।

হুযূরের 'ফয়য্'-এর কথা কা'বা শরীফের দেয়ালগুলোকে জিজ্ঞাসা করুন, মক্কার বাজারগুলোকে জিজ্ঞাসা করুন, 'মিনা' ও 'মুযদালিফা'র গলিগুলোকে জিজ্ঞাসা করুন এবং 'আরাফাত'র সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলো থেকেও জেনে নিন। তখন সেগুলো বলবে যে, লোকেরা কা'বাকে বোতখানায় পরিণত করে দিয়েছিলো; হুযূর সেটাকে পরিষ্কার করে সমগ্র বিশ্বের জন্য ক্বেবলা করে দিয়েছেন। সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া সাল্লাম।

১৪. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের উপর হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'র আনুগত্য করা ফরয আর এ আনুগত্য

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ التَّمَسُّکَ بِهَدْيِهٖ لَايَسْتَتِبُّ اِلَّا بِالْاِقْتِفَآءِ لِمَا صَدَرَ مِنْ مِّشْكٰوتِهٖ وَالْاِعْتِصَامَ بِحَبْلِ اللّٰهِ لَايَتِمُّ اِلَّا بِبَيَانِ كَشْفِهٖ وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيْحِ الَّذِیْ صَنَّفَهُ الْاِمَامُ مُحْیِ السُّنَّةِ قَامِعُ الْبِدْعَةِ اَبُوْ مُحَمَّدِنِ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُوْدِنِ الْفَرَّاءُ الْبَغْوِیُّ رَفَعَ اللّٰهُ دَرَجَتَهٗ اَجْمَعَ كِتَابٍ صُنِّفَ فِیْ بَابِهٖ

আল্লাহর প্রশংসা এবং রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর দুরূদ-সালাম নিবেদনের পর- জেনে রাখা উচিত যে, হুযূরের 'সীরাত' বা আদর্শ চরিত্রকে দৃঢ়ভাবে অর্জন করা সম্ভবপর নয় ওই সব হাদীসের অনুসরণ ব্যতীত, যেগুলো হুযূরের বক্ষ মুবারক থেকে নিঃসৃত হয়েছে[১৪] এবং আল্লাহ্'র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা সম্ভবপর নয় তাঁর সুস্পষ্ট বর্ণনা ব্যতীত।[১৫] 'মাসাবীহ' নামক কিতাব, যা সুন্নাতকে জীবিতকারী ও বিদ'আতকে নির্মূলকারী, ইমাম আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাস্'উদ ফাররা আল্‌বাগভী'রই রচিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করুন! কিতাবটি এ বিষয়ে লিখিত সমস্ত কিতাবের মধ্যে ব্যাপকতর[১৬]

হাদীস ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ব্যতীত সম্ভবপর নয়। 'মিশকাত' অর্থাৎ 'থাক' হচ্ছে হুযূর-ই আন্ওয়ার'র বক্ষ মুবারক আর হুযূর আলায়হিস্ সালাম'র বরকতময় উক্তি ও অবস্থাদি হচ্ছে ওই থাকের প্রদীপ। যদি তোমরা আলো চাও, তবে ওই বক্ষ এবং ওই সব পবিত্র বাণী ও অবস্থাদি থেকেই তা' অর্জন করো। 'ক্বোরআন' হচ্ছে কিতাব, হুযূর আলায়হিস সালাম হচ্ছেন 'প্রদীপ'। 'প্রদীপ' ব্যতীত কিতাব পড়া যায় না। হুযূর আলায়হিস্ সালাম ব্যতীত ক্বোরআন বুঝা যায় না। প্রতিটি আয়াত হুযূর আলায়হিস্ সালাম'র তাফসীর বা ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী। অন্যথায় আমরা কিভাবে জানি اَقِيْمُوْا অর্থ কি এবং 'সালাত' ও 'যাকাত' কাকে বলে?

১৫. 'আল্লাহর রজ্জু' হচ্ছে ক্বোরআন করীম, যা আমাদের মত সাধারণ লোকদেরকে গভীর গর্ত থেকে বের করে উপরে পৌঁছাতে এসেছে। কিন্তু এ মজবুত রজ্জু থেকে সেই ফায়দা অর্জন করবে, যে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মাধ্যমে সেটা ধারণ করবে। রজ্জু আনয়নকারীও হুযূর এবং এরপর আমাদেরকে ধারণও করান হুযূর। ধারণ করার পর ছুটে যাওয়া থেকে রক্ষাকারীও হুযূর। কারণ, হুযূরের মাধ্যমে সৃষ্টি ক্বোরআন লাভ করেছে, হুযূরই বুঝিয়েছেন বলে ক্বোরআনকে অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে। হুযূরেরই কৃপায় ইন্শা-আল্লাহ্ মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তদনুযায়ী শুধু আমল নয়, বরং তাঁরই অনুগ্রহক্রমে মৃত্যুকালে কলেমা নসীব হবে। যে হাদীস অস্বীকার করে, সে যেন এমন দু'রাক'আত নামায পড়ে কিংবা একবার এমন যাকাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যার মধ্যে হাদীসের সাহায্য নেওয়া হয় নি। মোটকথা, নামায-যাকাত ইত্যাদির নির্দেশ শুনিয়েছে ক্বোরআন, কিন্তু শিখিয়েছেন হুযূর। ক্বোরআন মজীদ হচ্ছে রূহানী খাদ্যদ্রব্য আর হাদীস শরীফ হচ্ছে সেটার পানি। পানি ব্যতীত না খাদ্য তৈরি করা যায়, না খাওয়া যায়।

১৬. অর্থাৎ হাদীস শাস্ত্রের মধ্যে বহু কিতাব লিখা হয়েছে, কিন্তু 'মাসাবীহ' গ্রন্থটি সমস্ত কিতাবেরই ধারক। সেটার লিখক হচ্ছেন হযরত হুসাইন ইবনে মাস্'উদ। তাঁর উপনাম 'আবূ মুহাম্মদ', উপাধী 'ফাররা'। কেননা, তিনি চর্মনির্মিত পোশাক (پوستین) ব্যবসায়ী ছিলেন। (ফাররা নাহভী অন্যজন)। হিরাত ও সারখাস্'র মধ্যবর্তী এক জনপদের নাম বাগ্ভ। তিনি সেখানকার অধিবাসী ছিলেন। তাই তাঁকে 'বাগভী' বলা হয়।

স্বপ্নে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "তুমি আমার সুন্নাতকে জীবিত করেছো, আল্লাহ্ তোমাকে জীবিত রাখুন।" তাই তাঁর উপাধী হল 'মুহিউস্ সুন্নাহ' (সুন্নাতকে জীবিতকারী)। তিনি শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী, বড় মুত্তাক্বী আলিম, একনিষ্ঠ ইবাদতপরায়ণ ও দুনিয়ার মোহত্যাগী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি সর্বদা শুকনো রুটি অথবা যায়তুন কিংবা কিশমিশ দিয়ে রুটি খেতেন। ৮০ বছরের অধিক বয়স পেয়ে ৫১৬ হিজরিতে 'কূর্দ' নামক স্থানে ওফাত পান। আপন ওস্তাদ কাযী হুসাইনের পাশে দাফন করা হয়।

তিনি 'মাসাবীহ', শরহুস্ সুন্নাহ, তাফসীর-ই মা'আ-লিমুত্ তানযীল, কিতাবুত্ তাহ্যীব এবং ফাতাওয়া-ই বাগ্ভী ইত্যাদি কিতাব লিখেছেন। স্মর্তব্য যে, 'মাসাবীহ্'র মধ্যে ৪,৪৩৪টি হাদীস ছিলো। 'মিশকাত'র লিখক এর সাথে আরো ১,৫১১টি হাদীস সংযোজন করেছেন। সুতরাং 'মিশকাত শরীফ'-এ সর্বমোট ৫,৯৪৫টি হাদীস রয়েছে। (মিরক্বাত)

وَاَضْبَطَ لِشَوَارِدِ الْاَحَادِيْثِ وَاَوَابِدِهَا وَلَمَّا سَلَكَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ طَرِيْقَ الْاِخْتِصَارِ وَحَذَفَ الْاَسَانِيْدَتَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ النُّقَادِوَاِنْ كَانَ نَقْلُهٗ وَاِنَّهٗ مِنَ الثِّقَاتِ كَالْاِسْنَادِلٰكِنْ لَيْسَ مَافِيْهِ اَعْلَامٌ كَالْاَغْفَالِ

এবং বিস্মৃতপ্রায় ও দুর্বোধ্য হাদীসসমূহের সংরক্ষক ও ধারক ছিলো।[১৭] যেহেতু সম্মানিত গ্রন্থকার সংক্ষেপ করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন[১৮] এবং সনদগুলোকে বাদ দিয়েছেন (শুধু হাদীসগুলোই লিখেছেন) সেহেতু এ সম্পর্কে কোন কোন সমালোচক সমালোচনার মুখ খুলেছেন;[১৯] যদিও লেখকের হাদীস উদ্ধৃত করাই 'সনদ' বর্ণনা করার মত গ্রহণযোগ্য।[২০] কেননা, তিনি অতি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব,কিন্তু দিকনির্দেশক ফলক বিশিষ্ট রাস্তা এবং ফলকবিহীন রাস্তা এক ধরনের নয়।[২১]

---

১৭. شَوَارِد (শাওয়া-রিদ) شَارِدَة-এর বহুবচন।এর অর্থ نافرة (পথহারা প্রাণী)। অর্থাৎ ওই সব হাদীস, যেগুলো মানুষের স্মৃতি থেকে প্রায় চলে গিয়েছিলো। লোকেরা সেগুলোকে প্রায় ভুলে বসেছিলো; যেমনিভাবে পথহারা প্রাণী আপন স্থান থেকে পালিয়ে যায়।
اَوَابِد (আওয়া-বিদ) آبِدَة-এর বহুবচন। এর অর্থ বন্যজন্তু, যা মানুষ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। অর্থাৎ ওই সব হাদীস, যেগুলোর বিষয়বস্তু বোধশক্তির উর্ধ্বে, বুঝে আসে না, যেমন- বন্যজন্তু হাতের মুঠোয় আসে না। অর্থাৎ 'মাসাবীহ' ওই সমস্ত হাদীসের ধারক, যেগুলো লোকেরা ভুলে গিয়েছিলো অথবা সেগুলোর বর্ণনা কিংবা বিষয়বস্তুগুলো থেকে প্রায় নিরাশ হয়ে গিয়েছিলো।

১৮. এভাবে যে, না হাদীসগুলোর সনদ বর্ণনা করেছেন, না সেগুলোর উৎস অর্থাৎ কোন্ কিতাব থেকে এ হাদীস গৃহীত হয়েছে তা লিখেছেন। স্মর্তব্য যে, হাদীসের সনদ 'মুজতাহিদ'র উপকারে আসে, যা দ্বারা ওই সব হযরত হাদীসের স্তর, নাসিখ বা মানসূখ (রহিতকারী বা রহিত) হওয়া, বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধপূর্ণ হলে কোন একটা প্রাধান্য পাওয়া, কোন হাদীসের বক্তব্য মুস্তাহাব নির্দেশক হওয়া, কোনটার বচন ওয়াজিব নির্দেশক হওয়া ইত্যাদি জেনে নেন। সম্মানিত মুক্বাল্লিদগণ এসব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকেন। তাঁদের জন্য ইমামের উক্তিই দলীল, আর হাদীস হচ্ছে ইমামের দলীল। পুলিশের জন্য হাকিমের ফায়সালা দলীল, আর হাকিমের জন্য দেশের দণ্ডবিধির ধারাগুলোই দলীল। এ কারণে মাসাবীহ'র রচয়িতা শুধু হাদীসের 'মতন' (বচন) উল্লেখ করেছেন, সনদগুলো ছেড়ে দিয়েছেন। (মিরক্বাত)
স্মর্তব্য যে, হাদীসের এবারতকেই 'মতন' বলা হয়। আর বর্ণনাকারীদের পরম্পরাকে 'সনদ' বলে। মূল কিতাবের উল্লেখ করাকে, যেখান থেকে হাদীস গৃহীত হয় تَخْرِيْج (তাখরীজ) বা উদ্ধৃতকরণ বলা হয়।

১৯. এভাবে যে, 'মাসাবীহ'র হাদীসগুলোর প্রতি সন্দেহ করতে আরম্ভ করলেন। আর বলতে লাগলেন যে, যখন না সনদগুলোর উল্লেখ রয়েছে, না 'তাখরীজ' (উৎস) জানা যায়, তখন ওই হাদীসগুলো বিশুদ্ধ কিনা কে জানে? হাদীসের সমালোচকগণ হচ্ছেন- ওই সব সম্মানিত মুহাদ্দিস, যাঁরা 'সহীহ' (বিশুদ্ধ), দ্বা'ঈফ (দুর্বল সনদ বিশিষ্ট) ও 'হাসান' (উত্তম সনদ বিশিষ্ট) ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করণে সক্ষম, হাদীস বর্ণনাকারীর জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে অবগত এবং তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় ও সমালোচনা করতে সমর্থ।

২০. অর্থাৎ ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ্ এমন পর্যায়ের মুহাদ্দিস যে, তিনি কোন হাদীসকে কোন ত্রুটি নির্ণয় ব্যতীত উদ্ধৃত করাই ওই হাদীসের শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তাঁর উদ্ধৃতিই সনদ সম্পন্ন হওয়ার নামান্তর।
এ বচনগুলো থেকে দু'টি মাসআলা জানা যায়:
এক. মুক্বাল্লিদের জন্য ইমামের বর্ণিত হাদীসের উপর ভরসা করা বৈধ। হাদীসকে যাচাই-বাছাই করা তার জন্য প্রয়োজনীয় নয়। রোগীকে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রের উপরই ভরসা করতে হয়; চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই-পুস্তক পর্যালোচনা করার প্রয়োজন তার নেই।
দুই. ফক্বীহগণ দুর্বল হাদীসগুলো অনুসারে কাজ করলে ওই হাদীস শক্তিশালী বলে ধরে নিতে হয়।

২১. কাজেই, উৎস (সূত্র) বর্ণনা করে দিলে লোকেরা সমালোচনা করার সুযোগ পাবে না এবং 'মাসাবীহ' প্রণেতার বিপক্ষে আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ! কতোই উত্তম শিষ্টাচার যে, তিনি বলেছেন, 'চিহ্ন বিশিষ্ট রাস্তা' অর্থাৎ মিশকাত শরীফ 'ফলক বা চিহ্নবিহীন রাস্তা' অর্থাৎ 'মাসাবীহ'র মতো নয়। 'মাসাবীহ' অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের (কিতাব)। বস্তুতঃ এটা বিনয়ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

فَاسْتَخَرْتُ اللّٰهَ وَاسْتَوْفَقْتُ مِنْهُ فَاَعْمَلْتُ مَا اَغْفَلَهُ فَاَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيْثٍ مِّنْهُ فِىْ مَقَرِّهٖ كَمَا رَوَاهُ الْاَئِمَّةُ الْمُتْقِنُوْنَ وَالثِّقَاتُ الرَّاسِخُوْنَ مِثْلَ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِىِّ

সুতরাং আমি আল্লাহ্র নিকট থেকে কল্যাণ ও শক্তি প্রার্থনা করলাম[২২] এবং সেগুলোর মধ্যে চিহ্নবিহীনকে চিহ্নবিশিষ্ট করে দিলাম,[২৩] এভাবে যে, এর প্রতিটি হাদীসকে আপন অবস্থানে তেমনিভাবে স্থাপন করেছি[২৪] যেমন 'দক্ষ', 'আদিল' (মুত্তাক্বী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য) ও 'হাফিয' (এমন মুহাদ্দিস যিনি লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছেন) ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন- আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী,[২৫]

২২. এভাবে যে, মিশকাত শরীফ লিখার পূর্বে আমি নিয়মানুসারে ইস্তিখারাহ্ করেছেন। যেমন, ইমাম তাবরানী হযরত আনাস্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন- مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ অর্থাৎ 'যে ইস্তিখারাহ্ করে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়না আর যে পরামর্শ করে কার্য সম্পাদন করে সে লজ্জিত হয় না।' আর (কিতাবটি) প্রণয়নকালে আল্লাহর নিকট তা' পরিপূর্ণ করার শক্তি প্রার্থনা করতে থাকি। আল্লাহ্'র মুখাপেক্ষী বান্দা আহমদ ইয়ার খানও আল্লাহ্'র দরবারে প্রার্থনা করছে- মহান মুনিব আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ওসীলায় এমন মহৎ কাজকে অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন করার তাওফীক দিন। সেটা কবূল করে সাদক্বাহ্-ই জারিয়াহ্ এবং আমার গুনাহগুলোর কাফ্ফারায় (প্রায়শ্চিত্ত) পরিণত করুন! হে বিশ্বপ্রতিপালক এ প্রার্থনা কবূল করুন।

২৩. এভাবে যে, প্রত্যেক হাদীসের প্রারম্ভে বর্ণনাকারী সাহাবীর পবিত্র নাম এবং শেষভাগে হাদীসের কিতাবের নাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।

২৪. অর্থাৎ যে হাদীস 'মাসাবীহ'র মধ্যে যেস্থানে ছিলো আমিও (মিশকাত শরীফে) সেটাকে সেখানেই বর্ণনা করেছি। বিনা কারণে আগে কিংবা পরে নিই নি। আর হাদীসের মধ্যে মুহাদ্দিসগণের বর্ণনাগুলোর অনুসরণ করেছি। যেভাবে ওই ইমামদের থেকে বর্ণিত হয়েছিলো সেভাবেই আমি বর্ণনা করেছি।

২৫. ইমাম বোখারী: তাঁর নাম শরীফ মুহাম্মদ। পিতার নাম ইসমাঈল। বোখারায়, যা কাস্পিয়ান সাগরের তীরে একটি খুব বড় শহর, তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সে কারণে তাঁকে 'বোখারী' বলা হয়। উম্মত-ই মুহাম্মদীর খুব বড় আলিম, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর পিতাও বড় আলিম। আর হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও ইমাম মালেকের শাগরিদ ছিলেন। তাঁর মহীয়সী মাতা এমন ওলী ছিলেন, যাঁর দো'আ কবূল হতো। তিনি শৈশবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। চিকিৎসা করতে চিকিৎসকরা অক্ষম হয়ে পড়েন। তাঁর মাতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি বলছিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দো'আ কবূল করেছেন। তোমার সন্তানকে চক্ষুষ্মান করেছেন।" ভোরে দেখতে পান যে, তাঁর চোখ দু'টি জ্যোতি সম্পন্ন। ইমাম বোখারী তাঁর স্বপ্নের এক ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, "আমি নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'র পবিত্রতম শরীর থেকে মাছি তাড়াতে দেখলাম।" স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া হলো, "তুমি হাদীস শরীফের খিদমত করবে। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ থেকে দুর্বলগুলোকে দূরে সরিয়ে নেবে।" তিন লক্ষ হাদীস শরীফ তাঁর মুখস্থ ছিল। তন্মধ্যে এক লক্ষ ছিলো 'বিশুদ্ধ' (সহীহ) আর দু'লক্ষ ছিলো অন্যান্য। মসজিদ-ই হারাম শরীফে দীর্ঘ ষোল বছরে সহীহ বোখারী শরীফ প্রণয়ন করেছেন। তাও এভাবে যে, সর্বদা গোসল করে দু'রাক'আত নফল নামায সম্পন্ন করে লিখতেন।

বোখারায় শাওয়াল মাসের (১৯৪ হিজরি) জুমু'আর দিন আসরের পর তাঁর জন্ম হয়েছিল। ৬২ বছর বয়সে ২৫৬ হিজরিতে 'খরতঙ্গ' নামক স্থানে তিনি ওফাত পান। তদানীন্তনকালীন বাদশাহর দিক থেকে বিরক্ত হয়ে তিনি নিজেই নিজের ওফাতের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাহাজ্জুদের সময় তিনি এ প্রার্থনা করেন। পরদিনই তাঁর ওফাত হয়ে গেলো।

স্বপ্নে দেখা গেলো যে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীদের জামা'আত সহকারে যেন কার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আরয করা হলে হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আমরা মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি।" দীর্ঘদিন যাবৎ ইমাম বোখারীর মাযার শরীফ থেকে মুশক আম্বরের খুশবু

وَاَبِى الْحُسَيْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِىِّ وَاَبِىْ عَبْدِاللّٰهِ مَالِكِ بْنِ اَنَسِ الْاَصْبَحِىِّ

আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ক্বোশায়রী,[২৬] আবূ আবদুল্লাহ্ মালিক ইবনে আনাস্ আসবাহী,[২৭]

আসছিল। মাটি ও সুগন্ধময় হয়ে গিয়েছিলো।

বোখারী শরীফে সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা ৯০৮২। এগুলোর মধ্যে বার বার ও সনদবিহীন উল্লেখিত সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বারংবার উল্লেখিত হাদীসগুলো ছাড়া মোট মারফূ' হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৬২৩। তন্মধ্যে ২২টা হাদীসের সনদ শুধু তিনজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তা' থেকেও বার বার উল্লেখিতগুলো বাদ দিলে এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬তে; এমন হাদীসকে ثُلاثِىْ (সুলাসী) বলে। অর্থাৎ এ হাদীসগুলোর সনদে ইমাম বোখারী ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মধ্যে শুধু তিনজন বর্ণনাকারীর মাধ্যম বিদ্যমান।

ক্বোরআন শরীফের পর বোখারী শরীফই বিশুদ্ধতম কিতাব হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। মুসীবতের সময় বোখারী শরীফের খতম করা হয়। এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহক্রমে মুসীবতসমূহ দূরীভূত হয়ে যায়। -মিরক্বাত।

ইমাম বোখারী সহীহ বোখারী শরীফ ছাড়াও নিম্নলিখিত কিতাবগুলো লিখেছেন:

- আল্ আদাবুল মুফরাদ,
- রাফ'উল ইয়াদায়ন,
- ক্বিরআত খালফাল ইমাম,
- বিররুল ওয়ালিদায়ন,
- আততা-রীখুল কবীর,
- আল্ আওসাত্ব,
- আস্সগীর,
- খালক্বু আফ'আলিল 'ইবাদ
- কিতাবুদ্ দ্বো'আফা,
- জামে'-ই কবীর,
- মুসনাদ-ই কবীর,
- তাফসীর-ই কবীর,
- কিতাবুল আশরিবাহ্,
- কিতাবুল হিবাহ্,
- আসা-মিউস্ সাহাবা,
- কিতাবুল ভিজ্দান
- কিতাবুল 'ইলাল,
- কিতাবুল কুনা,
- কিতাবুল মাবসূত্ব এবং
- কিতাবুল ফাওয়া-ইদ

ইত্যাদি। কিন্তু বোখারী শরীফ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। তিনি ১০৮০জন মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন। এক লক্ষ মুহাদ্দিস তাঁর শাগরিদ। তাঁদের মধ্যে ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইবনে খুযায়মা, আবূ যুরা'আহ্ এবং আবূ হাতিম নাসায়ী সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মারভেযী বলছেন, "আমি বায়তুল্লাহ্ শরীফের কাছে ঘুমাচ্ছিলাম। আমি হুযূরকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি এরশাদ ফরমাচ্ছেন, "তুমি আমার কিতাব পড়ছোনা কেন?" আমি আরয করলাম, "হুযূর, আপনার কিতাব কোন্‌টি?" এরশাদ ফরমালেন, "মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারীর কিতাব সহীহ বোখারী।"

২৬. ইমাম মুসলিম : তাঁর নাম শরীফ হচ্ছে মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী। বনী ক্বোশায়রা গোত্রে তাঁর জন্ম হয়। তিনি বহু কিতাব লিখেছেন-

- মুসলিম শরীফ
- মুসনাদ-ই কবীর
- জামে কবীর
- কিতাবুল 'ইলাল
- আওহামুল মুহাদ্দিসীন
- কিতাবুত্ তামীয
- তাবাক্বাতুত্ তাবে'ঈন
- কিতাবুল মুখদ্বারামিয়্যীন ইত্যাদি।

কিন্তু সেগুলোর মধ্যে মুসলিম শরীফ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। তিন লক্ষ হাদীস থেকে চয়ন করে চার হাজার হাদীস তাতে সন্নিবিষ্ট করা হয়। মুসলিম শরীফে আশি থেকে কিছু বেশী হাদীস রয়েছে 'রুবা'ঈ', যেগুলোর সনদে শুধু চারজন বর্ণনাকারী রয়েছেন।

তাঁর জন্ম ২০৪ হিজরিতে, হযরত ইমাম শাফে'ঈর ওফাতের কিছুকাল পরে হয়েছিলো। ওফাত হয় ২৬১ হিজরির রজব মাসে। সাতান্ন বছর তাঁর বয়স শরীফ।

একবার তাঁর নিকট কোন একটি হাদীস জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি সমগ্র রাত ওই হাদীসটি তালাশ করার জন্য কিতাবাদি পর্যালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। এক ব্যক্তি খেজুর ভর্তি ঝুড়ি এনে তাঁর পাশে রাখলো। এদিকে তিনি তা থেকে একটার পর একটা করে খেজুর খাচ্ছিলেন আর হাদীসটি তালাশ করছিলেন। ভোর হলো। হাদীসটি পাওয়া গেলো। ঝুড়ির খেজুরও নিঃশেষ হলো। এ কারণে তাঁর ওফাত হলো। নিশাপুরে তাঁর কবর শরীফ অবস্থিত।

২৭. ইমাম মালিক : তিনি মালিকী মাযহাবের ইমাম। তাব'ই তাবে'ঈন'র অন্তর্ভুক্ত। যদিও তিনি ইমাম বোখারী ও মুসলিমের পূর্ব যুগের ছিলেন এবং তাঁর কিতাব মুআত্তা-ই ইমাম মালিক ওই দু'টি কিতাবের পূর্বেই লিখা হয়েছে, কিন্তু যেহেতু বোখারী ও মুসলিমের মর্যাদা হাদীস শাস্ত্রের মধ্যে সবার উর্ধ্বে পরিগণিত হয়েছে, সেহেতু প্রণেতা মহোদয় এ দু'জন ইমামের পরেই তাঁর উল্লেখ করেছেন।

তিনি বড় মুহাদ্দিস, ফক্বীহ্ ও আশিক্ব-ই রসূল ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন। একবার হজ্জের জন্য

وَاَبِیْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ اِدْرِیْسَ الشَّافِعِیِّ وَاَبِیْ عَبْدِ اللّٰهِ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ الشَّیْبَانِیِّ

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফে'ঈ,[২৮] আবূ আবদুল্লাহ্ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল শায়বানী,[২৯]

ব্যতীত অন্য কোন সময় মদীনা শরীফ থেকে বাইরে যান নি। তিনি এ পবিত্র শহরে কখনো খচ্চর কিংবা ঘোড়ার পিঠে আরোহন করেননি। অথচ, তাঁর অনেক ঘোড়া ছিলো। অত্যন্ত আদব সহকারে ওযূ অবস্থায় হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনশ' তাবে'ঈ ও চারশ' তাব'ই তাবে'ঈন থেকে হাদীসসমূহের শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর জন্ম হয় ১০৩ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে আর ওফাত হয় ১৭৯ হিজরিতে। (এটা মিরক্বাতের বর্ণনা)। ফাতওয়া-ই শামীতে বর্ণিত হয় যে, ইমাম মালিকের জন্ম হয় ৯০ হিজরিতে এবং ওফাত হয় ১৭৯ হিজরিতে। সুতরাং তাঁর বয়স ৮৯ বছর। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাতা। তাঁর মাযার শরীফ মদীনা মুনাওয়ারায় জান্নাতুল বাক্বী'তে, যা আলিম-ওলামা ও জনসাধারণের যিয়ারতের স্থান। এ অধমও যিয়ারত করেছি। তাঁর লিখিত হাদীসের কিতাব 'মুআত্তা-ই ইমাম মালিক' প্রসিদ্ধ।

২৮. ইমাম শাফে'ঈ: তাঁর উপনাম 'আবূ আবদুল্লাহ্'। নাম ও বংশ-শাজরা: মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনে আব্বাস ইবনে ওসমান ইবনে শাফে' ইবনে সা-ইব ইবনে ওবায়দ ইবনে আবদ-ই ইয়াযীদ ইবনে হাশিম ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফ। এ কারণে তিনি মুত্তালিবী, হাশেমী। শাফে' ইবনে সা-ইবের প্রতি সম্পর্কের কারণে তাঁর উপাধী হচ্ছে শাফে'ঈ। তাঁর মাযহাবের পরম্পরার নামও শাফে'ঈ। শাফে'র মায়ের নাম.খুলদা বিনতে আসাদ, হযরত আলী মুরতাদ্বার খালা। অর্থাৎ ফাতেমা বিনতে আসাদের সহোদরা। সা-ইব বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের পতাকাবাহী ছিলেন, যিনি মুসলমানদের নিকট বন্দী হয়ে আসেন এবং মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি লাভ করেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইমাম শাফে'ঈ ইসলামের গৌরবময় মুজতাহিদ ইমাম, মাযহাবের প্রবর্তক, ইবাদতপরায়ণ, পার্থিব মোহত্যাগী এবং বড়ই আদব রক্ষাকারী বুযুর্গ। দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদিতে তিনি চৌদ্দটি বড় আকারের কিতাব প্রণয়ন করেন। আর ধর্মীয় বিধানের শাখা-প্রশাখার উপর লিখেছেন শতাধিক কিতাব। তিনি যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন বাগদাদ শরীফে (কূফা) হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র মাযারে হাযির হয়ে দু'রাক'আত নফল নামায পড়ে হুযূর ইমাম আ'যমের ওসীলা নিয়ে দো'আ করতেন। মহান রব তাঁর সমস্যার সমাধান করে দিতেন। তিনি নিজেই বলতেন, ''ইমাম আবূ হানীফার মাযার শরীফ দো'আ কবূল হওয়ার জন্য পরশপাথর স্বরূপ।''

তাঁর জন্ম ১৫০ হিজরিতে। ইমাম আ'যমের ওফাতের দিনে। আসক্বলান অথবা মিনায় হয়েছিল। মক্কা মু'আয্যামায় লালিত হন। ৫৪ বছর বয়স শরীফ পেয়ে ২০৪ হিজরিতে মিশরে ওফাত পান। মিশরের কুরাফায় তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত। তিনি ইমাম মালিকের শাগরিদ। ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির লিখিত কিতাবাদি থেকে জ্ঞানার্জন করেন। রমযান শরীফের প্রতিটি রাতে তিনি এক খতম ক্বোরআন পড়তেন।

২৯. তাঁর উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্। নাম শরীফ- আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে বেলাল ইবনে ইদরীস ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জিনান ইবনে আসাদ ইবনে নিযার ইবনে মা'আদ ইবনে আদনান। বড় মুহাদ্দিস, ফক্বীহ্ ও মুজতাহিদ ছিলেন। মাযহাবের ইমাম। বাগদাদ শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন। বিদ্যার্জনের জন্য একাধারে কূফা, বসরা, সিরিয়া মক্কা মু'আয্যামাহ্ ও মদীনা মুনাওয়ারাহ্'য় যান। হাদীসের ইমামদের সাথে সাক্ষাত করেন। ইমাম বোখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ প্রমুখ তাঁর শাগরিদ। সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস থেকে চয়ন করে 'মুসনাদ-ই আহমদ ইবনে হাম্বল' প্রণয়ন করেন। তাঁর সব চেয়ে বড় মহত্ব এ যে, হুযূর গাউসুস্ সাক্বালাইন সৈয়্যদ শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির বাগদাদী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হাম্বলী মাযহাব'র অনুসারী ছিলেন।

তিনি সবসময় দারিদ্র্য অবলম্বন ও উপবাস যাপন করতেন। 'ক্বোরআন মাখলূক কি না?' এ মাসআলায় তার সঠিক সিদ্ধান্ত না মেনে বাগদাদের বাদশাহ মামুনুর রশীদ তাঁর বিপক্ষে চলে যান। সে তাঁকে ত্রিশটি চাবুক মারলো। ইমাম প্রতিটি চাবুকের জবাবে বলেছেন, ''ক্বোরআন আল্লাহ্'র কালাম ক্বদীম, মাখলূক নয়।'' তাঁর জন্ম বাগদাদ শরীফে ১৬৪ হিজরিতে হয়েছিলো। ৭৭ বছর বয়সে জুমু'আর দিন চাশতের সময় ২৪১ হিজরিতে বাগদাদ শরীফেই ওফাত পান। সেখানেই তাঁর আলোকোজ্জ্বল মাযার অবস্থিত।

তাঁর নামাযে জানাযায় ২৫ লক্ষ মানুষ শরীক হন। ওফাতের দিন ২০ হাজার কাফির মুসলমান হয়। তাঁর আলোকোজ্জ্বল

وَاَبِیْ عِیْسٰی مُحَمَّدِ بْنِ عِیْسَی التِّرْمِذِیِّ وَاَبِیْ دَاؤُدَ سُلَیْمَانَ ابْنِ الْاَشْعَثِ السِّجِسْتَانِیِّ وَاَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْمَدَ بْنِ شُعَیْبِ النَّسَائِیِّ وَاَبِیْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیْدَ بْنِ مَاجَةَ الْقَزْوِیْنِیِّ

আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী,[৩০] আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনে আশ্'আস সাজিস্তানী,[৩১] এবং আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শু'আইব নাসাঈ,[৩২] আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ ক্বাযভীনী,[৩৩]

মাযার থেকে আল্লাহ্'র অসংখ্য মাখলূক্ব বরকত হাসিল করে থাকে। হযরত ইমাম শাফে'ঈ তাঁর ওই জামা ধুয়ে পান করেন, যা পরিহিত অবস্থায় তাঁকে চাবুক মারা হয়েছিলো। ২৩০ বছর পর তাঁর কবর শরীফ খুলে গেলে তাঁর দেহ শরীফ ও কাফন মুবারক হুবহু সংরক্ষিত অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

-মিরক্বাত ও আশি''আতুল লুম'আত ইত্যাদি

৩০. তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সূরাহ্ ইবনে মূসা ইবনে দ্বাহহাক সালামী। উপনাম আবূ 'ঈসা'। বলখের জায়যুন নদীর তীরে 'তিরমিয' নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়, সেখানেই তিনি ওফাত পান। তিনি শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী। বড় মুহাদ্দিস, আলিম, ও ইবাদতপরায়ন বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর কিতাব 'তিরমিযী শরীফ' হাদীসের চুলচেরা যাচাই ও মাযহাবের বর্ণনায় অদ্বিতীয়। এ কিতাবে একটি হাদীস শরীফ আছে, যা ইমাম তিরমিযী পর্যন্ত শুধু তিনজনের মাধ্যমে হুযূর আলায়হিস্ সালাত ওয়াস্ সালাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর জন্ম হয় ২২৯ হিজরিতে। ওফাত হয় ৫০ বছর বয়সে ২৭৯ হিজরিতে।

৩১. তাঁর নাম শরীফ সুলায়মান ইবনে আশ্'আস ইবনে ইসহাক্ব ইবনে বশীর। উপনাম 'আবূ দাউদ'। প্রিয় জন্মভূমি খোরাসান এলাকার হিরাতের নিকটবর্তী এলাকা সীস্তান, যাকে সাবহিস্তানও বলা হয়। জন্ম ২০২ হিজরিতে এবং ওফাত ২৭৫ হিজরিতে বসরায় হয়েছিলো। সেখানেই তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত। বয়স পান ৭৩ বছর। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে চার হাজার আটশ' হাদীস সঙ্কলন করেছেন। বড় ফক্বীহ্, আলিম, মুহাদ্দিস, ইবাদতপরায়ণ, সংসারের মোহত্যাগী, মুত্তাক্বী ও পরহেযগার ছিলেন।

৩২. তাঁর নাম আবূ আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে শু'আয়ব ইবনে বাহার ইবনে সিনান নাসাঈ। খোরাসান অঞ্চলের একটি জনপদের নাম 'নাসা', মারভ'র নিকটবর্তী। সেখানেই তিনি বসবাস করতেন। তিনি প্রথমে হাদীসের একটি বিরাটাকার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেটার নাম ছিল 'নাসাঈ'। কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, ''নাসাঈর সমস্ত হাদীসই কি সহীহ?'' তিনি বললেন, ''না।'' লোকটি বললো, ''বিশুদ্ধ হাদীসগুলো সঙ্কলন করুন।'' তখন তিনি তা থেকে সহীহ হাদীসগুলো সঙ্কলন করলেন, সেটার নাম রাখলেন 'মুজ্তাবা-ই নাসাঈ'। এখন এ কিতাবটিই প্রচলিত।

শিক্ষার্জনের জন্য তিনি অতিমাত্রায় সফর করেন। তিনি যখন দামেস্কে পৌঁছুলেন তখন তাঁকে একজন লোক বললো, ''আমীর মু'আবিয়া উত্তম, না আলী মুরতাদ্বা?'' তদুত্তরে তিনি বললেন, ''আমীর-ই মু'আবিয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তাঁর মুক্তি হয়ে যাবে।'' এটা শুনে সেখানকার লোকেরা তাঁর উপর হামলা করলো এবং এত বেশি প্রহার করলো যে, সেখানকার জখমই তিনি সহ্য করতে পারেন নি। কারো কারো মতে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসে পৌঁছলে তাঁর ওফাত হয়। কেউ কেউ বলেন, ''মক্কা মু'আযযামায় তাঁর ওফাত হয়।'' সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হাদীসের বড় বড় ইমামগণ তাঁর শাগরিদ ছিলেন। যেমন, ইমাম ত্বাহাভী ও ইমাম আবুল ক্বাসিম ত্বাবরানী প্রমুখ। সাধারণত তিনি মিশরে থাকতেন। তাঁর জন্ম হয় ২১৫ হিজরিতে, ওফাত হয় ৩০৩ হিজরিতে।

কেউ কেউ লিখেছেন, তাঁর যুগে খারেজী সম্প্রদায়ের খুব জোর ছিলো। তিনি সবসময় আহলে বায়তের (নবী পরিবারের) ফযীলত বর্ণনা করতেন। এ জন্য খারেজীরা তাঁর পিঠে এমন জোরে বল্লম মেরেছিলো যে, তা তাঁর বক্ষ ভেদ করে বের হয়েছিলো। আর তিনি এ কথা বলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ অর্থাৎ কা'বার রবের শপথ! আমি সফলকাম হয়ে গেছি।

৩৩. তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ্ রবী'ঈ। উপনাম 'আবূ আবদুল্লাহ্'। ক্বাযভীনের অধিবাসী। তাঁর কিতাব হচ্ছে 'ইবনে মাজাহ'। তাতে সহীহ নয় এমন হাদীস তুলনামূলকভাবে বেশি থাকার কারণে কেউ কেউ ইবনে মাজাহ শরীফের স্থলে দারেমী অথবা মুআত্তাকে সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে গণনা করেছেন। তাঁর জন্ম হয় ২০৯ হিজরিতে। ওফাত হয় ২৭৩ হিজরির রমযান মাসে। বয়স পান ৬৪ বছর।

وَاَبِىْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيِّ وَاَبِى الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَالدَّارِ قُطْنِيِّ وَاَبِىْ بَكْرٍ اَحْمَدَ بْنِ حُسَيْنِ الْبَيْهَقِيِّ وَاَبِى الْحَسَنِ رَزِيْنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِيِّ وَغَيْرِهِمْ

আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান দারেমী,[৩৪] আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর দারে ক্বোত্‌নী,[৩৫] আবূ বকর আহমদ ইবনে হুসাইন বায়হাক্বী,[৩৬] আবুল হাসান রযীন ইবনে মু'আবিয়া আবদারী[৩৭] প্রমুখ।

৩৪. তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আফদ্বাল ইবনে বাহরাম। উপনাম 'আবূ মুহাম্মদ'। গোত্র দারেম ইবনে মালিকের নামানুসারে। এ কারণে তাঁকে দারেমী বলা হয়। জন্মভূমি সমরকন্দ। আপন যুগের শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও ফক্বীহ ছিলেন। তাঁর ওফাতের খবর শুনে ইমাম বোখারী খুব বেশি ক্রন্দন করেছিলেন। তাঁর শাগরিদ ছিলেন ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী প্রমুখ। তাঁর জন্ম হয় ১৮১ হিজরিতে এবং ওফাত শরীফ হয় ২৫০ হিজরির ৮ই যিলহজ্ব। বয়স পান ৭৪ বছর। তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'দারেমী শরীফ'।

৩৫. তাঁর নাম আবুল হাসান ইবনে আলী ইবনে ওমর। বাগদাদের এক মহল্লা ক্বোত্‌নের অধিবাসী। তিনি আপনযুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ইমাম ও আসমাউর রিজাল (হাদীস বর্ণনাকারী ইমামগণের ইতিহাস)-এর 'হাফিয' ছিলেন। তাঁর কিতাব 'দারু ক্বোত্‌নী' অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর শাগরিদ ছিলেন। যেমন, আবূ নু'আঈম, হাকেম ও আসফারাঈনী প্রমুখ। তাঁর জন্ম হয় ৩০৫ হিজরিতে এবং ওফাত হয় ৩৮৫ হিজরিতে বাগদাদ শরীফে। সেখানে তাঁর মাযার মুবারক অবস্থিত।

৩৬. তাঁর নাম আহমদ ইবনে হুসাইন। উপনাম 'আবূ বকর'। নিশাপুরের 'বায়হাক্ব' এলাকার নিকটবর্তী গ্রাম 'জযর'-এ তাঁর জন্ম হয়। তিনি আপন যুগের অত্যন্ত সম্মানিত মুহাদ্দিস, ইমাম হাকেমের শীর্ষস্থানীয় শাগরিদ।
তিনি 'বায়হাক্বী শরীফ' ছাড়াও বহু কিতাব লিখেছেন। তন্মধ্যে 'দালাইলুন্ নুবূওয়াত', 'কিতাবুল বা'সি ওয়ান্ নুশূর', 'কিতাবুল আদাব', 'কিতাবু ফাযা-ইলিল আওক্বাত', 'শু'আবুল ঈমান' ও 'কিতাবুল খিলাফিয়্যাত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি ওই সাতজন প্রণেতার মধ্যে অন্যতম, যাঁদের লিখনী থেকে মুসলমানগণ অতিমাত্রায় উপকৃত হন। দুনিয়াত্যাগী, স্বল্পভোজী ও অত্যন্ত ইবাদতপরায়ণ ছিলেন। ৩০ বছর যাবৎ একাধারে রোযাদার ছিলেন। তাঁর মাযহাব ছিলো শাফে'ঈ। তাঁর জন্ম হয় নিশাপুরে ৩৮৪ হিজরির শা'বান মাসে। ওফাতও নিশাপুরে (১০ জুমাদাল উলা) ৪৫৮ হিজরিতে। বয়স পান ৭৪ বছর। তাঁর তাবূত শরীফ (কফিন) তাঁর জন্মস্থান বায়হাক্ব এলাকার খুসরূজির্দে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মাহে জুমাদাল উলায় দাফন করা হয়।

৩৭. তাঁর নাম রযীন ইবনে মু'আবিয়াহ্। উপনাম 'আবুল হাসান'। 'আবদার' গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত, যিনি আবদুদ্ দার ইবনে কুসাই'র বংশধর। তাঁর 'কিতাবুন্ নাজরিয়্যাহ' প্রসিদ্ধ। ৫৩০ হিজরিতে তিনি ওফাত পান। তিনি ক্বোরায়শ বংশের লোক ছিলেন।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
আমি বুযর্গানে দ্বীনের আলোচনা ওই মহান সত্তার পবিত্র আলোচনা করেই সমাপ্ত করেছি, যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জীবন্ত মু'জিযা। উম্মতে মোস্তফার উজ্জ্বল প্রদীপ, প্রায় সব মুহাদ্দিস ও ফক্বীহগণের ওস্তাদ এবং আমাদের মজবুত দ্বীন-ই ইসলামের প্রথম মুজতাহিদ; যাঁর ফযীলত খোদ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। এরশাদ করেছেন, "যদি দ্বীন সুরাইয়্যাহ্ নক্ষত্রের নিকটও থাকতো, তাহলে পারস্যের এক ব্যক্তি সেখান থেকে তা নিয়ে আসতো।"
তাঁর নাম শরীফ নো'মান ইবনে সাবিত ইবনে যাওক্বী। হযরত যাওক্বী অর্থাৎ ইমাম-ই আ'যমের দাদা পারস্য বংশীয় ছিলেন। তাঁর উপনাম 'আবূ হানীফা'। উপাধি 'ইমাম-ই আ'যম'। তাঁর পিতামহ হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র একনিষ্ঠ আশিক্ব এবং তাঁরই খাস নৈকট্যধন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁরই ভালবাসার আকর্ষণে পারস্য ছেড়ে কূফায় এসে তাঁরই পাশে অবস্থান করেছেন। হযরত যাওক্বী আপন সন্তান সাবিতকে দো'আর জন্য হযরত আলী মুরতাদ্বার নিকট আনলেন। তিনি দো'আ করলেন এবং সুসংবাদ দিলেন যে, এ সন্তানের পুত্রের ইল্‌ম দ্বারা পৃথিবী ভরপুর হয়ে যাবে।
ইমাম আ'যমের জন্ম হয় কূফা নগরীতে ৮০ হিজরিতে। অর্থাৎ সমস্ত মুজতাহিদ ইমামের পূর্বে। ৭০ বছর পবিত্র বয়স পেয়ে ১৫০ হিজরিতে বাগদাদে ওফাত পান।

وَقَلِيلٌ مَّاهُوَ وَاِنِّى اِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيْثَ اِلَيْهِمْ كَاَنِّىْ اَسْنَدْتُّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَنَّهُمْ قَدْفَرَغُوْا مِنْهُ وَاَغْنُوْنَا عَنْهُ وَسَرَدْتُّ الْكُتُبَ وَالْاَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا وَاقْتَفَيْتُ اَثَرَهُ فِيْهَا

অবশ্য, তাঁরা ব্যতীত অন্যান্যরা সংখ্যায় কম।[৩৮] আমি যখন এসব বুযর্গের প্রতি হাদীস সম্পৃক্ত করে দিলাম, তখন তা' যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দিকে সম্পৃক্ত করে দিলাম।[৩৯] কেননা, এসব বুযর্গ 'সনদ' বর্ণনা সুসম্পন্ন করে আমাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন।[৪০]এবং আমি 'কিতাব' (পর্ব) এবং 'বাব' (অধ্যায়) এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি, যেমন তিনি করেছিলেন। এতে আমি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি।[৪১]

বাগদাদের কবরস্থান 'খায়র্‌যান'-এ দাফন হন। তাঁর কবর শরীফ সাধারণ ও বিশেষ লোকদের যিয়ারতস্থল। ইমাম শাফে'ঈ বলেন, "তাঁর কবর হচ্ছে দো'আ ক্বূল হওয়ার জন্য পরশ পাথরতুল্য।"

তিনি বহু সাহাবীর যুগ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চারজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা হলেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা, হযরত সাহ্ল ইবনে সা-'ইদী এবং আবূ তোফাইল আমের ইবনে ওয়া-সিলাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। তিনি হযরত হাম্মাদের ছাত্র এবং হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক্বের খাস শিষ্য ছিলেন। দু'বছর কাল তিনি তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন। অতি উচ্চ পর্যায়ের তাবে'ঈ। তিনি ইসলামের সর্বপ্রথম ও সবচে' বড় মুজতাহিদ। তাঁর মাযহাব দুনিয়ায় খুব প্রসার লাভ করে।

'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন যে, "সমস্ত জান্নাতী লোকদের মধ্যে দু'তৃতীয়াংশ জান্নাতবাসী হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উম্মত আর সমস্ত মুসলমানের মধ্যে দু'তৃতীয়াংশ মু'মিন হানাফী। আল্লাহ্'র অধিকাংশ আউলিয়া-ই কেরাম হচ্ছেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী।"

দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ এশার নামাযের ওযূ দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন। প্রতি রাতে পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ নামাযের এক রাকা'আতে খতম করতেন। রাতে তাঁর কান্নার আওয়াজ ঘরের বাইরে শুনা যেতো। তাঁর ওফাত শরীফের সময় সাত হাজার বার ক্বোরআন মজীদের খতম হয়।

সমস্ত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ্ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ইমাম আ'যমের শাগরিদ। এর পূর্ণ বিশ্লেষণ জানার জন্য আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব': দ্বিতীয় খণ্ডে দেখুন।

৩৮. অর্থাৎ ওই সমস্ত হাদীস, যেগুলো উল্লেখিত বুযুর্গগণ ছাড়া অন্য কারো রয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা স্বল্প। 'هُوَ' (সর্বনাম) 'وَغَيْرِهِمْ'-এর দিকে নির্দেশ করে।

৩৯. পবিত্রতা আল্লাহ্‌রই। কেমন ঈমান আলোকিতকারী কথা বললেন, অর্থাৎ তিনি বলেছেন, "আমি মিশকাত শরীফের হাদীস শরীফগুলোর শুধু 'মতন' (মূলবচন বা Text) বর্ণনা করবো, 'সনদ' (বর্ণনাকারীদের সূত্র) নয়। কেননা, আমি শেষভাগে বলে দেবো যে, সেটা মুসলিম, বোখারী অথবা অমুক কিতাব বর্ণনা করেছে। আমার এ সম্পৃক্তকরণ 'সনদ' বর্ণনা করারই নামান্তর।" কোন হাদীসকে ওই সব বুযুর্গ গ্রহণ করে নেওয়া সেটা বিশুদ্ধ ও মজবুত হওয়ারই প্রমাণ। আমরা হানাফীরা এটাই বলে থাকি যে, কোন হাদীসকে ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গ্রহণ করে নিলে এবং তদনুযায়ী তিনি কাজ করলে ওই হাদীস মজবুত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। ইমাম আ'যম সাহেবের দিকে হাদীসের সম্পর্ক, হুযূরের দিকেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামান্তর; বরং ইমাম সাহেবের কোন হাদীস দুর্বল হতে পারে না। কেননা, তিনি হুযূরের যামানার অত্যন্ত নিকটবর্তী সময়ের লোক। তখনও সনদগুলোতে দুর্বল বর্ণনাকারী অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

৪০. মিরক্বাত প্রণেতা এখানে বলেছেন যে, হাদীসের এ কিতাবগুলোর মধ্যে কোন হাদীস পাঠ করে এ কথা বলা বৈধ হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ কথাই এরশাদ করেছেন। কেননা, এ প্রণেতাগণের উপর যেমন নির্ভর করা যায়, তেমনি তাঁদের কিতাবগুলোর উপরও ভরসা করা যায়।

৪১. অর্থাৎ যে বিন্যাসের মাধ্যমে 'মাসাবীহ' প্রণেতা মাসাআলাগুলোর পর্ব এবং ওই পর্বগুলোর অধ্যায় বর্ণনা করেছেন, আমিও সেভাবে বর্ণনা করেছি। পূর্বাপর বিন্যাস ঠিক রেখেছি। ('কিতাব' ও 'বাব') পর্ব ও অধ্যায়গুলোর শিরোনাম তাই রেখেছি, যা তিনি রেখেছিলেন। যেমন- 'কিতাবুত্ তাহারাত' (পবিত্রতা পর্ব)। তাতে প্রথমে ওযূর অতঃপর গোসলের অতঃপর তায়াম্মুমের (বাব) অধ্যায় হবে।

وَقَسَّمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلٰى فُصُوْلٍ ثَلٰثَةٍ اَوَّلُهَا مَااَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ اَوْ
اَحَدُهُمَا وَاكْتَفَيْتُ بِهِمَا وَاِنِ اشْتَرَكَ فِيْهِ الْغَيْرُ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِمَا فِى الرِّوَايَةِ
وَثَانِيْهَا مَااَوْرَدَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمَذْكُوْرِيْنَ وَثَالِثُهَا مَااشْتَمَلَ عَلٰى مَعْنَى
الْبَابِ مِنْ مُلْحَقَاتٍ مُنَاسِبَةٍ مَعَ مُحَافَظَةٍ عَلَى الشَّرِيْطَةِ وَاِنْ كَانَ مَاثُوْرًا عَنِ
السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ثُمَّ اِنَّكَ اِنْ فَقَدْتَ حَدِيْثًا فِىْ بَابٍ فَذٰلِكَ عَنْ تَكْرِيْرٍ اَسْقَطُهٗ

আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিটি 'বাব' (অধ্যায়)কে তিনটি 'ফস্ল' (পরিচ্ছেদ)-এ বিভক্ত করেছি।[৪২] প্রথম পরিচ্ছেদে আমি ওইসব হাদীস বর্ণনা করেছি, যেগুলো ইমাম বোখারী ও মুসলিম অথবা উভয়ের মধ্যে কোন একজন বর্ণনা করেছেন। আমি তাঁরা দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। যদিও তাঁর বর্ণনায় অন্য প্রণেতাও শরীক রয়েছেন- বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের উচ্চ মর্যাদার কারণে।[৪৩] দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওই সমস্ত হাদীস উল্লেখ করেছি, যেগুলো তাঁরা (বোখারী ও মুসলিম) ব্যতীত উল্লিখিত অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন।[৪৪] তৃতীয় পরিচ্ছেদে ওইসব প্রাসঙ্গিক হাদীস পরিশিষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ- শর্তাবলীর প্রতি দৃষ্টি রেখে।[৪৫] যদিও সেগুলো পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় প্রকারের ইমামদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৪৬] অতঃপর যদি আপনি কোন অধ্যায়ে 'মাসাবীহ' কিতাবের কোন হাদীস না পান, তবে মনে করবেন যে, তা পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্যই সেটাকে আমি বের করে দিই।[৪৭]

৪২. অর্থাৎ যদিও কোন অধ্যায়ে (বাব) দু'টি পরিচ্ছেদ (ফস্ল) হবে, কিন্তু এটা অতি কম হবে। অধিকাংশ স্থানে তিনটাই হবে।

৪৩. অর্থাৎ যেহেতু হাদীস শাস্ত্রে বোখারী ও মুসলিম শরীফের মর্যাদা শীর্ষে, এমনকি তাঁদেরকে হাদীস শাস্ত্রের 'শায়খাঈন' (দু'দক্ষ ইমাম) বলা হয়, যেমন, ফিক্বহ্ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ও ইমাম আবূ ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকে 'শায়খাঈন' বলা হয় এবং মানতিক্ব শাস্ত্রে ফারাবী ও আবূ 'আলী সীনাকেও। সেহেতু প্রথম পরিচ্ছেদে আমি ওই দু'জন বুযর্গের বর্ণিত হাদীস আনবো।

আর যদি কোন হাদীস 'শায়খাঈন' ব্যতীত অন্যান্য মুহাদ্দিসও উদ্ধৃত করেন, তবে আমি ওই হাদীসকে শুধু শায়খাঈনের দিকে সম্পৃক্ত করবো। যেমন, যদি কোন হাদীস বোখারী ও তিরমিযীর হয়, তবে আমি শুধু বোখারীর নাম নেবো। আর এভাবে বলবো- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ (সেটা ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন)। কারণ, তাঁর উল্লেখ করলে অন্য কারো নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না।

৪৪. যেমন আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্ ইত্যাদি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাঁদের হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হবে।

৪৫. অর্থাৎ প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের মধ্যে 'মাসাবীহ্'র হাদীসসমূহ থাকবে। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে মিশকাত প্রণেতার পক্ষ থেকে সংযোজিত হবে। ওইগুলোতে যেসব হাদীস বর্ণিত হবে, সেগুলোর বেলায় এ কথার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে যে, প্রথমে হাদীসের বর্ণনাকারীর নাম অতঃপর শেষভাগে কিতাবের বরাত উল্লেখ থাকবে।

৪৬. অর্থাৎ আমি আমার তৃতীয় পরিচ্ছেদে এ কথা অনিবার্য করে নিয়েছি যে, 'হাদীস-ই মারফূ' আনবো; বরং সাহাবা ও তাবে'ঈনের বাণী এবং তাঁদের কার্যাদির বর্ণনাও উদ্ধৃত করবো। কেননা, মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তাও হাদীস হিসেবে গণ্য।

'সালাফ' (سَلَفٌ)অর্থ হচ্ছে গত হয়েছেন এমন ব্যক্তিবর্গ, অর্থাৎ অগ্রণীগণ (مُتَقَدِّمِيْن)। 'খালাফ' (خلف) অর্থ উত্তরসূরীগণ। অর্থাৎ পরবর্তীগণ (مُتَاخِرِيْن)।

এখানে 'সালাফ' দ্বারা সাহাবা-ই কেরাম'র কথা বুঝানো হয়েছে। আর 'খালাফ' দ্বারা সম্মানিত তাবে'ঈন'র কথা। যেহেতু সাহাবা-ই কেরামের মর্যাদা সাহাবী নয় এমন লোকদের থেকে অনেক বেশী, সেহেতু তাঁদের নাম প্রথমে নিয়েছেন, আর তাবে'ঈগণের নাম পরে।

৪৭. যদি কোন অধ্যায়ে কোন হাদীস 'মাসাবীহ্'র মধ্যে ছিলো, কিন্তু মিশকাতে নেই, তবে তার কারণ এ হবে যে, মাসাবীহ্'তে ওই হাদীস দু'স্থানে এসেছিলো। তা আমি এক স্থানে বর্ণনা করেছি, অন্যস্থানে উল্লেখ করি নি।

وَاِنْ وَّجَدْتَّ اٰخَرَ بَعْضَهٗ مَتْرُوْكًا عَلٰى اِخْتِصَارِهٖ اَوْمَضْمُوْمًا اِلَيْهِ تَمَامُهٗ فَعَنْ دَاعِىْ اِهْتِمَامٍ اَتْرُكُهٗ وَاُلْحِقُهٗ وَاِنْ عَثَرْتَ عَلٰى اِخْتِلَافٍ فِى الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِى الْاَوَّلِ وَذِكْرِهِمَا فِى الثَّانِىْ فَاعْلَمْ اَنِّىْ بَعْدَ تَتَبُّعِىْ كِتَابَىِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ لِلْحُمَيْدِىِّ وَجَامِعِ الْاُصُوْلِ اِعْتَمَدْتُّ عَلٰى صَحِيْحَىِ الشَّيْخَيْنِ وَمَتْنَيْهِمَا

আর যদি আপনি অন্য হাদীসকে এমনিই পান যে, সেটার কিছু অংশ সংক্ষেপ করার জন্য বাদ দেওয়া হয়েছে, অথবা সেটার পরিশিষ্ট অংশকে সংযোজন করা হয়েছে, তবে এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেই করা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু বাদ দেবো, কিছু সংযোজন করবো।[৪৮] আর যদি আপনি দু'টি পরিচ্ছেদের মধ্যে কোন ব্যতিক্রম সম্পর্কে অবগত হন, যেমন- প্রথম পরিচ্ছেদে বোখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্য কারো বর্ণিত হাদীস আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বোখারী ও মুসলিমের হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে,[৪৯] তবে জেনে নেবেন, তা এই জন্য যে, আমি হুমায়দীর 'জাম'উ বায়নাস্ সহীহাঈন' এবং জামি'ই উসূল'র কিতাবগুলোতে, যেগুলো বোখারী ও মুসলিম'র হাদীসসমূহের ধারক, তালাশ করার পর সহীহ্ মুসলিম ও বোখারী এবং ওই দু'টির 'মতন'[৫০]-এর উপর নির্ভর করেছি।

৪৮. অর্থাৎ যদি কোন হাদীস 'মাসাবীহ'তে সংক্ষেপে উল্লেখিত ছিলো, কিন্তু মিশকাতে পূর্ণদীর্ঘভাবে অথবা এর বিপরীত অর্থাৎ মাসাবীহতে পূর্ণ দীর্ঘ ছিলো, কিন্তু আমি সেটাকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছি, তবে সেটার কোন রহস্য ও কারণ রয়েছে। আমি কোন কারণ ছাড়া এ ব্যতিক্রম করি নি। যেমন- একটি দীর্ঘ হাদীসের একাংশের অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাথে মিল আছে, অবশিষ্টাংশের নেই, তখন আমি ওই সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকুই বর্ণনা করবো সংক্ষিপ্তভাবে। আর যদি কোন হাদীসের দু'টি অংশ মাসাবীহ্'র দু'টি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়ে থাকে, তবে আমি পুরো হাদীসটি একটি অধ্যায়ে সুদীর্ঘভাবে বর্ণনা করবো।

৪৯. অর্থাৎ মাসাবীহ্ প্রণেতার নিয়ম তো এ যে, প্রথম পরিচ্ছেদে 'শায়খাঈন' (ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম)-এর হাদীসসমূহ্ বর্ণনা করে থাকেন এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্যান্যের। আর যদি মিশকাতের মধ্যে এর বিপরীত দৃষ্টিগোচর হয় অর্থাৎ প্রথম পরিচ্ছেদে 'শায়খাঈন' ব্যতীত অন্য কারো কোন হাদীস চলে আসে অথবা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শায়খাঈনের, তবে তার কারণও তা-ই, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।☆

৫০. অর্থাৎ এ ব্যতিক্রমের কারণ এ হবে যে, আমি মিশকাত সঙ্কলনের সময় ইমাম হুমায়দীর কিতাব 'জমউ বায়নাস্ সাহীহাঈন' আর ইমাম মুজাদ্দিদুদ্ দ্বীনের কিতাব 'জামে'উল উসূল'ও দেখেছি আর মূলগ্রন্থ অর্থাৎ 'বোখারী' এবং 'মুসলিম'ও পর্যালোচনা করেছি। যদি ওই দু'সঙ্কলন গ্রন্থ এবং মূলগ্রন্থ 'বোখারী' ও 'মুসলিম'র মধ্যে ভিন্নতা দেখেছি, তবে আমি ওই সঙ্কলন গ্রন্থদু'টির উপর নির্ভর করি নি, বরং বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকে গ্রহণ করেছি। যেমন, একটি হাদীস 'জামেউল উসূল'-এ শায়খাঈনের সূত্রে বর্ণিত আছে, আর তা 'মাসাবীহ' প্রণেতা প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বোখারী ও মুসলিমে ওই বর্ণনা নেই; তখন আমি ওই হাদীসকে প্রথম পরিচ্ছেদেই স্থান দেবো, কিন্তু সেটার সম্বন্ধ বোখারী ও মুসলিমের প্রতি করবো না। অনুরূপ, বিপরীত হলে অর্থাৎ যদি ওই সঙ্কলন গ্রন্থগুলোতে কোন হাদীসের সম্পর্ক বোখারী ও মুসলিম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের প্রতি থাকে, কিন্তু ওই হাদীস বোখারী ও মুসলিম-এ আমি পেয়ে যাই আর 'মাসাবীহ্' প্রণেতা সেটাকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেন, তখন আমিও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই বর্ণনা করবো; কিন্তু 'সূত্র' হিসেবে উল্লেখ করবো বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থদু'টি।

স্মর্তব্য যে, 'জাম'উ বায়নাস্ সহীহাঈন' কিতাবের প্রণেতা হলেন হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবিন্ নসর ইবনে হুমায়দ আন্দালূসী ক্বোরত্বী, যিনি ইমাম দারে কুত্নীর ছাত্র ছিলেন। তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন। হিজরি ৪৮০ সালে সেখানেই ওফাত পান। তিনি তাঁর এ

☆ মিশকাত প্রণেতা গ্রন্থ রচনার সময় সহীহাঈন'র পাশাপাশি ইমাম হুমাইদী রচিত 'আল্-জাম'উ বায়নাস্ সহীহাঈন' ও ইমাম মুজাদ্দিদুদ্দীন রচিত 'জামে'উল উসূল (কিতাব দু'টি)ও অনুসরণ করেছিলেন। যে হাদীস সহীহাঈনে পাওয়া যায়নি অথচ উক্ত দু'কিতাবে পাওয়া গেছে এমতাবস্থায় সহীহাঈনে পাওয়া না গেলেও মিশকাত-প্রণেতা ইমাম হুমাইদী ও মুজাদ্দেদুদ্দীন প্রণীত কিতাবের উপর নির্ভর করে হাদীসটি মিশকাত শরীফের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম বাগভীর মত সহীহাঈনের উদ্ধৃতি দেননি। (অতঃপর অনুবাদ দেখুন)

وَاِنْ رَأَيْتَ اِخْتِلَافًا فِى نَفْسِ الْحَدِيْثِ فَذٰلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْاَحَادِيْثِ وَلَعَلِّىْ مَااطَّلَعْتُ عَلٰى تِلْكَ الرِّوَايَةِ الَّتِىْ سَلَكَهَا الشَّيْخُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَلِيْلًا مَّا تَجِدُ اَقُوْلُ مَاوَجَدْتُ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِىْ كُتُبِ الْاُصُوْلِ اَوْ وَجَدْتُّ خِلَافَهَا فِيْهَا فَاِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَانْسُبِ الْقُصُوْرَ اِلَىَّ لِقِلَّةِ الدِّرَايَةِ لَااِلٰى جَنَابِ الشَّيْخِ رَفَعَ اللّٰهُ قَدْرَهُ فِى الدَّارَيْنِ حَاشَا لِلّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ رَحِمَ اللّٰهُ مَنْ اِذَا وَقَفَ عَلٰى ذٰلِكَ نَبَّهَنَا عَلَيْهِ وَاَرْشَدَنَا طَرِيْقَ الصَّوَابِ

আর আপনি যদি মূল হাদীসে কোন পার্থক্য পান, তবে এ পার্থক্য হাদীসগুলোর 'সনদ'র পার্থক্যের কারণে হবে।[৫১] হতে পারে, আমি ওই বর্ণনা সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না, যেদিকে হযরত শায়খ বাগভী (মাসাবীহ্ প্রণেতা) গিয়েছেন। আপনি আমার এ উক্তি খুব কমই পাবেন যে, আমি এ বর্ণনা 'উসূলের কিতাবগুলো' (মৌলিক সূত্র)-এর মধ্যে পায় নি। অথবা সেগুলোর মধ্যে সেটার বিরোধী পেয়েছি।' যখন আপনি সে সম্পর্কে অবগত হন, তবে এ বিচ্যুতিকে আমার জ্ঞানের স্বল্পতার দিকে সম্পৃক্ত করবেন, হযরত শায়খ'র দিকে নয়। আল্লাহ্ উভয় জাহানে তাঁর সম্মানকে বৃদ্ধি করুন।[৫২] তাঁর দিকে কোন ধরনের বিচ্যুতির সম্পৃক্তকরণ থেকে আল্লাহ'রই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্ ওই ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করুন, যিনি হাদীস সম্পর্কে অবগত হয়ে আমাদেরকে সে সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করুন![৫৩]

গ্রন্থে বোখারী ও মুসলিমের হাদীস সমূহ সঙ্কলন করেছেন। আর 'জামে'উল উসূল' গ্রন্থের প্রণেতা হলেন ইমাম মুজাদ্দিদ উদ্দীন আবুল 'আদাত মুবারক ইবনে মুহাম্মদ জাযরী, যাঁকে 'ইবনে আসীর' বলা হতো। তিনি মুসুল-এ অবস্থান করতেন। আর সেখানেই হিজরি ৬০৬ সালে ওফাত পান। তিনি 'জামে'উল উসূল'-এ 'সিহাহ্ সিত্তা'র হাদীসগুলো সঙ্কলন করেছেন। আর 'মিশকাত' প্রণেতা ওই দু'গ্রন্থও পর্যালোচনা করেছেন এবং হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোও। আমার এ আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হলো যে, 'মিশকাত' প্রণেতা 'মিশকাত' সঙ্কলনে কতো পরিশ্রমই করেছেন!

৫১. অর্থাৎ যদি কোথাও এমন হয় যে, 'মাসাবীহ'তে বর্ণিত হাদীসের শব্দ ও ইবারত এক রকম আর 'মিশকাত'এ অন্য রকম, তখন এটার কারণ এ-ই যে, একই হাদীস বিভিন্ন সূত্রে, বিভিন্ন ইবারতে বর্ণিত হয়ে থাকে। 'মাসাবীহ' প্রণেতা কোন সূত্রে ওই বচনগুলো পেয়েছেন, যা তিনি মাসাবীহতে লিখেছেন, আর আমি ওই শব্দ কিংবা সনদ পাই নি, বরং অন্য সূত্রে অন্য বচন পেয়েছি, তখন আমি আমার অনুসন্ধানকৃত বচন উদ্ধৃত করেছি। এ থেকে বুঝা যায় যে, কোন মুহাদ্দিস বা ফক্বীহ'র বর্ণিত হাদীসের সূত্র খুঁজে পাওয়া না গেলে, তখন সেটাকে আমাদের নিজেদেরই জ্ঞানের দৈন্য মনে করতে হবে। এটা বলা যাবে না যে, ওই বুযুর্গ ভুল করেছেন। দেখুন, মিশকাত প্রণেতা মাসাবীহ'র সঙ্কলনকৃত হাদীসকে ভুল বলেননি, বরং নিজের জ্ঞানের স্বল্পতা মনে করেছেন। আমরা হানাফীরা এটাই বলে থাকি যে, যদি ইমাম আবূ হানীফা কুদ্দিসা সিররুহূ'র অভিমতের পক্ষে কোন হাদীস শরীফ আমরা খুঁজে না পাই, অথবা কোন দুর্বল হাদীস পাই, তবে সেটা আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা ইমাম-ই আ'যমের নয়। মিশকাত প্রণেতা এ শিক্ষাই দিয়েছেন।

৫২. অর্থাৎ মাসাবীহতে কতেক হাদীস এমনও আছে, যেগুলোর সূত্র আমি কোথাও পাই নি, অথবা সেটার বিপরীত পেয়েছি। তখন আমি ওই হাদীস মিশকাত শরীফে লিখে দিয়েছি; কিন্তু সাথে এটাও লিখে দিয়েছি যে, এ হাদীস আমি পাই নি বা সেটার বিপরীত পেয়েছি। তখন এতে আপনারা শায়খ বাগভীর প্রতি মন্দ ধারণা করেবেন না; বরং এটাকে আমার জ্ঞানের দৈন্য মনে করবেন। সুবহানাল্লাহ! এই হলো আদব! হে হানাফীরা! তোমরাও এ আদব শিখে নাও, যদি তোমরা এমন কোন হাদীস না পাও, যা ইমাম-ই আ'যমের পক্ষে দলীল, তবে এটা মনে করো যে, আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও অনুসন্ধানে ত্রুটি রয়েছে। হযরত ইমামের বর্ণিত মাসআলার উৎস হচ্ছে সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীস।

৫৩. অর্থাৎ এমন হাদীসের প্রতি, যা আমি পাই নি বা বিপরীত পেয়েছি। যদি কোন লোক তা পেয়ে যান তবে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে তাড়াতাড়ি জানিয়ে দেবেন, যাতে

وَلَمْ اٰلُ جُهْدًا فِى التَّنْقِيْرِوَالتَّفْتِيْش بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ وَنَقَلْتُ ذٰلِكَ الْاِخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ وَمَا اَشَارَ اِلَيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ غَرِيْبٍ اَوْضَعِيْفٍ اَوْ غَيْرِهِمَا بَيَّنْتُ وَجْهَهٗ غَالِبًا وَمَالَمْ يُشِرْاِلَيْهِ مِمَّا فِى الْاُصُوْلِ فَقَدْ قَفَيْتُهٗ فِىْ تَرْكِهٖ اِلَّا فِىْ مَوَاضِعَ لِغَرَضٍ وَرُبَمَا تَجِدُمَوَاضِعَ مُهْمَلَةًوَّذٰلِكَ حَيْثُ لَمْ اَطَّلِعْ عَلٰى رِوَايَةٍ فَتَرَكْتُ الْبَيَاضَ -

আমি যথাসম্ভব হাদীসসমূহ যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ক্রটি করিনি এবং ওই বিরোধকে তেমনিভাবে উদ্ধৃত করেছি যেমনি পেয়েছি।[৫৪] যখনি কখনো হযরত শায়খ 'গরীব' অথবা 'দ্ব'ঈফ' ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করেন, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি সেটার কারণও বর্ণনা করে দিয়েছি।[৫৫] আর উসূল-ই হাদীস থেকে যেখানে সেটার দিকে তিনি ইঙ্গিত করেন নি, সেখানে আমি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি-[৫৬] কয়েকটি স্থান ব্যতীত। তাও কোন উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে।[৫৭] অধিকন্তু আপনি এমন কিছু স্থান পরিত্যক্ত অবস্থায় পাবেন। তা ওই স্থানে পাবেন, সেখানে আমি 'রেওয়ায়ত' সম্পর্কে অবহিত হই নি। অবশ্য, সেখানে আমি সাদা জায়গা ছেড়েছি।[৫৮]

আমি ওই স্থানে সূত্রটা লিখে দিতে পারি। আল্‌হামদুলিল্লাহ্! (মুফতী আহমদ ইয়ার খান বিনয়ের সাথে বলেন) অধমের এ আক্বীদা যে, 'হিদায়া' প্রণেতা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণিত মাসআলার দৃঢ়তায় যে সব হাদীস শরীফ সঙ্কলন করেছেন, যদি গোটা দুনিয়ার সবাইও সেগুলোকে 'গরীব' বলে, কিংবা ইমামের মাসআলাসমূহের হাদীসগুলো কেউ নাও পায়, তবুও ইমাম আ'যমের মাসআলাসমূহের সব হাদীস সহীহ্। এ জন্য আমি 'জা-আল্ হক্ব': ২য় খণ্ড লিখেছি। সেটা পাঠ-পর্যালোচনা করুন।

৫৪. অর্থাৎ এটা মনে করো না যে, আমি 'মাসাবীহ্'র হাদীসগুলো অনুসন্ধানে ক্রটি করেছি। এমনও নয় যে, একবার দেখে লিখে দিয়েছি যে, আমি পাই নি; বরং আমি যথাসম্ভব খুব তালাশ করে দেখেছি। না পেয়ে বাধ্য হয়ে এটা লিখেছি। সুবহানাল্লাহ্!

৫৫. অর্থাৎ যে সব হাদীস সম্পর্কে 'মাসাবীহ' প্রণেতা বলেছেন যে, এ হাদীস দ্ব'ঈফ কিংবা গরীব কিংবা মুনকার কিংবা মু'আল্লাল, আমি মিশকাত-এ অনেক স্থানে ওই দূর্বলতা ইত্যাদির কারণ বর্ণনা করে দিয়েছি। হ্যাঁ, এমনও হবে যে, 'কারণ' বর্ণনা করি নি। তাও আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই। অর্থাৎ সেটা 'দ্ব'ঈফ' ও 'গরীব' হওয়ার কারণ আমার জানা ছিলো না।

৫৬. অর্থাৎ বেশিরভাগ এমনও হয়েছে যে, হাদীসের মূলগ্রন্থে কোন হাদীস 'য'ঈফ' বা 'গরীব' হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু 'মাসাবীহ' প্রণেতা সেটা উল্লেখ করেন নি। এমনসব স্থানে আমি মাসাবীহ্ প্রণেতার অনুসরণ করেছি এবং আমিও সেটার উল্লেখ করি নি।

৫৭. উদ্দেশ্য এ যে, কতেক সমালোচক মাসাবীহ্'র কিছু হাদীসকে 'মাওদ্বূ' (مَوْضُوْعٌ) 'মনগড়া' বলে মন্তব্য করে বসেছে; অথচ তিরমিযী ইত্যাদিতে সেটাকে 'সহীহ' বা 'হাসান' বলা হয়েছে তাই আমি মাসাবীহ্ প্রণেতার বিরুদ্ধে সমালোচনার মূলোৎপাটনের উদ্দেশে সেটার ব্যাখ্যা করে দিয়েছি যে, অমুক গ্রন্থে সেটাকে সহীহ বলা হয়েছে। অথবা কারণ এ হবে যে, 'মাসাবীহ্' প্রণেতা 'মাসাবীহ্'র ভূমিকায় বলেছেন যে, আমি আমার এ গ্রন্থে কোন 'মুনকার' হাদীস সন্নিবিষ্ট করিনি; অথচ তাতে কোন হাদীস মুনকারও ছিলো। তখন আমি সেটা সুস্পষ্ট করে দিয়েছি, যাতে কেউ 'মাসাবীহ্'তে ওই হাদীস দেখে 'সহীহ' মনে না করে।[আশি'আহ]

৫৮. অর্থাৎ মিশকাত শরীফে কোথাও হাদীসের পর কিছু খালি জায়গা পাবেন। তার কারণ এ যে, মাসাবীহ্তে ওই হাদীস ছিলো; কিন্তু আমি কোন গ্রন্থে তা পাই নি। আর আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, 'মাসাবীহ্' প্রণেতা আল্লামা বাগভী কোথাও দেখেই লিখেছেন। এ জন্য আমি মিশকাতে ওই হাদীস তো লিখে দিয়েছি, কিন্তু গ্রন্থের নাম বিজ্ঞ পাঠকদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি, যাতে যদি কেউ এটা জেনে নেন, তবে তিনি তা যেন সেখানে লিখে দেন।

সুতরাং আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ জাযরী প্রমুখ ওলামা এমনই করেছেন যে, ওই স্থান সাদা রেখে দেন; কিন্তু ওই কিতাবের নাম বর্ণনা করে দিয়েছেন, যাতে পাঠক জানতে পারে যে, এ উদ্ধৃতকরণ মিশকাত প্রণেতার নয়, বরং অন্য কারো।

فَاِنْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ فَاَلْحِقْهُ بِهٖ اَحْسَنَ اللّٰهُ جَزَاكَ وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِمِشْكٰوةِ الْمَصَابِيْحِ وَ اَسْئَلُ اللّٰهَ التَّوْفِيْقَ وَ الْاِعَانَةَ وَ الْهِدَايَةَ وَ الصِّيَانَةَ وَ تَيْسِيْرَ مَااَقْصُدُهٗ وَ اَنْ يَّنْفَعَنِيْ فِى الْحَيٰوةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَ جَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

আপনি যদি সে সম্পর্কে অবগত হন, তবে সেখানে তা সংযোজন করে দিন। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন ! আমি সেটার নাম রেখেছি 'মিশকাতুল মাসাবীহ্'।[৫৯] আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাওফীক্ব ও হিফাযত প্রার্থনা করছি। আর আপন উদ্দেশ্য সহজে অর্জিত হওয়ার প্রত্যাশা করছি। এটাও কামনা করছি যেন আল্লাহ্ জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর আমাকে ও সমস্ত মুসলমান নারী-পুরুষকে উপকৃত করেন।[৬০] আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি উত্তম কর্মব্যবস্থাপক (নির্ভর করার উপযোগী)। নেই শক্তি (সৎকর্ম করার), নেই ক্ষমতা (অসৎ কর্ম থেকে বাঁচার), কিন্তু পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহক্রমে।

---

৫৯. কেননা 'মিশকাত' শব্দের অর্থ হলো 'থাক'। 'মাসাবীহ্' হলো 'মিসবাহুন'-এর বহুবচন। এর অর্থ- চেরাগ বা বাতি। অতএব, উভয়ের অর্থ হলো- 'চেরাগসমূহের থাক।' কেননা, প্রত্যেক হাদীস আলোকময় ও পথপ্রদর্শক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রদীপ স্বরূপ। আর এ গ্রন্থ হচ্ছে ওইসব হাদীস পাওয়ার স্থান। তদুপরি, 'মাসাবীহ্' মূল গ্রন্থের নামও, আর ওই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 'মিশকাত'-এ মওজুদ আছে। অধিকন্তু নামকরণ যথার্থ ও সার্থক। ফক্বীর অধম আহমদ ইয়ার খান এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম 'মিরআত' রেখেছি। অর্থাৎ চেরাগের থাকের সামনে লাগানো আয়না, যা বাইরের বাতাসকে ভেতরে আসতে দেয় না। অধমের অভিপ্রায়ও এ যে, এ ব্যাখ্যা দ্বারা হাদীস অস্বীকারকারী এবং অবুঝ লোকদের যাবতীয় আপত্তি দূর হবে আর হাদীস সমূহের মধ্যকার বৈপরিত্যও দুরীভূত করা যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করুন। অথবা এটা মিশকাতের হাদীসসমূহ দেখার আয়না। অর্থাৎ এ সব হাদীস এ ব্যাখ্যার আলোকে দেখুন ও অনুধাবন করুন!

৬০. এভাবে যে, আমার জীবন যেন এত দীর্ঘ হয় যে, লেখার পর নিজেও পড়তে পারি, অপরকেও পড়াতে পারি এবং এটার বরকতে জীবনটুকু ঈমান ও তাক্বওয়ার মধ্যে অতিবাহিত হয়। আর মরণকালে কালেমা পড়া নসীব হয়। এ কিতাবও যেন কবর ও হাশরে কাজে আসে এভাবে যে, আমার পর এটা বারংবার প্রকাশিত হতে থাকে এবং মুসলমানরা উপকার লাভ করতে থাকে আর আমার নিকটও এটার সাওয়াব পৌঁছতে পারে। আলহামদু লিল্লাহ্! লেখকের এ দো'আ কবূল হয়েছে। আল্লাহ্'র অপার কৃপায় পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে, যেখানে মুসলমান আছে, সেখানে এ গ্রন্থ রয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এটা শিক্ষাও দেওয়া হয়। বিভিন্ন ভাষায় এটার ব্যাখ্যা লিখা হয়েছে। সুতরাং আরবী ভাষায় 'মিরক্বাত' ও 'লুম'আত', ফার্সী ভাষায় আশি''আতুল লুম'আত আর উর্দুতে জানিনা কত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। এ অধম বান্দা আহমদ ইয়ারও লেখকের প্রার্থনার সাথে একই প্রার্থনাই করছি এবং তাঁর ওসীলায় এটা ক্ববূল হওয়ার আশা রাখি। আল্লাহ্ তা'আলা এ অধমের ব্যাখ্যাগ্রন্থটাকে প্রকৃতার্থে 'মিশকাত'র 'মিরআত' বা আয়না করুন এবং এটাকে কবুল করে আমার পাপসমূহের কাফ্ফারা আর সাদক্বাহ্-ই জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। আমীন, এয়া- রাব্বাল্ 'আ-লামী-ন।

মহা সুসংবাদ: আলহামদু লিল্লাহ্! অধম হযরত মাওলানা আবসার সাবেরী (করাচী)-এর খিদমতে এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের ঐতিহাসিক নাম নির্বাচন করা সম্পর্কে চিঠি লিখেছিলাম। কিছুদিন পর অর্থাৎ ২০ যিলক্বদ ১৩৭৮ হিজরী সালে জুমু'আহবার তাঁর চিঠি এলো। যাতে লিখা ছিলো যে, অসুস্থতার কারণে ঐতিহাসিক নাম সম্পর্কে চিন্তা করতে পারিনি। শেষতক এক রাতে স্বপ্নে আমাকে এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের ঐতিহাসিক নাম বলে দেওয়া হয়েছে। তা' হল- 'যুল মিরআত'। সুবহানাল্লাহ্! কী সহজ-সরল নাম! আর তা 'মিশকাত'র সমুচ্চারিতও। অধম মাওলানার এ স্বপ্নকে একটা গায়বী সুসংবাদ মনে করি। আর অতি গর্বভরে এটার ঐতিহাসিক নাম 'যুল মিরআত' (১৩৭৮হি.) শরহে মিশ্কাত' রাখছি। আলহামদু লিল্লাহ্!

আহমদ ইয়ার খান
পৃষ্ঠাপোষক, মাদরাসা-ই গাউসিয়া নঈমিয়া
গুজরাত, পাকিস্তান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَّتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আল্লাহ্'র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

১ ‖ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব [১] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সকল কর্ম নিয়্যতগুলোর উপর নির্ভরশীল। [২] প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে নিয়্যত করে। [৩] সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে হবে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে হবে। [৪] আর যার হিজরত দুনিয়া অর্জন কিংবা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য হবে, [৫] তার হিজরত তার দিকেই হবে, যার জন্য সে হিজরত করেছে। [৬] [বোখারী ও মুসলিম]

১. তাঁর নাম মুবারক- ওমর ইবনে খাত্তাব ইবনে নুফায়ল। উপনাম 'আবূ হাফস্'। উপাধি 'ফারূক্ব-ই আ'যম'। রাষ্ট্রীয় খেতাব- 'আমীরুল মু'মিনীন'। তিনি ক্বোরাঈশের 'আদভী' উপগোত্রের লোক। কা'ব ইবনে লুয়াই পর্যন্ত গিয়ে তাঁর বংশ-পরম্পরা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বংশের সাথে মিলিত হয়। তাঁর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অগণিত। তিনি একজন মহা সম্মানিত সাহাবী ও ইসলামের সূচনালগ্নে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ঈমান গ্রহণের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশে উপনীত হয়। তিনি ঈমান গ্রহণ করলে ফেরেশতাদের মধ্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন ও খুশীর ধুম পড়ে যায় এবং পবিত্র ক্বোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়-

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

তরজমা: হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! আল্লাহ্ আপনার জন্য যথেষ্ট এবং এ যত সংখ্যক মুসলমান আপনার অনুসারী হয়েছে। [৮:৬৪। তরজমা- কানযুল ঈমান]

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ইন্তিকালের পর ১৩শ হিজরী সনে তিনি মুসলিম বিশ্বের খলীফা নির্বাচিত হন। সকলে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর খিলাফতকালে ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। অনেক রাজ্য বিজিত হয়। পবিত্র ক্বোরআনের অনেক আয়াত তাঁর সিদ্ধান্তের অনুরূপ অবতীর্ণ হয়। দীর্ঘ ১০বছর ৬মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৬৩ বছর বয়সে হিজরি ২৩ সনের ২৬ যিলহজ্ব বুধবার মসজিদে নবভী শরীফে প্রিয় নবীর মেহরাব শরীফ ও প্রিয় নবীর মুসাল্লা শরীফের উপর ফজরের নামায পড়ানোর সময় তাঁকে শহীদ করা হয়। মুগীরাহ্ ইবনে শো'বার ইয়াহুদী ক্রীতদাস আবূ লু'লূ খঞ্জর দ্বারা তাঁকে আঘাত করেছিলো। তাঁর শাহাদাতে মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিটি ঘরবাড়ি থেকে এ বলে কান্নার ধ্বনি গুমরে ওঠলো, ''আজ ইসলাম ও মুসলমানগণ ইয়াতীম হয়ে গেলো।'' হযরত সুহায়ব তাঁর জানাযার নামায পড়ান। প্রিয় নবীর সবুজ গম্বুজের নিচে প্রিয় রসূলের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

২. 'নিয়্যত' কোন কাজের সঙ্কল্প করাকেও বলা হয়, নিষ্ঠাকেও। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসূলকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা। এখানে দ্বিতীয় অর্থই প্রযোজ্য। অর্থাৎ সকল কর্মের সাওয়াব নির্ভর করে একমাত্র নিষ্ঠার উপর, যা পরবর্তী বিষয় দ্বারা সুস্পষ্ট হয়। এমতাবস্থায় হাদীস স্বীয় ব্যাপক অর্থই প্রকাশ করে। কোন কর্ম নিষ্ঠা ছাড়া সাওয়াবের উপযোগী নয়, চাই তা 'মুখ্য ইবাদত' (ইবাদতে মাক্বসূদাহ্ বা মাহাদ্দাহ্) হোক, যেমন- নামায, রোযা ইত্যাদি; কিংবা হোক 'গৌণ ইবাদত' (ইবাদতে গায়র-ই মাক্বসূদাহ্); যেমন- ওযূ', গোসল, কাপড় পরা ও স্থান পবিত্র করা ইত্যাদি। এ সবের সাওয়াব নিষ্ঠার ভিত্তিতেই পাওয়া যাবে। তাই সম্মানিত সূফীগণ বলেন- নিষ্ঠা ও সৎ নিয়্যত এমন দু'টি নি'মাত, যেগুলো ব্যতীত (ইবাদত ইবাদত থাকেনা, বরং) নিছক অভ্যাসজনিত অনুশীলন হিসেবেই পরিগণিত হয় মাত্র। আমলের নিষ্ঠার বরকতে কোন কোন অকৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতায় এবং কোন কোন গুনাহ্ ও অবাধ্যতা আনুগত্যে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত আবূ উমাইয়া জুমাইরী একদা (বাধ্য হয়ে অন্তরে বিশ্বাস ঠিক রেখে) কুফরী বাক্য মুখে উচ্চারণ করে ফেলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব হিজরতের রাতে সওর পর্বতের গুহায় এক ধরনের আত্মহত্যা করেছেন, হযরত আলী মুরতাদ্বা খন্দকের যুদ্ধে ইচ্ছে করে আসরের নামায ত্যাগ করেছেন। কিন্তু যেহেতু ওই

কাজগুলোতে তাঁদের নিয়্যত সৎ ছিলো, সেহেতু তাঁদের এ কাজগুলো সাওয়াব বা পুণ্যের কারণ হয়। মাওলানা রুমী বলেন-

ہرچہ گیرد علتے علت شود - کفر گیرد ملتے ملت شود

অর্থাৎ "কেউ যদি কোন ত্রুটিকে দোষ হিসেবে ধরে নেয়, তাহলে সেটাকে ত্রুটি বলা যাবে বটে, কিন্তু সেটার বাস্তবতা ভিন্নও হতে পারে। সুতরাং কুফরও যদি কোন দ্বীনকে বাহ্যিকভাবে স্পর্শ করে, তবুও দ্বীন দ্বীনই থাকবে।" (কারণ, বাস্তব অবস্থা যাচাই করা হলে দেখা যায় যে, তা কুফর নয়; বরং দ্বীনেরই অংশ। যেমন- হাজর-ই আসওয়াদকে চুম্বন করা পাথরপূজা নয় ইত্যাদি।)

শাফে'ঈগণ বলেন, এখানে 'নিয়্যত' দ্বারা প্রথম অর্থ বুঝায়। অর্থাৎ কোন কাজের সঙ্কল্প বা ইচ্ছা পোষণ করা। তাঁদের মতে, কেউ যদি ইচ্ছা ছাড়া ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুয়ে নেয়, তবে তার ওযূ হবে না; যেভাবে নিয়্যত বা ইচ্ছা ছাড়া নামায হয় না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা হাদীসের মর্মার্থের পরিপন্থী। তদুপরি, এতে হাদীসের অর্থের ব্যাপকতা অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, সামনে হিজরতের উল্লেখ রয়েছে- যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে হিজরত করে সে শরীয়ত মতে মুহাজির হিসেবে গণ্য হবে, যদিও এতে সাওয়াব হবে না। তেমনিভাবে, যে ব্যক্তি নামায আদায়ের ইচ্ছা ছাড়া নাপাক কাপড়, অপবিত্র শরীর ও নাপাক জমি ধুয়ে নেয়, এতেও এ সব বস্তু পবিত্র হয়ে যায় আর এতে নামাযও বৈধ হয়। সুতরাং বুঝা গেলো যে, তাঁদের (শাফে'ঈগণের) গৃহীত অর্থ তাঁদের মাযহাবেরও পরিপন্থী। স্মর্তব্য যে, 'আরকান-ই ইসলাম' অর্থাৎ কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যে 'নিয়্যত' অর্থাৎ কাজের সঙ্কল্প করা ফরয। বাকী, জিহাদ, হিজরত, ওযূ ইত্যাদিতে এ নিয়্যত ফরয নয়। তবে নিষ্ঠা ছাড়া ওসব কাজের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। অতএব, হানাফী মাযহাবের ইমামদের গৃহীত অর্থই সঠিক। আর হাদীসটি অত্যন্ত ব্যাপকার্থক। নামাযের মধ্যে মুখে নিয়্যতের শব্দাবলী বলা 'বিদ'আত-ই হাসানাহ' (উত্তম কাজ)। কারণ, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সর্বমোট ত্রিশ হাজার নামায পড়েছেন; কিন্তু কখনো পবিত্র রসনা দ্বারা নিয়্যত করেন নি। কতেক আলিম নামাযকে হজ্জের উপর অনুমান করে বলেছেন যে, ইহরামের সময় যেমন মুখে হজ্জের নিয়্যত করা হয়, তেমনি নামাযের ক্ষেত্রেও করা চাই। কিন্তু এ উক্তি সঠিক নয়। (মিরক্বাত)

৩. 'হিজরত'র আভিধানিক অর্থ 'ত্যাগ করা'। শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করাকে 'হিজরত' বলে। প্রয়োজনের সময় হিজরত একটি সর্বোত্তম ইবাদত। 'ইসলামী বর্ষ' হুযূর-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হিজরতের স্মারক।

৪. অর্থাৎ যে হিজরতে আল্লাহ্ ও রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যত করবে, প্রকৃতার্থে ওই 'হিজরত' আল্লাহ্ ও রসূলের দিকেই হবে। সুতরাং আলোচ্য হাদীসের মধ্যে এক কথার পুনরাবৃত্তি করা হয় নি। এতে বুঝা যায় যে, ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সন্তুষ্টির নিয়্যত করা শিরক নয়; বরং তা ইবাদতকে পরিপূর্ণ করে থাকে। দেখুন, হিজরত হলো ইবাদত, কিন্তু এরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে'। এতে আরো প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সান্নিধ্যে যাওয়া আল্লাহ'র দরবারে উপস্থিতির নামান্তর। মুহাজিরগণ মদীনা মুনাওয়ারায় যাচ্ছিলেন, যেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম্ তাশরীফ রাখছিলেন। সেখানে যাওয়া আল্লাহ'র কাছে যাওয়া বলে সাব্যস্ত করা হয়। আর জানা গেলো যে, প্রত্যেক স্থানে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'রই বরকতময় সত্তার বাহার বিদ্যমান। তিনি ব্যতীত যেকোন ভূখণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজ্যতুল্য। দেখুন! মক্কা মু'আযযামায় অবস্থান করা ইবাদত। কিন্তু যখন হুযূর মদীনা মুনাওয়ারায় চলে যান, তখন যদিও সেখানে কা'বা ঘর ইত্যাদি সব কিছু রয়েছে, কিন্তু সেখানে থাকা গুনাহ্ বলে সাব্যস্ত হয়। সেখান হতে হিজরত করা জরুরি হয়ে পড়ে। পরে যখন হুযূরের আলো বিচ্ছুরিত হলো তখন সেখানে অবস্থান করা ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত হলো।

৫. মদীনা মুনাওয়ারায় আনসারীগণ মুহাজিরগণকে স্থায়ীভাবে এমন শানদার মেহমানদারী করেন যে, সুবহানাল্লাহ্! তাঁরা স্বীয় ঘরবাড়ি, বাগান, জমিজমা, সবকিছুতে তাঁদেরকে সমান অংশীদার করে নেন। এমনকি কোন আনসারীর দু'জন স্ত্রী থাকলে একজনকে তালাক্ব দিয়ে মুহাজির ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। তাই এ আশঙ্কা ছিলো যে, কেউ জায়গা-জমি, বা স্ত্রী লাভের লোভে হিজরত করবে। এ কারণে হুযূর-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম্ এটা এরশাদ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, এখানে 'اَلنِّيَّاتُ'র মধ্যে 'নিয়্যত' দ্বারা কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করা নয়, বরং আন্তরিক নিষ্ঠাই বুঝায়। তাই লোকদেখানোর জন্য যে হিজরত করলো, তাকেও মুহাজির বলা যাবে, কিন্তু সে (হিজরতের) সাওয়াবের ভাগী হবে না, যা 'هِجْرَتُهٗ' শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে।

৬. মিশকাত প্রণেতা শায়খ ওলী উদ্দীন মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ গ্রন্থের প্রারম্ভে আমাদেরকে এটা বুঝানোর জন্য এ হাদীস লিখেছেন যে, আমার এ গ্রন্থ যেন নিষ্ঠার সাথে পাঠ করা হয়। নিছক দুনিয়া অর্জনের জন্য পড়বে না এবং তাঁর স্বীয় অন্তরের অবস্থা আমাদেরকে অবগত করেছেন যে, তিনিও এ গ্রন্থ

كِتَابُ الْاِيْمَان

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ◆ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَايُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَايَعْرِفُهٗ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ

ঈমান পর্ব[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ২ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খেদমতে হাযির ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন,[২] যাঁর কাপড় ধবধবে সাদা এবং চুল গাঢ় কালো ছিলো।[৩] তাঁর মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিলো না এবং আমাদের কেউ তাঁকে চিনতেও পারছিলো না।[৪] অবশেষে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কাছে গিয়ে বসলেন। নিজের হাঁটুযুগল হুযূরের বরকতময় হাঁটুযুগলের সাথে লাগিয়ে দিলেন।[৫]

নিষ্ঠার সাথে লিখেছেন। এখানে নিজের প্রসিদ্ধি বা সম্পদ অর্জনের কোন উদ্দেশ্য ছিলো না। এ হাদীস শরীফ আমার দৃষ্টিতেও রয়েছে।

❑ উল্লেখ্য, মিশকাত শরীফে যেখানে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ লিখা হয়েছে, সেখানে অর্থ হবে- হাদীসটি ইমাম বোখারী ও মুসলিম একই সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন।

১. اِيْمَانٌ (ঈমান)-এর আভিধানিক অর্থ 'নিরাপত্তা দেওয়া'। শরীয়তের পরিভাষায় 'ঈমান' ওই সকল ইসলামী আক্বাইদের নাম, যেগুলো মান্য ও পোষণ করে মানুষ আল্লাহ্'র আযাব থেকে নিরাপত্তার আওতায় এসে যায়। অর্থাৎ ওই সমস্ত বিষয় মেনে নেওয়া, যেগুলো হুযূর করীম আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন। যেহেতু ঈমান শুধু মেনে নেওয়া ও বিশ্বাসের নাম, সেহেতু তাতে পরিমাপ করা অসম্ভব। অবশ্য অবস্থায় 'কম-বেশি' হওয়া সম্ভব। যেহেতু ঈমান হচ্ছে সকল ইবাদতের মূল, সেহেতু প্রথমে সেটা বর্ণনা করেছেন।

২. ইনি হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম ছিলেন, যিনি মানবাকৃতিতে উপস্থিত হয়েছিলেন; যেমন হযরত মারয়ামের কাছে পুরুষের আকৃতিতে গিয়েছিলেন। 'ফিরিশতা' হলেন ওই নূরানী মাখলূক্ব, যাঁরা বিভিন্ন আকৃতি গ্রহণ করতে পারেন। 'জ্বিন' ওই আগুনের তৈরি মাখলূক্ব, যারা যেকোন আকৃতির হয়ে যেতে পারে; কিন্তু রূহ সেটাই থেকে যায়। সুতরাং এটা 'পুনর্জন্ম' নয় (যেমন ভ্রান্ত আর্যরা বিশ্বাস করে)।

৩. অর্থাৎ তিনি মুসাফির ছিলেন না। অন্যথায় তাঁর চুল ও পোশাক ধুলি-বালি দ্বারা মলিন হতো।

স্মর্তব্য যে, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর চুল কালো ও কাপড় সাদা হওয়া মানবীয় আকৃতির প্রভাব ছিলো। নতুবা, তিনি তো স্বয়ং নূরের তৈরি। পোশাক ও কালো চুল থেকে মুক্ত। হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয় মানব আকৃতিতে এসে পানাহার করতেন, বরং স্ত্রী সহবাসও করতে পারতেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র লাঠি সাপের আকৃতি ধারণ করে সবকিছু গিলে ফেলেছিলো।

অনুরূপ, আমাদের হুযূর নূরী-মানব। তাঁর পানাহার করা, বিয়ে-শাদী করাও মানবীয়তার বৈশিষ্ট্যাবলী ছিলো। কিন্তু (মধ্যখানে ইফতার না করে) এক নাগাড়ে রোযা পালন (সাওম-ই ভেসাল) করার মধ্যে এ নূর হওয়ার দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি পানাহার ব্যতীত বহুদিন যাবত অতিবাহিত করতেন। আজকে হাজার হাজার বছর ধরে হযরত ঈসা আলায়ইহিস্ সালাম পানাহার ছাড়াই আসমানের উপর অবস্থান করছেন। এটা নূরানীয়তের বহিঃপ্রকাশ।

৪. অর্থাৎ তিনি মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসী ছিলেন না। নতুবা আমরা তাঁকে চিনতে পারতাম। হুযূর তো তাঁকে খুব ভালভাবেই চিনতেন, যা সামনের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়।

৫. অর্থাৎ হুযূরের অতি নিকটে বসলেন। বুঝা যাচ্ছে যে, হুযূর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামকে চিনতে পেরেছিলেন। অন্যথায় বলতেন, "তুমি কে? এভাবে আমার এত নিকটে কেন বসছো?"

وَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ
قَالَ الْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

এবং স্বীয় হাত স্বীয় উরুর উপর রাখলেন[৬] আর আরয করলেন, "হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়া সাল্লাম) আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।"[৭] তিনি এরশাদ করলেন, "ইসলাম এটাই যে, তুমি এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্'র রসূল।[৮]

---

৬. যেভাবে নামাযী 'তাশাহহুদ' (আত্তাহিয়্যাত) পড়ার সময় দু'জানু হয়ে বসে। আজকাল হুযূরের পবিত্র রওযায় যিয়ারতকারীগণ নামাযের মত দাঁড়িয়ে সালাম আরয করে থাকেন। এ আদবের ভিত্তি হচ্ছে এ হাদীস। হযরত জিব্রাঈল ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদেরকে হুযূরের দরবারে উপস্থিতির আদব শিক্ষা দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, নামাযের মত এখানে দাঁড়ানো কিংবা বসা হারাম নয়। অবশ্য, সাজদাহ্ বা রুকু' করা হারাম।

৭. 'ইসলাম' কখনো 'ঈমান' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো তা ব্যতীত অন্য অর্থেও। এখানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকাশ্য অবস্থাদির নাম 'ইসলাম' আর বাত্বেনী আক্বাইদ (অন্তরের বিশ্বাস)-এর নাম 'ঈমান'। এজন্য এখানে 'শাহাদাত' ও 'আ'মাল' (যথাক্রমে সাক্ষ্যদান ও কর্মসমূহ উভয়ের কথা) উল্লেখ করা হয়েছে। স্মর্তব্য যে, বর্তমানে হুযূরকে শুধু 'এয়া মুহাম্মদু' বলে ডাকা হারাম। মহান রব এরশাদ ফরমান ...لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ অর্থাৎ "রসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনি স্থির করোনা, যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।" (২৪:৬৩, তরজমা: কানযুল ঈমান)

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটি খুব সম্ভব এ আয়াত শরীফ নাযিল হওয়ার পূর্বেকার। অথবা ফিরিশতাগণ এ আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নন। ☆

৮. 'কালেমা পাঠ করা' মানে 'সমস্ত ইসলামী আক্বাইদ' মেনে নেওয়া। যেমন বলা হয় 'নামাযে (সূরা ফাতিহা তথা) 'আলহামদু শরীফ' পড়া ওয়াজিব। এর মানে সম্পূর্ণ 'সূরা ফাতিহা' পাঠ করা।

সুতরাং এ হাদীসের ভিত্তিতে এখন এটা বলা যাবে না যে, 'সমস্ত ইসলামী দল-উপদল' যেমন মির্যায়ী, চাকড়ালভী ইত্যাদি মুসলমান।' কেননা, এ সকল লোক ইসলামী আক্বাইদ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

☆ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'এয়া মুহাম্মদু' বলে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে তিন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে- এক. স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক, যেমন- হাদীস-ই কুদসী বা মি'রাজের হাদীসে, দুই. ফিরিশতা কর্তৃক, যেমন- হাদীস-ই জিব্রাঈল ইত্যাদি এবং তিন. কোন কোন সম্মানিত সাহাবী কিংবা গ্রামীন নওমুসলিম (কর্তৃক এমন সম্বোধন করতে দেখা যায়)। এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে- এক. স্বয়ং আল্লাহ্ এই নিষেধের আওতাভুক্ত নন। দুই. যেহেতু আয়াত সাধারণ মুসলমানদের জন্য অবতীর্ণ, সেহেতু ফিরিশতাদের জন্য সেগুলো প্রযোজ্য নয়। তিন. সাহাবা-ই কেরামের সম্বোধন নিষেধের আয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্বেকার। তাছাড়া, নওমুসলিমগণ আয়াত সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে তাঁদের ওযর গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাঁদের এ আমল তা জায়েয প্রমাণ করার জন্য দলীল নয়। চার. মোল্লা আলী ক্বারী এও বলেছেন যে, হাদীসে জিব্রাঈলে তিনি সম্বোধনে হুযূরের 'নাম' হিসেবে ব্যবহার করেননি, বরং অর্থের দিক বিবেচনা করে 'গুণবাচক' শব্দ (অর্থাৎ হে অত্যাধিক প্রশংসিত সত্তা) হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পাঁচ. সিহাহ্ সিত্তার ইমামগণ হাদীস শরীফকে باللفظ বা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর হুবহু বচনে অথবা সমার্থক (بالمعنى) বচনে বর্ণনা করাকে বৈধ মনে করেন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সহীহ্ মুসলিম শরীফে হাদীসে জিব্রাঈল দু'ভাবে বর্ণিত হয়েছে- এক. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, যা মিশকাত শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দুই. হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। মিশকাত শরীফের মতনেও সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে- رَوَاهُ اَبُوْهُرَيْرَةَ مَعَ اِخْتِلَافٍ; এখানে লক্ষ্যণীয় যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের বর্ণনায় 'এয়া মুহাম্মদ' থাকলেও হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণনায় এতদস্থলে বর্ণিত হয়েছে يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ الخ ; তাছাড়া, মুসনাদ-ই ইমাম আ'যমের বর্ণনায় এসেছে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ...الخ; এমতাবস্থায় আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা অনুসারে আমল করাই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং আমরা 'এয়া রসূলাল্লাহ্', 'এয়া হাবীবাল্লাহ্', 'এয়া নাবীয়াল্লাহ্' ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর গুণবাচক শব্দ দিয়ে আদব ও ভক্তিসহকারে সম্বোধন করবো। এটাই উত্তম ও নিরাপদ। যেমন আল্লামা ইমাম যায়নুদ্দীন বোখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেছেন- وَالْاَوْلٰى اَنْ يَّقُوْلَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ رُوِيَتْ يَامُحَمَّدُ (অর্থাৎ রেওয়াতের মধ্যে 'এয়া মুহাম্মদু' থাকলেও আদব ও সম্মানার্থে 'এয়া নাবীয়াল্লাহ্' ও 'এয়া রসূলাল্লাহ্' বলাটাই উত্তম।

-[মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়াহ্]

وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهٗ يَسْئَلُهٗ وَيُصَدِّقُهٗ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ

আর নামায ক্বায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে, পবিত্র কা'বার হজ্জ করবে, যদি সেখানে পৌঁছতে পারো"।[৯] আরয করলেন,"আপনি সত্য বলেছেন।" আমরা তাঁর ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হলাম এজন্য যে, হুযূরের কাছে জিজ্ঞাসাও করছেন এবং সত্যায়নও করছেন।[১০] তিনি আবার আরয করলেন, "আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।" হুযূর এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করো।[১১] আর ভাল-মন্দ তাক্বদীরে বিশ্বাস করো।"[১২] আরয করলেন, "আপনি সত্য বলেছেন।" পুনরায় আরয করলেন, "আমাকে ইহ্‌সান সম্পর্কে বলুন।"[১৩] তিনি এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্'র ইবাদত এভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ।[১৪]

৯. এতে প্রকাশ্যত হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামকে সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির মধ্যে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অন্যথায়, ফিরিশতাদের উপর নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি আমল ফরয নয়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (এবং আল্লাহ্'র জন্য মানুষের উপর বায়তুল্লাহ্'র হজ্ব করা ফরয...)। -[৩:৯৭]

স্মর্তব্য যে, এ সকল আমল ইসলামের এমন অঙ্গ নয় যে, এগুলো বর্জনকারী কাফির হয়ে যাবে। এখানে ইসলামের পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে। আমল বর্জনকারীতো মুসলমান, কিন্তু পরিপূর্ণ মুসলমান নয়।

১০. কেননা, জিজ্ঞাসা করা না জানার আলামত এবং সত্যায়িত করা জানার আলামত। এ থেকে বুঝা গেল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব সম্পর্কে অবগত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর সম্পর্কে এরশাদ ফরমাচ্ছেন مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ (তিনি সত্যায়নকারী ওই কিতাবের, যা হে কিতাবীরা! তোমাদের সাথে আছে)।

১১. স্মর্তব্য যে, عَنِ الْاِيْمَانِ (ঈমান সম্পর্কে) দ্বারা পারিভাষিক ঈমান বুঝানো উদ্দেশ্য এবং اَنْ تُؤْمِنَ দ্বারা আভিধানিক ঈমান অর্থাৎ 'মান্য করা' বুঝানো উদ্দেশ্য।

সুতরাং এটা 'তা'রীফুশ্ শায়ই বিনাফ্‌সিহী' বা কোন জিনিসের সংজ্ঞা স্বয়ং ওই জিনিস দ্বারাই দেওয়া নয় এবং এক শব্দের পুনর্বার উল্লেখও নয়। সমস্ত ফিরিশতা সমস্ত নবী ও সমস্ত কিতাবের উপর 'ইজমালী' বা সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনা যথেষ্ট। আর ক্বোরআন ও ক্বোরআনের ধারকের উপর যেনো বিস্তারিতভাবে ঈমান আনাই আবশ্যক।

১২. এভাবে যে, সকল ভাল-মন্দ কথা, যা আমরা বলে থাকি, আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই জানেন এবং ওগুলোই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তাক্বদীরের অর্থ- 'পরিমাপ', 'অনুমান'। তাক্বদীর দু'প্রকার: 'মুবরাম' এবং 'মু'আল্লাক্ব'।

'তাক্বদীর-ই মুবরাম' পরিবর্তন হতে পারে না।

তাক্বদীর-ই মু'আল্লাক্ব' দো'আ ও আমল ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে।

ইবলীসের দো'আয় তার হায়াত বেড়ে গেছে। যেমন এরশাদ হয়েছে- فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ (সুতরাং তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে)। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র দো'আয় হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম'র হায়াত ৬০ বছরের স্থলে ১০০ বছর হয়ে গেছে।

তাক্বদীরের বিস্তারিত আলোচনা আমার 'তাফসীরে নাঈমী'র তৃতীয় পারায় দেখুন।

১৩. অর্থাৎ মহান রব এরশাদ করেছেন। لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى (অর্থাৎ যারা একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য তথা জান্নাত) ইত্যাদি। এ আয়াতগুলোতে 'ইহ্‌সান' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? উত্তর পাওয়া গেছে 'ইখলাস-ই আমল' বা আমলের নিষ্ঠা।

১৪. অর্থাৎ যদি তুমি খোদাকে দেখতে পাও, তাহলে তোমার অন্তরে সে ধরনের ভয় হতো এবং যেভাবে তুমি নিজেকে শামলিয়ে নিয়ে আমল করতে, সেভাবেই ভয়ের সাথে, মনযোগ দিয়ে আমল করো।

فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاَخْبِرْنِیْ عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ مَاالْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّآئِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِیْ عَنْ اَمَارَاتِهَا، قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَآءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِی الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِیْ يَاعُمَرُ اَتَدْرِیْ مَنِ السَّآئِلُ

আর যদি (তা সম্ভব না হয়), যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তাহলে খেয়াল করো যে, তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।"[১৫] আরয করলেন, "ক্বিয়ামত সম্পর্কে সংবাদ দিন।" [১৬] তিনি এরশাদ করলেন, "তুমি যাঁর কাছে জিজ্ঞেস করছেন, তিনি ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী অপেক্ষা অধিক অবগত নন।" [১৭] আরয করলেন, "ক্বিয়ামতের কিছু নিদর্শন বলে দিন।" [১৮] হুযূর এরশাদ করলেন, "দাসী স্বীয় মালিককে প্রসব করবে,"[১৯] খালি পা উলঙ্গ শরীর বিশিষ্ট দরিদ্র এবং মেষ-রাখালদেরকে বড় বড় দালানে গর্ব করতে দেখবে।" [২০] (বর্ণনাকারী) বলছেন, অতঃপর প্রশ্নকারী লোকটি চলে গেলেন। আমি সেখানে কিছু সময় অবস্থান করলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে এরশাদ করলেন, "হে ওমর! তুমি কি জানো এ প্রশ্নকারী কে?"

১৫. এমনিতে তো সর্বদা মনে করো যে, আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন; কিন্তু ইবাদতের অবস্থায় বিশেষভাবে তা খেয়াল রাখবে। তাহলে, ইন্‌শা- আল্লাহ্! ইবাদত করা সহজ হবে, অন্তরে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হবে, চোখে পানি আসবে। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তা নসীব করুন। আ-মী-ন।

১৬. অর্থাৎ কোন্ দিনে, কোন্ তারিখে, কোন্ মাসে ও কোন্ বছরে হবে? বুঝা যাচ্ছে যে, জিব্রাঈল আমীনের আক্বীদা এ ছিলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের ইল্‌ম দান করেছেন। কেননা জ্ঞাত ব্যক্তির কাছেই জিজ্ঞাসা করা হয়। এখানে জিব্রাঈল আমীন তো হুযূরকে পরীক্ষা করা কিংবা অপারগতা প্রকাশ করানোর জন্য প্রশ্ন করছেন না; বরং এটাই দেখাতে চাচ্ছেন যে, "হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কাছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে; কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেন নি। স্মর্তব্য যে, হুযূর অন্যান্য স্থানে ক্বিয়ামতের দিনও বলে দিয়েছেন, মাস এবং তারিখও বলে দিয়েছেন। বলেছেন তা জুমু'আর দিন, মুহার্‌রম মাসের ১০ম তারিখে সংঘটিত হবে।

১৭. এখানে জ্ঞানের অস্বীকৃতি নেই। নতুবা এরূপ বলা হতো لَااَعْلَمُ (আমি জানি না); বরং অধিক জানার অস্বীকৃতি রয়েছে। অর্থাৎ তা সম্পর্কে আমার কাছে তোমার চেয়ে অধিক ইল্‌ম নেই। অর্থাৎ হে জিব্রাঈল! এখানে জনসমাগম, আর ক্বিয়ামতের ইল্‌ম আল্লাহ্'র গোপন রহস্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ গুপ্ত বিষয়টি আমার দ্বারা কেন প্রকাশ করাতে চাচ্ছো? প্রকৃত কথা হচ্ছে- আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ক্বিয়ামতের জ্ঞানও দিয়েছেন। [তাফসীর-ই সাভী ইত্যাদি] এ জন্যই হযরত জিব্রাঈল হুযূরকে এ প্রশ্ন করেছিলেন। ক্বিয়ামতের ইল্‌ম সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণালব্ধ আলোচনা আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব': ১ম খণ্ড দেখুন। হুযূরের এ উত্তর থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর এখানে হযরত জিব্রাঈলকে চিনতে পেরেছিলেন।

১৮. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের সংবাদ দেওয়া যদি যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহলে সেটার বিশেষ কিছু আলামত হলেও বলে দিন। এ প্রশ্ন থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হুযূরের নিকট ক্বিয়ামতের জ্ঞান ছিলো। 'আলামত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় অবগত ব্যক্তিকেই।

১৯. অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি অবাধ্য হবে। পুত্র মায়ের সাথে দাসীর মতো আচরণ করবে। সুতরাং যেন মা তার মুনিবকেই প্রসব করবে। এর আরো ব্যাখ্যা রয়েছে।

২০. অর্থাৎ দুনিয়ায় এমন পরিবর্তন আসবে যে, হীন লোকেরা মর্যাদাবান সেজে বসবে। পক্ষান্তরে, মর্যাদাবান লোকেরা অপমানিত হয়ে যাবে। যেমনিভাবে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। সিকান্দর যুল ক্বারনাঈন নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন কোন পেশাদার ব্যক্তি তার মৌরুশী পেশা ত্যাগ না করে, যা'তে দুনিয়ার শৃঙ্খলা ভঙ্গ না হয়ে যায়। [আশি"আতুল লুম'আত] বুঝা গেলো যে, হীন লোকেরা নিজেদের পেশা ছেড়ে উচ্চ হয়ে যাওয়া ক্বিয়ামতের আলামত। বস্তুতঃ তা দ্বারা দুনিয়ার নিয়ম-শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যায়।

قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهٗ جِبْرَئِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَعَ اِخْتِلَافٍ وَفِيْهِ وَاِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْاَرْضِ فِيْ خَمْسٍ لَايَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اَلْاٰيَةَ﴾ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আমি আরয করলাম, "আল্লাহ্ ও রসূলই ভাল জানেন।"[২১] তিনি বললেন, "তিনি হযরত জিব্রাঈল। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছে।" [২২] [মুসলিম] হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কিছুটা ভিন্নতা সহকারে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় আছে- 'যখন তোমরা খোলা পা ও উলঙ্গ শরীর বিশিষ্ট মুক-বধিরকে পৃথিবীর বাদশাহ্ (শাসক) হিসেবে দেখবে।' 'ক্বিয়ামত' ওই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানেন না। অতঃপর এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন...আল্ আয়াত।" [২৩] [বোখারী ও মুসলিম]

২১. এটা সাহাবীদের আদব যে, তাঁরা ইল্মকে আল্লাহ্-রসূলকে সোপর্দ করেন।

এ থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো: এক. হুযূরের যিক্র আল্লাহ্'র সাথে মিলিয়ে করা শির্ক নয়; বরং সুন্নাত-ই সাহাবা (সাহাবা-ই কেরামের নিয়ম)। এটা বলা যাবে যে, আল্লাহ্-রসূল জানেন, আল্লাহ্-রসূল দয়া করুন! আল্লাহ্-রসূল রহম করুন! আল্লাহ্-রসূল কল্যাণ করুন! দুই. হুযূর অবগত ছিলেন যে, এ প্রশ্নকারী হযরত জিব্রাঈলই ছিলেন। অন্যথায় তিনি বলে দিতেন, "আমিও জানিনা লোকটি কে ছিলো।"

২২. অর্থাৎ এজন্য এসেছিলেন যে, তোমাদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন, আর তোমরা উত্তর শুনে দ্বীন শিখে নেবে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, মুসলমানদের জন্য হুযূরের আনুগত্য করা ওয়াজিব, জিব্রাঈল'র আনুগত্য নয়। যেহেতু এখানে হযরত জিব্রাঈল এটা বলেননি যে, 'ওহে লোকেরা! আমি জিব্রাঈল। আমার কাছ থেকে তোমরা অমুক অমুক বিষয় শিখে নাও; বরং হুযূরের মাধ্যমে বলিয়েছেন, যাতে তা মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। جِبْرَائِيْل অর্থ عَبْدُ اللّٰه; جَبْر অর্থ عَبْد আর اِيْل অর্থ اَللّٰه। এটা হিব্রু ভাষার শব্দ।

২৩. অর্থাৎ পাঁচটি জিনিস সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নয়- ক্বিয়ামত কখন হবে, বৃষ্টি কখন আসবে, মায়ের গর্ভে কি আছে। কেউ জানেনা আগামীকাল কি করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে? এতে 'সূরা লুক্বমান'র শেষ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ আয়াত ও হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ্ পাক কাউকে এগুলোর ইলম প্রদানই করেননি। তাক্বদীর লিখক ফিরিশতা এবং মালাকুল মাওতকে এগুলোর ইল্ম প্রদান করা হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বদরের ময়দানে যুদ্ধের আগে যমীনের উপর রেখা টেনে বলে দিয়েছিলেন- 'আগামীকাল এখানে অমুক কাফির, ওখানে অমুক কাফির, ওখানে অমুক কাফির নিহত হবে।' বরং এর অর্থ এটাই যে, এ 'উলূম-ই খাসসাহ' (পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান) অনুমান-আন্দাজ বা হিসাব কষে জানা যায়না। শুধু আল্লাহ্র ওহীর মাধ্যমেই এগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।☆

☆ সূরা লুক্বমান'র উক্ত আয়াতের শেষাংশে اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-এর তাফসীরে মোল্লা শায়খ আহমদ জীবন রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি 'তাফসীর-ই বায়দ্বাভী'র উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন- আয়াতের عَلِيْمٌ ('আলী-মুন)'র অর্থ হল- 'আল্লাহ্ সত্তাগতভাবে জ্ঞাতা, আর خَبِيْرٌ (খাবীর) অর্থ হল- مُخْبِرٌ বা 'অবহিতকারী'। সুতরাং আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়ায়- নিশ্চয় আল্লাহ্ উক্ত পাঁচ বিষয় সম্পর্কে স্বত্তাগতভাবে অবগত এবং তাঁর পছন্দনীয়দের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা ওই সব বিষয়ে অবহিত করে থাকেন। ফলে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তথা অন্য কোন প্রিয় বান্দা- নবী হোক, কিংবা ওলী, এ সব বিষয়ে খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা জানেন বলে আক্বীদা পোষণ করলে শির্ক তো নয়'ই; বরং ঈমানের অঙ্গ। তিনি আরো লিখেছেন, 'এর দলীল হলো- যেমন ইমাম বায়দ্বাভী উল্লেখ করেছেন عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ [অর্থাৎ আল্লাহ্ অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং তিনি আপন বিশেষ গায়ব কারো নিকট প্রকাশ করেন না, কিন্তু যে রসূলের উপর তিনি (অধিক) সন্তুষ্ট।] এখানে غَيْبِهٖ (তাঁর গায়ব) মানে اَلْغَيْبُ الْمُخْتَصُّ بِهٖ (ওই অদৃশ্যজ্ঞান যা একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট)। অতএব, এ শেষোক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- "আল্লাহ্, তাঁর বিশেষ অদৃশ্যজ্ঞানও তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা প্রদান করেন। [তাফসীর-ই আহমদিয়া] একই কথা আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী 'মাজমু'আহ-ই রাসাইল-ই ইবনে আবিদীন: ২য় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন- وَاِنْكَارُ عِلْمِ الْغَيْبِ لِلْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى عِنَادٌ (অর্থাৎ আল্লাহ্'র অবহিতকরণক্রমেই নবী ও ওলীগণের 'ইলম-ই গায়ব' (অদৃশ্যজ্ঞান)কে অস্বীকার করা কুফর)।

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءُ الزَّكٰوةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ

৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত,[২৪] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইসলাম পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত-[২৫] এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর খাসবান্দা ও রসূল,[২৬] নামায ক্বায়েম করা,[২৭] যাকাত প্রদান করা, হজ্জ করা[২৮] এবং রমযানের রোযা পালন করা। [বোখারী ও মুসলিম] ৪ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[২৯] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে।[৩০] ওইগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে এ কথা বলা যে,[৩১] আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং

২৪. তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর। হুযূরের নুবূয়ত প্রকাশের এক বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। হিজরি ৭৩ সনে ইবনে যুবায়রের শাহাদাতের তিন মাস পর ওফাত পান। 'যী-তুওয়া'র মুহাজিরীন-কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি চুরাশি বছর হায়াত পান। তিনি অত্যন্ত মুত্তাক্বী এবং সুন্নাতের উপর অত্যধিক আমলকারী ছিলেন। [মিরক্বাত ইত্যাদি]

২৫. অর্থাৎ ইসলাম তাঁবু কিংবা ছাদের ন্যায় এবং এই পাঁচটি 'আরকান' সেটার পাঁচটি স্তম্ভের মত। সুতরাং যে কেউ এগুলো থেকে কোন একটিকে অস্বীকার করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং তার ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে। স্মর্তব্য যে, এ আমলগুলোর উপর ঈমানের পরিপূর্ণতা নির্ভরশীল এবং এগুলো মেনে নেওয়ার উপর মূল ঈমান নির্ভর করে। সুতরাং সহীহ্ আক্বীদা পোষণকারী কালেমা পড়ে মুসলমান হবার পর আর কখনো কালেমা পড়েনি, অথবা নিয়মিতভাবে নামায- রোযা সম্পন্ন করেনি, সে যদিওবা মু'মিন, কিন্তু পরিপূর্ণ মু'মিন নয়। আর যে এগুলোর কোন একটিকে অস্বীকার করবে সে কাফির। সুতরাং হাদীস শরীফের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আমল ঈমানের 'অংশ' নয়।

২৬. এটা দ্বারা সমস্ত ইসলামী আক্বাইদ বুঝানো উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি কোন আক্বীদার অস্বীকারকারী হবে, সে হুযূরের রিসালাতেরই অস্বীকারকারী হবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে রসূল বলে মেনে নেওয়ার অর্থ এটাই যে, তাঁর প্রতিটি বাণী মান্য করা হবে।

২৭. সর্বদা পড়া, সহীহভাবে পড়া ও মনযোগ দিয়ে পড়ার নামই নামায ক্বায়েম করা।

২৮. যদি সম্পদ থাকে তাহলে যাকাত ও হজ্জ আদায় করা ফরয, নতুবা নয়। কিন্তু এগুলোকে ফরয বলে মেনে নেওয়া সর্বাবস্থায় ফরয। নামায হিজরতের পূর্বে মি'রাজ শরীফে ফরয হয়েছিলো, যাকাত ও রোযা হিজরি ২য় সনে এবং হজ্জ হিজরি ৯ম সনে ফরয হয়েছে।

২৯. তাঁর নাম ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'আবদুশ্ শাম্স' এবং ইসলাম গ্রহণের পর 'আবদুর রাহমান ইবনে সাখার দাউসী' হয়। খায়বার যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। চার বছর মুসাফির ও মুক্বীম অবস্থায় ছায়ার মত হুযূরের সাথে ছিলেন। তিনি বিড়াল খুব ভালবাসতেন। এমনকি একদা তিনি জামার আস্তীনে বিড়াল নিয়েছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, ''তুমি 'আবূ হুরায়রা' অর্থাৎ বিড়ালওয়ালা।'' তখন থেকে তিনি এ উপনাম দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়ে যান। হিজরি ৩৫সনে মদীনা মুনাওয়ারায় ওফাত পান। তাঁকে জান্নাতুল বক্বীতে দাফন করা হয়। ৮৭ বছর হায়াত পান। তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর থেকে চার হাজার তিনশ' চৌষট্টিটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩০. شُعْبَةٌ (শো'বাহ্) গাছের ডালকে বলা হয়। এখানে 'স্বভাব' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ কাজ থেকে সর্বোচ্চ কাজ পর্যন্ত সবই ইসলামী স্বভাব। কোনটি ছেড়ে দিও না।

৩১. অর্থাৎ 'কালেমাহ্-ই তাইয়্যেবা' পড়তে থাকা, সেটার অভ্যাস করা, মুর্দাকে কালেমাহ্-ই তাইয়্যেবা'র সাওয়াব পৌঁছানো, কারো মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে ক্বোরআন পাঠ ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা এ হাদীস থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, উত্তম ইবাদতের সাওয়াবও উত্তম। এটাই পৌঁছানো উচিত।

اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَآءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ، هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ وَلِمُسْلِمٍ قَالَ اِنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ؟ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَعَنْ اَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা,[৩২] আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।[৩৩] [বোখারী ও মুসলিম] **৫ ||** হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত,[৩৪] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মুসলমান হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ[৩৫] নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির হলেন, ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ছেড়ে দেয়।[৩৬] এ শব্দগুলো বোখারী শরীফের। আর মুসলিম শরীফের শব্দ হল, বর্ণনাকারী বলেছেন- "এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র দরবারে আরয করলেন, কোন্ মুসলমান উত্তম?" তিনি এরশাদ করেছেন, "যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে।" **৬ ||** হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[৩৭] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

৩২. পাথর, ইট ও কাঠ ইত্যাদি, যেগুলো দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় কিংবা হোঁচট খায়। এগুলো সরিয়ে ফেলা সাওয়াবের কাজ। এমনিভাবে, সৃষ্টির উপকার করাও বড় সাওয়াবের কাজ। এমনকি পানি পান করানোও। এজন্য কোন কোন মানুষ পথের ধারে পানীয় জল ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকেন।

৩৩. 'লজ্জা' দ্বারা 'ঈমানী লজ্জা' বুঝানো হয়েছে, যা যাবতীয় গুনাহ্ থেকে বিরত রাখে। বান্দা মাখলূক্বকে, আল্লাহ্'র রসূলকে ও ফিরিশ্তাদেরকে, সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'আলাকে লজ্জা করবে। গোপনেও কোন গুনাহ্ করবে না; কারণ আল্লাহ্, রসূল ও ফিরিশ্তাগণ দেখছেন। প্রকাশ্যেভাবেও করবে না; কারণ, মুসলমানগণও দেখতে পাচ্ছেন। 'নাফসানী কিংবা শয়তানী লজ্জা, বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। যেমন- নামায বা গোসল করতে লজ্জা বোধ করা।

৩৪. তিনি আমর ইবনে 'আস ইবনে ওয়াইলের পুত্র। তিনি তাঁর পিতার আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অনুমতিক্রমে হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ করেন, যার সংখ্যা হচ্ছে- সাতশ'। তিনি বড় আলিম, মুত্তাক্বী ও আবিদ ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হিজরি ৬৩ সনে তায়েফ কিংবা মিসরে ওফাত পান। [মিরক্বাত]

৩৫. অর্থাৎ পরিপূর্ণ মুসলমান, যে আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয়দিক থেকে মুসলমান। মু'মিন সেই, যে কোন মুসলমানের গীবত করে না, গালি দেয় না, চোগলখুরী ইত্যাদি করে না, কারো সাথে মারামারি করে না, কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কিছু লিখে না। এ হাদীস সচ্চরিত্রগুলোর ধারক। মুসলমানদের নিরাপত্তার কথা বিশেষভাবে এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে, কখনো কখনো কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা ও তাদের মন্দ বলা ইবাদত। এখানে অন্যায়ভাবে গীবত করা ও কষ্ট দেওয়া বুঝায়। এ হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, 'যালিম-মুসলমান কাফির; অথবা দয়ালু কাফির মুসলমান।'

৩৬. অর্থাৎ কামিল মুহাজির হচ্ছে ওই মুসলমান, যে ব্যক্তি মাতৃভূমি ত্যাগ করার সাথে সাথে গুনাহ্ও ত্যাগ করে। অথবা গুনাহ্ ছেড়ে দেওয়াও আভিধানিক অর্থে হিজরত, যা সর্বদা অব্যাহত থাকবে।

৩৭. তিনি হলেন আনাস ইবনে মালিক ইবনে নাদ্বর আনসারী খাযরাজী। হুযূরের বিশেষ খাদিম। দশ বছর তাঁর পবিত্র সংস্পর্শে ছিলেন। তিনি শত বছরের অধিক হায়াত পান। ফারূক্ব-ই আ'যম'র যুগে বসরায় চলে যান। খুব সম্ভব তিনি সেখানেই হিজরী ৯৩ সনে ইন্তিকাল করেন। বসরায় সর্বশেষ সাহাবী হিসেবে তাঁর ওফাত হয়। তাঁর নূরানী মাযার শরীফ সর্বস্তরের মানুষের যিয়ারতস্থল।☆

☆ উল্লেখ্য, তিনি ওই ৪ জন সৌভাগ্যবান সাহাবীর অন্যতম, যাঁরা হুযূরের খিদমত করে বিশেষ নি'মাতের অধিকারী হয়েছেন। তাঁরা হলেন- এক. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি হুযূরের খিদমতের ফলে নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হবার গৌরব লাভ করেন।

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন]

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার মাতাপিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল লোকের চেয়েও অধিক প্রিয় হবো।[৩৮] [বোখারী ও মুসলিম] **৭ ॥ তাঁরই হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার মধ্যে তিনটি স্বভাব থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে-**[৩৯] **যার নিকট আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়,**[৪০]

৩৮. এখানে 'প্রিয়' দ্বারা স্বভাবগত ভালবাসার প্রেমাস্পদ (طبعى محبوب) বুঝানো উদ্দেশ্য। শুধু আক্বলী বা যুক্তিগত নয়। কেননা, সন্তানদের, মাতাপিতার প্রতি স্বভাবগত ভালবাসা হয়ে থাকে। এ ভালবাসাই হুযূরের প্রতি অধিকতর হওয়া চাই।

মহান আল্লাহ্'র প্রশংসাক্রমে প্রত্যেক মু'মিনের কাছে হুযূর জান-মাল ও সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয়। সাধারণ মুসলমানও ওইরূপ স্বধর্ম ত্যাগকারী সন্তানগণ এবং বেদ্বীন মাতাপিতাকে ত্যাগ করে থাকে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মানে প্রাণও উৎসর্গ করে দেয়। এ বিষয়ে গাযী আবদুর রশীদ, গাযী-ই ইলমে দ্বীন আবদুল ক্বাইয়ূম প্রমুখের জীবন্ত উদাহরণ মওজূদ রয়েছে।

৩৯. শারীরিক খাবারসমূহে যেমন বিভিন্নরকম স্বাদ রয়েছে, তেমনিভাবে রূহানী খাবারসমূহ ঈমান এবং আ'মালেও বিভিন্ন রকম স্বাদ বিদ্যমান। যেমনিভাবে ওই খাবারসমূহের স্বাদ ওই ব্যক্তিই অনুভব করতে পারে, যার প্রকাশ্য ইন্দ্রীয় সঠিক থাকে, তেমনিভাবে এ ঈমানী খাবারগুলোর স্বাদ ওই ব্যক্তিই অনুভব করতে পারে, যার রূহ বিশুদ্ধ থাকে।

আর যেমনিভাবে প্রকাশ্য ইন্দ্রীয়গুলো দুরস্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার ঔষধ রয়েছে, তেমনি ওই ইন্দ্রীয়ের অনুভূতি দুরস্তকারী রূহানী ঔষধপত্রও রয়েছে।

এ হাদীস শরীফে ওই ঔষধগুলোর উল্লেখ রয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন শারীরিক ও আত্মিক উভয় দিকের চিকিৎসাকারী।

যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ অর্জন করতে পারে, সে বড় কঠিন কাজের কষ্টও আনন্দের সাথে সহ্য করতে পারে। সে শীতকালের নামায ও জিহাদ সানন্দে সম্পন্ন করতে পারে। কারবালার ময়দান এ হাদীসের জীবন্ত তাফসীর। এ স্বাদই সমস্ত মুশকিলকে সহজ করে দেয়। এর দ্বারাই 'রেদ্বা বিল ক্বাদ্বা' (তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্টি) ভাগ্যে জুটে।

৪০. মাল-দৌলত, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি সবই দুনিয়াবী নি'মাত। এতে ক্বোরআন, কা'বা, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত নয়। যেহেতু এগুলোর প্রতি ভালবাসা রাখা মানে স্বয়ং আল্লাহ্-রসূলকে মুহাব্বত করা।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূরের প্রতি ওই ধরনের ভালবাসা রাখা চাই যে ধরনের ভালবাসা আল্লাহ্'র প্রতি রাখতে হয়।

'মুহাব্বত'র বহু প্রকার রয়েছে

মায়ের প্রতি মুহাব্বত এক রকম, স্ত্রীর প্রতি অন্য রকম, সন্তানের প্রতি এক ধরনের, ভাইবোনের প্রতি অন্য ধরনের। হুযূরের প্রতি মুহাব্বত ওই ধরনের হওয়া চাই, যে ধরনের আল্লাহ্'র প্রতি রাখা চাই। অর্থাৎ মুহাব্বত-ই ঈমানী ও ইরফানী।

هُمَا (সর্বনাম) এরশাদ করা থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্-রসূলের জন্য একটিমাত্র দ্বিবচন-সর্বনাম আসতে

দুই. হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি দীর্ঘ দশ বছর যাবত হুযূরের খিদমত করলে হুযূর তাঁর দীর্ঘায়ু ও অধিক সন্তানের জন্য দো'আ করেন। ফলে তিনি এত দীর্ঘ হায়াত লাভ করেন যে, শেষ বয়সে তিনি লোক সমক্ষে আসতেও সঙ্কোচ বোধ করতেন। কারণ, তিনি নিজ হাতে পুত্র ও পৌত্রসহ সর্বমোট ১০৪ জনকে দাফন করার সুযোগ পান। এতে তাঁর দীর্ঘায়ু ও সন্তানের আধিক্য সহজেই অনুমেয়। তিন. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা। তিনি মাত্র সাত বছর বয়সে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমত এমনিভাবে করেছেন যে, হুযূরের জন্য তাহাজ্জুদের ওযূর পানি ও শৌচকর্ম সম্পাদনের পানি গভীর রাতে আলাদা আলাদাভাবে ব্যবস্থা করতেন। হুযূর খুশী হয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে দো'আ করেছিলেন- "আল্লাহুম্মা! 'আল্লিমহুল্ কিতা-ব।" (হে আল্লাহ্! তাঁকে কিতাবুল্লাহ্'র ইলম দান করুন!) ফলে তিনি মুফাস্সিরকুল সরদার (رَئِيْسُ الْمُفَسِّرِيْنَ) হবার গৌরব অর্জন করেন। চার. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জুতো মুবারক ও বিছানা মুবারক বহনের খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার ফলে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দো'আ করেছিলেন- اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ (হে আল্লাহ্! তাকে দ্বীনের বুঝশক্তি দান করুন)। সুতরাং, তিনি 'ফক্বীহ্কুল সরদার' হবার মর্যাদা লাভ করেছেন।

وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَّايُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَّكْرَهُ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ-مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

যে ব্যক্তি বান্দার সাথে শুধু আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্যই ভালবাসা রাখে[৪১] এবং যাকে আল্লাহ্ কুফর থেকে মুক্তি দেবার পর সে কুফরে পুনরায় ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার ন্যায় মন্দ মনে করে।[৪২] [বোখারী ও মুসলিম]

৮ ‖ হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু[৪৩] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ওই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ উপভোগ করেছে, যে আল্লাহ্ রব, ইসলাম দ্বীন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রসূল হওয়ার উপর সন্তুষ্ট হয়েছে।[৪৪] [মুসলিম শরীফ]

পারে, যেখানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে সমকক্ষতার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকার কারণেই নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সুতরাং হাদীসগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

স্মর্তব্য যে, এখানে মহব্বত দ্বারা 'মুহাব্বত-ই তব'ঈ' বা স্বভাবগত মহব্বত বুঝানো উদ্দেশ্য, শুধু মুহাব্বত-ই আক্বলী (বিবেকগত মহব্বত) নয়।☆

৪১. অর্থাৎ বান্দাদেরকে শুধু এ জন্যই মুহাব্বত করবে যে, আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য এতে শামিল হবে না। উস্তাদ, শায়খ, এমনকি মাতাপিতা ও সন্তানদেরকে এ জন্য মুহাব্বত করবে যে, তা আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির মাধ্যম এবং ইসলামের তরীক্বা। এটা সার্বক্ষণিক (স্থায়ী) মুহাব্বত। দুনিয়াবী মুহাব্বত দ্রুত ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন-

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ "অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, পরহেযগারগণ ব্যতীত।" [৪৩:৬৭]

৪২. অর্থাৎ কুফর এবং কাফিরদের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা জন্মে যায়। ইসলামের তাওফীক্বকে মহান রবের নি'মাত মনে করে। কাফিরদের নিকট থেকে এমনভাবে নিজেকে রক্ষা করবে যেমনিভাবে সাপের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। কারণ, সাপ হচ্ছে জানের দুশমন এবং এসব লোক ঈমানের দুশমন।

৪৩. তিনি হুযূর করীমের আপন চাচা। তাঁর বয়স হুযূরের চেয়ে দু'বছরের বেশি ছিলো। তিনি বলতেন, "বড় হলেন হুযূর, বয়স আমার বেশি।" তাঁর মাতা কা'বা শরীফের উপর সর্বপ্রথম সিল্কের রেশমী গিলাফ দিয়েছিলেন। তিনি হাতির ঘটনার পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ৩২ হিজরির ১২ রজব জুমু'আর দিন ৮৮ বছর বয়সে ওফাত পান। তাঁকে জান্নাতুল বাক্বী'তে দাফন করা হয়। আমি (লেখক) তাঁর কবর শরীফের যিয়ারত করেছি। তিনি ইসলাম আগেই গ্রহণ করেছিলেন; বদরের যুদ্ধে বাধ্য হয়ে কাফিরদের সাথে এসেছিলেন। স্বীয় হিজরতের দিন ইসলাম প্রকাশ করেন। তিনিই সর্বশেষ হিজরতকারী।

৪৪. 'আল্লাহর রবূবিয়াতে সন্তুষ্ট থাকা'র অর্থ হচ্ছে- তাক্বদীরে তাঁর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। অসুস্থ ব্যক্তি ডাক্তারের তিক্ত ঔষধ এবং তাঁর অপারেশন করার উপরও সন্তুষ্ট থাকেন।

'ইসলাম দ্বীন হবার উপর সন্তুষ্ট থাকা'র অর্থ হচ্ছে- ইসলামের বিধি-বিধান আনন্দচিত্তে ক্বূল করা। কোন বিধানের উপর মুখেও সমালোচনা না করা। 'হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর নুবূয়তের উপর সন্তুষ্টি' হচ্ছে- তাঁর সুন্নাতগুলোর প্রতি মুহাব্বত রাখা। তাঁর আওলাদ, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ বরং যেসব জিনিস হুযূরের প্রতি সম্পৃক্ত সেসব জিনিসকে মুহাব্বত করা।

এ হাদীস শরীফ পূর্বেকার হাদীস শরীফের বিরোধী নয়। এ তিনটি গুণ যার নসীব হবে, পূর্বের হাদীসে বর্ণিত তিনটি বিষয়ও তার অর্জিত হবে।

☆ যেমন তিক্ত ঔষধ সেবন করতে স্বভাব না চাইলেও আক্বল বা বিবেক তা সেবন করতে রোগমুক্তির স্বার্থে বাধ্য করে। এমন মহব্বত হুযূরের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন কেউ যদি নিছক বেহেশ্‌ত লাভের উদ্দেশ্যে বিবেক খাটিয়ে হুযূরকে ভালবাসে, অন্তর দিয়ে নয়, তবে এমন ভালবাসা কোন মু'মিন থেকে কাম্য নয়।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ
لَايَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَّلَانَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ
بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى
الْاَشْعَرِىِّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَّهُمْ اَجْرَانِ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ
اٰمَنَ بِنَبِيِّهٖ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ وَّالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ

৯ || হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে সত্তার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ তাঁরই শপথ! এ উম্মতের[৪৫] কোন ইহুদী ও খ্রিস্টান আমার নাম শুনে, অতঃপর আমার প্রতি যা প্রেরণ করা হয়েছে তার উপর ঈমান আনা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে সে দোযখী হবেই।[৪৬] [মুসলিম শরীফ] **১০ ||** হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[৪৭] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে, যারা দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে- ওই কিতাবী, যে নিজের নবীর উপরও ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপরও ঈমান এনেছে,[৪৮] মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাস, যখন সে আল্লাহ্'র হক্বও আদায় করে এবং স্বীয় মুনিবদের হক্বও আদায় করে,[৪৯]

৪৫. এখানে 'উম্মত' মানে 'উম্মত-ই দাওয়াত'; অর্থাৎ সমস্ত মানুষ। ইহুদী ও খ্রিস্টান সেটার ব্যাখ্যা। মুশরিক ও কাফির প্রমুখ স্বয়ং এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কারণ, যখন ইহুদী ও খ্রিস্টানের উপরও ইসলাম গ্রহণ করা অনিবার্য হলো, যারা পূর্বের পয়গম্বরগণের উপর ঈমান এনেছিলো, তখন যারা কোন নবীকে মোটেই মান্য করতো না, তাদের জন্য নিশ্চিতভাবে ইসলাম গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪৬. এ হাদীস শরীফ থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো:
এক. সমস্ত সৃষ্টির উপর রসূলের আনুগত্য করা আবশ্যক। যে কোন দেশ, যেকোন গোত্র এবং যেকোন যামানারই হোকনা কেন, যে খোদার বান্দা, তার উপর হুযূরের আনুগত্য করা আবশ্যক।
দুই. যার কাছে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নুবূয়তের সংবাদ পৌঁছেনি, সে ওযর সম্পন্ন (নিরুপায়)। তার নাজাতের জন্য শুধু তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস করাটাই যথেষ্ট।
সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মানিত মাতাপিতা ক্ষমাপ্রাপ্ত ও জান্নাতী। কারণ, তাঁরা একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং হুযূরের নুবূয়তের পূর্বেই ওফাত প্রাপ্ত হন। এ মাসআলার পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ আমার কৃত তাফসীর-ই নাঈমী: ১ম পারায় দেখুন।

৪৭. তিনি ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবী। তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে ক্বায়স। তিনি বনী আশ্'আর গোত্রের লোক। ইয়েমেন থেকে মক্কা মু'আযযামায় এসে মুসলমান হন। প্রথমে হাবশাহ্ ও পরে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। তিনি বসরার শাসক ছিলেন। হযরত আলী মুরতাদ্বা তাঁকে তাঁর পক্ষ থেকে (সিফ্ফীনের যুদ্ধে) সালিশকার নিয়োগ করেছিলেন- হযরত আমীর মু'আবিয়ার সন্ধির ঘটনায়। হিজরি ৫২ সনে মক্কা মু'আযযামায় ওফাত পান। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর গুণাবলী অনেক। 'নজফ' শরীফে তাঁর কবরের যিয়ারত করানো হয়, আমিও সেখানে গেছি। কিন্তু ওটা সঠিক নয়।

৪৮. অর্থাৎ আহলে কিতাব যদি হুযূরের উপর ঈমান আনে, তাহলে তারা প্রথমতঃ আহলে কিতাব হবারও সাওয়াব পাবে। যদিও ওই অবস্থায় তারা তাদের নবীগণের উপর ভুলপন্থায় ঈমান এনেছিলো।
যেমন- খ্রিস্টান হযরত মসীহকে, ইহুদী হযরত ওযায়েরকে আল্লাহ্'র পুত্র বলতো। কিন্তু যেহেতু তারা ওই নবীগণকে সত্য এবং কিতাবগুলোকে সঠিক বলেই মানতো, সেহেতু সেটার সাওয়াব এখন পেয়ে যাবে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং কা'ব-ই আহবার প্রমুখ। এ বিধান ক্বিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। (দ্বিতীয়তঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর ঈমান আনার সাওয়াব।)

৪৯. এভাবে যে, কয়েকজন মালিকের অধীনে একজন গোলাম ছিলো। অতঃপর সে তাদের সকলের হক্ব সম্পন্ন এবং খিদমতও করছিলো। আর ইসলামের ফরযগুলোও পালন করছিলো। মোটকথা- দুনিয়ার ঝঞ্ঝাট যত বেশি হয় (এমতাবস্থায়) ইবাদতের উপর প্রতিদানও তত বেশি।

وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ اَمَةٌ يَطَاُهَا فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَاْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَآءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ

আর ওই ব্যক্তি, যার কাছে দাসী ছিলো, যার সাথে সে সহবাস করতো, তাকে উত্তম আদব শিখিয়েছে এবং ভালভাবে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে আযাদ করে দিয়ে বিয়ে করে নিয়েছে। তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।[৫০] [বোখারী ও মুসলিম শরীফ] **১১ ॥ হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানুষের সাথে জিহাদ করার, যাতে তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে,[৫১] নিশ্চয় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্'র রসূল, নামায ক্বায়েম করে এবং যাকাত দেয়।[৫২] যখন এটা করে নেবে, তখন তারা স্বীয় রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে রক্ষা করবে,[৫৩]**

৫০. একটি হচ্ছে দাসীকে আদব ও তা'লীম দেওয়ার এবং আযাদ করার সাওয়াব, অপরটি হচ্ছে তাকে বিয়ে করার সাওয়াব।

৫১. এখানে حَتّٰى ,كَىْ অর্থে ব্যবহৃত। যেমন- اَسْلَمْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ الْجَنَّةَ (আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি যাতে বেহেশতে প্রবেশ করি)। সুতরাং হাদীস শরীফে এর অর্থ হবে- আমার প্রতি আল্লাহ্'র নির্দেশ হয়েছে যেন আমি রাজ্যজয় কিংবা সম্পদ অর্জনের মানসে জিহাদ না করি, বরং মানুষকে হিদায়ত করার উদ্দেশ্যেই জেহাদ করি। এ অর্থের ভিত্তিতে আলোচ্য হাদীসের উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হবে না যে, 'এটা তো ক্বোরআনের আয়াতের বিরোধী এবং اَلنَّاس দ্বারা সমস্ত কাফির বুঝায়।' সুতরাং এ حَتّٰى অব্যয়টি 'শেষ পর্যন্ত' বুঝানোর জন্য নয়।

স্মর্তব্য যে, আরবের মুশরিকদের জন্য 'জিযিয়া কর'-এর বিধান নেই। তারা হয়তো ঈমান আনবে, নতুবা হত্যা করা হবে কিংবা কয়েদ ও দাসত্ব ইত্যাদি করবে। মহান রব এরশাদ করেন- وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ (এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন, যতক্ষণ না ফিৎনা থাকে।)[২:১৯৩] আরবের আহলে কিতাব এবং অনারবীয় সমস্ত কাফিরের জন্য বিধান হচ্ছে- হয়তো তারা ঈমান আনবে অথবা 'জিযিয়া' (কর) দেবে; নতুবা হত্যা বা কয়েদ ইত্যাদি বরণ করবে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ (অর্থাৎ:...যতক্ষণ তারা অপমানিত অবস্থায় সহস্তে জিযিয়া পরিশোধ করে।)[৯:২৯] মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়তো পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করবে, নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। 'জিযিয়া' বা কয়েদ তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। মহান রব এরশাদ করেন تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْيُسْلِمُوْنَ (অর্থাৎ: তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা মুসলমান হবে)। বিদ্রোহীদের বিধান হচ্ছে- হয়তো হত্যা, নতুবা বিদ্রোহ থেকে তাওবা। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ (...তবে ওই সীমানা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্'র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।)[৪৯:৯] সুতরাং আয়াত ও হাদীসসমূহ একই অর্থ জ্ঞাপক।

৫২. যেহেতু ওই সময় পর্যন্ত রোযা ও জিহাদ ইত্যাদির বিধান আসেনি, সেহেতু সেগুলো উল্লেখ করা হয় নি। বস্তুতঃ যদি কেউ নামায অথবা যাকাত অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির। তার বিরুদ্ধে কাফিরদের মত জিহাদ করা হবে। অবশ্য নামায ও যাকাত বর্জনকারীদেরকে তজ্জন্য শাস্তি দেওয়া হবে।

৫৩. যেহেতু ওই মুবারক যামানায় ইসলামে নতুন ফের্কার উদ্ভব হয়নি, কালেমা, নামায ও যাকাত ঈমানেরই আলামত ছিলো, সেহেতু এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি এ তিন কাজ করবে তার জান ও মাল নিরাপদ। বর্তমানে অনেক মুরতাদ্দ ফির্কাও কালেমা, নামায ও যাকাতের পাবন্দ রয়েছে; কিন্তু তারা মুরতাদ্দ। তাদের বিরুদ্ধে মুরতাদ্দ হবার কারণে জিহাদ করা হবে। যেমন- সিদ্দীক্ব-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু

إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ رَوَاهُ الْبُخَارِىْ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى اَعْرَابِىٌّ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهٗ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ

ইসলামের অধিকার ব্যতীত[৫৪] এবং তাদের হিসাব আল্লাহ্'র উপর ন্যাস্ত।[৫৫] এতে বোখারী ও মুসলিমের ঐকমত্য রয়েছে, কিন্তু ইমাম মুসলিম 'ইসলামের অধিকার' বাক্যাংশটি উল্লেখ করেননি। ১২ ॥ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়বে, আমাদের ক্বেবলার দিকে মুখ ফিরাবে, আমাদের যবেহকৃত পশু আহার করবে, সে ওই (ধরনের) মুসলমান,[৫৬] যার জন্য আল্লাহ্-রসূলের নিরাপত্তা রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র যিম্মা বা নিরাপত্তা ভঙ্গ করো না।[৫৭] [বোখারী শরীফ] ১৩ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক গ্রাম্য লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলো, আমাকে এমন কাজের হিদায়ত করুন, যা সম্পন্ন করলে আমি বেহেশ্‌তী হয়ে যাবো।

তা'আলা আনহু মুসায়লামা কায্‌যাবের ভণ্ড নুবূয়তে বিশ্বাসীদের সাথে জিহাদ করেছিলেন। বর্তমানেও ক্বাদিয়ানী ইত্যাদি মুরতাদ্দদের সম্পর্কে বিধান এটাই।

৫৪. অর্থাৎ যদি ইসলাম গ্রহণ করার পর হত্যা, যেনা, কিংবা ডাকাতি ইত্যাদি করে, তাহলে তারা ক্বতল ও নির্ধারিত শাস্তির উপযোগী হবে। কারণ এটা ইসলামের হক্ব; এটা কুফরের (কারণে) ক্বতল নয়।

৫৫. অর্থাৎ যদি কোন লোক মৌখিকভাবে কলেমা পড়ে এবং প্রকাশ্যভাবে নামায ও যাকাত আদায় করে, তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে জিহাদ করবো না। যদি মুনাফিক্বী করে উক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন। মুনাফিক্বদের সাথে ইসলামী জিহাদ নেই। বর্তমানের বাতিল ফির্কার লোকদের কেউ কেউ মুনাফিক বলে আখ্যায়িত হলেও যেহেতু তাদের থেকে কুফরী শব্দ পাওয়া যায়, সেহেতু তারা মুরতাদ্দ্ মুনাফিক নয়। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা অপরিহার্য।

৫৬. স্মর্তব্য যে, মু'মিনের আলামত বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ওই হিসেবে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক সময় শুধু কলেমা পড়া মু'মিনের আলামত ছিলো। নামায ইত্যাদি কোন বিধান আসে নি। তখন এরশাদ হয়েছিলো مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (যে কলেমা পড়েছে, সে জান্নাতী হয়েছে)। অতঃপর ওই সময় আসল যখন নামায ইত্যাদিও এসে গেছে। তখন এরশাদ হলো, যা আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারায় মুনাফিক্বগণও ছিলো, যারা কালেমা-নামায ইত্যাদি সম্পন্ন করেও বে-ঈমান ছিলো। তখন আল্লাহ্-রসূলের মুহাব্বত ঈমানের আলামত সাব্যস্ত হলো। যেমন এরশাদ হয়েছে, الحديث لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ... অর্থাৎ "তোমাদের কেউ মু'মিন হবেন না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট অধিকতর প্রিয় হবো...।" ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া হলো যে, শেষকালে এমন কতেক লোক সৃষ্টি হবে, যারা তোমাদের চেয়ে অধিক আবিদ ও মুত্তাক্বী হবে; কিন্তু ইসলাম থেকে খারিজ হবে। মোটকথা হচ্ছে- অবস্থানুযায়ী আলামত হবে। বর্তমানে মির্যায়ী- রাফেযী (অর্থাৎ ক্বাদিয়ানী)। প্রমুখও এসব আমল করে থাকে, কিন্তু মু'মিন নয়।

৫৭. অর্থাৎ এ মু'মিন আল্লাহ্-রসূলের নিরাপত্তায় থাকে। তোমরা তাকে নির্যাতন করো না। নতুবা তোমরা আল্লাহ্-রসূলের প্রতি খিয়ানতকারী হিসেবে গণ্য হবে। এ থেকে বুঝা গেলো, হুযূরের আশ্রয় ও নিরাপত্তা গ্রহণ করা শির্ক নয়, ঈমানেরই রুকন। এটাও জানা গেলো যে, মুত্তাক্বী-মুসলমানকে নির্যাতন করা, ফাসিক্বকে নির্যাতন করার চেয়েও অধিক মন্দ। কেননা, এতে নির্যাতনও করা হয় এবং আল্লাহ্-রসূলের প্রতি খেয়ানতও করা হয়।

قَالَ تَعۡبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشۡرِکُ بِهٖ شَيۡئًا وَّتُقِيۡمُ الصَّلٰوةَ الۡمَكۡتُوۡبَةَ وَتُؤَدِّیۡ الزَّكٰوةَ الۡمَفۡرُوۡضَةَ وَتَصُوۡمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِیۡ نَفۡسِیۡ بِيَدِهٖ لَااَزِيۡدُ عَلٰى هٰذَا شَيۡئًا وَّ لَااَنۡقُصُ مِنۡهُ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِیُّ ﷺ مَنۡ سَرَّهٗ اَنۡ يَّنۡظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنۡ اَهۡلِ الۡجَنَّةِ فَلۡيَنۡظُرۡ اِلٰى هٰذَا۔ مُتَّفَقٌ عَلَيۡهِ وَعَنۡ سُفۡيَانَ ابۡنِ عَبۡدِ اللّٰهِ الثَّقَفِیِّ قَالَ قُلۡتُ يَارَسُوۡلَ اللّٰهِ قُلۡ لِّیۡ فِی الۡاِسۡلَامِ قَوۡلًا لَّا اَسۡاَلُ عَنۡهُ اَحَدًا بَعۡدَکَ وَفِیۡ رِوَايَةٍ غَيۡرَکَ قَالَ قُلۡ اٰمَنۡتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسۡتَقِمۡ۔ رَوَاهُ مُسۡلِم

এরশাদ করলেন, আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, নামায ক্বায়েম করো, ফরয যাকাত প্রদান করো, রমযানের রোযা রাখো।[৫৮] সে বললো, ওই সত্তার শপথ! যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ। আমি কখনো তাতে কম-বেশি করবো না।[৫৯] অতঃপর যখন সে চলে গেলো, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, কেউ জান্নাতী মানুষকে দেখতে চাইলে, সে যেন তাকে দেখে।[৬০] [বোখারী ও মুসলিম] **১৪ ||** হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাক্বাফী[৬১] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে এমন বিষয় বলুন, যা আপনার পরে সে সম্পর্কে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করবো না।" অপর এক বর্ণনায় আছে, "আপনি ব্যতীত।" তিনি এরশাদ করলেন, "বলো, আমি আল্লাহ্'র উপর ঈমান এনেছি।" অতঃপর সেটার উপর অটল থাকো।[৬২] [মুসলিম শরীফ]

৫৮. এটা সমস্ত এবাদতের তাফসীর। যেহেতু ওই সময় পর্যন্ত জিহাদ ইত্যাদির বিধান আসে নি, অথবা তার উপর জিহাদ ফরয ছিলো না। সেহেতু জিহাদের উল্লেখ করেন নি।

৫৯. অর্থাৎ এ ফরযগুলোতে নিজের পক্ষ থেকে কমবেশি করবো না, ফজরের ফরয চার বা ছয় রাক'আত পড়বো না এবং যোহর দুই বা তিন রাক'আত পড়বো না, রোযা চল্লিশটি রাখবো না। অথবা এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে- নিজের গোত্রের লোকদের কাছে হুবহু এ বিধানগুলোই পৌঁছিয়ে দেবো। দ্বীনের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কমবেশি করবো না। অথবা এখন প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে কমবেশি করবো না। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা এটা অনিবার্য হয় না যে, ফিতরা, ক্বোরবানী, দু'ঈদের নামায, মান্নতের রোযা ও বিতর জরুরি নয়। এ বিধানগুলো ওই সময় পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় নি। পরে স্বয়ং হুযূরই বিধানগুলো সংযোজন করে এরশাদ করেছেন। সুতরাং এ হাদীস হানাফী মাযহাবের পরিপন্থী নয়।

৬০. এ থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো- এক. জান্নাতী মানুষ দেখাও সাওয়াব। বুযুর্গগণের দর্শনের কারণে গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

اٹھ جاگ فرید استیاد ل مسجد دے جا ـ مت کوئی بخشیا مل ہوئے تو بھی بخشیا جا

অর্থাৎ "হে ঘুমন্ত ফরীদ! জেগে উঠ, মসজিদে যাও। হয়তো সেখানে কোন ক্ষমাপ্রাপ্ত জান্নাতী লোক পাওয়া যাবে। তাকে দেখে হয়তো তোমাকেও ক্ষমা করা হবে।"

দুই. হুযূরের কাছে মানুষের পরিণতি তথা সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান হবার ইলম রয়েছে। তিনি জানেন কে জান্নাতী, কে দোযখী। হুযূর অবগত আছেন যে, এ মু'মিন বান্দা তাক্বওয়ার উপর ক্বায়েম থাকবে, ঈমানের উপর মৃত্যু বরণ করবে, জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৬১. তাঁর নাম সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে রবী'আহ্। উপনাম 'আবূ আমর' এবং তিনি বনী সাক্বীফ গোত্রের লোক। তিনি তায়েফের অধিবাসী। ফারূক্বে আ'যমের শাসনামলে তায়েফের শাসক ছিলেন। তাঁর থেকে মোট পাঁচটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত মুত্তাক্বী ও আবিদ ছিলেন।

৬২. আল্লাহ্'র উপর ঈমান আনার অর্থ- সমস্ত ইসলামী আক্বীদা মেনে নেওয়া। সুতরাং তাওহীদ, রিসালাত, হাশর, নশর, ফিরিশতা, জান্নাত, দোযখ সবগুলোর উপর ঈমান আনা এর অন্তর্ভুক্ত। যেমনিভাবে কাউকে পিতা মানলে তার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে আত্মীয় মানতে হয়। অর্থাৎ তাঁর পিতা আমাদের দাদা, তাঁর আওলাদ আমাদের ভাইবোন, তাঁর ভাই আমাদের চাচা হবেন। আর 'দৃঢ় থাকা' দ্বারা সমস্ত ইসলামী আমলের উপর কঠোরভাবে ও নিয়মানুসারে আমল করা বুঝায়। সুতরাং এ হাদীস ঈমান ও তাক্বওয়ার ধারক এবং এর উপর আমলকারী নিশ্চিতভাবে জান্নাতী।

وَعَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دُوِيَّ صَوْتِهٖ وَلَانَفْقَهُ مَايَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ فَقَالَ لَااِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهٗ قَالَ لَااِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَلَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكٰوةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ

১৫ || হযরত ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ[৬৩] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক নজদী লোক[৬৪] হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে বিক্ষিপ্ত চুল নিয়ে হাযির হলো; যার কথার গুঞ্জনধ্বনি তো আমরা শুনছিলাম কিন্তু বুঝতে পারছিলামনা- সে কি বলছিলো। অবশেষে লোকটি হুযূর-ই আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকটে পৌঁছে গেলো। তখন সে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায রয়েছে। বললো, এগুলো ব্যতীত আমার কি আরো নামায আছে? হুযূর এরশাদ ফরমালেন, নেই।[৬৫] হ্যাঁ, যদি চাও নফল পড়তে পারো।[৬৬] হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, রমযান মাসের রোযা। লোকটি আরয করলো, এ ছাড়া আমার উপর কি আরো কিছু রয়েছে? এরশাদ করলেন, নেই; তবে নফল সম্পন্ন করতে পারবে। বর্ণনাকারী বললেন, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম তার উদ্দেশ্যে যাকাতের কথাও উল্লেখ করেছেন। লোকটি বললেন আমার দায়িত্বে কি আরো কিছু রয়েছে? এরশাদ করলেন, নেই; কিন্তু নফল আদায় করতে পারবে।[৬৭]

মহান রব এরশাদ ফরমান, اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا.. অর্থাৎ নিশ্চয় যারা বলেছে, 'আমাদের রব আল্লাহ' অতঃপর সেটার উপর স্থির রয়েছে...।৪১:৩০।
এই কলেমাগুলো 'জাওয়ামিউল কালিম' (অধিক অর্থবোধক স্বল্প বচন)-এর অন্তর্ভুক্ত।

৬৩. তাঁর উপনাম 'আবূ মুহাম্মদ'। তিনি ক্বুরশী (ক্বোরাঈশ বংশীয় লোক)। তিনি হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ভাতিজা ও প্রথম যুগের মুসলমান। সকল জিহাদে তিনি হুযূরের সাথে ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে হুযূরের ঢাল হয়ে ছিলেন এবং চব্বিশটি আঘাত পান। তাঁর বরকতময় শরীরে সর্বমোট ৭৫টি জখম ছিলো, যেগুলো তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে পেয়েছিলেন।
হিজরি ৩৬ সনে উষ্ট্রের যুদ্ধে বসরায় শহীদ হন। সেখানেই তাঁর নূরানী মাযার শরীফ বিদ্যমান। আমিও ওই মাযার-ই পাকের যিয়ারত করেছি। হুযূর তাঁর দা'ওয়াত দেওয়ার ঘটনা ও দাওয়াতের মধ্যে যেসব মু'জিযা তাঁর ঘরে প্রকাশ পেয়েছিলো, সেগুলো প্রসিদ্ধই।

৬৪. নজদ হচ্ছে আরবের একটি প্রদেশ। যা মক্কা মু'আযযমা ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এ প্রদেশ সম্পর্কে হুযূর কল্যাণের দো'আ করেন নি এবং সেখান থেকে ওহাবী ফির্কার অশুভ উদ্ভবের সংবাদ দিয়েছেন, যা এ কিতাবের শেষভাগে ইনশা আল্লাহ্ বর্ণিত হবে।

৬৫. অর্থাৎ এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া অন্য কোন ফরয নামায নেই। দু'ঈদের নামায ও বিতরের নামায ওয়াজিব। জুমু'আহ'র নামায যোহরের নামাযের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং এটা ওই পাঁচ ওয়াক্তের অন্তর্ভুক্ত।

৬৬. নফল দ্বারা শাব্দিক অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য, ফরযের উপর অতিরিক্ত। মহান রব ফরমাচ্ছেন فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ (অতঃপর আপনি তাহাজ্জুদ পড়ুন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত।১৭:৭৯।)। সুতরাং এতে বিতর ও দু'ঈদের নামায অন্তর্ভুক্ত। অথবা ওই সময় পর্যন্ত এসব নামায ইসলামে আসে নি। মোট কথা, এ হাদীস বিতর ও দু'ঈদের নামাযের বিরোধী নয়। হানাফী মাযহাবের ইমামদের পরিপন্থীও নয়।

৬৭. এ বাক্যও ক্বোরবানী এবং ফিতরা ওয়াজিব হবার বিরোধী নয়, যা পূর্বের টীকার আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়।

قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَيَقُوْلُ لَاَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اَتَوُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ الْقَوْمُ اَوْ مَنِ الْوَفْدُ؟ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَّلَانَدَامٰى

বর্ণনাকারী বললেন, লোকটি এটা বলতে বলতে চলে যাচ্ছিলো, আমি এর চেয়ে বেশিও করবো না এবং কমও করবো না। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি লোকটি তার কথায় সত্যবাদী হয়, তাহলে সফলকাম হবে।[৬৮] (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

১৬ ‖ হযরত ইবনে আব্বাস[৬৯] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল ক্বায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল[৭০] যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে আসলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা কোন্ গোত্র কিংবা কোন্ দল? আরয করলো, আমরা রবী'আহ্ গোত্রের[৭১]। হুযূর এরশাদ করলেন, এ প্রতিনিধিদল বা গোত্র অত্যন্ত উত্তমভাবে এসেছে, অপমানিতও হয়নি, লজ্জিতও হয়নি।[৭২]

৬৮. অর্থাৎ যদি খাঁটি অন্তরে ওয়াদা করে থাকে তাহলে সফল হবে।
অথবা, যদি ওই ওয়াদাকে পূর্ণ করে দেখায়, তবে সে সফলকাম হবে।
বুঝা গেলো যে, নজদীদের নির্ভরযোগ্যতা নেই। কেননা এর পূর্বে এক প্রশ্নকারীকে এমনই প্রতিশ্রুতির উপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সফলতা ও কৃতকার্যতার অকাট্য মন্তব্য করেছেন। এ নজদীর এ সব কথার উপর সফলতাকে শর্তযুক্ত করেছেন।

৬৯. তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তিনি হুযূরের চাচাত ভাই। তাঁর মাতা হলেন লুবাবাহ্ বিনতে হারিস অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনার সহোদরা।
তিনি হিজরতের ৩ বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন ১৩ বছর তখন হুযূরের ওফাত হয়। তাঁর উপাধী হচ্ছে حَبْرُ الْاُمَّةِ (হাবরুল উম্মাত) অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর বড় আলিম। তিনি তাফসীর-ই ক্বোরআনের ইমাম।
শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হিজরি ৬৮ সনে তায়েফে ৭১ বছর বয়সে ওফাত পান। তায়েফে তাঁর মাযার শরীফ রয়েছে। আমি যিয়ারত করেছি।

৭০. وفد গোত্রের ওই প্রতিনিধিদলকে বলা হয়, যারা নিজ গোত্রের পক্ষ থেকে বাদশাহ্ কিংবা গভর্নরের দরবারে কোন পয়গাম কিংবা অভিনন্দন নিয়ে হাযির হয়। অথবা তাদের পক্ষ থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে থাকে। তাঁরা ছিলেন ১৪ জন। তাঁরা আবদুল ক্বায়স গোত্রের তরফ থেকে ঈমান এনেছিলেন এবং হুযূরের নিকট থেকে ইসলামের বিধি-বিধান জানার জন্য হাযির হয়েছিলেন।
এ গোত্রের অবস্থান বাহরাইন, ক্বোতায়ফ ও হিজর ইত্যাদি জনপদে ছিল। আবদুল ক্বায়স তাদের পূর্বপুরুষের নাম ছিলো। তাদের বংশধারা- রবী'আহ ইবনে নাযার ইবনে মা'দ ইবনে আদনান পর্যন্ত পৌঁছে। এ জন্য এ গোত্রকে 'আবদুল ক্বায়স'ও বলা হয় এবং 'রবী'আহ'ও।

৭১. এ প্রশ্নোত্তর উপস্থিত লোকদেরকে শুনানোর জন্যই। হুযূর তো এগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন। মিরক্বাতে এই স্থানে উল্লেখ করা হয় যে, প্রতিনিধিদল যখন মদীনা মুনাওয়ারার নিকট পৌঁছলো, তখন হুযূর উপস্থিত লোকদেরকে সংবাদ দেন যে, আবদুল ক্বায়সের প্রতিনিধিদল আগমন করছে, যারা প্রাচ্যের উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।
তাদের মধ্যে আশাজ্জ'ও ছিলেন, যাঁর নাম মুনযির। জিজ্ঞেস করাটা অবগত না হবার কারণে নয়। মহান রবও জিজ্ঞেস করেছিলেন وَمَاتِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَامُوْسٰى অর্থাৎ হে মূসা! তোমার ডান হাতে কি?

৭২. এ বাক্যগুলো হয়তো দো'আ অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহ কখনও তোমাদেরকে লজ্জিত না করুন!
অথবা তা 'খবর' বা সংবাদসূচক, অর্থাৎ উত্তম হয়েছে। তোমরা সানন্দে মুসলমান হয়ে হাযির হয়ে গেছো। অন্যথায় কিছুদিন পর ইসলামী সৈন্যদল তোমাদের রাজ্য জয় করে নিতো। এতে তোমরা অপমানিত ও লজ্জিত হতে। এখন সসম্মানে ঈমান সহকারে এসেছো।

قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّالَانَسْتَطِيْعُ اَنْ نَّاْتِيَكَ اِلَّا فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا حَىٌّ مِّنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهٖ مَنْ وَّرَآءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوْهُ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ قَالَ اَ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِا للّٰهِ وَحْدَهٗ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ اِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ

তারা আরয করলো, এয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার কাছে শুধু সম্মানিত মাসগুলোতেই আসতে পারি।[৭৩] কেননা, আমাদের ও আপনার মধ্যখানে কাফির 'মুদ্বার' গোত্রের বাধা রয়েছে।[৭৪] সুতরাং আমাদেরকে চূড়ান্ত সংবাদ জানিয়ে ধন্য করুন, যে সংবাদ আমরা আমাদের গোত্রের অবশিষ্ট লোকদেরকেও জানিয়ে দিবো। আর আমরা জান্নাতে পৌঁছে যাবো।[৭৫] তারা হুযূরের কাছে পানীয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন হুযূর তাদেরকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন এবং চারটি জিনিস নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্'র উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা কি জানো শুধু আল্লাহ্'র উপর ঈমান আনা কি? তারা বললো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই জানেন।[৭৬] তিনি এরশাদ করলেন, এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত এবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই এবং মুহাম্মদ (মুস্তফা) আল্লাহ্'র রসূল।[৭৭] আর (তিনি আদেশ দিলেন-) নামায ক্বায়েম করার, যাকাত দেওয়ার এবং রমযানের রোযা রাখার।[৭৮]

৭৩. এখানে জাতীয় মাসগুলো বুঝানো উদ্দেশ্য। আমরা প্রতিবছর শুধু চারটি সম্মানিত মাসেই সফর করে আপনার কাছে আসতে পারি। সম্মানিত মাস চারটি ছিলো- রজব, যিলক্বদ, যিলহজ্ব ও মুহাররম। মাসগুলোতে কাফিররাও হত্যা এবং লুণ্ঠপাট করতো না; রাস্তায় নিরাপত্তা থাকতো। সহজভাবে সফর করা যেতো। এ জন্যই এটা আরয করছেন।

৭৪. যারা অন্য মাসগুলোতে লুঠতরাজ করতো। এ কারণে সফর বন্ধ থাকতো।

৭৫. ওই সব আক্বাইদ ও আমলের কারণে আমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করবেন এবং জান্নাত দান করবেন।

স্মর্তব্য যে, জান্নাত আল্লাহ্'র অনুগ্রহ দ্বারা অর্জিত হবে। এ আমলগুলো ওই অনুগ্রহ অর্জন করার মাধ্যম মাত্র।

৭৬. এটা আদব বশতঃ আরয করেছিলেন। অন্যথায় এসব লোক ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। মু'মিন তার ঈমান সম্পর্কে অনবহিত হয় না। [মিরক্বাত]

সম্মানিত সাহাবীদের আদব এছিলো যে, তাঁদের জানা থাকলেও হুযূরের সম্মুখে কোন কিছু আগে ভাগে বলতেন না। এ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রভূত জ্ঞান দান করেছেন।

৭৭. এ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূরের উপর ঈমান আনা ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনা অসম্ভব। 'ঈমান বিল্লাহ্' (আল্লাহ্'র উপর ঈমান)-এর ব্যাখ্যায় রিসালাতের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। 'শাহাদাৎ' বা সাক্ষ্য মানে 'অন্তরের সাক্ষ্য'। অর্থাৎ মেনে নেওয়া ও ক্ববূল করা। অন্যথায় মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের অঙ্গ নয়; বরং 'ইসলামী আহকাম' জারি হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত মাত্র।

৭৮. নামায, রোযা ইত্যাদি ঈমানের তাফসীর নয়; বরং এগুলো ঈমানের সাথে 'মা'তূফ' বা সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ তাদেরকে ঈমান আনার নির্দেশও দিয়েছেন এবং নামায, রোযা ইত্যাদির নির্দেশও। সুতরাং اِقَامُ ইত্যাদিতে 'যের' সহকারে পড়া চাই।

যেহেতু ঈমান আমলের চেয়ে অগ্রগণ্য, সেহেতু ঈমানের পর এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু তখনও হজ্জের হুকুম আসেনি, সেহেতু সেটার উল্লেখ নেই। হজ্জ ৯ম হিজরিতে ফরয হয়েছিলো।

وَاَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّآءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ اِحْفَظُوْهُنَّ وَ اَخْبِرُوْابِهِنَّ مَنْ وَّرَآءَكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهٗ لِلْبُخَارِيِّ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَوْلَهٗ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَّاتُشْرِكُوْ بِاللّٰهِ شَيْئًاوَّلَاتَسْرِقُوْاوَلَا تَزْنُوْا وَلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَاتَاْتُوْابِبُهْتَانٍ

তিনি আরো এরশাদ করলেন- গনীমতের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করবে।[৭৯] আর চারটি জিনিস নিষিদ্ধ করলেন, শরাবপাত্র, কদুর পাত্র, লাকড়ির পেটরা এবং আলকাতরা লাগানো পাত্র।[৮০] হুযূর এরশাদ করলেন, এগুলো তোমরা নিজেরাও মনে রেখো, অন্যদেরকেও এগুলো জানিয়ে দাও।[৮১] [মুসলিম ও বোখারী শরীফ এবং বর্ণিত বচনগুলো বোখারী শরীফের] **১৭ ॥ হযরত** ‘ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[৮২] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তাঁর আশেপাশে সাহাবীদের একটি দল উপস্থিত ছিলো,[৮৩] তোমরা আমার নিকট এ মর্মে বায়'আত করো[৮৪] যে, আল্লাহ্'র সাথে তোমরা কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, নিজেদের সামনে রচিত অপবাদ দেবে না[৮৫]

---

৭৯. যেহেতু ওই সময় জিহাদ ফরয হয়েছিলো এবং এসব লোক জিহাদের উপযোগী ছিলেন সেহেতু তাদেরকে জিহাদের আহকাম বা বিধানগুলো এরশাদ করেছেন। অর্থাৎ যদি তোমরা মুদ্বার গোত্রের কাফিরদের সাথে জিহাদ করো, তাহলে গনীমতের যে মাল তোমরা অর্জন করবে, তা থেকে এক পঞ্চমাংশ পাঠিয়ে দেবে এবং চার অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। মহান রব এ সম্পর্কে ফরমাচ্ছেন وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ...الاية (অর্থাৎ এবং জেনে রেখো যে, তোমরা যা কিছু গনীমত হিসেবে লাভ করো...। ৮:১১)

৮০. এগুলো মদের চারটি পাত্র: حَنْتَمٌ (খিনতাম) মদের ছোট কলসি, دُبَّاءٌ (শুকনো-শক্ত কদুর শূন্য খোলস, যা জগের মত ব্যবহার করা হতো), نَقِيْرٌ (গাছের শিকড়, যাকে খুদাই করে তাতে শরাব রাখত), مُزَفَّتٌ (শরাব পান করার পাত্র)। যেহেতু ওই সময় মদ প্রাথমিকভাবে হারাম করা হচ্ছিলো, সেহেতু ওই পাত্রগুলো যদি ব্যবহার হতে থাকে, তাহলে হয়তো তাদের বর্জিত মদের কথা আবার স্মরণ হয়ে যাবে। এ জন্যই এগুলোর ব্যবহারও হারাম করে দেওয়া হয়েছিলো। অতঃপর কিছুদিন পর এ হারাম হওয়া রহিত হয়ে যায়। অন্য বর্ণনায় এমনি রয়েছে।

৮১. অর্থাৎ তোমরা আলিম এবং আমলকারীও হবে, মুবাল্লিগও হবে। দ্বীনের প্রচারণার জন্য পূর্ণাঙ্গ আলিম হওয়া পূর্বশর্ত নয়। যে সহীহ মাসআলা জানবে, তাই প্রচার করবে। এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, হারাম থেকে বাঁচার জন্য হারাম আসবাবপত্র এবং উপকরণাদিও দূর করা প্রয়োজন। সর্দিকে প্রতিহত করো, তবে জ্বর হতে রক্ষা পাবে। ইঁদুর নিধন করো, যাতে প্লেগ রোগ বিস্তার লাভ না করে। গান ও অশ্লীল কার্যকলাপ বন্ধ করো। যাতে ব্যভিচার বন্ধ হয়।

৮২. তাঁর নাম ‘ওবাদাহ্’। উপনাম আবুল ওয়ালীদ। তিনি আনসারের ‘নক্বীব’(দলপতি)। আক্বাবার ১ম ও ২য় বায়'আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ক্বোরআন সঙ্কলকদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। বদরসহ সকল জিহাদে শরীক হন। ফারূক্ব-ই আ'যম এর যুগে সিরিয়ার কাযী (প্রধান বিচারপতি) ছিলেন। হামাস (ফিলিস্তিন) নামক স্থানে তিনি অবস্থান করেন। ফিলিস্তিনের রামাল্লায় ৭২ বছর বয়সে, হিজরী ৩৪ সনে ওফাত পান।

৮৩. عِصَابَةٌ শব্দটি عُصْبَةٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ ‘মজবুত হওয়া’। এখানে ১০ থেকে ৪০জন পর্যন্ত মানুষের দলকে عِصَابَةٌ বলা হয়।

৮৪. এটা ‘তাক্বওয়ার বায়'আত’ অর্থাৎ ভবিষ্যতে শিরক, চুরি, যিনা ইত্যাদি করবে না। অন্যথায় সাহাবীদের এ দল ‘ইসলামের বায়'আত’ তো এর আগেই করে নিয়েছিলেন। আজকাল পীর-মাশাইখের হাতে তাক্বওয়ার যে বায়'আত করা হয়, তার উৎস হচ্ছে এ হাদীস শরীফ। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের কাছ থেকে জিহাদের বায়'আতও নিয়েছিলেন।

৮৫. যেহেতু আরবে এ পাপগুলো অধিক হারে প্রচলিত ছিলো; বরং যিনা এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত

تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَاتَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَ مَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهُوَاِلَى اللّٰهِ اِنْ شَآءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَآءَ عَاقَبَهٗ فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

এবং কোন উত্তম বিষয়ে নির্দেশ অমান্য করবে না।[৮৬] তোমাদের মধ্যে যে অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার সাওয়াব আল্লাহ্'র বদান্যতার দায়িত্বে থাকবে।[৮৭] আর যে ব্যক্তি এগুলো থেকে কোন একটি[৮৮] সম্পন্ন করে বসবে এবং দুনিয়ায় শাস্তি ভোগ করে নেবে তবে ওই শাস্তি সেটার কাফ্ফারা হবে।[৮৯] আর যে এগুলোর কোনটি করে ফেলে অতঃপর মহান রব তা গোপন রাখেন[৯০] তাহলে তা আল্লাহ্'র নিকট গচ্ছিত থাকবে; যদি চান ক্ষমা করে দেবেন, যদি চান শাস্তি দেবেন।[৯১] সুতরাং আমরা তাঁর নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করলাম। [বোখারী ও মুসলিম]

করার উপর গর্ব করতো, সেহেতু হুযূর এগুলো তাকীদসহকারে নিষেধ করেছেন। যেহেতু 'বুহতান' বা মিথ্যা অপবাদ শুনেও দেওয়া যায় এবং রচনা করেও দেওয়া যায়। তবে বানিয়ে অপবাদ দেওয়াটা অধিকতর জঘন্য অপরাধ, সেহেতু এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কোন কোন নারী অন্যের সন্তান নিয়ে নিজের স্বামীকে বলতো এটা তোমার সন্তান, যা আমি প্রসব করেছি। এ মহান বাণীতে এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। তখন 'সম্মুখে' দ্বারা লজ্জাস্থান বুঝাবে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, বংশ পরিবর্তন করা কঠোর অপরাধ।

৮৬. না আমার, না আলিমদের, না শাসকদের, না মাতাপিতার, না শায়খের; বরং যে-ই ভাল কথার (কাজের) আদেশ দেয়, তার কথা মানো।

স্মর্তব্য যে, হুযূর যেকোন আদেশই দিন না কেন, তা উত্তমই। যদি তিনি নামায ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন, তখন নামায পড়া হারাম হয়ে যায়। হুযূরের নির্দেশগুলোর আনুগত্য করা নিঃশর্তভাবে ওয়াজিব (অপরিহার্য)। পার্থিব বিষয়ে হুযূরের পরামর্শ অনুসারে আমল করা উত্তম, ওয়াজিব নয়। এখানে مَعْرُوْفٌ (মা'রূফ অর্থাৎ ভালকাজের নির্দেশ দেওয়া)-এর শর্তারোপ হুযূরের জন্য প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত।

অর্থাৎ হুযূরের যাবতীয় নির্দেশ ভালই। কারো বাহ্যিক দৃষ্টিতে মন্দ মনে হলেও তা ভাল হিসেবে মেনে নিতে হবে। যেমন রোযা রাখা, নামায পড়া ভাল কাজ, কিন্তু হুযূর নিষেধ করলে সেটা মেনে নেওয়া অপরিহার্য, অমান্য করা গুনাহ্। আর অন্যদের বেলায় শর্ত সাপেক্ষ; অর্থাৎ মন্দ বিষয়ে রাজা-বাদশাহ্'র আনুগত্য করতে নেই।

৮৭. এতে ইঙ্গিতে এরশাদ করা হয়েছে যে, আনুগত্যের বদলা দুনিয়াতেই মানুষের কাছ থেকে কামনা করবে না। নিষ্ঠা অবলম্বন করো। ইন্শা- আল্লাহ্, দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিদান পাবে।

৮৮. কুফর ব্যতীত অন্য কোন গুনাহ্, যার শাস্তি শরীয়তে নির্ধারিত আছে, যেমন- যিনা, চুরি, মদ্যপান। অথবা যার শাস্তি নির্ধারিত নেই; বরং তা'যীর বা বিচারক কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি, যেমন- পায়ুসঙ্গম ইত্যাদি। অথবা তা'যীরও নেই; যেমন- (ওযর বশতঃ) নামায ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি।

৮৯. অধিকাংশ আলিম বলেছেন যে, 'হুদূদ' ও 'তা'যীর' (যথাক্রমে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি ও বিচারক কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তিগুলো) গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়। যার পরে ওই অপরাধের শাস্তি, ইন্শা- আল্লাহ্, আখিরাতে পাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, এ শাস্তিগুলো বান্দার হক্বের কাফ্ফারা। আল্লাহ্'র হক্ব তাওবা দ্বারাই মাফ হবে। মহান রব ফরমাচ্ছেন- وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (এবং যারা তাওবা করে নি, তারা হচ্ছে যালিমই।[৪৯:১১]) কিন্তু সঠিক অভিমত হচ্ছে, গুনাহগার ব্যক্তি নিজেকে শাস্তির জন্য পেশ করে দেওয়াই তাওবা ও কাফ্ফারা।

৯০. এতে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, কেউ যেনো নিজের গোপন গুনাহ্কে প্রকাশ না করে। বান্দার হক্ব অবশ্যই পরিশোধ করবে।

৯১. এতে এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে-

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

তরজমা: আল্লাহ্ এটা ক্ষমা করেন না যে, তাঁর কোন শরীক দাঁড় করানো হবে এবং এর নিম্ন পর্যায়ের যা কিছু আছে তা যাকে চান ক্ষমা করে দেন। [৪:১১৬, তরজমা: কান্যুল ঈমান]

অর্থাৎ কুফরের উপর মৃত্যুবরণকারীর ক্ষমা নেই। বাকী সকল গুনাহ্গারের জন্য ক্ষমার অবকাশ রয়েছে।

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَآءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَآءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ

১৮ ॥ হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত,**[৯২] **তিনি বলেন, নবী করীম** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **ক্বোরবানীর ঈদ কিংবা ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে**[৯৩] **তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি মহিলাদের জমায়েতের পাশ দিয়ে গমন করলেন।**[৯৪] **তখন এরশাদ করলেন, "হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমরা বেশি করে দান করো।**[৯৫] **কেননা আমাকে দেখানো হয়েছে**[৯৬] **যে, তোমাদের অধিকাংশ দোযখের অধিবাসী।"**

৯২. তাঁর নাম শরীফ সা'দ ইবনে মালিক আনসারী। 'খুদরা' আনসারের একটি গোত্র, যার দিকে তাঁকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তিনি বড় আলিম ও হাদীস-বিশারদ সাহাবী। খন্দক্বের যুদ্ধসহ তিনি ১২টি যুদ্ধে হুযূরের সাথে অংশ নেন। তিনি ৮৪ বছর বয়সে ৬৪ হিজরি সনে ওফাত পান। জান্নাতুল বক্বী'তে তাঁকে দাফন করা হয়। আমিও তাঁর নূরানী কবরের যিয়ারত করেছি।

৯৩. অর্থাৎ শহরের বাইরে। স্মর্তব্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'ঈদের নামায ময়দানে সম্পন্ন করতেন। যদিও মসজিদ-ই নবভী শরীফ মদীনা মুনাওয়ারায় সর্বোত্তম। বুঝা গেলো যে, এ দু'টি নামায ময়দানে সম্পন্ন করা সুন্নাত। যদিও শহরের অভ্যন্তরে (এবং মসজিদে) সম্পন্ন করাও জায়েয।

৯৪. যাঁরা ঈদগাহে নামায সম্পন্ন করতে গিয়েছিলেন। হুযূরের যামানায় সমস্ত মহিলার জন্য ঈদগাহে উপস্থিত থাকার বিধান ছিলো, যাতে তারা শরীয়তের আহকাম (বিধি-বিধান) শুনতে পারেন এবং ঈদের নামাযে কিংবা কমপক্ষে মুসলমানদের সাথে দো'আয় শরীক হতে পারেন। তাঁরা পুরুষদের থেকে আলাদা বসতেন। হুযূর খুতবার পর তাঁদের জামায়েতে বিশেষ ওয়ায করতেন। ফারূক্ব-ই আ'যমের যামানা থেকে মহিলাদের এ উপস্থিতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৯৫. এখন জিহাদ করার জন্য সাদক্বাহ্ দাও। অথবা সর্বদা নফল সাদক্বাহ্ দিতে থাকো। কেননা, ফরয সাদক্বাহ্'র বেলায় নারী ও পুরুষ সমান। এখানে সাদক্বাহ্-ই ফিতর বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা, তা তো ঈদাগাহে আসার আগে পরিশোধ করে দেওয়া হয়।

স্মর্তব্য যে, মহিলারা নিজেদের সম্পদ থেকে সাদক্বাহ্ যে কোন অবস্থায় দিতে পারে। স্বামীর সম্পদ থেকে তার অনুমতি নিয়ে দেবে- সুস্পষ্ট অনুমতি দ্বারা হোক, কিংবা প্রচলিত অনুমতি দ্বারা হোক।

৯৬. মি'রাজে অথবা 'কাশ্‌ফ' দ্বারা। এ থেকে কয়েকটি মাসআলা জানা গেলো: **এক.** হুযূরের দৃষ্টি ভবিষ্যত ও অতীতের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে থাকে। কেননা, দোযখে প্রবেশ করা ক্বিয়ামতের পরে হবে। কিন্তু এখনই তিনি তা দেখতে পাচ্ছেন। যেমনিভাবে আমরা স্বপ্ন বা কল্পনায় আগের ও পরের বিষয়াদি দেখে থাকি। **দুই.** হুযূর আল্লাহ'র হুকুমে বেহেশতী ও দোযখীদেরকে চিনেন। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে অবগত। অথচ এগুলো 'উলূমে খামসাহ' বা পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।☆ **তিন.** নেক আমলসমূহ, বিশেষত সাদক্বাহ্ আযাবকে দূরীভূত করে দেয়, এ জন্য মৃতের জন্য তার মৃত্যুর ৩য় দিনের অনুষ্ঠান,☆☆ ১০ম দিনের ফাতেহানুষ্ঠান ইত্যাদিতে 'ঈসাল-ই সাওয়াব' করা হয়। অর্থাৎ যদি তার কবরে আগুন থাকে, তাহলে তা এগুলো দ্বারা নিভে যাবে।

☆হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খোতবা দিলেন-

فَاَخْبَرَنَا مِنْ اَوَّلِ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى يَدْخُلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ فَحَفِظَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِىَ مَنْ نَسِيَهُ

অর্থাৎ: অতঃপর তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে বেহেশতীগণ বেহেশতে আপন আপন স্তরে এবং দোযখীরা দোযখে নিজ নিজ স্তরে প্রবেশ করা পর্যন্ত সবকিছু আমাদেরকে অবহিত করলেন। অতঃপর সেগুলো যারা স্মরণ রেখেছে তারা তো স্মরণ রেখেছে, আর যারা ভুলে গেছে, তারা ভুলে গেছে। [বোখারী শরীফ]

☆☆আমাদের দেশে প্রচলিত ৪র্থ দিনের ফাতিহা এবং এখানে উল্লিখিত ৩য় দিনের ফাতিহা একই কথা। মৃত্যুর দিন বাদ দিয়ে হিসাব করলে ৩য় দিনে উক্ত ফাতিহা অনুষ্ঠান হয়, আমাদের দেশে মৃত্যুর দিনসহ হিসাব করে ৪র্থ দিনে উক্ত ফাতিহা করা হয়। সুতরাং এভাবে ৩য় কিংবা ৪র্থ দিন বাদ দিয়ে ফাতিহাকে ৫ম দিন পর্যন্ত বিলম্ব করা ঠিক নয়।

فَقُلْنَ وَبِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَارَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَّدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدٰيكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْاَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ بَلٰى - قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا - قَالَ اَلَيْسَ اِذَاحَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ بَلٰى - قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

তারা বললো, "হুযূর এটা কেন?" এরশাদ করলেন, "তোমরা অভিসম্পাত-সমালোচনা অধিকহারে করে থাকো।[৯৭] স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ।[৯৮] আমি তোমাদের চেয়ে কম বিবেকসম্পন্ন, দ্বীনে ত্রুটিপূর্ণ এবং বিবেকবান মানুষের বিবেক হরণকারী কাউকে দেখিনি।"[৯৯] মহিলারা আরয করলো, "হুযূর! আমাদের দ্বীন ও বিবেকের ঘাটতি কিভাবে?" হুযূর এরশাদ করলেন, "এটা নয় কি, মহিলাদের সাক্ষী পুরুষের সাক্ষীর অর্ধেক?"[১০০]তারা বললো, "হ্যাঁ।" হুযূর এরশাদ করলেন, "এটাই মহিলাদের বিবেকের ঘাটতি।" তিনি আরো এরশাদ করলেন, "এটা কি ঠিক নয় যে, মহিলারা ঋতুস্রাবের সময় নামায-রোযা সম্পন্ন করতে পারেনা?"[১০১] তারা বললো, "হ্যাঁ।" হুযূর এরশাদ করলেন, "এটাই হচ্ছে তাদের দ্বীনের ঘাটতি।"[বোখারী, মুসলিম]

৯৭. রাগান্বিত অবস্থায় সন্তানের উপর এবং ঝগড়ায় প্রতিপক্ষের উপর। এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, অধিক অভিসম্পাত করা দোযখী হবার কারণ। এ থেকে ওই সকল লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যাদের মতবাদে সম্মানিত সাহাবীদেরকে গালি দেওয়া ও লা'নত করা এবাদত। (না'উযু বিল্লাহ) যেখানে নমরূদ, ফির'আউন, হামান এমনকি শয়তানকেও গালি দেওয়া এবং লা'নত করা জায়েয হলেও সাওয়াবের কাজ নয়, সেখানে বুযর্গদেরকে গালি দেওয়া কোথাকার মানবতা?

মাসআলা: কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর লা'নত করা জায়েয নয়, ওই সকল কাফির ব্যতীত, যাদের কুফরের উপর মৃত্যু হওয়া নাস্ (ক্বোরআন-হাদীস) দ্বারা প্রমাণিত। অনির্দিষ্টভাবে গুনাহ্গারের উপরও লা'নত করা জায়েয। উদাহরণস্বরূপ, এটা বলতে পারবে, "কাফিরদের উপর অথবা মিথ্যুকদের উপর লা'নত হোক।" কিন্তু এটাকে অভ্যাসে পরিণত করো না। এটা আলোচ্য হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়।

৯৮. অর্থাৎ যদি জীবনভরও স্বামীরা তোমাদের আবদার রক্ষা করে এবং একবার মাত্র কিছুতে অবহেলা করে, তাহলে তোমরা বলে থাকো, "তুমি আমার জন্য কিছুই করো নি।" যে বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্'রও কৃতজ্ঞ হতে পারে না।

৯৯. এতে নারীদের তিনটি দোষের কথা বর্ণনা করা হয়েছে- বিবেকে ঘাটতি, দ্বীনের উপর আমলে অবহেলা ও পুরুষকে নির্বোধ বানানো। এগুলো হচ্ছে মহিলাদের সাধারণ অবস্থা; যদিও কতেক মহিলা এগুলো থেকে পবিত্র। স্মর্তব্য যে, পুরুষ জাতি নারী জাতি থেকে উত্তম। যদিও কিছু সংখ্যক নারী কিছু সংখ্যক পুরুষ থেকে উত্তম। হযরত আমিনা খাতূন, হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্, হযরত ফাতিমা যাহরা প্রমুখ আমাদের ন্যায় কোটি কোটি পুরুষের চেয়েও উত্তম। সুতরাং হাদীসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকতে পারে না।

১০০. সাধারণ অবস্থায় হয়তো দু'জন পুরুষ সাক্ষী হয় অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষী মোটেই গ্রহণ করা যায় না; যেমন হুদূদ ও ক্বিসাস। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু একজন মহিলার সংবাদ গ্রহণ যোগ্য হয়। যেমন- আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় রমযানের ২৯ তারিখের চাঁদ দেখা, কিংবা হায়য-নিফাসের (যথাক্রমে, ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ) বা 'ইদ্দত' অতিক্রান্ত হবার সংবাদ। এখানে সাধারণ অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য।

১০১. অর্থাৎ একটি মেয়াদকালে নামাযের সাওয়াব থেকে এবং রোযা আদায় করার বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে।
স্মর্তব্য যে, 'হায়য' ও 'নিফাস'র সময়ে নামায সম্পূর্ণ মাফ। আর রোযা তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করা মাফ; কিন্তু পরবর্তীতে 'ক্বাযা' করা ওয়াজিব। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইবাদতে কমবেশি দ্বীনের পূর্ণতা ও অপূর্ণতার কারণ।
স্মর্তব্য যে, মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তি নামায-রোযার

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَذَّبَنِىْ ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ ذٰلِكَ فَاَمَّا تَكْذِيْبُهٗ اِيَّاىَ فَقَوْلُهٗ لَنْ يُّعِيْدَنِىْ كَمَا بَدَاَنِىْ وَلَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ اِعَادَتِهٖ وَاَمَّا شَتْمُهٗ اِيَّاىَ فَقَوْلُهٗ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَّاَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ

১৯ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন,[১০২] "মানুষ আমাকে মিথ্যারোপ করেছে, এটা তার জন্য উচিত ছিলো না এবং সে আমাকে গালি দিয়েছে; এটা তার জন্য দুরস্ত ছিলো না।[১০৩] আমাকে তার মিথ্যারোপ করা এ যে, সে বলে, 'মহান রব আমাকে পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারবে না।'[১০৪] অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার নিকট পুনর্বার সৃষ্টি করা থেকে অধিকতর সহজ নয়।'[১০৫] তার 'গালি দেওয়া' হচ্ছে তার এ প্রলাপ বকা যে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।'[১০৬] আমি তো একক ও অমুখাপেক্ষী।"[১০৭]

উপযোগী, কিন্তু হায়য ও নিফাস সম্পন্ন মহিলা ওইগুলোর উপযুক্তও নয়। সুতরাং ওরা দু'জন (মুসাফির ও রুগ্নব্যক্তি) অপূর্ণ নয়।

১০২. এটা হাদীস-ই কুদ্সী, যাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, قَالَ اللّٰهُ (আল্লাহ্ বলেছেন)। হাদীস-ই কুদসী ও ক্বোরআনের মধ্যে পার্থক্য এ যে, হাদীস-ই কুদসী স্বপ্ন এবং ইলহাম দ্বারাও অর্জিত হতে পারে, আর ক্বোরআন আসবে জাগ্রত অবস্থায়। তাছাড়া, ক্বোরআনের শব্দও মহান রবের পক্ষ থেকে আসে, কিন্তু হাদীসের বিষয়বস্তু মহান রবের, বচনগুলো হুযূরের।

স্মর্তব্য যে, সমস্ত হাদীস সত্য এবং ক্বোরআনের ন্যায় আমলযোগ্য। সিদ্দীক্ব-ই আকবর হাদীসের ভিত্তিতেই হুযূরের রেখে যাওয়া সম্পদের মধ্যে 'মীরাস' বন্টন করেন নি। অথচ মীরাস বণ্টন করা ক্বোরআনী হুকুম ছিলো। তবে হাদীসে কুদসীতে قَالَ اللّٰهُ কথাটির উল্লেখ থাকে। এর বিস্তারিত আলোচনা আমার পুস্তক 'এক ইসলাম'-এ দেখুন।

১০৩. স্মর্তব্য যে, জিন্ ও মানুষ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিতে কাফির নেই। তবে মানুষের উপর আল্লাহ্'র অনুগ্রহ বেশি। তাদের মধ্যেই নবী ও ওলীগণ প্রেরণ করেছেন। এ জন্যই বিশেষভাবে তার দোষ বর্ণনা করা হয়েছে।

১০৪. অর্থাৎ ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং সকল আয়াতের প্রতি মিথ্যারোপ করে, যেগুলোতে ক্বিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে।

১০৫. অর্থাৎ মহান রবের পক্ষে সৃষ্টি করা এবং দ্বিতীয়বার বানানো সমানভাবে সহজ। মানুষের পক্ষে প্রথমবার সৃষ্টি করা কষ্টসাধ্য, দ্বিতীয় বার বানানো সহজ। যখন কাফিররা মহান রবকে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা জানে, তখন ক্বিয়ামতকে মেনে নিতে তাদের যমের ভয় কেন?

অথচ ক্বিয়ামতে পুনরুত্থিত করা মানে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে, নতুনভাবে সৃষ্টি করা নয়। এতে ওই সকল কাফিরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্'র সত্তা ও গুণাবলীকে স্বীকার করে এবং ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করেছিলো।

১০৬. আরবের মুশরিকদের আক্বীদা এ ছিল যে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ্'র কন্যা। খ্রিষ্টানগণ হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে, ইহুদীগণ হযরত ওযায়র আলায়হিস্ সালামকে আল্লাহ্'র পুত্র বলে বিশ্বাস করে। এতে ওই তিন সম্প্রদায়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ করা আমাদের পূর্ণতা, কিন্তু আল্লাহ্'র ক্ষেত্রে হলে তা গালির শামিল। একই জিনিস একজনের জন্য পূর্ণতা, অন্য জনের জন্য ত্রুটিপূর্ণ। উপমা নয়, উদাহরণের খাতিরে বলা যায় যে, কুমারী কন্যাকে সন্তানধারিনী বলা গালি দেওয়ার নামান্তর; কিন্তু বিবাহিতার জন্য পূর্ণতা। মহান রবের শান এ ধরনের চেয়েও বহু উর্ধ্বে।

১০৭. সন্তান বিশিষ্ট লোক একাকীও নয়; কারণ সন্তান তার গোষ্ঠী, শ্রেণী ও জাতীয়তায় শরীক হয়; আবার অমুখাপেক্ষীও নয়; কেননা, মানুষ যৌন-কামনা ও তাড়নায়, কিংবা শত্রুদের ভয়ের কারণে অথবা নিজের মৃত্যুর পর ওয়ারিস হবার জন্য সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করে থাকে। মহান রব এ সকল প্রয়োজন থেকে পবিত্র। দেখুন চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি ক্বিয়ামতের আগে ধ্বংস হবে না; তাই ওয়ারিস হবার জন্য এগুলোর সন্তান-সন্ততিও নেই।

الَّذِىْ لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِّىْ كُفُوًا اَحَدٌ وَّفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَمَّا شَتْمُهٗ اِيَّاىَ فَقَوْلُهٗ لِىْ وَلَدٌ وَّ سُبْحٰنِىْ اَنْ اَتَّخِذَ صَاحِبَةً اَوْ وَلَدًا- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يُؤْذِيْنِىْ ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِىَ الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحَدٌ اَصْبَرَ عَلٰى اَذًى يَّسْمَعُهٗ مِنَ اللّٰهِ يَدْعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আমি কাউকে জন্ম দিই নি, আমাকেও কেউ জন্ম দেয় নি। আমার কোন সমকক্ষ নেই।[১০৮] হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এরূপ আছে, 'মানুষ আমাকে গালি দেয়া' হচ্ছে তার এ প্রলাপ বকা যে, আমি সন্তানের অধিকারী। আমি স্ত্রী-সন্তান গ্রহণ করা থেকে পবিত্র।[১০৯] [বোখারী] **২০ ॥** হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, আমাকে মানুষ কষ্ট দেয়,[১১০] অর্থাৎ তারা যামানাকে গালি দেয়।[১১১] অথচ 'যামানা' (সেটার নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনকারী) তো আমিই। আমিই রাত ও দিনের পরিবর্তন করে থাকি।[১১২] [বোখারী-মুসলিম] **২১ ॥** হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কষ্টদায়ক কথা শ্রবণ করে ধৈর্যধারণকারী[১১৩] আল্লাহ্'র চেয়ে কেউ নেই। তাঁর জন্য মানুষ সন্তান সাব্যস্ত করে, তারপরও তিনি তাদেরকে শান্তি ও জীবিকা দান করতে থাকেন।[১১৪] [বোখারী-মুসলিম]

---

১০৮. অথচ সন্তান পিতার একই জাতীয় হয়। অর্থাৎ মানুষের সন্তান মানুষ, বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়ে থাকে। তাহলে না'উযু বিল্লাহ্, আল্লাহ্'র সন্তান আল্লাহ্'ই হওয়া উচিত ছিলো। অথচ বান্দার স্রষ্টা আল্লাহ্ এবং সে আল্লাহ্'র সৃষ্টি। আল্লাহ্ মালিক, সে তাঁরই মালিকানাধীন। সুতরাং সমকক্ষ কোথায়?

১০৯. কেননা, স্ত্রী স্বামীর একই জাতি থেকেই হতে পারে। মানুষের স্ত্রী জিন্ ও গাভী-মহিষ হতে পারে না; যদি না'উযু বিল্লাহ্, আল্লাহ্'র স্ত্রী থাকতো তাহলে সেও তাঁর সমজাতীয় হতো' বরং তাঁর একই গোষ্ঠীর হতো। মহান রব জাতি, শ্রেণী ও গোষ্ঠী থেকে পবিত্র।

১১০. اِيْذَاء বা 'কষ্ট দেওয়া' মানে 'অসন্তুষ্ট করা'। অর্থাৎ আমার সম্পর্কে এমন সব কথা বলে, যেগুলোর কারণে আমি অসন্তুষ্ট হই। অন্যথায় মহান আল্লাহ্ দুঃখ-কষ্ট থেকে পবিত্র।

১১১. এভাবে যে, সে বলে থাকে, 'হায় যমানা! তুমি আমার উপর যুল্ম করলে। আমার অমুককে মেরে ফেললে, হায় যালেম যমানা!' অথবা আসমানকে। যেমন, মৌলভী মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী 'মর্সিয়া-ই গঙ্গূহী'তে যমানাকে ইচ্ছামত অভিশাপ দিয়েছে। এটা হারাম।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্'র হুকুমের অধীনস্থ জিনিসকে মন্দ বলা আল্লাহ্'র অসন্তুষ্টির কারণ। আল্লাহ্'র প্রিয় বান্দাদের মানহানি করাও অনুরূপ।

১১২. এভাবে যে, দিনকে নিয়ে যাই রাতকে আনি এবং এর বিপরীতও। তাছাড়া এগুলোকে ছোট-বড়, গরম-ঠাণ্ডা এবং উপকারী-অপকারী বানাই। সুতরাং এগুলোকে মন্দ বলা আমাকে দোষারোপ করার শামিল।

সার্তব্য যে, এখানে 'দাহর' (যমানা) মানে প্রকৃত প্রভাব সৃষ্টিকারী (مؤثر حقيقى) এবং উপকরণের স্রষ্টা (مسبب الاسباب) অন্যথায়, মহান রবকে 'যমানা' (دهر) বলা দুরস্ত নয় এবং 'দাহর' আল্লাহ্'র নামও নয়।

১১৩. এখানে ধৈর্য (صَبْر) মানে 'সহনশীলতা' (حلم)। এ অর্থেই আল্লাহ্'র নাম মুবারক صَبُوْرٌ কিংবা صَبَّارٌ। ওই ধরনের ধৈর্য নয়, যা অপারগতার কারণে করা হয়। সামনের বিষয়বস্তুতে এর ব্যাখ্যা রয়েছে।

১১৪. অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ্ তা'আলাকে দোষারোপ করে থাকে। আর মহান আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিতও এবং তিনি তাদের উপর সবকিছু করার ক্ষমতাও রাখেন; এতদসত্ত্বেও তাদেরকে তৎক্ষণাৎ আযাব দেন না; বরং দুনিয়ায় তাদেরকে সুস্থতা, নিরাপত্তা ও রিযক্ব দেন।

وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ اِلَّا مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَّايُعَذِّبَ مَنْ لَّا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَاتُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২২ || হযরত মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[১১৫] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি একটি লম্বা কান বিশিষ্ট বাহনের উপর হুযূরের পেছনে এভাবে সাওয়ার ছিলাম যে, আমার ও তাঁর মাঝখানে গদির লাকড়ি ব্যতীত অন্য কিছু ছিলো না।[১১৬] হুযূর এরশাদ করলেন, হে মু'আয! তুমি কি জানো আল্লাহ্'র হক্ব তাঁর বান্দার উপর কি? এবং বান্দার হক্ব আল্লাহ্'র উপর কি?[১১৭] আমি আরয করলাম আল্লাহ্ ও রসূলই ভালো জানেন। তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ্'র হক্ব বান্দাদের উপর তো এটা যে, 'তাঁর এবাদত করবে, কাউকে তাঁর শরীক বানাবে না।[১১৮] আর বান্দার হক্ব আল্লাহ্'র উপর এ যে, যে কেউ তার সাথে শরীক করে না তাকে আযাব দেবেন না।'[১১৯] আমি আরয করলাম, এয়া রসূলাল্লাহ্! আমি কি মানুষকে এ সুসংবাদ দেবো না? এরশাদ করলেন, এ সুসংবাদ দিওনা, মানুষ এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে।[১২০] [মুসলিম, বোখারী]

কেননা, দুনিয়া তাঁর 'রাহমান' (ব্যাপকভাবে দয়াশীল) গুণের প্রকাশস্থল। মৃত্যুর পর তাদেরকে নিরাপত্তাও দেন না, রুজি ইত্যাদিও দেন না। সেখানে তাঁর 'রহীম' (বিশেষ দয়া প্রদর্শনকারী) গুণের প্রকাশ ঘটবে।

১১৫. তিনি মু'আয ইবনে জাবাল আনসারী খাযরাজী। উপনাম 'আবূ আবদুল্লাহ্'। 'বায়'আত-ই আক্বাবা'য় অংশগ্রহণকারী ৭০জন আনসারের মধ্যে তিনিও ছিলেন। বদরসহ সকল যুদ্ধে হুযূরের সাথে ছিলেন। হুযূর তাঁকে ইয়েমেনের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। হযরত ওমর ফারূক্ব তাঁকে সিরিয়ার শাসক নিয়োগ করেন। 'আমওয়াস' (প্লেগ) রোগে আক্রান্ত হলে ৮৩ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। সিরিয়ায় তাঁর কবর শরীফ রয়েছে। তাঁর ফযীলত অশেষ ও অগণিত।

১১৬. অর্থাৎ সৌভাগ্য বশতঃ আমি হুযূরের অত্যন্ত নিকটে ছিলাম। আর প্রকাশ্য কথা হচ্ছে যে, এতো কাছে থেকে যে কথা শ্রবণ করা হবে, তা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে শুনা যাবে। ردیف শব্দটি ردفٌ হতে গঠিত। এর অর্থ 'পেছনে'। একটি ঘোড়া বা উটের উপর দুই ব্যক্তি সাওয়ার হলে পেছনে উপবিষ্ট আরোহীকে 'রাদীফ' বলা হয়। কোন পশুর উপর দু'ব্যক্তি সাওয়ার হওয়া তখনই নিষেধ, যখন ওই পশু দুর্বল হয়, দু'জনের বোঝা বহন করতে পারে না। সুতরাং এ হাদীস শরীফ নিষেধাজ্ঞা বিশিষ্ট হাদীস শরীফের বিপরীত নয়।

১১৭. 'হক্ব' অর্থ 'ওয়াজিব', 'আবশ্যক', 'উপযুক্ত'। বান্দার বেলায় এ তিনটি অর্থই দুরস্ত। কেননা আল্লাহ্'র এবাদত করা তাদের উপর ওয়াজিব, আবশ্যক এবং তজ্জন্য তারা উপযোগীও। মহান আল্লাহ্র জন্য এ অর্থ অন্যভাবে দুরস্ত হবে। তা এ যে, ওই দয়ালু আল্লাহ্ নিজের দয়ার দায়িত্বে নিজেই আবশ্যক করে নিয়েছেন যে, তিনি এবাদতকারীদেরকে প্রতিদান দেবেন। অন্য কেউ তাঁর উপর কিছু ওয়াজিব করতে পারে না। সুতরাং যে সকল বর্ণনায় এসেছে 'আল্লাহ্'র উপর কারো হক্ব নেই' ওইগুলো অন্য অর্থে ব্যবহৃত। তা হচ্ছে, কেউ তার উপর কিছু ওয়াজিব করতে পারে না। কেননা, তাঁকে কেউ আদেশকারী নেই। তিনিই সকলকে আদেশদাতা।

১১৮. এভাবে যে, কাউকে তাঁর সমকক্ষ বলে মানবে না, তাঁর জন্য স্ত্রী-সন্তানও সাব্যস্ত করবে না।
সুতরাং এতে অগ্নিপূজাবাদ, খ্রিষ্টবাদ ও ইহুদীবাদ সবার খণ্ডন রয়েছে। এ সকল ধর্ম হতে দূরে থাকা প্রয়োজন।

১১৯. অর্থাৎ যে কুফর করবে না, তাকে সার্বক্ষণিক শাস্তি দেবেন না। এরূপ ক্ষেত্রগুলোতে 'শিরক' কুফর অর্থে আসে এবং 'আযাব' দ্বারা সার্বক্ষণিক আযাব বুঝানো উদ্দেশ্য। নতুবা, কোন কোন গুনাহগারকেও কিছু আযাব দেওয়া হবে। -[আশি''আতুল লুম'আত ইত্যাদি]

১২০. এভাবে যে, এ কথার মর্মার্থ বুঝতে পারবে না এবং আমল ছেড়ে দেবে। কারণ তারা ভাববে যে, যখন শুধু আক্বীদার বিশুদ্ধতা দ্বারা আযাব থেকে নাজাত পাওয়া যায়, তখন নামায ইত্যাদি এবাদতের কী প্রয়োজন? এ থেকে

وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِیْفُهٗ عَلَی الرَّحْلِ قَالَ یَامُعَاذُ قَالَ لَبَّیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَیْکَ قَالَ یَامُعَاذُ قَالَ لَبَّیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَیْکَ قَالَ یَامُعَاذُ قَالَ لَبَّیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَیْکَ ثَلٰثًا قَالَ مَامِنْ اَحَدٍ یَّشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهٖ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَی النَّارِ قَالَ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُخْبِرُبِهِ النَّاسَ فَیَسْتَبْشِرُوْا؟ قَالَ اِذًا یَّتَّکِلُوْا۔

২৩ || হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাওদার উপর ছিলেন। মু'আয তাঁর পেছনে আরোহী ছিলেন। হুযূর এরশাদ করলেন, "হে মু'আয!" আরয করলেন, "হে আল্লাহ'র রসূল! আমি আপনার খিদমতে হাযির আছি।" আবার এরশাদ করলেন, "হে মু'আয!" তিনি আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার খিদমতে হাযির আছি।" হুযূর এরশাদ করলেন, "হে মু'আয!" আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্ আমি আপনার খিদমতে হাযির আছি।" তিন বার বললেন।[১২১] হুযূর এরশাদ করলেন, "এমন কেউ নেই, যে এ মর্মে সত্যিকার অর্থে আন্তরিকভাবে সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত মা'বূদ নেই এবং নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ (মুস্তফা) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ'র রসূল।'[১২২] কিন্তু আল্লাহ্ তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেবেন।"[১২৩] আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্, তবে কি আমি মানুষকে এর সংবাদ দেবো না, যাতে তারা খুশী হয়ে যায়?" হুযূর এরশাদ করলেন, "তখন তো তারা এর উপর ভরসা করে বসবে।"[১২৪]

বুঝা গেলো যে, আলিমগণ সাধারণ লোককে ওই মাসআলা বলবেন না, যা তাদের বুঝে আসে না।

স্মর্তব্য যে, হযরত মু'আয ওই সময় সুসংবাদ দেননি; বরং এ হাদীসটি 'খবর' হিসেবে কিছু সংখ্যক বিশেষ ব্যক্তিকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনের অবকাশ নেই। এর কিছু বর্ণনা সামনের হাদীস শরীফে আসছে।

১২১. হযরত মু'আযকে তিনবার ডাকা ও কোন কিছু না বলা- অধিক মনযোগী হবার জন্যই ছিলো, যাতে হযরত মু'আয হুযূরের বাণী শ্রবণ করার প্রতি পূর্ণ আগ্রহী হয়ে যান। যে কথা অপেক্ষার পর শ্রবণ করা যায়, তা খুব স্মরণ থাকে, 'লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়কা'র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ হচ্ছে 'আমি আপনার খিদমতে উপস্থিত আছি।' ছোটদের উচিত বড়দের প্রতি সর্বাবস্থায় আদব করা।

১২২. এভাবে যে, অন্তর দ্বারা তা মেনে নেবে এবং মুখে স্বীকার করবে। সুতরাং মুনাফিক্বরা এ সুসংবাদের আওতাভুক্ত নয় এবং 'সাতির' (ঈমান গোপনকারী) অর্থাৎ অন্তরে মু'মিন মুখে নিশ্চুপ ব্যক্তির উপর ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান কার্যকর হবে না। স্মর্তব্য যে, জীবনে একবার মুখে কলেমা-ই শাহাদাত পাঠ করা ফরয এবং ঈমানের স্বীকৃতি চাওয়া হলে তখনও জরুরি।

১২৩. এভাবে যে, সে দোযখে স্থায়ী হবে না। অথবা দোযখ তার অন্তর ও রসনাকে জ্বালাতে পারবে না। কেননা, এ দু'টি ঈমান ও এর সাক্ষ্যের স্থান। (দোযখ) কাফিরের হৃদয় ও দেহ উভয়কেই জ্বালাবে। মহান রব ফরমাচ্ছেন تَطَّلِعُ عَلَی الْاَفْئِدَةِ [আল্লাহ'র আগুন, যা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, তা (কাফিরদের) অন্তরসমূহের উপর সমুদিত হবে।-১০৪:৭] অথবা হাদীসের উদ্দেশ্য এটা যে, যে কাফির মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনবে এবং কোন আমলের সুযোগ পাবে না তার জন্য এ সুসংবাদ। মোটকথা, এ হাদীস শরীফ না ক্বোরআন শরীফের বিপরীত, না অন্যান্য হাদীস শরীফের পরিপন্থী। কোন মু'মিন আমলের অমুখাপেক্ষী হতে পারে না।

১২৪. হযরত মু'আয এ সুসংবাদ সকলকে পৌঁছিয়ে দেবার অনুমতি চেয়েছিলেন, এটা জানার জন্য যে, এ বিধান কি দ্বীন প্রচারের অন্তর্ভুক্ত, না আল্লাহ'র গোপন রহস্যের অন্তর্ভুক্ত! শরীয়তের বিধি-বিধান সকলের জন্য, তরীক্বতের গোপন বিষয়াবলী উপযুক্ত লোকদের বেলায় প্রযোজ্য। স্মর্তব্য যে, সাধারণ লোকেরা সুসংবাদ শুনে বেপরোয়া হয়ে যায়, কিন্তু বিশেষ ব্যক্তিগণ সুসংবাদ পেয়ে অধিক নেকী করতে থাকে। মহান রব স্বীয় হাবীবকে ফরমায়েছেন لِیَغْفِرَلَکَ اللّٰهُ...الخ (যাতে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন আপনার কারণে...;৪৮:২)। তখন হুযূর নেকী আরো বেশি করেছিলেন। হযরত ওসমান গণীর উদ্দেশে এরশাদ করেছিলেন, "যা চাও করতে পার, তুমি জান্নাতী হয়ে গেছো।" তখন তার আমল আরো বৃদ্ধি পায়।

فَاَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهٖ تَاَثُّمًا۔مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ اَتَيْتُهٗ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَامِنْ عَبْدٍ قَالَ لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ

অতঃপর হযরত মু'আয গুনাহ্ থেকে রক্ষা পাবার জন্য[১২৫] নিজের ওফাতের সময় এ সংবাদ দিয়ে দিয়েছিলেন।[১২৬] [বোখারী ও মুসলিম] **২৪ ॥ হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু**[১২৭] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে হাযির হলাম।[১২৮] হুযূরের পরনে ধবধবে সাদা কাপড় মুবারক ছিলো এবং তিনি নিদ্রাবস্থায় ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আমি আবার আসলাম। তখন তিনি জেগে গিয়েছিলেন। তিনি এরশাদ ফরমালেন, "যে কোন বান্দা 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্' পড়বে[১২৯] এবং এর উপর মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৩০] আমি আরয করলাম, "যদি সে যিনা ও চুরি করে?" এরশাদ করলেন, "যদিও যিনা ও চুরি করে।"[১৩১] আমি আরয করলাম, "যদি সে যিনা ও চুরি করে?"[১৩২] এরশাদ করলেন, "যদিও যিনা ও চুরি করে।"

১২৫. কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ইলম গোপন করবে, তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। ক্বোরআন শরীফেও ইলম গোপন করার মন্দ পরিণামের কথা এরশাদ হয়েছে।

১২৬. এটা বুঝতে পেরে যে, তাঁকে হুযূর এ সুসংবাদদানের জন্য ওই সময় নিষেধ করেছিলেন, যখন অধিকাংশ লোক নওমুসলিম ছিলো এবং হাদীস শরীফের মর্মকথা বুঝার শক্তিও কম ছিলো। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে। মানুষ অনুভূতি সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান হয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে সহীহ 'ইজতিহাদ'।

১২৭. তাঁর নাম জুনদাব ইবনে জানাদাহ্। উপনাম 'আবূ যার'। তিনি 'গিফার' গোত্রের লোক। তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পঞ্চম।

মক্কা মু'আযযামায় এসে মুসলমান হয়ে সেখানে হুযূরের নির্দেশে নিজ গোত্রে চলে যান। অতঃপর খন্দক্বের যুদ্ধের পর মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হন এবং হুযূরের সাথে অবস্থান করেন। অতঃপর 'রাবযা'য় চলে যান। সেখানে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র খিলাফতকালে হিজরি ৩২ সনে ওফাত পান।

তিনি অত্যন্ত দুনিয়া বিমুখ মুত্তাক্বী ও ইবাদতপরায়ণ সাহাবী। সম্পদ সঞ্চয় করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইসলামের প্রাক্কালেও তিনি আল্লাহ্র এবাদত করতেন।

১২৮. ঈমান গ্রহণ করার জন্য হযরত আলী মুরতাদ্বার সাথে। তাঁর ঈমান গ্রহণের আশ্চর্যজনক ঘটনা রয়েছে, যা অন্য কোন স্থানে বর্ণনা করা হবে। এখানে অন্য কোন উপস্থিতি বুঝানো উদ্দেশ্য। এ শেষোক্ত অভিমত বেশি গ্রহণীয়।

১২৯. এর অর্থ সমস্ত ইসলামী আক্বীদা মেনে নেওয়া। যেমন বলা হয়- নামাযে 'আল হামদু' পড়া ওয়াজিব। অর্থাৎ পুরো সূরাটি পড়া। অথবা ওই সময় কালেমা পড়াই মু'মিন হওয়ার চিহ্ন ছিলো। অথবা এর অর্থ এ যে, যে কাফির মৃত্যুর সময় কলেমা পড়ে মু'মিন হয়ে যায়।

১৩০. হয়তো প্রথম থেকেই গুনাহ'র কিছু শাস্তি পেয়ে অথবা শাফা'আতের পানি দ্বারা পরিষ্কার হয়ে। কেননা, মু'মিন দোযখে স্থায়ী হবে না।

১৩১. অর্থাৎ এগুলোকে হারাম মনে করে এবং নিজেকে গুনাহগার মনে করে। এ থেকে কয়েকটি মাসআলা জানা গেলো:

এক. কবীরাহ্ গুনাহ্ মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে না।

দুই. কবীরাহ্ গুনাহ্'র কারণে নেকীসমূহ বরবাদ হয়ে যায় না; কিন্তু কুফর দ্বারাই (নেকী বিনষ্ট) হয়।

তিন. যার মৃত্যু ঈমানের উপর হয় সে নিঃসন্দেহে জান্নাতী। শুরু থেকে হোক কিংবা কিছু পরে।

১৩২. আশ্চর্যান্বিত হয়ে। অর্থাৎ এত বড় গুনাহ্ করেও সে জান্নাতী থাকবে! হযরত আবূ যার চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, গুনাহর পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ব্যক্তি পাক-পবিত্র জান্নাতে কীভাবে কদম রাখবে? এটা তাঁর তখনো জানা ছিলো না যে, শাফা'আত ও রহমতের পানি অপবিত্রদেরকেও পবিত্র করে ফেলে।

قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِىْ ذَرٍّ وَكَانَ اَبُوْ ذَرٍّ اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ وَابْنُ اَمَتِهٖ

আমি বললাম, "যদিও যিনা ও চুরি করে?" হুযূর এরশাদ করলেন, "যদিও যিনা ও চুরি করে। আবূ যারের নাক ধূলোয় মলিন হওয়া সত্ত্বেও।"[১৩৩] হযরত আবূ যার যখনই এ হাদীস শরীফ বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন "যদিও আবূ যারের নাক ধূলোয় মলিন হয়ে যায়।"[১৩৪] [বোখারী, মুসলিম] ২৫ ॥ হযরত 'ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্'র প্রিয়বান্দা ও রসূল,[১৩৫] হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) আল্লাহ্'র বান্দা ও রসূল এবং তাঁর বান্দীর পুত্র,[১৩৬]

---

১৩৩. رَغْمٌ শব্দটি رغام হতে গঠিত। অর্থ খাক বা মাটি। আরবে এ শব্দটি 'অপছন্দ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যদিও তুমি অপছন্দের দরুন প্রশ্ন করতে করতে মাটিতে নাক ঘষে ফেলো, তবুও এ হুকুম বহাল থাকবে।

১৩৪. যাতে হাদীসের ভাষ্য পুরোপুরি বর্ণিত হয়। অথবা ইশক্বের দাবী অনুযায়ী। কারণ মাহবূবের তিরস্কারসুলভ সম্বোধনও আশিক্বের কাছে প্রিয় মনে হয়। সে বারংবার তা স্মরণ করে তৃপ্তি লাভ করে থাকে।

স্মর্তব্য যে, ফাসিক্ব মু'মিন শেষ পর্যন্ত জান্নাতী হবে। 'বে-দ্বীন' ও 'বদ-মাযহাব'-এর উপর জান্নাত হারাম। তার স্থায়ী ঠিকানা হলো দোযখ।

১৩৫. বান্দা-ই আ'লা এবং রসূল-ই আকমাল, যাঁর 'বান্দা হওয়া'র মাধ্যমে আল্লাহ্র 'রব হওয়া' সুস্পষ্ট হলো এবং যাঁর রিসালাত মহান রব 'ইলাহ্ হওয়া'র পরিপূর্ণ প্রকাশস্থল। সুতরাং তাঁর 'বান্দা হওয়া' ও অন্য কারো বান্দা হবার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আর বান্দারা এ বলে গর্বিত যে, আমাদের রব হচ্ছেন আল্লাহ্। 'আল্লাহ্'র কুদরতের হাত' এর উপর গর্বিত যে, তাঁর 'বান্দা' হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্। আল্লাহ্ এরশাদ ফরমাচ্ছেন- هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ (অর্থাৎ তিনিই হন, যিনি তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন।) বান্দারা মহান রবকে সন্তুষ্ট করতে চায় আর মহান রব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'কে সন্তুষ্ট করতে চান। এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى (অর্থাৎ এবং অতিসত্বর আপনার রব আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। ৯৩:৫) বান্দারা ইসলামের নৌকায় পার হবার জন্য সাওয়ার হয়েছে আর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আরোহন করেছেন পার করানোর জন্য। যেমন- জাহাজের যাত্রী ও কাপ্তান। অর্থাৎ জাহাজ যাত্রীদেরকে পার করায় আর কাপ্তান পার করান জাহাজকে। এ জন্যই একই জাহাজে যাত্রী চড়ে ভাড়া দিয়ে আর কাপ্তান চড়েন বেতন নিয়েই। যানবাহন একটিই; কিন্তু আরোহীদের শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং হুযূরের নামায, কলেমা পড়া, হজ্জ ও ক্বোরআন তিলাওয়াত দেখে এটা মনে করো না যে, হুযূর আমাদের মতই মু'মিন। এ আমলগুলো দ্বারা আমাদের সম্মান। আর হুযূরের এ আমলগুলো পালন করার কারণে ওই আমলগুলোর সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের গর্ব হচ্ছে- আমরা নামায পড়ি, নামাযের গর্ব হচ্ছে হুযূর সেটাকে (নামায) সম্পাদন করেছেন।

১৩৬. এ ঘোষণা অত্যন্ত ব্যাপক। খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা মসীহকে আল্লাহ্'র পুত্র এবং বিবি মারয়ামকে মহান রবের স্ত্রী বলতো। ইহুদীরা হযরত মসীহের নুবূওয়তকেও অস্বীকার করতো আর পূতঃপবিত্র হযরত মারয়ামকেও অপবাদ দিতো। এ একটি মাত্র বাক্যে উভয়েরই অত্যন্ত উত্তম রূপে খণ্ডন হয়ে গেছে। বর্তমান যুগের ক্বাদিয়ানী তাঁকে ইয়ূসুফ নাজ্জারের পুত্র বলে থাকে। আর হযরত মারয়াম'র সাথে তার বিয়ে সাব্যস্ত করার ধৃষ্টতা দেখায়। এতে তাদের ওই প্রলাপেরও সর্বোত্তম খণ্ডন এভাবে হয়ে গেলো যে, যদি হযরত মসীহ পিতার পুত্র হতেন, তা'হলে

وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

তিনি আল্লাহ্'র কালেমা, যা হযরত মারয়ামের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন[১৩৭] এবং আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে রূহ[১৩৮] আর জান্নাত ও দোযখ সত্য, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তার আমল অনুযায়ী।[১৩৯] ।বোখারী, মুসলিম।

তাঁর দিকেই তাঁকে সম্পৃক্ত করা হতো। ক্বোরআনও তাঁকে ঈসা ইবনে মারয়াম বলেছে। অথচ পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হচ্ছে- اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ (অর্থাৎ তাদেরকে তাদের পিতার নামে ডাকো)। ।৩৩:৫।

১৩৭. এভাবে যে, হযরত জিব্রাঈল আল্লাহ্'র হুকুমে 'কুন' (كُنْ) বলে হযরত মারয়ামের বক্ষে ফুঁক দিলেন। এতে তিনি গর্ভবতী হয়ে যান।

স্মর্তব্য যে, হযরত মসীহ্'র উপাধী 'কলেমাতুল্লাহ্' (আল্লাহ্'র কলেমা) তা হয়তো এ জন্য যে, তাঁর জন্ম 'কুন' (হয়ে যাও) কলেমা দ্বারা হয়েছে। যেমন- মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ...الاٰية (নিশ্চয় ঈসার উপমা আল্লাহ্'র নিকট আদমের উপমার মতো...আল আয়াত ।৩:৫৯।)।

হযরত আদম আলায়হিস সালামকে 'কলেমাতুল্লাহ্' এ জন্য বলা হয় না যে, তাঁর শরীরের সৃষ্টি মাটি থেকেই হয়েছিলো; শুধু তাঁর রূহ 'কুন' কালেমা দ্বারা ফুৎকার করা হয়েছে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ...الاٰية (অর্থাৎ যখন আমি তাকে সুঠাম করেছি এবং তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুৎকার করেছি...আল-আয়াত। ।১৫:২৯।) কিন্তু হযরত মসীহ'র শরীর ও রূহ উভয়ই 'কুন' দ্বারা সৃষ্ট। নুত্বফাহ্, আলাক্বাহ্, মুদগাহ্ (যথাক্রমে- শুক্রাণু, রক্তপিণ্ড ও মাংসপিণ্ড) কিছু দ্বারা হয় নি। ।মিরক্বাত।

অথবা এ জন্য যে, হযরত মসীহ্ আপাদমস্তক আল্লাহ্'র 'হুজ্জাত' বা দলীল। তিনি যেন আপাদমস্তক কলেমা। অথবা এ জন্য যে, তিনি একটি 'কালেমা' দম করে অসুস্থদেরকে সুস্থ, মৃতদের জীবিত করতেন। (এ থেকে বুযুর্গদের ঝাড়ফুঁক করা প্রমাণিত হলো।) অথবা এ জন্য যে, তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই কলেমা পড়েছিলেন। আর বলেছিলেন اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ...الخ (নিশ্চয় আমি আল্লাহ্'র বান্দা...)।।১৯:৩০।

১৩৮. مِنْهُ'র مِنْ অংশ-নির্দেশক (تبعيضية) নয় এবং এর অর্থ এ নয় যে, তিনি আল্লাহ্র অংশ; বরং مِنْ - اِبْتِدَائِيَّة; অর্থাৎ আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে শুক্রাণুর মাধ্যম ছাড়া তিনি সৃষ্ট হন। তাঁর উপাধী 'রূহুল্লাহ্'-ও। এটা হয়তো এ জন্য যে, তিনি 'রূহুল আমীন' জিব্রাঈলের ফুঁকের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছেন। অথবা এ জন্য যে, তিনি মৃত অন্তরে ঈমানের রূহ দান করেন।

১৩৯. অর্থাৎ উঁচু স্তরের মুত্তাক্বীকে জান্নাতের উঁচু স্তর দান করবেন এবং নিম্নস্তরের মুত্তাক্বীকে সেখানকার নিম্নস্তরের মর্যাদা দান করবেন। এটা ওই সকল লোকের জন্য, যারা আমলের বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে।

যারা অন্য কারো মাধ্যমে জান্নাতে যাবে, তারা তাদের সাথে থাকবে। যেমন- মুসলমানদের দুগ্ধপায়ী সন্তান এবং বিবিগণ। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম ইবনে রসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হুযূরের পুণ্যাত্মা বিবিগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আলায়হুন্না বেহেশতে প্রিয়নবীর সাথে থাকবেন।

স্মর্তব্য যে, জান্নাতে প্রবেশ ঈমানের ভিত্তিতে হবে। সেখানকার উচ্চ মর্যাদা আমলানুযায়ী হবে।

জান্নাতে প্রবেশ করা তিন ধরনের হবে:

এক. 'কসবী' (ঈমানসহকারে) আমল দ্বারা অর্জনমূলক,

দুই. 'وهبى' বা হিবাসূচক

তিন. 'আত্বাঈ' বা অনুগ্রহমূলক।

আলোচ্য হাদীস শরীফে 'অর্জনমূলক'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে।☆

☆যারা আল্লাহ্-রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের কারণে হিসাব-নিকাশ ছাড়াই বেহেশ্তে প্রবেশ করবেন, তাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ্'র রসূল দুনিয়াতেই বেহেশতের সুসংবাদ নাম ধরেই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া বোখারী শরীফের বর্ণনায় এ উম্মতের আরো সত্তর হাজার পুণ্যময় ব্যক্তি বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। তিরমিযী শরীফের বর্ণনা মতে, তাঁদের প্রত্যেকে নিজেদের সাথে এক হাজার জন করে বেহেশ্তে নিয়ে যাবেন। এতে শাফা'আতের মাসআলা এবং ওইসব উম্মতের ফযীলত স্পষ্ট হয়ে গেলো, যারা শাফা'আতের মাধ্যমে অথবা আল্লাহ্'র বিশেষ অনুগ্রহক্রমে বেহেশ্তে প্রবেশ করবেন। বিশেষ অনুগ্রহের উদাহরণ হলো- হিসাব-নিকাশের পর যখন একজন বান্দাকে দোযখে নিয়ে যাবার জন্য আল্লাহ্ ফিরিশতাদের নির্দেশ দেবেন, তখন বান্দা বারংবার পেছনের দিকে থাকাবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি বারবার কি দেখছো? তখন বান্দা বলবে, হে আল্লাহ্! আপনার 'রহমান' নামের বরকতে কোন অনুগ্রহ হচ্ছে কিনা তা-ই দেখছি। তখন আল্লাহ্'র রহমতের সাগরে ঢেউ খেলবে আর তাকে বেহেশতে নেওয়ার নির্দেশ দেবেন। তা'ছাড়া শাস্তি ভোগ করার পর যারা বেহেশতে যাবে তারাও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اُبْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلْاُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهٗ فَقَبَضْتُ يَدِىْ فَقَالَ مَالَكَ يَاعَمْرُو قُلْتُ اَرَدْتُّ اَنْ اَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا قُلْتُ اَنْ يُّغْفَرَلِىْ قَالَ اَمَاعَلِمْتَ يَاعَمْرُو اَنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهٗ وَاَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَ اَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهٗ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬ ‖ হযরত 'আমর ইবনুল 'আস্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[১৪০] তিনি বলেন, আমি (একদা) হুযূরের খিদমতে হাযির হলাম। আমি আরয করলাম, আপনার হাত মুবারক বাড়ান। আমি বায়'আত করবো![১৪১] হুযূর হাত বাড়ালেন। আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম।[১৪২] হুযূর এরশাদ করলেন, "হে আমর! এ কি হলো?" আমি আরয করলাম, "কিছু শর্ত আরোপ করতে চাই।" হুযূর এরশাদ করলেন, "কি শর্ত?" আমি আরয করলাম, "আমি যেনো ক্ষমা পেয়ে যাই।"[১৪৩] হুযূর এরশাদ করলেন, "হে 'আমর! তুমি কি জানোনা? ইসলাম পূর্বের গুনাহ্ বিলীন করে দেয়, হিজরত সেটার পূর্বের গুনাহ্ বিলীন করে দেয় এবং হজ্জও পূর্বের গুনাহ্ নিশ্চিহ্ন করে দেয়।"[১৪৪] এটা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

---

১৪০. তিনি হযরত আমর ইবনুল 'আস্ সাহ্মী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ক্বুরশী (ক্বোরাঈশ বংশীয়)। হিজরি ৫ম সনে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও ওসমান ইবনে ত্বালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা'র সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।
হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আম্মানের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। তিনি হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম'র শাসনকালে সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। তিনিই মিসর বিজয়ী। মিসরেই ৯০ বছর বয়সে হিজরি ৪৩ সনে ওফাত পান। [ইকমাল]

১৪১. এটা ইসলামের বায়'আত। বস্তুতঃ সাহাবা-ই কেরাম ইসলাম গ্রহণের সময় হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বরকতময় হাতেও বায়'আত করতেন। অর্থাৎ দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার ওয়াদা করতেন।
উল্লেখ্য, তাওবাহ্র বায়'আত, তাক্বওয়ার বায়'আত, জিহাদের বায়'আত, শাহাদাতের বায়'আত, কোন বিশেষ মাসআলার উপর বায়'আত হচ্ছে এটা ব্যতীত- বর্তমানে সাধারণভাবে পীর-মাশাইখের হাতে যে বায়'আত হয় তা তাওবা ও তাক্বওয়ার বায়'আত' হচ্ছে।
বায়'আতের সময় শায়খের হাতে হাত দেওয়া সুন্নাত। যেমনটি এ হাদীস শরীফ থেকে জানা গেলো।

১৪২. বে-আদবীর জন্য নয়; বরং তাঁকে ইখতিয়ারপ্রাপ্ত মানতেন বলেই।

১৪৩. দেখুন ক্ষমা করা আল্লাহ্'র কাজ; অথচ শর্তারোপ করছেন রসূলুল্লাহ্'র কাছে। আমরাও বলতে পারি- "হুযূর! আমাদেরকে জান্নাত দান করুন! দোযখ থেকে আমাদের নাজাত নসীব হোক।"

১৪৪. বুঝা গেলো যে, ঈমান ও সৎকাজ গুনাহ্ মাফ হবার মাধ্যম। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ (নিশ্চয় নেক কার্যাদি মন্দ কার্যাদিকে দূরীভূত করে [১১:১১৪])।
তাদের থেকে গুনাহ্ বিলীন হয়; কিন্তু বান্দার হক্বসমূহ মাফ হয় না।
নওমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে কাফির থাকাকালীন ঋণও পরিশোধ করবে এবং 'হুদূদ' (শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি) এবং 'কিসাস'ও প্রয়োগ করা হবে।
সুতরাং আলোচ্য হাদীসের উপর কোন আপত্তি নেই। অর্থাৎ এটা কেউ বলতে পারেনা যে, কুফরের যমানায় যুলম ও হত্যা করে নাও, মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করে নাও এবং পরে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও, সব ক্ষমা হয়ে যাবে। এটা অসম্ভব।

وَالْحَدِيْثَانِ الْمَرْوِيَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ وَالْاٰخَرُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ ـ سَنَذْكُرُهُمَافِىْ بَابِ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ ◆ اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُّدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ وَاِنَّهٗ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَّسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ

আর ওই দু'টো হাদীস, যেগুলো হযরত আবূ হোরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, (একটি হলো) তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন, "আমি সমস্ত শরীকের মধ্যে শির্ক হতে সর্বাধিক বেপরোয়া ও পবিত্র।" আর দ্বিতীয় (হাদীস) হচ্ছে এ যে, "অহঙ্কার ও বড়ত্ব আমার চাদর।" আমি এ দু'টি হাদীস 'রিয়া ও অহঙ্কার' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণনা করবো[১৪৫] যদি মহান আল্লাহ্ চান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৭ || হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম,[১৪৬] "এয়া রসূলাল্লাহ্, আমাকে এমন কাজের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করায় এবং দোযখ থেকে দূরে রাখে।"[১৪৭] হুযূর এরশাদ করলেন, "তুমি অত্যন্ত বড় জিনিসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছ।[১৪৮] তবে হ্যাঁ, যার জন্য আল্লাহ্ সহজ করে দেবেন, তার জন্য তা সহজ।[১৪৯] আল্লাহ্'র ইবাদত করো,[১৫০] কোন কিছুকে তাঁর সমকক্ষ জানবে না, নামায ক্বায়েম করো, যাকাত দাও, রমযানের রোযা রাখো, কা'বার হজ্জ করো।"[১৫১]

---

১৪৫. অর্থাৎ এ দু'টো হাদীস 'মাসাবীহ'তে এ অধ্যায়ে ছিলো; কিন্তু আমি প্রথম হাদীস 'বাবুর রিয়া'তে এবং দ্বিতীয় হাদীসটি 'বাবুল কিব্র'-এ আনবো। কেননা এগুলো সেখানে উল্লেখ করার উপযোগী। আমি ইন্শা- আল্লাহ্ এ হাদীসগুলোর ব্যাখ্যাও সেখানে আরম্ভ করবো।

১৪৬. তাবূকের যুদ্ধে দুপুরের সময়, যখন অত্যন্ত গরম ছিলো, তখন সমস্ত সাহাবী পৃথক পৃথকভাবে গাছের নিচে অবস্থান করলেন এবং আমি হুযূরের সাথে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। [মিরক্বাত]

১৪৭. ক্রিয়ার এ সম্বন্ধটি রূপকার্থে। কারণ (প্রকৃতপক্ষে) জান্নাত দেওয়া ও দোযখ থেকে রক্ষা করা মহান রবেরই কাজ। যেহেতু আমল সেটার মাধ্যম, সেহেতু সেটাকে 'কর্তা' সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এটা বলা যাবে যে, হুযূর জান্নাত দেন, দোযখ থেকে রক্ষা করেন। আমাদের সৎকার্যাদি অপেক্ষা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মাধ্যম (ওসীলা) গ্রহণ করা অধিকতর শক্তিশালী।

১৪৮. কেননা, দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া ও জান্নাতে প্রবেশ করা বড় নি'মাত। সুতরাং সে দু'টির মাধ্যমও বড় হবে।

১৪৯. অর্থাৎ এ 'মাধ্যম' বলে দেওয়া আমার পক্ষে সহজ। কারণ মহান রব আমাকে প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে অবগত করেছেন। অথবা ওই আমলগুলো ওই সব লোকের জন্য সহজ হবে, যাদের উপর আল্লাহ্ দয়া করেন। ঢিল নিজেই নিচের দিকে পতিত হয়। কেউ উঠালেই উপরে ওঠে। আমাদের সৃষ্টি মাটি থেকে। সুতরাং আমাদের অবস্থাও তাই।

১৫০. অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করো, যা সমস্ত ইবাদতের মূল। কেননা, ইবাদতসমূহের বর্ণনাতো সামনে আসছে। এখানে মুদ্বা-রি' (مُضَارِع) ক্রিয়াটি 'নির্দেশ' (امر) অর্থে এসেছে, বর্ণনামূলক (خبر) নয়।

১৫১. এভাবে যে, নামায দৈনিক পাঁচ ওয়াক্বত। রোযা প্রতি বছর রমযানে, যদি ধন থাকে তাহলে যাকাত প্রতিবছর এবং হজ্জ জীবনে একবার। এ কথা প্রকাশ্য যে, এখানে শুধু ফরযসমূহ বুঝানো উদ্দেশ্য, যেগুলোর উপর বেহেশ্তী

ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَآءُ النَّارَ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتّٰى بَلَغَ يَعْمَلُوْنَ۔ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَذِرْوَةِ سَنَامِهٖ۔ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔ قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ۔ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ؟

অতঃপর এরশাদ করলেন, "আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ সম্পর্কে বলে দেবো না?[১৫২] রোযা ঢাল স্বরূপ,[১৫৩] দান-খায়রাত গুনাহ্‌কে তেমনিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে[১৫৪] আর মানুষ মধ্যরাতে নামায পড়া।"[১৫৫] অতঃপর তিনি এটা তিলাওয়াত করলেন, "তাদের পার্শ্বদেশগুলো বিছানা থেকে পৃথক থাকে...يَعْمَلُوْنَ পর্যন্ত।"[১৫৬] অতঃপর এরশাদ করলেন, আমি কি তোমাকে সমস্ত কিছুর মস্তক, স্তম্ভ, পিঠের উঁচু হাড়ের চূড়া (কোহান) সম্বন্ধে বলবো না?[১৫৭] আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুন এয়া রসূলাল্লাহ্।[১৫৮] হুযূর এরশাদ করলেন, সমস্ত জিনিসের মস্তক হচ্ছে 'ইসলাম', সেটার স্তম্ভ হচ্ছে 'নামায'[১৫৯] এবং পৃষ্ঠচূড়া হচ্ছে 'জিহাদ'।[১৬০] অতঃপর এরশাদ করলেন, তোমাকে কি এ সবকিছুর মূল সম্পর্কে সংবাদ দেবো না?[১৬১]

হওয়া নির্ভরশীল।

১৫২. অর্থাৎ ওই নেক আমলসমূহ, যা বহু নেক আমলের মাধ্যম। যেমন- রোযা কুপ্রবৃত্তি দমনের মাধ্যম। কুপ্রবৃত্তি দমিত হলে মানুষ বহু নেক কাজ করতে পারে। কেননা, বাধা প্রদানকারী তো নাফ্‌স বা কুপ্রবৃত্তিই।

১৫৩. যার বরকতে রোযাদার পর্যন্ত গুনাহ্'র তীর পৌঁছে না এবং শয়তানের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

১৫৪. যেহেতু, দানশীলতায় আল্লাহ্'র ইবাদতও রয়েছে এবং বান্দাদের উপকারও রয়েছে, দরিদ্রদের চাহিদাও পূরণ হয়। কেননা, এটা গুনাহ্গুলোকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে পরশপাথর তুল্য। যে ব্যক্তি বান্দার প্রতি দয়া পরবশ হয়, মহান রবও তার প্রতি দয়া পরবশ হন।

১৫৫. অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায। পঞ্জেগানা নামাযের পর এ নামায অত্যন্ত উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন। অন্যান্য নামাযে আনুগত্যের প্রাধান্য রয়েছে। এ নামাযে ইশ্‌কের প্রাধান্য বিদ্যমান। তাছাড়া, এ নামায মহান রব বিশেষভাবে হুযূরের জন্য পাঠিয়েছেন। হুযূরের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। মহান রব ফরমাচ্ছেন- وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ (এবং আপনি রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়ুন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত।)[১৭:৭৯, তরজমা: কান্যুল ঈমান]

১৫৬. অর্থাৎ 'এশা'র পর কিছুক্ষণ ঘুমায়। অতঃপর ওঠে তাহাজ্জুদ পড়ে। উল্লেখ্য, তাহাজ্জুদের জন্য প্রথমে ঘুমানো পূর্বশর্ত। অন্যথায় বিছানার উল্লেখ হতো না।

তাহাজ্জুদের পরও শয়ন করা সুন্নাত। এটাও এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত- "বিছানা বিছানো থাকে, কিন্তু তারা মুসাল্লার উপর থাকে।"

১৫৭. এখানে দ্বীনকে উটের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর সেটার জন্য মাথা, পা ও পৃষ্ঠচূড়া সাব্যস্ত করা হয়েছে; যেমনিভাবে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উপমার নিয়ম (تخييل ও استعارة بالكناية) রয়েছে।

১৫৮. এ প্রশ্ন ও উত্তর প্রশ্নকারীকে উৎসাহ্ প্রদানের জন্যই। কেননা, অপেক্ষা করার পর যে জিনিস অর্জিত হয়, তা বেশি স্মরণ থাকে।

১৫৯. 'জিনিস' মানে 'দ্বীন'। ইসলাম ব্যতীত 'দ্বীনদারী' (ধার্মিকতা) কায়েম থাকতে পারে না; যেমনিভাবে মাথা ছাড়া জীবন থাকে না। আর নামায দ্বারা দ্বীন শক্তিশালী ও উন্নত হয়, যেমনিভাবে খুঁটি দ্বারা ছাদ স্থায়ী হয়।

১৬০. জিহাদ যেহেতু কঠিন, অথচ জিহাদ দ্বারাই দ্বীনের সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন- পিঠের উঁচু হাড় দ্বারা উটের সৌন্দর্য; অথচ সেটার পিঠের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছা অনেকটা মুশকিলও বটে।

জিহাদ অর্থ 'কষ্ট করা'। এটা জিহ্বা, বর্ম ও কলম দ্বারা করা যায়। কাফিরদের সাথে জিহাদ করা সহজ; কিন্তু নিজের নাফ্‌সের সাথে জিহাদ করা কষ্টকর। এ বাক্যে সকল প্রকার জিহাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১৬১. مِلَاك (মিলাক) বলা হয়, যা দ্বারা কোন কিছুর শৃঙ্খলা ও ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। অন্য অর্থে 'আস্‌ল-ই উসূল' বা সব কিছুর মূল।

قُلْتُ بَلٰى يَانَبِيَّ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِلِسَانِهٖ فَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهٖ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

আমি আরয করলাম, "হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহ্'র নবী।" অতঃপর হুযূর স্বীয় জিহ্বা মুবারক ধরে এরশাদ করলেন, "এটাকে সংযত রাখো।"[১৬২] আমি আরয করলাম, "এয়া নাবীয়্যাল্লাহ্! মুখের কথাবার্তার জন্যও কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে?"[১৬৩] এরশাদ করলেন, "হে মু'আয! তোমার মা তোমার জন্য ক্রন্দন করুক,[১৬৪] মানুষকে মুখের উপর কিংবা নাকের উপর উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে না, কিন্তু তাদের মুখের কর্তিত(কথা)গুলো।"[১৬৫] এ হাদীস আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। **২৮ ||** হযরত আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[১৬৬] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ভালবাসে, আল্লাহ্'র জন্য শত্রুতা পোষণ করে, আল্লাহ্'র ওয়াস্তে দান করে এবং আল্লাহ্'র জন্য বিরত থাকে,[১৬৭] সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নেয়।"[১৬৮]

---

১৬২. অর্থাৎ প্রথমে যাচাই করো, তারপর বলো। জিহ্বায় লাগাম দাও। মহান রব আমাদেরকে স্পর্শ করার জন্য দু'টি হাত, চলাফেরার জন্য দু'টি পা, দেখার জন্য দু'টি চোখ, শোনার জন্য দু'টি কান দিয়েছেন। কিন্তু কথা বলার জিহ্বা দিয়েছেন মাত্র একটি। এর কারণ হচ্ছে- কথা বলো কম, কাজ করো বেশি।

১৬৩. অর্থাৎ কথা তো সাধারণ জিনিস। সেটার জন্য পাকড়াও কেন? চুরি, যিনা, খুন ইত্যাদি গুনাহ্ পাকড়াও করার উপযোগী। কিন্তু এগুলো তো জিহ্বা দ্বারা হয় না।

১৬৪. আরবে 'মা কাঁদুক' কথাটি ভালবাসার সূরে বলা হয়। যেমন শিশুকে (পাঞ্জাবী) মায়েরা স্নেহবশতঃ বলে থাকে- اے رُڑ جائیں اُڑ پڑ جائیں উর্দূতে বলা হয়- مارنے ہتیارے ارے مٹ گئے যার অর্থ- "তুমি হারিয়ে যাও বা মরে যাও। আর তোমার মা তোমাকে কেঁদে কেঁদে খোঁজ করুক বা স্মরণ করুক।"

১৬৫. কেননা, হাত-পা দ্বারাই বেশির ভাগ গুনাহ্ সম্পন্ন হয়ে থাকে; কিন্তু জিহ্বা দ্বারা কুফর, শির্ক, গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যাপবাদ- সবকিছুই সম্পন্ন হয়ে থাকে, যেগুলো দোযখে অবমাননা ও লাঞ্ছনার সাথে প্রবেশের কারণ হয়। 'হাসা-ইদ' হচ্ছে ওই স্থান, যেখানে ফসল কেটে রাখা হয়। অর্থাৎ কর্তিত ফসলের স্তুপ। মানুষের প্রতিটি কথা আমলনামায় লিখা হয়। ওই দফতর যেন সেগুলোর স্তুপ।

১৬৬. তাঁর নাম শরীফ 'সদ্দী', উপনাম 'আবূ উমামা'। তিনি বাহিলা গোত্রের লোক। প্রথমে মিসরে ও পরে হামাসে অবস্থান করেন। ৭১ বছর বয়সে হিজরি ৮৬ সনে হামাস নগরীতেই ওফাত পান। তিনি সিরিয়ার সর্বশেষ সাহাবী। [মিরক্বাত]

১৬৭. যদিও মুসলমানের সকল কাজ আল্লাহ্'র জন্য করা চাই, কিন্তু এ চারটি কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির তাড়নায় করা হয়ে থাকে। এ জন্য এগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যখন এ কাজগুলো আল্লাহ্'র জন্য হয়ে গেলো, তখন বাকী আমলগুলোও তথা শয়ন, জাগরণ, কথা বলা এবং চুপ থাকা ইত্যাদিও আল্লাহ্'র জন্য হবে। এটা প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, আল্লাহ্'র জন্য দাতার সংখ্যা কম; কিন্তু যশ-খ্যাতির জন্য ব্যয়কারীর সংখ্যা বেশি। মহান রব সৎ গুণাবলী আমাদেরকে নসীব করুন!

১৬৮. কেননা, ঈমানের পূর্ণতা নিষ্ঠার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সিদ্দীক্বগণের দলে পৌঁছে যায়। নিষ্ঠার পরিচয় হচ্ছে- কাফির পুত্র শত্রুকে মনে হয় এবং অপরিচিত মু'মিনকেও আপন মনে হয়। কবি বলেন-

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد
فدائے یک تن بیگانہ کاشنا باشد

অর্থাৎ আল্লাহ্'র সাথে সম্পর্কহীন আপনজন হাজার থাকলেও তারা আপন নয়, বরং পর। আর আল্লাহ্'র জন্য উৎসর্গিত একজন, সে পর হলেও আপন জন।

رَوَاهُ اَبُوْ دَؤُدَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ اَنَسٍ مَعَ تَقْدِيْمٍ وَّتَاْخِيْرٍ وَّفِيْهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهٗ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَآئِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَآئِىُّ وَزَادَ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ بِرِوَايَةِ فَضَالَةَ

এ হাদীস শরীফ ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী কিছুটা পরিবর্তন করে হযরত মু'আয ইবনে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে এরূপ উদ্ধৃত করেছেন- **"নিশ্চয় সে স্বীয় ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নেয়।"**

২৯ ॥ হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "সর্বোত্তম আমল হচ্ছে- আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ভালবাসা এবং আল্লাহ্'র ওয়াস্তে শত্রুতা পোষণ করা।"[১৬৯] [আবূ দাউদ]

৩০ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "খাঁটি মুসলমান হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে[১৭০] **এবং সত্যিকার মু'মিন হচ্ছে ওই ব্যক্তি যার দিক থেকে মানুষ তার রক্ত ও মালের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে।"**[১৭১] **এটি তিরমিযী ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান-এ হযরত ফাদ্বালার বর্ণনায়**[১৭২] **এটা সংযোজনপূর্বক বর্ণনা করেছেন-**

---

১৬৯. কেননা অন্য আমলগুলো শরীর (قالب) দ্বারা সম্পন্ন হয় আর আল্লাহ্'র জন্য ভালবাসা কিংবা শত্রুতা অন্তরের আমল। প্রথমোক্তগুলো হচ্ছে শারীরিক ইবাদত আর শেষোক্তগুলো হচ্ছে অন্তরের ইবাদত। কেননা, আল্লাহ্'র জন্য ভালবাসা তখনই হবে, যখন আল্লাহ্'র সাথে মুহাব্বত হবে। আর আল্লাহ্'র মুহাব্বত তাঁর সমস্ত বিধানের মুহাব্বতের মাধ্যম।

ইমাম গাযযালী বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি বাবুর্চিকে এজন্য মুহাব্বত করে যে, তার দ্বারা উত্তম খাবার রান্না করে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করবে, তাহলে এটা আল্লাহ্'র জন্য মুহাব্বত।

আর যদি কেউ আলিম-ই দ্বীনকে এ জন্য মুহাব্বত করে যে, তাঁর কাছ থেকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করে দুনিয়া অর্জন করবে, তাহলে এটা দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বত হিসেবে গণ্য হবে। [আশি''আতুল লুম'আত]

১৭০. অর্থাৎ না কাউকে বিনা কারণে মারধর করে, না তাদের বিরুদ্ধে চোগলখুরী ও গীবত করে। হক্বের কারণে মারধর করা স্বয়ং দ্বীন। যেমন- অপরাধী থেকে ক্বিসাস লওয়া, শরীয়তের প্রয়োজনে গীবত করা স্বয়ং ইবাদত। যেমন- হাদীস বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করা হয় হাদীস সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য। এ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে এ হাদীসের বিধান প্রযোজ্য নয়।

১৭১. অর্থাৎ তার আচরণ এতই উত্তম হবে যে, মানুষ স্বভাবতই তার পক্ষ থেকে এ মর্মে নিশ্চিন্ত হবে যে, এ ব্যক্তি না আমাদের সম্পদ আত্মসাৎ করবে, না আমাদেরকে কষ্ট দেবে। মুসলমানদের এ নিশ্চিন্ত থাকা আল্লাহ্'র বড় নি'মাত। এ জন্য কোন বুযর্গ বলেছেন, কারো ঈমানী শক্তি যাচাই করার জন্য তার প্রতিবেশি এবং বন্ধুদেরকে জিজ্ঞেস কর।

এ হাদীস শরীফ থেকে ইঙ্গিতে বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'ইসলাম' প্রকাশ্য অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত এবং ঈমানের সম্পর্ক অন্তরের সাথে।

১৭২. তিনি হলেন ফাদ্বালাহ্ ইবনে ওবায়দ আওসী আনসারী। তিনি হুযূরের গোলাম। উহুদ এবং এর পরবর্তী সকল যুদ্ধে হুযূরের সাথে ছিলেন। বায়'আত-ই রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হুযূরের পরে সিরিয়ার জিহাদগুলোতে অংশ নেন। তিনি দামেস্কে বসবাস করেন। আমীর-ই মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র যুগে সেখানকার বিচারপতি ছিলেন। ৫৩ হিজরিতে সেখানেই ওফাত পান।

[মিরক্বাত ও আশি''আতুল লুম'আত]

وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا قَالَ لَا اِيمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْاِيْمَانِ ◆ اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

"'মুজাহিদ' (ধর্মীয় যোদ্ধা হচ্ছে) ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্'র আনুগত্যের মধ্যে স্বীয় নাফসের সাথে জিহাদ করে, (স্বীয় নাফ্সকে) কষ্ট দেয়,[১৭৩] খাঁটি 'মুহাজির' সে-ই, যে গুনাহ্ ও পাপাচারাদি ত্যাগ করে।"[১৭৪]

৩১ ॥ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর আমাদেরকে এটা ব্যতীত খুব কমই ওয়ায করতেন, যাতে তিনি বলতেন, "যে আমানতদার নয়, তার ঈমান নেই, যে ব্যক্তি ওয়াদা পালনকারী নয় তার দ্বীন নেই।"[১৭৫] এ হাদীস বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান-এ বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৩২ ॥ হযরত 'ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্'র রসূল',

১৭৩. কেননা, আমাদের জন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রু ও আস্তিনের সাপ হচ্ছে আমাদের নাফ্স। কাফিরদেরকে মারা সহজ; কিন্তু দুষ্ট নাফ্সকে মারা মুশকিল ব্যাপার। মাওলানা বলেন-

سہل شیرے دانکہ صفہا بشکند
شیر آں باشد کہ خود را بشکند

অর্থাৎ: এক বাঘের পক্ষে অনেক বাঘের কাতার ভেঙ্গে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করা সহজ, তবুও (সেটা প্রকৃত বাঘ নয় বরং) প্রকৃত বাঘ হচ্ছে সেটাই, যে নিজেকে ভাঙ্গতে পারে। (সুতরাং যে নিজের ব্যাঘ্ররূপী নাফ্সকে দমনে সক্ষম, সে-ই প্রকৃত বীরপুরুষ)।

১৭৪. কেননা, মাতৃভূমি শরীরের দেশ এবং গুনাহ্ হচ্ছে নাফ্স-ই আম্মারের দেশ। মাতৃভূমিকে জীবনে একবার ছাড়তে হয়, কিন্তু গুনাহ্কে প্রতিটি মুহূর্তে ছেড়ে দিতে হয়। এখানে গুনাহ্ মানে ছোট গুনাহ্ (خطاء)এবং পাপাচার (ذنوب) মানে বড় গুনাহ্।

১৭৫. অর্থাৎ আমানতদারী এবং ওয়াদা পালন করা ব্যতীত ঈমান ও দ্বীন পরিপূর্ণ হয় না। আমানতের মধ্যে ধন-সম্পদ, মানুষের ইয্যাত-সম্মান, এমনকি নারীর আপন সতীত্ব রক্ষা করা- সবই অন্তর্ভুক্ত; বরং সকল নেক আমলও আল্লাহ্'র আমানত। হুযূরের প্রতি ইশক্ব-মুহাব্বত হুযূরের আমানত। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ...الاية (নিশ্চয় আমি আমানত পেশ করেছি...)। عهد (আহ্দ)-এর মধ্যে অঙ্গীকার (ميثاق) দিবসে মহান রবের সাথে কৃত অঙ্গীকার, বায়'আতের সময় পীরের সাথে ওয়াদা, নিকাহ্'র আক্বদের সময় স্বামী বা স্ত্রীর সাথে অঙ্গীকার এবং বন্ধুর সাথে যে সব বৈধ অঙ্গীকার করা হয় সবই অন্তর্ভুক্ত। এগুলো পূর্ণ করা আবশ্যক। আর অবৈধ ওয়াদাগুলো ভঙ্গ করা অপরিহার্য। যদি কারো সাথে যিনা, চুরি, হারাম ভক্ষণ কিংবা কুফরের ওয়াদা করে, তাহলে তা অবশ্যই যেন পূরণ না করে। কেননা, এগুলো আল্লাহ্'র সাথে অঙ্গীকারের পরিপন্থী। কারণ, আল্লাহ্-রসূলের সাথে এগুলো থেকে বাঁচার জন্য ওয়াদা করেছে; তা-ই এটাই যেন পালন করে।

حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا

আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দোযখ হারাম করে দেবেন।[১৭৬] [মুসলিম শরীফ] ৩৩ ॥ হযরত 'ওসমান[১৭৭] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এটা জেনে ও মেনে নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।[১৭৮] [মুসলিম শরীফ] ৩৪ ॥ হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[১৭৯] তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দু'টি জিনিস অনিবার্যকারী।[১৮০] জনৈক সাহাবী আরয করলেন, এয়া রসূলাল্লাহ্! অনিবার্যকারী জিনিস কি কি? এরশাদ ফরমালেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র শরীক আছে জেনে মৃত্যুবরণ করলো,[১৮১]

১৭৬. এর ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে। তা হচ্ছে -এর অর্থ সমস্ত ইসলামী আক্বীদা ক্বূল করে নেওয়া। আর এর মাহাত্ম্য হচ্ছে যার আক্বাইদ বিশুদ্ধ হবে, সে দোযখে স্থায়ী হবে না। অথবা এটা দ্বারা ওই ব্যক্তিকে বুঝায়, যে ঈমান গ্রহণ করা মাত্রই মৃত্যুবরণ করে। অথবা এ হাদীস ওই সময়ের, যখন শরীয়তের বিধি-বিধান মোটেই আসে নি। মোটকথা- এ হাদীস শরীফ অপরাপর হাদীস শরীফের বিরোধী নয়।

১৭৭. তাঁর নাম 'ওসমান ইবনে আফ্‌ফান ইবনে আবুল 'আস ইবনে উমাইয়া। উপনাম 'আবূ আবদুল্লাহ্'। উপাধী 'জামি'উল ক্বোরআন'। ক্বোরাঈশ গোত্রের 'আবদে মানাফ'-এ গিয়ে তাঁর বংশধারা হুযূরের সাথে মিলে যায়। ইসলামের প্রথম দিকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের হাতে ঈমান আনেন। তিনি দুই হিজরতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১ম হিজরত করেন হাবশায় (আবিসিনিয়া/ ইথিওপিয়া) এবং ২য় হিজরত মদীনা শরীফে। তাঁর উপাধী 'যুন্নূরাঈন'ও; কেননা প্রিয়নবীর দু'কন্যা রুক্বাইয়্যাহ্ এবং উম্মে কালসূম একের পর এক তাঁর বিবাহাধীন হন। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র সন্তানদের মধ্যে (তিনি ব্যতীত) কারো বিবাহাধীনে নবীর দু'কন্যা নেই। বদরের যুদ্ধের সময় হুযূরের নির্দেশেই হযরত রুক্বাইয়্যাহ'র সেবা-শুশ্রূষার জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন। তাঁকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ দেওয়া হয়েছিলো। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি হুযূর কর্তৃক প্রেরিত হয়ে মক্কা মু'আয্‌যামায় গিয়েছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের বাম হাত মুবারককে লক্ষ্য করে ফরমালেন, "এটা ওসমানের হাত।" হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর পক্ষ থেকে বায়'আত করেন এবং বায়'আত গ্রহণ করেন। ২৪ হিজরীতে তিনি খিলাফতের আসন অলঙ্কৃত করেন। ১২বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। ৬২বছর বয়সে আস্‌ওয়াদ তাজয়ীবী মিসরীর হাতে মদীনা মুনাওয়ারায় ক্বোরআন পাঠরত অবস্থায় শহীদ হন। জান্নাতুল বাক্বী' শরীফে তাঁর মাযার শরীফ সকলের যিয়ারতস্থল। আমিও সেখানে হাযির হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

১৭৮. যদিও মুখে উচ্চারণ করার সুযোগ হয় নি। কেননা, মৌখিক স্বীকারোক্তি তো শরীয়তের বিধান কার্যকর করারই পূর্বশর্ত মাত্র।

১৭৯. তাঁর নাম জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্। উপনাম 'আবূ আবদুল্লাহ্'। তিনি আনসারী ও সালাম গোত্রীয় প্রসিদ্ধ সাহাবী। অতি বড় মুহাদ্দিস। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে ১৮টি যুদ্ধে অংশ নেন। বদরেও সাথে ছিলেন। পরিশেষে সিরিয়া ও মিসরে অবস্থান করেন। তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ৯৪ বছর বয়সে ৭৪ হিজরিতে ওফাত পান। জান্নাতুল বাক্বী'তে তাঁর নূরানী মাযার শরীফ রয়েছে। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার সর্বশেষ সাহাবী।

১৮০. আল্লাহ্'র অনুমতিক্রমে। কেননা, আহলে সুন্নাতের মতে, আমল স্বয়ং অনিবার্য করে না, বরং আল্লাহ্'র ইচ্ছাই অনিবার্য করে। অর্থাৎ মানুষের দু'টি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্'র ইচ্ছায়, শাস্তি ও প্রতিদানকে অনিবার্য করে। এর বর্ণনা সামনে আসছে।

১৮১. অর্থাৎ কুফর করা অবস্থায়, যার একটি প্রকার শিরকও। দেখুন, দাহরিয়াহ্, একত্ববাদে বিশ্বাসী হিন্দু এবং আর্য ইত্যাদি সবই জাহান্নামী; যদিও তারা নিছক মুশরিক

دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ اَبِىْ
هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا حَوَالَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا
فِىْ نَفَرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَاَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِيْنَا اَنْ يُّقْتَطَعَ
دُوْنَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ اَبْتَغِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتّٰى اَتَيْتُ حَآئِطًا لِّلْاَنْصَارِ لِبَنِى النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهٖ هَلْ اَجِدُ لَهٗ بَابًا فَلَمْ اَجِدْ
فَاِذَا رَبِيْعٌ يَدْخُلُ فِىْ جَوْفِ حَآئِطٍ مِّنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيْعُ الْجَدْوَلُ

সে দোযখে যাবে।[১৮২] আর যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা গেলো যে, কাউকে আল্লাহ্'র সাথে শরীক স্থির করে নি,[১৮৩] সে বেহেশ্‌তে যাবে।[১৮৪] [মুসলিম শরীফ]

৩৫ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আশেপাশে উপবিষ্ট ছিলাম। আমাদের সাথে হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাও ছিলেন।[১৮৫] তখন হঠাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য থেকে ওঠে চলে গেলেন এবং ফিরে আসতে দেরি করলেন। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম এ ভেবে যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে হুযূরের কোন বিপদ হলো কিনা![১৮৬] আমরা বিচলিত হয়ে ওঠে গেলাম। আর প্রথমে আমিই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমি হুযূরকে খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত আমি বনূ নাজ্জারের এক আনসারীর বাগানে পৌঁছলাম।[১৮৭] বাগানের আশে পাশে ঘুরে দেখলাম[১৮৮] কোন দরজা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু পেলাম না।[১৮৯] একটি নালা ছিল, যা বাইরের কূপ থেকে বাগানে প্রবেশ করেছে।[১৯০]

নয়। এরূপ ক্ষেত্রগুলোতে শির্‌ক মানে কুফর হয়ে থাকে। এর বিপরীত হচ্ছে ঈমান, তাওহীদ নয়।

১৮২. চিরকালের জন্য। যেমন কামারের ভাটির কয়লা।

১৮৩. অর্থাৎ মু'মিন-মুসলমান হয়ে; শুধু একত্ববাদী হয়ে নয়। অন্যথায় শয়তান মুশরিক নয়, একত্ববাদী; কিন্তু তবুও জান্নাতী নয়।

১৮৪. হয়তো শুরু থেকেই, অথবা কিছু শাস্তি ভোগ করার পর প্রবেশ করবে।

১৮৫. সাহাবীদের দলে এ দু'জন বুযর্গ তেমন মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, যেমন তারকারাজির মধ্যে চন্দ্র-সূর্যের স্থান। এ কারণে অধিকাংশ স্থানে তাঁদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। স্মর্তব্য যে, সাহাবীগণের 'শায়খাঈন' হলেন হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর, মুহাদ্দিসগণের 'শায়খাঈন' ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম, ফক্বীহগণের 'শায়খাঈন' ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইয়ূসুফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম, মানতিক্বের 'শায়খাঈন' আবূ আলী সীনা ও ফারাবী।

১৮৬. এভাবে যে, আমরা হুযূরের খিদমতে হাযির নেই, হুযূর কোথাও একাকী হয়েছেন এবং কোন দুশমন তাঁকে কষ্ট দেবে কিনা। কেননা, আরবে হুযূরের বহু দুশমন রয়েছে। এ আশঙ্কা স্বাভাবিক নিয়মের (دَارُالْاَسْبَاب)ভিত্তিতে; অন্যথায়, আল্লাহ্ সর্বদা হুযূরের সাথে আছেন।

১৮৭. বনী নাজ্জার আনসারের এক বড় গোত্র। 'হা-ইত্ব' ওই বাগানকে বলা হয়, যার চতুর্পাশে দেয়াল থাকে এবং একটি মাত্র ফটক। 'বোস্তান' প্রতিটি বাগানকে বলা যায়; দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত হোক, বা না-ই হোক।

১৮৮. এ জন্য যে, আমি আন্দাজ করে বুঝতে পারলাম যে, হুযূর এ বাগানে রয়েছেন। শায়খ মুহাম্মদ আবদুল হক্ব বলেছেন, মাহবূবের সৌন্দর্যের সমীরণ ও মাহবূবের সুঘ্রাণ আশিক্বের মুহাব্বতের মস্তিষ্কে ছিলো, যেমনিভাবে হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম'র সুবাস মিশর থেকে কিন'আনে পৌঁছে গিয়েছিলো। কিন্তু আশেক্বদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কখনো গুপ্ত, কখনো প্রকাশ্য।

১৮৯. অর্থাৎ দরজা মওজূদ ছিলো, কিন্তু নজরে পড়েনি মাহবূবের ইশ্‌ক্বে বিভোর থাকার কারণে।

১৯০. তা-ই নজরে পড়ে গেছে। আশিক্বদের অবস্থাই অনন্য হয়ে থাকে। তাঁদের অবস্থাদি বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। দেখুন,

قَالَ فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَاشَاْنُكَ؟ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَاَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا اَنْ تُقْتَطَاعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَاَتَيْتُ هٰذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهٰٓؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَآئِىْ فَقَالَ يَآ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَعْطَانِىْ نَعْلَيْهِ

তিনি বলেছেন, আমি কুঞ্চিত হয়ে নালা দিয়ে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম'র খিদমতে হাযির হলাম।[১৯১] আল্লাহ্'র রসূল এরশাদ ফরমালেন, "আবূ হোরায়রা?"[১৯২] আমি বললাম, "হ্যাঁ এয়া রসূলাল্লাহ্" এরশাদ করলেন, "তোমার কী অবস্থা?"[১৯৩] আমি আরয করলাম, "হুযূর, আপনি আমাদের কাছে তাশরীফ রাখছিলেন, হঠাৎ করে চলে এসেছেন এবং ফিরতে দেরি হচ্ছিলো; আমরা ভয় পেয়ে গেছি এ ভেবে যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে হুযূরের কোন বিপদ হলো কি না! প্রথমে আমিই ঘাবড়ে গেছি।[১৯৪] তাই এ বাগানে এসেছি এবং আমি শৃগালের মত কুঞ্চিত হয়ে প্রবেশ করেছি।[১৯৫] আর অন্য লোকেরা আমার পিছনে রয়েছে।"[১৯৬] হুযূর এরশাদ করলেন, "হে আবূ হোরায়রা!" এবং আমাকে বরকতময় পাদুকাযুগল দিলেন।[১৯৭]

মহান রবের শান! হযরত আবূ হোরায়রার নজরে ফটকটি পড়েনি নালাটিই দৃশ্যমান হয়েছিলো। এরূপ ঘটনাবলী ওই সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, যাদের ভাগ্যে ইশক্ব'র অংশ জুটেছে।

১৯১. বুঝা যাচ্ছে যে, নালাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিলো, যাতে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে প্রবেশ করেছেন।

স্মর্তব্য যে, বিনানুমতিতে নালার মাধ্যমে কারো ঘর বা বাগানে প্রবেশ করা আইনতঃ নিষিদ্ধ। কিন্তু এটা ইশক্ব'র চমৎকারিত্ব ছিলো। নিজেকে নমরূদের আগুনে নিক্ষেপ করা, বিনাদোষে সন্তানকে যবাই করা -এসবই ইশক্ব'র বহিঃপ্রকাশ। তা থেকে আইন বহু ক্রোশ দূরে।

১৯২. এ প্রশ্নটি আশ্চর্যবোধের ভিত্তিতে ছিলো। যেহেতু ফটক থাকা সত্ত্বেও নালার পথে পৌঁছলেন। অথবা দরজা বন্ধ ছিলো এবং ওই পথে চলে আসলেন।

১৯৩. অর্থাৎ তুমি চিন্তিত কেন? হাঁফাচ্ছো কেনো?

১৯৪. এতে আল্লাহ্'র নি'মাতের প্রকাশ করা হয়েছে; অহঙ্কার কিংবা লোকদেখানো নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাকে আপনার এমন ইশক্ব দান করেছেন যে, আপনি ছাড়া ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না।

১৯৫. এতে ক্ষমা প্রার্থনার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। অর্থাৎ হুযূর! আমি ওই আশঙ্কার কারণে বিচলিত হয়ে দরবারের আদাব বজায় রাখতে পারি নি। অনুমতি ছাড়া এসে গেছি। সালাম করতেও ভুলে গেছি। অথচ এ দু'টিই ক্বোরআনের নির্দেশ; কিন্তু যার হুঁশ থাকে না সে কী না করে?

১৯৬. কবির ভাষায়-

نہ تنہا من دریں میخانہ مستم
ازیں مے ہمچو من بسیار شد مست

অর্থাৎ আমি এ শরাবখানায় একাকী নই, এ শরাবের প্রভাবে আমার মত অনেকেই বিভোর হয়ে আছে।

ایک میں ہی نہیں عالم ہے طلبگار تیرا

অর্থাৎ আমি একজনই নই, সমগ্র জাহান আপনার প্রত্যাশী।

১৯৭. কেন দান করলেন? তদুত্তরে জ্ঞানীরা তো এটাই বলে থাকেন যে, নিশানা হিসেবে দিয়েছেন। যাতে বুঝা যায় ইনি হুযূরেরই প্রেরিত। আশেক্বগণ বলেন, না। এরূপ নয়। সাহাবীরা সত্যবাদী। তাঁদের সকল কথা নিশানা ব্যতীত মান্য করা হয়। উদ্দেশ্য এটাই যে, সামনে শুধু 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবূ হোরায়রাকে পাদুকা মুবারক বহনকারী বানিয়ে এটা শিক্ষা দিয়েছেন যে, ওই ব্যক্তির কালেমা ও তাওহীদ গ্রহণযোগ্য, যে আমার পাদুকাবাহক হয়। এতে দ্বীনের মৌখিক প্রচারণার সাথে কার্যতঃ প্রচারণাও রয়েছে। ইশক্ব'র এ তাফসীর দ্বারা হাদীসের উপর কোন আপত্তি রইলো না। পাদুকা শরীফ বহন করাতে সমস্ত আক্বাইদ ও আ'মল এসে গেছে। তাঁর বরকতমণ্ডিত পাদুকাবাহক নিঃসন্দেহে জান্নাতী।

فَقَالَ اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيكَ مِنْ وَّرَآءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًابِهَا قَلْبُهٗ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ اَوَّلُ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرَ فَقَالَ مَاهَاتَانِ النَّعْلَانِ يَااَبَاهُرَيْرَةَ قُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِىْ بِهِمَا مَنْ لَّقِيْتُ يَشْهَدُاَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ مُسْتَيْقِنًابِهَا قَلْبُهٗ بَشَّرْتُهٗ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُبَيْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لِاِسْتِىْ فَقَالَ اِرْجِعْ يَآبَا هُرَيْرَةَ

আর এরশাদ করলেন, "আমার পাদুকাযুগল নিয়ে যাও। যাকে তুমি এ বাগানের পেছনে দৃঢ় অন্তরে এ মর্মে সাক্ষ্য দিতে পাও[১৯৮] যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই' তাকে বেহেশ্তের সুসংবাদ দাও।"[১৯৯] প্রথমে যার সাথে আমার সাক্ষাত হলো, তিনি ছিলেন ফারূক্ব-ই আ'যম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।[২০০] তিনি বললেন, "হে আবূ হোরায়রা! এ জুতোগুলো কি? আমি বললাম, "এগুলো আল্লাহ্'র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বরকতময় পাদুকাযুগল, হুযূর আমাকে এগুলো দিয়ে এ জন্য প্রেরণ করেছেন যেন আমি যাকে দৃঢ় অন্তরে এই সাক্ষ্য দিতে পাবো যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই' তাকে বেহেশ্তের সুসংবাদ দিয়ে দিই।" হযরত ওমর আমার বুকের উপর হাত মারলেন।[২০১] ফলে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। আর বললেন, "হে আবূ হোরায়রা! ফিরে যাও।"[২০২]

---

১৯৮. সুবহানাল্লাহ্! কতই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। অর্থাৎ এ সুসংবাদ প্রত্যেক লোককে দেবে না। যেহেতু এ রহস্য প্রত্যেকে বুঝবে না। শুধু হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'কেই বলবে। যাকে তুমি এ বাগানের পেছনেই পেয়ে যাবে, যিনি আমার রহস্যাদি সম্বন্ধে অবগত।

১৯৯. অর্থাৎ তাঁকে বলে দাও- "আপনি নিশ্চিত বেহেশ্তী।" এ থেকে কয়েকটি মাসআলা জানা গেলো:

এক. হুযূর এটা সম্পর্কে অবগত ছিলেন যে, হযরত আবূ হোরায়রা প্রথমেই হযরত ওমরের সাক্ষাৎ পাবেন।

দুই. হযরত ওমর নিশ্চিতভাবে বেহেশ্তী।

তিন. হুযূর সকল মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্পর্কে অবগত।

চার. মুসলমানদের জন্য মুখে কালেমা তাইয়্যেবাহ্ পড়া জরুরি। শুধু হৃদয়ে আক্বীদা বা বিশ্বাস স্থাপন করে ক্ষান্ত হবে না, মৌখিক স্বীকৃতি সহকারে ঘোষণাও দেবে।

পাঁচ. এ ধরনের হাদীস শরীফগুলো সর্বসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা ব্যতীত বলা যাবে না। এ জন্যই হুযূর এ শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ এ বাগানের পেছনে তুমি যে মুসলমানকে পাবে শুধু তাকেই সুসংবাদ দাও।

২০০. এটা হুযূরের বাণীর বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি এরশাদ করেছিলেন, "যাকে তুমি এ বাগানের পেছনে পাবে।" হযরত ওমরের সাথে সাক্ষাত হওয়া হুযূরের মহান বাণীরই তাফসীর বা বাস্তব ব্যাখ্যা।

২০১. এখানে কিছু কথা উহ্য রয়েছে। তা হচ্ছে, "হযরত ওমর আমাকে বললেন, "ফিরে যাও!" আমি তা মানি নি। তখন তিনি আমাকে মারলেন। কেন না, কোন কিছু বলা ব্যতিরেকে প্রহার করাটা অযৌক্তিক। [মিরক্বাত]

আর এটাই সুস্পষ্ট যে, এখানে প্রহার করা উদ্দেশ্য ছিলো না; বরং উদ্দেশ্য ছিলো সামনে যাওয়া থেকে বিরত রাখা এবং ফিরে যেতে বাধ্য করা। হযরত আবূ হোরায়রা দুর্বল ছিলেন। এ সামান্য নাড়া দেওয়াতেই পড়ে গেলেন। আর যদি প্রহারও করে থাকেন, তাহলেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ, হযরত ওমর হযরত আবূ হোরায়রা'র জন্য শিক্ষকতুল্য। অথবা অন্ততঃ বড় ভাইয়ের মতো ছিলেন।

২০২. স্মর্তব্য যে, এ বাণীতে হুযূরের নির্দেশের বিরোধিতা নেই। উদ্দেশ্য এটা বলা, "হে আবূ হোরায়রা তুমি নির্দেশ পালন করেছো! তুমি আমাকে পেয়ে গেছো। তুমি আমাকে বাণিটি শুনিয়ে দিয়েছো। হাদীস লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছে। সেটার ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন নেই।"

স্মর্তব্য যে, হাদীসের উৎস হচ্ছেন- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হাদীসের লক্ষ্যস্থল হচ্ছে, 'মুজতাহিদ'। সাধারণ লোকেরা সরাসরি হাদীস-ই রসূলের উপর আমল করবে না, বরং মুজতাহিদের কাছ থেকে বুঝার পরে আমল করবে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ (অর্থাৎ সেটা অনুধাবন করবে ওইসব লোক, যারা তা থেকে মাসআলা অনুমান

فَرَجَعْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَاَجْهَشْتُ بِالْبُكَاۤءِ وَرَكِبَنِىْ عُمَرُ وَاِذَا هُوَ عَلٰى اَثَرِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَالَكَ يَآاَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهٗ بِالَّذِىْ بَعَثْتَنِىْ بِهٖ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاِسْتِىْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَاعُمَرُ مَاحَمَلَكَ عَلٰى مَافَعَلْتَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَبَعَثْتَ اَبَاهُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِىَ يَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ

তখন আমি আল্লাহ্'র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে হাযির হলাম এবং কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করলাম[২০৩] এবং আমার মধ্যে তখন হযরত ওমর'র ভীতির সঞ্চার হলো।[২০৪] দেখলাম, তিনি আমার পেছনেই ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "আবূ হোরায়রা! কী হয়েছে?" আমি বললাম, "আমি হযরত ওমর'র সাক্ষাত পেলাম এবং তাঁকে ওই পয়গাম শুনালাম, যেটা দিয়ে হুযূর আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি আমার বুকের উপর এমনভাবে মারলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। আর বললেন, 'ফিরে যাও'!"[২০৫] হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "হে ওমর! এ কাজে[২০৬] কোন্ ধারনাটি তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে?" তিনি আরয করতে লাগলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আমার মাতাপিতা উৎসর্গ হোন! আপনি কি আবূ হোরায়রাকে বরকতময় পাদুকাযুগল দিয়ে এজন্য প্রেরণ করেছেন[২০৭] যেন সে যাকে দৃঢ় অন্তরে এ সাক্ষ্য দিতে পাবে যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই', তাকে বেহেশ্ত'র সুসংবাদ দিয়ে দেবে?" হুযূর এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ"।[২০৮]

করবে।(৪:৮৩)) ক্বোরআন-হাদীস রূহানী চিকিৎসার ঔষধ। তা কোন রূহানী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে ব্যবহার করো; নতুবা মারা যাবে। এ হাদীস শরীফ ইমামদের তাক্বলীদ (অনুসরণ) করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী দলীল।

২০৩. অর্থাৎ আমি হুযূরের কাছে তেমনিভাবে আশ্রয় নিয়েছি, যেমন শিশু তার স্নেহময়ী মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়। স্মর্তব্য যে, হযরত আবূ হোরায়রা এখানে এসে কেঁদেছিলেন, ওইখানে কাঁদেন নি। কেননা, মাযলূম তার সাহায্যকারীকে দেখেই ক্রন্দন করে থাকে।

২০৪. এটা আরবের পরিভাষা। যেমন, বলা হয়, "অমুকের উপর ঋণ সাওয়ার হয়ে গেছে।" অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে।

২০৫. অর্থাৎ এ কাজের জন্য এখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হবে না। হয়তো হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে ফিরে যাও, অথবা অন্য কোন কাজে যাও।

২০৬. হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে, তাঁকে প্রহার করার ব্যাপারে নয়। যেমনটি পরবর্তী বিষয়বস্তু হতে বুঝা যাচ্ছে। এ বাণী থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, অভিযোগ ইত্যাদিতে অধিকাংশ সময় একজনের সংবাদ গ্রহণযোগ্য। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ হোরায়রা'র কাছ থেকে না সাক্ষ্য চেয়েছেন, না হযরত ওমরের কাছ থেকে স্বীকৃতি চেয়েছেন? বরং শুধু তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার কারণটি জিজ্ঞেস করেছেন।

২০৭. এ আবেদন-নিবেদন দরবার-ই নবভী শরীফের নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত, হযরত আবূ হোরায়রা'র কোন মন্দ ধারনার কারণে নয়; কেননা, সকল সাহাবী সত্যের মাপকাঠি। তাঁদের সংবাদসমূহ গ্রহণযোগ্য। যখন বাদশাহ'র কর্মচারী বাদশাহ্'র দরবারে কোন বিষয় সম্পর্কে আবেদন-নিবেদন করতে চায়, তখন প্রথমে বাদশাহ'র কাছ থেকে তা সত্যায়িত করে নেওয়া শাহী দরবারের আদব।

২০৮. স্মর্তব্য যে, এ স্থানে একটি বিষয়ের বর্ণনা আসে নি। তা হচ্ছে- 'বাগানের পেছনে।' বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত ওমর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র গুপ্ত রহস্যের ধারক। তিনি প্রিয়নবীর পবিত্র অন্তরের রহস্যসমূহ সম্পর্কে অবগত।

قَالَ فَلَاتَفعَلْ فَاِنِّیْ اَخْشٰی اَنْ یَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَیْهَا فَخَلِّهِمْ یَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صلی الله علیه وسلم فَخَلِّهِمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی الله علیه وسلم
مَفَاتِیْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَوَاهُ اَحْمَدُ

আরয করলেন, "এরূপ করবেন না।[২০৯] আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, মানুষ এর উপর ভরসা করে বসবে।[২১০] তাদেরকে আমল করতে দিন।" হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "ঠিক আছে করতে দাও।"[২১১] [মুসলিম শরীফ] ৩৬ ‖ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করেছেন, "বেহেশ্তের চাবিগুলো হচ্ছে[২১২] কালেমা-ই শাহাদাত, অর্থাৎ এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।" এ হাদীস ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন।

২০৯. অর্থাৎ ভবিষ্যতে হযরত আবূ হোরায়রাকে সর্বসাধারণের কাছে কথা বলার অনুমতি দেবেন না। এতে হুযূরের মহান দরবারে একটি পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে মাত্র। এটা হুযূরের আদেশের বিরোধিতা নয়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন وَشَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ (এবং আপনি তাদের সাথে কাজে পরামর্শ করুন।[৩:১৫৯]) এ জন্যই হুযূর এ ঘটনায় তিরস্কার করেননি; বরং তাঁর পরামর্শ কবূল করে নিলেন। এ থেকে এটাও অনিবার্য হয় না যে, হযরত ওমর'র জ্ঞান-বুদ্ধি হুযূরের চেয়ে অধিক। এ হাদীস শরীফের মূল রহস্য অন্য রকম, যা আমি ইতোপূর্বে আরয করেছি। অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র এ আদেশ সেটার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছে। নিদের্শও পালিত হয়ে গেছে।

২১০. অর্থাৎ ওই সকল নওমুসলিম, যারা এখনও পর্যন্ত হুযূরের মহান বাণীর উদ্দেশ্য বুঝার উপযুক্ত নয়, তারা প্রকাশ্য বাক্য শুনে আমল ছেড়ে বসবে এবং বুঝবে যে, নাজাতের জন্য শুধু কলেমা পাঠ করে নেওয়াই যথেষ্ট। এ জন্য বর্তমান যুগের আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের শিক্ষা নেওয়া উচিত, যারা চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত সকল হাদীসের উপর আমল করার দাবিদার। পবিত্র কোরআনের আয়াতের উপরও অন্ধভাবে গিয়ে পতিত হওয়া হারাম। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَالَّذِیْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ یَخِرُّوْا عَلَیْهَا صُمًّا وَّعُمْیَانًا (অর্থাৎ এবং যাদেরকে তাদের রবের আয়াতগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন তারা সেগুলোর উপর উপুড় হয়ে বধির ও অন্ধ হয়ে পতিত হয় না।) [২৫:৭৩]

২১১. অর্থাৎ তোমার পরামর্শ গ্রহণ করা গেলো, তা অত্যন্ত সঠিক। স্মর্তব্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র উপর আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র না ক্বিসাস আরোপ করেছেন, না তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে বলেছেন। কেননা, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুজতাহিদ। আর হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শুধু মুহাদ্দিস। মুজতাহিদ হচ্ছেন ওস্তাদ, মুহাদ্দিস হচ্ছেন শাগরিদ। ওস্তাদের উপর শাগরিদের ক্বিসাস আবশ্যক নয়; যদিও ভুল বশতঃ শাস্তি দিয়ে দেন। হযরত মূসা আলায়হিস সালাম ভুল বশতঃ হযরত হারূন আলায়হিস সালাম'র চুল ধরে টেনেছিলেন। কিন্তু মহান রব তাঁর উপর ক্বিসাস আরোপ করেননি। [আল-কোরআন]

আমার এ ব্যাখ্যা দ্বারা নিম্নের প্রশ্নাবলীর সমাধান হয়ে গেলো: এক. হযরত আবূ হোরায়রা বাগানের ফটক কেন দেখেননি, নালা কেন দেখেছিলেন? দুই. তিনি অন্যের বাগানে বিনানুমতিতে কেন গেলেন? তিন. তিনি প্রথমে সালাম কেন করেননি? চার. হুযূর তাঁকে বরকতময় পাদুকাযুগল কেন দান করেছিলেন? পাঁচ. হযরত ওমর হাদীস প্রচারে হযরত আবূ হোরায়রাকে কেন বাধা দিয়েছিলেন? ছয়. তাঁকে কেন প্রহার করেছিলেন? সাত. হুযূর কর্তৃক হযরত আবূ হোরায়রা'র উক্তিকে সত্যায়ন করালেন কেন? আট. হুযূরকে এই বাণীর প্রচার না করার পরামর্শ কেন দিলেন? নয়. হুযূর তাঁর পরামর্শ কেন কবূল করেছিলেন? দশ. হযরত ওমর হতে এ প্রহারের বদলা কেন নেওয়া হয়নি? (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

২১২. অর্থাৎ আক্বীদা'র পরিশুদ্ধতা ব্যতীত কোন ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারে না এবং আক্বীদার বিশুদ্ধতা স্বয়ং জান্নাত ও সেখানকার সমস্ত স্তরগুলোর চাবি। এ জন্যই مَفَاتِیْحُ বহুবচন বলা হয়েছে। অর্থাৎ ওখানকার সকল স্তরের চাবি হচ্ছে কলেমা-ই তাইয়্যিবাহ। আমি পূর্বেই আরয করেছি যে, কলেমা দ্বারা উদ্দেশ্য সকল ইসলামী আক্বীদা

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رِجَالًا مِّنْ اَصْحٰبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ حَزِنُوْا عَلَيْهِ حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوَسْوِسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ وَسَلَّمَ فَلَمْ اَشْعُرْ بِهٖ فَاشْتَكٰى عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ اَقْبَلَا حَتّٰى سَلَّمَا عَلَيَّ جَمِيْعًا فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ مَّا حَمَلَكَ اَنْ لَّا تَرُدَّ عَلٰى اَخِيْكَ عُمَرَ سَلَامَهٗ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ بَلٰى وَاللّٰهِ لَقَدْ فَعَلْتَ قَالَ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَا شَعَرْتُ اَنَّكَ مَرَرْتَ وَلَا سَلَّمْتَ

৩৭ || হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওফাত পান তখন হুযূরের সাহাবীদের মধ্যে কিছু সাহাবী এরূপ পেরেশান হন যে, তাঁরা সন্দেহরোগে আক্রান্ত হবার উপক্রম হয়েছিলেন।[২১৩] হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলাম। একবার আমি উপবিষ্ট ছিলাম। তখন ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমার পাশ দিয়ে গেলেন। আমাকে সালাম বললেন, কিন্তু আমার তা কোনভাবে অনুভবই হলো না।[২১৪] হযরত ওমর হযরত আবূ বকরকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটি দিলেন।[২১৫] এরপর তাঁরা দু'জনই আমার কাছে তাশরীফ আনলেন এবং দু'জনই আমাকে সালাম করলেন।[২১৬] আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমাকে বললেন, "কি কারণে তুমি তোমার ভাই ওমরের সালামের উত্তর দাও নি?" আমি বললাম, "আমি এরূপ করি নি?"[২১৭] ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "আল্লাহরই শপথ! তুমি এটা করেছো।" আমি বললাম, "আল্লাহরই শপথ! আমি এটা জানি না যে, তুমি আমার পাশ দিয়ে গেছো এবং এটাও জানি না যে, তুমি আমাকে সালাম করেছো।"

বুঝানো। সুতরাং মুনাফিক্ব ও মুরতাদ্দরা যদি সারা জীবন কলেমা পড়ে, তবুও জান্নাতী নয়।

২১৩. অর্থাৎ অতিরিক্ত শোকের কারণে দুশ্চিন্তার রোগ হয়ে গিয়েছিল। তা কেটে যায়নি। বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। অথবা এ প্ররোচনা অন্তরে আসছিলো যে, ইসলাম কিভাবে স্থায়ী থাকবে। সেটার অভিভাবকতো চলে গেছেন। কাফেলার পরিচালক তো বিদায় নিয়ে গেছেন। এখন এ কাফেলা কিভাবে সামলানো যাবে। এ সকল ধারণা অনিচ্ছাকৃত ছিলো।

স্মর্তব্য যে, হুযূরের ওফাতে দুঃখিত ও পেরেশান হওয়া সুন্নাতে সাহাবা-ই কেরাম; কিন্তু নিজেকে প্রহার করা, মাতম করা নিষিদ্ধ।

২১৪. অর্থাৎ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উচ্চ স্বরে সালাম করেছেন; কিন্তু আমার কানে তাঁর আওয়াজ পৌঁছে নি। অতিরিক্ত দুঃখের সময় সম্মুখে রাখা জিনিসও দৃষ্টিগোচর হয় না।

২১৫. কেননা, তিনি এটা মনে করেছিলেন যে, হয়তো হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। এ জন্য তিনি সালামের উত্তর এত আস্তে দিয়েছেন যে, আমি শুনতে পাই নি; এটা ধারনা করেন নি যে, উত্তরই দেন নি। কেননা, সালামের উত্তর দেওয়া অপরিহার্য। এ থেকে বুঝা গেলো যে, শাসকের সামনে কারো অভিযোগ করা বিশেষতঃ সংশোধনের জন্য হলে গীবত নয়, বরং সুন্নাত-ই সাহাবা।

২১৬. হযরত ওমর তো রাজী করানোর নিয়তে এসেছেন এবং হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সংশোধনের ইচ্ছায় এসেছেন।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, কারো অভিযোগ শুনে মনে মনে রেখে দেবেন না, বরং তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। যদিওবা দলের মধ্য থেকে একজনের সালাম করা যথেষ্ট হয়; কিন্তু এখানে স্থান এমন ছিলো যে, দু'জনে আলাদা আলাদা সালাম করেছিলেন। অথবা এ দু'জন আগে পরে হযরত ওসমান গনী'র কাছে গিয়েছিলেন।

২১৭. অর্থাৎ তিনি আমার পাশ দিয়ে যান নি এবং আমিও তাঁর সালামের উত্তর দানে অলসতা করি নি। এটা মিথ্যা নয়, বরং নিজের ইলমের ভিত্তিতেই বলেছেন।

قَالَ اَبُوْبَكْرٍ صَدَقَ عُثْمَانُ قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ اَمْرٌ فَقُلْتُ اَجَلْ قَالَ مَاهُوَ قُلْتُ تَوَفَّى اللّٰهُ تَعَالٰى نَبِيَّهٗ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ اَنْ نَسْئَلَهٗ عَنْ نَجَاةِ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَدْ سَئَلْتُهٗ عَنْ ذٰلِكَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهٗ بَاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اَنْتَ اَحَقُّ بِهَا قَالَ اَبُوْبَكْرٍ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَانَجَاةُ هٰذَا الْاَمْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَبِلَ مِنِّى الْكَلِمَةَ الَّتِىْ عَرَضْتُ عَلٰى عَمِّىْ

তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "ওসমান সত্য বলছে। হে ওসমান, তোমাকে তা থেকে কোন বড় বিষয় ব্যস্ত রেখেছে।[২১৮] (তা থেকে অমনোযোগী করে ফেলেছে।)" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "ওই জটিল বিষয়টি কি?" আমি বললাম, "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে এর পূর্বেই ওফাত দিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা হুযূরের কাছ থেকে নাজাত প্রাপ্তির একমাত্র আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো।"[২১৯] আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "আমি এ সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছি।"[২২০] আমি তাঁর খিদমতে দণ্ডায়মান হয়ে গেলাম[২২১] এবং বললাম, "হে আবূ বকর, আপনার জন্য আমার মাতাপিতা উৎসর্গ হোক। আপনিই এর সর্বাধিক দাবীদার।"[২২২] তখন আবূ বকর বললেন, "আমি একদা আরয করেছিলাম, "এয়া রসূলাল্লাহ্! নাজাত প্রাপ্তির নিশ্চিত আমল কি?"[২২৩] অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "যে আমার ওই কথা মেনে নেবে যা আমি আমার চাচার কাছে পেশ করেছিলাম।"[২২৪]

---

২১৮. অর্থাৎ তুমি কোন কিছু চিন্তা করছিলে, যার কারণে দেখতে পাও নি, শুনতে পাও নি। তোমরা দু'জনই সত্যবাদী।

২১৯. 'বিষয়' মানে হয়তো 'দ্বীন' হবে; অর্থাৎ দ্বীন ইসলামে দোযখ হতে নাজাত লাভের ভিত্তি কোন্ বিষয় জিনিসের উপর নির্ভরশীল? যদিওবা হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, নাজাতের ভিত্তি কলেমা-ই ত্বাইয়্যেবাহ; কিন্তু এ দুঃখ ও পেরেশানীর সময় নিজের বর্ণিত হাদীস নিজেই ভুলে গেছেন।

অথবা 'বিষয়' দ্বারা শয়তানের প্ররোচনা বুঝানো উদ্দেশ্য। মাঝে মধ্যে আমাদের অন্তরে বড় বড় কুধারণাও এসে থাকে। এমন কোন্ আমল করা যাবে, যার বরকতে হয়তো ওই কুমন্ত্রণা থেকে নাজাত পাবো, কিংবা সেটার কুফল থেকে রক্ষা পাবো। এটাই প্রকাশ্য অর্থ।

২২০. এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উত্তরও আমার স্মরণে রয়েছে।

২২১. অর্থাৎ আনন্দের কারণে বুঝা গেলো যে, আনন্দের সংবাদ শ্রবণ করে দাঁড়িয়ে যাওয়া সুন্নাতে ওসমানী; বরং স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে দেখে আনন্দে দাঁড়িয়ে যেতেন। সুতরাং মীলাদ শরীফে যিকরে বেলাদতের সময় দাঁড়িয়ে যাওয়া সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। এটা আনন্দ ও খুশীর ক্বিয়াম; এ হাদীস শরীফই এর ভিত্তি। একে হারাম বলা যাবে না।

২২২. অর্থাৎ আপনার ন্যায় বুযুর্গ ব্যক্তির জন্যই উপযুক্ত ছিলো যে, এরূপ কথাগুলো হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে আমাদের কাছে পৌঁছাবেন। কেননা, আপনি ইলমের প্রতি উৎসাহী এবং হুযূরের গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত।

২২৩. অর্থাৎ শয়তানী কুমন্ত্রণা কিংবা সেটার কুফল থেকে আমরা কিভাবে রক্ষা পাবো? অথবা দ্বীনী বিষয়গুলোতে নাজাতের ভিত্তি কোন্ জিনিসের উপর?

২২৪. চাচা আবূ তালিবের সম্মুখে সর্বদাই কলেমা-ই ত্বাইয়্যিবাহ্ পেশ করেছেন। বিশেষভাবে তাঁর ওফাতের সময় হুযূর বলেছিলেন, "চাচা, এখন হলেও পাঠ করুন, নাজাত পাবেন।" স্মর্তব্য যে, আবূ তালেব হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'কে সত্য বলে স্বীকার করতেন। তিনি হুযূরের বহু গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন; কিন্তু মুখে কলেমা পাঠ করেন নি, এজন্য তাঁকে শরীয়তের পরিভাষায় 'মুসলমান' বলা যায় না।

فَرَدَّهَا فَهِىَ لَهُ نَجَاةٌ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَعَنِ الْمِقْدَادِاَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لَايَبْقٰى عَلٰى ظَهْرِالْاَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍوَّلَاوَبْرٍ اِلَّااَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْاِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍوَّذُلِّ ذَلِيْلٍ اِمَّا يُعِزُّهُمُ اللّٰهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِّنْ اَهْلِهَا اَوْيُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا قُلْتُ فَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ

তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[২২৫] সুতরাং এ কলেমা-ই তাওহীদ'র মধ্যেই তার নাজাত নিহিত।" [আহমদ]

৩৮ ॥ হযরত মিক্বদাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[২২৬] তিনি হুযূরকে এটা এরশাদ করতে শুনেছেন যে, পৃথিবীর উপরিভাগে সাধারণ কোন তাঁবু ও কাঁচা ঘর[২২৭] থাকবে না; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাতে ইসলামের কালেমা পৌঁছিয়ে দেবেন- মর্যাদাবানদের মর্যাদা এবং অপমানিত লোকদের কাছে অবমাননার সাথে।[২২৮] হয়তো আল্লাহ্ তাদেরকে ইজ্জত দান করবেন। অর্থাৎ তাদেরকে কলেমাধারী বানিয়ে দেবেন অথবা তাদেরকে অপমানিত করবেন। তারা দ্বীনের অনুগত থাকবে। আমি মনে মনে বললাম, "তখনতো প্রিয় দ্বীন পুরোটাই আল্লাহ্'রই হবে।" [আহমদ]

২২৫. অর্থাৎ মুখে পাঠ করেন নি, যদিওবা আন্তরিকভাবে স্বীকৃতি ছিলো। আবূ তালিবের কলেমাহ্ পাঠ না করা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হিফাযতের উদ্দেশ্যে ছিলো; এ ভেবে যে, 'মক্কার কাফিরেরা আমার মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখবে এবং আমার প্রতি সম্মান দেখিয়ে হুযূরের প্রতি অত্যাচার করবে না।

এর ফলাফল এটা হয়েছিলো যে, আবূ তালিবের জীবদ্দশায় হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'কে মক্কা ত্যাগ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয় নি। তাঁর ওফাতের পরেই হিজরতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হয়েছিলো।

আবূ তালিবের ঈমানের আলোচনা আমার কিতাব 'তাফসীর-ই নাঈমী'তে দেখুন।

২২৬. তাঁর নাম 'মিক্বদাদ ইবনে আমর ইবনে সা'লাবাহ্ কান্দী'; কিন্তু তিনি 'মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ' নামে প্রসিদ্ধ। এ জন্য যে, তিনি আসওয়াদের প্রতিপালনে ছিলেন। তিনি মহাসম্মানিত সাহাবী এবং মু'মিনদের মধ্যে ৬ষ্ঠ। ৯০ বছর বয়সে হিজরি ৭৩ সনে মদীনা মুনাওয়ারার ৩ মাইল দূরে 'জরফ' নামক স্থানে ওফাত পান।

লোকেরা তাঁর কফীন মুবারক কাঁধে বহন করে জান্নাতুল বাক্বী'তে এনে দাফন করেছেন। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

২২৭. প্রকাশ থাকে যে, 'যমীন' মানে আরবের যমীন। 'সাধারণ ঘর' মানে 'গ্রাম্য লোকদের তাঁবু' এবং 'কাঁচা ঘর' মানে সাধারণভাবে সকল শহরবাসীর ঘর। অর্থাৎ আরবে কোন গ্রাম কিংবা শহর এমন থাকবে না, যেখানে ইসলাম প্রবেশ করবে না আল্লাহ্'র অনুগ্রহে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে।

আর যদি 'সমগ্র দুনিয়া' বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ হাদীসের প্রকাশ ক্বিয়ামতের অব্যবহিত পূর্বেই হবে। অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম'র অবতরণ এবং ইমাম মাহদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র প্রকাশের সময়েই হবে। অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়াবাসী মুসলমান হয়ে যাবে।

২২৮. অর্থাৎ কিছু লোক সন্তুষ্টচিত্তেই মুসলমান হবে। তারা ইজ্জত পাবে। আর কিছু লোক বাধ্য হয়ে মুখে কলেমা পাঠ করবে। তারা লাঞ্ছিত হবে।

অথবা এর মানে এটাই যে, কিছু লোক মুসলমান হয়ে ইজ্জত পাবে এবং কিছু লোক ইসলামকে অস্বীকার করে মুসলমানদেরকে কর প্রদানকারী হবে।

এ অর্থানুসারে হাদীসের প্রথমাংশ অন্য অর্থেরও অবকাশ রাখে। এর আরো কতিপয় ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ وَهْبِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قِيلَ لَهُ اَلَيْسَ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لَّيْسَ مِفْتَاحٌ اِلَّا وَلَهٗ اَسْنَانٌ فَاِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَّهٗ اَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَاِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلَامَهٗ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهٗ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَّ كُلُّ سَيِّئَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯ || **হযরত** ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ[২২৯] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তাঁকে বলা হলো, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' কি জান্নাতের চাবি নয়?[২৩০] তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে কোন চাবি দাঁত ছাড়া হয় না।[২৩১] সুতরাং, তোমরা যদি দাঁত বিশিষ্ট চাবি নিয়ে এসো, তাহলেই তোমাদের জন্য দরজা খুলবে; নতুবা খুলবে না।[২৩২] [বোখারী- তরজমাতুল বাব]

৪০ || **হযরত** আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি স্বীয় ইসলামকে পরিশুদ্ধ করে[২৩৩] তখন সে যে নেকীই করবে, তা দশগুণ লেখা হবে-সর্বোচ্চ সাতশ' গুণ পর্যন্ত।[২৩৪] আর যেকোন মন্দ কাজ সে করবে তা একগুণই লেখা হবে।[২৩৫] অবশেষে সে স্বীয় রবের সাথে মিলিত হবে। [মুসলিম ও বোখারী]

২২৯. তাঁর উপনাম 'আবূ আবদুল্লাহ'। তাঁর জন্মভূমি পারস্য, অবস্থানস্থল ইয়েমেনের সানা'আ এলাকায়। তিনি একজন মহামান্য তাবে'ঈ। ইয়েমেনের ক্বাযী (বিচারপতি) ছিলেন। হিজরী ১১৪ সালে ওফাত পান। হযরত জাবির ও ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম'র সাথে সাক্ষাৎ লাভ এবং হাদীস শ্রবণ করেছেন।

২৩০. মুসলমানদের মধ্যে ফের্কা-ই মুর্জিয়া নামে একটি দল ছিলো, যাদের দৃষ্টিতে আমলের কোন প্রয়োজন ছিলো না। তারা ইসলাম গ্রহণ করে জঘন্যতম গুনাহকেও মন্দ মনে করতো না। প্রশ্নকারী তাদেরই একজন ছিলো। প্রশ্নের পটভূমি এটা ছিলো যে, যখন কলেমা-ই ত্বাইয়্যেবা জান্নাতের চাবি, তখন নেক আমলগুলোর কি প্রয়োজন আছে?

২৩১. সুবহানাল্লাহ, কত সুন্দর উদাহরণ! অর্থাৎ কলেমা-ই ত্বাইয়্যেবা চাবির দণ্ড, আর ইসলামের স্তম্ভগুলো- নামায, রোযা ইত্যাদি হচ্ছে সেটার দাঁত (স্বরূপ); যেভাবে চাবিতে দাঁতের প্রয়োজন রয়েছে, সেভাবে মুসলমানদের জন্য চার (স্তম্ভ) আরকানও আবশ্যক।

২৩২. অর্থাৎ বদ-আমল মুসলমান প্রথমতঃ জান্নাতে যাবে না; اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ কিন্তু আল্লাহ্ চাইলে।
এ মাসআলার বিশ্লেষণ ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

২৩৩. এভাবে যে, সকল ইসলামী আক্বীদা অন্তরে বিশ্বাস রেখে মুখে স্বীকার করবে। মহান রব ফরমাচ্ছেন-
مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন চেহারা ঝুঁকিয়েছে আল্লাহ'র জন্য এবং সে হয় সৎকর্মপরায়ণ...। -[২:১১২, তরজমা: কানযুল ঈমান]

২৩৪. অর্থাৎ কমপক্ষে দশগুণ, অধিক সাতশ'গুণ। 'যেমন ইখলাস ও স্থান তেমন সাওয়াব' -এটা হচ্ছে নিয়ম (কানুন)। অনুগ্রহের কোন সীমা নেই। এ হাদীসে এ দু'টি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে:
এক. فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا (তবে তাঁর জন্য রয়েছে তদনুরূপ দশগুণ)।[৬:১৬০]
দুই. مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ...الاية (অর্থাৎ তাদের উপমা, যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে...। [২:২৬১]
স্মর্তব্য যে, এটা ওই সব নেকীর বর্ণনা, যেগুলো সাধারণভাবে করা হয়।
অন্যথায়, মদীনা-ই তাইয়্যেবার একটি নেকীর সাওয়াব পঞ্চাশ হাজারগুণ এবং মক্কা মুকাররামার একটি নেকীর সাওয়াব এক লাখগুণ। সুতরাং হাদীসসমূহে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

২৩৫. এটাও সাধারণ গুনাহর বর্ণনা। অন্যথায় মক্কা মু'আযযমায় একটি গুনাহ একলাখে গণ্য হবে। এভাবে গুনাহর প্রবর্তকের উপর সমস্ত গুনাহগারের আযাব বর্তাবে।

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلًا سَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَآئَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الْاِثْمُ قَالَ اِذَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ شَىْءٌ فَدَعْهُ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَعَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ مَّعَكَ عَلٰى هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ حُرٌّ وَّعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْاِسْلَامُ قَالَ طِيْبُ الْكَلَامِ وَ اِطْعَامُ الطَّعَامِ

৪১ ॥ হযরত আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র দরবারে আরয করলো, "ঈমান কি?"[২৩৬] হুযূর এরশাদ করলেন, "যখন তোমাকে স্বীয় নেকী আনন্দিত করবে এবং স্বীয় মন্দকাজ পীড়া দেবে, তাহলে তুমি কামিল মু'মিন।"[২৩৭] লোকটি পুনরায় আরয করলো, "এয়া রসূলাল্লাহ্! গুনাহ্ কি"? হুযূর এরশাদ করলেন, "যে জিনিস তোমার অন্তরে বিদ্ধ হয় তা ছেড়ে দাও।"[২৩৮] [আহমদ]

৪২ ॥ হযরত আমর ইবনে 'আবাসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[২৩৯] তিনি বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে হাযির হলাম এবং আরয করলাম, "হে আল্লাহ'র রসূল! ইসলামে আপনার সাথে কে কে আছে?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "এক গোলাম, এক আযাদ।"[২৪০] আমি আরয করলাম, "ইসলাম কি?"[২৪১] হুযূর এরশাদ করলেন, "উত্তম কথা বলা ও খানা খাওয়ানো।"[২৪২]

---

২৩৬. অর্থাৎ মু'মিন হবার পরিচয় কি, যাতে আমি বুঝতে পারি যে, আমি এখন মু'মিন হয়েছি?

২৩৭. সুবহানাল্লাহ্! কতই সুন্দর পরিচিতি। মানুষ তিন ধরনের হয়ে থাকে: এক. গাফিল বা অলস, **দুই.** আক্বিল বা বুদ্ধিমান এবং **তিন.** কামিল বা পরিপূর্ণ। 'গাফিল' হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে গুনাহ্'র উপর খুশী থাকে এবং সাওয়াবের কাজে দুঃখ ও অনীহা প্রকাশ করে। যেমন- কাফিরগণ কিংবা কিছু সংখ্যক ফাসিক্ব-পাপী। **'আক্বিল'** ওই ব্যক্তি, যে নেকিকে ভাল এবং গুনাহকে স্বীয় বিবেক দ্বারা মন্দ মনে করে; কিন্তু আমলের ব্যাপারে উদাসীন। **'কামিল'** হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যাঁর ক্বলবের রঙ বদলে গেছে। তিনি নেকীর উপর তেমনি সন্তুষ্ট, যেমন তিনি বাদশাহী পেয়ে গেছেন, গুনাহ্'র কারণে তেমনি মনক্ষুণ্ন হন, যেমন, (তাঁর) সকল সম্পদ ও সন্তান ধ্বংস হয়ে গেছে। এটি বহু উঁচু স্তর। আল্লাহ্ তা'আলা নসীব করুন!

২৩৮. অর্থাৎ কামিল মু'মিনের অন্তরই গুনাহ্ ও সাওয়াবের মধ্যে পার্থক্য করে নিতে পারে। যেমন মানুষের আত্মা মাছি হজম করে না, বমি করে ফেলে। অনুরূপ, ঈমানী আত্মা গুনাহ্ বরদাশ্ত করে না।

এ হাদীস ওইসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাঁরা ওই সাহাবীর ন্যায় কামিল মু'মিন হবে; আমাদের মত গুনাহ্গারদের ক্ষেত্রে নয়। আমরা তো অনেক ক্ষেত্রে মন্দ কার্যাবলীকে নেক কাজ মনে করে থাকি।

২৩৯. তাঁর উপনাম আবূ শায়খ। তিনি বনূ সালামা গোত্রের লোক। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের অন্যতম। সুতরাং, তিনি ছিলেন চতুর্থ মুসলমান। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নির্দেশে স্বীয় গোত্র বনী সুলাইমে অবস্থান করেন। খায়বার বিজয়ের পরে মদীনা মুনাওয়ারায় হাযির হন এবং সেখানে অবস্থান করেন।

২৪০. অর্থাৎ তখন পর্যন্ত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত বেলাল রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ঈমান এনেছিলেন। যেহেতু হযরত আলী ছোট ছিলেন এবং হযরত খাদীজা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা মহিলা ছিলেন, সেহেতু তাঁদের উল্লেখ করেন নি। হুযূরের এ বাণীর অর্থ এ যে, ইসলামে গোলাম ও আযাদ সকল প্রকার মানুষ অন্তর্ভুক্ত। এ অর্থই অধিক শক্তিশালী।

২৪১. অর্থাৎ মুসলমানের বিশেষ স্বভাবগুলো কি? অথবা ইসলামের পরিপূর্ণতা কি?

২৪২. এটা ইসলামী স্বভাব। 'ভালকথা'র মধ্যে কালেমা তাইয়্যেব, দ্বীন পৌঁছিয়ে দেওয়া, মানুষকে মন্দ থেকে কঠোরভাবে বিরত রাখা এবং নম্র ভাষায় কথা বলা -সবই অন্তর্ভুক্ত। আর 'খাওয়ানো'র মধ্যে মেহমানদারী, মুসাফির ও অভুক্তদেরকে পেট ভরে খাওয়ানো, শিশুদের প্রতিপালন করা -সবই অন্তর্ভুক্ত।

قُلْتُ مَاالْاِيْمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ قَالَ قُلْتُ اَىُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ
سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ قَالَ قُلْتُ اَىُّ الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ
قَالَ قُلْتُ اَىُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ قَالَ قُلْتُ اَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ
قَالَ اَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ قَالَ فَقُلْتُ فَاَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ
جَوَادُهٗ وَاُهْرِيْقَ دَمُهٗ ـ قَالَ قُلْتُ

আমি আরয করলাম,"ঈমান কি?"[২৪৩]এরশাদ করলেন, "সহনশীলতা ও দানশীলতা",[২৪৪](বর্ণনাকারী) বললেন, আমি আরয করলাম,"কোন্ ইসলাম উত্তম?" হুযূর এরশাদ করলেন, "যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।" তিনি বললেন, আমি আরয করলাম,"কোন্ ঈমান উত্তম?" হুযূর এরশাদ করলেন,"সৎ স্বভাব।"[২৪৫] তিনি বললেন, আমি আবার আরয করলাম, "কোন্ ধরনের নামায উত্তম?"[২৪৬]এরশাদ করলেন, "দীর্ঘ ক্বিয়াম বিশিষ্ট নামায।"[২৪৭]বললেন, আমি আরয করলাম "কোন্ ধরনের হিজরত উত্তম?"[২৪৮] হুযূর এরশাদ করলেন, "তোমার রব যা অপছন্দ করেন তা-ই তুমি বর্জন করবে।"[২৪৯] তিনি বললেন, আমি আরয করলাম, "কোন্ জিহাদ উত্তম?" এরশাদ করলেন, "যার ঘোড়ার পা কেটে দেওয়া হবে এবং সেটার রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া হবে।"[২৫০] তিনি বললেন, আমি আরয করলাম-

২৪৩. অর্থাৎ ঈমানের সুফল এবং মু'মিনের আলামত।

২৪৪. বহু ধরনের সবর রয়েছে- ইবাদতে সবর, গুনাহ্ থেকে সবর এবং বিপদে সবর। অর্থাৎ সর্বদা ইবাদত করা, কখনও গুনাহ্ না করা এবং মুসীবতের সময় না ঘাবড়ানো। অনুরূপ, (দানশীলতাও বিভিন্ন ধরনের। যেমন) ইল্‌মের দানশীলতা, সম্পদের দানশীলতা, দ্বীনের দানশীলতা -সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

২৪৫. 'সৎস্বভাব' আল্লাহ্'র বড় নি'মাত। এটা আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'কে মু'জিযাস্বরূপ দান করা হয়েছে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (নিশ্চয় আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত)। 'খুলুক্ব-ই হাসান' হচ্ছে ওই স্বভাব- যা দ্বারা স্রষ্টাও সন্তুষ্ট, সৃষ্টিও। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যাপারে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর হস্তে পাকড়াও করা।

২৪৬. অর্থাৎ নামাযের কোন্ রুকন অথবা কোন্ ধরনের নামায উত্তম? এ থেকে বুঝা গেলো যে, নামাযের রুকনগুলো পরস্পর সমান নয়।

২৪৭. قُنُوْتٌ (কুনূত) অর্থ আনুগত্য, নম্রতা, নামায, দু'আ, চুপ থাকা এবং ক্বিয়াম। এখানে হয়তো বিনয় বুঝানো উদ্দেশ্য, অথবা একাগ্রতা অথবা ক্বিয়াম বুঝানো উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অর্থ (ক্বিয়াম)ই অধিক স্পষ্ট।
স্মর্তব্য যে, কারো কারো মতে সাজদাহ্ উত্তম। কারো মতে ক্বিয়াম উত্তম। কারো ধারনামতে, রাতের নামাযে দীর্ঘ ক্বিয়াম উত্তম এবং দিনের নামাযে অধিক সাজদাহ্ উত্তম; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র মতে দীর্ঘ ক্বিয়াম উত্তম। কেননা, এতে কষ্ট ও ইবাদত বেশি। অর্থাৎ যদি এক ঘন্টা নফল পড়ে, তাহলে ছোট ছোট বিশ রাক্'আতের স্থলে দীর্ঘ চার রাক্'আত পড়বে। এ হাদীস ইমাম সাহেবের দলীল। যেসব বর্ণনায় অধিক সাজদাহকে উত্তম বলা হয়েছে, ওইগুলোতে নির্দিষ্ট কোন কারণ রয়েছে।

২৪৮. হিজরত বহু প্রকারের রয়েছে। মক্কা মুকাররামাহ্ থেকে হাবশার দিকে, মক্কা মুকাররমাহ্ থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে, কাফিররাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের দিকে, অজ্ঞতার স্থান থেকে ইলমের স্থানের দিকে-ইলম অর্জনের জন্য, গুনাহ্ থেকে নেকীর দিকে, কুফর থেকে ইসলামের দিকে। [মিরক্বাত]

২৪৯. হারাম, মাকরূহ-ই তাহরীমী, মাকরূহ-ই তানযীহী -সব ক'টি থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, এসব হচ্ছে সর্বোচ্চ হিজরত। স্মর্তব্য যে, যা হুযূরের কাছে অপছন্দনীয়, তা আল্লাহ্'র কাছেও অপছন্দনীয়।

২৫০. অর্থাৎ মুজাহিদ জিহাদের ময়দান হতে না প্রাণটি নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন, না সম্পদ। গণীমতের প্রশ্নই তো আসে না। জিহাদে যে পরিমাণ কষ্ট অধিক হবে সে পরিমাণ সাওয়াবও বেশি হবে।

اَىُّ السَّاعَاتِ اَفْضَلُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ رَوَاهُ اَحْمَدُ **وَعَنْ** مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لَايُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَيُصَلِّى الْخَمْسَ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ غُفِرَلَهٗ قُلْتُ اَفَلَا اُبَشِّرُهُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ دَعْهُمْ يَعْمَلُوْا رَوَاهُ اَحْمَدُ **وَعَنْهُ** اَنَّهٗ سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَفْضَلِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُحِبَّ لِلّٰهِ وَتَبْغُضَ لِلّٰهِ وَتَعْمَلَ لِسَانَكَ فِىْ ذِكْرِ اللّٰهِ قَالَ وَمَاذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

"কোন্ সময়টি উত্তম?"[২৫১]এরশাদ করলেন, "শেষ রাতের মধ্যম অংশ।"[২৫২] [আহমদ] **৪৩ || হযরত** মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না,[২৫৩] পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে এবং রমযানের রোযা পালন করে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[২৫৪] আমি বললাম, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমি কি মানুষকে এ সুসংবাদ দেবো না?" হুযূর এরশাদ করলেন, "তাদেরকে ছেড়ে দাও আমল করুক।"[২৫৫] [মুসনাদ-ই আহমদ] **৪৪ || তাঁরই** থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট কামিল ঈমান[২৫৬] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হুযূর এরশাদ করলেন, "(কামিল ঈমান হচ্ছে এটা) তুমি আল্লাহ্র উদ্দেশে ভালবাসা ও শত্রুতা পোষণ করো এবং স্বীয় জিহ্বাকে আল্লাহ্র যিক্রে লিপ্ত রাখো।"[২৫৭] আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আর কি?"

---

২৫১. অর্থাৎ নফলের জন্য কোন্ সময় উত্তম? ফরয নামাযগুলোর ওয়াক্ত নিয়ে প্রশ্নই করা হয় নি। যেমনটি উত্তর হতে বুঝা যাচ্ছে।

২৫২. অর্থাৎ রাতের শেষ তৃতীয়াংশকে তিনভাগ করো। সেটার মধ্যম অংশে তাহাজ্জুদ পড়ো। রাতের শেষ ষষ্টমাংশের ওই সময়েই সাহরী খাওয়া, দো'আ-প্রার্থনা করা, বরং ক্ষমা প্রার্থনা করা উত্তম। কেননা ওই সময় রহমত-ই ইলাহী পৃথিবীর দিকে বেশি ধাবিত হয় এবং ওই সময় জাগ্রত হওয়া নাফ্সের জন্য কষ্টদায়ক। পংক্তি-

پچھلی راتیں رحمت ربدی گھر گھر کرے آوازہ!
سونے والیو ربّ ربّ کر لو کھلاہے دروازہ!

অর্থাৎ: শেষ রাতে মহান রবের রহমত ঘরে ঘরে আওয়াজ দেয়- হে ঘুমন্ত লোকেরা! হে রব! হে রব! বলে ডেকে নাও। তাঁর দরজা খোলা রয়েছে।

২৫৩. অর্থাৎ সমস্ত ইসলামী আক্বীদা পোষণ করে। নাজাতের জন্য শুধু তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া যথেষ্ট নয়। নতুবা শয়তানও তাওহীদে (একত্ববাদে) বিশ্বাসী। এর বিশ্লেষণ ইতোপূর্বে করা হয়েছে। কেননা ক্বোরআন-সুন্নাহ'র এ ধরনের বাণীতে 'শিরক' মানে কুফর।

২৫৪. শুরু থেকেই, অথবা শেষ ভাগে। যেহেতু ওই সময় পর্যন্ত জিহাদ, যাকাত ও হজ্জ ফরয হয় নি, অথবা প্রত্যেক লোক এগুলোর উপযুক্ত নয়। সুতরাং এগুলোর উল্লেখ করা হয় নি।

'ক্ষমা' মানে 'সগীরা গুনাহ'র ক্ষমা, নতুবা 'কবীরা গুনাহ' তাওবা ছাড়া এবং বান্দার হক্বসমূহ সেগুলো পরিশোধ করা ব্যতীত ক্ষমা করা হবে না; কিন্তু যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে ভিন্ন কথা।☆

২৫৫. অর্থাৎ সর্বসাধারণের মাঝে সংক্ষিপ্ত হাদীসের প্রসার করো না। কেননা, তারা সেটার মর্ম অনুধাবন করতে পারবে না এবং আমলের চেষ্টা ছেড়ে দেবে। আমি ইতোপূর্বে আরয করেছি যে, এ সকল হাদীস পরে প্রচার করা এ জন্য ছিলো, যাতে দ্বীন গোপন করার অপরাধ না বর্তায়। তাছাড়া, এরূপ হাদীসগুলো মুজতাহিদদের মাধ্যমেই সর্বসাধারণের জন্য উপকারী।

২৫৬. অর্থাৎ মু'মিনের কোন্ অবস্থা ও কোন্ অভ্যাস উত্তম সেটা উত্তর থেকে বুঝা যাচ্ছে।

২৫৭. যাতে যিক্রের বরকত জিহ্বা পর্যন্ত পৌঁছে এবং এর দ্বারা ঈমানে শক্তি অর্জিত হয়। যে জিহ্বা আল্লাহ্র যিক্রে সিক্ত থাকে তা ইন্শা- আল্লাহ্ দোযখের আগুনে জ্বলবে না।

☆ অবশ্য, কিছু কবীরা গুনাহ্ এমন রয়েছে, যেগুলোর প্রতিকারের জন্য তাওবা যথেষ্ট। কিন্তু এমন কিছু কবীরা গুনাহ রয়েছে, যেগুলোর ক্ষমা পাওয়ার জন্য তাওবার পরও ক্বাযা দিতে হয়। যেমন- নামায।

قَالَ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَاتَكْرَهُ لِنَفْسِكَ رَوَاهُ اَحْمَدُ

بَابُ الْكَبَائِرِ وَعَلَامَاتِ النِّفَاقِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ

এরশাদ করলেন, "মানুষের জন্য তা-ই পছন্দ করো যা নিজের জন্য পছন্দ করো এবং তাদের জন্য ওটাই অপছন্দ করো যা নিজের জন্য অপছন্দ করো।" [মুসনাদ-ই আহমদ]

অধ্যায় : কবীরা গুনাহ্সমূহ ও মুনাফিক্বীর আলামতসমূই

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৪৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ[২] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরয করলেন, "হে আল্লাহ্'র রসূল! কোন্ গুনাহ্[৩] আল্লাহ্'র নিকট বেশি বড়?"

১. 'গুনাহ্-ই কবীরাহ্' হচ্ছে ওই গুনাহ, যার নিষেধাজ্ঞা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। অথবা ওই গুনাহ, যার জন্য শরীয়ত কিছু শাস্তি নির্ধারণ করেছে। অথবা ওই গুনাহ, যা দ্বারা দ্বীনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। অথবা প্রতিটি গুনাহ, ছোট গুনাহ্'র অনুপাতে কবীরাহ্ গুনাহ্ হিসেবে গণ্য হবে। অথবা যে সব ছোট গুনাহ্ সর্বদা করা হবে, তা কবীরাহ্। অথবা একই গুনাহ্ যা একজনের জন্য সগীরাহ্ এবং অন্যজনের জন্য কবীরাহ্; তা হচ্ছে- حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّاٰتُ لِلْمُقَرَّبِيْنَ (যেসব কাজ সাধারণ সৎকর্ম পরায়নদের জন্য পুণ্যময় কাজ; কিন্তু আল্লাহ্'র নৈকট্যধন্য লোকদের জন্য গুনাহ্ হিসেবে বিবেচ্য।) অথবা একজনের ক্ষেত্রে সগীরাহ্, অন্যজনের ক্ষেত্রে কবীরাহ্। সাধারণ মুসলমানের অবমাননা সগীরাহ্ গুনাহ্, ওলামা-মাশাইখ'র অবমাননা কবীরাহ্ গুনাহ্। নবী কিংবা ক্বোরআন অথবা কা'বাকে অবজ্ঞা করা কুফর। কবীরাহ্ গুনাহ্ এবং নিফাক্বের আলামতের মধ্যে عموم من وجه এর সম্পর্ক বিদ্যমান।

২. তাঁর উপনাম আবূ আবদুর রহমান ও ইবনে উম্মে আবদ। তিনি বনূ হুযায়ল গোত্রের লোক। তিনি প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ও মহামর্যাদাবান সাহাবী। তিনি হযরত ওমর ফারূক্ব-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র আগে মুসলমান হন এবং দু'হিজরতের সৌভাগ্য অর্জনকারী ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ প্রথমে হাবশার দিকে ও পরে মদীনা ত্বায়্যেবায় হিজরত করেন। বদরসহ সকল যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে ছিলেন। তিনি হুযূরের না'লাঈন শরীফ (পাদুকাযুগল মুবারক) বহনকারী ও গোপন রহস্যের ধারক ছিলেন। সফরে হুযূরের বরকতময় মিসওয়াক ও পানির লোটা তাঁর কাছেই থাকতো। ফারূক্ব-ই আ'যমের শাসনকালে কূফার বিচারপতি ছিলেন। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র শাসনামলে মদীনা ত্বায়্যেবায় চলে যান। ৬০ বছরের অধিক হায়াত পান। হিজরী ৩২ সনে মদীনা-ই পাকে ওফাত পান। জান্নাতুল বক্বী'তে তাঁকে দাফন করা হয়। খোলাফা-ই রাশিদীনের পর বড় ফক্বীহ ও আলিম সাহাবী তিনিই ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁকেই অনুসরণ করেন। [রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]

৩. শরীয়তের দৃষ্টিতে মন্দ জিনিসের নামই গুনাহ্। সেটা চার প্রকারে বিভক্ত:

এক. যেগুলো তাওবা ব্যতীত ক্ষমা হয় না। যেমন- কুফর ও শিরক।

দুই. যেগুলো নেক আমলের বরকতেও মাফ হয়ে যায়। যেমন- সগীরা গুনাহ্।

তিন. যেগুলো তাওবা ব্যতীত মাফ হবারও আশা থাকে। যেমন- 'হুক্বূক্বুল্লাহ' (আল্লাহ্'র হক্বসমূহ) সম্পর্কিত বড় গুনাহ্। (কেউ তাওবা করার ইচ্ছা থাকলেও এর পূর্বে মৃত্যুবরণ করলো।)

চার. যেগুলোর ক্ষমার জন্য তাওবার সাথে সাথে মাখলূক্বের সন্তুষ্টিও প্রয়োজন হয়। যেমন- 'হাক্বক্বুল ইবাদ' (বান্দার হক্ব)। [মিরক্বাত]

قَالَ اَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تَزْنِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَهَا وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ الاٰيَة مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ

হুযূর এরশাদ করলেন, "এ যে, তুমি আল্লাহ্'র সাথে শরীক স্থির করবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[৪] আরয করলেন, "তারপর কোন্ গুনাহ্?" এরশাদ করলেন, "এ যে, তুমি স্বীয় সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সাথে আহার করবে।"[৫] আরয করলেন, "তারপর কোন্ গুনাহ্?" এরশাদ করলেন, "এ যে, স্বীয় প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করবে।"[৬] তখন আল্লাহ্ তা'আলা এর সত্যায়নে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেছেন, আর ওই সব লোক আল্লাহ্'র সাথে অন্য উপাস্যের উপাসনা করে না, ওই প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন[৭] এবং ব্যভিচার করে না আল-আয়াত।[বোখারী, মুসলিম] ৪৬ ‖ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্'র সাথে শির্ক করা, মাতাপিতার নাফরমানী করা[৮] কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা[৯] কবীরাহ্ গুনাহ্সমূহের অন্তর্ভুক্ত।"

৪. অর্থাৎ শির্ক ও কুফর। কেননা, এগুলো আকবারুল কাবা-ইর (সর্বাধিক বড় গুনাহ)।

৫. যেমন আরবের মধ্যে প্রচলন ছিলো যে, দরিদ্র লোকেরা ব্যয়ভার বহনে অপারগতার ভয়ে পুত্র ও কন্যা উভয়কে হত্যা করতো। যেহেতু এতে নিরপরাধ মানুষ হত্যা, নিকটা-ত্মীয়ের উপর যুলম্ এবং আল্লাহ্'ই রিযক্বদাতা হবার উপর অবিশ্বাস -এ তিনটি অপরাধের সমাবেশ ঘটেছে, সেহেতু সেটাকে কুফর ও শিরকের পরবর্তী স্থানে রাখা হয়েছে।

৬. কেননা, যিনা স্বয়ং কবীরাহ্ গুনাহ্ এবং এতে প্রতিবেশীর হক্বও নষ্ট করা হয়। কেননা, প্রত্যেকে স্বীয় প্রতিবেশীর উপর ভরসা করে থাকে এবং তার জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মান সংরক্ষণ করাকে নিজের জন্য ফরয মনে করেন। স্মর্তব্য যে, এখানে কবীরাহ্ গুনাহ্ শুধু ৪টি বলা হয়েছে- প্রয়োজন ও ক্ষেত্র বিবেচনায়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন যে, গুনাহে কবীরাহ্ ৭০টি এবং হযরত সা'ঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন- কবীরাহ্ গুনাহ্ ৭০০টি।[মিরক্বাত] অর্থাৎ গুনাহে কবীরাহ্'র প্রকার ৭০টি এবং সংখ্যা ৭০০টি।

৭. এই আয়াতে حَرَّمَ اللّٰهُ الخ দ্বারা এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, মু'মিন, কাফির, যিম্মী ও মুস্তা'মান (নিরাপত্তায় আশ্রয়ী)কে হত্যা করা হারাম। اِلَّا بِالْحَقِّ আয়াতাংশের মধ্যে ওই সকল অপরাধের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলোর শাস্তি হচ্ছে হত্যা। যেমন- মুরতাদ্দ (ধর্মত্যাগী বা ঈমানের পর কুফরকারী) হয়ে যাওয়া অথবা যিনা করা, অথবা অন্যায়ভাবে হত্যা করা। অর্থাৎ যদি মু'মিন এ ৩টির মধ্যে কোন অপরাধ করে, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে।

৮. অর্থাৎ তাঁদের হক্বসমূহ আদায় না করা অথবা তাঁদের বৈধ আদেশসমূহের বিরোধিতা করা। মাতাপিতার আদেশ বলতে দাদা-দাদী এবং নানা-নানীর আদেশও বুঝায়। এ বিন্যাস দ্বারা বুঝা গেলো যে, মাতাপিতার অবাধ্যতা সবচেয়ে জঘন্য গুনাহ্। কারণ, শিরকের পরেই সেটার উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্যই মহান রব স্বীয় ইবাদতের সাথে মাতাপিতার আনুগত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اَنْ لَّاتَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ এ যে তোমরা ইবাদত করবে না, কিন্তু তাঁরই এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। [১৭:২৩]

৯. ইয়ামীন-ই গুমূস (মিথ্যা শপথ) ওই শপথকে বলা হয়, যাতে দেখেশুনে অতীত ঘটনার ব্যাপারে মিথ্যা শপথ করা হয়। এতে গুনাহ্ রয়েছে। এর কাফফারা নেই, এ শপথ মানুষকে গুনাহ্'র মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। এ কারণে সেটাকে غَمُوْس (ডুবানো) বলা হয়। যেহেতু মিথ্যা ও মিথ্যা শপথ হাজার হাজার গুনাহ্'র মূল, সেহেতু এটা কবীরাহ্ গুনাহ্। স্মর্তব্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উত্তরগুলো প্রশ্নকারীদের অবস্থানুসারে হয়ে থাকে।

رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَفِىْ رِوَايَةِ اَنَسٍ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ بَدَلَ الْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاهُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰو وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

এটি ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণনায় 'মিথ্যা শপথ'-এর স্থলে 'মিথ্যা সাক্ষ্য' রয়েছে।[বুখারী ও মুসলিম]

৪৭ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বেঁচে থাকো।" সাহাবীগণ আরয করলেন, "হে আল্লাহ্'র রসূল! সেগুলো কি কি?" তিনি এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্'র সাথে শির্ক করা,[১০] যাদু করা,[১১] অন্যায়ভাবে ওই ব্যক্তিকে হত্যা করা, যাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া,[১২] ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা,[১৩] জিহাদের দিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন (পলায়ন) করা,[১৪] সহজ-সরল সচ্চরিত্রবতী নারীদেরকে অপবাদ দেওয়া।"[১৫] [বোখারী ও মুসলিম শরীফ]

১০. অর্থাৎ নিঃশর্ত কুফর। কেননা, কোন কুফরই সগীরাহ্ গুনাহ্ নয়, সবই কবীরাহ্ পর্যায়ের গুনাহ্।

১১. 'سحر' মানে যাদু করা, অথবা বিনা প্রয়োজনে যাদু শেখা। স্মর্তব্য যে, যাদুর প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য যাদু শিখা জায়েয; বরং আবশ্যক। যদি যাদুতে কুফরী শব্দাবলী থাকে তাহলে যাদুকর মুরতাদ্দ হয়ে যায়, নতুবা নিছক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হবে। উভয় প্রকারের যাদুকরকেই হত্যা করা ওয়াজিব। প্রথম প্রকারের যাদুকরকে ধর্মত্যাগ ও ফ্যাসাদের কারণে এবং দ্বিতীয় প্রকারের যাদুকরকে শুধু ফ্যাসাদের কারণে।-[আশি''আতুল লুম'আত]

১২. অর্থাৎ সুদ খাওয়া- চাই ভক্ষণ করুক, নতুবা তা দ্বারা পরিধান করুক, অথবা অন্য কোন কাজে লাগাক। এ থেকে বুঝা গেলো যে, সুদ লওয়া কবীরাহ্ গুনাহ্, দেওয়াও।

১৩. অর্থাৎ যুল্‌ম করে তার সম্পদ গ্রাস করা। কেননা ইয়াতীম দয়া পাবার উপযুক্ত। তার উপর যুল্‌ম করা অত্যন্ত জঘন্য গুনাহ্।

১৪. অর্থাৎ কাফিরদের সাথে মোকাবেলা না করে পালিয়ে যাওয়া। কেননা, এতে মুজাহিদদের ক্ষতি এবং ইসলামের অবমাননা করা হয়।

স্মর্তব্য যে, জিহাদ থেকে পলায়ন করা কবীরাহ্ গুনাহ্- যদি কাপুরুষোচিত কারণে হয়। যদি কাফিরদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবার কারণে বাধ্য হয়ে মোর্চা ত্যাগ করতে হয়, তাহলে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। এমন পরিস্থিতিতে অটল থাকা এবং শহীদ হয়ে যাওয়া উত্তম; কিন্তু পিছনে সরে যাওয়া কবীরাহ্ গুনাহ্ নয়। যুদ্ধের রণকৌশলের ভিত্তিতে পেছনে সরে যাওয়াও সাওয়াব।

১৫. যিনার অপবাদ। অর্থাৎ যে পুণ্যবতী নারী যিনা সম্পর্কে জানেও না তাকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যিনার অপবাদ দেওয়া। সুতরাং ক্ষুব্ধ হয়ে কোন মহিলাকে যিনাকারিনী বা চরিত্রহীনা বলাও এর অন্তর্ভুক্ত।

স্মর্তব্য যে, নেক্কার পুরুষ ও সচেতন মহিলাদেরকে যিনার অপবাদ দেওয়াও গুনাহ; কিন্তু অনবহিত মহিলাদেরকে অপবাদ দেওয়া অধিকতর গুনাহ্। যার শাস্তি হচ্ছে- দুনিয়ায় আশি চাবুক মারা এবং আখিরাতে কঠিন আযাব।

পরিশিষ্ট

'মিরক্বাত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৭টি গুনাহ্ অতি জঘন্য।

৪টি অন্তরের:

এক. শির্ক ও কুফর, দুই. গুনাহ্'র উপর অটল থাকার নিয়্যত। তিন. আল্লাহ্'র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং চার. আযাব থেকে নিরাপদ মনে করা।

৪টি জিহ্বার:

এক. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, দুই. পূতঃপবিত্রদেরকে অপবাদ দেওয়া, তিন. মিথ্যা শপথ ও চার. যাদু করা।

৩টি পেটের গুনাহ্:

এক. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, দুই. মদ্যপান করা এবং

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَايَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَايَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَغُلُّ اَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاِيَّاكُمْ اِيَّاكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّلَايَقْتُلُ حِيْنَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ عِكْرَمَةُ قُلْتُ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ

৪৮ ॥ তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এরূপ হয় না যে, যিনাকারী যিনা করা অবস্থায় মু'মিন থাকবে।[১৬] এরূপও হয় না যে, চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাকবে। এরূপও হয় না যে, মদ্যপায়ী মদ পান করার সময় মু'মিন থাকবে এবং এটাও হয় না যে, ডাকাত ডাকাতি করার সময় মু'মিন থাকবে। এতে মানুষ অসহায় দৃষ্টিতে স্বীয় সম্পদ চলে যেতে দেখতে থাকে।[১৭] আর এমনও হয় না যে, খিয়ানতকারী খিয়ানত করার[১৮] সময় মু'মিন থাকবে। সুতরাং এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো। [বোখারী ও মুসলিম]

হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আছে যে, এরূপ হয় না যে, হত্যাকারী হত্যা করার সময় মু'মিন থাকবে।[১৯] হযরত ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,[২০] "আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম,

২টি লজ্জাস্থানের:

এক. যিনা করা, দুই. পায়ুসঙ্গম করা।

২টি হাতের গুনাহ:

এক. চুরি করা, দুই. অন্যায়ভাবে হত্যা করা।

১টি পায়ের গুনাহ :

জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা। আর

১টি সমস্ত শরীরের গুনাহ-

অর্থাৎ মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া।

১৬. এসব স্থানে ঈমান না থাকা মানে পরিপূর্ণ ঈমান না থাকা। অথবা ঈমানের নূর না থাকা।

অর্থাৎ ওই সকল গুনাহয় লিপ্ত অবস্থায় গুনাহ্গারের কাছ থেকে তার ঈমানের নূর বের হয়ে যায়। অন্যথায় এ সব গুনাহ্ কুফর নয়। আর এ সব গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তি মুরতাদ্দও নয়। যদি ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে কাফির হয়ে মারা যাবে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ অর্থাৎ যদিও যিনা করে, যদিও চুরি করে তবুও সে মু'মিন। এর বিশ্লেষণ পরবর্তী হাদীস শরীফে আসছে।

১৭. ওই ডাকাতকে (দেখতে থাকে)। অর্থাৎ প্রকাশ্যে মাল লুণ্ঠন করে নেয় এবং মালিক তাকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। অথবা নিজের সম্পদকে। অসহায় দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। (আর মনে মনে আফসোস করে) 'হায়! আমার সম্পদ চলে যাচ্ছে।'

ডাকাতির মধ্যে ৩টি অপরাধ থাকে:

এক. অপরের মাল অবৈধভাবে কব্জা করা,
দুই. প্রকাশ্যে অপরের মাল ছিনিয়ে নেওয়া এবং
তিন. অন্তরের কঠোরতা।

কারণ, মানুষের দুঃখ, আফসোস এবং কান্না তার অন্তরে রেখাপাত করে না। সুতরাং এটা বহু গুনাহ্'র সমষ্টি হল, যা মু'মিনের জন্য শোভা পায় না।

১৮. غُلُوْل (গুলূল) গনীমতের মালে খিয়ানত করাকে বলা হয়। কখনও তা সাধারণ খিয়ানত করার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই অধিক স্পষ্ট।

১৯. 'হত্যা' (কৃতল) দ্বারা উদ্দেশ্য- স্বেচ্ছায় অন্যায়ভাবে হত্যা করা। সুতরাং হাদীস শরীফের মর্মার্থ সুস্পষ্ট। অন্যথায় কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীকে হত্যা করা ইবাদত। যেমন- 'ক্বিসাস' বা হাকিমের বিচারের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা ও যিনার নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা ইত্যাদি।

২০. তিনি ইকরামা (ইবনে আবূ জাহ্ল) নন; বরং তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস'র আযাদকৃত ক্রীতদাস। তাঁর খাদিম ও কাতেব (লিখক)। -মিরক্বাত

كَيْفَ يُنْزَعُ الْاِيْمَانُ مِنْهُ قَالَ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ ثُمَّ اَخْرَجَهَا فَاِنْ تَابَ
عَادَ اِلَيْهِ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَايَكُوْنُ هٰذَا مُؤْمِنًا
تَامًّا وَلَايَكُوْنُ لَهٗ نُوْرُ الْاِيْمَانِ. هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىْ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ. زَادَ مُسْلِمٌ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ
مُسْلِمٌ ثُمَّ اتَّفَقَا اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

তার থেকে ঈমান কিভাবে বের হয়?" তিনি বললেন, "এভাবে!" এটা বলে তিনি স্বীয় আঙ্গুলগুলো পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করালেন, তারপর আঙ্গুলগুলো বের করলেন।[২১] অতএব, যদি তাওবা করে, তাহলে ঈমান এভাবে ফিরে আসে![২২] তারপর আঙ্গুলগুলো পরস্পর গেঁথে নিলেন। আবূ আবদুল্লাহ্ বললেন,[২৩] এ হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে- এ লোকটি পরিপূর্ণ মু'মিন থাকে না এবং তার মধ্যে ঈমানের নূরও থাকে না। এগুলো ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র বচন।

৪৯ || হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- মুনাফিক্বের আলামত তিনটি।[২৪] ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ হাদীসকে বর্ধিত আকারে বর্ণনা করেছেন- "যদিও রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে মনে করে।" অতঃপর মুসলিম ও বোখারী ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছেন- "যখন কথা বলে (তখন) মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।"[২৫]

---

২১. অর্থাৎ 'নূরে ঈমানী' মু'মিনের শিরা-উপশিরায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন গ্রথিত আঙ্গুলসমূহ; কিন্তু এসব গুনাহ্'য় লিপ্ত অবস্থায় ওই নূর ও ঈমানী 'হায়া' (লজ্জা) সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়।

২২. আমি ইতোপূর্বে আরয করেছি যে, প্রত্যেক গুনাহ্'র তাওবা ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং 'হুকূকুল ইবাদ' (বান্দার হকসমূহ)'র তাওবার সময় তার হক্ব আদায় করে দেয়া পূর্বশর্ত। অথবা ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।
হযরত হাসান বসরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, এ ধরনের অপরাধীদেরকে সুন্দর সুন্দর উপাধী দ্বারা সম্বোধন করা যাবে না (তাওবা করার পূর্বে)। اَوْلِيَائُهُ الْمُؤْمِنُوْنَ (মু'মিনগণ) এবং اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (আল্লাহ্'র বন্ধু মু'মিনগণই) এ ধরনের সম্মানসূচক সম্বোধন থেকে বঞ্চিত। এখন তাদেরকে সম্বোধন করা হবে চোর, যিনাকারী ও ফাসিক্ব হিসেবে। [মিরক্বাত]

২৩. অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি।

২৪. 'মুনাফিক্ব' মানে ই'তিক্বাদী (বিশ্বাসগত) মুনাফিক্ব। অর্থাৎ অন্তরের দিক দিয়ে কাফির এবং মুখে মুসলমান। এ দোষগুলো তাদের আলামত; কিন্তু আলামতের সাথে আলামতধারী থাকা জরুরি নয়। কাকের চিহ্ন 'কালো হওয়া'; কিন্তু প্রতিটি কালো জিনিস কাক নয়।
অর্থাৎ এ আলামতগুলো মুনাফিক্ব'র। সুতরাং যাদের মধ্যে এ আলামতগুলো পাওয়া যাবে তাদের প্রত্যেককে মুনাফিক্ব বলা যাবে না। মৌলিক ঈমান তার মধ্যে থাকলে এ সব আলামতরূপী দোষগুলোর কারণে গুনাহগার হবে মাত্র।
সুতরাং বাতিল আক্বীদাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে এসব আলামতের সমন্বয় ঘটলে সে-ই প্রকৃত মুনাফিক্ব।

২৫. অর্থাৎ এগুলো মুনাফিক্বদের কাজ। মুসলমানকে এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এটা নয় যে, এ অপরাধগুলো স্বয়ং নিফাক্ব।
হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালামের ভাইয়েরা এ তিন অপরাধই করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা মুনাফিক্ব সাব্যস্ত হননি কাফিরও নন। সুতরাং হাদীসের উপর কোন আপত্তি নেই।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ اِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً وَ اِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫০ || হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যার মধ্যে চারটি দূষণীয় স্বভাব থাকে[২৬] সে খাঁটি মুনাফিক্ব,[২৭] এবং যার মধ্যে এর থেকে একটি দোষ থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিক্বী'র একটি দোষ থাকবে। যতক্ষণ সে তা বর্জন না করে- যখন তার নিকট আমানত রাখা হবে তখন খিয়ানত করবে, যখন কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে, যখন ওয়াদা করবে তখন তা ভঙ্গ করবে এবং যখন ঝগড়া করবে তখন গালি দেবে।[২৮] [বোখারী, মুসলিম]

৫১ || হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মুনাফিক্বের উপমা ছাগীর ন্যায়, যা দু'টি (পাঁঠা) ছাগলের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে,[২৯] কখনও এ ছাগলের কাছে পৌঁছে, কখনো অপর ছাগলের কাছে যায়। [মুসলিম]

২৬. এ হাদীস শরীফ পূর্ববর্তী হাদীসের বিরোধী নয়। একটি জিনিসের অনেকগুলো আলামত হয়ে থাকে। কখনও সবগুলো বর্ণনা করে দেওয়া হয়, কখনো কম-বেশি বর্ণনা করা হয়। ওই তিনটিও মুনাফিক্বীর আলামত ছিল, এ চারটিও মুনাফিক্বীর আলামত।

২৭. 'মুনাফিক্ব-ই আমলী' অর্থাৎ মুনাফিক্বদের ন্যায় কর্মকাণ্ড সম্পাদনকারী। যেমন- মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ "নামায কায়েম করো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না" [৩০:৩১]। অথবা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বর্জন করেছে, সে কাফির হয়ে গেছে।" অর্থাৎ 'বেনামাযী হওয়া' কাফিরসুলভ কাজ অর্থাৎ কাফিরদের কাজ।☆

২৮. এ থেকে ওই সকল লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যাদের দৃষ্টিতে গালিগালাজ করা ইবাদত, বরং ঈমানের মূল। ইসলামে শয়তান, ফির'আউন ও হামানকে বিনা প্রয়োজনে গালি দেওয়াও মন্দ কাজ। কেননা, এতে স্বীয় মুখই অপবিত্র হয়।

২৯. দু'টিকে রাজী করার এবং দু'টি থেকেই স্বাদ ও উপকার লাভ করার জন্য; যা দ্বারা তার বাচ্চা প্রজননের ইচ্ছা বুঝা যায়।

স্মর্তব্য যে, কাফির ও মু'মিন সকলকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় থাকা মারাত্মক ব্যাধি। যা করলে তার নিজের কোন দ্বীন থাকে না। এ জন্য এখানে এরূপ মন্দ জিনিসের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। যাতে অন্তরে এর প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

এই নিফাক্ব রোগে বর্তমানে অনেক বহুরূপী মুসলমানও আক্রান্ত। কিছু কিছু জ্ঞানপাপীর দৃষ্টিতে- কৌশল অবলম্বন করে কাফির ও মু'মিন সকলকে সন্তুষ্ট করা এবং সকলের কাছ থেকে উপকৃত হওয়া ইবাদত। আল্লাহ, আমাদেরকে এরূপ শয়তানী ইবাদত থেকে রক্ষা করুন!

☆ আল্লামা ইব্রাহীম হালাভী 'সগীরী' নামক কিতাবে আলোচ্য হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন: تَرْك বা বর্জন করা মানে নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা বা এটাকে ফরয মনে না করা। অতএব, নামায না পড়াকে যদি জঘন্য পাপ মনে করে আল্লাহ'র কাছে বা মানুষের কাছে লজ্জাবোধ করে, কিংবা এমনটিকে গুনাহ্ বলে মেনে নেয়, তবে সে কাফির নয়, বরং ফাসিক্ব।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ يَهُوْدِىٌّ لِّصَاحِبِهٖ اِذْهَبْ بِنَا اِلٰى هٰذَا النَّبِىِّ فَقَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ لَاتَقُلْ نَبِىٌّ اِنَّهٗ لَوْسَمِعَكَ لَكَانَ لَهٗ اَرْبَعُ اَعْيُنٍ فَاَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَئَلَاهُ عَنْ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَاتَسْرِقُوْا وَ لَاتَزْنُوْا وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوْا بِبَرِئٍ اِلٰى ذِىْ سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهٗ وَلَا تَسْحَرُوْا وَلَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৫২ ॥ হযরত সাফওয়ান ইবনে 'আস্সাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[৩০] তিনি বলেন, এক ইহুদী তার সাথীকে বললো, আমাকে ওই নবীর কাছে নিয়ে চলো। তখন তার সাথী বললো, তাঁকে নবী বলো না।[৩১] যদি তিনি তা শুনে ফেলেন, তাহলে তিনি চার চোখ বিশিষ্ট অর্থাৎ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন।[৩২] অতঃপর ওই দু'জন হুযূরের দরবারে হাযির হলো এবং তারা দু'জন তাঁকে সুস্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো।[৩৩] নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, কোন কিছুকে আল্লাহ'র সাথে শরীক করো না,[৩৪] চুরি করো না, যিনা করো না, অন্যায়ভাবে কোন মর্যাদাবান প্রাণ হত্যা করো না, কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে শাসকের কাছে নিয়ে যেয়ো না, যাতে তাকে হত্যা করে দেয়,[৩৫] যাদু করো না, সুদ খেয়ো না,[৩৬]

৩০. তিনি সাহাবী। কূফা'র অধিবাসী ও বনূ মুরাদ গোত্রের লোক। বারটি যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৩১. বুঝা যাচ্ছে যে, ইহুদীদের অন্তর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সত্য হবার পক্ষে সাক্ষ্য দিতো, কিন্তু শুধু জেদের বশেই তারা অস্বীকার করতো।

৩২. অর্থাৎ তিনি খুশী হয়ে যাবেন এবং ইহুদীদেরকে এ কথা বলতে পারবেন, "তোমাদের লোকও আমাকে নবী বলে থাকে।" সুবহানাল্লাহ! মহত্ব সেটাই, শত্রুও যার স্বীকৃতি দেয়।

৩৩. সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী মানে হচ্ছে-
এক. হয়তো নেক আমলসমূহ; যেগুলো আমলকারী নেক্কার হবার আলামত হয়। এতদভিত্তিতে হুযূরের এ উত্তর প্রশ্নের অনুরূপ।
দুই. অথবা এটা দ্বারা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র সুস্পষ্ট নয়টি মু'জিযা বুঝানো হয়েছে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ (অর্থাৎ নিশ্চয় আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি।১৭:১০১) এতদভিত্তিতে, হুযূরের উত্তর হিকমতপূর্ণ। অর্থাৎ ওইগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, বরং নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করো এবং তোমাদের কি করা উচিত সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো।
স্মর্তব্য যে, তারা নয়টি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলো। হুযূর দশটি জিনিস বলে দিয়েছেন। ৯টি হচ্ছে- যেগুলো প্রত্যেক দ্বীনের আহকাম (বিধান) এবং দশমটি হচ্ছে ইহুদী ধর্মের সাথে নির্দিষ্ট; অর্থাৎ শনিবারে শিকার না করা।

৩৪. হতে পারে যে, এতে ইঙ্গিতে এ কথা বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা মুশরিক। কেননা, তারা হযরত ওযায়র আলায়হিস্ সালামকে আল্লাহ'র পুত্র বলে মনে করে, অথচ পুত্র পিতার অংশ হয়ে থাকে।

৩৫. কেননা, এটা দ্বিগুণ অপরাধ। বিচারককে ধোঁকা দেওয়া এবং নির্দোষকে হত্যা করা। এটাও সকল দ্বীনেই হারাম ছিলো।

৩৬. এ থেকে বুঝা গেলো যে, সুদ কোন নবীর দ্বীনে জায়েয ছিলো না। কেননা, এটা হচ্ছে ওই আমলগুলোর তালিকা, যেগুলো সকল দ্বীনে প্রচলিত ছিলো।

وَلَاتَقْذِفُوْا مُحْصَنَةً وَلَاتَوَلُّوْا لِلْفِرَارِ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً اَلْيَهُوْدُ اَنْ لَّاتَعْتَدُوْا فِى السَّبْتِ قَالَ فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَا نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِىٌّ قَالَ فَمَايَمْنَعُكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوْنِىْ قَالَ اِنَّ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَارَبَّهٗ اَنْ لَّايَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ نَبِىٌّ وَّاِنَّانَخَافُ اِنْ تَبِعْنَاكَ اَنْ يَّقْتُلَنَا الْيَهُوْدُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ

পুণ্যবতী নারীকে যিনার অপবাদ দিও না, জিহাদের দিন পলায়ন করার জন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না।[৩৭] আর হে ইহুদীরা! তোমাদের উপর বিশেষ করে এটাও আবশ্যক যে, শনিবারের ব্যাপারে তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।[৩৮] হাদীস বর্ণনাকারী বলছেন, তখন তারা দু'জন হুযূরের হাত ও পা মুবারকে চুমু খেলো,[৩৯] আর বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্য নবী।[৪০] হুযূর এরশাদ করলেন, তাহলে তোমাদেরকে আমার আনুগত্য থেকে কোন্ জিনিস বিরত রাখছে?[৪১] তারা বললো, হযরত দাউদ আলায়হিস সালাম মহান রবের কাছে দো'আ করেছিলেন, যেন তাঁর বংশধরের মধ্যে নুবূয়ত থাকে।[৪২] আমরা আশঙ্কা করছি যে, যদি আমরা আপনার আনুগত্য করি তাহলে ইহুদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে। [তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ]

৩৭. এ বিধান ওইসব দ্বীনে ছিলো, যেগুলোতে জিহাদ ফরয ছিলো। যে দ্বীনে জিহাদ ফরযই ছিলো না, সেগুলোতে এ বিধানও ছিলো না।

৩৮. ওই দিনে শিকার করো না। অর্থাৎ শনিবার শিকার না করা তোমাদের তাওরীতেরই হুকুম। এটা তোমাদের জন্য আয়াতে বাইয়্যিনাহ্ ছিলো। এখন তাওরীত রহিত হয়েছে। (তাই) এ হুকুমও রহিত হয়ে গেছে।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত আসমানী কিতাব সম্পর্কে অবগত এবং এ অবগতি হুযূর নবী হওয়ার প্রমাণ। এ জন্যই ওই প্রশ্নকারী হুযূরের কদমে ঝুঁকে পড়েছিলো।

৩৯. এটা প্রকাশ্য কথা যে, মুবারক পদযুগলেও মুখ লাগিয়ে চুম্বন করেছেন। বুঝা গেলো যে, বুযুর্গদের কদম চুম্বন করা জায়েয। আর কদমবুচির জন্য ঝুঁকে যাওয়া সাজদাও নয়, নিষিদ্ধও নয়। নতুবা হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম তাদেরকে নিষেধ করে দিতেন।

স্মর্তব্য যে, ক্বোরআন করীম, কালো পাথর (হাজর-ই আসওয়াদ), বুযুর্গদের হাত-পা এবং মাতাপিতার হাত-পায়ে চুম্বন করা সাওয়াব এবং বরকতের মাধ্যমও। কোন কোন বুযুর্গ তো স্বীয় মাশাইখ'র তাবাররুকেও চুম্বন করতেন। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মিম্বর শরীফে চুম্বন করতেন।

চুম্বনের আলোচনা এবং সেটার প্রকারভেদ আমার 'জা-আল হক্ব ওয়া যাহাক্বাল বাত্বিল' কিতাব দেখুন।

৪০. কেননা, 'উম্মী' (যিনি বাহ্যিকভাবে কোন ওস্তাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, এমন ব্যক্তিত্ব)'র জন্য এ ধরনের ইল্‌ম সুস্পষ্ট মু'জিযা।

স্মর্তব্য যে, এ 'সাক্ষ্য' মানে জানা ও পরিচিতি। অর্থাৎ আমরা জেনে নিলাম যে, আপনি নবী, সুতরাং তারা এ শব্দ দ্বারা মু'মিন হয় নি। এ জন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পরবর্তী প্রশ্ন করাও যথার্থ হয়েছে।

৪১. অর্থাৎ যখন তোমরা আমাকে নবী জেনে নিয়েছো, তখন কেন মেনে নিচ্ছো না এবং মুসলমানও কেন হচ্ছো না?

৪২. তাঁর দো'আ কবূল হয়েছে। আর আপনি তো তাঁর বংশধরের নন। কেননা, তিনি বনী ইসরাঈল ছিলেন, আপনি তো বনী ইসমাঈল।

এটা তাদের পুরোপুরি অপবাদ ছিলো। সমস্ত নবী আমাদের হুযূর সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম এ দো'আ কিভাবে করতে পারেন? আশ্চর্যের বিষয় যে, এরা দু'জন এখনই হুযূর'র সত্যায়ন করেছে এবং এখন আবার এ অপবাদ দিচ্ছে!

কোন কোন ইহুদী এটাও বলেছিলো যে, হুযূর শুধু আরবের মুশরিকদের নবী, আমাদের নবী নন। সম্ভবত: এদের উদ্দেশ্যও এটা হবে।

বস্তুতঃ এটাও ভুল ছিলো। তাওরীত ও যাবূরে এ সংবাদ ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত জগতের নবী হবেন, সকল শরীয়তের রহিতকারী হবেন।

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ثَلٰثٌ مِّنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَاتُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَّ لَاتُخْرِجْهُ مِنَ الْاِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَّ الْجِهَادُ مَاضٍ مُذْ بَعَثَنِيَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الدَّجَّالَ

৫৩ || হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তিনটি জিনিস ঈমানের ভিত্তি[৪৩]- যে লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ বলে তার থেকে (মুখকে) সংযত রাখা,[৪৪] অর্থাৎ নিছক গুনাহ্র কারণে তাকে কাফির বলো না[৪৫] এবং না তাকে শুধু কোন আমলের কারণে ইসলামের বাইরে মনে করো।[৪৬] আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ জারি রয়েছে, যখন থেকে আল্লাহ্ আমাকে প্রেরণ করেছেন[৪৭] ওই সময় পর্যন্ত যে, এ উম্মতের সর্বশেষ দল দাজ্জালের সাথে জিহাদ করবে।[৪৮]

৪৩. অর্থাৎ যার উপর ঈমানের ভবন প্রতিষ্ঠিত, যেগুলো ব্যতীত মানুষ মু'মিন হতে পারে না।

৪৪. তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করবে না। 'কালেমা পড়া' মানে সমস্ত ইসলামী আক্বাইদ মেনে নেওয়া। যা আমি বহুবার উল্লেখ করেছি।

ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, "আমরা আহলে ক্বেবলাকে কাফির বলি না।" এ কথার উদ্দেশ্যও এটা। কারো থেকে কুফরী শব্দ পাওয়া গেলে, কেউ দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়াদি, যেগুলো খবর-ই মুতাওয়াতির কিংবা ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত, অস্বীকার করলে, মুখে বা কাজে তা করা প্রমাণিত হলে সে আহলে ক্বেবলা থাকে না; বরং কাফির বা মুরতাদ্দ হয়ে যায়। যেমন- ক্বোরআন মজীদকে মাখলূক্ব (সৃষ্ট) বলে মু'তাযিলা সম্প্রদায়, খতমে নুবূয়তকে অস্বীকার করে ক্বাদিয়ানী ও তাদের সহযোগী দেওবন্দীরা এবং যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামসহ সমস্ত নবীর দো'আ নিশ্চিত কবূল হওয়াকে অস্বীকার করে অথবা কথায় ও কাজে তার পরিচয় দেয় তারা সবাই আহলে ক্বেবলা বহির্ভূত। [শরহে ফিক্বহে আকবর, উসূলে বযদভী]

শুধু কালেমা পাঠ ও কা'বা ঘরের দিকে মুখ ফেরানো ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। মুনাফিক্বরা এ দু'টি কাজ করতো, কিন্তু তারপরও কাফির ছিলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩টি ফের্কা হবে। একটি ব্যতীত সবাই জাহান্নামী।" খারেজীদের সম্পর্কে বলেছেন যে, "তারা অত্যন্ত নামাযী এবং ক্বোরআন পাঠকারী হবে, কিন্তু দ্বীন থেকে এমনভাবে দূরে থাকবে, যেমনিভাবে নিক্ষিপ্ত তীরফলক ধনুক থেকে বের হয়ে যায়।" এ ব্যাখ্যার সমর্থন পরবর্তী বিষয়বস্তু থেকেও পাওয়া যায়।

৪৫. এতে খারেজীদের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা কবীরা গুনাহকে কুফর এবং গুনাহগারকে কাফির বলে থাকে। এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ গুনাহ হচ্ছে অপকর্ম করা, কুফর নয়।

স্মর্তব্য যে, কোন কোন গুনাহ্ কুফরের আলামত। এ জন্য ফোক্বাহা-ই কেরাম ওইসব কর্মকাণ্ডকে কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন- পৈতা বাঁধা, মূর্তিকে সাজদা করা, ক্বোরআন করীমকে ময়লায় নিক্ষেপ করা, হুযূরের কোন জিনিসের প্রতি বিদ্রূপ করা, বেআদবী করে হুযূরের পবিত্র কণ্ঠস্বরের উপর নিজের কণ্ঠস্বর উঁচু করা, মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- لَاتَعْتَذِرُوْاقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَاِيْمَانِكُمْ (তোমরা মিথ্যা অজুহাত রচনা করোনা, তোমরা মুসলমান হয়ে কাফির হয়ে গেছো।) [৯:৬৬, তরজমা: কানযুল ঈমান]

আরো এরশাদ ফরমাচ্ছেন- فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ الْاٰيَةَ (সুতরাং [হে মাহবূব!] আপনার রবের শপথ! তারা মুসলমান হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না।...আল-আয়াত।)[৪:৬৫]

আরো এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ (অর্থাৎ যেন কখনো তোমাদের আমলগুলো নিষ্ফল না হয়ে যায়...। [৪৯:২, তরজমান: কানযুল ঈমান]

এ সকল গুনাহ্ এ কারণে কুফর, এগুলো তাদের অন্তরস্থ কুফরের আলামত। সুতরাং আলোচ্য হাদীস শরীফ ও ক্বোরআন মজীদ পরস্পর বিরোধী নয়।

৪৬. এ'তে মু'তাযিলাদের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা বলে থাকে যে, কবীরা গুনাহ্কারী মু'মিনও নয়, কাফিরও নয়; বরং মধ্যখানে আলাদা একটা স্তরে- 'ফাসিক্ব'; অথচ কুফর ও ইসলামের মধ্যখানে কোন স্তর নেই। আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আতের আক্বীদা হলো, 'ফাসিক্ব' হলো দুর্বল মু'মিন, কাফির নয়। সুতরাং 'ফাসিক্ব' পৃথক কোন স্তর নয়।

৪৭. মদীনা ত্বাইয়্যেবাহ্'র দিকে। কেননা, হিজরতের পূর্বে জিহাদ ফরয ছিলো না।

৪৮. অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম ও ইমাম মাহ্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুসলমানদের সাথে নিয়ে

لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَّ لَا عَدْلُ عَادِلٍ وَ الْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ - رَوَاهُ اَبُوْدَؤُدَ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْاِيْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهٖ كَالظُّلَّةِ فَاِذَا خَرَجَ مِنْ ذٰلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ اِلَيْهِ الْاِيْمَانُ -

رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَؤُدَ

জিহাদকে যালিমের যুল্‌ম ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা বাতিল করতে পারবে না।[৪৯] আর তাক্বদীরসমূহের উপর ঈমান রাখা।[৫০] [আবূ দাঊদ]

৫৪ || হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন কোন বান্দা যিনা করে, তখন তার কাছ থেকে ঈমান বের হয়ে যায়। তা তার মাথার উপর শামিয়ানার মত হয়ে থাকে।[৫১] অতঃপর যখন বান্দা ওই অপকর্ম থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন ঈমানও তার দিকে ফিরে আসে।[৫২] -[তিরমিয, আবূ দাঊদ]

দাজ্জাল ও তার দলের বিরুদ্ধে তলোয়ার দ্বারা জিহাদ করবেন।

কেননা, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হিস ওয়াসাল্লাম'র উম্মত হবেন। যেহেতু দাজ্জালের পরে সমগ্র দুনিয়া মুসলমান হয়ে যাবে; কোন কাফির থাকবে না এবং হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম ও ইমাম মাহ্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ওফাতের কিছু সময় পর দুনিয়ায় কুফরই থাকবে। কোন মু'মিন থাকবে না, সেহেতু এ জিহাদই সর্বশেষ জিহাদ হবে। এরপরে কোন জিহাদ হবে না।

স্মর্তব্য যে, যদিওবা পূর্ববর্তী কোন কোন শরীয়তেও জিহাদ ছিলো, কিন্তু ইসলামী জিহাদ ও এর নীতিমালা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে আরম্ভ হয়ে দাজ্জালের হত্যা পর্যন্ত থাকবে। সুতরাং আলোচ্য হাদীসের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি নেই।

৪৯. অর্থাৎ প্রত্যেক ইনসাফকারী ও যালিম বাদশাহ্'র সাথে মিলে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। এ'তে ইঙ্গিতে দু'টি মাসআলা বলা হয়েছে:

এক. জিহাদের জন্য ইসলামী বাদশাহ্ অথবা আমীরুল মুসলিমীনের উপস্থিতি বা নির্দেশ জিহাদ ওয়াজিব হবার জন্য পূর্বশর্ত।

দুই. ফাসিক্ব বা পাপিষ্ঠ বাদশাহ্'র অধীনে বা আহ্বানে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আবশ্যক।

সাহাবা-ই কেরাম হাজ্জাজ ইবনে ইয়ূসুফের মত ফাসিক্ব শাসকের সাথে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

এতে ক্বাদিয়ানীদের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা বলে থাকে যে, মির্যা ক্বাদিয়ানী জিহাদ রহিত করে দিয়েছে। জিহাদ নামাযের মত সুস্পষ্ট-সুদৃঢ় দলীল দ্বারা প্রমাণিত ও রহিত হবার অনুপযোগী ইবাদত। জিহাদ ব্যতীত কোন জাতি জীবিত থাকতে পারে না। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ

"এবং ক্বিসাসের মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে।" [২:১৭৯, তরজমা: কান্যুল ঈমান]

৫০. তাক্বদীরের পূর্ণ আলোচনা আমার কিতাব 'তাফসীর-ই না'ঈমী'র তৃতীয় পারায় দেখুন। এখানে শুধু এতটুকু বুঝে নিন যে, যা কিছু হচ্ছে, সবই আল্লাহ্‌র ইল্‌ম ও তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে। আমরা আমাদের আমলগুলোর অর্জনকারী মাত্র; খালিক্ব বা স্রষ্টা নই।

সুতরাং আমরা অর্জনের ক্ষেত্রে ইখতিয়ারপ্রাপ্ত এবং 'খলক্ব' বা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অক্ষম। আমরা না 'ক্বাদির-ই মুত্বলাক্ব' বা নিঃশর্তভাবে সক্ষমও নই, আবার 'মাজবূর-ই মাহাদ্ব' বা (নিছক পাথরের মত) অক্ষমও নই।

৫১. এর ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে 'নূর-ই ঈমান' কিংবা 'ঈমানের অহমিকা' বের হওয়া বুঝায়। মূল ঈমান বের হওয়া নয়।

৫২. অর্থাৎ যখন তাওবা করে নেয় তখন তাওবার বরকতে 'নূর-ই ঈমান' (ঈমানের আলো) কিংবা ঈমানের অহমিকা ফিরে আসে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ اَوْصَانِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَاتَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَاتَتْرُكَنَّ صَلٰوةً مَّكْتُوْبَةً مُّتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةً مَّكْتُوْبَةً مُّتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلَاتَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهٗ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৫৫ ॥ হযরত মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি জিনিসের আদেশ দিয়েছেন।[৫৩] হুযূর এরশাদ করেছেন- ১. মহান রবের সাথে কাউকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।[৫৪] ২.স্বীয় মাতাপিতার নাফরমানী করোনা, যদিও তারা তোমার ঘরবাড়ী ও সম্পদ থেকে বের হয়ে যাবার আদেশ দেন।[৫৫] ৩.ফরয নামায ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ছেড়ে দিও না, কেননা কেউ স্বেচ্ছায় ফরয নামায ছেড়ে দিলে তার উপর থেকে আল্লাহ্'র করুণার দায়িত্ব চলে যায়।[৫৬] ৪.কখনো মদ পান করো না, কারণ সেটা সমস্ত অশ্লীলতার শির।[৫৭]

৫৩. অর্থাৎ তাকীদ সহকারে আদেশ দিয়েছেন। আরবীতে জোরালো নির্দেশকে ওসীয়ত বলা হয়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِیْۤ اَوْلَادِكُمْ (আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে...।) -[৪:১১]

৫৪. প্রাণ দেওয়ার সময় প্রাণ দিয়ে দাও; কিন্তু অন্তর দিয়ে শিরক ও কুফর করো না। এটা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। প্রাণনাশের আশঙ্কার সময় মুখে কুফরের প্রলাপ বকা অন্তরে ঈমান বহাল থাকার শর্তে জায়েয। মহান রব ফরমাচ্ছেন- اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ (কিন্তু যাকে বাধ্য করা হয়, তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকে।।১৬:১০৬।)। এখানে 'অন্তরের কুফর' বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য হাদীস শরীফ এ আয়াতের বিপরীত নয়। তাছাড়া, যে ব্যক্তি প্রাণ দিয়ে দেয় এবং কলেমা-ই কুফর মুখে বলে নি, তাহলে সে সাওয়াবের উপযোগী হবে। এমতাবস্থায় প্রাণ দিয়ে দেওয়াটা عَزِيْمَتٌ ('আযীমাত) এবং এভাবে প্রাণ বাঁচানো رُخْصَتٌ (রুখসত)। যদি হাদীসের এ অর্থ হয়, তাহলে হুযূর হযরত মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'আযীমত'র নির্দেশ দান করেছেন।

৫৫. এটি মুস্তাহাবসূচক বিধান। মাতাপিতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব। হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম'র ইঙ্গিত পেয়ে (তাঁর স্ত্রীকে) তালাক্ব দিয়েছিলেন; তা 'মুস্তাহাব' আমল ছিলো। কিন্তু পিতার আদেশে স্ত্রী বা সন্তানের উপর যুল্ম করবে না। কেননা, অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ। আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ মাতাপিতার নির্দেশের চেয়েও অগ্রগণ্য। এভাবে, যদি মাতাপিতা কুফর বা অবাধ্যতার আদেশ দেয়, তাহলে তা মানবে না। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-
وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِیْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا অর্থাৎ: "এবং যদি তারা উভয়ে তোমার উপর প্রচেষ্টা চালায় যেন তুমি আমার সমকক্ষ দাঁড় করাও এমন বস্তুকে, যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করোনা।।" -৩১:১৫, তরজমা: কানযুল ঈমান।

৫৬. অর্থাৎ বে-নামাযী আল্লাহ্'র নিরাপত্তায় থাকে না। নামাযের বরকতে মানুষ দুনিয়ায় বিপদসমূহ থেকে, মৃত্যুর সময় মন্দ শেষ পরিণতি থেকে, কবরে অকৃতকার্য হওয়া থেকে এবং হাশরের মুসীবতগুলো থেকে আল্লাহ্'র অনুগ্রহক্রমে নিরাপদ থাকে। সূফীগণ বলেছেন, ওযীফা, আমালিয়াত ও তাবীয ইত্যাদির উপকার অর্জনের জন্য নামাযের পাবন্দি আবশ্যক- শায়খ ও মুরীদ উভয়ের জন্য।

৫৭. 'মদ' দ্বারা সকল নেশা সঞ্চারক বস্তু বুঝানোই উদ্দেশ্য। কেননা, নেশা দ্বারা আক্বলই লোপ পায়। তখন ভালমন্দ কে শিক্ষা দেবে? মদ্যপায়ী ও নেশাগ্রস্ত লোক মলমূত্র পর্যন্ত খায় ও পান করে ফেলে।
স্মর্তব্য যে, সকল তরল জাতীয় নেশাসঞ্চারক জিনিস সাধারণভাবে হারাম। আঙ্গুরের শরাব (মদ)ও অকাট্যভাবে হারাম এবং অন্যান্য মদ একাধিক ব্যাখ্যা সম্বলিত দলীল দ্বারা হারাম। আফিম, ভাঙ্গ, তামাক ইত্যাদি যখন নেশাসঞ্চারক হবে তখন হারাম।

وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَّةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَّةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَاتَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَّاَخِفْهُمْ فِي اللّٰهِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ **وَعَنْ** حُذَيْفَةَ قَالَ اِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَاِنَّمَا هُوَالْكُفْرُ وَالْاِيْمَانُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫. গুনাহ্ থেকে নিজেকে রক্ষা করো, কেননা গুনাহ্'র কারণে আল্লাহ্'র অসন্তুষ্টি অবতীর্ণ হয়।[৫৮] ৬. জিহাদ হতে পালানো থেকে বেঁচে থাকো, যদিও লোকেরা মারা যায়।[৫৯] ৭. আর যখন মানুষকে মহামারীর মৃত্যু স্পর্শ করে আর তুমি তাদের মধ্যে থাকো, তাহলে তুমি সেখানে অটল থাকো।[৬০] ৮. নিজের উপার্জন থেকে পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করো।[৬১] ৯. স্বীয় আদব শিক্ষাদানের লাঠি তাদের উপর থেকে তুলে নিও না[৬২] এবং ১০. তাদেরকে আল্লাহ্'র ভয় দেখাও।[মুসনাদ-ই ইমাম আহমদ] **৫৬ ॥ হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,[৬৩] নিফাক্ব (কপটতা) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যামানায় ছিলো, কিন্তু বর্তমানে হয়তো কুফর নতুবা ঈমান -এ দু'টিই রয়েছে।[৬৪]**[বোখারী শরীফ]

৫৮. স্মর্তব্য যে, ছোট গুনাহকে ছোট মনে করে সম্পন্ন করে ফেলো না। ছোট নেকীকে নগণ্য মনে করে ছেড়ে দিও না। ছোট গুনাহ্ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, যা কখনো বাড়িঘর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেয়। ক্ষুদ্র নেকী সামান্য পানির মত, যা কখনো প্রাণ বাঁচিয়ে দেয়। শয়তান প্রথমে ছোট গুনাহ্ করায়, তারপর বড় গুনাহ্ করিয়ে থাকে, তারপর কুফর ও শিরক করায়। ছোট গুনাহ্'ও সর্বদা করলে তা বড় গুনাহয় পরিণত হয়। সুতরাং আলোচ্য হাদীস শরীফ সম্পূর্ণ সহীহ। এখানে সকল গুনাহ্ বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা, তা আল্লাহ্'র অসন্তুষ্টির কারণ হয়- প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে।

৫৯. আদেশও মুস্তাহাব নির্দেশক। যদি কোন মুজাহিদ এমনি মুহূর্তেও দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ থাকে এবং শহীদ হয়ে যায়, তাহলে সাওয়াব পাবে এবং যদি পালিয়ে যায়, তাহলে গুনাহ্গারও হবে না। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ (অর্থাৎ এখন আল্লাহ্ তোমাদের উপর ভার লাঘব করেছেন।[৮:৬৬])

সুতরাং উহুদের যুদ্ধে যেসব সাহাবীর পদস্খলন ঘটেছিলো তাঁরা গুনাহ্গার ছিলেন না। ভুল তাঁদেরই হয়েছিলো, যাঁরা গিরিপথ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কোরআন করীম তাঁদের ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছে।

৬০. অর্থাৎ তোমরা যেখানে আছো সেখানে যদি প্লেগ ইত্যাদি রোগও ছড়িয়ে পড়ে, তবু সেখান থেকে পালিয়ে যেওনা; যাতে সেখানকার মৃতগণ কাফন-দাফন ব্যতীত এবং রোগীগণ সেবা-শুশ্রূষাবিহীন থেকে না যায়। আর যদি রোগাক্রান্ত এলাকায় তুমি না থাকো তবে সেখানে যেও না। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন, وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ (আর তোমরা নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়ো না।) [২:১৯৫, তরজমা: কানযুল ঈমান]

৬১. বুঝা গেলো যে, স্ত্রী-সন্তান (পরিবার-পরিজন) লালন-পালন করার জন্য উপার্জন করাও ইবাদত। ইসলাম দুনিয়া ত্যাগ করার শিক্ষা দেয় না।

৬২. অর্থাৎ স্ত্রী-সন্তানদের (পরিবার-পরিজন) অবস্থাদির প্রতি লক্ষ্য রাখো, তাদেরকে সংশোধন করতে থাকো- ছোট বাচ্চাদের প্রহার এবং বড়দেরকে ভয় ও ধমকের মাধ্যমে। ক্বিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন, قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ ''নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করো।'' [৬৬:৬]

৬৩. তাঁর পবিত্র নাম হুযায়ফা। উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্ 'আবাসী। তাঁর পিতা হাসীল। তাঁর পিতার উপাধী 'ইয়ামান।' তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র গোপন রহস্যাদির ধারক ছিলেন। হিজরি ২৫ সনে হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র শাহাদাতের চল্লিশ দিন পর মাদা-ইনে তিনি ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত।

৬৪. অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যামানায় সাময়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

بَابٌ فِى الْوَسْوَسَةِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ مَاوَسْوَسَتْ بِهٖ صُدُوْرُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهٖ اَوْتَتَكَلَّمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْهُ قَالَ جَآءَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَسَاَلُوْهُ اِنَّانَجِدُ فِىْ اَنْفُسِنَا مَايَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهٖ

অধ্যায় : কুপ্ররোচনা প্রসঙ্গে[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৫৭ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের ওই সমস্ত লোকের মনের কুমন্ত্রণা ক্ষমা করে দিয়েছেন[২] যতক্ষণ না সে তদনুযায়ী কাজ করে কিংবা কথা বলে।[৩] -[বোখারী ও মুসলিম] ৫৮ ॥ তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে হাযির হলেন এবং তাঁর দরবারে আরয করতে লাগলেন, "আমরা আমাদের অন্তরে এমন কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করি, যেগুলো বর্ণনা করা অতি বড় গুনাহ্ মনে হয়।"[৪]

মুনাফিক্বদেরকে হত্যা করা হয়নি। যদিও তাদের কাছ থেকে কুফরির আলামতসমূহ প্রকাশ পেয়েছিল, যাতে কাফিররা আমাদের গৃহযুদ্ধ থেকে সুযোগ নিতে না পারে। ওই যামানায় তিন প্রকারের মানুষ গণ্য হতো। কাফির, মু'মিন ও মুনাফিক্ব। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পরে 'নিফাক্ব' বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। হয়তো কুফর নতুবা ইসলাম। যদি কারো কাছ থেকে কুফরের আলামত দেখা যায়, তাকে হত্যা করা যাবে, অপ্রকাশ্য কাফিরকেও। কেননা, সে মুরতাদ্দ।

—০— -[লুম'আত ও মিরক্বাত ইত্যাদি]

১. وَسْوَسَة (ওয়াস্ওয়াসা)-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'কোমল স্বর'। পরিভাষায়, মনের কু-প্ররোচনাদি তথা কুচিন্তাকে وَسْوَسَةٌ (ওয়াস্ওয়াসা) বলে। আর উত্তম ধারণাবলীকে اِلْهَام (ইলহাম) বলা হয়। ওয়াস্ওয়াসা বা কুমন্ত্রণা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। ইলহাম মহান রবের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে- নবী ব্যতীত অন্য কারো 'ইলহাম' শরীয়তের দলীল নয়। কেননা, এতে এ সন্দেহের অবকাশ থাকে যে, তা হয়তো শয়তানী কুমন্ত্রণা হবে। -[মিরক্বাত ও আশি''আতুল লুম'আত]

২. অর্থাৎ মনের কুপ্ররোচনার জন্য পাকড়াও করা হবে না। এটা এ উম্মতের বিশেষত্ব। পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে এ জন্যও পাকড়াও করা হতো।

স্মর্তব্য যে, মনের কুধারণা এক জিনিস, কু-উদ্দেশ্য অন্য জিনিস। কুউদ্দেশ্যের জন্য পাকড়াও হয়। এমনকি কুফরীর ইচ্ছাও কুফরী। শায়খ আবদুল হক্ব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, যে সব কুপ্ররোচনা অন্তরে অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ করে আসে, তাকে هَاجِس (হাজিস) বলে। এটা তাৎক্ষণিকভাবে আসে এবং মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যায়; এলো আর গেলো। এটা পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যও মার্জনীয় ছিলো, আমাদের জন্যও মার্জনীয়। কিন্তু যা অন্তরে থেকে যায়, তা আমাদের জন্য মার্জনীয়, কিন্তু তাদের জন্য মার্জনীয় ছিল না। যদি সেটার সাথে সাথে অন্তরে তৃপ্তি ও আনন্দ সৃষ্টি হয়, তবে তাকে هَمٌّ (হাম্মুন) বা ইচ্ছা বিশেষ বলা হয়। তাতেও পাকড়াও নেই। যদি সেটার সাথে সাথে সম্পন্ন করে ফেলারও চূড়ান্ত ইচ্ছা থাকে, তাহলে তাকে عَزْم (আযমুন) বলে। তাতে পাকড়াও রয়েছে। স্মর্তব্য যে, গুনাহ'র ইচ্ছা যদিও গুনাহ; কিন্তু তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত নেই। যিনার ইচ্ছা করা গুনাহ, কিন্তু যিনা নয় (তাই, শাস্তিও বর্তাবে না)।

৩. অর্থাৎ মৌখিক গুনাহ্য় মুখে বলা এবং কর্মগত গুনাহ'র মধ্যে কাজে পরিণত করাই বিবেচ্য।

৪. এটা সাহাবীদের পরিপূর্ণ ঈমানের দলীল যে, শয়তানী কুমন্ত্রণার উপর আমল করা তো দূরের কথা, তা মুখে উচ্চারণ করতেও তাঁরা ভীত হয়ে পড়তেন।

قَالَ اَوَ قَدْ وَجَدْتُّمُوْهُ قَالُوْا نَعَم قَالَ ذٰلِکَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّکَ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَزَالُ النَّاسُ يَتَسَآءَ لُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তোমরা কি সেটা অনুভব করছো?"[৫] তাঁরা আরয করলেন, "হ্যাঁ।" হুযূর এরশাদ করলেন, "এটা সুস্পষ্ট ঈমান।"[৬] [মুসলিম]

৫৯ || তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কারো কাছে শয়তান আসে।[৭] তখন শয়তান তাকে বলে, 'অমুক জিনিস কে সৃষ্টি করেছেন? অমুক জিনিস কে সৃষ্টি করেছে?' এমন কি সে বলে বসে, 'তোমাদের রবকে কে সৃষ্টি করেছে?'[৮] যখন এ সীমা পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন আ'উযু বিল্লা-হ্ (আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি) পড়ে নাও এবং তা থেকে বিরত থাকো।[৯] [বোখারী ও মুসলিম]

৬০ || তাঁরই হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মানুষ একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করতে থাকবে, এমনকি বলা হবে, "এ মাখলূক্বকে তো মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন! সুতরাং আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?"[১০]

---

৫. শয়তানী কুমন্ত্রণা কিংবা সেটাকে অত্যন্ত মন্দ মনে করা।

৬. অর্থাৎ শয়তানী কুমন্ত্রণা (وَسْوَسَةٌ) আসা পরিপূর্ণ ঈমানের দলীল। কেননা, চোর সম্পদপূর্ণ ঘরেই গিয়ে থাকে এবং শয়তান মু'মিনকে প্ররোচিত করার চিন্তায় বেশি মগ্ন থাকে। হযরত আলী মুর্তাদ্বা বলেছেন, "যে নামায কুমন্ত্রণামুক্ত ওই নামায ইহুদী-নাসারারই।"-[মিরক্বাত]

অথবা, হাদীসের অর্থ এ যে, ওয়াসওয়াসাকে মন্দ মনে করাই প্রকৃত ঈমান। কেননা, কাফির তো ওইগুলোকে ভাল মনে করে; তাই বিশ্বাস করে বসে।

৭. হয়তো স্বয়ং ইবলীস। কেননা, সে সমগ্র দুনিয়ার উপর দৃষ্টি রাখে এবং সর্বত্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। অথবা, শয়তানের ওই সহযোগী (ক্বরীন), যে প্রতিটি মানুষের সাথে আলাদাভাবে লেগে থাকে এবং সর্বদা তার সাথে থাকে। অথবা নিকৃষ্ট মানুষ, যে এরূপ কথাবার্তা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

৮. অথচ সৃষ্টি ওই জিনিসকেই বলা হয়, যা অস্থায়ী হয়ে থাকে। মহান রব হচ্ছেন 'ওয়াজিবুল ওজূদ' (চিরঞ্জীব)। وَاجِبُ الْوُجُوْد হচ্ছেন ওই মহান সত্তা, যাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য, যিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তাঁর সত্তা কখনো বিলীন হতে পারে না। তাঁকে কে সৃষ্টি করবে? (অর্থাৎ তিনি কারো সৃষ্ট নন।) যে সব জিনিসের সত্তাগত অস্তিত্ব নেই, অন্যের মুখাপেক্ষী, ওইগুলোর (عَرِيْضَات) সর্বশেষ লক্ষ্য ও গন্তব্য হল সত্তাগত অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তু। (সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুই অপ্রাকৃতিক বা সত্তাগত অস্তিত্বহীন। কাজেই, আল্লাহ্ কারো সৃষ্টি হতে পারেন না।) সকল তারকা সূর্য দ্বারা আলোকিত। কিন্তু সূর্য কোন সৃষ্টি দ্বারা আলোকিত নয়।

৯. অর্থাৎ সেটার উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করার চেষ্টাও করো না। নতুবা শয়তান প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করবে, আ'উযু (اَعُوْذُ) পাঠ করে তাকে তাড়িয়ে দাও। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। শয়তান সাজদা না করার পর মহান রব তার যুক্তিগুলোর উত্তর দেননি; বরং এরশাদ ফরমায়েছেন فَاخْرُجْ مِنْهَا (তা থেকে বেরিয়ে যাও)। স্মর্তব্য যে, اَعُوْذُ بِاللّٰه (আ'উ-যু বিল্লা-হ্) পাঠ করা শয়তানকে দূর করার জন্য যথেষ্ট (মহৌষধ)।

১০. যেমনটি বর্তমানে আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী নাস্তিক সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে থাকে। ওই গায়েবের সংবাদদাতা (নবী)'র উপর নিজেকে উৎসর্গ করি, যিনি ক্বিয়ামত অবধি সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন। করাচিতে আমাকে এক ব্যক্তি সরাসরি এ প্রশ্ন করেছিলো। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিলো صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰه (রসূলুল্লাহ্ সত্যি বলেছেন)।

فَمَنْ وَجَدَمِنْ ذٰلِکَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ **عَنْ** اِبْنِ مَسْعُوْدٍقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍاِلَّاوَقَدْوُكِّلَ بِهٖ قَرِيْنُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهٗ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ قَالُوْاوَاِيَّاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِيَّایَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِیْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ فَلَايَاْمُرُنِیْ اِلَّابِخَيْرٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ **وَعَنْ** اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

সুতরাং যে ব্যক্তির মনে এরূপ কিছু আসবে, সে বলবে, "আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান এনেছি।"[১১] [বোখারী ও মুসলিম]

৬১ ॥ হযরত ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে একজন সাথী-জিন্ ও একজন সাথী ফিরিশতা নিয়োজিত হয়নি।"[১২] সাহাবীগণ আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার জন্যও কি?" এরশাদ করলেন, "আমার জন্যও।[১৩] কিন্তু আমার রব আমাকে তার উপর সাহায্য দান করেছেন। ফলে, সে মুসলমান হয়ে গেছে। এখন সে আমাকে ভাল কাজের পরামর্শই দিয়ে থাকে।"[১৪] [মুসলিম]

৬২ ॥ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

---

১১. অর্থাৎ যুক্তিগ্রাহ্য কোন দলীল ছাড়াই তাঁর স্বত্তা ও গুনাবলীকে মেনে নিলাম। এ হাদীসের ভিত্তিতে কোন কোন আলিম 'কালাম শাস্ত্র' (ইসলামী যুক্তিশাস্ত্র) পাঠ করা ও পাঠদান করা অপছন্দ করেছেন। কিন্তু কতেক আলিম যুগের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করে তা শিখেছেন এবং শিক্ষাদান করেছেন। কিন্তু তা সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য নয়; বরং সন্দেহাবলী দূর করার জন্যই। উভয়ই আল্লাহ্'র পছন্দনীয়। স্মর্তব্য যে, প্রশ্নকৃত ব্যক্তি তো কাফির হবে না। কিন্তু প্রশ্নকারী যদি সন্দেহের ভিত্তিতে জিজ্ঞেস করে, তাহলে সে কাফির এবং যদি উত্তর জানার জন্য জিজ্ঞেস করে তাহলে কাফির নয়; বরং সাওয়াব পাবেন।

১২. অর্থাৎ সকল বিবেকসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সাথে, কুমন্ত্রণা দেওয়ার জন্য একজন শয়তান এবং ইলহাম (স্বর্গীয় প্রেরণা) প্রদান করার জন্য একজন ফিরিশ্‌তা সর্বদা নিয়োজিত থাকেন।

'মিরক্বাত' ও 'আশি''আতুল লুম'আত' উভয় কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন কোন মানুষের সন্তান জন্ম লাভ করে, তখন তার সাথেই ইবলীসের এক শয়তান (সন্তান)ও জন্মলাভ করে। যাকে ফার্সীতে همزاد (হামযাদ) এবং আরবীতে وَسْواس (ওয়াসওয়াস) বলে। এটাই সুস্পষ্ট বিষয় যে, প্রতিটি মুহূর্তেই ইবলীসের অগণিত বাচ্চা জন্মলাভ করে থাকে, মানবসন্তানের সংখ্যানুপাতে। যেমন- মাছ ও নাগিনী (সাপ) একই সময়ে হাজার হাজার ডিম ছাড়ে। মহামারীর জীবাণু প্রতি মুহূর্তে বাচ্চা দিতে থাকে।

১৩. একজন ফিরিশ্‌তা নিয়োজিত আছেন 'মুলহিম' এবং একজন শয়তান।

১৪. এটাই প্রকাশ্য যে, এখানে 'ইসলাম' মানে ঈমানই; আনুগত্য নয়। আর এটা হুযূরের সর্বোচ্চ মর্যাদার বিশেষত্ব যে, তাঁর প্রতি নিয়োজিত শয়তান, যার ফিত্‌রত বা স্বভাবে কুফর অন্তর্ভুক্ত, সেও ঈমান নিয়ে এসেছে। বুঝা গেলো যে, 'নিগাহ্-ই করম' (কৃপাদৃষ্টি) দ্বারা ফিত্‌রতসমূহও বদলে যায়। মিরক্বাত নামক কিতাবে আছে যে, হা-মা ইবনে ইবলীস হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, "হাবীলের হত্যার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি সমস্ত নবীর সাথে ছিলাম। আপনি আমাকে কিছু ক্বোরআন শিক্ষা দান করুন।" তিনি তাকে সূরা ওয়াক্বি'আহ্, মুরসালাত, নাবা, ইখলাস, ফালাক্ব ও না-স্ শিক্ষা দান করেন। জিনগণ কর্তৃক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর ঈমান আনয়ন করার কথা তো ক্বোরআনের সূরা জিন'র মধ্যে বর্ণিত আছে। অথচ সমস্ত জিন্ ইব্‌লীসের আওলাদ। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ অর্থাৎ সে জিন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, অতঃপর সে আপন রবের নির্দেশ থেকে বের হয়ে গেলো।১৮:৫০।। সুতরাং চাকড়ালভীগণ এ হাদীসের উপর কোন অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে না।

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَ ابْنِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم صِيَاحُ الْمَوْلُوْدِ حِيْنَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ اِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَآءِ

"শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহিত হবার স্থানসমূহে (শিরা-উপশিরা) বিচরণ করে থাকে।"[১৫] [বোখারী ও মুসলিম]

৬৩ || হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কোন আদমসন্তান এমন নেই,[১৬] যাকে তার জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। ওই সন্তান শয়তানের স্পর্শের কারণেই ক্রন্দন করে থাকে[১৭] মারয়াম ও তাঁর সন্তান ব্যতীত।"[বোখারী ও মুসলিম] **৬৪ ||** তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যমীনে ভূমিষ্ট হবার সময় শিশুর কান্না শয়তানের আঘাতের কারণেই হয়।[১৮]

৬৫ || হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই শয়তান পানির উপর নিজের সিংহাসন বিছায়।[২০]

---

১৫. হয়তো স্বয়ং ইবলীসও 'সঙ্গী-শয়তান'। যেহেতু সে আগুনের তৈরি, সেহেতু সে মানুষের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে এবং শক্তি প্রয়োগ করে থাকে।
অথবা, তার কুমন্ত্রণা ও কুধারণাসমূহ। বুঝা গেলো যে, কোন মানুষ আল্লাহ'র অনুগ্রহ ব্যতীত শয়তান থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

১৬. অর্থাৎ হযরত আদম ও হাওয়া আলায়হিমাস্ সালামকে স্পর্শ করতে পারে নি। কেননা তাঁরা আদম-সন্তান নন।

১৭. এ থেকে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বিষয় স্বতন্ত্র। এরূপ ক্ষেত্রে বক্তা নিজে অন্তর্ভুক্ত থাকেন না। তাহক্বীক্ব ও গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হুযূর শুভাগমন করে ক্রন্দন করেন নি। -[আশি''আতুল লুম'আত]

১৮. হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম অর্থাৎ ওই দু'জন বুযুর্গকে শয়তান স্পর্শ করতে পারে নি। যেমন- বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, জন্মের সময় শয়তান মানব-সন্তানদের উদরে আঙ্গুল দ্বারা আঘাত করে, যার চোটে শিশু ক্রন্দন করে থাকে। ওই দু'জন বুযুর্গের জন্মের সময়ও শয়তান এ কাজটি করেছিলো, কিন্তু তার আঙ্গুল ওই পর্দায় লেগেছিলো, যা মহান রব তাঁদের এবং তার মধ্যখানে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এ হাদীসের সমর্থন ক্বোরআনে করীমের এ আয়াত দ্বারাই হয়-
إِنِّىْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ অর্থাৎ "আমি তাকে ও তার বংশধরকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।" [৩:৩৬, তরজমা: কানযুল ঈমান]

১৯. অর্থাৎ ওই শিশুর উদরে সে আঙ্গুল দ্বারা আঘাত করে এবং সেটার চোটে শিশু কান্না করে। এ জন্য সুন্নাত হচ্ছে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই তাকে গোসল দিয়ে ডান কানে আযান এবং বাম কানে তাকবীর (ইক্বামত) বলা, যাতে শয়তান দূর হয়ে যায়। কারণ, আযানের আওয়াজ শুনে শয়তান পালিয়ে যায়। কতেক দুষ্ট লোক এ সব হাদীস শরীফকে অস্বীকার করে। তাদের কম জ্ঞানে এগুলো বুঝে আসে না। সম্ভবতঃ তারা শিশুর কানে আযান দেওয়াকেও অস্বীকার করে বসবে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- তারা বলে, গরম বা ঠাণ্ডা বাতাস শিশুর উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং শিশু এর কষ্টেও কাঁদতে পারে, কিন্তু শয়তান যে বায়ুর চেয়েও সূক্ষ্ম, তার প্রভাব তাদের বুঝে আসে না। তারা মিথ্যুক। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি অপরিপূর্ণ। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সত্য। স্মর্তব্য যে, শয়তানের এসব কাজ শিশুর উপর শিশুকাল থেকেই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই (তার নিজের ধারণায়); অন্যথায় পথচ্যুত করা আরম্ভ হয় ওই শিশু বুদ্ধিসম্পন্ন হবার পর।

২০. প্রতিদিন সকালে সমুদ্রের উপর যখন তার কার্যক্রম শুরু করে; কিন্তু তার সিংহাসন সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যায় না। কেননা, সে নিজেও আগুনের, তার সিংহাসনও আগুনের। বর্তমান কালে তো লোহা ও কাঠের নৌকা এবং

ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ يُفْتِنُوْنَ النَّاسَ فَاَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَّجِئُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ مَاصَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِئُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَاتَرَكْتُهُ حَتّٰى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اِمْرَاَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ اَنْتَ ـ قَالَ الْاَعْمَشُ اُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْاَئِسَ مِنْ اَنْ يَّعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ ـ

তারপর নিজের বিভিন্ন বাহিনীকে মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য প্রেরণ করে।[২১] তাদের মধ্যে তার কাছে অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত সে-ই হয়, যে বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করে।[২২] তাদের মধ্যে একজন এসে বলে, "আমি অমুক অমুক বিপর্যয় ছড়িয়েছি।" ইবলীস বলে, "তুমি কিছুই করোনি।" তারপর অন্য একজন এসে বলে, "আমি অমুককে ওই সময় পর্যন্ত ছাড়িনি যতক্ষণ না তার এবং তার স্ত্রীর মধ্যখানে ফাটল সৃষ্টি করেছি।"[২৩] হুযূর এরশাদ করলেন, "ইবলীস তখন তাকে পাশে বসায় এবং বলে তুমি খুবই ভাল।" হযরত আ'মাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, আমার মনে হচ্ছে যে, হুযূর এরশাদ করেছেন, "তাকে শয়তান জড়িয়ে ধরে।"[২৪] [মুসলিম] **৬৬ ||** তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "নিশ্চয় শয়তান তো এ থেকে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরবের নামাযীগণ তাকে পূজা করবে।"[২৫]

জাহাজগুলোও ডুবে যায় না। (সুতরাং শয়তানের সিংহাসন নিমজ্জিত না হওয়াতে তার কোন বিশেষত্ব নেই।)

২১. سرايا শব্দটি سرية-এর বহুবচন। এর অর্থ ক্ষুদ্রবাহিনী। যার সংখ্যা পাঁচজন থেকে চারশ' পর্যন্ত হয়। শয়তানের বংশধরদের বিভিন্ন দল রয়েছে। তাদের নাম ও কাজ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- ওযূ'তে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী দলের নাম 'ওয়ালহান' (وَلْهَانٌ) এবং নামাযে বিঘ্নসৃষ্টিকারী দলের নাম 'খানযাব'। এভাবে মসজিদে বাজারে, শরাবখানায় তার আলাদা আলাদা বাহিনী থাকে।

২২. অর্থাৎ ইবলীস আপন বংশধরদের মধ্য থেকে তাকেই নিজের বিশেষ নৈকট্য দান করে, যে জনসাধারণের মধ্যে বড় ভ্রান্তি কিংবা বিপর্যয় ছড়িয়ে আসে।

২৩. এভাবে যে, তালাক্ব সংঘটিত করে দিয়েছি। তালাক্ব যদিওবা মুবাহ্ (বৈধ), কিন্তু তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে যায় বহু ফ্যাসাদের উৎস। এ জন্য ইবলীস তার উপর খুশি হয়ে যায়। এ জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, اَبْغَضُ الْحَلَالِ الطَّلَاقُ (অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হালাল কাজ হচ্ছে তালাক্ব দেওয়া।) যতদূর সম্ভব তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। অথবা এর মর্মার্থ এটা যে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দিয়েছি। অর্থাৎ স্ত্রীকে স্বামীর সাথে এমনি ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে এসেছি যে, সে তাঁকে ছাড়েও নি, রাখেও নি। এটা জঘন্য অপরাধ। মহান রব এরশাদ ফরমায়েছেন, تَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (যদ্দরুন অপর স্ত্রীকে ঝুলানো অবস্থায় রেখে দেবে।৪:১২৯) এ অর্থে হাদীস সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট।

২৪. এ হাদীস থেকে দু'টি মাসআলা বুঝা যায়:

এক. যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করে সে ইবলীসের মতই অপরাধী। এ থেকে ওই সব আমল-তদবীরের আমলকারীর শিক্ষা গ্রহণ করা চাই, যারা স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের জন্য তাবীয-তদবীর করে।

দুই. হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দৃষ্টি হতে ইবলীসসহ কোন জিনিসই গোপন নয়। কেননা, এটাই প্রকাশ্য কথা যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যক্ষভাবে দেখেই এসব কিছু বলেছেন।

২৫. অর্থাৎ আরবের সাধারণ মুসলমান শিরকী কর্মকাণ্ড করবে না। অথবা ব্যাপকভিত্তিতে (عَلَى الْعُمُوْمِ) মুরতাদ্দ হবে না। গুটি কতেক মানুষ কখনো মুরতাদ্দ হয়ে যাওয়া এ হাদীসের বিপরীত নয়। আরবকে(جَزِيْرَةٌ) এ জন্য বলেছেন যে, ওই ভূ-খণ্ডকে পারস্য সাগর, রোম সাগর, দাজলা ও ফোরাত নদী পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আরব দৈর্ঘ্যে ইডেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত। প্রস্থে জিদ্দা থেকে ইরাকের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা পর্যন্ত।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর সালাত ও সালাম,

وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ ◆ اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَهٗ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّىْ اُحَدِّثُ نَفْسِىْ بِالشَّيْءِ لَاَنْ اَكُوْنَ حُمَمَةً
اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَتَكَلَّمَ بِهٖ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ اَمْرَهٗ اِلَى الْوَسْوَسَةِ -رَوَاهُ
اَبُوْدَاؤُدَ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ
اٰدَمَ وَلِلْمَلَكِ

কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিতে রত আছে।"[২৬] [মুসলিম]

◆ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆

৬৭ ‖ হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে এক ব্যক্তি আসলো এবং বললো, "আমার অন্তরে এমন কিছু কথার উদ্রেক হয়, যেগুলো মুখে বলার চেয়ে আমি জ্বলে কয়লা হয়ে যাওয়াকে অধিক পছন্দ করি।"[২৭] হুযূর এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্'রই শুক্‌র, যিনি এ সব ধারণাকে কুমন্ত্রণায় পরিণত করে দিয়েছেন।"[২৮] [আবূ দাঊদ]

৬৮ ‖ হযরত ইবনে মাস্'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "মানুষের মধ্যে শয়তানের প্রভাবও রয়েছে[২৯] এবং ফিরিশ্‌তার প্রভাবও রয়েছে।

মওলূদ শরীফ, ওরস, ফাতিহা, খতম, হুযূরের কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি শির্‌ক নয়। কেননা, এ সব কিছুই আরবের সাধারণ মুসলমানদের চিরাচরিত নিয়ম। যদি এগুলোর মধ্যে কোন একটিও শির্‌ক হতো, তাহলে আরব শরীফের মুসলমানদের মধ্যে এগুলোর কখনো প্রচলন হতো না।

এটাও বুঝা গেলো যে, অনারব কখনো আরবের ন্যায় সম্মানিত হতে পারে না। অন্য কোন জায়গার মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে মুরতাদ্দ হতে পারে; কিন্তু সেখানকার (আরব) মুসলমানগণ হতে পারে না। স্মর্তব্য যে, যদিও মুসায়লামা কায্‌যাব আরবের বহু মুসলমানকে মুরতাদ্দ করে ফেলেছিলো, কিন্তু আল্লাহ্'র অনুগ্রহে ওই মুরতাদ্দ হওয়া টিকে থাকেনি। তা একটি নিছক সাময়িক ব্যাপার ছিলো, যা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং এটা বিবেচ্যই নয়।

২৬. অর্থাৎ আরবকে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিবাদের মধ্যে জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাতকালের শেষভাগে যে মতানৈক্য আরম্ভ হয়েছিলো তা আজ পর্যন্ত শেষ হচ্ছে না; যদিও আরবে ঐক্যের স্লোগান দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু সেটার বাস্তবতা অনুপস্থিত।

২৭. অর্থাৎ ইসলামী আক্বীদাসমূহ, আল্লাহ্'র মহান সত্তা ও গুণাবলী, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশংসাবলী সম্পর্কে এমনসব মন্দ ধারণা যে, সেগুলো গ্রহণ করা তো দূরের কথা সেগুলো আমার নিকট এমনই মন্দ মনে হয় যে, এর চেয়ে জ্বলে কয়লা হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। এমনকি সেগুলো বলতেও ইচ্ছে হয় না। সুবহানাল্লাহ! এটা হচ্ছে ওই খোদাভীতি যা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাহচর্য-ধন্য হবার কারণে সাহাবা-ই কেরামের ভাগ্যে জুটেছিলো। এটা ঈমানী ভীতিরই প্রমাণ।

২৮. অর্থাৎ মহান রব এমন ধারণাসমূহকে 'কুমন্ত্রণা'র অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যার জন্য কোন পাকড়াও নেই। ওই দয়ালু আল্লাহ্ বান্দার অপারগতা ও ওযর সম্পর্কে অবহিত।

২৯. এখানে 'শয়তান' মানে হয়তো ইবলীস অথবা মানুষের 'ক্বারীন' (সাথী-শয়তান), যে সর্বদা মানুষের সাথে থাকে, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তার প্রভাব প্রায় সকল মানুষের উপরই পড়ে থাকে। কারো উপর কম, কারো উপর বেশি। (যাঁরা এ প্রভাবের উর্ধ্বে তাঁদের আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে।)

لَمَّةٌ فَاَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَاِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ وَاَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَاِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَّجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ اَنَّهٗ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَّجَدَ الْاُخْرٰى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثُمَّ قَرَاَ ﴿اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ﴾ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَزَالُ النَّاسُ يَتَسَآءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَاِذَا قَالُوْا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُ اَحَدٌ

শয়তানের প্রভাব হচ্ছে মুসীবতের ভয় দেখানো এবং সত্যকে অস্বীকার করা;[৩০] কিন্তু ফিরিশ্‌তার প্রভাব হচ্ছে কল্যাণের ওয়াদা করা এবং সত্যের প্রত্যায়ন করা।[৩১] যে ব্যক্তি শেষোক্ত কথাগুলো অন্তরে অনুধাবন করে, তার এ কথা জেনে রাখা চাই যে, নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌'র পক্ষ থেকে। সুতরাং তার উচিত আল্লাহ্‌'র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।[৩২] আর যে ব্যক্তি অন্যটি অনুধাবন করে, সে যেন মরদূদ শয়তান হতে আল্লাহ্‌'র কাছে আশ্রয় চায়।[৩৩] তারপর তিনি এটা তিলাওয়াত করলেন- আশ্‌শায়ত্বা-নু ইয়া'ইদুকুমুল্ ফাক্বরা ওয়া ইয়া'মুরুকুম্ বিলফাহ্‌শা----ই। অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং নির্লজ্জতার পরামর্শ দেয়।[২:২৬৮]) এ হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা 'গরীব' পর্যায়ের হাদীস।

৬৯ || হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, হুযূর এরশাদ করেছেন, মানুষ উপর্যুপরি পরস্পর প্রশ্ন করতে থাকবে, এমনকি বলা হবে, 'মাখলূক্বকে তো আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছেন?'[৩৪] যখন এটা বলবে, তখন তোমরা বলে দেবে, "আল্লাহ্ এক।

---

৩০. এভাবে যে, ওই দুষ্ট শয়তান মন্দ কার্যাবলীকে সুন্দর এবং নেক কাজগুলোকে মুসীবত বানিয়ে দেখায় সৎকাজের ইচ্ছা করলে দারিদ্রের ভয় দেখায়। অবৈধ ব্যয়গুলোর সময় 'প্রসিদ্ধ' হবার লোভ দেখায়। অনেক সময় দেখা গেছে যে, অধিকাংশ মুসলমান হজ্জ ও দান করার ক্ষেত্রে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু বিয়ে-শাদীর বিভিন্ন হারাম-প্রথার আয়োজনের সময় প্রশস্ত মনে ব্যয় করে থাকে। এটা শয়তানেরই প্রভাব। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَاْ مُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ-এর অর্থ এটাই। (অর্থাৎ: শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায় দারিদ্র্যের আর নির্দেশ দেয় লজ্জাহীনতার।২:২৬৮)

৩১. এভাবে যে, যদি সাদক্বাহ্ ও দান-খায়রাতের সময় নাফ্‌স ভয় পায় এবং শয়তান দারিদ্রের ভয় দেখায়, তখন এ ফিরিশ্‌তা অন্তরে আওয়াজ দিয়ে বলে, "ভয় করোনা।" সাদক্বাহ্ দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায়, হ্রাস পায় না আর তখনই এ আয়াত সম্মুখে এসে যায়: يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ (আল্লাহ্ ধ্বংস করেন সুদকে এবং বর্ধিত করেন দানকে।২:২৭৬) এটা ওই ফিরিশ্‌তারই কাজ। যে ব্যক্তি যে আওয়াজের প্রতি বারংবার কর্ণপাত করবে ওই আওয়াজই শক্তিশালী হতে থাকবে এবং অন্য আওয়াজ দুর্বল হয়ে যাবে। কোন কোন ওলীর কাছ থেকে শয়তান নিরাশ হয়ে তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও পরিহার করে।

৩২. কেননা, সদিচ্ছা ও উত্তম ধারণাসমূহও আল্লাহ্‌'র নি'মাত। শোকর করলে নি'মাত বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ভাল ইচ্ছাকে তাড়াতাড়ি কাজে পরিণত করবে। কেননা, এটা বলা যায় না- পরে সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা।

৩৩. কেননা, اَعُوْذُ এবং لَاحَوْلَ দ্বারা শয়তান পালিয়ে যায়। সম্মানিত সূফীগণ বলেছেন, যে কেউ সকাল ও সন্ধ্যায় ২১বার لَاحَوْلَ শরীফ পড়ে পানিতে দম করে পান করবে, ইন্‌শা আল্লাহ্, শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে সে অনেকাংশে নিরাপদ থাকবে।

৩৪. অর্থাৎ 'প্রত্যেক অস্তিত্বশীল (مَوْجُوْدٌ)'র জন্য স্রষ্টা (مُوْجِد) থাকা চাই। আল্লাহ্‌ও তো মওজূদ। সুতরাং তাঁরও স্রষ্টা (مُوْجِد) থাকা চাই।' এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা।

স্মর্তব্য যে, শয়তান আলিমদের অন্তরে আলিমানা কুমন্ত্রণা এবং সূফীদের অন্তরে আশিক্বানা কুমন্ত্রণা, সর্বসাধারণের

اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهٖ ثَلٰثًا وَ لْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ فِيْ بَابِ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِاِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى - ◆ اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَّبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَآءَلُوْنَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ - رَوَاهُ الْبُخَارِى وَلِمُسْلِمٍ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِنَّ اُمَّتَكَ لَايَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مَاكَذَا مَاكَذَا

আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী।[৩৫] তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।"[৩৬] তারপর নিজের বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে এবং মরদূদ শয়তান থেকে আল্লাহ্'র আশ্রয় প্রার্থনা করবে। এটা আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। আমি 'আমর ইবনুল আহ্ওয়াস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র হাদীস, ইনশা- আল্লাহু তা'আলা, ক্বোরবানীর ঈদের খোৎবার অধ্যায়ে বর্ণনা করবো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ **৭০ ॥** হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মানুষ পরস্পর প্রশ্ন করতে থাকবে, এমনকি এটাও বলে বসবে, "আল্লাহ্ তো সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?" এটা বোখারী শরীফের বর্ণনা। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, হুযূর এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, নিশ্চয় আপনার উম্মত[৩৭] বলতে থাকবে, 'এটা কেমন? ওটা কেমন?'[৩৮]

অন্তরে সাধারণ কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয়। শিকার যেরূপ, জালও তদ্রূপ। অনেক সময় মানুষ গুনাহকে ইবাদত মনে করে।

৩৫. সুবহানাল্লাহ্! কত সুন্দর যুক্তিভিত্তিক দলীলাদি। সন্তানের জন্য ৩টি শর্ত আছে- এক. সন্তানের জনক হওয়ার মধ্যে একত্ব থাকে না, দ্বিত্ব এসে যায়। কেননা, সন্তান পিতার সাথে জাতিগতভাবে এক হয় এবং ব্যক্তি হিসেবে দ্বিতীয় হয়। মহান রব জাতিসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা ইত্যাদির বহু উর্ধ্বে। اَحَدٌ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। দুই. সন্তানের জনক সন্তানের মুখাপেক্ষী হয়। নিজের উত্তরাধিকার কিংবা বাহুবলের জন্য সন্তান কামনা করে। মহান পরওয়ারদিগার অমুখাপেক্ষী। صَمَدٌ শব্দের মধ্যে এটাই বলা হয়েছে। তিন. প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু (مُمْكِنُ الْوُجُوْد) স্রষ্টা (مُوْجِد)-এর মুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে পরওয়ারদিগার হলেন وَاجِبُ الْوُجُوْد বা চিরন্তন (যার অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য ও নিশ্চিত)। তাছাড়া পুত্রকে পিতার মত হতে হয়। মহান রবের কোন উপমা নেই ...لَمْ يَلِدْ-এ সেটার দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে।

৩৬. এ থুথু শয়তানের মুখে পড়বে। যাতে সে লাঞ্ছিত হয়ে পালিয়ে যাবে। কেননা, শয়তান অধিকাংশ সময় বাম দিক থেকেই আসে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, কখনো থুথু দ্বারাও শয়তান পালায়। কতেক সূফী দমের সাথেও থুথু দেন। এ হাদীই তাঁদের দলীল।

৩৭. অর্থাৎ উম্মত-ই দা'ওয়াত (যাদের কাছে দ্বীনের দা'ওয়াত পৌঁছেছে কিন্তু এখনো ঈমান আনে নি) এ কথা বলতে থাকবে। তারা হচ্ছে নাস্তিক ও কাফির ইত্যাদি; 'উম্মত-ই ইজাবত' (যাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছেছে এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে) মু'মিন এ কথা বলবে না। । অথবা 'বলা' মানে অন্তরের কুমন্ত্রণা। তাহলে উম্মতে ইজাবতও অন্তর্ভুক্ত।

৩৮. অর্থাৎ প্রত্যেক হুকুমের কারণ ও প্রত্যেক জিনিসের রহস্য জিজ্ঞাসা করবে। সমালোচনা বেশি করবে। বাস্তবতা বিমুখ হবে। স্মর্তব্য যে, তারা বলবে- আমাদের কাছে 'কেন' রয়েছে? এবং তাদের কাছে 'কি' ছিল? (অর্থাৎ তারা নানা প্রশ্ন বা কুতর্কের এক পর্যায়ে এভাবে বলতে থাকবে, 'কোন মুসলমানকে পেলে জিজ্ঞেস করবে- এটা কেন? ওটা কেন? আর দ্বীনের সমালোচনা করতে গিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন করবে- 'এটা কি ছিলো? ওটা কি ছিলো?'

৩৯. তিনি বনী সক্বীফ গোত্রের লোক। তাঁর আম্মাজান

حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْحَالَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ صَلَاتِىْ وَبَيْنَ قِرَأَتِىْ يُلَبِّسُهَا عَلَىَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهٗ خِنْزَبٌ فَاِذَا اَحْسَسْتَهٗ فَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلٰى يَسَارِكَ ثَلٰثًا فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَهُ اللّٰهُ عَنِّىْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

এমনকি তারা এটাও বলে ফেলবে, "আল্লাহ্ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন, মহামহিম আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?"

৭১ || হযরত ওসমান ইবনে আবুল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[৩৯] তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, "এয়া রসূলাল্লাহ্! নিশ্চয় শয়তান বাধা হয়ে গেলো আমি এবং আমার নামায ও তিলাওয়াতের মধ্যে, নামাযকে সন্দেহযুক্ত করে দিলো।"[৪০] হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "ওই শয়তানকে 'খিন্‌যাব' (বা খান্‌যাব) বলা হয়।[৪১] যখনই তোমরা তাকে অনুভব করো, তখন তোমরা তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্'র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো এবং বাম দিকে তিন বার ভৎর্সনা করো (বা থুথু নিক্ষেপ করো)।"[৪২] আমি এটাই করলাম। তখন আল্লাহ্ তাকে আমার কাছ থেকে দূর করে দিলেন।[৪৩] [মুসলিম]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শুভজন্মের সময় মা আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার পাশে ছিলেন। হুযূর তাঁকে তায়েফের শাসক নিয়োগ করেছিলেন। সুতরাং তিনি ফারূক্ব-ই আ'যমের যুগ পর্যন্ত সেখানকার গভর্নর ছিলেন। অতঃপর ফারূক্ব-ই আ'যম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় খিলাফত কালের তৃতীয় সালে তাঁকে সেখান থেকে বদলী করে আম্মান (জর্দান) ও বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করলেন।

হিজরি ১০ সনে যখন বনী সক্বীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে ঈমান আনার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। শেষ জীবনে বসরায় অবস্থান করেন। হিজরি ৫১ সনে সেখানেই ওফাত পান। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওফাতের পর যখন বনূ সক্বীফের কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ্দ্ হয়ে যাচ্ছিলো, তখন তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন,

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শেষ কালের মু'মিন হয়ে এখন মুরতাদ্দদের প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছো কেন?"

৪০. এভাবে যে, না আমার সম্পন্নকৃত রাক্'আতগুলো স্মরণ থাকলো, না প্রথম রাক্'আতে কি পড়েছিলাম তা স্মরণ রইলো। বুঝা গেলো যে, নামাযে ওয়াসওয়াসাহ্ বুযুর্গদেরও হয়ে যায়।

৪১. خِنْزَب, خ বর্ণে 'যের' বা 'যবর' এবং ز বর্ণে 'যবর' দ্বারা। অর্থ হচ্ছে পঁচা মাংস কিংবা সার্বক্ষণিক গুনাহ্। [ক্বামূস] এটা শয়তানের ওই বংশধরের নাম, যারা নামাযীদের মনে নামাযে সন্দেহের উদ্রেক করে।

৪২. নামায শুরু করার সময় 'তাকবীর-ই তাহরীমাহ্'র পূর্বে। অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় যে, যে ব্যক্তি 'তাহরীমাহ্'র পূর্বে এভাবে ভৎর্সনা করে لاحول শরীফ পড়ে নেয়, তারপর 'তাহরীমাহ্' করে, নামাযের মধ্যখানে দৃষ্টি সংযত রাখে, অর্থাৎ ক্বিয়ামের সময় সাজদাহ্'র স্থান, রুকূ'র মধ্যে পায়ের পিঠ, সাজদাহ্'য় নাকের অগ্রভাগ, বৈঠকে কোলে নিবদ্ধ রাখবে, ইনশা- আল্লাহ্, নামাযে তার একাগ্রতা নসীব হবে।

৪৩. অর্থাৎ এ হাদীস আমারও পরীক্ষিত। 'মুহাদ্দিসীন-ই কেরামের দৃষ্টিতে পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত হলে হাদীস শক্তিশালী হয়ে যায়। আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' দ্বিতীয় খণ্ড দেখুন।

وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ اَهِمُ فِىْ صَلَاتِىْ فَيَكْثُرُ ذٰلِكَ عَلَىَّ فَقَالَ لَهُ اِمْضِ فِىْ صَلَاتِكَ فَاِنَّهُ لَنْ يَّذْهَبَ ذٰلِكَ عَنْكَ حَتّٰى تَنْصَرِفَ وَاَنْتَ تَقُوْلُ مَااَتْمَمْتُ صَلَاتِىْ - رَوَاهُ مٰلِكٌ

بَابُ الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ

◆اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ◆ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم

৭২ ॥ হযরত ক্বাসেম ইবনে মুহাম্মদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,[৪৪] এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "আমি আমার নামাযে সন্দেহ করে থাকি এবং এ সব দ্বন্দ্ব আমার বেশি হয়ে থাকে।" তিনি বললেন, "তুমি তোমার নামায পড়তে থেকো। কেননা, এ সন্দেহ তো যাবে না, যতক্ষণ না তুমি এটা বলে নামায শেষ করবে, আমার নামায পরিপূর্ণ হয় নি।"[৪৫] [মুআত্তা-ই ইমাম মালিক]

অধ্যায়: তাক্বদীরের উপর ঈমান আনা[১]

◆প্রথম পরিচ্ছেদ◆ ৭৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

৪৪. তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র পৌত্র। মহা মর্যাদাবান তাবে'ঈ এবং মদীনা মুনাওয়ারার ৭ জন ক্বারীর অন্যতম। হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা তাঁর ফুফু। ইমাম যায়নুল আবেদীন তাঁর খালাত ভাই এবং তিনি ইমাম মুহাম্মদ বাক্বির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম'র শ্বশুর। তিনি ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র নানা। যেহেতু তিনি এতিম র'য়ে গিয়েছিলেন, তাই হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাঁকে লালন-পালন করেন। তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ ও আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে এক বিরাট দল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৭০/৭২ বছর বয়স পেয়ে হিজরি ১০১/১০২ সনে ওফাত পান। 'ইকমাল' গ্রন্থে আল্লামা খতীব-ই বাগদাদী লিখেছেন, তিনি ৭০ বছর বয়সে ১০১ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন।

৪৫. সুবহানাল্লাহ! কত সুন্দর শিক্ষা! অর্থাৎ মনের এ সকল কুপ্ররোচনার কারণে কোন নামায ছেড়ে দিও না, পুনরায় সম্পন্নও করো না। এগুলো আসতে থাকবে। যখন নাফস-শয়তান তার এসব কাজ থেকে বিরত হয় না, তুমি কেন নামায ছেড়ে দেবে? মাছিগুলোর কারণে তো খাবার পরিহার করা হয় না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, অন্তরের বান্দা নও। অন্তর একাগ্র হোক কিংবা না-ই হোক, নামায সম্পন্ন করতে থাকো।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, নামায পরিপূর্ণ না হবার জন্য 'সন্দেহ' যথেষ্ট নয়। এসব সন্দেহের দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না; নামায পড়তে থাকো।

১. এখানে عَام(ব্যাপক)'র পর خَاص(নির্দিষ্ট) উল্লেখ করা হয়েছে; যদিও ঈমানের বর্ণনায় তাক্বদীরও অন্তর্ভুক্ত ছিলো, কিন্তু যেহেতু তাক্বদীরের মাসআলা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর, এতে 'জবরিয়া'-'ক্বদরিয়া' বহু বাতিল ফির্ক্বার বিরোধপূর্ণ বিষয় রয়েছে এবং এ মাসআলা সর্বসাধারণের জন্য দুর্বোধ্য, তাই এটার পৃথক অধ্যায় নির্ধারণ করা হয়েছে। تَقْدِيْرٌ (তাক্বদীর)'র শাব্দিক অর্থ 'আন্দাজ করা।' মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ (অর্থাৎ নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে একটা নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি[৫৪:৪৯])। কখনও তা বিচার ও ফায়সালা অর্থেও আসে। ইসলামের পরিভাষায় ওই আন্দায ও ফয়সালাকে 'তাক্বদীর' বলা হয়, যা মহান রবের পক্ষ থেকে স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে লিপির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাক্বদীর ৩ প্রকার:

১. মুবরাম,
২. মুশাবাহ-ই মুবরাম ও
৩. মু'আল্লাক্ব।

প্রথম প্রকারের তাক্বদীর পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়

كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى عِنْدَ رَبِّهِمَا

"আল্লাহ্ সৃষ্টিকুলের তাক্বদীরসমূহ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছেন।[২] তিনি এরশাদ করেন, তাঁর আরশ পানির উপর ছিলো।[৩] [মুসলিম] **৭৪ ||** হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক জিনিসেরই তাক্বদীর বা পরিমাণ রয়েছে, এমনকি অক্ষমতা এবং জ্ঞানবুদ্ধিরও।[৪] [মুসলিম] **৭৫ ||** হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত আদম ও হযরত মূসা স্বীয় রবের সামনে (মুনাযারাহ্) পরস্পর যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন।[৫]

প্রকার তাক্বদীর আল্লাহর বিশেষ প্রিয় বান্দাদের দো'আয় পরিবর্তিত হতে পারে এবং তৃতীয় প্রকার সাধারণ মুসলমানদের দো'আ এবং নেক আমলের বদৌলতে পরিবর্তিত হয়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتٰبِ (অর্থাৎ "আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করেন এবং (যা চান) প্রতিষ্ঠিত করেন। আর তাঁরই কাছে রয়েছে মূললিপি।"[১৩:৩৯]) হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে লূত সম্প্রদায়ের জন্য দো'আ করতে বারণ করা হয়েছিলো। কেননা, তাদের উপর দুনিয়াবী আযাবের ফয়সালা 'মুবারাম'(নিশ্চিত) হয়ে গিয়েছিলো। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র দো'আর বরকতে হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম'র বয়স ৬০ বছরের স্থলে ১০০বছর হয়ে গিয়েছিলো। প্রথমোক্ত তাক্বদীর ছিল 'মুবারাম' পর্যায়ের। আর এটা হল 'মু'আল্লাক্ব'।

স্মর্তব্য যে, তাক্বদীরের কারণে মানুষ পাথরের ন্যায় বাধ্য হয়ে যায়নি। নতুবা হত্যাকারীর ফাঁসি হতো না এবং চোরের হাত কাটা যেতো না। কেননা, মহান রবের ইলমে এটা এসেছে যে, অমুক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এ কাজ করবে। দো'আ, ঔষধ-পথ্য, আমাদের চেষ্টা-তদবীর এবং ইখতিয়ারসমূহ সবই তাক্বদীরের অন্তর্ভুক্ত। এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমার 'তাফসীর-ই নাঈমী': ৩য় পারায় দেখুন।

২. অর্থাৎ 'ক্বলম' লাওহ্-ই মাহফূযে আল্লাহ্'র হুকুমে অনাদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বিন্দু বিন্দু করে লিখে দিয়েছে। স্মর্তব্য যে, এই লিপিবদ্ধ করা এ জন্য ছিলো না যে, মহান রব ভুলে যাবার আশঙ্কা ছিলো, বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো ফিরিশতাকুল এবং কতেক প্রিয় বান্দাকে সে সম্পর্কে অবগত করানো।[মিরক্বাত]

এ থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার কিছু বান্দা সৃষ্টিজগতের সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবগত। নতুবা এ লিপিবদ্ধ করা অযথা হয়ে যেতো। লাওহ-ই মাহফূযকে ক্বোরআন-ই করীম 'কিতাবে মুবীন' (সুস্পষ্ট কিতাব) বলেছে। অর্থাৎ স্পষ্টকারী কিতাব। যদি 'লাওহ মাহফূয' সকলের দৃষ্টি থেকে গোপন হতো তাহলে 'মুবীন' হতোনা।

৩. এ থেকে বুঝা গেলো যে, আসমান ও যমীন ইত্যাদি সৃষ্টির পূর্বেই পানির সৃষ্টি হয়েছে। আরশ পানির উপর হবার অর্থ এটাই যে, ওই দু'টির মধ্যখানে কোন আড়াল ছিলোনা। এটাও নয় যে, তা পানির উপর স্থাপন করা হয়েছিলো। অন্যথায় আরশ সমস্ত জড়পদার্থ থেকে বহু বড়। [আশি''আহ্]

৪. এ হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে, এ আয়াত- اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ (অর্থাৎ নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জিনিসকে একটা নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি।[৫৪:৪৯]) অর্থাৎ মানুষের সামর্থ্য ও অক্ষমতা, জ্ঞান ও অজ্ঞতা -সবই পূর্বে নির্ধারিত হয়ে গেছে।

৫. হয়তো আত্মার জগতে। অথবা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র যামানায় হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে জীবিত করে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে, অথবা এভাবে যে, 'হাযা-ইর-ই কুদস' (ঊর্ধ্বজগতে আল্লাহর পবিত্র দরবারে নৈকট্যধন্য পুণ্যাত্মাদের বিশেষ মিলনকেন্দ্র)-এ তাঁদের সাক্ষাত হয়েছিলো। মিরক্বাতে বর্ণিত আছে যে, সম্মানিত নবীগণ তাদের আপন আপন কবর শরীফে জীবিতই, নামাযও পড়েন। দেখুন, আমাদের নবীর মি'রাজ রজনীতে সমস্ত নবী সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁদেরকে নামায পড়িয়েছেন।

فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى قَالَ مُوْسٰى اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَ نَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِهٖ وَاَسْجَدَلَكَ مَلٰٓئِكَتَهٗ وَاَسْكَنَكَ فِىْ جَنَّتِهٖ ثُمَّ اَهْبَطْتَّ النَّاسَ بِخَطِيَّاتِكَ اِلَى الْاَرْضِ قَالَ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسٰى الَّذِىْ اِصْطَفٰكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهٖ وَبِكَلَامِهٖ

তখন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র উপর বিজয়ী হয়েছেন। হযরত মূসা বললেন, "আপনি ওই আদম, যাঁকে আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে স্বীয় রূহ ফুঁকে দিয়েছেন,[৬] স্বীয় ফিরিশ্তাদের দ্বারা আপনাকে সাজদাহ্ করিয়েছেন,[৭] আপনাকে তাঁর জান্নাতে রেখেছেন,[৮] তারপর আপনি স্বীয় পদস্খলনের মাধ্যমে মানুষকে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করিয়েছেন।"[৯] হযরত আদম বললেন, "আপনি ওই মূসা, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরী ও কথোপকথনের জন্য মনোনীত করেছেন,[১০]

এ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র দৃষ্টি রূহ জগতেও রয়েছে। এমনকি তিনি সেখানকার অবস্থাদি প্রত্যক্ষ করেন এবং মানুষকে তা শুনিয়ে দেন। কেননা, একথাই সুস্পষ্ট যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এসব ঘটনা (না দেখে না শুনে নয়, বরং) সচক্ষে দেখেই বর্ণনা করেছেন।

৬. অর্থাৎ আপনার পবিত্র গড়নে ফিরিশতাদের মাধ্যম ব্যতীত এবং মাতাপিতার মাধ্যম ছাড়া মহান আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতী হাতে তৈরি করেছেন এবং নিজের সমস্ত পরিপূর্ণতার প্রকাশস্থল করেছেন। আর স্বীয় সৃজিত রূহ আপনার পবিত্র শরীরে সঞ্চালন করেছেন। এখানে আল্লাহ্'র সাথে সম্বন্ধ করাটা মর্যাদা প্রকাশের জন্যেই।
নতুবা মহান আল্লাহ্ স্বয়ং রূহ থেকে পবিত্র। রূহের গূঢ় তত্ত্ব আল্লাহই জানেন। তবে বুঝা যাচ্ছে যে, তা ফুৎকারের উপযোগী বস্তু। কেননা, সবক্ষেত্রে রূহের জন্য ফুৎকার শব্দটাই ব্যবহৃত হয়। আউলিয়া-ই কেরামের ঝাড়-ফুঁকের প্রমাণ এ জাতীয় হাদীস ও আয়াতসমূহ থেকেই গৃহীত।

৭. তা'যীমী সাজদা, যমীনের উপর কপাল রেখে করিয়েছিলেন, না শুধু রুকূ' করিয়েছেন, না শুধু ঝুঁকিয়েছিলেন। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ (সুতরাং তোমরা তার জন্য সাজদাবনত হও)।
এটা ইবাদতের উদ্দেশ্যে সাজদাহ্ ছিলো না; বরং তা ছিলো আল্লাহর জন্য আর আদম আলায়হিস্ সালাম হলেন ক্বেবলা স্বরূপ।☆ যা لَكَ শব্দের 'لِ'র মর্মার্থ থেকে বুঝা যায়। অন্যথায় শয়তান কখনো তা করতে অস্বীকার করতো না।

৮. সাময়িকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য, যাতে যমীনকে তিনি এভাবে আবাদ করতে পারেন। অন্যথায় তাঁর সৃষ্টি তো যমীনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যেই ছিলো। এর বিশ্লেষণ আমার তাফসীর-ই নাঈমী'তে দেখুন।

৯. অর্থাৎ খাত্বা-ই ইজতিহাদী বা গবেষণাজনিত ত্রুটি এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে গন্ধম খেয়ে ফেলেছেন। যদ্দরুন তিনি যমীনে তাশরীফ আনেন এবং বংশধারা এখানেই চালু হয়। যদি তিনি সেখানে থাকতেন, তাহলে আমরা সবাই ওখানেই জন্ম নিতাম।

একটি মজার কাহিনী

এক বেআদব জনৈক আলিমকে বললো, "দাদার গুনাহ্ আমরা ভোগ করছি। গন্ধম তিনি খেয়েছেন, শাস্তি আমরা পাচ্ছি। তিনি আমাদেরকে নিচে নামিয়ে এনেছেন।" আলিম উত্তরে বললেন, এটা একেবারে ভুল কথা; বরং তোমার মতো ধিককৃতরাই তাঁকে নিচে নামিয়ে এনেছে। মহান রব জানতেন যে, তাঁর পিঠে তোমার মতো বে-ঈমান সন্তানও রয়েছে। তিনি তাই নির্দেশ দিলেন, "হে আদম! এদের মত খবীসদেরকে যমীনে নিক্ষেপ করে এসো, তারপর ফিরে এসো।" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র উক্ত আবেদন-নিবেদন অশালীনতা প্রকাশের জন্য নয়। সম্মানিত নবীগণ সম্মানিত পিতৃপুরুষদের প্রতি অশালীনতা প্রদর্শন করা থেকেও পবিত্র।

১০. পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থান করে ফিরিশতার মাধ্যম ব্যতীত মহান রবের সাথে সরাসরি কথা বলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র বিশেষত্ব। এ জন্যেই তাঁর উপাধি 'কালীমুল্লাহ্'। লা-মকানে পৌঁছে মহান রবের দীদার লাভ করা ও তাঁর সাথে কথা বলা আমাদের মহান রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'রই বৈশিষ্ট্য। কেননা, তিনি হচ্ছেন 'হাবীবুল্লাহ্'।

☆ এটা এভাবেও বলা যায়- زبان حال سے کہتے تھے آدم - جسے سجدہ ہوا ہے میں نہیں ہوں অর্থাৎ অবস্থার ভাষায় হযরত আদম আদম বলছিলেন- "যাকে সাজদাহ্ করা হয়েছে তিনি তো আমি নই।"

وَاَعْطَاکَ الْاَلْوَاحَ فِیْهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَیْءٍ وَقَرَّبَکَ نَجِيًّا فَبِكَمْ وَجَدْتَّ اللّٰهَ كَتَبَ التَّوْرٰةَ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ قَالَ مُوْسٰى بِاَرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ اٰدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَّ فِيْهَا وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى قَالَ نَعَمْ قَالَ اَفَتَلُوْمُنِیْ عَلٰى اَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا

আপনাকে তাওরীতের লিখিত ফলকসমূহ দান করেছেন, যেগুলোতে সমস্ত জিনিসের সুস্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান[১১] এবং আপনাকে বিশেষ গোপনকথা দ্বারা নৈকট্য দান করেছেন। বলুন তো, আমাকে সৃষ্টি করার কতকাল পূর্বে আপনি তাওরীতকে পেয়েছেন যে, আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করেদিয়েছেন?"[১২] হযরত মূসা বললেন, "৪০ বছর পূর্বে।"[১৩] হযরত আদম বললেন, "আপনি কি তাওরীতে এটাও দেখেছিলেন যে, স্বীয় রবের আনুগত্যের ক্ষেত্রে আদমের পদস্খলন হয়েছে, সুতরাং তিনি সফলকাম হন নি?"[১৪] তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" হযরত আদম বললেন, "তাহলে কি আপনি ওই ধরনের ত্রুটির জন্য আমাকে তিরস্কার করছেন,[১৫]

১১. অর্থাৎ তাওরীত শরীফ, যা 'যবরজদ' (পান্না) পাথরের ফলকসমূহের উপর লিপিবদ্ধ অবস্থায় প্রদান করা হয়েছে। তাতে তৎকালীন শরীয়তের বিধি-বিধান এবং সমস্ত গায়েবী ইলমের সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিলো। স্মর্তব্য যে, তাওরীত প্রদানের সময় তাতে হিদায়তও ছিলো এবং সমস্ত জিনিসের বর্ণনাও ছিলো। কিন্তু যখন সম্প্রদায়ের লোকদের গো-বৎস পূজার কারণে রাগান্বিত হওয়ায় হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র হাত থেকে তা যমীনে পড়ে গিয়েছিলো। তখন হিদায়ত ও রহমত তো থেকে গেলো, কিন্তু تِبْيَانٌ لِّكُلِّ شَیْءٍ (সমস্ত বস্তুর বিশদ বিবরণ) তা থেকে ওঠিয়ে নেয়া হলো। মহান রব এরশাদ ফরমান-

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ وَفِیْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ

(এবং যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলো তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন আর সেগুলোর লিখিত বিষয়াদির মধ্যে হিদায়াত ও রহমত রয়েছে -ওইসব লোকের জন্য, যারা আপন রবকে ভয় করে।।৭:১৫৪।)

দেখুন- এখানে تِبْيَانٌ-এর উল্লেখ নেই। সারকথা এটাই যে, 'তাওরীত'-এ সমস্ত গায়েবী ইলম ছিলো, কিন্তু স্থায়ী থাকেনি। অথচ কোরআন শরীফে সমস্ত গায়েবী ইলমের বর্ণনা ছিলো এবং স্থায়ীও রয়েছে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- نَزَّلْنَا عَلَيْکَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ (অর্থাৎ আর আমি আপনার উপর এ ক্বোরআন অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ...।১৬:৮৯।) সুতরাং হযতর মূসা আলায়হিস্ সালাম'র ইলম আমাদের প্রিয়নবীর সমান হতে পারে না।

১২. অর্থাৎ আপনি তো জানেন যে, আমার সৃষ্টির কত কাল পূর্বে তাওরীত শরীফ লাওহে মাহফূযে কিংবা ফিরিশতাদের সহীফাগুলোতে অথবা এসব ফলকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো। তৃতীয় অর্থটিই অধিক স্পষ্ট। এ থেকে বুঝা গেলো যে, সম্মানিত নবীগণের দৃষ্টি এ জগত সৃষ্টির পূর্বের ঘটনাবলীও দেখে নেয়। কেননা, যে ঘটনা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র সৃষ্টির পূর্বে হয়েছে, তা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র দৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান, যা وَجَدْتَّ শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে।

১৩. যদি ফলকগুলোয় লিপিবদ্ধ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে 'বছর' দ্বারা দুনিয়ার বছর বুঝাবে এবং যদি লাওহে মাহফূযে লিখা বুঝায়, তাহলে মহান রবের জ্ঞাত বছর বুঝানো উদ্দেশ্য হবে; যেখানকার এক বছর এখানকার হাজার বছরের চেয়েও অধিক। সুতরাং এ হাদীস শরীফ পূর্ববর্তী হাদীসের বিপরীত নয়; যাতে রয়েছে যে, লাওহ মাহফূযে লিপিবদ্ধ করা আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে।।আশি''আহ ও মিরক্বাত।

স্মর্তব্য যে, তাওরীত আল্লাহ্'র কালাম, যা 'ক্বদীম' (চিরন্তন), আর সেটার নক্শাসমূহ লিপিবদ্ধ করাটা 'হা-দিস' (নশ্বর), এখানে সেটারই উল্লেখ রয়েছে।

১৪. অর্থাৎ গবেষণায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে, যে উদ্দেশ্যে গন্দুম খেয়েছিলেন, তা তিনি অর্জন করতে পারেন নি। তা হচ্ছে স্থায়িত্ব লাভ ও মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া। স্মর্তব্য যে, সম্মানিত নবীগণ নুবূয়ত প্রকাশের পূর্বে ও পরে ছোট ও বড় সব ধরনের গুনাহ্ থেকে নিষ্পাপ।।মিরক্বাত। হ্যাঁ, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি গবেষণার সিদ্ধান্ত জনিত (ত্রুটিই) হতে পারে। আর তাঁদের এ ধরনের ত্রুটির কারণে আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে যেই মৃদু তিরস্কার আসে, তাতে হাজার হাজার হিকমত নিহিত থাকে। সুতরাং এখানে غَوٰى ও عَصٰى-এর ওই অর্থই হবে, যা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

১৫. অর্থাৎ তুমি কি তিরস্কারের ভঙ্গিতে কথা বলছো? অন্যথায় হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাঁকে না তিরস্কার করতে পারতেন, না করেছেন। পুত্র পিতাকে, বিশেষত নবী-পিতাকে এবং ছাত্র শিক্ষককে তিরস্কার করার অধিকার

كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيَّ اَنْ اَعْمَلَهُ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِيْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اَنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِيْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِّثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِّثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ

যা সম্পন্ন করা আমার সৃষ্টির ৪০ বছর পূর্বে আমার তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছিলো?[১৬] নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- হযরত আদম মূসা আলায়হিস্ সালাম'র উপর (যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শনে) বিজয়ী রইলেন।[১৭][মুসলিম] **৭৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ** রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদিকুল মাসদূক্ব (সর্বস্বীকৃত সত্যবাদী) নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন,[১৮] তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের সৃষ্টির মূল উপাদান মায়ের পেটে চল্লিশ দিন বীর্য হিসেবে থাকে, তারপর ওই পরিমাণ সময় রক্তপিণ্ড, তারপর ওই পরিমাণ মেয়াদকাল যাবৎ মাংসপিণ্ড।[১৯] তারপর আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফিরিশ্তাকে চারটি বিষয় বাতলিয়ে দিয়ে তার নিকট প্রেরণ করেন।[২০]

রাখেন না।

১৬. আর মহান রব তাঁকে সেটার ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন। স্মর্তব্য যে, এখানে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র দৃষ্টি বাহ্যিক অবস্থার দিকে ছিলো। পক্ষান্তরে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র উত্তর প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতেই ছিলো। বর্তমানে আমাদের মত গুনাহ্গাররা তাক্বদীরের দোহাই দিয়ে স্বীয় গুনাহ্গুলো থেকে মুক্ত হতে পারি না। অর্থাৎ হে মূসা! আমার এই বিচ্যুতি এবং জান্নাত থেকে ভূ-পৃষ্ঠে আসা, এখানে এত সুন্দর বাগ-বাগিচা সাজানো -সবই মহান রবের ইচ্ছা ও তাঁর সন্তুষ্টি সাপেক্ষেই ছিলো। এতে হাজার হাজার রহস্যও নিহিত ছিলো। তুমি রহস্যের ধারক (রহস্যজ্ঞানী) হয়ে আমাকে এ প্রশ্ন কেন করছো?

১৭. কেননা, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র প্রশ্ন ছিলো শরীয়ত ভিত্তিক আর হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র উত্তর ছিল হাক্বীক্বত বা বাস্তবভিত্তিক। বিজয় হাক্বীক্বতেরই হয়ে থাকে। হাক্বীক্বতের অধিকারী হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম শিশুটিকে তার অপরাধসম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও হত্যা করেছিলেন, অথচ তাঁর বিরুদ্ধে এ জন্য কোন ফাতওয়া আরোপিত হয় নি।

১৮. 'সাদিক্ব' তিনিই, যাঁর সব উক্তিই সত্য। 'মাসদূক্ব' তিনিই, যাঁর সকল আমল সত্য। অথবা 'সাদিক্ব' তিনিই, যিনি বোধসম্পন্ন হয়ে সত্য বলেন এবং 'মাসদূক্ব' ওই ব্যক্তি, যিনি শুরু থেকেই সত্যবাদী হন। অথবা 'সাদিক্ব' হলেন যিনি বাস্তব ঘটনানুযায়ী সংবাদ দেন এবং 'মাসদূক্ব' হচ্ছেন, যিনি স্বীয় মুবারক মুখে যা বলে দেন, বাস্তবেও তা ঘটে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মধ্যে এ সর্ব গুণই বিদ্যমান।

১৯. অর্থাৎ মায়ের গর্ভে বীর্য (শুক্রাণু) চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওই অবস্থায় সাদা রঙেই থাকে। তারপর লাল বর্ণের রক্তে পরিণত হয়। তারপর চল্লিশ দিন পরে জমাট বেঁধে মাংস হয়।

সম্মানিত সূফীগণ বলেছেন, যেহেতু হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র দেহ মুবারক সৃষ্টির উপাদান চল্লিশ বছর এবং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র তূর পাহাড়ে অবস্থান চল্লিশ দিন ছিলো, এ জন্যেই শুক্রাণুর উপর পত্যেক চল্লিশ দিন পর পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং সন্তান প্রসবের পর নিফাস'র সময়সীমাও চল্লিশ দিন। বিবেক-বুদ্ধির পরিপূর্ণতাও আসে চল্লিশ বছরে।

এ হাদীস শরীফ সূফীগণের চিল্লার দলীল। সুন্নী মুসলমানগণ মৃতব্যক্তির চেহলাম এ হাদীস শরীফের ভিত্তিতেই করে থাকেন। কারণ চল্লিশের মধ্যে পরিবর্তন হওয়া বিদ্যমান।

২০. অর্থাৎ তাক্বদীর লিখক ফিরিশ্তা, যিনি গর্ভস্থ শিশুর অদৃষ্ট লেখায় নিয়োজিত একমাত্র ফিরিশ্তা। তিনি সমগ্র দুনিয়ার গর্ভবতী মহিলাদের পর্যবেক্ষক। বুঝা গেলো যে, তিনিও হাযির-নাযির (উপস্থিত-প্রত্যক্ষকারী)।

২১. অর্থাৎ সে কি করবে, কখন ও কোথায় মৃত্যুবরণ

فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ اَوْسَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَوَالَّذِىْ لَآ اِلٰهَ غَيْرُهُ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّاذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِفَيَدْخُلُهَاوَاَنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِحَتّٰى مَايَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّاذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

তখন ওই ফিরিশ্‌তা তার কর্ম, তার মৃত্যু, তার রিযক্ব এবং সে কি হতভাগা না সৌভাগ্যবান- এ সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে যায়।[২১] তারপর তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়। অতঃপর ওই সত্তারই শপথ! যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কেউ বেহেশ্‌তীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও বেহেশ্‌তের মধ্যখানে শুধু এক হাতের ব্যবধান থাকে,[২২] তখন হঠাৎ লিপিবদ্ধ তাক্বদীর তার সামনে এসে যায় এবং সে দোযখীদের কাজ করে বসে;[২৩] অতঃপর সে সেখানেই পৌঁছে যায়। আর তোমাদের মধ্যে কেউ দোযখীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও দোযখের মধ্যখানে শুধু এক হাতের ব্যবধান থাকে, তখনই তার লিপিবদ্ধ তাক্বদীর তার সামনে এসে যায় এবং সে বেহেশ্‌তীদের কাজ করে থাকে। অতঃপর সে সেখানেই প্রবেশ করে।[২৪] [বোখারী, মুসলিম] **৭৭ ॥ হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ**[২৫] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

---

করবে, কি কি আহার করবে, কি পান করবে এবং তার মৃত্যু কাফির অবস্থায় হবে, না মু'মিন অবস্থায়! স্মর্তব্য যে, এ বিষয়গুলো ওই পঞ্চজ্ঞানভুক্ত, যেগুলো সম্বন্ধে বলা হয়েছে وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ الْاٰيَةَ (আর তাঁরই নিকট রয়েছে অদৃশ্যভাণ্ডারের চাবিসমূহ...।৬:৫৯।) এ ফিরিশ্‌তা আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষাক্রমে সমস্ত মানুষের এ সব বিষয়ে জ্ঞাত। 'মিরক্বাত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ বিষয়গুলো একটি ফলকে লিখে শিশুর গলায় ঝুলানো হয়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ (এবং প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য আমি তার গ্রীবালগ্ন করে দিয়েছি।।১৭:১৩।) চিন্তা করুন, যখন ফিরিশ্‌তার ইলমের পরিমাণ এতটুকু হয়, তখন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, যিনি আ'লামুল খালক্ব (সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী), তাঁর জ্ঞান তো আমাদের ধারণা-কল্পনার বহু উর্ধ্বে। আর এ ফলকে লিখা এবং গলায় ঝুলানো এজন্যই যেন বাস্তব দৃষ্টিতে তা পড়তে পারে। স্মর্তব্য যে, লিপিবদ্ধ করা লাওহে মাহফূযেও হয়ে থাকে এবং শবে ক্বদরে ফিরিশতাদের সহীফাসমূহেও হয়ে থাকে; তাছাড়া, শিশুদের কপাল কিংবা গলার ফলকে অথবা হাতেও হয়ে থাকে; কিন্তু এ লিখন বিভিন্ন ধরনের।

২২. অর্থাৎ শুধু মৃত্যুর। অর্থাৎ মৃত্যু হবে এবং ওখানে পৌঁছে যাবে। 'এক হাত' উপমা দেওয়ার জন্য এরশাদ করেছেন।

২৩. অর্থাৎ কাফির হয়ে যায়। এতে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, মহান রব কুকর্ম ব্যতীত কাউকে দোযখে নিক্ষেপ করেন না। সুতরাং এটাই সুস্পষ্ট যে, কাফিরদের শিশুরা দোযখী নয়। (আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাতা)

২৪. অর্থাৎ ঈমান এনে মুত্তাক্বী (খোদাভীরু) হয়ে মৃত্যু বরণ করে। সুতরাং কোন পাপী যেন মহান রবের করুণা থেকে নিরাশ না হয় এবং কোন নেক্‌কারও যেন স্বীয় তাক্বওয়ার উপর অহঙ্কার না করে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শুভমৃত্যু দান করুন!

স্মর্তব্য যে, জান্নাত অর্জিত হবে- নেক আমলের ভিত্তিতে, আল্লাহ্‌র দান স্বরূপ এবং তাঁর বদান্যতা ও অনুগ্রহক্রমে। এখানে আমল দ্বারা অর্জিত জান্নাতের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় মুসলমানের শিশুরাতো জান্নাতীই। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (অর্থাৎ আমি তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে মিলিয়ে দিই)।

২৫. তিনি সা-'ঈদী ও আনসারী। তাঁর নাম প্রথমে 'হাযন' (কঠিন) ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'সাহ্‌ল' (নম্র) রেখেছেন। তাঁর উপনাম আবুল আব্বাস অথবা আবূ

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَاَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دُعِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى جَنَازَةِ صَبِىٍّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ طُوْبٰى لِهٰذَا عُصْفُوْرٌ مِّنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوْءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ فَقَالَ اَوْغَيْرُ ذٰلِكِ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِىْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ

নিঃসন্দেহে কোন কোন বান্দা তো দোযখীদের মত কাজ করে থাকে, অথচ সে হয় জান্নাতী। আর কোন কোন বান্দা জান্নাতীদের ন্যায় কাজ করে, কিন্তু সে দোযখী হয়ে যায়। আমলসমূহের বিবেচনা শেষ পরিণতির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে।[২৬]

৭৮ ॥ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত,[২৭] তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এক আনসারী শিশুর জানাযার দাওয়াত দেওয়া হলো। আমি আরয করলাম, "তার জন্য সুসংবাদ যে, সে বেহেশ্তের পাখিগুলোর মধ্যে একটি পাখি,[২৮] যে গুনাহ্ করেনি, গুনাহ্ করার সময়ও পায়নি।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "হে আয়েশা! এতদভিন্ন কী হতে পারে?[২৯] নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এমন কিছু বেহেশতী সৃষ্টি করেছেন, যাদেরকে তাদের পিতার পৃষ্ঠেই বেহেশ্তের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

ইয়াহয়া। তিনি নিজেও সাহাবী ছিলেন, তাঁর পিতাও সাহাবী। হুযূরের ওফাত শরীফের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৫ বছর। হিজরি ৯১ সনে মদীনা মুনাওয়ারায় ওফাত পান। মদীনা-ই তাইয়্যেবায় সর্বশেষ সাহাবী তিনিই। তাঁর ওফাতে মদীনা ত্বাইয়্যেবাহ্ সাহাবী শূন্য হয়ে পড়ে।

২৬. অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যেমন কর্ম তেমনই ফল হবে। সুতরাং বান্দার উচিত যেন সর্বদা নেক কাজ করে। কেননা, হতে পারে সেটাই তার জীবনের শেষ সময়।

২৭. তিনি উম্মুল মু'মিনীন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কন্যা। তাঁর মাতা উম্মে রূমান বিনতে 'আ-মির ইবনে 'ওয়াইমার।

নুবূয়তের ১০ম বছর শাওয়াল মাসে হিজরতের তিন বছর পূর্বে হুযূরের বিবাহাধীন হন, ৭ বছর বয়সে। হিজরতের ১৮ মাস পরে শাওয়াল মাসে ৯ বছর বয়সে পিত্রালয় থেকে বিদায় হয়ে নবী পাকের ঘরে চলে যান। ৯ বছর পর্যন্ত হুযূরের খিদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হুযূরের ওফাত শরীফের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ১৮ বছর। হুযূর তিনি ব্যতীত কোন কুমারীকে শাদী করেন নি।

তিনি ফিক্বহ্ বিশারদ, ভাষাবিদ। বহু হাদীস শরীফের হাফিযাহ্ এবং পবিত্র ক্বোরআনের উত্তম মুফাস্সির ছিলেন। তাঁর বক্ষে শির মুবারক রাখা অবস্থায় হুযূর ওফাত পান এবং তাঁরই হুজুরা শরীফে হুযূরকে দাফন করা হয়। যখন তাঁকে অপবাদ দেয়া হয়েছিলো তখন তাঁর পবিত্রতার বিবরণ দিয়ে ১৯টি আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়। পংক্তি-

یعنی ہے سورۂ نور جن کی گواہ - انکی پرنور صورت پہ لاکھوں سلام

(অর্থাৎ যাঁর পবিত্রতার সাক্ষী সূরা-ই নূর, তাঁর নূরানী গড়নের প্রতি লাখো সালাম।) তাঁর নিকট থেকে ১২১০টি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি ১৭ই রমযান মঙ্গলবার রাতে ৫৭ হিজরীতে ৫৩ বছর বয়সে হযরত আমীর-ই মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র শাসনামলে ওফাত পান। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর নামায-ই জানাযা পড়ান। জান্নাতুল বক্বী'তে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আমি (লিখক) তাঁর কবর শরীফের যিয়ারত করেছি।

২৮. অর্থাৎ শহীদদের মত যেখানে ইচ্ছা বাগ-বাগিচায় ভ্রমণ করবে।

২৯. অর্থাৎ সে জান্নাতী হওয়া নিশ্চিত নয়, কারণ, সে অন্য কিছুর জন্যও সৃষ্ট হতে পারে।

স্মর্তব্য যে, এ হাদীস শরীফ এ আয়াত শরীফ দ্বারা রহিত- وَاَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ...الاية অর্থাৎ: (আমি তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে মিলিয়ে দিই।)

[৫২:২১, তরজমা: কান্যুল ঈমান]

মুসলমানদের শিশুসন্তান তাদের পিতামাতার সাথেই থাকবে। কাফিরদের শিশুসন্তান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এর বিশ্লেষণের জন্য আমার 'হাশিয়াতুল ক্বোরআন' (তাফসীর-ই নূরুল 'ইরফান) দেখুন।

وَخَلَقَ لِلنَّارِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِيْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ

আর কিছু দোযখীও সৃষ্টি করেছেন, যাদেরকে তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশেই দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[৩০]

৭৯ ॥ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত[৩১] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যার একটি ঠিকানা দোযখে[৩২] এবং একটি ঠিকানা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয় নি।"

৩০. অর্থাৎ যাকে যেখানকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে সেখানেই পৌঁছুবে, আমল করুক কিংবা না-ই করুক। এ প্রসঙ্গে আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 'আমল' ছাড়াও আল্লাহ'র দান বা বদান্যতায়ও জান্নাত অর্জিত হবে; কিন্তু আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও দয়া থেকে এটা বহু দূরে যে, তিনি গুনাহ্ ব্যতীত কাউকে জাহান্নামে পাঠাবেন না। যেমন এরশাদ হচ্ছে-وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (তোমরা কেবল আপন কৃতকর্মের প্রতিফলই পাবে। ৩৬:৫৪)।

ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, মুসলমানদের শিশুসন্তান জান্নাতী হবে মর্মে ইমামদের ইজমা' বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর কাফিরদের শিশুসন্তান অধিকাংশ ইমামের মতে জান্নাতী। আর এ হাদীস মানসূখ (রহিত) বলে বিবেচিত হবে।

৩১.তাঁর নাম মুবারক আলী ইবনে আবূ তালিব, উপনাম আবুল হাসান এবং আবূ তোরাব, উপাধি হায়দার-ই কার্‌রার। তিনি কুরশী, হাশেমী ও মুত্তালিবী। (যথাক্রমে- তিনি ক্বোরায়শ বংশীয়, হাশেম গোত্রীয় এবং আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।) তিনি ইসলামের চতুর্থ খলীফা এবং ছোটদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মু'মিন । আট কিংবা দশ বছর বয়সে ঈমান আনেন। হুযূরের সাথে তাবূকের যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ফযীলত বর্ণনাতীত। তিনিই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বংশধরদের উৎসপুরুষ, রসূলে পাকের চাচাত ভাই, হযরত ফাতিমা বতূলের স্বামী। অর্থাৎ একদিকে তিনি হুযূর করীমের পাঞ্জতন-ই পাক (নবীপরিবারের ঘনিষ্টতম পাঁচজন: হুযূর করীম, হযরত ফাতিমা, হযরত আলী, হযরত হাসান ও হযরত হুসাঈন)'র অন্যতম এবং ঐতিহাসিক খায়বারের দুর্জয় দূর্গ ক্বমূস বিজয়ের প্রধান ব্যক্তিত্ব। পংক্তি-

شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن
پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام

অর্থাৎ তরবারি চালনাকারী সিংহ, খায়বারের ক্বমূস বিধ্বংসী (বিজয়ী), আল্লাহ'র ক্বুদরতের হাতের প্রতিচ্ছবি (হযরত আলী)-এর প্রতি লাখো সালাম।

তিনি ১৮ই যিলহজ্ব ৩৫হিজরী জুমু'আহবার অর্থাৎ হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের তারিখেই খলীফা নিযুক্ত হন। ৪ বছর ৯ মাস খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৬৩ বছর হায়াত পেয়ে ১৭ই রমযান ৪০ হিজরিতে জুমু'আহ'র দিন কূফার জামে মসজিদে শাহাদাত বরণ করেন। আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম মুরাদী 'ক্বত্বাম' নামীয়া এক মহিলার প্রেমে পড়ে তার কথা মত তাঁকে শহীদ করেছিলো।

শাহাদাতের ৩য় দিনে ওফাত পান। ইমাম হাসান, হুসাঈন এবং আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাঁকে গোসল দেন। ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জানাযার নামায পড়ান। কূফার কবরস্থান নাজাফ শরীফে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর ক্বর-ই আন্ওয়ার সৃষ্টিকুলের যিয়ারতের স্থান। আমিও যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

তাঁর ৯ স্ত্রী ছিলেন : ১.ফাতিমা যাহ্‌রা, ২.উম্মে বনীন, ৩.লায়লা বিনতে মাস'উদ, ৪.আসমা বিনতে 'ওমাইস, ৫.উমামা বিনতে আবুল 'আস, ৬.খাওলাহ্ বিনতে জা'ফর, ৭.সাহ্‌বা বিনতে রবী'আহ্, ৮.উম্মে সা'ঈদ বিনতে 'ওরওয়া, ৯.মাহ্ইয়া বিনতে ইমরাউ ক্বায়েস।

এ স্ত্রীদের গর্ভে বার পুত্র এবং নয় কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত হাসান, হযরত হুসাঈন, হযরত যায়নাব ও উম্মে কালসূম হলেন হযরত ফাতিমা যাহ্‌রার গর্ভজাত।

৩২. এখানেاو-واو(অথবা) অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ লাওহ-ই মাহফূযে প্রত্যেক মানুষ সম্পর্কে আগেভাগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে- সে জান্নাতী কিংবা দোযখী। জান্নাতী হলে কোন্ মর্যাদার আর দোযখী হলে কোন স্তরের। এখানে ওটা বুঝানো উদ্দেশ্য, যা সামনের বিষয়বস্তু দ্বারা সুস্পষ্ট হয়।

قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَانَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهٗ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الْاٰيَةَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ حَظَّهٗ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لَامُحَالَةَ

উপস্থিত লোকেরা আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা কি তাহলে আমাদের লিপিবদ্ধ তাক্বদীরের উপর ভরসা করবো না এবং আমল ছেড়ে দেবো না?"[৩৩] হুযূর এরশাদ করলেন, "আমল করতে থাকো। প্রত্যেকের জন্য ওই আমলই সহজ হবে, যার জন্য সে সৃষ্টি হয়েছে।[৩৪] যদি কেউ সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তার জন্য সৌভাগ্যপূর্ণ আমল সহজ হবে এবং যদি দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তার জন্য দুর্ভাগ্যের আমল সহজ হবে।"[৩৫] অতঃপর হুযূর করীম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন-"ফাআম্মা- মান আ'ত্বা- ওয়াত্তাক্বা- ওয়া সোয়াদ্দাক্বা বিল্‌হুসনা-"আল্-আয়াত। (সুতরাং ওই ব্যক্তি, যে দান করেছে ও পরহেযগারী অবলম্বন করেছে এবং সবচেয়ে উত্তমকে সত্য মেনেছে-আল্-আয়াত।[৯২:৫-৬])"[৩৬] [বোখারী, মুসলিম]

৮০ ॥ হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি মানুষের জন্য তার যিনার অংশ লিপিবদ্ধ (নির্ধারণ) করেছেন,[৩৭] যা সে অবশ্যই পাবে।

৩৩. কেননা, সংঘটিত হবে সেটাই যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমল যা-ই করুক না কেন, আল্লাহর ফয়সালা পরিবর্তিত হয় না।

৩৪. অর্থাৎ দুনিয়ায় কৃত আমলগুলো সাধারণত আমলকারীর পরিণামের পূর্বাভাস। জান্নাতীদের কাছে নেক কাজগুলো সহজ এবং গুনাহ্ ভারী মনে হয়। আর দোযখীদের কাছে এর বিপরীত মনে হয়। তবে এটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সব ক্ষেত্রে নয়। কখনও আজীবন গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাতী হয়ে মৃত্যুবরণ করে আর কখনও এর বিপরীতও ঘটে থাকে। সুতরাং এ হাদীস শরীফ পূর্ববর্তী হযরত সাহল ইবনে সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস শরীফের বিপরীত নয়।

৩৫. অর্থাৎ লাওহ-ই মাহফূযে কর্ম ও পরিণাম দু'টোই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি এ নেককাজগুলো করবে এবং জান্নাতে যাবে। আর অমুক লোক কুফর ইত্যাদি করবে। সুতরাং জাহান্নামী হবে। বান্দাদের উপর মহান রবের আনুগত্য করা ফরয। তাছাড়া, কাউকে জান্নাতী ও দোযখী হবার ব্যাপারে বাধ্য করা হয় নি।

৩৬. এ আয়াত শরীফ যদিওবা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ঈমান ও দানশীলতা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তবুও যেহেতু এর শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক, সেহেতু এটা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

৩৭. এখানে 'প্রতিটি মানুষ' দ্বারা সাধারণ মানুষ বুঝানো উদ্দেশ্য। যা থেকে, বাল্যকালে মৃত্যুবরণকারী সন্তানগণ, বিশেষ করে, আউলিয়া-ই কেরাম, সম্মানিত নবীগণ, বিশেষতঃ হযরত ইয়াহ্‌য়া ও হযরত ঈসা আলায়হিমাস্ সালাম স্বতন্ত্র। যারা সম্মানিত নবীগণকে এর অন্তর্ভুক্ত বলে বিশ্বাস করে তারা বে-দ্বীন। অর্থ এ যে, সাধারণত মানুষ যিনা কিংবা যিনার আনুষঙ্গিক বিষয়াদিতে জড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলার বড় অনুগ্রহ এ যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনিচ্ছাকৃত নড়াচড়া ও নিছক কুধারণার জন্য পাকড়াও করেন না।

হযরত শায়খ মুহাম্মদ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস-ই দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর আশি''আতুল লুম'আত গ্রন্থে লিখেছেন, যিনার অংশ মানে যিনার মাধ্যমসমূহ। এভাবে যে, মানুষের মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তি এবং নারীর প্রতি আসক্তি স্বভাবগতভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান তাকে তা থেকে রক্ষা করেন।

স্মর্তব্য যে, হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম'র পবিত্র হৃদয়ে ওই বিশেষ সময়ে যুলায়খার প্রতি বিন্দুমাত্রও আসক্তি জন্মেনি।

মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ

فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهٗ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ كُتِبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ نَصِيْبُهٗ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَامُحَالَةَ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَا هُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطٰى وَالْقَلْبُ يَهْوٰى وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهٗ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَءَيْتَ مَايَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُوْنَ فِيْهِ اَشَىْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى فِيْهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَبَقَ

সুতরাং চক্ষুর যিনা হচ্ছে কুদৃষ্টি,[৩৮] আর জিহ্বার যিনা হচ্ছে (যিনার তৃপ্তি লাভের কু-উদ্দেশ্যে) আলোচনা করা।[৩৯] আর মনের প্রবৃত্তি ইচ্ছা ও কামনা করে আর লজ্জাস্থান ওই কামনাকে সত্যায়িত কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।[বোখারী, মুসলিম] আর ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আদম-সন্তানদের উপর যিনার অংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা সে অবশ্যই পাবে। চক্ষুর যিনা হচ্ছে দেখা, কানের যিনা হচ্ছে শ্রবণ করা[৪০] এবং জিহ্বার যিনা হচ্ছে আলোচনা করা, হাতের যিনা স্পর্শ করা, পায়ের যিনা পা বাড়ানো[৪১] এবং মনের প্রবৃত্তি ইচ্ছা ও কামনা করে, আর লজ্জাস্থান সেটাকে সত্য কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।[৪২]

৮১ ‖ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন[৪৩] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, মুযায়না গোত্রের দু'ব্যক্তি আরয করলো, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি বলুন, লোকেরা যা কিছু বর্তমানে আমল করছে এবং যেগুলোতে মশগুল রয়েছে, সেগুলো কি এমন জিনিস, যা তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং যে জিনিসের তাক্বদীর তাদের মধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেছে,

---

رَبِّهٖ অর্থাৎ এবং তিনিও স্ত্রীলোকের ইচ্ছা করতেন- যদি আপন রবের নিদর্শন না দেখতেন।[১২:২৪])

৩৮. পরনারীর প্রতি আসক্তির কারণে।
স্মর্তব্য যে, হঠাৎ দৃষ্টি পতিত হওয়া ক্ষমাযোগ্য। ইচ্ছাকৃত দেখার জন্য পাকড়াও করা হবে। এখানে দ্বিতীয় প্রকার দৃষ্টি বুঝানো উদ্দেশ্য।

৩৯. পরনারীদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করা জিহ্বা বা মুখের যিনা, তা সাগ্রহে তৃপ্তিসহকারে উপভোগের জন্য শ্রবণ করা কানের যিনা। কোন কোন মহিলা স্বীয় স্বামীর নিকট অন্য মহিলার রূপ ও গুণ বর্ণনা করে থাকে। এটা গুরুতর অপরাধ।

৪০. কান লাগিয়ে মনযোগ সহকারে। এ জন্য এখানে اِسْتِمَاع - بَاب اِفْتِعَال থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪১. সারকথা এ যে, একটি যিনা অনেকগুলো ছোট-ছোট যিনার সমষ্টি। প্রত্যেক অঙ্গের যিনা আলাদা। যিনাকারী যিনা করার সময় চোখ, কান, জিহ্বা, হাত, পা সমস্ত অঙ্গের যিনা করে থাকে। এ জন্যই 'কঙ্কর নিক্ষেপ' করা হয়; শুধু খাসি করা হয় না।

৪২. সুতরাং মানুষের উচিত, যিনার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি থেকেও নিজেকে রক্ষা করা। সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে ফিল্মী গান ও চলচ্চিত্র প্রচার-প্রসার ও প্রদর্শনের কুফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
'মিরক্বাত' কিতাবে আছে যে, পরনারীদেরকে না-জায়েয পত্রাদি লিখা বা পৌঁছানো, সেদিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা, হাতে ইশারা করা -সবই হাতের যিনা।

৪৩. তাঁর উপনাম আবূ নাজীদ। তিনি খোযা'আহ্ গোত্রীয় ও কা'ব বংশীয়। খায়বারের যুদ্ধের বছর হযরত আবূ হোরায়রার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বসরায় বসবাস করতেন। হিজরী ৫২ সালে সেখানে ইন্তিকাল করেন। তিনি একজন মহামান্য সাহাবী। তিনি ৩০ বছর যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। এ সময় ফিরিশ্তারা তাঁকে সালাম করতে আসতেন।[মিরক্বাত ও আশি''আহ্]

اَوْ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُوْنَ بِهٖ مِمَّا اَتَاهُمْ بِهٖ نَبِيُّهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَا بَلْ شَىْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى فِيْهِمْ وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰاهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ شَابٌّ وَاَنَا اَخَافُ عَلٰى نَفْسِى الْعَنَتَ وَلَا اَجِدُ مَا اَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَآءَ كَاَنَّهٗ يَسْتَاْذِنُهٗ فِى الْاِخْتِصَآءِ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ

না তাতে, যা তারা ভবিষ্যতে করবে, যেগুলো তাদের কাছে তাদের নবী এনেছেন এবং যে দলীল তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে?''[৪৪] হুযূর এরশাদ করলেন, ''না, বরং আমল হচ্ছে ওই জিনিস, যার সিদ্ধান্ত তাদের জন্য হয়ে গেছে এবং অদৃষ্টের লিখন সম্পন্ন হয়ে গেছে।[৪৫] এর সমর্থন আল্লাহ্‌র কিতাবেও মওজূদ রয়েছে, (এরশাদ হচ্ছে) 'এবং (শপথ!) আত্মার এবং তাঁরই, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তার অসৎকর্ম ও তার খোদাভীরুতা অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছেন'।''[৪৬] [৯১:৭-৮] মুসলিম।

৮২ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আরয করলাম, ''এয়া রসূলাল্লাহ্! আমি একজন যুবক এবং স্বীয় নাফ্‌সের উপর যিনার আশঙ্কা করছি এবং বিয়ে করার সামর্থ্যও নেই।''[৪৭] সম্ভবতঃ তিনি নবী করীমের নিকট খাসি হবার অনুমতি চাচ্ছিলেন।[৪৮] তিনি বলেন, তখন হুযূর চুপ রইলেন। আমি আবার তা আরয করলাম। তিনি তখনো চুপ রইলেন। আমি আবারো কথাটি বললাম। প্রিয়নবী তখনো চুপ রইলেন।[৪৯] আমি আবার অনুরূপ বললাম।

৪৪. প্রশ্নের সারকথা হচ্ছে, এ অদৃষ্টের লিখন কি পূর্বে আর ত্রুটি-বিচ্যুতি পরে, না এর বিপরীত? অর্থাৎ প্রথমে কি আমরা স্বয়ং কাজ করে নিই, তারপর তা লেখা হয়? 'লিপিবদ্ধ করা' মানে 'তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করা', আমলনামা লিপিবদ্ধ করা নয়; কেননা এ লিখন তো কাজ সম্পন্ন করার পরে হওয়াই নিশ্চিত। স্মর্তব্য যে, ক্বদরিয়া ফির্কার লোকদের আক্বীদা হচ্ছে, ''তাক্বদীরের লিখন মূলত কিছুই নয়; পূর্বে কিছুই লিখা হয় নি, বরং আমরা স্বাধীন নিঃশর্তভাবে শক্তিমান হয়ে আ'মাল করে থাকি। তারপর তা লিপিবদ্ধ করা হয়।'' এটা তাদের মারাত্মক ধর্মহীনতা।

৪৫. অর্থাৎ আমাদের কর্মসমূহ ওই অদৃষ্টের লিখনের পর সেটারই অনুরূপ, সেটার বিপরীত নয়। (এটা মহান আল্লাহ্'র অসীম জ্ঞানের অকাট্য প্রমাণ।) এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা।

৪৬. দলীল গ্রহণের ভিত্তি হচ্ছে, এখানে اَلْهَمَ ক্রিয়াটি অতীতকালবাচক, যা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এ 'ইলহাম' (প্রেরণা জাগানো) আমল করার অনেক আগেই হয়েছে।

৪৭. অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং মহরের সামর্থ্য রাখি না; দাসী ক্রয় করা তো দূরের কথা।

মাসআলা: যে ব্যক্তি স্ত্রীর অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম নয়, তার জন্য বিয়ে করা নিষিদ্ধ। 'হুক্বূ-ক্ব' (অধিকারসমূহ)-এর মধ্যে শারীরিক শক্তি ও সম্পদের সামর্থ্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

৪৮. এটা কোন বর্ণনাকারীর উক্তি। অর্থাৎ (তাঁর মতে) হযরত আবূ হোরায়রার এ আবেদন-নিবেদন এ জন্যই ছিলো যে, হয়তো হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খাসি হয়ে যাবার অনুমতি দান করবেন, যাতে যিনার সম্ভাবনাও অবশিষ্ট না থাকে। সাহাবা-ই কেরামের এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের 'তাক্বওয়া' যে, তাঁরা শরীয়তের বিধি লঙ্ঘনের উপর মুসীবতকে প্রাধান্য দেন। খাসি হয়ে নিজের অঙ্গহানি ঘটানো ও নিজেকে ত্রুটিযুক্ত করে নিতে রাজি; কিন্তু গুনাহ্‌গার হতে রাজি নন। [রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম]

৪৯. এ বারবার চুপ থাকা হয়তো মাসআলাটির গুরুত্বারোপের জন্য ছিলো, যাতে হযরত আবূ হোরায়রা সেটার উত্তর মনযোগ দিয়ে শুনেন; অথবা তাঁকে প্রশ্নের অবতারণা থেকে বিরত করার জন্য। (অর্থাৎ) খাসি হওয়া তো দূরের কথা সেটার উল্লেখও করো না!

فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَآ اَبَاهُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلٰى ذٰلِكَ اَوْذَرْ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ قُلُوْبَ بَنِىْ اٰدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَّاحِدٍ يُّصَرِّفُهٗ كَيْفَ يَشَآءُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "হে আবূ হোরায়রা! ক্বুদরতের কলম এমন প্রতিটি বস্তুর বিবরণ লিখে শুকিয়েও গেছে, যা তুমি পেয়ে যাবে- চাই এখন তুমি খাসি হও কিংবা রেখে দাও।"[৫০] [বোখারী]

৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "সকল মানুষের অন্তর[৫১] আল্লাহ্‌র (ক্বুদরতের) আঙ্গুলগুলোর মধ্যে দু'আঙ্গুলের মধ্যখানে রয়েছে[৫২] একটি মাত্র অন্তরের ন্যায়। তিনি যেভাবে চান সেগুলোকে সেভাবে ফেরান।"[৫৩] অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "হে আল্লাহ্! হে অন্তরগুলোর পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও।"[৫৪] [মুসলিম]

---

৫০. অর্থাৎ যদি তোমার তাক্বদীরে যিনা লিখা হয়ে থাকে, তাহলে তা খাসি হওয়ার পরেও করে নেবে, অন্যথায় খাসি হওয়া ব্যতীতও করবে না। হুযূরের এ মহান বাণীতে খাসি হবার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না; বরং উত্তম পন্থায় তা থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কেননা, মানুষের খাসি হওয়া দেহ-বিকৃতি (مُثْلَة)'র শামিল। আর 'মুসলাহ্' (দেহ বিকৃতি) ইসলামী বিধানে হারাম। অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য নিজেকে কেন হারাম কাজে লিপ্ত করছো?

৫১. সমস্ত নবী, ওলী, মু'মিন এবং কাফির সবই এর অন্তর্ভুক্ত; কেউ আল্লাহর আয়ত্বের বাইরে নন। যেহেতু শরীয়তের বিধি-বিধান সাধারণত শুধু মানুষের উপর বর্তায়, সেহেতু বিশেষভাবে মানুষের অন্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অন্যথায় ফিরিশতা ও জিন্ ইত্যাদির অন্তরও মহান রবের আয়ত্বাধীন।

৫২. এ বচনগুলো 'মুতাশাবিহাত'র অন্তর্ভুক্ত (মুতাশাবিহাত হচ্ছে বহু অর্থবোধক শব্দ বা বচন, তবে এর সঠিক অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই জানেন)। কেননা, মহান রব আঙ্গুল, হাত ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। উদ্দেশ্য হচ্ছে- সকলের অন্তর আল্লাহ্‌র আয়ত্বাধীন, তিনি অতি সহজে পরিবর্তন করেন। যেমন, বলা হয়- তোমার কাজ আমার আঙ্গুলের মধ্যে। অথবা আমি প্রশ্নগুলোর উত্তর চিমটি দ্বারা দিতে পারি। 'মুতাশাবিহাত'র পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমার কৃত 'তাফসীরে নাঈমী'র ৩য় পারায় দেখুন!

৫৩. মন্দ কিংবা ভালোর দিকে। অর্থাৎ বান্দা নিজের ইচ্ছায় ভাল বা মন্দ কাজ করতে থাকে। সুতরাং বান্দা বাধ্য নয়। ইচ্ছা করেই কাজ করে। আর ইচ্ছা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। নতুবা শাস্তি কিংবা প্রতিদানের উপযোগী হতো না, আর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও বাধ্যগত কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য হতো না। মৃগী রোগীর হাত ইচ্ছা ব্যতীত নড়াচড়া করে এবং লেখার সময় ইচ্ছা দ্বারাই নড়াচড়া করে। কুকুরকে পাথর নিক্ষেপ করলে কুকুর তোমাকেই কামড় দেবে; পাথরকে কামড়াবে না। অথচ পাথরই তার গায়ে লাগে। কেননা, সে জানে পাথরের কোন ক্ষমতা নেই। ক্ষমতাবান হলো পাথর নিক্ষেপকারী। যদি আমরা নিজেকে পাথরের ন্যায় বাধ্য মনে করি, তাহলে আমরা পশুর চেয়েও বোকা সাব্যস্ত হবো। মোটকথা, এ হাদীস শরীফ দ্বারা বান্দা ক্ষমতাহীন ও ইচ্ছাশূন্য হয় না।

৫৪. এ দো'আ কাফির, মু'মিন, নেক্কার, বদকার- সবার জন্যই। অর্থাৎ বদকারদের অন্তর নেকীর দিকে ফিরিয়ে দিন এবং নেক্কারদের অন্তর নেকীর উপর ক্বায়েম রাখুন। স্মর্তব্য যে, এ দো'আ মূলতঃ অপরের জন্য। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'সায়্যিদুল মা'সূমীন' (নিষ্পাপদের প্রধান)। তাঁর পক্ষে গুনাহ্ করা অসম্ভব। তাঁর জন্য মহান রব হিদায়তকে তেমনি অনিবার্য করে দিয়েছেন; যেমন সূর্যের জন্য আলো এবং আগুনের জন্য তাপ। তাঁর মর্যাদা তো অতি উঁচু। তাঁর একান্ত গোলাম বা অনুসারীদের জন্য হিদায়ত এবং তাক্বওয়া অনিবার্য ও নিশ্চিত। মহান রব সাহাবা-ই কেরাম সম্পর্কে এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى (এবং তিনি (আল্লাহ্) তাদের জন্য তাক্বওয়ার বাণী অপরিহার্য করেছেন)।[৪৮:২৬, কানযুল ঈমান]

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَامِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ ﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ﴾ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ

৮৪ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রতিটি শিশু 'দ্বীন-ই ফিত্বরত'র উপরই ভূমিষ্ঠ হয়।[৫৫] অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদী, খ্রিষ্টান কিংবা অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়;[৫৬] যেমনিভাবে প্রাণীগুলো নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি ওইগুলোর মধ্যে কোনটিকে নাক-কান কর্তিত পেয়ে থাকো?[৫৭] তারপর তিলাওয়াত করছিলেন, "আল্লাহ্রই সৃষ্টি, যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্র সৃষ্টিতে পরিবর্তন নেই,[৫৮] এটিই সুদৃঢ় দ্বীন।"-বোখারী, মুসলিম। ৮৫ ॥ হযরত আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

'নবীগণ মা'সূম' মর্মে আলোচনা আমার কিতাব 'জা-আল্ হক্ব' এবং সাহাবা-ই কেরামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা আমার কিতাব 'আমীর-ই মু'আবিয়া'য় দেখুন।

৫৫. 'শিশু সন্তান' মানে মানুষের সন্তান, যা পরবর্তী বিষয়বস্তু থেকে সুস্পষ্ট হয়। 'ফিত্বরাত'র শাব্দিক অর্থ 'বিদীর্ণ করা ও সৃষ্টি করা।' এখানে মূল ও জন্মগত অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ ঈমান সহকারে জন্মগ্রহণ করে। 'রূহ জগত'-এ মহান রব সমস্ত রূহ থেকে 'নিজে রব' হবার পক্ষে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছেন। সকলে بَلٰى (হ্যাঁ) বলে স্বীকার করেছে। ওই স্বীকারোক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাবস্থায় দুনিয়ায় এসেছে। এ স্বীকারোক্তি ও ঈমান সকলের মৌলিক ও জন্মগত দ্বীন।

৫৬. অর্থাৎ শিশু বুদ্ধিমান হওয়া পর্যন্ত জন্মগত দ্বীন তথা তাওহীদ ও ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। বুদ্ধিমান হবার পর স্বীয় মাতাপিতা ও সঙ্গীদেরকে যেরূপ দেখে সেরূপই হয়ে যায়। মাতাপিতা শিশুদের প্রথম শিক্ষক। তাদের সংস্পর্শ শিশুর স্বভাবের জন্য ছাঁচ স্বরূপ। এ জন্য নিজের মেয়ের জন্য ভাল স্বামী এবং ছেলের জন্য দ্বীনদার পুত্রবধু তালাশ করা আবশ্যক, যেন সন্তান নেককার হয়। এ জন্য আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মহত্ব এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি মূর্তিপূজারী ও অজ্ঞদের মাঝে জীবন যাপন করেছেন, কিন্তু তাদেরকে শুধরিয়েছেন, (কিন্তু) তাঁর আপন আদর্শে পরিবর্তন ঘটে নি। বুঝা গেলো যে, হুযূর মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র স্বভাব মুবারককে সাজিয়ে-গুছিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, এখানে ইহুদীবাদ ও খ্রিষ্টবাদ মানে তাদের এ বিকৃত (মনগড়া) বর্তমান ধর্ম; মূল দ্বীন নয়। তা তৎকালীন সময়ে প্রকৃত হিদায়তই ছিলো।

৫৭. 'রূহানিয়াত'কে শারীরিক অবস্থার সাথে উপমা দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, যেভাবে সাধারণতঃ পশুর বাচ্চাগুলোর সুস্থ অঙ্গ বিশিষ্ট অবস্থায় জন্ম হয়, তারপর শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করে। সেভাবে মানুষের রূহগুলোর অবস্থাও। (অর্থাৎ প্রথমে ঈমানসহ আসে, তারপর পারিপার্শ্বিক কারণে শির্ক-কুফর ও পাপাচার দ্বারা কলুষিত হয়ে যায়।)

৫৮. অর্থাৎ নিয়ম এ যে, প্রত্যেক মানুষ ঈমান ও তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এটা কখনও হতে পারে না যে, কোন শিশু রূহজগতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কাফির হয়ে ভূমিষ্ঠ হবে। সুতরাং আয়াতের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি নেই। স্মর্তব্য যে, রূহ জগতে অঙ্গীকার দিবসের ঈমান পার্থিব জগতে শরীয়তের দৃষ্টিতে মু'মিন হবার জন্য যথেষ্ট নয়। (এখানে স্বতন্ত্রভাবে ঈমান আনতে হবে।) এ জন্যই কাফিরের শিশুসন্তানকে কাফির বলে গণ্য করা হয়। তাই তার জন্য নামায-ই জানাযাও নেই, ইসলামী কাফন-দাফনও নেই। আর পরবর্তীতে প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তাকে মুরতাদ্দ বা ধর্মত্যাগীও বলা যায় না। যে শিশুকে হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম হত্যা করেছিলেন এবং বলেছেন اِنَّهٗ طُبِعَ كَافِرًا (নিশ্চয় তাকে কাফির হিসেবে মোহর ছেপে দেওয়া হয়েছে), সেখানে جُبِلَ ও قُدِّرَ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বুদ্ধিমান হবার পর কাফির হওয়া তার তাক্বদীরে নির্ধারিত এবং এটা তার জন্মগত স্বভাবই ছিলো। সুতরাং এ হাদীস ওই আয়াতের বিরোধী নয় এবং আয়াতগুলোতেও কোন বৈপরিত্য নেই।

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ لَايَنَامُ وَلَايَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَاانْتَهٰى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُاللّٰهِ مَلْاٰى لَاتَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ

আমাদের মধ্যে পাঁচটি জিনিস শিক্ষাদানের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান হলেন।[৫৯] সুতরাং হুযূর এরশাদ করলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শয়ন করেন না, শয়ন করা তাঁর জন্য শোভা পায় না।"[৬০] তিনি পাল্লা কিংবা রিযক্ব ঝুঁকিয়ে দেন কিংবা উপরে উঠান।[৬১] তাঁর দরবারে রাতের আমলগুলো দিনের আমলগুলোর পূর্বে এবং দিনের আমলগুলো রাতের আমলগুলোর পূর্বেই পেশ হয়ে যায়।[৬২] তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর।[৬৩] যদি তাঁর পর্দা সরিয়ে নিতেন, তাহলে তাঁর মহান সত্তার জ্যোতিরাশি দৃষ্টিসীমার দিগন্ত পর্যন্ত সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে দিতো।"[৬৪] -[মুসলিম] ৮৬ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আল্লাহ্র দয়ার হাত পরিপূর্ণ।[৬৫] ব্যয় সেটাকে কমাতে পারে না।"

৫৯. অর্থাৎ তিনি ওয়ায করার জন্য দণ্ডায়মান হলেন এবং ওয়াযে এ পাঁচটি জিনিস বর্ণনা করলেন। দাঁড়িয়ে ওয়ায করা ও খোৎবা দেওয়া সুন্নাত। তা জুমু'আর খোতবা হোক কিংবা বিয়ের খোৎবা হোক কিংবা অন্য কোন বিষয়ের হোক। [ফিক্বহের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য]

৬০. কেননা, নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু। এ জন্য জান্নাত ও দোযখে নিদ্রা থাকবে না। মহান রব নিদ্রা থেকে পবিত্র। তাছাড়া, নিদ্রা আলস্য দূর করা ও আরামের জন্য হয়। মহান রব আলস্য থেকে পবিত্র। ইরশাদ ফরমাচ্ছেন وَمَامَسَّنَا مِنْ لُغُوْبٍ (এবং ক্লান্তি আমার নিকটে আসে নি।[৫০:৩৮]) এতে ওই সকল মুশরিকের খণ্ডন রয়েছে যারা বলতো "আল্লাহ্ দুনিয়া সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই এখন দুনিয়ার কার্যাবলী আমাদের মূর্তিগুলো চালিয়ে যাচ্ছে।" (না'উযু বিল্লাহ্)

৬১. قِسْطٌ-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'অংশ'। জীবিকাকেও 'ক্বিসত্' বলা হয় এবং পরিমাপযন্ত্রের পাল্লাকেও বলা হয়। কেননা, জীবিকা নির্ধারিত অংশ অনুসারে অর্জিত হয় এবং পাল্লাও অংশে অংশে বন্টন করে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ (এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো।[২৬:১৮২]) অর্থাৎ তিনি কাউকে বেশী জীবিকা দেন, কাউকে কম দেন। অথবা একই ব্যক্তি কখনও গরীব হয়, কখনো ধনী হয়, কখনো মু'মিন, কখনো কাফির, কখনো মুত্তাক্বী, কখনো ফাসিক্ব। অনুরূপ, একটি গোত্র কখনো জয়ী, কখনো পরাজিত হয়।

৬২. অর্থাৎ আমলসমূহ লিপিবদ্ধকারী ফিরিশ্‌তা সারা দুনিয়ার আমল দিনে দু'বার পেশ করে থাকেন। এ পেশ করা মহান রব না জানার কারণে নয়; যেমন- হুযূরের সমীপে উম্মতের দুরূদ শরীফ ফিরিশ্‌তারা পেশ করে থাকেন। তা এ জন্য নয় যে, হুযূর সে সম্পর্কে অনবহিত।

৬৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নূর (সূক্ষ্ম), মাখলূক্ব হচ্ছে জড় পদার্থস্বরূপ। এ জন্য সৃষ্টিকুল তাঁকে দেখতে পায় না। মিরক্বাত কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের নবী স্বীয় রবকে দুনিয়ায় এ জন্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছেন যে, হুযূর নূর ছিলেন। তাছাড়া, হুযূর প্রার্থনা করেছিলেন وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا অর্থাৎ হে খোদা! আমাকে নূর বানিয়ে দাও। হুযূরের দো'আ কবূল হয়েছিলো এবং তিনি নূরী শক্তিসম্পন্ন হয়েছিলেন।

৬৪. ফিরিশতাদেরকেও এবং অন্যান্য সৃষ্টিকেও এ শক্তিতো আমাদের নবীর ছিলো যে, মি'রাজে খোদ আল্লাহর মহান সত্তাকে আড়ালবিহীন প্রকাশ্যভাবে দেখেছিলেন। এমনকি চোখের পলকও এদিক-সেদিক ফিরে নি। মহান রব ফরমাচ্ছেন, مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَاطَغٰى (চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে।[৫৩:১৭])

৬৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ মহান ধনবান। এর সমর্থন এ আয়াতে রয়েছে- وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ (এবং এমন কোন বস্তু নেই, যেটার ভাণ্ডার আমার নিকট নেই)। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলা 'হাত' থেকেও পবিত্র এবং তা পরিপূর্ণ হওয়া থেকেও।

سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اَرَاَيْتُمْ مَااَنْفَقَ مُذْخَلَقَ السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَافِىْ يَدِهٖ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلْاٰى قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْاٰنُ سَحَّاءُ لَايَغِيْضُهَا شَيْءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ـ وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَرَارِى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ◆ اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ اَوَّلَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ

তাঁর দানশীলতা দিনরাত অব্যাহত রয়েছে।[৬৬] চিন্তা করে দেখো, যখন থেকে তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কত (বেশী) ব্যয় করেছেন; কিন্তু ওই ব্যয় তাঁর দানশীলতার হাতে ঘাটতি আনতে পারে নি। তাঁর আরশ পানির উপর ছিলো।[৬৭] তাঁর করায়ত্বে দাঁড়িপাল্লা রয়েছে, যা তিনি উর্ধ্বে তোলেন ও নিচে নামান।[৬৮] [বোখারী, মুসলিম] মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে, "আল্লাহর বদান্যতার হাত ভরপূর।" ইবনে নুমায়র (مَلْاٰى-এর স্থলে)(مَلْاٰنُ سَحَّاءُ) বর্ণনা করেছেন। "রাত ও দিনের কোন জিনিস তাতে কোন ঘাটতি আনে না।"

৮৭ || তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূলকে কাফিরদের শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি এরশাদ করলেন, "মহান রব জানেন তারা কি আ'মাল করতো।"[৬৯] [মুসলিম ও বোখারী]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৮৮ || হযরত 'উবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "মহান রব যে জিনিস সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছিলেন,

---

৬৬. এর উদাহরণ তিনি তাঁর কিছু মাখলূক্বের মধ্যে স্থাপন করেছেন। সমুদ্রের পানি, সূর্যের আলো ও আমাদের ইল্‌ম ইত্যাদি ব্যয় করলে কমে না। জান্নাতের রিযক্বেরও এ অবস্থা।
সুতরাং মহান রবের ধনভাণ্ডারের কথা কি বলবো? অতএব, হাদীস শরীফ সুস্পষ্ট। এতে কোন আপত্তি নেই।

৬৭. এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্বেই করা হয়েছে যে, আরশ ও পানির মধ্যখানে কোন অন্তরাল ছিলো না।

৬৮. অর্থাৎ মানুষের রিযক্ব ও তাদের আমল আল্লাহর আয়ত্বাধীন, যাতে তিনি হ্রাস-বৃদ্ধি করেন।
অথবা সকল জাতির তাক্বদীরসমূহ তাঁর আয়ত্বাধীন। কারো পতন ঘটান, কাউকে উত্থান দেন।

৬৯. অর্থাৎ যদি সে যুবক হয়ে কাফির হতো তাহলে সে জাহান্নামী এবং যদি মু'মিন হতো, তাহলে জান্নাতী।
স্মর্তব্য যে, কাফিরদের মৃত শিশুসন্তান সম্বন্ধে ওলামা-ই কেরামের কয়েকটি অভিমত রয়েছে:
এক. তারা জান্নাতী। কেননা, তারা 'ফিত্বরাত' বা জন্মগতভাবে ঈমানের উপরই জন্মগ্রহণ করে।
দুই. তারা স্বীয় মাতাপিতার অধীনস্থ হয়ে জাহান্নামী হবে।
তিন. তারা আ'রাফ-এ (জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্তর) থাকবে। কেননা, তাদের কাছে শরীয়তসম্মত ঈমান কিংবা কুফর -কোনটাই নেই।
চার. তাদের ব্যাপারে মন্তব্য থেকে বিরত থাকা চাই। কেননা, দলীল বিভিন্ন ধরনের রয়েছে।
পাঁচ. তারা বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যেরূপ হতো, তাদের উপর ওই ধরনের বিধানই প্রযোজ্য। অর্থাৎ যদি তারা কাফির হতো, তবে জাহান্নামী আর যদি মু'মিন হতো তাহলে জান্নাতী।
এ হাদীস শেষোক্ত অভিমতের পক্ষে দলীল। মিরক্বাত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, সঠিক অভিমত হচ্ছে- তারা জান্নাতী। আর হুযূরের এই মহান বাণী আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল হবার পূর্বেকার; যেগুলোতে এরশাদ হয়েছে, "অপরাধ ছাড়া আমি (আল্লাহ) কাউকে আযাব দিবো না।" কেউ কেউ এটাও বলেছেন যে, তারা জান্নাতী তো বটে, তবে মু'মিন জান্নাতীদের খাদিম হিসেবে।

الْقَلَمُ فَقَالَ لَهُ اُكْتُبْ فَقَالَ مَا اَكْتُبُ قَالَ اُكْتُبِ الْقَدَرَ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى الْاَبَدِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا **وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ** قَالَ سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ ﴿وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الاٰية﴾ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْاَلُ عَنْهَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً

তা ছিলো ক্বলম।[৭০] অতঃপর সেটার উদ্দেশে বললেন, "লিখো।" সেটা আরয করলো, 'কি লিখবো?"[৭১] এরশাদ ফরমালেন, "তাক্বদীর লিখো।" তখন সেটা যা কিছু হয়েছে এবং যা অনন্তকাল পর্যন্ত হবে সবই লিখে দিলো।"[৭২] -[তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটা 'গরীব' পর্যায়ের হাদীস।

৮৯ || হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[৭৩] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'যখন আপনার রব আদমসন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরকে বের করলেন...আল্ আয়াত।'[৭৪] হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শুনেছি তাঁকেও এই প্রশ্নই করা হয়েছিলো। তখন তিনি এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদমকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর পৃষ্ঠদেশ স্বীয় কুদরতী হাতে বুলিয়ে দিলেন।[৭৫] তখন তা থেকে তাঁর সন্তানগণকে বের করলেন।[৭৬]

৭০. এটা আনুপাতিক প্রথম। অর্থাৎ আরশ, পানি, বাতাস ও লওহ-ই মাহফূয সৃষ্টির পর যে জিনিস সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছিলো তা হচ্ছে ক্বলম। মিরক্বাত কিতাবে এ স্থানে উল্লেখ করা হয় যে, সর্বপ্রথম 'নূর-ই মুহাম্মদী' সৃষ্টি হয়েছিলো। সেটা প্রকৃত অর্থে প্রথম। কেউ কেউ বলেন যে, 'হাক্বীক্বত-ই মুহাম্মদিয়া' হচ্ছে 'ক্বলম'। এতদ্ভিত্তিতে এটাও প্রকৃত অর্থে প্রথম।

৭১. এ বচনগুলোতে কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি বস্তুতেই মহান রবের দরবারে আবেদন-নিবেদন করার ক্ষমতা রয়েছে। ক্বোরআন-ই করীমে এরশাদ হচ্ছে- وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ (অর্থাৎ আর এমন কোন বস্তু নেই, যা তাঁর (আল্লাহ) প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে না।।১৭:৪৪।) হুযূরের বিচ্ছেদে শুকনো কাঠ ক্রন্দন করেছে এবং তাঁর সাথে কাঠ ও পাথর ইত্যাদি কথা বলেছে।

৭২. 'হয়ে গেছে' বলা কাজ সংঘটিত হবার ভিত্তিতেই; লিপিবদ্ধ করার সময় কিছুই হয় নি। প্রত্যেক জিনিস ভবিষ্যতে হবার ছিলো। অনন্তকাল ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঘটিতব্য সমস্ত ঘটনা; যেগুলোর সময়সীমা নির্ধারিত। ক্বিয়ামতের পরের বিষয়াদি অনন্ত। যেমন- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা রয়েছে -এই লিখন লাওহ-ই মাহফূযে 'নূন' দোয়াত থেকে হয়েছে। এ ক্বলম- দোয়াতের হাক্বীক্বত (বাস্তব অবস্থা) সম্পর্কে মহামহিম রবই জানেন। এ লিখন মহান রবের নিজে স্মরণ রাখার জন্য ছিলো না; বরং ওই সকল মাক্ববূল বান্দাদেরকে অবহিত করার জন্যই, যাঁদের দৃষ্টি লওহ-ই মাহফূয পর্যন্ত পৌঁছে। এটা আমি ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। এ থেকে সম্মানিত নবী ও ওলীগণের 'ইল্ম-ই গায়ব' প্রমাণিত হয়।

৭৩. তিনি জুহান গোত্রীয়, স্বনামধন্য ও মহামান্য তাবে'ঈ এবং অন্যতম কামিল ওলী। হিজরী ১০০ সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়। হযরত ওমর ফারূক্বের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি। এ হাদীস শরীফ তার নিকট অন্যসূত্রে পৌঁছেছে।

৭৪. অর্থাৎ এর অর্থ কি ও সেটা নির্গত করার ধরন কি ছিলো।

৭৫. এ কথাটি 'মুতাশাবিহাত'র অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তাঁর পৃষ্ঠ মুবারক কুদরতের দৃষ্টিতে দেখেছেন। অন্যথায় মহান রব 'হাত'র প্রকাশ্য অর্থ এবং ডান-বাম থেকে পবিত্র। পুরুষের শুক্রাণু তার পৃষ্ঠেই থাকে। এ জন্য দৃষ্টি পৃষ্ঠের দিকেই দেওয়া হয়েছে।

৭৬. এভাবে যে, প্রত্যেক লোমের গোড়া থেকে ঘামের বিন্দুর মত প্রকাশ পেলো। এ ঘটনা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম জান্নাতে যাবার আগে 'নু'মান' পাহাড়ের উপর আরাফাত শরীফের নিকট কিংবা মক্কা মু'আযযমা এবং তায়েফের মধ্যখানে ঘটে। কেউ কেউ বলেছেন- এটা

فَقَالَ خَلَقْتُ هٰٓؤُلَآءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهٗ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰٓؤُلَآءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَجُلٌ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اِسْتَعْمَلَهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِّنْ اَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهٗ بِهِ الْجَنَّةَ وَاِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اِسْتَعْمَلَهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ

তখন এরশাদ করলেন, "এদেরকে আমি বেহেশ্‌তের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা বেহেশ্‌তীদের আমল করবে।"[৭৭] তারপর তাঁর পিঠে (পুনরায়) বুলিয়ে দিলেন। তখন তা থেকে সন্তানাদি বের করলেন।"[৭৮] তখন তিনি এরশাদ করলেন, "এদেরকে আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি। এসব লোক দোযখীদের আমল করবে।"[৭৯] এক ব্যক্তি আরয করলেন, "তাহলে আমল কি জন্য থাকবে, এয়া রসূলাল্লাহ্?"[৮০] হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ যে বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা জান্নাতীদের আমল করান। শেষ পর্যন্ত সে জান্নাতীদের আমলগুলোর মধ্যে কোন আমলের উপর মৃত্যুবরণ করে। এ ভিত্তিতে তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করান।[৮১] আর যখন কোন বান্দাকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা দোযখীদের কাজ করান।[৮২]

জান্নাত থেকে তাশরীফ আনার পরে ঘটেছিলো। আর এ রূহসমূহ সাদা বর্ণের।

৭৭. অর্থাৎ স্বেচ্ছায় মনের আনন্দে নেক আমল করবে, ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করবে, জান্নাতে যাবে। সুতরাং ওই সব লোকের উপর এ আমলগুলো চেপে দেওয়া বুঝায় না। স্মর্তব্য যে, এখানে আমলের ভিত্তিতে আল্লাহর অনুগ্রহে অর্জিত জান্নাত বুঝানো উদ্দেশ্য। আমল ব্যতীত আল্লাহর নিরেট বদান্যতায়ও জান্নাত অর্জিত হবে। যেমন- মুসলমানদের ছোট শিশুসন্তান কিংবা মৃত্যুর প্রাক্কালে ঈমান গ্রহণকারী। যেমন- হযরত হারিস ইবনে সাবিত, ওরফে উসায়রাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উহুদের যুদ্ধের দিন সকালে ঈমান আনেন এবং যোহরের পূর্বেই ওই জিহাতে শাহাদাত বরণ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জান্নাতী বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।[ফাতহুল বারী]

৭৮. কালো বর্ণের এগুলো কাফিরদের রূহ ছিলো।

৭৯. এভাবে যে, কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করবে। জীবন যাপন কুফরের উপর হোক কিংবা ঈমানের উপর। এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এবং উপস্থিত ফিরিশতাদেরকে সমস্ত জান্নাতী ও দোযখীদের দেখানো হয়েছিলো। আর বলে দেওয়া হয়েছিলো যে, তাদেরকে অবহিত করার জন্যই এ ঘটনা ঘটানো হয়েছিলো। আমাদের হুযূরের ইলম হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র চেয়ে অনেক গুণ বেশি। সুতরাং, হুযূরও সকলের পরিণাম এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্পর্কে অবগত আছেন। 'পঞ্চবিষয়'র জ্ঞান (উলূম-ই খামসাহ) মহান রব তাঁকে দান করেছেন।

এটাও বুঝা গেলো যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র পৃষ্ঠদেশে তাঁর সমস্ত সন্তানের রূহ এবং তাঁদের সৃষ্টির মূল উপাদান বিদ্যমান ছিলো। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, মু'মিনদের রূহসমূহ সাদা ছিলো। আর সম্মানিত নবীগণের রূহসমূহ নূরানী বা অত্যুজ্জ্বল ছিলো।

৮০. কেননা, যদি আমরা জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হই। তাহলে আমল যতটুকুই করি না কেন, জান্নাত পাবই। জান্নাতী ও দোযখী হওয়া না বাধ্যতামূলক বিষয় হলো, না ইচ্ছাধীন বিষয়; বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত সামর্থ্য ছাড়া কেউ বাহুবলে ও স্বেচ্ছায় নেক্‌কার বা বদকার হতে পারে না। সুতরাং জান্নাতী কিংবা দোযখী হওয়াও অনুরূপ।☆

৮১. এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নীতিমালা; সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিমালা নয়। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, কিছু মানুষ জীবনভর দোযখীদের মত কাজ করে, কিন্তু মৃত্যুর প্রাক্কালে নেক আমল করেই মৃত্যুবরণ করে।

৮২. কাজ করানো মানে বান্দার অন্তরের ঝোঁক মন্দ কার্যাবলীর দিকে হয়, যাতে সে নিজের খুশী ও ইচ্ছায় মন্দ কাজগুলো সম্পন্ন করে। সুতরাং বান্দা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে

☆ ایں سعادت بزور بازو نیست - تانہ بخشد خدائے بخشندہ অর্থাৎ এ নেককার হওয়া বাহুবলের ফসল নয়, যতক্ষণ না মহান দাতা আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে তাওফীক্ব না দেন। [শায়খ সা'দী]

حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ- رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوٗدَ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ يَدَيْهِ كِتَابَانِ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاهٰذَانِ الْكِتَابَانِ قُلْنَا لَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَّا اَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ فِيْهِ اَسْمَاۤءُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَسْمَاءُ اٰبَآئِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا

শেষ পর্যন্ত সে দোযখীদের কাজগুলোর মধ্যে কোন একটি কাজের উপর মৃত্যুবরণ করে; যার দরুন তাকে দোযখে প্রবেশ করান।"[৮৩] [মালিক, তিরমিযী, আবূ দাউদ]

৯০ || হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন, তাঁর হাত মুবারকে দু'টি কিতাব ছিলো।[৮৪] এরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানো এ দু'টি কি কিতাব?"[৮৫] আমরা আরয করলাম, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে অবহিত করানো ছাড়া জানি না।"[৮৬] তখন ডান হাতের কিতাব সম্পর্কে হুযূর এরশাদ করলেন, "এ কিতাব রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এসেছে,[৮৭] যাতে সকল জান্নাতীদের নাম রয়েছে এবং তাদের বাপ-দাদা ও গোত্রের নামও রয়েছে। অতঃপর শেষ পর্যন্ত সকলের যোগফলও উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৮] সুতরাং ওইগুলোর মধ্যে কখনো কম-বেশি হতে পারে না।"[৮৯]

অক্ষম, 'কসব' বা অর্জনের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার প্রাপ্ত। সুতরাং সে দোযখের আযাবের উপযোগী হয়।

৮৩. সুতরাং সর্বদা পুণ্যকাজ করার ক্ষেত্রে যত্নবান হও।

৮৪. অর্থাৎ একটি পবিত্র ডান হাতে, অপরটি বরকতময় বাম হাতে। সঠিক কথা হচ্ছে কিতাব দু'টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিলো, যেগুলো সাহাবা-ই কেরাম প্রত্যক্ষ করেছেন। নিছক কাল্পনিক ছিলো না, যেমন কেউ কেউ ধারণা করেছেন। পরবর্তী বক্তব্য দ্বারা এটাই সুস্পষ্ট হয়। [মিরক্বাত ও আশি'আতুল লুম'আত]

৮৫. অর্থাৎ এ দু'টি কিতাব, যা তোমরা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছো, সেগুলো কোন্ বিষয়ের এবং তাতে কি লিখা আছে? এ থেকেও বুঝা যাচ্ছে যে, কিতাব দু'টি দেখা যাচ্ছিলো, নতুবা 'এ দু'টি' (هٰذَان) বলে ইশারা করা হতো না। তাছাড়া, সাহাবীগণও আরয করতেন, "হুযূর! সে কোন কিতাব এবং ওগুলো কোথায়?"

৮৬. অর্থাৎ "কিতাব দু'টি তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সেটার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা জানি না। যদি আপনি অবগত করান তাহলে জানতে পারবো।" বুঝা গেলো যে, হুযূর কিতাবগুলোও দেখছেন এবং ওই কিতাবগুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগতও, আর মানুষকে ওই কিতাব দু'টি পড়াতে-শেখাতেও সক্ষম। এটাই সাহাবা-ই কেরামের আক্বীদা ছিলো।

৮৭. যার মধ্যে মহান রবের বিশেষ ইলমের প্রকাশ ঘটেছে।

৮৮. এভাবে যে, সম্পূর্ণ কিতাবে বর্ণিত জান্নাতীদের নাম, ঠিকানা ও কর্ম তো সূচিতে বিদ্যমান এবং সবশেষে সমষ্টি; অর্থাৎ সর্বমোট কতজন। এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সকল জান্নাতী ও দোযখী সম্পর্কে বিস্তারিত ইলম দান করেছেন। তাদের পিতৃপুরুষ, গোত্র ও কর্মসমূহ সম্পর্কেও অবগত করেছেন। এ হাদীস শরীফ হুযূরের ইলমের পক্ষে উজ্জ্বল প্রমাণ। যা'তে ভিন্নতর ব্যাখ্যার অবকাশ থাকতে পারে না।

৮৯. অর্থাৎ মহান রব তাতে 'তাক্বদীর-ই মুবরাম' (চূড়ান্ত অদৃষ্ট)-এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এবং আমাকে সেটার ইলম দান করেছেন। বাকী রইলো 'তাক্বদীর-ই মু'আল্লাক্ব' ও 'মুশাবাহ-ই মু'আল্লাক্ব' (যথাক্রমে- আমলের শর্ত সাপেক্ষ অদৃষ্ট এবং এমনি এক শর্তসাপেক্ষ অদৃষ্ট, যা আল্লাহর নেক বান্দার দো'আর বরকতে পরিবর্তিত হতে পারে)। এ দু'টিতে হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে।

স্মর্তব্য যে, 'লওহ্-ই মাহফূয'-এ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর 'উম্মুল কিতাব'-এ শুধু 'মুবরাম তাক্বদীর'র কথা রয়েছে। 'লওহ্ মাহফূয' পর্যন্ত ফিরিশ্তাদের ইলম বিস্তৃত; কিন্তু আমাদের হুযূর করীমের ইলম উম্মুল কিতাব পর্যন্ত ও ব্যাপক। [মিরক্বাত]

ثُمَّ قَالَ لِلَّذِىْ فِىْ شِمَالِهٖ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ فِيْهِ اَسْمَآءُ اَهْلِ النَّارِ وَاَسْمَآءُ اٰبَآئِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا فَقَالَ اَصْحَابُهٗ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ اَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا فَاِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ وَّاِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَعَنْ اَبِىْ خُزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ

তারপর বাম হাতের কিতাব সম্পর্কে এরশাদ ফরমালেন, "এ কিতাব রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এসেছে।[৯০] তাতে দোযখীদের এবং তাদের বাপদাদা ও গোত্রের নাম রয়েছে। তারপর শেষ পর্যন্ত সকলের সমষ্টিও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে কখনো কম-বেশি হতে পারে না।"[৯১] অতঃপর সাহাবীগণ আরয করলেন, "তাহলে আমল কি জন্য থাকলো? এয়া রসূলাল্লাহ্! যদি এ কাজ সম্পন্নই করে ফেলা হয়?"[৯২] এরশাদ করলেন, "সঠিকপন্থা অবলম্বন করো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো।[৯৩] কেননা, জান্নাতীদের শেষ পরিণতি জান্নাতীদের আমলের উপর হয়ে থাকে; যদিওবা প্রথমে অন্য কোন আমল করে থাকে। আর নিঃসন্দেহে দোযখীদের মৃত্যু দোযখীদের কাজের উপরই হয়ে থাকে, যদিওবা আগে অন্য কোন আমলও করে থাকে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'হাত মুবারক দ্বারা ইশারা করে ওইগুলো ঝেড়ে নিলেন।[৯৪] তারপর এরশাদ করলেন, "তোমাদের রব বান্দাদের বিষয় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন, একদল জান্নাতী এবং অপর দল দোযখী হবে।"[৯৫] [তিরমিযী]

৯১ || হযরত আবূ খোযা-মাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন,[৯৬]

আলোচ্য হাদীস শরীফে সাহাবা-ই কেরামকে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে।

৯০. ফিরিশ্‌তার মাধ্যম ব্যতীত, অথবা ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে উম্মুল কিতাব থেকে সঙ্কলিত হয়ে, যা ফিরিশ্‌তারাও জানেন না। কেননা, এটা তাক্বদীর-ই মুবারাম, যা আমি ইতিপূর্বে আরয করেছি।

৯১. এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ স্বীয় তাক্বদীর-ই মুবরাম সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অবগত করেছেন।

৯২. অর্থাৎ পরিণামের ভিত্তি যদি মহান রবের লিখনের উপর হয়, আমাদের আমলের উপর না হয়, তাহলে আমলগুলোর প্রয়োজনই বা কি?

৯৩. অর্থাৎ পুণ্যময় কার্যাদি এবং বিশুদ্ধ আক্বীদাগুলো গ্রহণ করো, যাতে তোমাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়।

৯৪. অর্থাৎ উভয় হাত মুবারক ঝেড়ে নিলেন, যার ফলে কিতাব দু'টি অদৃশ্য হয়ে গেলো। অথবা কিতাব দু'টিকে 'আলম-ই গায়ব' (অদৃশ্য জগত)'র দিকে নিক্ষেপ করলেন। এ নিক্ষেপ ওইগুলোর অবমাননার জন্য ছিলো না (বরং সংশ্লিষ্ট স্থানে সংরক্ষণের জন্য), আর এর ফলে সেগুলো মাটিতেও পড়ে নি।

৯৫. এটা ক্বোরআন করীমের আয়াত থেকে গৃহীত। আর 'বান্দাগণ' মানে মানবকুল। কেননা, জান্নাতে প্রতিদানের জন্য মানুষ ছাড়া কেউ যাবে না। এটা তো হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র 'মীরাস'। তা আদমসন্তানেরাই পাবে।

৯৬. তার পিতার নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। খুব সম্ভব তাঁর নাম 'ইয়া'মূর', যিনি বনূ হারিস ইবনে সা'দ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। এ আবূ খোযা-মাহ তাবে'ঈ। আবূ খোযা-মাহ নামক সাহাবী হলেন অন্যজন।

قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَءَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّمِنْ قَدَرِاللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِىَ مِنْ قَدَرِاللّٰهِ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِى وَابْنُ مَاجَةَ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَارَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتّٰى اِحْمَرَّ وَجْهُهٗ حَتّٰى كَاَنَّمَافُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَااُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَاهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْافِىْ هٰذَاالْاَمْرِ

তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, "এয়া রসূলাল্লাহ! আমাদেরকে বলুন, আমরা যে ঝাড়ফুঁক করি,[৯৭] যেই ঔষধপত্র সেবন করি এবং সতর্কতা স্বরূপ যা কিছু বর্জন করি[৯৮] তা কি আল্লাহর তাক্বদীর(অদৃষ্ট লিখন)কে পরিবর্তিত করে?" হুযূর এরশাদ করলেন, "সেগুলোও স্বয়ং আল্লাহর লিখিত তাক্বদীর অনুসারেই হয়।[৯৯] (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) **৯২ ||** হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন,[১০০] এমতাবস্থায় যে, আমরা তাক্বদীরের মাসআলা নিয়ে বাদানুবাদ করছিলাম। তখন এতে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। এমনকি তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেলো, যেন গন্ডদেশ মুবারকে আনারের দানা নিংড়ে দেয়া হয়েছে।[১০১] আর এরশাদ করলেন, তোমাদেরকে কি এ আদেশ দেয়া হয়েছে, না আমি এটা নিয়েই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি?[১০২] তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যখন এ মাসআলা নিয়ে ঝগড়া করেছিলো, তখন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।[১০৩]

৯৭. অর্থাৎ তাবিজ-কবচ-তাগায় ফুঁক দেওয়া, দুরূদ শরীফ পড়ে ফুঁক দেওয়া, ঝাড়-ফুঁক করা ইত্যাদি যদি ক্বোরআনী-আয়াত কিংবা হাদীস শরীফে বর্ণিত দো'আ অথবা বুযুর্গদের আ'মল দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহলে জায়েয; অন্যথায় নিষেধ। এর বিস্তারিত আলোচনা, ইনশা- আল্লাহ্ كِتَابُ الطِّبِّ وَالرُّقٰى (চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক শীর্ষক অধ্যায়)'র মধ্যে আসবে।

৯৮. অর্থাৎ অসুখ-বিসুখে ঔষধ সেবন করি এবং ক্ষতিকর খাদ্যবস্তু পরিহার করি অথবা যুদ্ধে ঢাল ইত্যাদি দ্বারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করি।

৯৯. অর্থাৎ ওইগুলোর ব্যবহার জায়েয এবং তাক্বদীরে এটাই লেখা হয়েছে যে, অমুক রোগ ঔষধ বা তাবিজ দ্বারা নিরাময় হবে। আর অমুক মুসীবত ওই ঝাড়-ফুঁক কিংবা অমুক জিনিস পরিহার করলে দূর হবে।

অর্থাৎ বিভিন্ন মুসীবত আসা এবং ওইগুলো চেষ্টা-তদবীর দ্বারা দূরীভূত হওয়া- সবই তাক্বদীরের লিপির অন্তর্ভুক্ত। চেষ্টা-তদবীর করা তাক্বদীরের পরিপন্থী নয়।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, তাগা, তাবিজ, ঝাঁড়ফুঁক ও ঔষধ সেবনের মত চিকিৎসা জায়েয। যেহেতু তা সাহাবা-ই কেরাম এবং রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম'র সুন্নাত। এ বিষয়ে একটি অধ্যায় আসবে।

১০০. অর্থাৎ যখন আমরা যা কিছু করি, আল্লাহ্'র ইচ্ছায় করি, তখন আমরা তো বাধ্যই হলাম, তাহলে এর জন্য সাওয়াব ও আযাব কিভাবে হবে? ইত্যাদি, যেমন- আজকাল সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়।

১০১. অর্থাৎ রাগান্বিত হওয়ার চিহ্নাদি হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'র চেহারা মুবারকে প্রকাশ পাচ্ছিলো। এ অসন্তোষ তাঁর ব্যক্তিগত কারণে ছিলো না; বরং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য এবং সাহাবা-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যেই ছিলো। এ রাগান্বিত হওয়াও ইবাদত; যার জন্য বড় সাওয়াব রয়েছে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ওস্তাদ শাগরিদদের উপর এবং পীর মুরীদানের উপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

১০২. অর্থাৎ যে সব জিনিস তোমাদের প্রয়োজন এবং যেগুলো সম্পর্কে কবর ও হাশরে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, ওইগুলো অর্জন করার চেষ্টা করো। 'তাক্বদীরের মাসআলা নিয়ে বিতর্ক করার বিধান তোমাদের উপর বর্তায় নি। আর তোমাদেরকেও সেটা সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে না।

১০৩. ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের একটি দল কিংবা অন্য নবীগণের উম্মত, যারা তাক্বদীরের ফায়সালার ব্যাপারে অহেতুক কুতর্কে লিপ্ত হয়ে ঈমানহারা হয়ে গেছে এবং তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়েছে।

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَّاتَنَازَعُوْا فِيْهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوٰى اِبْنُ مَاجَةَ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَرْضِ فَجَآءَ بَنُوْ اٰدَمَ عَلٰى قَدْرِ الْاَرْضِ مِنْهُمُ الْاَحْمَرُ وَالْاَبْيَضُ وَالْاَسْوَدُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ

আমি তোমাদের উপর অপরিহার্য করে দিচ্ছি যেন তোমরা এ মাসআলা নিয়ে বিবাদ না করো।[১০৪] [তিরমিযী] ইবনে মাজাহ আমর ইবনে শো'আইব হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১০৫]

৯৩ ‖ হযরত আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা আদম আলায়হিস্ সালামকে এক মুষ্ঠি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, যা সমগ্র পৃথিবী থেকে নেওয়া হয়েছে।[১০৬] সুতরাং আদম-সন্তানরা ভূ-পৃষ্ঠ অনুসারে এসেছে।[১০৭] তাদের মধ্যে লাল, সাদা, কালো এবং মধ্যম রঙের রয়েছে।[১০৮] আর নম্র ও কর্কশ, অপবিত্র ও পবিত্র সবই রয়েছে।[১০৯] [এ হাদীস শরীফ আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন।

১০৪. এ থেকে বুঝা গেলো যে, তাক্বদীরের মাসআলায় না জেনে, না বুঝে কুতর্কে লিপ্ত হওয়া এবং সর্বসাধারণের অন্তরে এ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা হারাম। অনুরূপ, অজ্ঞ লোকদের জন্য এটা নিয়ে অধিক চিন্তাভাবনা করাও নিষিদ্ধ। কিন্তু এ মাসআলার সত্যতার পক্ষে দলিলাদি পেশ করা, অভিযোগকারীদের সংশয় দূর করা কুতর্ক নয়; বরং এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তের প্রচারণার শামিল; কিন্তু এটা আলিমদের কাজ, সাধারণ লোকের কাজ নয়। সুতরাং 'ইলমুল কালাম' (আক্বাইদ শাস্ত্র)-এ তাক্বদীরের মাসআলা আলোচনা করা এ সতর্কবাণীর আওতায় পড়ে না।

১০৫. স্মর্তব্য যে, তাঁদের সনদে 'ইরসাল' (সনদের শেষভাগে বর্ণনাকারী বাদ পড়া) রয়েছে। কেননা, তাঁদের বংশধারা হচ্ছে- আমর ইবনে শু'আইব ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনে 'আ-স। আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর সাহাবী। শু'আইব তাঁর সাক্ষাৎ পাননি। جَدِّهٖএর ضمير শু'আইব'র দিকে প্রত্যাবর্তন করে। কেউ কেউ বলেছেন- এতে 'ইরসাল' নেই, কারণ শু'আইব স্বীয় দাদা 'আমর ইবনে 'আ-স'র সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

১০৬. এভাবে যে, হযরত আযরাঈল আলায়হিস্ সালাম প্রত্যেক প্রকারের মাটি থেকে কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন। আর সেটাকে সকল প্রকার পানি দিয়ে খামির তৈরী করলেন। যেহেতু হযরত আযরাঈল'ই এ মাটি নিয়ে গিয়েছিলেন, সেহেতু প্রাণ হনন করার কাজও তাঁকে সোপর্দ করলেন, যাতে যমীনের আমানত যমীনেই ফিরিয়ে দিতে পারেন। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর বান্দাদের কাজ আল্লাহর দিকেও সম্পৃক্ত হয়। দেখুন, মাটি সংগ্রহকারী হলেন হযরত আযরাঈল আলায়হিস্ সালাম। কিন্তু এরশাদ হয়েছে, মহান রবই সংগ্রহ করেছেন। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমার কৃত 'তাফসীর-ই নাঈমী'তে দেখুন।

১০৭. অর্থাৎ যেহেতু মাটিগুলো বিভিন্ন ধরনের ছিলো, সেহেতু মানুষের আকৃতি এবং স্বভাব-চরিত্রও বিভিন্ন রকমের হয়েছে। যা পরবর্তী বিষয়বস্তু দ্বারা সুস্পষ্ট হয়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, সমস্ত মানুষের মৌলিক উপাদানগুলো হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। যেভাবে সকলের রূহ তাঁর পৃষ্ঠদেশে ছিলো। সম্মানিত নবীগণের মৌলিক উপাদানগুলো নূরানী ছিলো, অন্যদের ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে আল্লাহর নূর এ জন্য বলা হয়। কারণ, তাঁর রূহও নূর, শরীরও নূরানী। অন্যথায় সকলের রূহও তো নূরের।

১০৮. অর্থাৎ শ্যামল কিংবা সাদা ও লাল বর্ণে মিশ্রিত, অর্থাৎ যাদের গড়নে সাদা মাটির অংশের আধিক্য হয়েছে, তারা সাদা হয়েছে, যাদের মধ্যে কাল রঙের মাটির আধিক্য হয়েছে তারা কালো হয়েছে। যাদের মধ্যে দু'টিই সমান, তারা শ্যামল কিংবা লাল-সাদা মিশ্রিত রঙের হয়েছে।

১০৯. অর্থাৎ মানুষের আকৃতিসমূহ যেমন মাটির ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রকমের হয়েছে, তেমনি তাদের স্বভাব-চরিত্র ও নানা রকম মাটির প্রভাবে নানা রকম হয়েছে। অর্থাৎ যাদের মধ্যে নরম মাটির অংশ অধিক তাদের স্বভাব নরম

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ خَلْقَهٗ فِيْ ظُلْمَةٍ فَاَلْقٰى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهٖ فَمَنْ اَصَابَهٗ مِنْ ذٰلِكَ النُّوْرِ اهْتَدٰى وَمَنْ اَخْطَاَهٗ ضَلَّ فَلِذٰلِكَ اَقُوْلُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلٰى عِلْمِ اللّٰهِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

৯৪ ‖ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মাখলূক্বকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন।[১১০] তারপর তাদের উপর স্বীয় নূরের চমক দান করেছেন।[১১১] যার কাছে ওই নূরের কিছু পৌঁছেছে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে।[১১২] আর যে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে।[১১৩] এ জন্যেই আমি বলছি যে, ক্বলম আল্লাহ্র ইলমের ভিত্তিতে লিখে শুকিয়ে গেছে।[১১৪] [আহমদ, তিরমিযী]

৯৫ ‖ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রায়শ এটা এরশাদ করতেন, "হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর অটল রাখুন।"[১১৫]

এবং শক্তমাটি যাদের অংশে অধিক, তাদের স্বভাবও কঠোর। যারা খারাপ মাটি দ্বারা তৈরি, তারা স্বভাবেও মন্দ। পবিত্র মাটির তৈরি লোকদের স্বভাবও পাক-সাফ হয়েছে। স্মর্তব্য যে, যেমনিভাবে শরীরের মূল রং বদলায়না, অনুরূপ মানুষের মূল স্বভাবও পরিবর্তিত হয় না। আর যেমনিভাবে পাউডার বা বাহ্যিক কালো রঙের চিহ্ন দূরীভূত হয়ে যায়, তেমনি স্বভাবের বাহ্যিক অবস্থাসমূহ ও পরিবর্তন হয়ে যায়। আবূ জাহলের কুফর আসলী ছিলো, ফলে পরিস্কার হতে পারে নি। হযরত ওমর ফারূক্ব-ই আ'যম রাদিয়াল্লাহু আনহু'রটি সাময়িক ছিলো, যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র একটিমাত্র কৃপাদৃষ্টি ধুয়ে পরিস্কার করে দিয়েছে।

১১০. অর্থাৎ জিন্ ও ইনসান; ফিরিশতারা নন, এ দু'সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় তারা কুপ্রবৃত্তি ও যৌন-পিপাসার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো।

১১১. অর্থাৎ ঈমান ও মা'রিফাতের উজ্জ্বলতা। বুঝা গেলো যে, অন্ধকার আমাদের মূল অবস্থা; উজ্জ্বলতা মহান রবের দয়া। গুনাহ্ আমরা নিজেরা করি; নেক্ কাজ তিনি আমাদেরকে করার সামর্থ্য দেন। মাটির ঢিলার মতো আমরা নিচের দিকে পড়ে যাই, তিনি স্বীয় দয়ায় উপরে ওঠিয়ে নেন।

১১২. বেহেশতের রাস্তার দিকে। তা থেকে যাঁদের উপর নূরের গভীর ছটা পড়েছে, তাঁরা নবী কিংবা ওলী হয়েছেন। যাঁদের উপর হালকাভাবে পড়েছে, তাঁরা মু'মিন হয়েছে।

১১৩. অর্থাৎ কাফির র'য়ে গেছে। স্মর্তব্য যে, এ অন্ধকারে সৃষ্টি করা 'অঙ্গীকার'র পূর্বেকার ঘটনা। সকল মানুষ শুরুতেই বন্টন-বিন্যস্ত হয়ে গেছে। অঙ্গীকারের সময় মু'মিনগণ আনন্দের সাথে 'হ্যাঁ' (بلٰى) বলেছিলো এবং কাফিরগণ অনিচ্ছাকৃতভাবে। ওই অঙ্গীকারের উপর মানবশিশু মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেয়।

সুতরাং এ হাদীস শরীফ এ কথার বিরোধী নয় যে, প্রতিটি শিশু 'ফিত্বরাত'র উপর ভূমিষ্ঠ হয়। ওখানে 'ফিত্বরাত' মানে এ স্বীকারোক্তি।

১১৪. অর্থাৎ যা লেখার ছিলো তা লিখে দিয়েছে। স্মর্তব্য যে, এটা দ্বারা মানুষের বাধ্য হওয়া অনিবার্য হয় না; কেননা, ওখানে এটাই লেখা হয়েছে যে, এ বান্দা সানন্দে এ কাজ করবে। কাজও লিপিতে এসে গেছে এবং তার ইচ্ছা এবং আনন্দও।

১১৫. এ দো'আ উম্মতকে শিক্ষাদানের জন্য, যা'তে লোকেরা তা শুনে শিখে নিতে পারে। নতুবা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সঠিক দ্বীন হতে বিচ্যুত হওয়া তেমনিভাবে অসম্ভব, যেমন আল্লাহ্র শরীক থাকা (অসম্ভব); বরং যার উপর তিনি কৃপাদৃষ্টি দেন সেও বিচ্যুত হতে পারে না। হযরত ওসমান গনীকে বলে দিয়েছেন, "যা চাও করতে পার;" কিন্তু তিনি গুনাহ্ করতে পারেন নি। যেমনটি পরবর্তী বিষয়বস্তু হতে সুস্পষ্ট হয়।

فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اٰمَنَّابِكَ وَبِمَاجِئْتَ بِهٖ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ نَعَمْ اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللّٰهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَآءُ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيْشَةٍ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ ظَهْرَ الْبَطْنِ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِاَرْبَعٍ يَّشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা আপনার উপর এবং আপনার আনীত সব কিছুর উপর ঈমান এনেছি। তবে এখনওকি আপনি আমাদের ব্যাপারে কোন আশঙ্কা করেন।"[১১৬] এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ। সমস্ত অন্তর আল্লাহ্‌র কুদরতী আঙ্গুলগুলোর মধ্যে দু'আঙ্গুলের মাঝখানে বিদ্যমান, যেদিকে তিনি ইচ্ছা করেন ফিরিয়ে দেন।"[১১৭] [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্]

৯৬ ॥ হযরত আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "অন্তরের উপমা ওই পালকের ন্যায়, যা খোলা মাঠে থাকে, যাকে বায়ুপ্রবাহ এপিঠ-ওপিঠ ওলট-পালট করে দেয়।"[১১৮] [আহমদ]

৯৭ ॥ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ওই সময় পর্যন্ত বান্দা (পূর্ণাঙ্গ) মু'মিন হয় না, যতক্ষণ না সে চারটি বিষয়ের উপর ঈমান আনে: এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রসূল। আমাকে আল্লাহ্ সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আর সে মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর[১১৯] এবং তাক্বদীরের উপর ঈমান আনবে।"[১২০] [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্]

---

১১৬. সুবহানাল্লাহ্! এটাই হচ্ছে সাহাবা-ই কেরামের ঈমান। তাঁরা দো'আ শুনতেই বুঝে ফেলেছেন যে, এ দো'আ তো আমাদের জন্যই; হুযূরের নিজের জন্য নয়।

স্মর্তব্য যে, عَلَيْنَا দ্বারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সাধারণ মুসলমানের কথা বুঝানো হয়েছে। নতুবা কতেক সাহাবী হুযূরের দয়ায় এ থেকে স্বতন্ত্র। হুযূর এরশাদ করেছেন, হযরত ওমরের ছায়া থেকেও শয়তান পলায়ন করে। হুযূরের কৃপাদৃষ্টিতে টলটলায়মানও দৃঢ় হয়ে যায়। মহান্ রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ তরজমা: "শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওলীগণের না আছে কোন ভয়, না আছে কোন দুঃখ।" [১০:৬২, তরজমা-ই কান্যুল ঈমান]

১১৭. অর্থাৎ জিন্ ও মানবের অন্তর। এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

১১৮. অন্তর যেন একটি পাতা। দুনিয়া হচ্ছে বিশাল ময়দান। আর 'সঙ্গ' হচ্ছে তীব্র বায়ু। যদি এ পাতা কোন ভারী পাথরের নীচে এসে যায়, তাহলে বাতাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। যদি আমরা গুনাহগারগণও কোন কামিল পীরের আশ্রয়ে এসে যাই, তাহলে ইন্‌শা- আল্লাহ, আমরা অধার্মিকতা থেকে রক্ষা পাবো। পীর-মুর্শিদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করার মূল উদ্দেশ্য এটাই।

১১৯. 'মৃত্যু'র মধ্যে নাস্তিকদের প্রতি খণ্ডন হয়েছে। কেননা, তারা ব্যক্তি মৃত্যুকে স্বীকার করে; কিন্তু বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুতে বিশ্বাসী নয়। আর 'পুনরুত্থান'র মধ্যে ওইসব লোকের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী নয়।

অর্থাৎ এটাও মানবে যে, সমগ্র জগত ধ্বংস হবে এবং এটাও যে, মৃত্যুর পর শাস্তি বা প্রতিদানের জন্য ওঠতে হবে। আর এ অর্থও হতে পারে যে,'মৃত্যু' মানে ব্যক্তিগত মৃত্যু এবং 'উত্থিত হওয়া' মানে কবরে জীবিত হওয়া।

১২০. অর্থাৎ না 'জবরিয়া' ফির্কার আক্বীদায় বিশ্বাসী হয়ে মানুষকে 'নিছক বাধ্য' বলে বিশ্বাস করবে, না 'ক্বদরিয়া' আক্বীদা পোষণ করে তাক্বদীরকে অস্বীকার করবে ও নিজেকে সর্বশক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করে বসবে।

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِىْ لَيْسَ لَهُمَا فِى الْاِسْلَامِ نَصِيْبٌ اَلْمُرْجِيَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذٰلِكَ فِى الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدْرِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَرَوٰى التِّرْمِذِىُّ نَحْوَهٗ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৯৮ || **হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতে এমন দু'টি দল রয়েছে,[১২১] ইসলামে যাদের কোন অংশ নেই- 'মুরজিয়াহ্' ও 'ক্বদরিয়া'।"[১২২]** এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। আর বলেছেন, এটি 'গরীব' পর্যায়ের হাদীস।

৯৯ || **হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, "আমার উম্মতে ভূমিধ্বস ও আকৃতি পরিবর্তন সংঘটিত হবে, আর এটা হবে তাক্বদীর অস্বীকারকারীদের উপর।"[১২৩]** এটা আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন, আর তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০০ || **তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,**

---

১২১. 'উম্মত' মানে হয়তো 'উম্মত-ই দা'ওয়াত', যা'তে কাফিরও অন্তর্ভুক্ত। অথবা 'উম্মত-ই ইজাবত' অর্থাৎ যারা কলেমা পড়েছে, যাদেরকে জাতিগত দিক থেকে মুসলমান বলা যায়। দেখুন, মুসলমানদের ৭২টি দোযখী দল জাতিগতভাবে মুসলমান এবং অপর একমাত্র দল হচ্ছে 'নাজিয়াহ' (মুক্তি বা নাজাতপ্রাপ্ত দল), যারা জাতিগতভাবেও মুসলমান এবং আক্বীদাগতভাবেও মুসলমান। সুতরাং, আলোচ্য হাদীস শরীফের বিরুদ্ধে এ আপত্তি নেই যে, ওই সব কাফির দলগুলোকেও হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম কেন 'উম্মত' বলে আখ্যায়িত করেছেন?

১২২. 'মুরজিয়া সম্প্রদায়' বলে থাকে যে, যেমনিভাবে কাফিরকে কোন নেক কাজ উপকৃত করে না, তেমনিভাবে মুসলমানদের জন্যও কোন গুনাহ্ ক্ষতিকর নয়; যথেচ্ছ করতে পারবে। যেমন- এ যুগের দিত্তাশাহী ফক্বীর এবং কিছু কিছু রাফেযীর উত্তরসূরী, যাদের ভ্রান্ত আক্বীদা হচ্ছে দিত্তা শাহকে মেনে নিলে কিংবা মুহাররমে মাতম ও বুক চাপড়িয়ে নিলে যথেচ্ছ করা যায়। আর ক্বদরিয়ারা বলে, "তাক্বদীর বলতে কোন জিনিস নেই। আমরা আমাদের আমলগুলোর সৃষ্টিকর্তা এবং ক্ষমতাবান।"

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এ দু'ফির্কা সম্পূর্ণ কাফির। অবশ্য আলিমগণ বলেছেন- তাদের কুফর 'লুযুমী'; ইল্তিযামী নয়।[অর্থাৎ তারা তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করতে গিয়ে তা কুফরের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে (لزومى) স্বেচ্ছায় বা হঠকারিতার মাধ্যমে কুফরী আক্বীদা অবলম্বন করা তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না (التزامى) ।এতদসত্ত্বেও তাদের পথভ্রষ্টতা নিশ্চিত হয়।] অবশ্য, তাদেরকে কাফির বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা, কুফর সাব্যস্ত করার জন্য অকাট্য দলীল (قطعى) চাই, এ হাদীস শরীফ (قطعى) নয়, (বরং ظنى)।]

১২৩. এটাই প্রকাশ্য বিষয় যে, এখানে ভূমিধ্বস এবং আকৃতি পরিবর্তন (خسف ও مسخ)-এর প্রকৃত অর্থই বুঝানো হয়েছে। আর বাস্তবিকই আখেরী যামানায় কতেক তাক্বদীর অস্বীকারকারীদেরকে ক্বারূনের মত যমীনে ধ্বসে ফেলা হবে এবং কিছু সংখ্যক লোক আয়লাবাসীদের মত বানর ও শূকর হয়ে যাবে। স্মর্তব্য যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'র শুভাগমনের পর এ ধরনের সাধারণ আযাব ক্বিয়ামত পর্যন্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আযাব আসবে। সুতরাং এ হাদীস শরীফ এ আয়াতের বিপরীত নয়- مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ (আল্লাহর কাজ এ নয় যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন...।৮:৩৩) অর্থাৎ এ আয়াতে ব্যাপক আযাবের অস্বীকৃতি রয়েছে এবং এ হাদীসে বিশেষ আযাবের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন- এ হাদীস শরীফের অর্থ হচ্ছে- যদি আমার উম্মতে مسخ ও خسف (আকৃতি পরিবর্তন ও ভূমিধ্বস) হতো, তাহলে ক্বদরিয়া সম্প্রদায়ের উপরই হতো। [লুম'আত]

اَلْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِنْ مَرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَّاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجَالِسُوْا اَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوْهُمْ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ

ফের্কা-ই ক্বদরিয়া হচ্ছে এ উম্মতের 'মাজূসী' (অগ্নিপূজারী) সম্প্রদায়।[১২৪] যদি তারা অসুস্থ হয়, তাহলে তাদের সেবা করো না এবং যদি মারা যায়, তবে তাদের জানাযায় যেও না।[১২৫] [আহমদ, আবূ দাঊদ] **১০১ || হযরত** ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ক্বদরিয়াদের সাথে উঠাবসা করো না।[১২৬] তাদের সাথে কথার সূচনাও করো না।[১২৭] [আবূ দাঊদ]

১০২ || হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ছয় ব্যক্তি এমন রয়েছে, যাদের উপর আমি লা'নত করেছি ও আল্লাহ্।[১২৮]

কেউ কেউ বলেছেন, ক্বদরিয়াদের এ আযাব ক্বিয়ামতে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ হাশরের ময়দানে তাদের মুখ কালো হবে এবং পুলসেরাত থেকে পতন ঘটিয়ে জাহান্নামে ধ্বসিয়ে ফেলা হবে। [মিরক্বাত] কিন্তু প্রথম অর্থটি অধিক শক্তিশালী।

১২৪. এখানে 'উম্মত' মানে 'উম্মত-ই ইজাবত' অর্থাৎ কালেমা পাঠকারী (জাতীয় মুসলমান)। মজূসী (অগ্নিপূজারী)'র আক্বীদা হচ্ছে- জগতের সৃষ্টিকর্তা দু'জন- সৎকর্মের সৃষ্টিকর্তা 'ইয়াযদান' এবং মন্দকাজের সৃষ্টিকর্তা 'আহ্রামান' অর্থাৎ শয়তান। এভাবে ক্বদরিয়ারা নিজেদেরকে নিজেদের আমলগুলোর সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করে। সুতরাং তারা মজূসীদের চেয়েও নিকৃষ্ট হলো। কেননা, তারা (ক্বদরিয়া) শুধু দু'জন সৃষ্টিকর্তা মানে, আর ওরা (অগ্নিপূজারীরা) লক্ষ-কোটি সৃষ্টিকর্তা মানে।

১২৫. অর্থাৎ তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে বয়কট (বর্জন) করো; যাতে তারা নিরুপায় হয়ে তাওবা করে। 'বয়কট করা অতি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা। মহান রব অবাধ্য স্ত্রীদের ব্যাপারে এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ (এবং তাদের থেকে পৃথক হয়ে শয়ন করো। [৪:৩৪])। স্মর্তব্য যে, মু'মিনের, বে-দ্বীন হতে এমনভাবে পৃথক থাকা চাই যেন জীবনে-মরণেও তাদের কাছ থেকে পৃথক থাকবে। প্রাণ বাঁচাতে চাইলে সাপের কাছ থেকে পলায়ন করো। ঈমান বাঁচাতে চাইলে বে-দ্বীনদের কাছ থেকে দূরে সরে পড়ো। ক্বদরিয়ারা হয়তো কাফির, নতুবা গোমরাহ্ (পথভ্রষ্ট)। মোটকথা, তাদের সংস্পর্শ প্রাণনাশক বিষতুল্য।

১২৬. হৃদ্যতা প্রদর্শন ও মিলেমিশে থাকার নিয়মানুসারে দ্বীনের বাণী প্রচার ও তর্ক-মুনাযারার জন্য বিজ্ঞআলিমদের তাদের কাছে যাওয়া জায়েয। সরল প্রকৃতির মুসলমানগণ যেকোন অবস্থায় তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে। বর্তমানকালের ক্বাদিয়ানী, ওহাবী, রাফেযী -সকলের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য। যদি মুসলমানগণ এ হাদীসের উপর আমল করতো, তাহলে তাদের বাতিল মাযহাব প্রচার-প্রসার লাভ করতো না। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (স্মরণে আসতেই যালিমদের নিকটে বসো না। [৬:৬৮])।

১২৭. لَا تُفَاتِحُوْا - فَتْحٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ সূচনা করা বা ফয়সালা করা। যেমন- এরশাদ হচ্ছে رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا (হে আমাদের রব! আমাদের এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। [৭:৪৯]) অর্থাৎ তাদেরকে বিচারক বা শালিশকার বানাবেন না।

অথবা তাদের সাথে কথাবার্তা অযথা তর্ক-মুনাযারা ইত্যাদির সূচনা করো না; যাতে ফিৎনা না হয়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, বে-দ্বীনদের জলসায় যাওয়া, তাদের কিতাবাদি (আমল করার উদ্দেশ্যে) অধ্যয়ন করা এবং তাদেরকে দা'ওয়াত ইত্যাদি খাওয়ানো- সবই না-জায়েয।

১২৮. লা'নত (لَعْنَتْ) অর্থ- দূরীভূত করা। যখন সেটার فَاعِل (কর্তা) বান্দা হবে, তখন সেটার অর্থ হবে রহমত থেকে দূরে ছিটকে পড়ার জন্য অভিসম্পাত করা। আর যদি এর কর্তা (فَاعِل) মহান রব হন, তবে অর্থ হবে- 'রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া'। কোন মুসলমানকে তার নাম নিয়ে লা'নত করা জায়েয নয়। বিশেষ দোষের ভিত্তিতে সাধারণভাবে লা'নত করা জায়েয। যেমন- মিথ্যুক ও যিনাকারীদের উপর আল্লাহর লা'নত। তা'ছাড়া ওই সকল কাফিরের উপরও লা'নত করা জায়েয, যাদের মৃত্যু কুফরের উপর হওয়া নিশ্চিত হয়েছে। যেমন- আবূ জাহল,

وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ الزَّائِدُفِيْ كِتَابِ اللّٰهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدْرِاللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبْرُوْتِ لِيُعِزَّمَنْ اَذَلَّهُ اللّٰهُ وَيُذِلَّ مَنْ اَعَزَّهُ اللّٰهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِيْ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِيْ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى الْمَدْخَلِ وَرَزِيْنُ فِيْ كِتَابِهٖ

আর সকল নবীর দো'আ নিশ্চিত কবুল:[১২৯] ১.আল্লাহ্র কিতাবে পরিবর্তনকারী,[১৩০] ২. আল্লাহ্র নির্ধারিত তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী, ৩.জবরদস্তিমূলক মালিকানা প্রতিষ্ঠাকারী, ওইসব লোককে অপমানিত করার জন্য, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্মান দিয়েছেন,[১৩১] ৪.যারা আল্লাহ্র হারামকৃতকে হালাল মনে করে,[১৩২] ৫.যারা আমার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে ওই সব কথাবার্তা হালাল মনে করে, যেগুলোকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন[১৩৩] এবং ৬. আমার সুন্নাত বর্জনকারী।[১৩৪]

[বায়হাক্বী তাঁর 'মাদখাল' কিতাবে এবং ইমাম রযীন তাঁর কিতাবে এটা বর্ণনা করেছেন]

আবূ লাহাব প্রমুখ। 'লি'আন'-এর মধ্যে নির্দিষ্ট দোষের ভিত্তিতে লা'নত করা হয়। এ হাদীস শরীফে উক্ত লা'নতের কথা বলা হয়েছে।

১২৯. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর সকল দো'আ মাক্বুল। যদি তাঁদের কোন দো'আ 'ক্বাযা' ও তাক্বদীরের বিপরীত হয়ে যায়, তখন তাঁদেরকে দো'আ করা থেকে রুখে দেওয়া হয়। তাও প্রত্যাখ্যান করা হয় না। মহান রব হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম'র উদ্দেশে এরশাদ ফরমায়েছেন يٰاِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ("হে ইব্রাহীম! এ চিন্তায় পড়ো না।" [১১:৭৬, তরজমা: কানযুল ঈমান])

১৩০. ক্বোরআনে হোক বা অন্য কোন আসমানী কিতাবে শব্দগত পরিবর্ধন করে বা অর্থগত বিকৃতি সাধন করে। এ থেকে ওই সব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা বর্তমানে ক্বোরআনের তাফসীরকে ক্রীড়া-তামাশার মত মনে করে এবং আয়াতের ওই অর্থ করে থাকে, যা এ যাবৎ কোন মু'মিনের কল্পনায়ও ছিলো না। আলিমগণ বলেছেন- কোরআন-ই করীমের 'শায্' (অধিকাংশ ক্বারীদের বিপরীত) ক্বিরআতসমূহ হাদীসের সম পর্যায়ের (ظَنِّيٌّ) বিধান রাখে। তা ক্বোরআনও নয়; ওইগুলোর তিলাওয়াতও জায়েয নয়। [মিরক্বাত]

১৩১. অর্থাৎ মানুষের সমর্থনের বিপরীত অবৈধভাবে তাদের শাসক হয়ে যাওয়া। যেমন- বর্তমানে প্রায়ই এরূপ হচ্ছে। স্মর্তব্য যে, জাতি বা দেশের অবস্থা বিগড়ে গেলে তা সামলানোর জন্য শাসনের লাগাম হাতে নিয়ে নেওয়া হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম'র সুন্নাত। এখানে ওইসব শাসকগোষ্ঠীর কথা বুঝানো উদ্দেশ্য,'যারা দ্বীন ও রাজ্যকে বিগড়ে দেওয়ার জন্য শাসক হয়েছে; যারা ফাসিক্বদেরকে মর্যাদা দেয় এবং ওলামা ও আউলিয়া-ই কেরামকে অপমানিত করার অপচেষ্টা চালায়।

১৩২. অর্থাৎ মক্কা মুকাররামার সীমানার অভ্যন্তরে ফিতনা-ফ্যাসাদ, শিকার এবং গাছপালা কাটা ইত্যাদি কাজ সম্পাদনকারী, যেগুলোকে শরীয়ত সাধারণভাবে, অথবা বিশেষভাবে সেখানে হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

১৩৩. অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বংশধরের অবমাননা ও তাঁদের উপর যুলম্-অত্যাচার করা, রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ইতরাত বা বংশধর হচ্ছেন- হযরত ফাতিমা যাহ্রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র বংশধর। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা দ্বীনেরই অংশ। যখন পবিত্র কা'বা ঘরের নৈকট্যের কারণে হেরমের যমীন সম্মানিত, তখন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তাঁর বুযুর্গ বংশধরগণ (সাইয়্যেদগণ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অবশ্যই জরুরি। অথবা এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে- যারা আমার আওলাদ হবে, অথচ আল্লাহ্র হারামকে হালাল মনে করবে, তাদের উপর লা'নত। [আশি''আতুল লুম'আত]

কেননা, যদিও গুনাহ্ সকলের জন্যই মন্দ, কিন্তু নবীর বংশধরগণের জন্য অধিক মন্দ। এ থেকে সাইয়্যেদ হযরতদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। তাঁরা যেন তাঁদের পিতৃপুরুষদের প্রতিচ্ছবি হন। শুধু সাইয়্যেদ হবার উপর অহঙ্কার না করেন।

১৩৪. নগণ্য মনে করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সুন্নাতকে, মুআক্কাদাহ্ হোক কিংবা গায়র মুআক্কাদাহ্-ই যা-ইদাহ্ হোক অথবা হুযূরের তরীক্বা বা স্বভাব মুবারক হোক- সেটাকে তুচ্ছ মনে করা ও উপহাস করা অকাট্যভাবে কুফর। হুযূরের পবিত্র স্বভাবগত সুন্নাতকে সর্বদা পরিত্যাগকারী হুযূরের একটি শাফা'আত থেকে বঞ্চিত।

وَعَنْ مَطَرِبْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ لِعَبْدٍ اَنْ يَّمُوْتَ بِاَرْضٍ جَعَلَ لَهٗ اِلَيْهَا حَاجَةً ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِلَاعَمَلٍ قَالَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ قُلْتُ فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ قُلْتُ بِلَاعَمَلٍ قَالَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১০৩ ॥ হযরত মাত্বার ইবনে 'ওকামিস[১৩৫] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দা সম্পর্কে কোন ভূ-খণ্ডে মৃত্যুবরণ করার ফায়সালা করে দেন, তখন তার জন্য সেখানে কোন জরুরি কাজ নির্ধারণ করে দেন।"[১৩৬] [আহমদ, তিরমিযী] ১০৪ ॥ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহর রসূল! মুসলমানদের সন্তানরা[১৩৭] (কোথায় যাবে?)" হুযূর এরশাদ করলেন, "তারা তাদের পিতৃপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত।"[১৩৮] তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! কোন আমল ছাড়াই?" হুযূর এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্ জানেন তারা কি করতো।"[১৩৯] আমি আরয করলাম, "তাহলে কাফিরদের সন্তানরা?" হুযূর এরশাদ করলেন, "তারা তাদের বাপদাদাদের অন্তর্ভুক্ত।"[১৪০] আমি আরয করলাম, "কোন কিছু করা ব্যতীতই কি?" হুযূর এরশাদ করমালেন, "আল্লাহ্ খুব ভালভাবে জানেন যা তারা করতো।"[১৪১] [আবূ দাউদ] ১০৫ ॥ হযরত ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

---

১৩৫. তিনি সুলায়ম গোত্রীয়। তিনি কূফার অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য। তাঁর নিকট থেকে শুধু এ একটি হাদীস শরীফ বর্ণিত।
তিনি সাহাবী ছিলেন কিনা -সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। সঠিক অভিমত হচ্ছে- তিনি সাহাবী। সাহাবী হবার জন্য (ঈমান সহকারে) একটি মাত্র মুহূর্ত হুযূর-ই আকরামের সাথে সাক্ষাতই যথেষ্ট।

১৩৬. পার্থিব কিংবা ধর্মীয়। সুতরাং কিছু লোক রওযা-ই পাক যিয়ারত করার জন্য কিংবা হজ্জ করার জন্য মদীনা পাক কিংবা মক্কা মুকাররামাহ্ গমন করে; আর সেখানে ইন্তিকাল করে। এমন প্রয়োজনও বরকতময় এবং মৃত্যুও।

১৩৭. অর্থাৎ বুদ্ধিমান হবার পূর্বে যাদের মৃত্যু হয়ে যায় তারা কোথায় যাবে?

১৩৮. অর্থাৎ বেহেশ্তী। আর জান্নাতে যেই মর্যাদা তাদের পিতৃপুরুষদের হবে, তা-ই তাদেরও হবে। সুতরাং হযরত ক্বাসিম ও হযরত ইব্রাহীম প্রমুখ হুযূর আলায়হিস্ সালাম'র সাথে থাকবেন। সন্তানগণ তো বহু উচ্চ পর্যায়ের নৈকট্য রাখে। ইন্শা- আল্লাহ! যারা হুযূরের প্রতি আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট, তাঁরা হুযূরের সাথে থাকবেন। ফুলের তোড়ার ঘাসও ফুলের সাথে বাদশাহ্র হাতে পৌঁছে যায়।

১৩৯. অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য কার্যতঃ কর্ম সম্পন্ন করা পূর্বশর্ত নয়। পরোক্ষ কর্মও যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ যদি তারা জীবিত থাকতো, তবে তারা মুসলমানের সন্তান হিসেবে থাকতো এবং পুণ্যময় কাজই করতো। এতদ্ভিত্তিতে জান্নাতেই যাবে; বরং কোন কোন গুনাহগারও নেক্কারদের ওসীলায় জান্নাতী। যেমন- ইতোপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

১৪০. অর্থাৎ তাদের সাথে দোযখে যাবে।

১৪১. অর্থাৎ তারা যদি জীবিত থাকতো, তবে তো কাফিরের সন্তানই থাকতো; তাই কুফরই করতো। অধিকাংশ আলিমদের অভিমত হচ্ছে- হাদীস শরীফের এ অংশ ওইসব আয়াত দ্বারা রহিত, যেগুলোতে এরশাদ হয়েছে যে, বিনা অপরাধে দোযখে দেওয়া হবে না। এ কথা বহুবার বলা হয়েছে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ("এবং আমি শাস্তিদাতা নই, যতক্ষণ না আমি রসূল প্রেরণ করি।" ১৭:১৫)

اَلْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُوْدَةُ فِى النَّارِ- رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِى ◆ اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَغَ اِلٰى كُلِّ عَبْدٍ مِّنْ خَلْقِهٖ مِنْ خَمْسٍ مِنْ اَجَلِهٖ وَعَمَلِهٖ وَمَضْجَعِهٖ وَاَثَرِهٖ وَرِزْقِهٖ- رَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الْقَدْرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

জীবিত দাফনকারিনী মা এবং জীবিত দাফনকৃত শিশুকন্যা -উভয়ই দোযখে (যাবে)।[১৪২] [আবূ দাউদ, তিরমিযী।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ১০৬ ॥ হযরত আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[১৪৩] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা আপন আপন সৃষ্টিকুলে প্রত্যেক বান্দার ব্যাপারে পাঁচটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছেন।[১৪৪] তার মৃত্যু সম্পর্কে, তার আমল সম্পর্কে,[১৪৫] প্রত্যেক নড়াচড়া সম্পর্কে, স্থিতিশীলতা সম্পর্কে[১৪৬] এবং তার জীবিকা সম্পর্কে। [আহমদ।]

১০৭ ॥ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তাক্বদীরের মাসআলায় বিতর্ক করবে, ক্বিয়ামতের দিন তজ্জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১৪৭]

---

১৪২. আরবের সম্পদশালী কাফিরগণ তাদের কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করতেই জীবিত পুঁতে ফেলতো। হাদীস শরীফের প্রকাশ্যার্থ হচ্ছে- এ মা ও শিশুকন্যা উভয়ই জাহান্নামী। মা প্রকৃতপক্ষে কুফর করার কারণে, আর শিশুকন্যা কাফির বিবেচিত হবার(تَبَعًا) ভিত্তিতে। তখনতো এর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত হচ্ছে তা-ই, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি ব্যাখ্যা এটাও হতে পারে যে, وَائِدَة মানে ওই প্রসব কাজে সহযোগী ধাত্রী, যে শিশুকন্যাকে দাফন করিয়ে দিত। আর مَوْءُوْدَة মানে ওই মা, যার শিশুকন্যাকে (জীবিত) দাফন করে ফেলা হয়েছে। তখন এ হাদীস শরীফ একেবারে স্পষ্টার্থক। উভয় নারী আপন আপন কুফরের ভিত্তিতে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।[অন্যত্র এ ধরনের অপরাধী পিতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই পিতামাতা ও ধাত্রী একই অপরাধের (অপরাধী ও) শাস্তিযোগ্য।]

১৪৩. তাঁর নাম মুবারক 'ওয়াইমার ইবনে 'আমির। তিনি আনসারী ও খায্‌রাজ গোত্রীয়। দারদা তাঁর কন্যার নাম। তিনি নিজের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সবার পরে ঈমান আনেন। তিনি ফক্বীহ ও ইবাদতপরায়ণ সাহাবী। সিরিয়ায় বসবাস করতেন। ৩২ হিজরিতে দামেস্কে ওফাত পান। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

১৪৪. অর্থাৎ ভাগ্যের ফয়সালা চূড়ান্ত। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা ব্যস্ত হয়ে পড়া এবং অবসর গ্রহণ করা থেকে পবিত্র। যদিও আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা সব বিষয়ে হয়ে গেছে, তবুও বিশেষভাবে এ পাঁচটির উল্লেখ এ জন্য করেছেন যে, মানুষের নিকট এগুলোর চিন্তাভাবনা বেশি থাকে। এর মর্মার্থ এ যে, তোমরা এগুলোর চিন্তায় জীবন কেন বিনষ্ট করছো? যা ফয়সালা হয়ে গেছে তা হবেই।

১৪৫. অর্থাৎ কি করবে এবং কোথায় ও কখন মরবে।

১৪৬. مَضْجَع -অর্থ পার্শ্বদেশ (করট) রাখার জায়গা। অর্থাৎ নিদ্রাস্থল। اَثَر পদাঙ্ককে বলা হয়। অর্থাৎ কোথায় থাকবে, কোথায় বিচরণ করবে, কোন্ কোন্ স্থানে যাবে এবং কোথায় দাফন হবে অথবা দাফনও হবে না।

১৪৭. তিরস্কার স্বরূপ অর্থাৎ তুমি তা নিয়ে নিজের সময় কেন নষ্ট করছো এবং তাতে বিতর্ক কেন করছো?

স্মর্তব্য যে, মানুষকে পথভ্রষ্ট করা কিংবা তাদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টির জন্য অথবা যেসব লোক কম বিবেকবান তাদের সামনে তাক্বদীরের মাসআলার অবতারণা করা অপরাধ। তাই এখানে একথা বুঝানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এ মাসআলায় গবেষণা করা, সন্দেহ দূর করার জন্য আলোচনা করা যথার্থ ও সাওয়াবের কারণ।

সুতরাং ওই সব সাহাবী ও আলিমগণ তিরস্কারযোগ্য নন, যাঁরা এ মাসআলার উপর মূর্খদের সাথে তর্কযুদ্ধ করেছেন কিংবা কিতাবাদি রচনা করেছেন।

وَمَنْ لَّمْ يَتَكَلَّمْ فِيْهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَعَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ اَتَيْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهٗ قَدْ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ شَيْءٌ مِّنَ الْقَدْرِ فَحَدِّثْنِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّذْهِبَهٗ مِنْ قَلْبِيْ فَقَالَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوٰتِهٖ وَاَهْلَ اَرْضِهٖ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَّهُمْ

আর যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে বিতর্ক করবে না, তজ্জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।[১৪৮] [ইবনে মাজাহ]

১০৮ ‖ হযরত ইবনে দায়লামী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,[১৪৯] তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কা'বের[১৫০] নিকট হাযির হলাম এবং আরয করলাম, "আমার অন্তরে তাক্বদীর সম্পর্কে কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উদয় হয়েছে।[১৫১] আমাকে কোন হাদীস শরীফ শুনান। হয়তো আল্লাহ্ আমার অন্তর থেকে তা দূর করে দেবেন।"[১৫২] তিনি বললেন, "যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আসমান ও যমীবাসীদের আযাব দেন, তাহলে তিনি তাদের প্রতি অন্যায়কারী হবেন না[১৫৩]

১৪৮. সাধারণ মানুষের জন্য জরুরি হচ্ছে, এটাকে মেনে নেওয়া, বিতর্ক না করে মেনে নেওয়া নিশ্চয় আমাদের উপর বর্তায়, বিতর্ক করা নয়। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী (যাত্ ও সেফাত)'র মাসআলারও একই বিধান। পংক্তি- تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا
پہچان گیا میں تری پہچان یہی ہے

অর্থাৎ: হে আল্লাহ্! তুমি হৃদয়ে তো আসো, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না। আমি এটাই বুঝলাম যে, এটাই তোমার পরিচয়।

১৪৯. তাঁর নাম আবূ আবদুল্লাহ্ অথবা আবদুর রহমান ইবনে ফিরোয দায়লামী হিমইয়ারী। তিনি পারস্য বংশোদ্ভূত। তাঁর পিতা ফিরোয আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করেছেন, যে ব্যক্তি নুবূয়তের ভণ্ড দাবীদার ছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট হুযূরের ওফাতের অসুস্থতার সময় যখন এ সংবাদ পৌঁছালো, তখন হুযূর বলেছিলেন,"তাঁকে একজন নেক্ বান্দা হত্যা করেছে।"তিনি আমীর-ই মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র শাসনামলে ৫০হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। দায়লামী সাহাবী ছিলেন এবং তাঁর পুত্র আবূ আবদুর রহমান তাবে'ঈ। 'দায়লাম' একটি পাহাড়ের নাম।

১৫০. তিনি সাতজন বিশিষ্ট বিশুদ্ধ ক্বোরআন পাঠক সাহাবীদের অন্যতম। তিনি আনসারী, খাযরাজ গোত্রীয় ও ওহী লিখক ছিলেন। তিনি ওই ছ'জন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা হুযূরের পবিত্র যুগে হাফেয-ই ক্বোরআন ছিলেন। হুযূর তাঁর উপনাম 'আবুল মুনযির' রেখেছিলেন এবং হযরত ওমর ফারুক্ব তাঁর উপনাম 'আবূ তোফায়ল' রাখেন। হুযূর তাঁকে 'সাইয়্যেদুল আনসার' (আনসারকুল সর্দার) এবং হযরত ওমর তাঁকে 'সাইয়্যেদুল মুসলিমীন' বলতেন। মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত ওমরের খিলাফতকালে ১৯ হিজরি সনে ওফাত পান।

১৫১. যেহেতু সমস্ত জিনিস যখন লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে এবং ওই সব সংঘটিত হবেই, সেহেতু শরীয়তের বিধানই বা কি জন্য? এবং শাস্তি ও প্রতিদানই বা কেন? সম্ভবতঃ এ সকল সংশয় ক্বদরিয়াদের সংশ্রবের কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

১৫২. এখান থেকে বুঝা গেলো যে, আলিমদের নিকট যাওয়া, তাঁদেরকে মাসআলাসমূহ জিজ্ঞেস করা এবং নিজের সন্দেহ দূর করে নেওয়া সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাত। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (অতঃপর তোমরা বিজ্ঞ আলিমদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা না জানো।)[২১:৭]

১৫৩. অর্থাৎ কেন এবং কিরূপে -এ নিয়ে চিন্তা করো না, বরং এ বিশ্বাস রাখো যে,আল্লাহ্ প্রকৃত মালিক, তিনি নিজ মালিকানায় যা চান অধিকার প্রয়োগ করেন। আমরা ছাগল যবেহ করি, গাছ কেটে জ্বালিয়ে থাকি। কুম্ভকার কোন মাটিকে পেয়ালা বানায়, যা পানিতে থাকে, কোন মাটিকে পাতিল বানায়, যা আগুনের উপর জ্বলে। যখন তবুও তাদের কেউ অত্যাচারী নয়, তখন যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নির্দোষভাবেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করে, তবে তিনি অত্যাচারী হবেন কেন? স্মর্তব্য যে, এগুলো কাল্পনিক উপমা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উক্তি উদ্ধৃত করে এরশাদ করেন قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ (আপনি বলুন, অসম্ভব কল্পনায়, রহমানের যদি কোন সন্তান থাকতো, তবে সর্বপ্রথম আমি তার ইবাদত করতাম।[৪৩:৮১]) নতুবা সম্মানিত নবীগণ এবং যাঁদের সাথে জান্নাতের ওয়াদা হয়ে গেছে, তাদের আযাব হওয়া তেমনি অসম্ভব, যেমন আল্লাহ্র শরীক থাকা অসম্ভব।

আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা থেকে পবিত্র। এখানে শুধু এটা ঘোষণা করা হয়েছে যে, অসম্ভব কল্পনায়, তিনি যদি

وَلَوْرَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْاَنْفَقْتَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَاقَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمَ اَنَّ مَااَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُخْطِئَكَ وَاَنَّ مَااَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَلَوْمُتَّ عَلٰى غَيْرِهٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَقَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَيْتُ زَيْدَبْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذٰلِكَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

এবং যদি তাদের উপর দয়া করেন তাহলে তাঁর রহমত তাদের আমলের চেয়ে উত্তম।[১৫৪] আর যদি তুমি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় দান করো, তাহলে আল্লাহ্ তা কবূল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাক্বদীরের উপর ঈমান আনবে।[১৫৫] আর এটা জেনে রেখো যে, যা কিছু তোমার উপর সংঘটিত হয়েছে, তা তোমার উপর না হয়ে থাকতো না এবং যা তোমার উপর থেকে সরে গেছে, তা তোমাকে স্পর্শ করতে পারতো না।[১৫৬] আর যদি তুমি এটা ব্যতীত অন্য কোন আক্বীদার উপর মৃত্যুবরণ করো, তাহলে দোযখে প্রবেশ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, "অতঃপর আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদের নিকট গেলাম। তখন তিনিও অনুরূপ বলেছেন। অতঃপর আমি হুযায়ফা ইবনে ইয়ামানের নিকট গেলাম। তিনিও এ ধরনের কথা বলেছেন। অতঃপর আমি যায়েদ ইবনে সাবিতের[১৫৭] নিকট হাযির হলাম। তখন তিনিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সূত্রে একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন।"[১৫৮] [আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ]

তাদেরকে আযাবও দেন, তবুও তিনি অত্যাচারী সাব্যস্ত হবেন না। কারণ, সে-ই অত্যাচারী, যে অপরের রাজ্যে (মালিকানায়) অধিকার না থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

১৫৪. অর্থাৎ যদি তিনি কাফির-মুরতাদ্দ ইত্যাদিসহ সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে এটা তাঁর দয়া। এ ধরনের উক্তিও কাল্পনিক। নতুবা ইবলীস, ফির'আউন, আবূ জাহল প্রমুখ জান্নাতী হওয়া একেবারে অসম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَلَايَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ

(এবং না তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করবে।) [৭:৪০, তরজমা: কানযুল ঈমান]

১৫৫. এ থেকে কয়েকটি মাসআলা প্রতীয়মান হয়:

এক. তাক্বদীরকে অস্বীকার করা কুফর এবং অস্বীকারকারী কাফির। এ কারণে, কোন কোন আলিম ক্বদরিয়া সম্প্রদায়কে কাফির বলেছেন।

দুই. কাফিরদের কোন নেকী কবূল হয় না, যেমনিভাবে ওযূবিহীন লোকের নামায শুদ্ধ হয় না।

তিন. সম্মানিত সাহাবীদের যুগে এ ধরনের কিছু বিভ্রান্তিমূলক মাসআলা ছড়িয়ে পড়েছিলো। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ সেগুলোর খণ্ডন ও মূলোৎপাটন করেছিলেন।

১৫৬. অর্থাৎ সমস্ত মুসীবত এবং শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে। পার্থিব মাধ্যম যা-ই হোকনা কেন। সুতরাং এটা বলো না, 'যদি তার জ্বর না হতো, তাহলে তার মৃত্যু হতো না।' অথবা, যদি আমি অমুক কাজটি করতাম, তাহলে আমি অসুস্থ হতাম না। মৃত্যুও আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং জ্বর-অসুখও আল্লাহর তরফ থেকেই এবং এ কাজটিও।

১৫৭. তিনি আনসারী। ওহী লিখক। ইলমে ফরায়েযের বড় আলিম। তিনি সিদ্দীক্ব-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র খিলাফতকালে ক্বোরআন সঙ্কলনকারী, হযরত উসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র খেলাফতকালে মাসহাফসমূহের (ক্বোরআন শরীফের কপি) লিখকদের মধ্যে অন্যতম। ৫৬ বছর বয়সে ৪৫ হিজরিতে পবিত্র মদীনায় ওফাত পান।

১৫৮. সুতরাং এ হাদীস মারফূ' (যে হাদীস শরীফের সূত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে)। যদিও এ তিনজন সাহাবী এ মারফূ' হওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি।

وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلًا اَتٰى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ اِنَّ فُلَانًا يُقْرِءُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَ اِنَّهٗ بَلَغَنِىْ اَنَّهٗ قَدْ اَحْدَثَ فَاِنْ كَانَ قَدْ اَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّى السَّلَامَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ اَوْفِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَّمَسْخٌ اَوْ قَذْفٌ فِىْ اَهْلِ الْقَدَرِ-رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاؤُدَوَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَعَنْ عَلِىٍّ قَالَ سَاَلَتْ خَدِيْجَةُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১০৯ || হযরত নাফি'[১৫৯]রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমরের কাছে এসে বললেন, "অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম বলেছেন।"[১৬০] তিনি বললেন,"আমি শুনেছি সে বিদ'আতী হয়ে গেছে।"[১৬১] যদি সে সত্যিই বিদ'আতী হয়ে যায়, তাহলে তাকে আমার সালাম বলো না।[১৬২] আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, আমার উম্মতে অথবা এ উম্মতে ভূমিধ্বস, আকৃতি পরিবর্তন, পাথর বর্ষণ হবে ক্বদরিয়া সম্প্রদারে মধ্যে। এ হাদীস শরীফ তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, "এ হাদীস 'হাসান-গরীব' পর্যায়ের।[১৬৩]

১১০ || হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত খাদীজা[১৬৪]রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে

---

১৫৯. তিনি নাফি' ইবনে সারজাস দায়লামী। সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমররের আযাদকৃত ক্রীতদাস। মহামর্যাদা সম্পন্ন তাবে'ঈ। ইমাম মালিক এবং অন্যান্য ইমামগণও তাঁর নিকট থেকে হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন। বড় ইবাদতপরায়ণ খোদাভীরু আলিম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসের তিনিই বর্ণনাকারী। ১১৭ হিজরীতে ওফাত পান।

১৬০. বুঝা গেলো যে, কারো মাধ্যমে সালাম বলে পাঠানো জায়েয। বর্তমানেও কিছু কিছু লোক হাজীদের মাধ্যমে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'র রওযা-ই আন্ওয়ারে সালাম বলে পাঠান।

১৬১. অর্থাৎ সে দ্বীনের মধ্যে নতুন (ভ্রান্ত) আক্বীদার উদ্ভব বা গ্রহণ করেছে। কারণ সে তাক্বদীরকে অস্বীকার করে ক্বদরিয়া হয়ে গেছে। বুঝা গেলো যে, ক্বদরিয়া মতবাদ বহু পুরাতন। সাহাবা-ই কেরামের যুগে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

১৬২. অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে সালামের জবাব পৌঁছাবে না। এ থেকে কয়েকটি মাসআলা বুঝা গেল-

এক. বিদ'আত-ই সাইয়্যেআহ্ ওই সব বাতিল ও ভ্রান্ত আক্বাইদকে বলা হয়, যেগুলো ইসলামে নতুনভাবে রচনা করা হয়। যেই বিদ'আত বা বিদ'আতীর অত্যন্ত মন্দ পরিণতির কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। দেখুন, হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা তাক্বদীর অস্বীকার করার আক্বীদাকে বিদ'আত বলেছেন।

দুই. সম্মানিত সাহাবীদের যুগে যেসব মন্দ আক্বীদা সৃষ্টি হয়েছিল, ওইগুলোও বিদ'আত। যদিও ক্বদরিয়া মতবাদ 'খায়রুল কুরূন' বা সর্বোত্তম যুগেই উদ্ভাবিত হয়েছে। তবুও সেটা বিদ'আত হলো। 'বিদ'আত' হওয়ার জন্য 'খায়রুল কুরূন'-এর পর হওয়া পূর্বশর্ত নয়। হযরত ওমর ফারুক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তারাভীহ্ নামাযের নিয়মিত জামা'আতকে, যা তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন, 'বিদ'আতে হাসানাহ্' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তিন. ইসলামে নতুন ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী বাতিলপন্থী তথা বে-দ্বীনকে না সালাম করা যাবে, না তার সালামের জবাব দেওয়া যাবে।

১৬৩. অর্থাৎ এ হাদীস শরীফ একাধিক সনদে বর্ণিত আছে। এক সনদে তা 'হাসান', অন্য সনদে 'সহীহ', তৃতীয় সনদে 'গরীব'।

১৬৪. তিনি বিশ্বমুসলিমের প্রথম আম্মাজান। নাম শরীফ খাদীজা বিনতে খোয়াইলিদ ইবনে আসাদ। ক্বোরাইশ বংশীয়া। তাঁর বংশধারা কুসাই ইবনে কিলাবে পৌঁছে হুযূরের বংশধারার সাথে মিলিত হয়ে যায়। প্রথমে হালাহ্ ইবনে যারারাহর বিবাহাধীন ছিলেন। অতঃপর আতীক্ব ইবনে আ'ইয়ের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এরপর চল্লিশ বছর বয়সে হুযূরের বিবাহাধীন হয়েছেন। হুযূর সর্বপ্রথম তাঁকেই

عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَالَهَافِى الْجَاهِلِيَّةِفَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُمَا فِى النَّارِقَالَ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهَةَ فِىْ وَجْهِهَاقَالَ لَوْرَأَيْتِ مَكَانَهُمَالَاَبْغَضْتِهِمَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَوُلْدِىْ مِنْكَ قَالَ فِى الْجَنَّةِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَوْلَادَهُمْ فِى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَوْلَادَهُمْ فِىْ النَّارِثُمَّ قَرَءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهٗ فَسَقَطَ عَنْ ظَهْرِهٖ كُلُّ نَسَمَةٍ

তাঁর ওই দু'সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যারা জাহেলীযুগে মৃত্যুবরণ করেছে।[১৬৫] হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তারা উভয়ে দোযখে রয়েছে।[১৬৬] বর্ণনাকারী বলেন, যখন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম তাঁর চেহারায় বিষণ্নতার চিহ্ন দেখলেন, তখন বললেন, যদি তুমি তাদের ঠিকানা দেখতে তাহলে তাদেরকে ঘৃণা করতে।[১৬৭] তিনি আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আচ্ছা, আপনার ঔরশ মুবারক থেকে আমার যে সন্তানগুলো?"[১৬৮] হুযূর এরশাদ করলেন, "তারা বেহেশ্‌তে।" অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "মুসলমানগণ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি বেহেশ্‌তে।[১৬৯] আর কাফিরগণ ও তাদের সন্তানরা দোযখে যাবে।" অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত শরীফ পাঠ করলেন- "এবং যারা ঈমান আনলো এবং তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের অনুগামী।"[১৭০] [আহমদ] ১১১ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন আল্লাহ্ হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর পিঠের উপর ক্বুদরতের হাত বুলিয়ে দিলেন। তখন তাঁর পিঠ হতে ক্বেয়ামত পর্যন্ত তাঁর সন্তানদের রূহসমূহ বের হলো,

---

বিয়ে করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় অন্য কাউকে শাদী করেন নি। সর্বপ্রথম তিনিই হুযূরের উপর ঈমান আনেন। হযরত ইব্রাহীম ব্যতীত হুযূরের পবিত্র আওলাদগণ তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর পঁচিশ বছর বয়সে শরীফে তাঁকে শাদী করেন। তিনি ৬৫ বছর হায়াত পেয়ে হিজরতের চার বছর পূর্বে মক্কা মু'আযযমায় ওফাত পান। জান্নাতুল মু'আল্লার দ্বিতীয় অংশে তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো। তাঁর কবর শরীফ সকলের যিয়ারতের স্থান। আমি অধমও সেখানে হাযির হয়েছি।

১৬৫. পূর্ববর্তী স্বামীদের থেকে ইসলাম প্রকাশের পূর্বে।

১৬৬. কেননা, তাদের পিতাও মুশরিক ছিল এবং হে খাদীজা! ওই সময় তুমিও মুশরিক ছিলে। সুতরাং তারা নিজেরাও মু'মিন হতে পারে নি এবং পিতামাতার অনুসারী হয়ে জান্নাতীও হতে পারে নি। এ মাসআলার গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত এ অধ্যায়ে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, এটা 'সংবাদ' নয়; বরং একটা বিধানেরই বর্ণনা মাত্র। অর্থাৎ আইনগতভাবে তোমার ওই পুত্ররা জাহান্নামী হওয়ার যোগ্য। সুতরাং এ হাদীস ওইসব আয়াত দ্বারা রহিত, যেগুলোতে এরশাদ করা হয়েছে যে, "আমি গুনাহ ব্যতীত কাউকে আযাব দিই না।"

১৬৭. অর্থাৎ তাদের প্রতি তোমার মাতৃত্বপূর্ণ স্নেহ এবং তাদের আযাবের উপর দুঃখ ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে, যতক্ষণ না তুমি তাদের ওই ঠিকানা দেখতে পাও। এ থেকে বুঝা গেলো যে, জান্নাতী পিতা-মাতা এবং দোযখী সন্তান-সন্ততির মধ্যে আদৌ স্নেহ মমতা থাকবে না। ওখানে মুহাব্বত হবে ঈমানী সম্পর্কের কারণে, হৃদয়ের সম্পর্কের (আত্মীয়তা) কারণে নয়।

১৬৮. ত্বাইয়্যেব, ত্বাহির ও ক্বাসিম, যাঁরা বাল্যকালে ওফাত পেয়েছিলেন, ইসলাম প্রকাশের পূর্বে।

১৬৯. এ হাদীস শরীফ ওই হাদীস শরীফকে রহিত করে দেয়, যাতে এরশাদ হয়েছিলো যে, মুসলমানদের ছোট শিশুরা নিজেরা তাক্বদীরে লিখিত নির্দ্ধারিত আমল অনুযায়ী জান্নাতী অথবা দোযখী হবে।

১৭০. এ আয়াত থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো: এক. যদি মাতাপিতার মধ্যে কেউ মুসলমান হয়, তাহলে সন্তান

هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَىْ كُلِّ اِنْسَانٍ مِّنْهُمْ وَبِيْصًا مِّنْ نُّوْرٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰى اٰدَمَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ مَنْ هٰؤُلَاۤءِ قَالَ ذُرِّيَّتُكَ فَرَأٰى رَجُلًا مِّنْهُمْ فَاَعْجَبَهٗ وَبِيْصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ اَىْ رَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ دَاؤُدُ فَقَالَ اَىْ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهٗ قَالَ سِتِّيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِىْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْقَضٰى عُمْرُ اٰدَمَ اِلَّا اَرْبَعِيْنَ

তাঁর সন্তানদের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ যাদেরকে সৃষ্টি করবেন এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেক মানুষকে দু'চোখের মধ্যখানে নূরের চমক দিলেন।[১৭১] অতঃপর তাদেরকে হযরত আদম'র নিকট পেশ করলেন। তিনি বললেন, "হে রব! এরা কারা?" বললেন,"তোমার সন্তানগণ।"[১৭২] তিনি তাদের মধ্যে, একজনকে দেখলেন। এতে তার চোখের মধ্যেভাগের চমক পছন্দ হলো।[১৭৩] তিনি বললেন, "হে রব! ইনি কে?" বললেন, "হযরত দাউদ।" বললেন, "হে রব! তাঁর বয়স কত নির্ধারণ করেছেন?" বললেন,"ষাট বছর।"[১৭৪] তিনি আরয করলেন,"হে রব! আমার বয়স হতে চল্লিশ বছর নিয়ে তাকে বৃদ্ধি করে দিন।"[১৭৫] রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "যখন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র নির্ধারিত বয়সের চল্লিশ বছর অবশিষ্ট থাকতে

মু'মিন হবে। **দুই.** শিশুসন্তান মাতাপিতার সাথে থাকবে। মাতাপিতাকে কিছু কম দেওয়া হবে না।

১৭১. ফিত্বরী (স্বভাবগত) নূর, অর্থাৎ 'ফিত্বরাত-ই সালীমাহ্' (সুস্থ স্বভাব)'র নূর চেহারায় প্রকাশ পেয়েছে। স্মর্তব্য যে, سقط অর্থাৎ পতিত গর্ভভ্রূণ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এতে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয় নি। যেসব শিশুর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে দেখানো হয়েছে। এসব কিছু হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে অবগত করানোর জন্য করা হয়েছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তো সর্বদাই সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে অবগত।

১৭২. এ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নিজের সকল সন্তানকে দেখেও নিয়েছেন, চিনেও নিয়েছেন এবং তাদের পরিণাম সম্পর্কেও অবগত হয়েছেন- অমুক বেহেশ্তী, অমুক দোযখী।

১৭৩. এ থেকে বুঝা গেলো যে, তাদের উজ্জ্বলতা বিভিন্ন রকম ছিলো এবং হযরত আদমের কাছে হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম'র উজ্জ্বলতা পছন্দ হওয়ার কারণে এটা অনিবার্য হয় না যে, তাঁর উজ্জ্বলতা আমাদের হুযূরের চেয়েও অধিক বা উত্তম। বাস্তব সৌন্দর্য এক জিনিস, পছন্দ হওয়া অন্য জিনিস। লায়লার চেয়ে অধিক সুন্দরী মহিলা বিদ্যমান ছিলো; কিন্তু তার আশিক্বের চোখে সে-ই অধিক আকর্ষণীয় ছিলো। [আশি''আতুল লুম'আত]

১৭৪. বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মাক্ববূল বান্দাদেরকে তাঁর বিশেষ জ্ঞান দান করে থাকেন। কেননা, বয়সের সময়সীমা 'উলূম-ই খামসাহ্' (পঞ্চবিষয়ের জ্ঞান)'র অন্তর্ভুক্ত,☆ যা রব্বুল আলামীন সাইয়্যেদুনা হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে জানিয়ে দিয়েছেন।

১৭৫. হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র বয়স এক হাজার বছর নির্ধারিত ছিলো। তিনি আরয করলেন- "আমার হায়াত নয়শ' ষাট বছর করে দিন এবং দাউদ আলায়হিস্ সালাম'র হায়াত পূর্ণ একশ' বছর করে দিন! এ দো'আ আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করে নিলেন।

বুঝা গেলো যে, সম্মানিত নবীর দো'আর বরকতে মানুষের জীবনে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তাঁদের মর্যাদা তো বহু উঁচু। শয়তানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেও তার হায়াত বৃদ্ধি পেয়েছিলো। সে আবেদন করেছিলো اَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ (অর্থাৎ আমাকে অবকাশ দিন ওই দিন পর্যন্ত যেদিন লোকেরা পুনরুত্থিত হবে।[৭:১৪]) আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবূল করে এরশাদ করেন- قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ الاية (বললেন, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো। [৭:১৫]) فَاِنَّكَ'র 'ف'দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এ হায়াত বৃদ্ধি তার আবেদনের কারণে হয়েছিলো। বাকী রইলো ওই আয়াত শরীফ- اِذَا جَاۤءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً-

---

☆ পঞ্চবিষয়: ১. ক্বিয়ামত কখন হবে, ২. বৃষ্টি কখন হবে, ৩. মাতৃগর্ভে কি আছে, ৪. কোথায় মৃত্যু হবে এবং আগামীকাল কি হবে। এসব বিষয় আল্লাহ্ তা'আলা তো জানেনই, তিনি যাকে চান জানিয়েও দেন। [তাফসীরাত-ই আহমদিয়াহ্, পৃষ্ঠা: ৬০৮-৬০৯]

جَآءَهُ مَلَکُ الْمَوْتِ فَقَالَ اٰدَمُ اَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِیْ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ اَوَلَمْ تُعْطِهَا اِبْنَکَ دَاوٗدَ فَجَحَدَ اٰدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهٗ وَنَسِیَ اٰدَمُ فَاَکَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهٗ وَخَطَأَ اٰدَمُ وَخَطَأَتْ ذُرِّيَّتُهٗ - رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ

তাঁর নিকট মৃত্যুদূত (ফিরিশ্‌তা) হাযির হলো,[১৭৬] তখন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বললেন, "এখনও কি আমার জীবনের চল্লিশ বছর বাকী নেই?" বললেন, "আপনি তুমি কি তা তোমার সন্তান দাউদকে দিয়ে দেন নি?[১৭৭] হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তা তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকার করলেন (স্মরণ করতে না পারায়)। এ জন্য তাঁর সন্তানগণও অস্বীকার করতে থাকে।[১৭৮] হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ভুল বশতঃ গাছের ফল ভক্ষণ করেছিলেন। তাই তাঁর সন্তানগণও ভুলে যেতে লাগলো। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম (সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে) ত্রুটি করেছিলেন। তাই তাঁর সন্তানগণও ত্রুটি-বিচ্যুতি করতে লাগলো।[১৭৯] [তিরমিযী]

وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (যখন তাদের প্রতিশ্রুতি আসবে, তখন একটা মুহূর্ত না পেছনে হটবে, না সামনে বাড়বে।[১০:৪৯]) এটা এ হাদীসের বিরোধী নয়। কেননা, আয়াতে তাক্বদীর-ই মুবরাম (চূড়ান্ত অদৃষ্ট) অর্থাৎ ইল্‌ম-ই ইলাহী'র উল্লেখ রয়েছে আর এখানে তাক্বদীর-ই মু'আল্লাক্ব (শর্ত সাপেক্ষ অদৃষ্ট)-এর উল্লেখ রয়েছে।

অথবা আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে- কেউ স্বেচ্ছায় তার বয়স-সীমায় হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে না। আর হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে বান্দার দো'আর ভিত্তিতেও আল্লাহ্ বয়স-সীমা কম-বেশি করে থাকেন।

পরিশেষে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম মৃতদের জীবিত করতেন। তাঁর দো'আর বরকতে তাদের নতুন হায়াত অর্জিত হতো। সুতরাং সঠিক অভিমত হলো, দো'আ দ্বারা তাক্বদীর পরিবর্তিত হয়।

১৭৬. অর্থাৎ যখন তাঁর নয়শ' ষাট বছর পূর্ণ হল, তখন হযরত আযরাঈল হাযির হয়ে তাঁকে মৃত্যুর বার্তা শুনালেন। বুঝা গেলো যে, সম্মানিত নবীগণের ওফাত আমাদের মত জোরপূর্বক হয় না; বরং মৃত্যুদূত (ফিরিশ্‌তা) প্রকাশ্যভাবে তাঁদের খিদমতে হাযির হন এবং তাঁদের অনুমতিক্রমে জান কব্জ করেন। তাঁদের ওফাত তাঁদের ইচ্ছানুসারে হয়।

১৭৭. বুঝা গেলো যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম স্বীয় হায়াত সম্পর্কে জানতেন যে, তাঁর পূর্ণ মেয়াদ সর্বমোট এতটুকু হবে। এটা 'উলূমে খামসা'র অন্তর্ভুক্ত।

এটাও বুঝা গেলো যে, সম্মানিত নবীগণের ওফাত শরীফ তাঁদের সন্তুষ্টি ও সম্মতির ভিত্তিতে বুঝিয়ে-সুজিয়ে করা হয়। আমাদের সাথে মালাকুল মাউত কখনো এ ধরনের হিসাব-নিকাশ করেন না।

১৭৮. অর্থাৎ আদম আলায়হিস্ সালাম নিজের এ দানের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এর ভিত্তিতে বলেছেন, "আমার এ দানের কথা মনে নেই।" 'স্মরণ থাকা' অস্বীকার করেছেন, দানের কথা অস্বীকার করেন নি। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদত্ত সংবাদকে অস্বীকার করাই কুফর হয়; (এখানে সংবাদের অস্বীকার নেই, নিজের স্মরণের অস্বীকৃতি রয়েছে মাত্র)। সুতরাং হাদীসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। সম্মানিত নবীগণের ভুল-ত্রুটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়, যাতে হাজারো হিকমত নিহিত।

১৭৯. অর্থাৎ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র দিক থেকে গাছ নির্ধারণের 'ইজতিহাদী' বা গবেষণাপ্রসূত ভুল হয়েছে; অর্থাৎ তিনি মনে করেছেন যে, 'আল্লাহ্ নির্দিষ্টভাবে এ নির্দিষ্ট গাছের ফল প্রসঙ্গে নিষেধ করেছেন, আর আমি তো অন্য গাছ হতে ফল খাচ্ছি' অথচ নিষেধাজ্ঞাটি ছিল- ওই জাতীয় সব গাছের প্রসঙ্গে। [মিরক্বাত]

অথবা তিনি মনে করেছিলেন যে, 'আমাকে আহার করতে, নিষেধ করা হয় নি, বরং নিকটে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।' যা-ই হোক না কেন, এটা ধোঁকাই হয়েছিলো। সেই ভুল ও ভুলে যাওয়া আজ পর্যন্ত মানুষের স্বভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে আসছে। এ হাদীস শরীফে এটা বলা হয় নি যে, অতঃপর ফয়সালা কি হয়েছিলো।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র বয়সসীমা এক হাজার বছর দেওয়া হয়েছিলো এবং হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামকেও দেওয়া হয় একশ' বছর। তাঁর পবিত্র বাক্য বৃথা যায় নি। যদি হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এমনও বলে দিতেন যে, আমাকে তো আরো এক হাজার বছর দুনিয়ায় থাকতে হবে, তাহলে তাঁর কথা মেনে নেওয়া হতো; যেমনটি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র ওফাতের ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়।

وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ حِيْنَ خَلَقَهٗ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنٰى فَاَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَآءَ كَاَنَّهُمُ الذَّرُّ وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرٰى فَاَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَآءَ كَاَنَّهُمُ الْحُمَمُ فَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ يَمِيْنِهٖ اِلَى الْجَنَّةِ وَلَا اُبَالِىْ وَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ كَتِفِهِ الْيُسْرٰى اِلَى النَّارِ وَلَا اُبَالِىْ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَعَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ اَنَّ رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهٗ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ دَخَلَ عَلَيْهِ اَصْحَابُهٗ يَعُوْدُوْنَهٗ وَهُوَ يَبْكِىْ فَقَالُوْا لَهٗ مَا يُبْكِيْكَ اَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ اَقِرَّهٗ حَتّٰى تَلْقَانِىْ قَالَ بَلٰى

১১২ ॥ হযরত আবূদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, হুযূর এরশাদ করেছেন, "যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদমকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর ডান কাঁধের উপর ক্বুদরতের হাত রাখলেন, এতে সাদা রঙের সন্তান-সন্ততি পিঁপড়ার মত বের হলো। আর বাম কাঁধের উপর ক্বুদরতের হাত রাখলেন। ফলে কয়লার মত কালো সন্তান-সন্ততি বের হলো।[১৮০] অতঃপর ডান দিকের সন্তানদের সম্পর্কে এরশাদ করলেন,এরা জান্নাতের দিকে যাবে। আমার কোন পরোয়া নেই। বাম কাঁধের সন্তানদের সম্পর্কে এরশাদ করলেন, এরা দোযখ অভিমুখী। আমার কোন পরোয়া নেই।[১৮১] [আহমদ]

১১৩ ॥ হযরত আবূ নাদ্বরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযূরের সাহাবীদের মধ্যে একজন সাহাবী, যাঁকে 'আবূ আবদুল্লাহ্' বলা হতো, অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে দেখার জন্য তাঁর এক বন্ধু গিয়েছিলেন। তিনি কাঁদছিলেন।[১৮৩] তখন এ সাহাবী বললেন, "কেন কাঁদছো? তোমাকে কি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হিস্ সালাম এটা বলেন নি, "তুমি নিজের গোঁফগুলো কাটাও। অতঃপর সেটা নির্ধারিতভাবে পালন করো এ পর্যন্ত যে, আমার সাথে মিলিত হবে।[১৮৪] তিনি বললেন 'হ্যাঁ'।

---

১৮০. এ ধরনের ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। একবার সমস্ত সন্তানের কপালে 'নূর-ই ফিত্বরী' (স্বভাবগত আলো)'র চমক ছিলো। ওইবার কাফিরগণ সম্পূর্ণ কালো ছিলো এবং মু'মিনগণ ছিলেন সাদা (উজ্জ্বল)। সুতরাং হাদীসগুলোতে কোন দ্বন্দ্ব নেই।[মিরক্বাত] তাদের অন্তরের অবস্থা চেহারায় প্রকাশ পেয়েছিলো। এ-ই রূপই ক্বিয়ামতে হবে। অর্থাৎ কাফিরগণ খুব কালো এবং মু'মিনগণ হবে সাদা (উজ্জ্বল)। এ থেকে দু'টি মাসআলা বুঝা গেলো: **এক.** হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র পিঠে সমস্ত মানুষের রূহসমূহ এবং মৌলিক অংশ মওজূদ ছিলো। ডানদিকে মু'মিনদের এবং বামদিকে কাফিরদের। **দুই.** হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সমস্ত বেহেশতী ও দোযখী সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

১৮১. অর্থাৎ মানুষ জান্নাতী হলেও আমার কোন লাভ নেই এবং জাহান্নামী হলেও কোন ক্ষতি নেই; লাভ-ক্ষতি তাদের নিজেদেরই। তাছাড়া, আল্লাহ্ তা'আলার উপর কোন কিছু ওয়াজিব নয়। তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।

১৮২. তিনি নাদ্বরা ইবনে মুনযির ইবনে মালিক মুত্তাহাদী। মহাসম্মানিত তাবে'ঈ। হযরত খাজা হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কিছু দিন পূর্বে বসরায় তাঁর জন্ম হয়। ১০৭ হিজরি সনে সেখানেই ওফাত পান।

১৮৩. মৃত্যুর ভয় কিংবা অসুখের কষ্টের কারণে নয়; বরং আল্লাহর ভয়ে। যেমনটি সামনের বিষয়বস্তু হতে সুস্পষ্ট হয়। ওই সময় এ অবস্থা আল্লাহর বিশেষ রহমত। ওই সব সাহাবীর নাম জানা যায় নি। প্রকাশ থাকে যে, রোগী দেখার জন্য যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সম্মানিত সাহাবী এবং তাবে'ঈও ছিলেন।

১৮৪. অর্থাৎ হে রসূলের সাহাবী! তুমি ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কা করছো কেন? তোমাকে তো হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দু'টি সুসংবাদ দিয়েই দিয়েছেন: একটি হচ্ছে তুমি বেহেশ্‌তী। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তুমি বেহেশ্‌তে হুযূরের নৈকট্য অর্জনকারী। স্মর্তব্য যে, দাড়ি লম্বা করা এবং

وَلٰكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَبَضَ بِيَمِيْنِهٖ قَبْضَةً وَّاُخْرٰى بِالْيَدِ الْاُخْرٰى وَقَالَ هٰذِهٖ لِهٰذِهٖ وَهٰذِهٖ لِهٰذِهٖ وَلَا اُبَالِىْ وَلَا اَدْرِىْ فِىْ اَىِّ الْقَبْضَتَيْنِ اَنَا. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَخَذَ اللّٰهُ الْمِيْثَاقَ مِنْ ظَهْرِ اٰدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِىْ عَرَفَةَ فَاَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهٖ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَءَهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ

কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হিস সালামকে এরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতের ডান হাতে এক মুষ্ঠি নিলেন এবং অপর হাতে আরেক মুষ্ঠি নিলেন।[১৮৫] আর বললেন, 'এটা এ জন্য আর ওটা এ জন্য[১৮৬] এবং আমার কোন পরোয়া নেই।' আমি জানিনা যে, আমি কোন মুষ্ঠিতে ছিলাম।"[১৮৭] [আহমদ]

১১৪ || হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে 'না'মান' অর্থাৎ আরাফাতে অঙ্গীকার নিলেন।[১৮৮] এভাবে যে, তাঁর পিঠ হতে সমস্ত সন্তানকে বের করলেন। তাদেরকে হযরত আদমের সামনে পিঁপড়ার মত ছড়িয়ে দিলেন।[১৮৯]

গোঁফ ছাঁটা এতটুকু হওয়া চাই যেন উপরের ঠোঁটের পুরো প্রান্ত পরিস্কার থাকে। এটা সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ, বরং ওয়াজিব। এটা নিয়মিতভাবে পালন করা বেহেশ্তী হওয়া এবং হুযূরের নৈকট্যধন্য হবার মাধ্যম; যেমনিভাবে সুন্নাত ত্যাগ করার অভ্যাস হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম থেকে দূরে সিটকে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৫. কুদরতের হাতে ওই মুষ্ঠি দু'টিতে মানবজাতির রূহসমূহ ছিলো। এ হাদীস দ্ব্যর্থবোধক তথা 'মুতাশা-বিহাত'র অন্তর্ভুক্ত। (যেগুলোর প্রকৃত মর্মার্থ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন)। আল্লাহ্ তা'আলা 'মুষ্ঠি'র বাহ্যিক অর্থ হতে পবিত্র।

১৮৬. অর্থাৎ যারা ডান মুষ্ঠিতে ছিলো তারা বেহেশতের জন্য এবং যারা অপর মুষ্ঠিতে ছিলো তাঁরা দোযখের জন্য।

১৮৭. ডান মুষ্ঠিতে, না বাম মুষ্ঠিতে? সুতরাং আমি কি বেহেশতী, না দোযখী? এখানে 'ইলম্'র অস্বীকৃতি নেই; বরং 'দিরায়াত' বা অনুধাবনের অস্বীকৃতি রয়েছে। 'দিরায়াত' ক্বিয়াস বা অনুমান দ্বারা জানাকে বলা হয়। হুযূরের সুসংবাদ দ্বারা তাঁদের নিজেদের বেহেশ্তী হবার নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়েছিলো। বর্তমানে সিদ্দীক্ব-ই আকবার ও ফারূক্ব-ই আ'যম জান্নাতী হবার উপর আমাদের ঈমান রয়েছে। যে ব্যক্তি তাঁরা জান্নাতী হবার বিষয়ে সন্দিহান সে বেঈমান।

তাঁর জবাবের মর্মার্থ এ যে, ওই মুষ্ঠি দু'টির বর্ণনা বিশিষ্ট হাদীস আমার সম্মুখে থাকার কারণে আমার দৃষ্টি এ সুসংবাদের প্রতি (নিবদ্ধ) ছিলো না। এ জন্যই আমি কাঁদছিলাম। স্মর্তব্য যে, ওইসব সম্মানিত সাহাবী কিংবা স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভয় আল্লাহর মহত্বের প্রতি ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়; আল্লাহর তিরস্কারের ভয় নয়। আল্লাহর ওয়াদাগুলোর প্রতি তাঁদের আস্থাহীনতা ছিলো না। যেমন, বাদশাহর প্রধানমন্ত্রীর মনে শাহী দরবারের ভক্তিপূর্ণ ভয় থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াদাসমূহের উপর ভরসা করে না সে কাফির। আল্লাহর মহত্বের (جَلَال) প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয় ঈমানী শক্তির প্রমাণ। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মধ্যে ফির'আউনের অত্যাচারের ভয় ছিলো; যদিও আল্লাহ্ তাঁকে হিফাযতের ওয়াদা দিয়েছিলেন। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা 'ইমকান-ই কিয্ব' (আল্লাহর জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব হওয়া)'র মাসআলা কখনোই প্রমাণিত হতে পারে না।☆

১৮৮. 'না'মান পাহাড়' মক্কা মু'আযযমা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান হতে শুরু হয়ে আরাফাত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পাহাড়ের উপর এ ঘটনা ঘটেছিলো। সুতরাং এ হাদীসও শুদ্ধ যে, আরাফাতে এ অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিলো এবং এটাও শুদ্ধ যে, তায়েফের নিকটে নেওয়া হয়েছিলো।

১৮৯. যা'তে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম সকলকে চিনতে পারেন এবং এ অঙ্গীকারের বচনগুলো শুনতে ও দেখতে পান।

☆ বর্তমানে ওহাবী-দেওবন্দী সম্প্রদায় এহেন বাতিল আক্বীদা পোষণ করে থাকে। মূলতঃ মু'তাযিলা সম্প্রদায়ই এ ভ্রান্ত ধারণার প্রবর্তক। ['বাওয়াদিরুন্ নাওয়াদির' কৃত. মৌং আশরাফ আলী থানভী, 'ফাতাওয়া-ই রশীদিয়া', কৃত মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, 'আল্ মানযূমাতুল্ মুখতাসারাহ' কৃত মৌং ফয়যুল্লাহ, হাটহাজারী।] খণ্ডনে 'শরহে মাওয়াক্বিফ।

ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا ﴿قَالَ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ﴾ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ اَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوْا ثُمَّ اَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ﴿اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى﴾ قَالَ فَاِنِّىْ اُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ وَاُشْهِدُ عَلَيْكُمْ اَبَاكُمْ اٰدَمَ

তারপর তাদের সামনাসামনি কথোপকথন করলেন। বললেন, "আমি কি তোমাদের রব নই?" সকলে বললো, "হ্যাঁ।" আমি এ মর্মে সাক্ষী রইলাম[১৯০] যেন তোমরা ক্বিয়ামতের দিন এটা না বলো যে, "আমরা এ সম্পর্কে অনবগত ছিলাম।" অথবা এটা না বলো যে, "আমাদের পূর্ব পুরুষরাই ইতোপূর্বে শির্ক করেছে, আমরা তো তাদের পরেই সৃষ্টি হয়েছি; তবে কি আপনি আমাদেরকে মিথ্যুকদের অপরাধে ধ্বংস করে দিচ্ছেন?"[১৯১] [আহমদ]

১১৫ || হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লার এ বাণী "যখন আপনার রব আদমসন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন" প্রসঙ্গে বলেছেন, তাদেরকে তিনি একত্রিত করেছেন, তাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন,[১৯২] অতঃপর তাদের আকৃতি তৈরি করলেন এবং বাকশক্তি দান করলেন।[১৯৩] তখন তারা কথা বললো। তারপর তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিলেন এবং তাদের নিজেদেরকে তাদেরই উপর সাক্ষী বানালেন।[১৯৪] এ মর্মে যে, 'আমি কি তোমাদের রব নই?' তারা বললো, "হ্যাঁ"। এরশাদ করলেন, "আমি তোমাদের উপর সাত আসমান ও সাত যমীন এবং তোমাদের পিতা আদমকে সাক্ষী বানাচ্ছি।[১৯৫]

---

১৯০. আল্লাহ্ ও বান্দার এ কথোপকথন মাধ্যম ব্যতীত এভাবে হয়েছিলো যে, বান্দারা আল্লাহ্‌কে দেখেছেন, যেমনটি قُبُلًا শব্দ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্‌কে রব বলার এ স্বীকারোক্তি সমস্ত বান্দা থেকে নেওয়া হয়েছিলো। যাদের মধ্যে সম্মানিত নবীগণ, বুযুর্গ ওলীগণ এবং সমস্ত মু'মিন অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাছাড়া, কাফিরগণও সেখানে শামিল ছিলো। হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'র অনুসরণের অঙ্গীকার শুধু সম্মানিত নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম থেকে নেওয়া হয়েছিলো এবং দ্বীন প্রচারের অঙ্গীকার বনী ইসরাঈলের আলিমদের থেকে নেওয়া হয়েছিলো। এই তিনটি অঙ্গীকারই ক্বোরআন-ই হাকীমে রয়েছে।

১৯১. অর্থাৎ তাওহীদের কথা তোমাদেরকে এখানে অবহিত করানো হয়েছে। তোমাদের কাছ থেকে এর স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়েছে। এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য সম্মানিত নবীগণ ও আসমানী কিতাবসমূহ প্রেরণ করা হবে। সুতরাং এখন কারো অজ্ঞতার অজুহাত দেখানোর সুযোগ রইলো না। এ থেকে বুঝা গেলো যে, তাওহীদে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য এবং কাফিরদের মৃত শিশুসন্তান দোযখী নয়।

১৯২. অর্থাৎ পুরুষ ও নারী অথবা তাদের আলাদা প্রকারভেদ করলেন। কাফির, মু'মিন, মুনাফিক্ব -সকলকে আলাদা আলাদাভাবে।

১৯৩. অর্থাৎ যে আকৃতি ও অবয়ব দুনিয়ায় হবে ওই আকৃতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো। অথবা কাফিরদেরকে কালো ও মুমিনদেরকে উজ্জ্বল এবং সম্মানিত নবীগণকে নূরানী আকৃতিতে বানানো হয়েছিলো, যাতে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম চিনতে পারেন।

১৯৪. একজনকে অন্যজনের উপর সাক্ষী অথবা প্রত্যেকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার সত্তার উপর সাক্ষী বানান।

১৯৫. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকে অথবা স্বয়ং আসমান ও যমীনকে। দ্বিতীয় অর্থটি অধিক গ্রহণীয়। কেননা, ওইগুলো থেকে প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই

اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهٰذَا اِعْلَمُوْا اَنَّهٗ لَآاِلٰهَ غَيْرِىْ وَلَا رَبَّ غَيْرِىْ وَلَاتُشْرِكُوْا بِىْ شَيْئًا اِنِّىْ سَاُرْسِلُ اِلَيْكُمْ رُسُلِىْ يُذَكِّرُوْنَكُمْ عَهْدِىْ وَمِيْثَاقِىْ وَاُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِىْ قَالُوْا شَهِدْنَا بِاَنَّكَ رَبُّنَا وَاِلٰهُنَا لَارَبَّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَآ اِلٰهَ لَنَا غَيْرُكَ فَاَقَرُّوْا بِذٰلِكَ وَرُفِعَ عَلَيْهِمْ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ

যাতে তোমরা ক্বিয়ামতে এ কথা না বলো যে, 'আমরা এ সম্পর্কে অবগত ছিলাম না।' জেনে রেখো! আমি ছাড়া না কোন মা'বূদ (উপাস্য) আছে, না কোন রব। কোন কিছুকে আমার সাথে সমকক্ষ স্থির করো না।[১৯৬] অতি সত্বর তোমাদের নিকট আমার পয়গাম্বরদের প্রেরণ করবো, যাঁরা তোমাদেরকে আমার দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে[১৯৭] এবং তোমাদের উপর আমার কিতাবগুলো অবতরণ করবো।"[১৯৮] তারা বলল, "আমরা এ মর্মে সাক্ষ্য দিলাম যে, তুমি আমাদের রব, আমাদের উপাস্য। তুমি ছাড়া না আমাদের কোন রব আছে, না মা'বূদ।"[১৯৯] অতঃপর সকলে এর স্বীকারোক্তি দিলো। হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে তাদের সামনে তাদেরকে দেখার জন্য উঠানো হলো।[২০০]

বোধশক্তি আছে। সুতরাং সাগরের বিন্দু বিন্দু পানি, যমীনের প্রতিটি নেককার ও বদকারকে বালুকণা চিনতে পারে। ক্বিয়ামতের দিন যমীন মানুষের আমলগুলোর সাক্ষ্য দেবে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, সমস্ত নবী, বিশেষতঃ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম, নিজের বংশধরদের আমলগুলো সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবেন। বুঝা গেলো যে, তাঁরা আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত আছেন। এ হাদীস শরীফের বিশ্লেষণ রয়েছে এ আয়াতে- وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا (আর এ রসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী।[২:১৪৩])

১৯৬. অর্থাৎ তোমাদের জন্য ক্বিয়ামতে কোন অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ বাকী রাখেন নি। তোমাদের এ স্বীকারোক্তির পক্ষেও শত শত সাক্ষী আছে এবং দুনিয়ার সমস্ত আমল সম্পর্কে অনেক সাক্ষী হবে। এখন তোমরা এ অজুহাতও রচনা করতে পারবে না যে, "আমাদের এ স্বীকারোক্তি স্মরণে ছিলো না,' এটাও না যে, "আমাদের জানা ছিলো না।" কেননা, আমাদের ডায়েরী লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং সম্মানিত নবীগণ, আসমান ও যমীন আমাদের আমলগুলো দেখে আমাদের সাক্ষী হয়ে যাচ্ছেন।

১৯৭. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ ওয়াদা পূরণ করেছেন যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হতে ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত দুনিয়া এক মুহূর্তও নবূয়তশূন্য ছিলো না।

স্মর্তব্য যে, নবীর যামানা এক জিনিস, নুবূয়তের যমানা অন্য জিনিস। আর নবীগণের পার্থিব জীবন হচ্ছে 'নবীর যমানা' এবং তাঁদের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকার সময় হচ্ছে 'নুবূয়তের যমানা'। সুতরাং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমাদের হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'র নুবূয়তের যমানা।

১৯৮. সম্মানিত নবীগণের মাধ্যমে। এখানে 'কুতুব' মানে আল্লাহর কালাম- 'সহীফা' হোক কিংবা সুবিন্যস্ত কিতাব হোক। যেমন- আসমান থেকে একশ'টি সহীফা এসেছে, চারটি কিতাব এবং কোন যুগই আল্লাহর কালাম থেকে শূন্য ছিলো না, এখনো নেই। কোন্ নবীর উপর ক'টি সহীফা নাযিল হয়েছে তা আমার তাফসীরে নঈমীতে দেখুন।

১৯৯. 'মিরক্বাত' প্রণেতা মহোদয় বলেছেন, এখানে 'শাহাদাত' মানে ইল্ম। অর্থাৎ আমি 'মুশাহাদা' (অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দর্শন) করার মাধ্যমে তোমার রবূবিয়াত (রব হওয়া) এবং 'মা'বূদিয়াত' (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে উপলব্ধি করেছি।

অথবা এর অর্থ 'সাক্ষ্য'। অর্থাৎ আমরা একে অপরের এ তাওহীদের স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষী হয়ে গেলাম।

২০০. এভাবে যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম উঁচুস্থানের উপর দাঁড়িয়ে এদের সকলকে উঁকি মেরে দেখেছেন এবং তাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে চিনে নিয়েছেন; যেমনটি পরবর্তী বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট হয়।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নিজের সকল সন্তানকে জানেন ও চিনেন। সুতরাং আমাদের হুযূরের ইল্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার অবকাশ রাখে না। হযরত আদমের সমস্ত ইল্ম আমাদের হুযূর মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ইলমের তুলনায় সমুদ্রের সামনে পানির বিন্দুর ন্যায়।

فَرَأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ وَحَسَنَ الصُّورَةِ وَدُونَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُشْكَرَ وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مِثْلَ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّورُ خُصُّوا بِمِيثَاقٍ اٰخَرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ إِلٰى قَوْلِهِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ

তখন তিনি ধনী, গরীব, সুন্দর ইত্যাদি দেখলেন।[২০১] তিনি আরয করলেন, "হে রব! তুমি স্বীয় বান্দাদের পরস্পর সমান করো নি কেন?" বললেন, "আমি ইচ্ছা করলাম যেন আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।"[২০২] তিনি তাদের মধ্যে নবীগণকে চেরাগের মত দেখলেন, যাদের উপর নূর ছিলো।[২০৩] তাঁদের থেকে রিসালাত ও নুবূয়ত সম্পর্কে অন্য এক বিশেষ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হলো। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী- "এবং যখন আমি নবীগণের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার নিলাম..." তাঁর বাণী 'মারয়াম-তনয় ঈসা' পর্যন্ত।[২০৪]

২০১. 'ধনী ও গরীব' বলতে সম্পদ, আমলসমূহ ও ঈমান সব কিছুর ক্ষেত্রে ধনী-গরীব বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নিজের অন্তরের ধনী ও গরীব- মু'মিন ও কাফির, মুত্তাক্বী ও গুনাহ্গার এবং সম্পদের দিক দিয়ে ধনী ও গরীব- বিত্তবান ও পরমুখাপেক্ষী, রাজা ও প্রজা, এভাবে সুশ্রী ও বিশ্রী ইত্যাদি দেখে নিয়েছেন। [মিরক্বাত]

স্মর্তব্য যে, এখানে 'ধনবান হওয়া' ও 'গরীব হওয়া' অন্তরের গুণাবলী, আর সুশ্রী ও সুন্দর হওয়া আকৃতিরই অবস্থা। আল্লাহ্ তা'আলা ওই দিন প্রত্যেকের আকৃতির উপর তার যাহেরী ও বাতেনী (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য) অবস্থাদি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। এতে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম অনায়াসে সকল মানুষের সকল অবস্থা অবলোকন করেছিলেন।

স্মর্তব্য যে, আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এসব জিনিস এরও পূর্বে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যেভাবে বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। হবেও না কেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাপেক্ষা বড় সাক্ষী এবং সমস্ত সৃষ্টির সর্বাধিক প্রত্যক্ষকারী।

২০২. অর্থাৎ মানবজাতির অবস্থাদির ভিন্নতা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং আমার প্রতিদান দেওয়ার মাধ্যম। তা এভাবে যে, প্রত্যেকে নিজের চেয়ে নীচু পর্যায়ের মানুষকে দেখে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, এ বলে- "হে খোদা, তোমার কৃতজ্ঞতা, আমি তার চেয়ে ভাল আছি।" যেমন, ধনীরা গরীবদের অভাব-অনটন দেখে কৃতজ্ঞতার সাজদা নিবেদন করবে এবং গরীবরা ধনীদের জটিল ও অতিরিক্ত হিসাবের কথা চিন্তা করে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এভাবে সুন্দর মানুষ কুৎসিৎ মানুষের অসৌন্দর্য দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং অসুন্দর মানুষ সুন্দরের বালা-মুসীবত দেখে সৌন্দর্য না পাবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। বাদশাহ্ প্রজাদের খালি হাত দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং প্রজারা বাদশাহ্র দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রম ইত্যাদি বিপদাপদ দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। 'শোকর' উঁচু স্তরের ইবাদত; বরং সমস্ত ইবাদতের মূল।

২০৩. 'নবী' 'রসূল' হতে ব্যাপক (عام)। যাঁর উপর ওহী আসে তিনি 'নবী' এবং যাঁদের প্রতি দ্বীন প্রচারেরও আদেশ এসেছে তাঁরা 'রসূল'। যে নবী স্বতন্ত্র শরীয়তেরও অধিকারী ছিলেন তিনি 'মুরসাল'। নবীর সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আর 'রসূল' তের জন এবং 'মুরসাল' চার জন। প্রত্যেক রসূল নবীও, পক্ষান্তরে প্রত্যেক নবী রসূল নন। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম সমস্ত নবীকে তাঁদের পূর্ণ মর্যাদা সহকারে দেখেছেন। কাউকে চেরাগের ন্যায়, কাউকে বাতির ন্যায়, কাউকে গ্যাস লাইটের ন্যায়, কেউকে বিজলীর ন্যায়, কাউকে চাঁদের ন্যায় এবং আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -কে সূর্যের ন্যায় দেখেছিলেন। কারো আলো চাঁদের মতো স্নিগ্ধ ছিলো এবং কারো আলো রোদের ন্যায় প্রখর ছিলো। এসব কিছু سُرُجٌ শব্দটির অন্তর্ভুক্ত।

২০৪. সম্মানিত নবীগণ থেকে বিশেষ দু'টি অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিলো: একটি রিসালাতের দায়িত্ব পালন ও নুবূয়তের প্রচারণার অঙ্গীকার। আমাদের হুযূরও এ অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এর বর্ণনা এ আয়াত শরীফে রয়েছে। আর দ্বিতীয়টি আখেরী যামানার নবীর উপর ঈমান আনা ও তাঁকে সাহায্য করার। আমাদের হুযূর এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। সকলের নিকট থেকে আমাদের হুযূরের উপর ঈমান আনার অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিলো। এর আলোচনা

كَانَ فِي تِلْكَ الْاَرْوَاحِ فَارْسَلَهُ اِلٰى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَحُدِّثَ عَنْ اُبَيٍّ اَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيْهَا - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَعَنْ اَبِي الدَّرْدَآءِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَاكَرُ مَا يَكُوْنُ اِذْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوْهُ وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَاتُصَدِّقُوْا بِهِ فَاِنَّهُ يَصِيْرُ اِلٰى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ

হযরত ঈসাও ওই রূহগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁকে বিবি মারয়ামের নিকট পাঠালেন। হযরত উবাই হতে জানা গেছে যে, তিনি হযরত মারয়ামের পবিত্র মুখ দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।[২০৫] [আহমদ]

১১৬ ॥ হযরত আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র দরবারে উপস্থিত ছিলাম এবং যা কিছু সংঘটিত হবার রয়েছে সে সবকিছুর আলোচনা করছিলাম।[২০৬] রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "যদি তোমরা শোনো যে, পাহাড় স্বীয় স্থান থেকে সরে গেছে তাহলে তা মেনে নাও আর যদি এটা শোনো যে, কোন মানুষ তার স্বভাবজাত অভ্যাস থেকে পরিবর্তিত হয়েছে, তাহলে তা মেনে নেবে না। সে আবার সেদিকেই ফিরে যাবে, যার উপর সে জন্মলাভ করেছে।"[২০৭] [আহমদ]

১১৭ ॥ হযরত উম্মে সালামাহ[২০৮] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি আরয করলেন,

উক্ত আয়াতের এ অংশে আছে- ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ (الْاٰيَة) (অতঃপর তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন ওই রসূল...।৩:৮১।)

২০৫. অর্থাৎ সমস্ত রূহ স্বীয় পিতার পৃষ্ঠদেশে ফিরে গেলো; কিন্তু হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম'র রূহ মুবারক হযরত মারয়াম'র গর্ভে, তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে প্রবেশ করেছে। কেননা, তাঁর জন্ম পিতা ব্যতীতই হবার ছিলো।

২০৬. অর্থাৎ দুনিয়ার ঘটনাবলী পূর্ববর্তী ফয়সালা অনুযায়ী হচ্ছে, না ঘটনাচক্রে হচ্ছে? কিন্তু এ আলোচনা তর্ক-মুনাযারা হিসেবে ছিলো না; বরং গবেষণার জন্য ছিলো। এ জন্য হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুনতে রইলেন, বারণ করেননি; বরং একটি মাসআলার চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছেন।

বুঝা গেলো যে, 'ইলমুল কালাম' (দর্শনশাস্ত্র) পড়া নিষিদ্ধ নয়। তাক্বদীরের মাসআলা নিয়ে বাদানুবাদ করা নিষেধ। যেমন পূর্ববর্তী হাদীসগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয়।

২০৭. মাসআলার সারকথা হলো যে, দুনিয়ার ঘটনাবলী পূর্ববর্তী ফয়সালা (অদৃষ্টলিখন) অনুযায়ী সংঘটিত হচ্ছে এবং ওই ফয়সালাই অটল, যাতে পরিবর্তন অসম্ভব।

স্মর্তব্য যে, মানুষের দু'টি অবস্থা রয়েছে:

এক. 'স্বত্তাগত' (ذَاتِي)

দুই. 'গুণগত' (وَصْفِي)।

গুণগত (وَصْفِي) অবস্থাদি দিনরাত পরিবর্তিত হতে থাকে। কাফির মু'মিন হয়ে যায়, ফাসিক্ব মুত্তাক্বী হয়, কৃপণ দানশীল হয়ে যায়, কাপুরুষ বীরপুরুষ হয়।

কখনো বুযুর্গদের সংস্পর্শের কারণে, কখনো ইলমের বরকতে, আবার কখনো নিরেট আল্লাহর ক্বুদরতে (এ পরিবর্তন ঘটে)। কিন্তু মূল অবস্থা কখনো পরিবর্তিত হতে পারে না। যদি কখনো সাময়িকভাবে বদলেও যায়, তাহলে তা স্থায়ী হবে না।

আগুনের উপর পানি গরম হয়ে যায়। কিন্তু সেখান থেকে সরানোর সাথে সাথে আবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এখানে মূল অবস্থার কথা বলা হয়েছে। আর جُبِلَتْ দ্বারা ওই স্বভাবের কথা বুঝানো উদ্দেশ্য, যা আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে, যা'তে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অসম্ভব।

২০৮. তাঁর নাম 'হিন্দ্ বিনতে আবী উমাইয়া'। প্রথমে 'আবূ সালমা'র বিবাহাধীন ছিলেন। চতুর্থ হিজরীতে বিধবা হন। ওই চতুর্থ হিজরীতেই শাওয়াল মাসের শেষের দিকে হুযূরের বিবাহাধীন হন। ৫৯ হিজরীতে মদীনা পাকে ওফাত পান। জান্নাতুল বক্বী'তে দাফন হন। ৮৪ বছর বয়স পান। বহু সাহাবী ও তাবে'ঈ তাঁর থেকে হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَايَزَالُ يُصِيْبُكَ فِيْ كُلِّ عَامٍ وَّجَعٌ مِّنَ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِيْ اَكَلْتَ قَالَ مَا اَصَابَنِيْ شَيْءٌ مِّنْهَا اِلَّا وَهُوَ مَكْتُوْبٌ عَلَيَّ وَاٰدَمُ فِيْ طِيْنَتِهٖ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

……◆……

بَابُ اِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ
اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

"এয়া রসূলাল্লাহ্! প্রত্যেক বছর আপনার ওই বিষমিশ্রিত ছাগলের কষ্ট অনুভূত হয়, যা আপনি (খায়বরে) খেয়েছিলেন।"[২০৯] হুযূর এরশাদ করলেন, "আমার নিকট ওই জিনিস ব্যতীত কিছুই পৌঁছে না, যা আমার অদৃষ্টে ওই সময়ই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো, যখন হযরত আদম আপন খামীরে ছিলেন।"[২১০] [ইবনে মাজাহ্]

……◆……

অধ্যায় : কবর আযাবের প্রমাণ[১]
প্রথম পরিচ্ছেদ

২০৯. ঘটনার বিবরণ এ যে, একজন ইহুদী মহিলা খায়বরে ধোঁকা দিয়ে বিষমিশ্রিত ছাগলের গোশ্ত হুযূরকে খাইয়েছিলো। একজন সাহাবীও খেয়েছিলেন, যিনি শহীদ হয়ে যান। আল্লাহর কৃপায় হুযূর নিরাপদে রইলেন; কিন্তু প্রতি বছর বিষক্রিয়া অনুভূত হতো। এমনকি ওফাতের সময়ও এ বিষের প্রভাব প্রকাশ পেয়েছিলো। ইনশা-আল্লাহ্ -এর বিস্তারিত বিবরণ মু'জিযা বিষয়ক অধ্যায়ে আসবে।

২১০. সুতরাং এটা বলা যাবে না যে, আমি যদি খায়বরে না যেতাম, তবে বিষ খেতাম না। খায়বরে যাওয়া ও সেখানে বিষ খেয়ে নেওয়া সবকিছুই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো।

১. কবরের আযাব সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা স্মরণ রাখা দরকার: **এক.** এখানে 'কবর' মানে 'বরযখ জগৎ,' যার প্রারম্ভ প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু থেকে হয় এবং পরিসমাপ্তি ক্বিয়ামত দিবসে। এখানে প্রচলিত 'কবর' বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যে সকল মৃত ব্যক্তির দাফন হয় নি, বরং জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে- অথবা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, তারও কবরের হিসাব ও আযাব হবে। **দুই.** কবর-আযাবের প্রমাণ বহু আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ...الاية (আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে দৃঢ় উক্তির উপর অটল রাখবেন...।১৪:২৭) আরো এরশাদ ফরমান- مِمَّا خَطِيْئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا (তাদেরকে তাদের কেমন পাপরাশির কারণে নিমজ্জিত করা হয়েছে! অতঃপর আগুনে প্রবেশ করা হয়েছে।৭১:২৫।) অন্যত্র এরশাদ ফরমান, اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا (আগুন, যার উপর তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয়।৪০:৪৬।) -এ সব আয়াত কবর-আযাব প্রসঙ্গে অবতীর্ণ। দেখুন, আমার লিখিত 'ফিহরিস্তে ক্বোরআন' এবং 'ফতোয়া-ই ন'ঈমিয়া'। সুতরাং কবর আযাবকে অস্বীকারকারী গোমরাহ্। **তিন.** কবরে শুধু ঈমানের হিসাব, হাশরে ঈমান ও আমল দু'টিরই হিসাব (নেওয়া হবে)। **চার.** কবরের হিসাব আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যুগ হতে আরম্ভ হয়েছে; পূর্ববর্তী উম্মতদের না এ হিসাব, না নিজের নবীর সাথে পরিচয় করানো হতো। **পাঁচ.** কবরের হিসাব আট প্রকৃতির লোক থেকে নেওয়া হয়না- নবী, শহীদ, জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণকারী, মহামারী রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ও মহামারীতে ধৈর্যধারণকারী, শিশুসন্তান, জুমু'আর দিন বা রাতে মৃত্যুবরণকারী, প্রতি রাতে সূরা মুলক তিলাওয়াতকারী, মৃত্যুর রোগে 'ক্বুল্ হুয়াল্লাহ' (সূরা ইখলাস) তিলাওয়াতকারী। [ফাতাওয়া-ই শামী] **ছয়.** কবরের হিসাব এক জিনিস, কবরের আযাব অন্য জিনিস। কিছু লোক কবরের হিসাবে সফল হবে, কিন্তু কিছু গুনার কারণে আযাবে লিপ্ত হবে। যেমন- চোগলখোর ও অপবিত্র লোক। **সাত.** কাফিরের কবর আযাব চিরস্থায়ী হবে, গুনাহগার মু'মিনদের সাময়িক। এমনকি কারো কারো আযাব জুমু'আর রাত আসতেই শেষ হয়ে যায়। এজন্য দাফনের পর থেকে জুমু'আর রাত পর্যন্ত কবরের পাশে ক্বোরআন তিলাওয়াত করানো হয়। **আট.** হাশরের পর বান্দাদেরকে বেহেশ্ত কিংবা দোযখে প্রবেশ করিয়ে সাওয়াব কিংবা আযাব দেওয়া হবে। 'বরযখ' (কবর

عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُسْلِمُ اِذَا سُئِلَ فِى الْقَبْرِ يَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ ﴿ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ﴾ -وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ﴿ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ﴾ نَزَلَتْ فِىْ عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهٗ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ وَنَبِيِّىْ مُحَمَّدٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১৮ ॥ হযরত বারা ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত।[২] তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, হুযূর এরশাদ করলেন, মুসলমানকে যখন কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তখন সে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল।[৩] এর প্রমাণ হচ্ছে- মহান আল্লাহ্‌র এ বাণী- "আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে দৃঢ় উক্তির উপর অটল্ রাখবেন পার্থিব জীবনে এবং পরকালে।"[৪] আর হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে অন্য একটি বর্ণনা এ মর্মে এসেছে যে, তিনি এরশাদ করেন, 'আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে দৃঢ় উক্তির উপর অটল রাখবেন' -এ আয়াত কবরের আযাবের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।[৫] কবরে মৃত ব্যক্তিকে বলা হয়, "তোমার রব কে?" তখন সে বলে, "আমার রব আল্লাহ্ এবং আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।"[৬] [বোখারী, মুসলিম]

জগত)-এ জান্নাত কিংবা দোযখের সাওয়াব কিংবা আযাব কবরে পৌঁছবে। মৃতের শরীর সেখানে পৌঁছে না। সুতরাং এ আযাব ও সাওয়াবের মধ্যে পার্থক্য আছে।
নয়. কবরের আযাব রূহে হবে, শরীর সেটার আনুষঙ্গিক, কিন্তু হাশরের পরের আযাব কিংবা সাওয়াব দেহ ও আত্মা উভয়েই হবে।
২. তাঁর নাম বারা। উপনাম 'আবূ 'ওমারাহ্', তিনি আনসারী ও হারেস গোত্রের লোক। খন্দক ও উহুদসহ (সর্বমোট) পনেরটি যুদ্ধে হুযূরের সাথে ছিলেন। ফারূক্ব-ই আ'যমের খেলাফতকালে কূফায় অবস্থান করেন। ২৪ হিজরী সনে 'রাই' (তেহরান) তিনিই জয় করেন। হযরত আলী মুরতাদ্বার খেলাফতকালে উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ এবং নাহরাওয়ানে হযরত আলী মুরতাদ্বার সাথে ছিলেন। কূফায় তাঁর ওফাত হয়।
৩. কবরে প্রশ্নকারী ফিরিশ্‌তা দু'জন হলেন- 'মুন্‌কার' ও 'নাকীর'। তাঁরা তাওহীদ, রিসালাত এবং দ্বীন সম্পর্কে পরীক্ষা নেন। এ জবাব সাধারণ মু'মিনদের, যা এখানে এরশাদ হয়েছে। কোন কোন আশিক্ব জামাল-ই মুস্তফা দেখার সাথে সাথেই উঠে আত্মহারা হয়ে যান এবং তেমনিভাবে তাওয়াফ করেন, যেমন ফড়িং বাতির অথবা হাজ্বীগণ কা'বা ঘরের। যেভাবে বুযুর্গদের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা স্বপ্নযোগে মানুষকে তাঁদের প্রশ্নের বিবরণ এমন পদ্ধতিতে দিয়েছিলেন যে, তা শুনে গা শিয়রে ওঠে।
৪. এখানে 'আখিরাত' মানে কবর। অর্থাৎ কবরে কেউ নিজের প্রচেষ্টায় সফলকাম হতে পারে না। কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমেই সফলতা অর্জিত হবে। অর্থাৎ মু'মিনদের জীবনে এবং কবরে কলেমা-ই শাহাদাতের উপর আল্লাহ্ তা'আলাই অটল রাখেন।
নতুবা দুনিয়ার বহু অবস্থা এবং কবরের কঠিন প্রশ্নাবলী তাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার মতই। 'ক্বওল-ই সাবিত' মানে 'কলেমা-ই ত্বায়্যিবাহ্'। যেহেতু কবরে শুধু ঈমান- আক্বীদার পরীক্ষা হবে, সেহেতু আমলসমূহের উল্লেখ করা হয় নি।
৫. অর্থাৎ কবরের আযাব ও সাওয়াবের প্রমাণ হিসেবে; অন্যথায় এ আয়াত ওইসব মু'মিনের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা কবরের আযাব হতে নিরাপদ। সুতরাং, আলোচ্য হাদীসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।
৬. দুনিয়ায় পরীক্ষার প্রশ্নগুলো পরীক্ষার পূর্বে গোপন রাখা হয়, যাতে কেউ উত্তর চিন্তা-ভাবনা করে রাখতে না পারে। আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম এ পরীক্ষার প্রশ্নগুলোও প্রকাশ করে দিয়েছেন, ওইগুলোর উত্তরও বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদের হুঁশ তখনও বহাল রাখুন! এবং এ জানিয়ে দেওয়া উত্তরগুলোও যেন স্মরণ হয়।

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهٗ اَنَّهٗ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهٖ

১১৯ ॥ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং তার সাথী-বন্ধুরা ফিরে যায়, তখন সে তাদের জুতোর শব্দও শুনতে পায়।[৭] তার কাছে দু'জন ফেরেশ্‌তা আসে। তারা তাকে বসায়।[৮]

৭. এ থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো: **এক.** মৃতরা শুনতে পায়। মৃতদের শোনা পবিত্র ক্বোরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত শো'আইব ও হযরত সালিহ্ আলায়হিমাস্ সালাম আযাবপ্রাপ্ত গোত্রের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ...الاية (হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি...। [৭:৯৩]) আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেন, وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا অর্থাৎ "হে মাহবূব! আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরকে জিজ্ঞেস করুন।[৪৩:৪৫]" বরং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে বলা হয়েছিলো, ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا "যবেহকৃত প্রাণীগুলোকে ডাকুন, সেগুলো দৌঁড়ে আসবে।[২:২৬০]" এ হাদীস শরীফ মৃতরা শোনেন মর্মে সুস্পষ্ট নাস্ (প্রমাণ)। আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বদর প্রান্তরে নিহত কাফিরদের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে কথা বলেছেন।

স্মর্তব্য যে, মৃতদের এ শ্রবণশক্তি সর্বদা থাকে। এ জন্য শরীয়তের বিধান হচ্ছে, কবরস্থানে গিয়ে মৃতদেরকে ('আস্সালামু আলায়কুম্ এয়া আহ্লাল্ ক্বুবূর' বলে) সালাম করবে। অথচ যারা শুনেনা তাদেরকে সালাম কীভাবে করবে? যেসব আয়াতে মৃতদের শোনার ব্যাপারে অস্বীকৃতি রয়েছে, সেখানে মৃত মানে 'অন্তরের মৃত' অর্থাৎ কাফির। 'শোনা' মানে গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়া। এ জন্যই যেখানে ক্বোরআন মজীদ বলেছে اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى "আপনি মৃতদের শোনাতে পারবেন না।" সেখানে সাথে সাথে এটাও বলে দিয়েছেন, اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا অর্থাৎ "আপনি শুধু মু'মিনদেরকেই শোনাতে পারবেন।" এতে বুঝা গেলো যে, উক্ত আয়াতে 'মৃত' মানে কাফির। 'মিরক্বাত' প্রণেতা এখানে লিখেছেন, মৃতব্যক্তি তার গোসলদাতা, জানাযায় অংশগ্রহণকারী, বহনকারী ও দাফনকারীদেরকে জানেন ও চিনেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা 'সবুজ গম্বুজ শরীফে' হযরত ওমরের দাফন হবার পর পর্দা সহকারে প্রবেশ করতেন, আর বলতেন, "আমি ওমরের প্রতি লজ্জা বোধ করি।" বুঝা গেলো যে, মৃতরা দেখেনও। ইমাম-ই আ'যম মৃতদের শোনার পক্ষে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন নি; বরং শোনার ধরনের ব্যাপারে (বিরত ছিলেন); যেমনটি এখানে 'মিরক্বাত' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। **দুই.** মৃত্যুর পর শক্তি বেড়ে যায়। যেমন- হাজার হাজার মন মাটির নিচে দাফন হওয়া সত্ত্বেও মৃতরা মানুষের জুতোর আওয়াজ শুনতে পায়। সুতরাং যে সম্মানিত ওলীগণ তাঁদের পার্থিব জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে দেখতে পান, তাঁরা ওফাতের পর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আরশ-ই আ'যম পর্যন্ত অবশ্যই খবর রাখেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত, প্রতি বৃহস্পতিবার মৃত ব্যক্তিদের রূহ তাদের নিকটাত্মীয়দের ঘরে পৌঁছে তাদের রূহে সাওয়াব পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। [আশি''আতুল লুম'আত: বা-বু যিয়ারাতিল ক্বুবূর]

মি'রাজের রাতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে সমস্ত নবী, এরপর মুহূর্তের মধ্যে আসমানে বিশিষ্ট নবীগণ সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। এ গতি ওফাতপ্রাপ্তদের রূহের শক্তি। নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর ওই উপস্থিতি ছিলো সশরীরে।

৮. এ পবিত্র বাণী হতে দু'টি মাসআলা প্রতীয়মান হয়:

এক. কবরের হিসাব সকল মানুষ ফিরে আসার পর শুরু হয়। সুতরাং যদি কেউ কবরের পাশে থেকে যায়, তাহলে আল্লাহ্‌র রহমতে আশা করা যায় যে, ওই মৃতলোকের কবরের হিসাব হবে না। এ জন্যেই কেউ কেউ দাফনের পর থেকে জুমু'আর রাত পর্যন্ত কবরের পাশে হাফিয-ই ক্বোরআন বসিয়ে রাখেন -এ আশায় যে, হয়তো তাঁদের উপস্থিতির কারণে হিসাব এবং তিলাওয়াত-ই ক্বোরআনের বরকতে আযাব হবে না।

দুই. মুনকার-নাকীর ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের মধ্যে এমন শক্তি আছে যে, একই সময়ে তাঁরা হাজার-হাজার স্থানে যেতে পারেন, হাজার হাজার কবরে একই সময়ে উপস্থিত হয়ে সকল মৃত ব্যক্তি হতে হিসাব নিয়ে নেন। এরই নাম 'হাযির-নাযির'। সুতরাং যদি সম্মানিত নবী ও ওলীগণ একই সময়ে কয়েক স্থানে উপস্থিত হন তাহলে কোন অসুবিধা নেই এবং এমন আক্বীদা শির্কও নয়।

স্মর্তব্য যে, মুনকার-নাকীর মৃতের মধ্যে রূহ সংযুক্ত করেন, যাতে সে জীবিত হয়ে বসে যায় এবং কথাবার্তা বলে; কিন্তু

فَيَقُوْلَانِ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ـ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ ـ فَيُقَالُ لَهٗ اُنْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ

তারপর বলে, 'তুমি এ মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলতে? অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম,[৯] তখন মু'মিন বলে দেয়, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর প্রিয়বান্দা ও তাঁর রসূল।"[১০] তখন তাকে বলা হয়, "তুমি স্বীয় দোযখের ঠিকানা দেখো, যাকে আল্লাহ্ জান্নাতের ঠিকানা দ্বারা পরিবর্তিত করে দিয়েছেন।"[১১]

এ 'জীবিত হওয়া' আমরা অনুভব করতে পারি না। আর যাদেরকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিংবা বাঘে খেয়ে ফেলেছে তাদের মৌলিক অঙ্গগুলোর সাথে রূহের সম্পর্ক করে দেওয়া হয় এবং তার নিকট থেকে হিসাব নেওয়া হয়। আলোচ্য হাদীসে পাকে কোন ভিন্ন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। মায়ের গর্ভে ফিরিশ্তা সন্তান তৈরি করে যান। তাক্বদীর লিখে যান। অথচ মা সে সম্পর্কে অবগত থাকে না। 'আলম-ই আমর (নির্দেশ জগত)'র বিষয়াদি এসব চোখে দেখা যায় না।

আল্লামা ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'ফাতহুল বারী' কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, "মৃত ব্যক্তির রূহ স্থাপনকারী হলেন 'রূমান' নামক ফিরিশ্তা। তখন তার মনে হবে যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। তখন সে দেখতে পাবে- দিনের শেষে সূর্য ডুবে যাচ্ছে ও আসরের নামাযের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। এদিকে মুনকার-নাকীর তাকে প্রশ্ন করতে চাইলে সে বলবে, "একটু অপেক্ষা করো, আমি আসরের নামায সম্পন্ন করে নিই।" তখন ওই ফিরিশ্তাদ্বয় একে অপরের দিকে তাকাবে আর বলবে, লোকটি দ্বীনদার-নামাযী। তাঁকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই।" [ফাতহুল বারী শরহে বোখারী]

৯. এটা هٰذَاالرَّجُل-এর বিশ্লেষণ। যা হুযূর স্বয়ং বলেছেন, কোন বর্ণনাকারীর বিশ্লেষণ নয়। অন্যথায় তিনি 'রসূলুল্লাহ' অথবা 'নাবীয়্যুল্লাহ' বলতেন। [মিরক্বাত]

এ থেকে কয়েকটি মাসআলা জানা গেলো: **এক.** কবরের হিসাব হুযূর হতে নেওয়া হয় নি। কেননা, হুযূরকে চেনার নামই তো হিসাব। সুতরাং তাঁর থেকে কিভাবে হিসাব নেওয়া হবে? **দুই.** প্রত্যেক মৃতকে খুব কাছাকাছি অবস্থান থেকে হুযূরের যিয়ারত করানো হয়। যেমন, তা هٰذَا দ্বারা বুঝা গেলো। هٰذَا সেখানেই বলা হয়, যেখানে বস্তু দেখাও যায়, কাছেও থাকে। **তিন.** হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একই সময়ে সকলের কবরে পৌঁছতে পারেন। অথবা একই সময়ে সকলের দৃষ্টিগোচর হতে পারেন। যেমন সূর্যের আলো একই সময়ে লক্ষ লক্ষ স্থানে বিদ্যমান হয় এবং একই সময়ে স্বয়ং সব জায়গা থেকে দেখা যায়। এ থেকে 'হাযির-নাযির'-এর মাসআলা বুঝা গেলো। **চার.** ফিরিশ্তারা খোদ হুযূরেরই সাক্ষাৎ করান, তাঁর ছবির নয়। কেননা, ব্যক্তি (رَجُل) শব্দটি না ছবির জন্য ব্যবহৃত হয়, না ওই ছবির নাম 'মুহাম্মদ', না ওই ছবি নবী? যেমনিভাবে পাথরকে খোদা বলা শির্ক, তেমনি কোন ছবিকে নবী বলাও কুফর। আশিক্বগণ কবরে হুযূরের ওই সাক্ষাতের আশায় মৃত্যু কামনা করেন এবং আশিক্বদের মৃত্যুকে 'ওরস' বলা হয়। অর্থাৎ ওই দিন হচ্ছে বরযাত্রার দিন, অথবা বরের মিলনের খুশির দিন।

১০. অর্থাৎ যার খাতিমাহ (জীবনের পরিসমাপ্তি) ঈমানের সাথে হয়েছে, সে হুযূরকে দেখুক কিংবা না-ই দেখুক, ঈমানী নূর দ্বারা তাঁকে চিনতে পারবে এবং ব্যাকুল হয়ে বলতে থাকবে, "ইনি ওই মহান নবী, আমি যাঁর কলেমা পড়েছিলাম।" কোন কোন আশিক্ব বলে ফেলবেন, "আমি আজীবন তাঁকে রসূলুল্লাহ মেনেছি, এখন তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি আমাকে দয়া করে স্বীয় উম্মত বলছেন কিনা?" যেমনটি কোন কোন সূফীর কাশ্ফ দ্বারা প্রমাণিত।

১১.আল্লাহ্ প্রত্যেক বান্দার দু'টি ঠিকানা রেখেছেন একটি জান্নাতে, অপরটি দোযখে। কাফির নিজের ঠিকানাও আয়ত্ব করবে এবং মু'মিনদের দোযখস্থ ঠিকানাও। আর মু'মিন জান্নাতে স্বীয় ঠিকানা এবং কাফিরের জান্নাতী ঠিকানাও আয়ত্ব করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন (জান্নাতীরা বলবে)-وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ (এবং [আল্লাহ্] আমাদেরকে এ ভূমির অধিকারী করেছেন।[৩৯:৭৪])

আরো এরশাদ করেছেন- اِنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ (এ ভূমির অধিকারী আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ হবে।[২১:১০৫])

এখানে 'যমীন' দ্বারা বেহেশতের যমীন বুঝানো উদ্দেশ্য। আর 'ওয়ারিস হওয়া' মানে কাফিরের অংশেরও মালিক হওয়া। আলোচ্য হাদীসের মর্মার্থ এটাই।

فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَّاَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهٗ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لَاۤاَدْرِىْ، كُنْتُ اَقُوْلُ مَايَقُوْلُ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهٗ لَادَرَيْتَ لَاتَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَّلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهٗ لِلْبُخَارِىْ

তখন সে ওই উভয় ঠিকানা দেখে নেয়।[১২] কিন্তু মুনাফিক্ব ও কাফিরদেরকে বলা হয়, "এ মহান ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে?"[১৩] সে বলে, "আমি জানিনা, লোকে যা বলতো আমিও তা বলতাম।"[১৪] তখন তাকে বলা হয়, "না তুমি চিনলে, না ক্বোরআন পড়লে।"[১৫] "আর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা প্রহার করা হয়, যাতে সে এমন চিৎকার করে যে, জিন্ ও ইনসান ছাড়া তার নিকটবর্তী সবকিছুই তা শুনতে পায়।"[১৬]

[বোখারী, মুসলিম। তবে হাদীসের বচন বোখারী শরীফের]

অর্থাৎ যদি তুমি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এখানে চিনতে না পারতে, তাহলে দোযখে এখানে থাকতে। এটা এ জন্য বলা হয় যেন মু'মিনের আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায়।

১২. অর্থাৎ মৃতব্যক্তি স্বীয় কবর হতে দোযখ ও বেহেশ্ত স্বচক্ষে দেখতে পায়। অথচ এ ঠিকানা কবর (পৃথিবী) হতে কোটি কোটি মাইল দূরে। যখন মৃতের দূরদৃষ্টির এ অবস্থা, তখন যদি সে সমগ্র পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীদেরকে দেখে, তাহলে তাতে আশ্চর্য বোধ করার কী আছে? আজো হুযূর-ই আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সব উম্মতের সমস্ত অবস্থা দেখছেন এবং তাদের সমস্ত কথা শুনছেন। এ জন্য প্রত্যেক নামাযী প্রত্যেক স্থান হতে তাঁকে নামাযের অভ্যন্তরেই সালাম আরয করে থাকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ অর্থাৎ হে নবী! আপনার উপর সালাম।

১৩. এ থেকে জানা যায় যে, কবরে এ ইঙ্গিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (حسيّة) হয়, না বিবেকগ্রাহ্য (عقليّة), না কাল্পনিক (وهميّة)। অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বাস্তব সৌন্দর্য দেখিয়েই জিজ্ঞেস করেন। নিছক মনগড়া ও কাল্পনিক বিষয়ের প্রতি ইশারা করেন না। কেননা, কাফিরদের অন্তরে হুযূর সম্পর্কে আদৌ ধারণা নেই। যদি তার সামনে হুযূর মুস্তফার বাস্তব সৌন্দর্য বিদ্যমান না হয়, তবে সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলবে, "কার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো? এখানে তো কেউ নেই"-এ হাদীস হুযূরের 'হাযির-নাযির' হবার পক্ষে এমন শক্তিশালী দলীল যে, অস্বীকারকারীদের পক্ষে কস্মিনকালেও এর খণ্ডন সম্ভবপর হবে না ইন্শা-আল্লাহ্। সূর্য একই সময়ে লক্ষ লক্ষ আয়নায় আলোকচ্ছটা প্রতিফলিত করতে পারে। সুতরাং নুবূয়তের সূর্যও লক্ষ লক্ষ কবরে একই সময়ে আলোক বিকিরণ করতে পারেন।

১৪. যদিওবা কাফির জীবনভর হুযূরকে দেখতে পায়, কিন্তু কবরে চিনতে পারবে না। যেমন- আবূ জাহ্ল, আবূ লাহাব প্রমুখ। কেননা, সেখানে কবরে হুযূরের পরিচিতি ঈমানী সম্পর্কের ভিত্তিতেই হবে। মজার বিষয় হলো, কাফিরগণ সেখানে স্বীয় কুফরের কথাও ভুলে যাবে। এটা বলতে পারবে না, "আমি তাঁকে আমার মত মানুষ, কিংবা বড়ভাই তুল্য অথবা যাদুকর ও উন্মাদ বলতাম।" বরং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলবে, "আমার স্মরণ নেই, আমি তাঁকে কি বলতাম। যা অন্য লোকেরা বলতো আমিও তাই বলতাম।"

১৫. تَلَيْتَ মূলত تَلَوْتَ ছিলো। دَرَيْتَ এর সাথে সাদৃশ্য রক্ষার জন্য সেটার 'واو'কেও 'ى' দ্বারা পরিবর্তিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর নুবূয়তের পক্ষে তো যুক্তিগ্রাহ্য দলীলও প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তাঁর মু'জিযা ইত্যাদি, শরীয়তের বর্ণনা ভিত্তিক দলীলাদি ও ক্বোরআনের আয়াতসমূহ রয়েছে। তুমি জীবনে না তাঁকে তোমার বিবেক দ্বারা চিনতে পেরেছো, না ক্বোরআনের দিক-নির্দেশনা দ্বারা মেনে নিয়েছো, না আলিমদের অনুসরণ করেছো। প্রকাশ থাকে যে, এখানে পুরো আলোচনাটি কাফির ও মুনাফিক্বের প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এতে কোন প্রকারের ভিন্ন ব্যাখ্যা ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।

১৬. অর্থাৎ যেহেতু জিন্ ও মানুষের উপর ঈমান ও শরীয়তের বিধানাবলী বর্তায় এবং ঈমান বিল্ গায়ব (না দেখে বিশ্বাস করা) আবশ্যক, সেহেতু কবরের আযাব এবং কাফির মৃতের শোর-চিৎকার এবং আর্তনাদও তাদের থেকে গোপন রাখা হয়েছে, যাতে এ 'গায়ব' (অদৃশ্য) 'শাহাদাত' (প্রকাশ্য) না হয়ে যায়। তাঁরা ব্যতীত অন্য সব নিকটবর্তী প্রাণী, বরং গাছ-পাথর ইত্যাদিও এ আওয়াজ শুনতে পায়।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَامَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ- فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

১২০ || হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মারা যায়, তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে তার ঠিকানা পেশ করা হতে থাকে।[১৭] যদি জান্নাতী হয়, তাহলে জান্নাতের ঠিকানা এবং যদি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে দোযখের ঠিকানা।[১৮] অতঃপর তাকে বলা হয়, 'এটা তোমার ঠিকানা। তোমাকে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সেখানে পাঠাবেন।'"[১৯] [বোখারী, মুসলিম]

১২১ || হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, এক ইহুদী মহিলা তাঁর নিকট হাযির হলো[২০] এবং সে কবরের আযাব সম্পর্কে আলোচনা করলো[২১] আর তাঁকে বললো, "আল্লাহ্ তোমাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন!"

স্মর্তব্য যে, প্রত্যেক কবরে সাওয়াল-জাওয়াব করার জন্য দু'জন ফিরিশ্তা যান, যেন তারা সাক্ষীও হয়ে যান; কিন্তু হাতুড়ি দ্বারা প্রহারকারীরা হলেন অন্য ফিরিশ্তা।

১৭. এখানে 'সকাল-সন্ধ্যা' মানে সর্বদা। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি কবর হতে সব সময় নিজের জান্নাতী কিংবা দোযখী ঠিকানা দেখতে থাকে। সুতরাং হাদীসগুলোতে দ্বন্দ্ব নেই। এর সমর্থন করে এ আয়াত اَلنَّارُيُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَاغُدُوًّاوَّعَشِيًّا (আগুন, যার উপর তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয়। [৪০:৪৬])

১৮. দেখতে থাকে এবং কবরে জান্নাতের খুশবু, সেখানকার শীতল বায়ু, বরং সেখানকার ফলমূলও আসতে থাকে। অনুরূপ, কাফিরের কবরে দোযখের অগ্নিবায়ু, সেখানকার দুর্গন্ধ ও সাপ-বিচ্ছু পৌঁছতে থাকে।

স্মর্তব্য যে, কবরে জান্নাতের আরাম অথবা দোযখের কষ্ট পৌঁছে থাকে। কিন্তু শরীর নেক আমালের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাতে পৌঁছানো ক্বিয়ামতের পরে হবে। অবশ্য, শহীদদের রূহসমূহ মৃত্যুর সাথে সাথেই জান্নাতে পৌঁছে যায়। স্বশরীরে প্রবেশ করা তাঁদের জন্যও ক্বিয়ামতের পরে হবে।

১৯. স্মর্তব্য যে, মু'মিনের রূহ কবরে বা অন্য কোথাও আবদ্ধ হয় না, বরং কোন কোন রূহ তো সমগ্র জগতে বিচরণ করতে থাকে; যেমনটি 'মিরক্বাত' ইত্যাদি কিতাবে রয়েছে। কিন্তু হেড কোয়ার্টার কবরেই থাকে এবং সেটার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক বহাল থাকে। যেমনিভাবে, নিদ্রার সময় রূহ-ই সায়রানী (ভ্রাম্যমান আত্মা)-এর সম্পর্ক শরীরের সাথে থাকে। এ জন্যই কবরের যিয়ারত করা হয় এবং সেখানে মৃতের রূহে সাওয়াব পৌঁছানো এবং আবেদন-নিবেদনও করা হয়। হাদীসের অংশ هٰذَامَقْعَدُكَ (এটা তোমার ঠিকানা)-এর মর্মার্থ এটাই।

২০. সৌজন্য সাক্ষাৎ কিংবা অন্য কোন কাজের জন্য; মায়া-মমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে নয়। মুসলমান মহিলাদের জন্য পাপিষ্ঠ নারীদের থেকে পর্দা করা আবশ্যক; কাফির নারীদের থেকে নয়। সুতরাং ফক্বীহগণের অভিমত এ হাদীসের পরিপন্থী নয়।

২১. কেননা, সে তাওরীত শরীফ পড়েছিলো। অথবা তাদের পাদ্রীদের নিকট শুনেছিলো। জানা গেলো যে, ইহুদী এবং খ্রিস্টানগণও কবরের আযাবে বিশ্বাসী। যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করে, অথচ কবর আযাবকে অস্বীকার করে, তারা এদের চেয়েও নিকৃষ্ট। সমস্ত আসমানী কিতাবে এর উল্লেখ রয়েছে। মু'তাযিলা ও রাফেযীগণ এবং এ যুগের কিছু আধুনিকতা-প্রেমী এটাকে অস্বীকার করে।

فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ- فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ- قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلّٰى صَلٰوةً اِلَّا تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَائِطٍ لِبَنِىْ النَّجَّارِ عَلٰى بَغْلَةٍ لَّهٗ وَنَحْنُ مَعَهٗ اِذْ حَادَتْ بِهٖ فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَاِذَا اَقْبُرٌ سِتَّةٌ اَوْ خَمْسَةٌ فَقَالَ مَنْ يَّعْرِفُ اَصْحَابَ هٰذِهِ الْاَقْبُرِ قَالَ رَجُلٌ اَنَا

অতঃপর হযরত আয়েশা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।[২২] হুযূর এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য।"[২৩] হযরত আয়েশা বললেন, "এরপর আমি কখনো নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এমনি দেখি নি যে, তিনি যে কোন নামাযই পড়েছেন আর কবরের আযাব থেকে মহান রবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন নি।"[২৪] [বোখারী, মুসলিম]

১২২ || হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[২৫] তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বনী নাজ্জার গোত্রের বাগানে স্বীয় খচ্চরের উপর আরোহনরত ছিলেন[২৬] এবং আমরা হুযূরের সাথে ছিলাম। হঠাৎ তাঁর খচ্চরটি ছুটাছুটি করতে লাগলো[২৭] তা তাঁকে ফেলে দেবার উপক্রম হয়েছিলো। হঠাৎ দেখা গেলো সেখানেই পাঁচটি কিংবা ছয়টি কবর রয়েছে। হুযূর এরশাদ করলেন, "এ কবরবাসীদেরকে কে চিনো?"[২৮] এক ব্যক্তি আরয করলেন, "আমি (চিনি)।"

২২. কেননা, তখনো পর্যন্ত তিনি তা জানতেন না এবং ইহুদী নারীর কথার উপর নির্ভর করেন নি। এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাফিরদের কথার উপর নির্ভর করা যাবে না, যতক্ষণ না সেটার সত্যায়ন মুসলমান আলিম-ই দ্বীন দ্বারা করা হয়।

২৩. অর্থাৎ সমস্ত আসমানী-দ্বীনে এ কথা বলা হয়েছে। স্মার্তব্য যে, কাফিরদের কবর-আযাব কোন মতেই প্রতিকারযোগ্য নয়। কিন্তু গুনাহগার মু'মিনদের কবর-আযাব তাজা গাছ পালার তাসবীহ, বুযুর্গদের দো'আ, ঈসালে সাওয়াব ইত্যাদি দ্বারা নিঃশেষ কিংবা হ্রাস পেয়ে যায়। যেমন- বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর খেজুর গাছের তাজা ডাল পুঁতে দিয়েছেন। এখন কবরের উপর ফুল দেওয়া ও ঘাস জম্মানোর উদ্দেশ্য এটাই।

২৪. প্রত্যেক নামাযের পর উচ্চস্বরে, এর পূর্বে নিম্নস্বরে দো'আ করতেন। এ দো'আ উম্মতের শিক্ষার জন্য, যেন লোকেরা শিখে নেয়; অন্যথায় সম্মানিত নবীগণ থেকে না কবরে প্রশ্ন করা হবে, না আযাব; বরং তাঁদের বরকতে মানুষের আযাব দূরীভূত হয়ে যায়। (মুসলিম বিশ্বে ফরয নামাযের পর উচ্চস্বরে যে দো'আ করা হয়, তা হাদীস সম্মত।)

২৫. তিনি আনসারী মদীনাবাসী, ওহী লিখক, ইলম্-ই ফরাইযের ইমাম। তাঁর জীবনী ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২৬. বনী নাজ্জার আনসারের একটি বড় গোত্র। তাঁদেরই ছোট শিশুরা হিজরতের দিন হুযূরের আগমনের সময় দফ বাজিয়ে এবং (না'ত) আবৃত্তি করে আনন্দ প্রকাশ করেছিলো।

২৭. কবরের আযাব দেখে। বুঝা গেলো যে, যেই খচ্চর মুবারকের উপর হুযূর সাওয়ার হন সেটার চোখ থেকে অদৃশ্য জগতের পর্দা উঠে যায়। ফলে সেটা কবরের অভ্যন্তরের আযাব দেখতে পায়। সুতরাং যেই ওলীর উপর হুযূরের মুবারক হাত পড়ে যায়, তিনি আরশ থেকে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত সব কিছু দেখতে পান। স্মার্তব্য যে, জীবজন্তুগুলো কবরবাসীদের ডাক-চিৎকার শুনতে পায়। যেমন পূববর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু কবরের আযাব দেখা হুযূরের বরকতে ছিলো। নতুবা আমাদের ঘোড়া দিনরাত কত কবর অতিক্রম করে যাচ্ছে। সেগুলো থমকেও দাঁড়ায় না, দৌঁড়ও দেয় না।

২৮. এ প্রশ্নটি নিজের অবগতি না থাকার ভিত্তিতে ছিলো না; বরং অন্যের মুখে তাদের অবস্থাদি শুনানোর জন্যই। হুযূর স্বীয় সাহাবা এবং তাঁদের কবরগুলো চিনেন। প্রত্যেকের দাফনে অংশ গ্রহণ করতেন। মহান রব হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে বলেছিলেন, "তোমার হাতে কি?" অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞাতা। হুযূর তো কবরের আযাব দেখছেন। এটা কিভাবে হতে পারে যে,

قَالَ فَمَتٰى مَاتُوْا قَالَ فِى الشِّرْكِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ تُبْتَلٰى فِىْ قُبُوْرِهَا فَلَوْلَا اَنْ لَّاتَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُّسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِىْ اَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ

হুযূর বললেন, "তারা কখন মৃত্যুবরণ করেছে?" আরয করলেন, "শির্কের যুগে।"[২৯] তখন হুযূর বললেন, "এ লোকগুলোকে[৩০] কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে।[৩১] যদি এ আশঙ্কা না থাকতো যে, 'তোমরা দাফন করা ছেড়ে দেবে', তাহলে আমি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করতাম যেন, এ আযাব থেকে তিনি কিছুটা তোমাদেরকেও শুনিয়ে দেন, যা আমি শুনতে পাচ্ছি।"[৩২] তারপর তিনি আমাদের দিকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে বললেন, "দোযখের আযাব হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করো।" সকলে বললো, "দোযখের আযাব হতে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" হুযূর বললেন, "কবরের আযাব হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাও।" সকলে বললো, "আমরা কবরের আযাব হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৩৩] হুযূর বললেন, "প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফিত্না হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাও।" তাঁরা বললেন, "আমরা প্রকাশ-অপ্রকাশ্য ফিত্নাগুলো হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৩৪]

তিনি তাদের সম্পর্কে অনবহিত?

২৯. হুযূরের তাশরীফ আনার পূর্বে অথবা পরে, তাঁকে অস্বীকার করে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইসলাম প্রকাশের পূর্বে, যারা মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরও কবরে আযাব হবে এবং কাফিরদের আযাব কখনো শেষ হয় না। না তাদের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করা যাবে, না ঈসালে সাওয়াব ইত্যাদি। মৃতের জন্য কোন ঔষধ উপকারী নয়। কাফিরের জন্য কোন দো'আ লাভজনক নয়। এ জন্যই হুযূর তাদের জন্য না দো'আ করেছেন, না তাজা গাছের ডাল ইত্যাদি পুঁতে দিয়েছেন- যেমনিভাবে গুনাহ্‌গারদের কবরে খেজুর গাছের ডাল পুঁতে দিয়েছিলেন; যার বর্ণনা সামনে আসবে। কোন কোন মুসলমান মুশরিকদের খুশী করার জন্য গান্ধীর সমাধীতে ফুল দেয়। তা সম্পূর্ণ না-জায়েয।

৩০. মুশরিক ও কাফির উম্মত, অর্থাৎ তাদের দল যেই দ্বীন অথবা যুগ অথবা স্থানে একত্রিত হয়। [মিরক্বাত]

৩১. পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 'কবর' মানে 'আলম-ই বরযখ'। ভারতের মুশরিকরা মৃতকে জ্বালিয়ে দেয়। তাদেরও 'বরযখ (কবর)'র আযাব হয়।

৩২. প্রকাশ থাকে যে, এ সম্বোধন সমস্ত মুসলমানকে করা হয়েছে। শুধু সাহাবা-ই কেরামকে নয়; কোন কোন সাহাবী ও আল্লাহ্‌র কিছু সংখ্যক ওলী তো কবরের আযাব শোনেন ও দেখেন। এর মর্মার্থ এটাই যে, কবরের আযাব এমন ভয়ানক জিনিস যে, যদি সাধারণ লোকেরা দেখতো তবে ভয়ে উন্মাদ হয়ে যেতো এবং নিজেদের মৃতদের দাফন করার কথা ভুলে যেতো। এ অর্থ নয় যে, দাফন না করলে আযাব হয় না। সুতরাং হাদীসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। পাকিস্তানের কোয়েটা অঞ্চলে সংঘটিত ভূমিকম্প দেখে মানুষের হুঁশ চলে গিয়েছিলো এবং অনেকে পাগল হয়ে গিয়েছিলো।

৩৩. যদিও কবরের আযাব আগে এবং দোযখের আযাব পরে, কিন্তু যেহেতু দোযখের আযাব কঠোর ও কবরের আযাব তুলনামূলকভাবে হালকা; কারণ, দোযখের মধ্যে আগুন রয়েছে এবং কবরের মধ্যে রয়েছে আগুনের প্রভাব, সেহেতু দোযখের উল্লেখ প্রথমে করেছেন এবং কবরের কথা পরে।

৩৪. 'প্রকাশ্য ফিত্না' হলো অপকর্ম অর্থাৎ দৈহিক পাপ এবং 'অপ্রকাশ্য ফিত্না' হলো ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি, অর্থাৎ অন্তরের গুনাহ্। এর অর্থ হচ্ছে- ওই সমস্ত গুনাহ্ হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করো, যেগুলো দোযখের আযাব বা কবরের আযাবের কারণ হয়। যেহেতু প্রকাশ্যভাবে এগুলো কষ্টদায়ক নয়, সেহেতু এগুলোর বর্ণনা

قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ ◆اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْاٰخَرِ النَّكِيْرُ

তিনি বললেন, "দাজ্জালের ফিত্না হতে আল্লাহ্র আশ্রয় চাও।" তাঁরা বললেন, "আমরা দাজ্জালের ফিত্না হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৩৫] [মুসলিম]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১২৩ ‖ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন মৃতকে দাফন করা হয়,[৩৬] তখন তার কাছে দু'জন কালবর্ণের ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট ফিরিশ্তা আসে।[৩৭] একজনকে 'মুনকার' ও অপরজনকে 'নাকীর' বলা হয়।[৩৮]

পরে করা হয়েছে।

৩৫. এ দো'আ ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষার জন্য এবং সাহাবা-ই কেরামের অন্তরে দাজ্জালের ফিতনার আতঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য; নতুবা হুযূরের জানা ছিলো যে, সাহাবীদের যুগে না দাজ্জাল আসবে, না তার ফিতনা।

৩৬. দাফনের উল্লেখ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়ার ভিত্তিতে করা হয়েছে। যেহেতু আরবে সাধারণত মৃতদেরকে দাফনই করা হয়, সেহেতু সেটা বলা হয়েছে। অন্যথায় যেসব মৃতকে দাফন করা হয় না, বরং তাদেরকে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে ফেলা হয়, অথবা বাঘ ও মাছে খেয়ে ফেলে, তার দেহের মূল অঙ্গগুলোর সাথে রূহের সম্পর্ক করে দেওয়া হয় এবং সাওয়াল ও জাওয়াব হয়ে যায়, যদিও ওই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুনিয়ায় বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। [মিরক্বাত ও লুম'আত ইত্যাদি]

৩৭. এ দু'জন ফিরিশ্তা হলেন তাঁরাই, যাঁরা কবরের হিসাব-নিকাশের জন্য নিয়োজিত। তাঁরা মানবীয় আকৃতি ধারণ করে এ বর্ণে এ জন্য আসেন, যা'তে তাঁদের ভয়ে কাফিরগণ ভীত হয়ে পড়ে এবং হতভম্ব হয়ে উত্তর দিতে না পারে আর মু'মিন প্রশান্ত থাকবে এবং সহজেই উত্তর দেবে। এ ভীত হয়ে পড়া ও প্রশান্ত থাকা- কাফির ও মু'মিনের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যই।

এ থেকে দু'টি মাসআলা প্রতীয়মান হয়:

এক. নূরানী মাখলূক্বের মধ্যে একই সময়ে হাজার হাজার স্থানে বিদ্যমান থাকার শক্তি রয়েছে। দু'জন ফিরিশ্তা একই মুহূর্তে হাজার হাজার কবরে পৌঁছে যান। সুতরাং কোন কোন ওলীর একই সময়ে কয়েক স্থানে উপস্থিত হওয়াও সম্ভব।

দুই. যখন 'নূর' মানবাকৃতিতে আসে, তখন মানব দেহের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো তাতে পাওয়া যায়। ফিরিশ্তাগণ নূর এবং নূর কালোও নয়, নীলও নয়; কিন্তু যখন মানুষের আকৃতিতে আসে, তখন তাদের চেহারার রঙ কালোও হয়ে যায়, চোখগুলোও নীল হয়ে যায়। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র লাঠি যখন সাপ হতো, তখন সেটা পানাহার করতো। تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ (সেটা কৃত্রিম সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো।[২৬:৪৫]) অর্থাৎ হারূত ফিরিশ্তা যখন মানুষের আকৃতিতে এসেছিলেন তখন পানাহার করতেন, সহবাসও করতে পারতেন।

এ থেকে ওই সব লোকের শিক্ষা নিতে হবে, যারা বলে, "যদি হুযূর নূর হতেন, তাহলে পানাহার কীভাবে করতেন?"

৩৮. এ শব্দ দু'টির অর্থ হলো- 'অপরিচিত', যাকে দেখে ভয় পাওয়া যায়। যেহেতু মৃতব্যক্তি তাঁদেরকে কখনো দেখে নি, তদুপরি তাদের আকৃতিও ভয়ানক হয়, সেহেতু তাঁদেরকে এ নামে নামকরণ করা হয়।

শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস-ই দেহলভী আশি''আতুল লুম'আত' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, কাফিরদেরকে প্রশ্নকারী ফিরিশতাদের এ-ই নাম। আর মু'মিনদের পরীক্ষাগ্রহণ কারীদের নাম 'মুবাশ্শির ও বাশীর।' কিন্তু শুধু নামগুলোতেই পার্থক্য রয়েছে; সত্তা একই।

فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ اَشْهَدُ اَنْ
لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَيَقُوْلَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ
هٰذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهٗ فِيْ قَبْرِهٖ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِيْ سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهٗ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهٗ نَمْ
فَيَقُوْلُ اَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِيْ فَاُخْبِرُهُمْ

তারা বলে, "তুমি এ মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলতে?"[৩৯] তখন মৃত ব্যক্তি বলবে, "ইনি আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা ও তাঁর রসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসূল।"[৪০] তখন তারা বলে, "আমরা তো জানতাম যে, তুমি এটা বলবে।"[৪১] অতঃপর তার কবরে প্রশস্ততা দান করা হয় সত্তর গজ দীর্ঘ, সত্তর গজ প্রস্থ (৭০বর্গগজ)।[৪২] অতঃপর তার জন্য সেখানে আলোকিত করে দেওয়া হয়;[৪৩] তারপর তাকে বলা হয়, "ঘুমিয়ে পড়ো।" সে বলে, "আমি আমার ঘরে ফিরে যাবো, যেন তাদেরকে এ সংবাদ দিতে পারি।"[৪৪]

৩৯. 'মিরক্বাত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আকৃতি মুবারক প্রতিটি কবরে প্রকাশ পায়, যেমনিভাবে প্রত্যেক আয়নায় সূর্য দেখা যায়। কোন কোন আলিম বলেন, কবর হতে পবিত্রতম রওযা পর্যন্ত আড়াল তুলে নেওয়া হয়। যার ফলে মৃত ব্যক্তি হুযূরের বিশ্ব আলোকিতকারী সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে থাকে। কেউ কেউ বলেন, মু'মিনের নিকট থেকে এরপর এ সৌন্দর্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত অদৃশ্য হয় না। এ জন্য কোন কোন আশিক্ব মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করেন। হুযূর করীম হযরত ফাতিমা যাহ্রাকে বলেছেন, "আমার আহলে বায়তের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সাথে মিলিত হবে।" অথবা পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণকে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে অধিক দানশীল হবে সে আমার সাথে প্রথমে মিলিত হবে।" এ বাণীগুলোর মর্মার্থ এটাই।

স্মর্তব্য যে, এ ফিরিশ্তাগণ হুযূর আন্ওয়ারকে رَجُلٌ(পুরুষ) বলে আখ্যায়িত করা তুচ্ছার্থে নয়, কারণ হুযূরের মানহানি করা কুফর। বরং পরীক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য। কেননা, যদি তাঁরা 'নবী' কিংবা 'রসূল' বলে দিতেন, তাহলে পরীক্ষাই বা কি হতো?

৪০. কবরে প্রশ্নও তিনটি হয় এবং উত্তরও তিনটি। কিন্তু এখানে প্রশ্নতো একটি বলা হয়েছে, যা সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর জবাব তিনটি- তাওহীদেরও, দ্বীনেরও রিসালাতেরও। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বান্দা হুযূরকেই দেখে থাকে, তাঁর ফটোকে নয়। অন্যথায় এ জবাব মূলত কুফর হতো। কেননা, হুযূরের ফটোকে নবী বলা তেমনিই কুফর, যেমন আল্লাহ্র নামের পাথর তৈরি করে সেটাকে খোদা বলা কুফর।

৪১. অর্থাৎ এ সাওয়াল-জাওয়াব নিয়মানুসারে হয়েছে। আমরা তোমার ঈমান সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম না। বুঝা গেলো যে, ফিরিশ্তারা প্রতিটি মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং কুফর ও ঈমান সম্পর্কে অবগত। আমাদের হুযূর তো সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করার অবকাশই নেই। 'মিরক্বাত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ফিরিশ্তারা মু'মিন মৃত ব্যক্তির কপালে নূর-ই ঈমানের চমক, ইবাদতের চিহ্ন এবং পুণ্যবান হবার আলামতসমূহ দেখতে পান। যেমন- ক্বিয়ামতে প্রত্যেক ব্যক্তি মু'মিন ও কাফিরকে চিনতে পারবে। আল্লাহ্ এরশাদ ফরমান- يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ (যেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে।[৩:১০৬])

৪২. অর্থাৎ চারহাজার নয়শ' গজ, যা সত্তরকে সত্তর দিয়ে গুণ করলে অর্জিত হয়। অর্থাৎ সত্তর গজ দীর্ঘ, সত্তর গজ প্রশস্ত। সর্বমোট আয়তন চার হাজার নয়শ' (গজ)। এ বর্ণনা প্রশস্ততা বুঝানোর জন্য, সীমাবদ্ধতা বুঝানোর জন্য নয়। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, চক্ষুর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত। ওটা এর ব্যাখ্যা।

৪৩. এ আলো, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদিরও নয়; বরং নূর-ই ইলাহী বা নূর-ই মুস্তফার উজ্জ্বলতাই হয়ে থাকে। এটা হৃদয়স্থ ঈমানের নূরও হতে পারে।

৪৪. যে, আমি সফল হয়ে গেছি এবং অত্যন্ত আরামে আছি। বুঝা গেলো যে, মৃত ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনকে চিনতে পারে এবং সেখানে যেতেও সক্ষম। কেননা, সে এটা বলে না যে, তুমি আমাকে নিয়ে যাও অথবা যানবাহন নিয়ে এসো; বরং বলে, "আমি যাই" যদিও তার পরিবার-পরিজন শত শত ক্রোশ দূরে থাকে।

فَيَقُوْلَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لَايُوْقِظُهُ اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَّضْجَعِهِ ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا اَدْرِىْ فَيَقُوْلَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ ذٰلِكَ. فَيُقَالُ لِلْاَرْضِ الْتَئِمِىْ عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ اَضْلَاعُهُ فَلَايَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا

তখন তারা বলে, "তুমি ওই দুলহানের মতো ঘুমাও, যাকে তার প্রিয়স্বামী ছাড়া ঘরের কেউ জাগায় না-[৪৫]এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ্ তাকে তার ওই নিদ্রাস্থল হতে উঠাবেন।" আর যদি মৃতব্যক্তি মুনাফিক্ব (কাফির) হয়, তাহলে বলে, "আমি লোকজনকে কিছু বলতে শুনেছিলাম। ওইরূপ আমিও বলতাম, আমি চিনতাম না।"[৪৬] তখন তারা বলে, "আমরা জানতাম যে, তুমি এটা বলবে।"[৪৭] তারপর যমীনকে বলা হয়, "তার জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে যাও।" তখন তা তার জন্য এতই সঙ্কীর্ণ হয়ে যায় যে, মৃতের একপাশের পাঁজরের হাঁড়গুলো অপরপাশে চলে যায়।[৪৮] অতঃপর সে কবরের আযাবেই লিপ্ত থাকে,

৪৫. মিরক্বাত কিতাবে বলা হয়েছে, শয়ন করা মানে বিশ্রাম নেওয়া। অর্থাৎ এ বরযখের জীবনটি সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত করো। কারণ, তোমার নিকট খোদার রহমত ছাড়া কোন বিপদাপদ পৌঁছতে পারিবে না; যেমন নববধুর নিকট বর ছাড়া কেউ পৌঁছুতে পারে না। এই নিদ্রা মানে অলসতার নিদ্রা নয়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ...الاية
(তারা জীবিকা পায়, তাঁরা উৎফুল্ল এরই উপর, যা আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহক্রমে দান করেছেন এবং আনন্দ উদ্‌যাপন করছে তাদের পরবর্তীদের জন্য, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি।।৩:১৬৯-১৭০।)-এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্‌র মাক্ববূল বান্দাগণ কবরে জান্নাতী রিয্‌ক্ব ভোগ করেন, হাসি-খুশিতে থাকেন এবং দুনিয়াবাসীদের খবর রাখেন। যদি তাঁরা ঘুমিয়েই থাকেন, তাহলে ফলমূল কিভাবে আহার করেন, এখানকার খবরও কিভাবে রাখেন? তাছাড়া, কবরস্থানে পৌঁছে সালাম করাও সুন্নাত হতো না; কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তিদের সালাম করা নিষেধ। সুতরাং এ হাদীস শরীফকে ওহাবী সম্প্রদায় দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না।

এ হাদীস শরীফ বুযুর্গানে দ্বীনের ওরস করার পক্ষে উৎস-প্রমাণ। যেহেতু ফিরিশ্‌তাগণ সেদিন কবরবাসীকে 'আরূস' (দুলহান) বলেছেন, সেহেতু ওই দিনের নাম 'ওরস'র দিন। মু'মিনের মৃত্যুর দিন হচ্ছে আনন্দের দিন এবং কাফিরের জন্য গ্রেফতারের দিন।

৪৬. বুঝা গেলো যে, আন্তরিক বা নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান কবরের মধ্যে সাথে করে। নিছক মৌখিক না বাহ্যিক ইসলাম যাবে না। এর গবেষণালব্ধ বিবরণ ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

৪৭. কেননা, লাওহ্-ই মাহফূয আমাদের সম্মুখে রয়েছে, তোমাদের কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করা আমাদের জানা আছে, তোমার কপালে কুফরের অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি। এ সাওয়াল-জাওয়াব শুধু নিয়ম পালনের জন্যই।

৪৮. অর্থাৎ ডান পাঁজর বাম দিকে এবং বাম পাঁজর ডানদিকে; কিন্তু তার এ অবস্থা আমাদের অনুভূতির উর্ধ্বে। যদি আমরা কাফিরের লাশ দেখি, তবে পূর্বের মত ঠিকঠাক মনে হবে।

স্মর্তব্য যে, যদি একই কবরে কাফির ও মু'মিনকে দাফন করা হয় তবুও ওই কবর মু'মিনের জন্য প্রশস্ত হবে এবং কাফিরের জন্য হবে সঙ্কুচিত। মু'মিনের জন্য হবে আলোকিত এবং কাফিরের জন্য হবে অন্ধকার। মু'মিনের জন্য ঠাণ্ডা ও কাফিরের জন্য গরম, মু'মিনের জন্য সুগন্ধিপূর্ণ এবং কাফিরের জন্য দুর্গন্ধময়, যেমন- একই বিছানায় দু'জন মানুষ ঘুমালো। একজন ভাল ও মনে আনন্দদায়ক স্বপ্ন দেখলো, অপরজন দেখলো মর্মান্তিক ও ভয়াবহ স্বপ্ন। বিছানা একই; কিন্তু দু'জনের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। স্বপ্ন 'বরযখ' (কবরজগত)'র একটি উপমা। স্বপ্ন অধিকাংশ কল্পনাই হয়ে থাকে, আর বরযখে হবে বাস্তব। পাঁজর বলা হয়েছে বুঝানোর জন্য, নতুবা যে সকল কাফিরের হাঁড়গুলো জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলা হয়েছে, অথবা জীবজন্তু খেয়ে ফেলেছে, তাদের আত্মার উপরও এরূপ সঙ্কোচন হবে। তার জন্য কবর একটি 'শিকান্‌জা' বা প্রেসার মেশিন স্বরূপ।

حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَّضْجَعِهٖ ذٰلِكَ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللّٰهُ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَادِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِيَ الْاِسْلَامُ فَيَقُوْلَانِ مَاهٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هُوَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ وَمَايُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَاٰمَنْتُ بِهٖ وَصَدَّقْتُ فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ ﴿يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ اَلْاٰيَة﴾ قَالَ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَآءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ

যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাকে ওই ঠিকানা হতে উঠাবেন।[৪৯] [তিরমিযী] **১২৪ ||** হযরত বারা ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, হুযূর এরশাদ করেছেন, মৃত ব্যক্তির নিকট দু'জন ফিরিশ্‌তা আসে, অতঃপর তাকে বসায়,[৫০] তারপর তাকে বলে, "তোমার রব কে?" সে বলে, "আমার রব আল্লাহ্।" তারপর বলে, "তোমার দ্বীন কি?" সে বলে, "আমার দ্বীন ইসলাম"।[৫১] তারপর তারা বলে, "কে এ মহান ব্যক্তি, যাঁকে তোমাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছে?" তখন সে বলে, "তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।' ফিরিশ্‌তারা বলে, "তুমি তা কীভাবে জেনেছো?"[৫২] সে বলে, "আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, সেটার উপর ঈমান এনেছি, সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি।"[৫৩] এটাই হচ্ছে 'ইয়ুসাব্বিতুল্লাহু...আল্-আয়াত' এ আয়াতের তাফসীর । অর্থাৎ আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে দৃঢ় উক্তির উপর অটল রাখেন...। হুযূর এরশাদ করেন, "অতঃপর আসমান থেকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করেন, "আমার বান্দা সত্যবাদী"।[৫৪]

---

৪৯. অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত। বুঝা গেলো যে, কাফিরের আযাব কোন তদবীর দ্বারাই নিঃশেষ কিংবা শিথিল হতে পারে না। গুনাহগার মু'মিনদের আযাব বুযুর্গদের পদচারণা, জীবিতদের ঈসালে সাওয়াব ইত্যাদি দ্বারা লঘু হয়ে যায়।

৫০. স্মর্তব্য যে, শায়িত ব্যক্তির বসাকে 'জুলুস' (جُلُوْس) এবং দাঁড়ানো ব্যক্তির বসাকে 'কু'উ-দ' (قُعُوْد) বলা হয়। কখনও রূপকভাবে একটিকে অপরটির অর্থেও ব্যবহার করা হয়। এখানে তা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত। এখানে বসানোও ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য কাজ নয়। মর্গে কাফেরদের মরদেহ আমাদের সামনে পড়ে থাকে, কিন্তু ফিরিশ্‌তারা তাকে বসিয়ে পরীক্ষা নিয়ে আযাবে লিপ্ত করে থাকেন; অথচ আমরা কিছুই বুঝতে পারি না। আমাদের সামনে শায়িত ব্যক্তি দুঃস্বপ্নে কষ্ট পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে; কিন্তু আমরা অনুধাবন করতে পারি না।

৫১. এ সাওয়াল ও জাওয়াব- সবই আরবী ভাষায় হয়। মৃত্যুর পর সকলের ভাষা আরবী হয়ে যায়।(মিরক্বাত) কিন্তু মৃতব্যক্তি নিজের জীবদ্দশা কালীন ভাষাও বুঝতে পারে। আমাদের হুযূর পার্থিব জীবন মুবারকে সমস্ত ভাষা জানতেন, এমনকি কাঠ-পাথর ইত্যাদির ভাষাও। জীবজন্তু হুযূরের পবিত্র দরবারে আবেদন-নিবেদন করতেন। এখনো প্রত্যেক ভাষা সম্পর্কেই অবগত। হুযূরের রওযা মুবারকে প্রত্যেক ফরিয়াদকারী স্বীয় ভাষায় আবেদন-নিবেদন করে। সেখানে অনুবাদ করার প্রয়োজন হয় না।

৫২. এ প্রশ্ন আনন্দের। অর্থাৎ হে বান্দা! এ সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে তুমি তাঁকে কীভাবে চিনতে পারলে এবং তুমি কিভাবে পরীক্ষায় সফল হয়ে গেলে?

৫৩. অর্থাৎ মাধ্যম ব্যতীত আমি ক্বোরআন শরীফ নিজেই শিখেছি; অথবা আলিমদের মাধ্যমে। তা থেকে আক্বাইদ ও আমালের শিক্ষা অর্জন করেছি। সুতরাং উত্তরটি আলিমদের জন্যও প্রযোজ্য এবং মূর্খদের জন্যও। এ উত্তর দ্বারা বুঝা গেলো যে, কবরে হুযূরকে চেনা ঈমানী সম্পর্কের কারণেই হবে; কখনো হুযূরকে দেখুক কিংবা না-ই দেখুক। স্মর্তব্য যে, মু'মিনগণ এক দৃষ্টিকোণ থেকে হুযূরের কাছ থেকেই ক্বোরআন জেনে থাকে এবং অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ক্বোরআন দ্বারা হুযূরকে চিনতে পারেন।

৫৪. عَبْدِيْ (আমার বান্দা) শব্দটি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এ বাণী আল্লাহ্‌র, যা বান্দা আজকেই প্রথমবার নিজের কানে শুনতে পাচ্ছে। এ বাণী শুনে বান্দা যে আনন্দ পায় তা বর্ণনাতীত। 'আমার বান্দা সত্যবাদী'-এর অর্থ হচ্ছে

فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَّوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّبَصَرِهٖ ـ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهٖ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَااَدْرِىْ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَادِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَااَدْرِىْ فَيَقُوْلَانِ مَاهٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَااَدْرِىْ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ اَنْ كَذَبَ

সুতরাং তার জন্য বেহেশ্‌তের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য বেহেশ্‌তের দিকে দরজা খুলে দাও।" অতঃপর তা খুলে দেওয়া হয়। হুযূর এরশাদ করেন, তার উপর জান্নাতের হাওয়া এবং সেখানকার সুগন্ধি আসতে থাকে।[৫৫] আর কবর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।[৫৬] বাকী রইলো কাফির। হুযূর তার মৃত্যুর বর্ণনা দিলেন।"[৫৭] এরশাদ করলেন, "তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তার কাছে দু'জন ফিরিশ্‌তা আসে। তারপর তারা তাকে বসায় এবং তাকে বলে, 'তোমার রব কে?' সে বলে, "হায়! হায়! আমি জানিনা।"[৫৮] তারপর তাকে বলে, "তোমার দ্বীন কী?" সে বলে, "হায়! হায়! আমি জানিনা।"[৫৯] তারপর তারা বলে, "কে এ মহান ব্যক্তি, যাঁকে তোমাদের মধ্য পাঠানো হয়েছে?"[৬০] সে বলে, "হায়! হায়! আমি জানিনা।"[৬১] তখন একজন আহ্বানকারী আসমান হতে আহ্বান করে, "সে মিথ্যুক।[৬২]

দুনিয়ায়ও সত্যবাদী রয়েছে এবং আজকেও সত্য বলেছে।

৫৫. ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কবরে জান্নাতের নি'মাতসমূহ পৌঁছে থাকে; কিন্তু বান্দা সেখানে পৌঁছে না, বান্দার বেহেশ্‌তে পৌঁছানো হাশরের পর হবে।

৫৬. এ হাদীস 'সত্তর গজ প্রশস্ত হবার' ব্যাখ্যা।

৫৭. এভাবে যে, কেমন মুসীবতের মধ্যে তার প্রাণবায়ু বের হয়। তাছাড়া, তার দুনিয়া ত্যাগের দুঃখ, আযাবের ফিরিশ্‌তাদের ভয়,ঘটিতব্য আযাবের আশঙ্কা -সবই একত্রিত হয়ে যায়। মু'মিনের মধ্যে এর কোনটিই থাকে না।

৫৮. বুঝা গেলো যে, যেসব লোক দুনিয়ায় হুযূরের সাথে গোলামীর সম্পর্ক স্থাপন করে নি, যদিও তারা তাওহীদে বিশ্বাসী হয়; কিন্তু কবরে তাওহীদ ইত্যাদি সবকিছুই ভুলে যাবে। কেননা, এ উত্তর প্রত্যেক কাফিরের হবে, নাস্তিক হোক কিংবা মুশরিক হোক, অথবা শয়তানী তাওহীদবাদে বিশ্বাসী তাওহীদী জনতা হোক।

৫৯. অর্থাৎ তার এটাও মনে নেই যে, দুনিয়ায়,সে ইসলাম ব্যতীত কোন্ ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। কেননা, সমস্ত কুফরই শয়তানী দ্বীন, যেগুলোর ভিত্তি কুপ্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুর সাথে সাথে শয়তান সঙ্গ ত্যাগ করে, নাফ্‌স ছিন্ন হয়ে যায়। যখন শেকড়ই কেটে গেছে, তখন শাখা-প্রশাখা কিভাবে ঠিক থাকবে?

৬০. বুঝা গেলো, কাফির-মুর্দাকেও হুযূরের সাথে দীদার করানো হয়; কিন্তু তারা চিনতে পারে না। কেননা, তাঁকে চেনা দৃষ্টিশক্তি দ্বারা হয় না; বরং অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই হয়। অন্ধ সাহাবা হুযূরকে দেখতে পেয়েছেন। চক্ষুবিশিষ্ট কাফির হুযূরকে দেখে নি। দৃষ্টিশক্তি সুরমা দ্বারা প্রকট হয়; অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহর মাক্ববূল বান্দাদের আস্তানার মাটি দ্বারাই তীক্ষ্ণ হয়।

৬১. এ জবাব হতে ওইসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'নিজের মত (মানুষ)' এবং 'বড় ভাই' বলাকে ঈমান মনে করে। যদি তা দ্বারা ঈমান পাওয়া যেতো, তাহলে এ কাফির বলতে পারতো যে, 'তিনি একজন মানুষ' অথবা 'আমার ভাই।'

বাশারিয়াত-ই মুস্তফা (হুযূর মুস্তফা'র মানবীয়তা) চেনার মধ্যে মুক্তি নেই; নুবূয়ত চেনাতেই মুক্তি রয়েছে। 'মানবীয়তা'তো আবূ জাহ্‌লও মানতো।

৬২. কেননা, সে বলে, "আমি তাঁকে চিনিও না" অথচ জীবদ্দশায় তাঁকে যাদুকর, কবি, নিজের মত মানুষ, বড়

فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَ اَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْالَهُ بَابًا اِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَاوَسَمُوْمِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلَاعُهُ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ اَعْمٰى اَصَمُّ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ لَّوْضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَتُرَابًا فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلَّاالثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُتُرَابًاثُمَّ يُعَادُفِيْهِ الرُّوْحُ- رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ

সুতরাং তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও। আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য আগুনের দিকে দরজা খুলে দাও।" তিনি (হুযূর) এরশাদ করেন, "অতঃপর তার উপর সেখানকার উত্তাপ ও উত্তপ্ত হাওয়া আসে।"[৬৩] এরশাদ করেন, "তার জন্য তার কবর সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এমনকি তার পাঁজরের হাড়গুলো এদিক থেকে ওদিকে হয়ে যায়।[৬৪] অতঃপর তার উপর অন্ধ ও বধির ফিরিশ্‌তা চড়াও হয়,[৬৫] যাদের নিকট লোহার এমন হাতুড়ি থাকে, যদি তা দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তাহলে তা ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। তা দ্বারা প্রহার করে থাকে- এমন প্রহার, যা জিন্ ও মানুষ ব্যতীত পূর্ব-পশ্চিম (প্রাচ্য-পাশ্চাত্য)'র সকল সৃষ্টি শুনতে পায়।[৬৬] এতে সে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। তারপর আবার তার মধ্যে রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।"[৬৭]

[আহমদ, আবূ দাঊদ]

ভাই ইত্যাদি বলে বেড়াতো। আর এখানে বলছে, "আমি চিনতেই পারছি না। যার কাছে প্রকৃতপক্ষে হুযূরের নুবূয়তের সংবাদ পৌঁছে নি, তার জন্য তাওহীদের আক্বীদাই যথেষ্ট এবং তাকে এ সাওয়াল-জাওয়াবও করা হবে না।

তাছাড়া, হুযূরের নুবূয়ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রসারিত হয়ে গেছে। এখন যে ব্যক্তি জেনেশুনে এ ব্যাপারে উদাসীন থাকবে, সেও অপরাধী এবং لَاَدْرِىْ (আমি জানি না) বলার মধ্যে মিথ্যুক।

স্মর্তব্য যে, এখানে عَبْدِىْ বলেন নি। কেননা, এ শব্দটি রহমতের; আর কাফির হচ্ছে অভিসম্পাতের উপযোগী।

৬৩. অর্থাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ, ধোঁয়া, বরং সেখানকার সাপ-বিচ্ছু এবং গরম বাতাসও। কোন কোন কবরে এ সব জিনিস দেখাও গেছে। আল্লাহ্ ক্ষমা করুন।

৬৪. এ সঙ্কীর্ণতাও ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকে। যেমন- গরম ও আগুন থাকবে।

৬৫. এ আযাবের ফিরিশ্‌তাদের নাম 'যবানিয়াহ্'। 'অন্ধ ও বধির' মানে পাষাণহৃদয়, নির্দয় এবং বেপরোয়া হওয়া, যেহেতু তাদের কষ্ট দেখেও দয়া করেন না। 'উহ্! আহ্!' শব্দ শুনে সেদিকে কর্ণপাত করেন না।(আশি"আহ্)।

নতুবা অন্ধ ও বধির হওয়া দূষণীয়। তা থেকে ফিরিশ্‌তাগণ পবিত্র। আল্লাহ্ ক্বিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলবেন- وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى (আর এমনিভাবে তুমি আজ বিস্মৃত হবে।২০:১২৬) অথচ মহান রব ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে।

৬৬. হাদীসটি একেবারে স্পষ্টার্থক, কোন ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। 'জিন ও মানব' দ্বারা সাধারণ মু'মিন বুঝানো হয়। মাক্ববূল বান্দাগণ এ আর্তনাদ শুনেনও কবরের আযাব দেখেনও।

৬৭. অর্থাৎ যেমনিভাবে দুনিয়ায় অত্যন্ত কষ্টে প্রাণ বের হয়েছিলো, অনুরূপ সেখানেও হবে। অর্থাৎ হাতুড়ির প্রতিটি আঘাতে প্রাণ বের হয়ে যাবে, আবার তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এ জন্যই ক্বিয়ামতের দিন কাফিররা আরয করবে-

رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ

অর্থাৎ "হে খোদা! তুমি আমাদেরকে বারবার মৃত্যু ও জীবন দিয়েছো।৪০:১১।"

এ আয়াতে اثْنَتَيْنِ (দু'বার) দ্বারা 'বারবার' বুঝানো উদ্দেশ্য। যেমন- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ (অতঃপর আবার দৃষ্টি উঠাও।৬৭:৪।)

মোটকথা, এ আয়াত আলোচ্য হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা। এ আয়াতের অন্য তাফসীরও করা হয়েছে।

وَعَنْ عُثْمَانَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَاتَبْكِىْ وَتَبْكِىْ مِنْ هٰذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِّنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ - قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَارَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلَّا وَ الْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

১২৫ || হযরত 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, যখন তিনি কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এত বেশি কাঁদতেন যে, তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেতো।[৬৮] তাঁর দরবারে আরয করা হলো, "আপনি বেহেশ্‌তে ও দোযখের বর্ণনা করেন, তখন তো কাঁদেন না, অথচ এখানে কাঁদছেন?" তখন তিনি বললেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কবর হচ্ছে আখিরাতের সোপানসমূহের মধ্যে প্রথম সোপান। যদি তা হতে নাজাত পেয়ে যায়, তাহলে পরবর্তী সোপানগুলো তা থেকে সহজতর হবে।[৬৯] আর যদি তা থেকে নাজাত না পায়, তাহলে পরবর্তী সেপানগুলো তদপেক্ষা কঠিন হয়।"[৭০] (বর্ণনাকারী) বলেন, এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি এমন কোন দৃশ্যই কখনো দেখি নি, যা কবরের চেয়ে (বেশি) ভয়াবহ।"[৭১]

এ হাদীস তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, "এ হাদীস 'গরীব' পর্যায়ের।"

---

৬৮. মৃত ব্যক্তির কথা স্মরণ করে নয়; বরং কবরের ভয়ে এবং কবরের আযাবের ভয়ে, যদিও তিনি সব ধরনের আযাব হতে নিরাপদ ছিলেন।
প্রিয় নবীর পবিত্র বাণীতে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু অন্তরে ভয় বিরাজমান ছিলো, যা ঈমানেরই চাহিদা।
যখন 'মাহফূয' বা নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের ভয়ের এ অবস্থা হয়, তাহলে আমরা গুনাহ্গারদের ভয় কত বেশি হওয়া চাই?
এটা দ্বারা এ কথা অনিবার্য হয় না যে, হুযূরের সুসংবাদের প্রতি তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো না; অথবা এও নয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে মিথ্যার সম্ভাবনা ছিলো।
আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছিলেন-
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য শোভা পায়না যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন এমতাবস্থায় যে, আপনি তাদের মধ্যে রয়েছেন।"[৮:৩৩, তরজমা: কান্যুল ঈমান]
এতদসত্ত্বেও প্রবল ঘূর্ণিঝড় দেখে হুযূরের নূরানী চেহারায়ও ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ পেতো।
৬৯. অর্থাৎ মৃত্যুর পর কবর, হাশর, মীযান, পুলসেরাত্ব ইত্যাদি অনেক সোপান আমাদেরকে অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু সমস্ত স্তরের পূর্বাভাস কবর থেকে পাওয়া যায়। এখানে রক্ষা পেলে, ইনশা- আল্লাহ্ সামনেও নিরাপদ থাকবে; বরং গুনাহগার-মু'মিনের জন্য কবরের সাময়িক শাস্তি তার গুনাহ্সমূহের কাফফারা হবে। যেমন- মিরক্বাত কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। সুবহা-নাল্লা-হ! মু'মিনের জন্য এ কঠোরতাও রহমত।
৭০. অর্থাৎ কবরের স্থায়ী শাস্তি কাফিরদের জন্যই। তার জন্য হাশর ও পুলসেরাত্ব কবরের চেয়েও অধিক ভয়াবহ।
৭১. অর্থাৎ দুনিয়ার বড় থেকে বড়তর মুসীবতও কবরের কিঞ্চিত আযাবের চেয়েও সহজ (হালকা)। আরাম- আয়েশে জীবনযাপনকারী কাফিরের কবরে এক অত্যুষ্ণ বায়ু প্রবাহিত করে বলবেন, "তুমি কি কখনো বিলাসী জীবন জীবন দেখেছো?" সে বলবে, "আমি জানিও না যে, বিলাসিতা কি জিনিস।"
দুনিয়ায় বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের সম্পদ, সন্তান ও বন্ধু-বান্ধবদের দেখে সান্ত্বনা পায়। কবরে কাকে দেখবে? হয়তো মাটি দেখবে, নতুবা আযাবের ফিরিশ্‌তাদেরকে।

وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ ثُمَّ سَلُوْا لَهٗ بِالتَّثْبِيْتِ ـ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْاَلُ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِىْ قَبْرِهٖ تِسْعَةٌ وَّ تِسْعُوْنَ تِنِّيْنًا تَنْهَسُهٗ وَتَلْدَغُهٗ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ

১২৬ || তাঁর (ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিয়ম ছিলো যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফনের কাজ সমাপ্ত হলে হুযূর সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন এবং এরশাদ করতেন, "তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করো, তারপর তার জন্য অটল থাকার দো'আ করো।[৭২] কেননা, এখন তাকে প্রশ্নাবলী করা হচ্ছে।"[৭৩] [আবূ দাঊদ]

১২৭ || হযরত আবূ সা'ঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কাফিরের জন্য তার কবরে নিরান্নব্বইটি সাপ চড়াও করা হবে।[৭৪] সেগুলো তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত চাটতে ও ছোবল মারতে থাকবে।"[৭৫]

---

৭২. পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম সমাজে প্রচলন আছে যে, দাফনের পরক্ষণে লোকেরা তৎক্ষণাৎ ফিরে যায় না; বরং কবরের আশেপাশে দণ্ডায়মান হয়। কিছু সূরা-আয়াত, দুরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে। তারপর ওইগুলোর সাওয়াব মৃতের আত্মার প্রতি প্রেরণ করে, মৃতের জন্য দো'আ করে। এসব কিছুর উৎস হচ্ছে আলোচ্য হাদীস শরীফ।

এ সবক'টি কাজই সুন্নাত। কোন কোন স্থানে দাফন করে কবরের পাশে আযানও দিয়ে থাকে। এটাও এ হাদীস থেকে প্রমাণিত। কেননা, এটাও মৃত ব্যক্তির জন্য তালক্বীনের অংশ এবং (কবরে প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানে) তাকে অটল রাখার প্রচেষ্টার নামান্তর।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-لَقِّنُوْا مَوْتٰكُمْ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' পড়ার শিক্ষা দাও)।

৭৩. অর্থাৎ তা হবেই। কেননা, কবরের হিসাব মানুষের ফিরে যাবার পরেই শুরু হয়।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, জীবিতদের দোয়ার বরকতে মৃতদের উপকার হয়। অনুরূপ, তাদের সাদক্বা-খায়রাত মৃতের জন্য উপকারী।

হযরত আবূ উমামা'র বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হুযূর এরশাদ ফরমান, "দাফনের পরে কবরের শিরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এটা বলো, 'হে অমুকের পুত্র অমুক! নিজের ওই কলেমা স্মরণ করো, যা তুমি দুনিয়ায় পড়তে। তোমার রব হলেন 'আল্লাহ্', তোমার দ্বীন হলো 'ইসলাম', তোমার নবী হলেন হযরত 'মুহাম্মদ মুস্তফা' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।"

'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন যে, কবরের কাছে ক্বোরআন শরীফের খতম পড়া মুস্তাহাব। ইমাম বায়হাক্বী হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, দাফনের পর কবরের শিরপ্রান্তে সূরা বাক্বারার প্রথম রুকূ' এবং পায়ের দিকে গিয়ে শেষ রুকূ' পড়া মুস্তাহাব।

শায়খ ইবনে হুমাম বলেন যে, কবরের কাছে ক্বোরআন তিলাওয়াত করা অতি উত্তম কাজ। আশি''আতুল লুম'আত কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি তখন ফিক্বহর দু'চারটি মাসআলা বর্ণনা করে মৃতকে সাওয়াব পৌঁছানো হয়, তাও ভালো।

৭৪. تِنِّيْنٌ (তিন্নী-ন) বিষধর আজগরকে বলা হয়। যেহেতু কাফির আল্লাহর নিরান্নব্বই নামের অস্বীকারকারী ছিলো, সেহেতু তার উপর নিরান্নব্বইটি সাপ নির্ধারিত হয়েছে। তাছাড়া, আল্লাহর একশ'টি রহমত রয়েছে, একটি (রহমত) দুনিয়ায়, আর নিরান্নব্বইটি মু'মিনের উপর আখিরাতে করা হবে। কাফিরদের উপর এ নি'মাতসমূহের পরিবর্তে সাপ নির্ধারিত হয়েছে।

৭৫. গোশ্ত চেঁচে ফেলা এবং বিষ না পৌঁছানোকে نَهْسٌ বলা হয় এবং দাঁত দিয়ে আঘাত করে বিষ ছেড়ে দেওয়া হল لَدْغٌ। অর্থাৎ কোনটি চাঁচতে থাকবে আর কোনটি ছোবল মারবে।

لَوْاَنَّ تِنِّينًا مِّنْهَا نَفَخَ بِالْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ خَضِرًا - رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ وَرَوَى التِّرْمِذِىُّ نَحْوَهُ وَقَالَ سَبْعُوْنَ بَدْلَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ - ◆اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ◆ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِيْنَ تُوُفِّىَ فَلَمَّا صَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَوُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَسُوِّىَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَبَّحْنَا طَوِيْلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهٗ حَتّٰى فَرَّجَهُ اللّٰهُ عَنْهُ - رَوَاهُ اَحْمَدُ

যদি ওই (সাপ)গুলো হতে কোন একটি সাপ পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ফেলে, তাহলে কখনো উদ্ভিদও জন্মাবে না।[৭৬] এটা দারেমী বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি 'নিরান্নব্বই'র স্থলে 'সত্তর' বলেছেন।[৭৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১২৮ || হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে হযরত সা'দ ইবনে মু'আয[৭৮]রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দিকে এমন সময়ে বের হলাম, যখন তিনি ওফাত পান। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযার নামায পড়লেন আর তাঁকে কবরে রাখা হলো এবং তাঁর উপর মাটি বরাবর করে দেওয়া হলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাসবীহ্ পড়লেন। আমরাও দীর্ঘক্ষণ তাসবীহ পড়লাম। তারপর তিনি তাকবীর বললেন। আমরাও তাকবীর বললাম।[৭৯] আরয করা হল, "এয়া রসূলাল্লাহ্ প্রথমে তাসবীহ্, তারপর তাকবীর কেন বলেছেন?" হুযূর এরশাদ করলেন, "এ নেককার বান্দার জন্য কবর সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, অবশেষে আল্লাহ্ সেটা প্রশস্ত করে দিয়েছেন।"[৮০] [আহমদ]

৭৬. এভাবে যে, সেটার উষ্ণতা ও বিষের কারণে মাটি সিদ্ধ হয়ে যাবে এবং উদ্ভিদ জন্মানের উপযোগী থাকবে না। যেখানে এটম বোমা পড়েছে, বর্তমানে সেখানকার এলাকা কৃষির অনুপযোগী হয়ে গেছে।

৭৭. ৭০ মানে এখানে অসংখ্য। এটা ৯৯'র বিপরীত নয়।

৭৮. তিনি আনসারের মধ্যে আউস গোত্রের সর্দার। 'আক্বাবা'র ১ম বায়'আতের পর মদীনা মুনাওয়ারায় ঈমান আনেন। তিনি ঈমান আনার কারণে 'আবদে আশহাল'ও ঈমান আনেন। হুযূর তাঁর নাম (উপাধি) 'সাইয়্যিদুল আনসার' (আনসারদের সর্দার) রেখেছেন। মহা সম্মানিত সাহাবী। হুযূরের সাথে বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খন্দকের যুদ্ধে তাঁর কাঁধে তীর লেগেছিলো। যার কারণে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিলো এবং তা আর বন্ধ হয় নি। এক মাস পর ৫ম হিজরীর যিলক্বদ মাসে ৩৭বছর বয়সে ওফাত পান। হুযূরের মুবারক হাতেই জান্নাতুল বাক্বী'তে দাফন হন।

৭৯. এ থেকে বুঝা গেলো যে, দাফনের পর কবরের নিকট তাসবীহ্ ও তাকবীর পড়া সুন্নাত। কারণ এটা দ্বারা আল্লাহ্‌র গযব (ক্রোধ) দূরীভূত হয়ে যায়। প্রজ্জ্বলিত আগুন নিভে যায়। এ থেকে কবরের পাশে আযানের মাসআলা গৃহীত। কেননা, এতে তাকবীরও আছে এবং তালক্বীনও। বস্তুতঃ এ দু'টিই সুন্নাত।

৮০. এ সঙ্কীর্ণতা কবরের আযাব ছিলো না; বরং কবরের স্নেহ প্রকাশই ছিলো। কবর মু'মিনকে এমনিভাবে চেপে ধরে, যেমনিভাবে মা শিশুকে কোলে নিয়ে চেপে ধরে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি তাতে এমনভাবে ভয় পেয়ে যায়, যেমনি মায়ের চাপে শিশুও কাঁদে। এ জন্যই হুযূর 'আবদ্-ই সালিহ' (পুণ্যবান বান্দা) বলেছেন। কবরের আযাব কাফির কিংবা গুনাহ্গারেরই হয়। পরবর্তী হাদীস সেটার ব্যাখ্যা। হুযূরের বরকত এবং তাকবীর ও তাহ্লীলের ওসীলায় এ সঙ্কীর্ণতাও দূর হয়ে গেলো।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, কবরের পাশে তাসবীহ্ ও

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الَّذِىْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضُمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ - رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا

১২৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ইনি হলেন ওই ব্যক্তি, যাঁর জন্য আল্লাহ্‌র আরশ নড়ে ওঠেছিলো। তাঁর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে[৮১] এবং তাঁর জানাযায় সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা হাযির হয়েছেন।[৮২] অবশ্যই তার জন্যও কবরকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে চাপিয়ে দেওয়ার মতোই। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর জন্য সহজ করে দিয়েছেন।"[৮৩] [নাসাঈ]

১৩০ ॥ হযরত আসমা[৮৪] বিনতে আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়ায করার জন্য দাঁড়ালেন।[৮৫]

তাকবীর মৃত ব্যক্তির জন্য উপকারী। তাছাড়া, বুঝা গেলো যে, হুযূরের চক্ষু মুবারক উপর থেকে কবরের অভ্যন্তরের অবস্থাও দেখতে পায়; তাঁর জন্য কোন কিছুই অন্তরাল নয়। স্মর্তব্য যে, হুযূরের ক্বদম শরীফের বরকতে কবরের মুসীবতসমূহ দূরীভূত হয়ে যায়। এ তাকবীর বলা আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কোন বে-আদব এটা বলতে পারবে না যে, হুযূর থাকা অবস্থায় আযাব কেন হয়েছে? কেননা, এটা কোন আযাবই ছিলো না।

৮১. অর্থাৎ সা'দ ইবনে মু'আযের জন্য আসমানের দরজা খুলে দিয়েছেন। সেখানকার ফিরিশ্‌তারা তাঁর পুণ্যাত্মাকে স্বাগত জানান এবং তাঁর আত্মা পৌঁছুলে আরশ-ই আ'যম খুশীতে নড়ে ওঠেছে। আসমানসমূহ থেকে ফিরিশ্‌তাগণ ও রহমত অবতীর্ণ হয়েছে।

'মিরক্বাত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মু'মিনদের আত্মাগুলো ওই বেহেশ্‌তেই থাকে, যা সপ্তম আসমানের উপরে অবস্থিত।

৮২. আল্লাহ্‌র রহমত নিয়ে কিংবা তাঁর জানাযায় শরীক হবার জন্য।

৮৩. এ বচনগুলো পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাখ্যা, যা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এ সঙ্কীর্ণতা কবরের আযাব ছিলো না; বরং কবরের রহমত (মমতা)ই ছিলো; যদিও তা তাঁর জন্য ভয়ানক ছিলো। বিড়াল নিজের ছানাকেও মুখে চেপে ধরে এবং ইঁদুরকেও। কিন্তু দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

৮৪. তাঁর উপাধি 'যা-তুন্ নাত্বা-ক্বাঈন' (ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ)। তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বার বড় বোন। হযরত যুবায়র ইবনে 'আউয়ামের স্ত্রী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়রের মাতা। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের কন্যা।

তিনি আঠারতম মহিলা, যাঁরা মক্কা-ই মু'আযযমায় ঈমান এনেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা অপেক্ষা দশ বছরের বড় ছিলেন। তাঁর সাহেবযাদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়রকে হাজ্জাজ ইবনে ইয়ূসুফ শূলীতে দিয়ে শহীদ করেছিলো। শূলী থেকে তাঁর লাশ মুবারক আনার দশ দিন পর হযরত আসমার ইন্তিকাল হয়। মক্কা মু'আযযমায় তাঁকে দাফন করা হয়। এই ঘটনা হিজরী ৭৩ সনে ঘটেছিলো।

৮৫. মসজিদে নবভী শরীফে, যেখানে পুরুষ ও নারীদের জমায়েত ছিলো। পুরুষরা আগে ছিলেন, মহিলারা পর্দা সহকারে পেছনে ছিলেন; যেমনিভাবে, ওই যুগে সাধারণ প্রচলন ছিলো, বরং মহিলাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো যেন তাঁরা ওয়াযের মজলিসে অংশগ্রহণ করেন; যাতে তাঁরা নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত বিধি-বিধান ও মাসআলা-মাসা-ইল সম্পর্কে অবগত হন।

স্মর্তব্য যে, খোতবা ও ওয়াজ দাঁড়িয়ে প্রদান করা সুন্নাত। ফাতাওয়া-ই শামী'তে উল্লেখ করা হয়েছে, বিয়ের খোতবাও দাঁড়িয়ে পড়া চাই।

وَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يُفْتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ هٰكَذَا وَزَادَ النَّسَائِىُّ حَالَتْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَنْ اَفْهَمَ كَلَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيْبٍ مِّنِّىْ اَىْ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اٰخِرِ قَوْلِهٖ قَالَ قَالَ قَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا مِّنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

তখন তিনি কবরের পরীক্ষার আলোচনা করলেন, যে পরীক্ষার মানুষ সম্মুখীন হয়।[৮৬] সুতরাং যখন তিনি তা উল্লেখ করলেন, তখন মুসলমানরা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন।[৮৭] ইমাম বোখারী হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম নাসাঈ নিম্নলিখিত অংশটি বর্ধিতাকারে উল্লেখ করেছেন, কান্নার স্বর আমার ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র বাণী বুঝার মধ্যভাগে অন্তরায় হয়েছিলো। যখন তাদের কান্নাকাটির স্বর থেমে গেলো, তখন আমি আমার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে বললাম, 'আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দান করুন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সর্বশেষ বাণী মুবারক কি ছিলো?[৮৮] লোকটি বললেন, হুযূর এরশাদ করেছেন, "আমার কাছে এ মর্মে ওহী এসেছে যে, তোমরা কবরে এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, যা দাজ্জালের ফিত্নার কাছাকাছি।"[৮৯]

৮৬. 'কবরের ফিত্না' মানে সেখানকার পরীক্ষা। المرء শব্দ দ্বারা বুঝা গেলো যে, কবরের হিসাব শুধু মানুষেরই হবে, জিন বা পশুগুলোর এ হিসাব নেই। কেননা, তাদের জন্য না জান্নাত রয়েছে, না সেখানকার নি'মাতসমূহ। কাফির জিনদের জন্য শুধু জাহান্নাম রয়েছে। জানোয়ারগুলোর জন্য দু'টির মধ্যে কোনটি নেই; বরং অত্যাচারের প্রতিশোধের ব্যবস্থা করে, ওইগুলোকে মাটি (বিলীন) করে দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে গবেষণালব্ধ অভিমত আমার 'ফাতাওয়া-ই নঈমিয়া'য় দেখুন।

৮৭. ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে কেঁদে ফেললেন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে উচ্চস্বরে ধ্বনিত হয়ে গেলো,এতে 'রিয়া'র অবকাশ ছিলো না। স্মর্তব্য যে, আল্লাহর ভয়ে শুধু অশ্রু বিসর্জন দিয়ে ক্রন্দন করা খুবই উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান-تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ (...তখন তাদের চোখগুলো দেখো, অশ্রুতে ভরে ওঠেছে।।৫:৮৩) কিন্তু যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে মানুষের সম্মুখেও কান্নার স্বর উঁচু হয়ে যায়, তাহলে তাও ইবাদত হবে।

৮৮. এ থেকে কয়েকটি মাসআলা বুঝা গেলো: **এক.** নারীরা পরপুরুষের সাথে শরীয়তসম্মত প্রয়োজনে পর্দার আড়ালে থেকে কথাবার্তা বলতে পারে। তবে শর্ত হলো- সাদাসিদে কথাবার্তা বলবে। কণ্ঠ যেন মধুর ও আকর্ষণীয় না হয়। মহান রব এরশাদ করেন-وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ (এবং যখন তোমরা তাদের নিকট থেকে কিছু ভোগ্যসামগ্রী চাও, তখন পর্দার পেছন থেকে চাও।।৩৩:৫৩) মহান রব আরো এরশাদ করেন, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ (...তাহলে, কথায় এমন কোমলতা অবলম্বন করো না।।৩৩:৩২) **দুই.** দো'আ দিয়ে কোন কথা জিজ্ঞেস করা উত্তম, যাতে সম্বোধিত ব্যক্তি আনন্দিত হয়। মু'মিনকে খুশী করাও ইবাদত। **তিন.** দ্বীনী বিষয়সমূহে একজনের সংবাদও গ্রহণযোগ্য, কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।

৮৯. অর্থাৎ কবরের ফিত্না (পরীক্ষা) দাজ্জালের ফিত্নার মত বড় বিপজ্জনক। দাজ্জালের ফিত্না হতে সে-ই রক্ষা পাবে যাকে আল্লাহ্ রক্ষা করবেন। অনুরূপ, কবরের হিসাবে ওই ব্যক্তিও সফল হবে, যাকে আল্লাহ্ সফল করেন। এ দু'স্থানে দৃঢ়তার সাথে অটল থাকা নিজের বাহাদুরী দ্বারা সম্ভব নয়। দাজ্জাল নিজেকে খোদা বলে দাবী করবে এবং বহু মানুষ তাকে খোদা বলে স্বীকারও করবে। কবরে শয়তান সম্মুখে এসে যায় এবং বলে, "আমি তোমার রব। আমাকে রব বলে মেনে নাও, তবেই সফল হয়ে যাবে।" শয়তানের বংশধরগণ মৃতের আত্মীয়- স্বজনের আকৃতি ধারণ করে সামনে এসে বলে থাকে, "হে বৎস! তাকে খোদা বলে মেনে নাও।" আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহু'র কিতাব 'ঈযানুল আজর' এবং আমার কিতাব 'জা-আল্ হক্ব' দেখুন। এ জন্যেই কবরের উপর 'আযান' দেওয়া হয়, যাতে শয়তানের দল পালিয়ে যায়।

وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ دَعُوْنِىْ اُصَلِّىْ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيْرُ اِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ فِىْ قَبْرِهٖ غَيْرَ فَزِعٍ وَّلَا مَشْغُوْبٍ ثُمَّ يُقَالُ فِيْمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ كُنْتُ فِى الْاِسْلَامِ فَيُقَالُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ جَآءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَصَدَّقْنَاهُ

১৩১ ॥ হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, হুযূর এরশাদ করলেন, "মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে প্রবেশ করানো হয়, তখন তার মনে হয় যেন সূর্য ডুবে যাচ্ছে।[৯০] তখন সে চক্ষুদ্বয় মোচন করতে করতে ওঠে বসে এবং বলে, "আমাকে ছেড়ে দাও, নামায পড়ে নিই।""[৯১] [ইবনে মাজাহ]

১৩২ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, "মৃত ব্যক্তি কবরে পৌঁছানোর পর তাকে বসানো হয়, সে ভীত হয় না, পেরেশানও হয় না।[৯২] তারপর তাকে বলা হয়, "তুমি কোন দ্বীনে ছিলে?" সে বলে, "দ্বীন ইসলামে।"[৯৩] তারপর বলা হয়, "ইনি কে?" সে বলে, "মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্, যিনি আমাদের কাছে মহান রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি।"[৯৪]

---

৯০. এ অনুভূতি মুনকার-নাকীরের জাগ্রত করার ফলেই হয়ে থাকে। দাফন যখনই হোক না কেন, যেহেতু আসরের নামাযের প্রতি বেশি তাকীদ দেওয়া হয়েছে এবং সূর্য অস্ত যাওয়া ওই আসরের সময় অতিবাহিত হওয়ারই দলীল, সেহেতু এ সময়টি দেখানো হয়।

৯১. অর্থাৎ হে ফিরিশ্‌তাগণ! প্রশ্ন পরে করুন! আসরের সময় চলে যাচ্ছে, আমাকে নামায আদায় করতে দিন! এটা ওই ব্যক্তিই বলবে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আসরের নামায নিয়মিতভাবে গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করতো।

মহান আল্লাহ্ আমাকে উক্ত অভ্যাস দান করুন! এ জন্যই মহান রব এরশাদ করেন- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থাৎ "তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষতঃ আসরের নামায।" [২:২৩৮]

সম্মানিত সূফীগণ বলেন, যেভাবে জীবন যাপন করবে, তেমনিভাবেই মৃত্যুবরণ করবে এবং যেমনিভাবে মৃত্যুবরণ করবে, তেমনিভাবেই ক্বিয়ামতে পুনরুত্থিত হবে।

স্মর্তব্য যে, মু'মিনের কাছে ওই সময় তেমনই মনে হবে, যেমন সে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। জান-কব্জ ইত্যাদির কথা সে ভুলে যাবে। এটারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এরূপ আরম্ভ করার পর সাওয়াল-জাওয়াবও হবে না। আর হলেও তা অত্যন্ত সহজ হবে। কেননা, তার এরূপ কথাবার্তায় সমস্ত সাওয়ালের জাওয়াব হয়ে গেছে।

৯২. এটা মু'মিনের অবস্থা হবে। এরূপ প্রশান্তির কারণে প্রশ্নগুলোর উত্তর সহজভাবে দেবে। সে দুনিয়ায় যথেষ্ট আশঙ্কা-ভয় করেছিলো। এখন তার প্রশান্তির সময় এসে গেছে।

৯৩. অর্থাৎ জীবদ্দশায়ও ইসলামের উপর ছিলে এবং এখনো; কিন্তু যেহেতু শাস্তি ও প্রতিদানের ভিত্তি জীবদ্দশার ঈমান ও আমলগুলোর উপর নির্ভরশীল, সেহেতু এখানে এটারই উল্লেখ করা হয়েছে।

কিছু সংখ্যক নেক্কার ব্যক্তি কবরে ক্বোরআন তিলাওয়াত, বরং নামায সম্পন্ন করে থাকেন; কিন্তু এতে সেগুলোর কোন সাওয়াব বা প্রতিদান নেই; তা আত্মাকে তৃপ্তি দেয় মাত্র। এ জন্য বুযুর্গদের রূহগুলোতেও সৎকার্যাদির সাওয়াব পৌঁছানো হয়। সুতরাং হাদীসের বিরুদ্ধে আপত্তি করা যায় না, كُنْتُ (আমি ছিলাম) মর্মে কেন এরশাদ করেছেন?

৯৪. স্মরণ রাখবেন যে, যদিও 'ইসলাম' শব্দের মধ্যে তাওহীদ, রিসালত এবং সমস্ত আক্বীদার বিবরণ এসে গেছে; কিন্তু তবুও চূড়ান্ত প্রশ্ন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে করা হয়।

'কলেমা' সমাপ্ত হয় তাঁর নাম নিয়ে, নামায সমাপ্ত হয় তাঁকে সালাম দিয়ে, কবরের পরীক্ষা সমাপ্ত হয় তাঁর পরিচয় নিয়ে।

فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللّٰهَ فَيَقُوْلُ مَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّرَى اللّٰهَ فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهِ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلٰى مَاوَقَاكَ اللّٰهُ ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ اِلٰى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ اِنْشَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى۔

তখন তাকে বলা হয়, "তুমি কি আল্লাহকে দেখেছো?"[৯৫] সে বলে, "কারো পক্ষে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়।"[৯৬] তারপর দোযখের দিকে জানালা খোলা হয়। সে ওদিকে দেখতে পায় যে, একে অপরকে পদদলিত করছে।"[৯৭] তারপর তাকে বলা হয়, "ওদিকে দেখো যা থেকে আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করেছেন।"[৯৮] তারপর বেহেশ্তের দিকে জানালা খুলে দেওয়া হয়, তখন সে সেখানকার নয়নাভিরাম সজীবতা আর যা কিছু তাতে বিদ্যমান সবকিছু দেখতে পায়।[৯৯] তারপর তাকে বলা হয়, "এটাই তোমার ঠিকানা। তুমি ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলে। সেটার উপর মৃত্যু বরণ করেছো এবং ইন্শা- আল্লাহ্ সেটার উপরই উত্থিত হবে।"[১০০]

'খাতামিয়াত' (পরিসমাপ্তি)'র মুকুট তাঁরই পবিত্র শিরে। সর্বত্র মুক্তি তাঁরই আশ্রয়ে হয়ে থাকে।

৯৫. অর্থাৎ তুমি যে বলছো, 'তিনি আল্লাহর কাছ থেকে নিদর্শনসমূহ এনেছেন', তুমি কি আল্লাহকে দেখেছো তাঁকে নবী করে পাঠাতে ও নিদর্শনসূহ দান করতে?

সে বলে, "নিজে তো দেখি নি, প্রত্যক্ষদর্শী প্রিয় রসূলের নিকট থেকে শুনেছিলাম। আমার কাছে তাঁর পবিত্র বাণী স্বীয় চোখে দেখার চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য। আমার চোখে দেখতে ভুল হতে পারে, কিন্তু তাঁর পবিত্র বাণী ভুল হতে পারে না।"

স্মর্তব্য যে, এ কথোপকথন পরিষ্কার বহির্ভূত। ফিরিশ্তারা সন্তুষ্ট হয়ে তার সাথে এ কথাগুলো বলে থাকেন।

৯৬. সুবনাল্লাহ! দুনিয়ায় এ চক্ষু যুগল দ্বারা অজ্ঞ মুসলমানও মৃত্যুর সাথে সাথেই আক্বাইদের আলিম হয়ে যায়।

৯৭. স্মরণ রাখা দরকার যে, মু'মিন ওই সময় দোযখের আগুন দেখতে পান। তবে তা মোটেই কষ্টদায়ক নয়। 'পদদলিত করা'র মর্মার্থ হচ্ছে, এত অধিক পরিমাণ আগুন, যেন আগুনের ভিড় জমে গেছে। যেমন একজন অন্যজনকে পদদলিত করছে।

৯৮. এ থেকে দু'টি মাসআলা প্রতীয়মান হয়:

এক. দোযখ থেকে রক্ষা পাওয়া নিছক নিজের আমলের ভিত্তিতে নয়; বরং তা মহান রবের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। কারণ, তাঁর বদান্যতার ফলেই কবরে সফলতা অর্জিত হয়।

দুই. প্রত্যেক ব্যক্তির স্থান বেহেশ্তেও রয়েছে এবং দোযখেও রয়েছে। মু'মিন বেহেশ্তে নিজের স্থানও লাভ করবেন এবং কাফিরের স্থানও। মু'মিনকে দোযখের স্থান প্রথমে দেখানো হয়, তাকে অধিক আনন্দিত করার জন্য।

৯৯. শুধু দেখেন না; বরং তা থেকে উপকৃতও হন এবং দোযখের জানালা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়; কিন্তু এ (বেহেশ্তের) জানালাটি ক্বিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকে।

১০০. অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমার নিজ আক্বীদাগুলোর উপর নিশ্চিত বিশ্বাস (عِلْمُ الْيَقِيْن) ছিলো, যা শ্রবণ দ্বারা অর্জিত হয়েছিলো। কবরে এ সব কিছু দেখে চাক্ষুষ বিশ্বাস (عَيْنُ الْيَقِيْن) অর্জিত হলো। আর হাশরের পরে সেখানে পৌঁছে বাস্তব বিশ্বাস (حَقُّ الْيَقِيْن) অর্জিত হবে। দৃঢ়বিশ্বাস (يَقِيْن) সব সময় ছিলো, সেটার মর্যাদা উন্নীত হতে থাকে।

স্মর্তব্য যে, যেমনিভাবে জীবনযাপন করবে, সেভাবেই মৃত্যুবরণ করবে। 'ইন্শা- আল্লাহ' (যদি আল্লাহ্ চান) -বলাটা বরকত হাসিলের জন্য; সন্দেহের ভিত্তিতে নয়। মহান রব এরশাদ করেন-

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَآءَ اللّٰهُ

(নিশ্চয় নিশ্চয় তোমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে; যদি আল্লাহ্ চান।৪৮:২৭)

وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السُّوْءُ فِىْ قَبْرِهٖ فَزِعًا مَشْغُوْبًا - فَيُقَالُ لَهٗ فِيْمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ لَاأَدْرِىْ فَيُقَالُ لَهٗ مَاهٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلًا فَقُلْتُهٗ فَيُفَرَّجُ لَهٗ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ اِلٰى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ اِلٰى مَاصَرَفَ اللّٰهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهٗ فُرْجَةً اِلَى النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهٗ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

মন্দ ব্যক্তিকে তার কবরে বসানো হয়, হতবুদ্ধি ও পেরেশান অবস্থায়।[১০১] অতঃপর তাকে বলা হয়, "তুমি কোন্ দ্বীনের উপর ছিলে?" সে বলে, "আমি জানি না।" তারপর বলা হয়, "ইনি কে?" সে বলে, "আমি লোকদেরকে কিছু বলতে শুনেছি, আমিও তা-ই বলেছিলাম।"[১০২] তখন তার সামনে বেহেশ্তের দিকে জানালা খুলে দেওয়া হয়। সে সেখানকার সজীবতা ও সেখানে বিদ্যমান নি'মাতসমূহ দেখতে পায়। তারপর তাকে বলা হয়, "ওটা দেখো, যা আল্লাহ্ তোমার কাছ থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।" তারপর দোযখের দিকে জানালা খুলে দেওয়া হয়। তখন সে দেখতে পায় যে, সেখানে একে অপরকে পদদলিত করছে। তারপর তাকে বলা হয়, "এটাই তোমার ঠিকানা।[১০৩] তুমি সন্দেহের উপর ছিলে, সেটার উপর মৃত্যু বরণ করেছো। সেটার উপরই ইন্শা- আল্লাহ্ উত্থিত হবে।"[১০৪] [ইবনে মাজাহ্]

---

১০১. কেনना, কাফির পৃথিবীতে খোদাভীতিশূন্য ছিলো। এখন থেকে তার ভয় শুরু হয়ে গেলো।

১০২. মুনাফিক্ব শুধু মানুষের দেখাদেখি মুখে 'রসূলুল্লাহ' বলে ফেলেছিলো। কাফির নিজের বন্ধু-বান্ধব থেকে শুনে তাঁকে যাদুকর ইত্যাদি বলতো। মোটকথা, সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে।

১০৩. এখানেও পূর্ববর্তী আলোচনা স্মরণ রাখা চাই। তা হচ্ছে কাফির বেহেশ্ত শুধু দেখতে থাকে, তা থেকে মোটেই উপকৃত হয় না। আর বেহেশ্তের জানালা তৎক্ষণাৎ বন্ধও করে দেওয়া হয়।
এ দেখানো অধিক অনুশোচনার জন্য। দোযখকে প্রত্যক্ষও করে এবং সেটার উষ্ণতা দ্বারা কষ্টও ভোগ করতে থাকে। আর এ জানালা কখনো বন্ধ হবে না।

১০৪. সাধারণ কাফিরদের মধ্যে তাদের ধর্মের উপরও দৃঢ়তা (অটলতা) থাকে না; সামান্য বিপদাপদের কারণেও ধর্ম ছেড়ে দেয়। মহান রব এরশাদ করেছেন- دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (তখন তারা আল্লাহকে ডাকে একান্ত তাঁরই নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে।১০:২২) আমি কোন কোন হিন্দুকে মসজিদের দরজায় নামাযীদের জুতোর ধূলিতেও চুমু খেতে দেখেছি, সম্মানিত পীর- বুযুর্গদের পদচুম্বন করতেও দেখেছি।
আর যেসব কট্টর কাফিরের মধ্যে তাদের ধর্মের উপর দৃঢ়তা ও বিশ্বাস রয়েছে, তাকেও দৃঢ় বিশ্বাস বলা যায় না, বরং সেটার নাম হবে 'জাহলে মুরাক্কাব' অর্থাৎ মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। তাছাড়া, তার এ বিশ্বাস (ভরসা) মৃত্যুর সাথে সাথেই নিঃশেষ হয়ে যায়। সুতরাং মৃত্যুর পর তার বুঝে আসে না যে, সত্য দ্বীন কি?
সুতরাং এ হাদীসের বিরুদ্ধে এ আপত্তি করা যাবে না যে, 'কোন কোন কাফিরের তো তাদের ধর্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তারপরও এ হাদীস কিভাবে বিশুদ্ধ হলো।'

بَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ◆ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌّ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অধ্যায় : ক্বোরআন ও সুন্নাহ্কে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ◆ ১৩৩ ॥ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে এমন রীতি উদ্ভাবন করে, যা এ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।[২] বোখারী, মুসলিম।

১. اِعْتِصَام, عَصْمٌ হতে গঠিত। এর অর্থ নিষেধ করা, বিরত রাখা। পূতঃপবিত্র হওয়াকে এ জন্যই عَصْمَتْ বলা হয়; যেহেতু তা গুনাহ্ হতে বিরত রাখে। সেটার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শক্তভাবে ধরা, ছুটে যাওয়া ও পালিয়ে যাওয়া, রুখে রাখা। শরীয়তের পরিভাষায়, সত্যতার উপর বিশ্বাস এবং সেটা অনুসারে নিয়মিতভাবে আমল করাকে اعتصام বলা হয়। এখানে كِتَاب মানে 'ক্বোরআন শরীফ' এবং 'সুন্নাহ্' মানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওই সব পবিত্র বাণী, বরকতময় আমল ও অবস্থা, যেগুলো মুসলমানদের জন্য আমলের উপযোগী। হুযূরের এসব কর্মকে শরীয়ত বলা হয় এবং পুণ্যময় অবস্থাকে তরীক্বত বলা হয়। সূফীদের দৃষ্টিতে হুযূরের শরীর মুবারকের অবস্থাদি হল শরীয়ত, ক্বলবের অবস্থাদি হচ্ছে তরীক্বত, রূহের অবস্থাদি হাক্বীক্বত এবং 'সির' (একটি বাতেনী স্তরের অবস্থা)কে মা'রিফাত। 'সুন্নাত' এর মধ্যে এ সবই অন্তর্ভুক্ত।

স্মর্তব্য যে, হুযূরের বৈশিষ্ট্যাবলী (خُصُوْصِيَّات) 'সুন্নাহ' নয়। সুতরাং নয় জন স্ত্রী বিবাহাধীন রাখা, উটের উপর আরোহন করে তাওয়াফ করা, মিম্বরের উপর নামায পড়ানো ইত্যাদি যদিও হুযূরের পুণ্যময় কার্যাবলী; কিন্তু আমাদের জন্য এগুলো অনুসারে আমল করার বিধান নেই। প্রত্যেক 'সুন্নাহ' হাদীস; কিন্তু প্রত্যেক 'হাদীস' সুন্নাহ্ নয়। এ জন্য গ্রন্থকার রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এখানে 'সুন্নাহ' বলেছেন, 'হাদীস' বলেন নি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ (আমার সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরো), بِحَدِيْثِىْ (আমার হাদীসকে) বলেন নি। তাছাড়া, আমাদের নাম, আল্লাহ্র প্রশংসাক্রমে, 'আহলে সুন্নাত' অর্থাৎ সমস্ত সুন্নাত অনুসারে আমলকারী, 'আহলে হাদীস' নয়। কেননা, সমস্ত হাদীসের উপর কেউ আমল করতে পারে না এবং কেউ 'আহলে হাদীস'ও হতে পারে না।

এটাও স্মর্তব্য যে, শরীয়তের দলীল চারটি: 'কিতাবুল্লাহ' (ক্বোরআন), সুন্নাহ্, ইজমা'-ই উম্মত এবং মুজতাহিদীনের ক্বিয়াস। কিন্তু কিতাব ও সুন্নাহ্ হচ্ছে সব দলীলের মূল আর ইজমা ও ক্বিয়াস ওইগুলোর পরে। কেননা, যদি কোন মাসআলা প্রথমোক্ত দু'টিতে পাওয়া না যায়, তখনই এ শেষোক্ত দু'টির দিকে মনোনিবেশ করবে। তাছাড়া, ক্বিয়াস হচ্ছে, ক্বোরআন-সুন্নাহর মর্মার্থ প্রকাশকারী। এ কারণে গ্রন্থকার (মিশকাত প্রণেতা) শুধু কিতাব ও সুন্নাহ্রই উল্লেখ করেছেন। অপর দু'টির উল্লেখ করেন নি। নতুবা এ দুটিও অত্যন্ত জরুরী। সিদ্দীক্ব-ই আকবর ও ফারূক্ব-ই আ'যমের খিলাফত উম্মতের ইজমা' বা ঐকমত্যের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁদের খিলাফতকে অস্বীকার করা কুফর। বাজরা এবং চাউলের মধ্যে সূদ হারাম; কিন্তু কিতাব ও সুন্নাহতে এর স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ক্বিয়াস দ্বারাই ওইগুলো হারাম হওয়া প্রমাণিত। এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে দেখুন। কিতাব ও সুন্নাহ্ হচ্ছে সমুদ্র; কোন ইমামের জাহাজে বসে সেটা অতিক্রম করো। কিতাব ও সুন্নাহ্ ঈমানী চিকিৎসার ঔষধ। কোন রূহানী চিকিৎসক অর্থাৎ মুজতাহিদ ইমামের পরামর্শক্রমে সেগুলো ব্যবহার করো।

২. অর্থাৎ এ উদ্ভাবনকারী প্রত্যাখ্যাত (মরদূদ) অথবা তার এ উদ্ভাবন প্রত্যাখ্যানযোগ্য। স্মর্তব্য যে, امر মানে দ্বীন-ইসলাম এবং ما মানে আক্বাইদ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামে ইসলাম বিরোধী আক্বীদা উদ্ভাবন করে- সেও প্রত্যাখ্যাত আর ওই আক্বাইদও বাতিল। সুতরাং রাফেযী, ক্বাদিয়ানী এবং ওহাবী ইত্যাদি বাহাত্তর ফির্কা, যাদের আক্বাইদ ইসলাম বিরোধী, সবই বাতিল।

অথবা امر দ্বারা দ্বীন বুঝায় এবং ما দ্বারা আমালসমূহ বুঝায়। আর لَيْسَ مِنْه-এর মর্মার্থ হচ্ছে- 'ক্বোরআন ও হাদীসের বিরোধী।' অর্থাৎ যে কেউ দ্বীনে এমন আমল উদ্ভাবন করে, যা দ্বীন অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহ'র বিপরীত হবে, যা দ্বারা সুন্নাত উঠে যায়, ওই উদ্ভাবনকারীও মরদূদ এবং এরূপ আমলও বাতিল। যেমন- উর্দূতে কিংবা বাংলায় খোত্বাহ্ ও

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهُدٰى هُدَى مُحَمَّدٍ وَّشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৪ ॥ হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হাম্দ ও সালাতের পর, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম কথা[৩] হলো আল্লাহ্র কিতাব এবং সর্বোৎকৃষ্ট ত্বরীকা মুহাম্মদ (মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র ত্বরীকা। আর সর্বনিকৃষ্ট বস্তু হলো- দ্বীনের মধ্যে বিদ'আতসমূহ এবং প্রত্যেক বিদ্'আতই গোমরাহী (ভ্রষ্টতা)।[৪] [মুসলিম]

নামায পড়া, ফার্সীতে আযান দেওয়া ইত্যাদি। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে ওই হাদীস, যা সামনে আসছে। তা হচ্ছে যে কেউ বিদ'আত সৃষ্টি করে, তখন আল্লাহ্ সুন্নাতকে উঠিয়ে নেন। আমার এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ হাদীস স্বীয় ব্যাপকতার উপর প্রযোজ্য হবে। এতে কোন শর্তারোপের প্রয়োজন নেই। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, لَيْسَ مِنْهُ দ্বারা বুঝা গেলো যে, দ্বীনের মধ্যে এমন কাজের উদ্ভাবন করা, যা কিতাব ও সুন্নাহ্র বিরোধী নয়, তাকে মন্দ বলা যাবে না।

৩. এ পবিত্র বাণী হুযূর ওয়া'যের মধ্যে খোত্বার পরে এরশাদ করেছেন। এ জন্য বলেছেন اَمَّا بَعْدُ। 'حَدِيْثٌ' শব্দের অর্থ শর্তহীনভাবে 'কথা' ও 'বাণী'। সুতরাং এ অর্থানুসারে ক্বোরআনকেও হাদীস বলা যায় এবং মানুষের কথাকেও; কিন্তু হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায়, শুধু হুযূরের পবিত্র বাণী ও বরকতময় কাজকে হাদীস বলা হয়। এখানে 'হাদীস' আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত। আল্লাহ্র কালাম বা বাণী সমস্ত কথার মধ্যে তেমনই মর্যাদাপূর্ণ, যেমন স্বয়ং আল্লাহ্ নিজের সৃষ্টির উপর মর্যাদাবান। هُدٰى শব্দের অর্থ উত্তম স্বভাব। হুযূরের স্বভাব উত্তম। কেননা, তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আমাদের কাজ ও কথা নাফসানী এবং শয়তানীও হয়ে থাকে; কিন্তু হুযূরের প্রতিটি কথা ও কাজ রাহমানী। এ জন্যেই হুযূরের কোন কাজের উপর আপত্তি করা কুফর; কারণ তা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অভিযোগ করারই শামিল। লোকেরা হুযূরের কোন একটি বিবাহের ব্যাপারে বিদ্রূপ মন্তব্য করেছিলো। তখন আল্লাহ্ এরশাদ করেন, زَوَّجْنٰكَهَا 'আমি আপনাকে এ বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

৪. مُحْدَثٌ-এর অর্থ হল নতুন ও নব আবিষ্কৃত জিনিস। এখানে ওইসব আক্বীদা অথবা মন্দকর্ম বুঝানো হয়েছে, যেগুলো হুযূরের ওফাত শরীফের পর দ্বীনে উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিদ'আত'র আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'নতুন জিনিস।' আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ নতুন (নমুনা ছাড়া) সৃষ্টিকারী আসমানসমূহ ও যমীনের।[২:১১৭]।

পরিভাষায় এর ৩টি অর্থ রয়েছে: **এক.** নতুন আক্বীদা, যাকে 'বিদ'আতে ই'তিক্বাদী' বলা হয়। **দুই.** ওই সব নতুন আমল, যেগুলো ক্বোরআন ও হাদীসের বিপরীত এবং হুযূরের ওফাত শরীফের পর উদ্ভাবিত হয়েছে। **তিন.** এমন সব নতুন আমল, যেগুলো হুযূরের পর উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রথম দু'অর্থের ভিত্তিতে সব ধরনের বিদ'আতই মন্দ। কোনটিই ভাল নয়। তৃতীয় অর্থের ভিত্তিতে কিছু কিছু বিদ'আত ভাল আর কিছু কিছু মন্দ। এখানে বিদ'আতের প্রথম অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ভ্রান্ত আক্বীদা। কেননা, হুযূর নিজেই সেটাকে ضَلَالَتْ(গোমরাহী) বলে আখ্যায়িত করেছেন। গোমরাহী আক্বীদার কারণেই হয়, আমলের কারণে নয়। বেনামাযী গুনাহ্গার, গোমরাহ্ নয়; আর আল্লাহকে মিথ্যুক অথবা হুযূরকে নিজের মত সাধারণ মানুষ মনে করা বদ-আক্বীদা পোষণ এবং গোমরাহী। আর যদি দ্বিতীয় অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তবুও এ হাদীস শর্তহীনভাবে বহাল থাকবে। কোন শর্তারোপ করার প্রয়োজন নেই। আর যদি তৃতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হয়, অর্থাৎ 'নব উদ্ভাবিত কাজ', তা'হলে এ হাদীস عام مخصوص البعض (এমন ব্যাপকার্থক শব্দ, যার কিছু অংশ নির্দিষ্ট করা হয়)। কেননা, এই বিদ'আত দু'প্রকার: **এক.** বিদ'আত-ই হাসানাহ্ ও **দুই.** বিদ'আত-ই সায়্যিআহ্। এখানে বিদ'আত-ই সায়্যিআহ্ বুঝানো উদ্দেশ্য। বিদ'আত-ই হাসানার জন্য 'কিতাবুল ইল্ম'র ওই হাদীসই দলীল, যা পরবর্তীতে আসছে, مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তমপন্থার উদ্ভাবন করে, সে বড় সাওয়াবের উপযোগী।" বিদ'আত-ই হাসানাহ্ কখনো 'জায়েয', কখনো 'ওয়াজিব', কখনো 'ফরয' পর্যায়ের হয়। এর অত্যন্ত উত্তম গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ এ স্থানে 'মিরক্বাত ও আশি''আতুল লুম'আত'-এ দেখুন। তাছাড়া, 'শামী ও আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব'-এও দেখুন। কেউ কেউ এর অর্থ এটা করেন যে, 'যে কাজ হুযূরের ওফাত শরীফের পর উদ্ভাবিত হয়েছে, তা বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী।' কিন্তু এ অর্থ সম্পূর্ণ ভুল ও অপব্যাখ্যার শামিল। কেননা, সমস্ত দ্বীনী বিষয়, ছয় কলেমা, ক্বোরআন শরীফের ত্রিশ পারা, ইলমে

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ ثَلٰثَةٌ مُّلْحِدٌ فِى الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبٌ دَمَ اِمْرِءٍ مُّسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِّيُهْرِيْقَ دَمَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبٰى قِيْلَ وَمَنْ اَبٰى قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১৩৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্র দরবারে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত ঘৃণিত: হেরম শরীফে ধর্মহীনতা প্রদর্শনকারী,[৫] ইসলামে জাহেলিয়া যুগের প্রথা অন্বেষণকারী[৬] এবং অবৈধভাবে মুসলমানের রক্তপিপাসু, যাতে তার রক্তপাত করতে পারে।[৭] [বোখারী]

১৩৬ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার সমস্ত উম্মত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে;[৮] কিন্তু যে অস্বীকার করে। আরয করা হলো, অস্বীকারকারী কে? বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো, সে-ই হলো অস্বীকারকারী।[৯] [বোখারী]

হাদীস, হাদীসের প্রকারভেদ, শরীয়তের বিধান সম্বলিত কিতাবাদি, তরীক্বতের চারটি সিলসিলা, হানাফী, শাফে'ঈ কিংবা ক্বাদেরী, চিশ্‌তী ইত্যাদি, মুখে নামাযের নিয়্যত বলা, উড়ো জাহাজে করে হজ্জের সফর, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত নতুন সমরাস্ত্র দ্বারা জিহাদ করা ইত্যাদি এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিস; যেমন- পোলাও, জর্দা, ডাকঘর, রেলওয়ে ইত্যাদি সবই বিদ'আত। যেগুলো হুযূরের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। তখন তো এগুলো সবই হারাম হওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়; অথচ এগুলোকে কেউ হারাম বলে না।

৫. اَلْحَاد-এর আভিধানিক অর্থ মনোযোগ দেওয়া ও ঝুঁকে পড়া। শরীয়তের পরিভাষায় বাতিলের দিকে ঝুঁকে পড়া ব্যক্তিকে مُلْحِد বলা হয়। ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী ও পাপিষ্ট উভয়ই مُلْحِد। অর্থাৎ মক্কা মুকাররামার সীমানার অভ্যন্তরে পাপাচারী অথবা পাপ প্রসারকারী কিংবা বদআক্বীদা পোষণকারী অথবা সেটার প্রবর্তক। যেহেতু, যদিও এ কাজগুলো সবই সর্বত্র মন্দ; কিন্তু হেরম শরীফে সম্পন্ন করা অনেকগুণ বেশি মন্দ; সেহেতু তা ওই পবিত্র স্থানের মর্যাদারও বিরোধী। আর যেমনিভাবে হেরম শরীফের মধ্যে একটি নেকীর সাওয়াব এক লক্ষ, অনুরূপ একটি গুনাহর শাস্তিও এক লক্ষ। এ জন্যই হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা মক্কা শরীফ ছেড়ে তায়েফে গিয়ে বসবাস করেছিলেন।

৬. অর্থাৎ মুসলমান হয়ে মুশরিকদের প্রথাগুলোকে পছন্দ করে এবং প্রসার করে। যেমন- বিলাপ-রোদন করা, বুক চাপড়ানো, অনুমান করে ভবিষ্যৎকথন ইত্যাদি। এ' থেকে রাফেযীদের শিক্ষা গ্রহণ করা চাই। কারণ, তারা জাহেলিয়াতের বহু প্রথাকে ইবাদত মনে করে থাকে।

৭. অর্থাৎ মুসলমানকে যুলম করে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করা তো মহাপাপ। হত্যার চেষ্টা করাও জঘন্যতর পাপ। ওই ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করে, করায়, পরামর্শ দেয় এবং হত্যার পর হত্যাকারীকে অন্যায়ভাবে মুক্ত করার চেষ্টা করে।

৮. এখানে 'উম্মত' মানে 'উম্মত-ই এজাবত', যারা হুযূরের দ্বীন প্রচারের দাওয়াত গ্রহণ করে কলেমা পড়েছে; নতুবা হুযূরের 'উম্মত-ই দাওয়াত' তো সমগ্র সৃষ্টিজগত।

৯. 'অস্বীকার করা' মানে আমল না করা। আর এতে গুনাহ্‌গার মুসলমানও অন্তর্ভুক্ত। আর 'জান্নাতে প্রবেশ করা' মানে প্রথম পর্বে প্রবেশ করা।

অর্থাৎ খোদাভীরু মু'মিন প্রথম পর্বে প্রবেশের উপযোগী। ফাসিক্ব এর উপযোগী নয়। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ একেবারে স্পষ্ট। আর যদি অস্বীকার করার অর্থ আক্বীদাগত অস্বীকার হয়, তাহলে হাদীসের মর্মার্থ এটা হবে- 'মুসলমান বেহেশ্‌তের উপযোগী; কাফির নয়।' কিন্তু প্রথমোক্ত অর্থ অধিক শুদ্ধ।

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَتْ مَلٰٓئِكَةٌ اِلَي النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَنَائِمٌ فَقَالُوْا اِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوْا لَهٗ مَثَلًا قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهٗ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوْا مَثَلُهٗ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا وَّجَعَلَ فِيْهَا مَادُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ اَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَوَاَكَلَ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَاْكُلْ مِنَ الْمَادُبَةِ فَقَالُوْا اَوِّلُوْهَا لَهٗ يَفْقَهْهَا

১৩৭ || হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূরের দরবারে ফিরিশ্‌তাদের একটি দল উপস্থিত হলো, যখন তিনি নিদ্রারত ছিলেন।[১০] তখন তাঁরা বললেন, তোমাদের এ মহান ব্যক্তিত্বের একটি উপমা রয়েছে। তা তাঁকে বলে দাও।[১১] তখন তাঁদের একজন বললেন, তিনি ঘুমোচ্ছেন। আর কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু মুবারক নিদ্রামগ্ন এবং অন্তর শরীফ জাগ্রত।[১২] তখন তাঁরা বললেন, তোমাদের এ মহান ব্যক্তির উপমা হচ্ছে তেমনি, যেমন কোন ব্যক্তি ঘর তৈরি করলো, সেখানে দস্তরখানা রাখলো। আর আহ্বানকারীকে পাঠিয়ে দিলো। তখন যারা এ আহ্বানকারীর কথা মেনে নেবে, তারা ঘরে আসবে, দস্তরখানা হতে আহার করবে। আর যারা অমান্য করবে, তারা না ঘরে আসবে, না দস্তরখানা হতে খেতে পারবে।[১৩] তারপর বললেন, এর মর্মার্থও আরয করে দাও, যাতে ভালভাবে বুঝতে পারেন।[১৪]

১০. খুব সম্ভব যে, উক্ত ঘটনা হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে হুযূর স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, যেমনটি তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে। مَلٰٓئِكَةٌ দ্বারা ফিরিশ্‌তাদের কোন দল বুঝানো হয়েছে, যাঁদের মধ্যে হযরত জিব্রাঈল এবং মীকাঈলও অন্তর্ভুক্ত। হযরত জিব্রাঈল হুযূরের শিয়রে ছিলেন এবং মীকাঈল পা মুবারকের দিকে ছিলেন। যেমন তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে।
আর এটাও হতে পারে যে, হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং এ কথোপকথন নিজ কানে শুনেছেন, যেমনটি তিরমিযী শরীফেই হযরত ইবনে মাস'উদের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। সাহাবীরা ফিরিশ্‌তাদেরকে কখনো কখনো দেখতে পেতেন এবং তাঁদের কথাবার্তাও শুনতেন। [মিরক্বাত]
১১. যাতে তিনি তা শুনে উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দেন; কেননা নবীগণের স্বপ্নও ওহী।
১২. অর্থাৎ কোন কোন ফিরিশ্‌তা বলেন যে, "নিদ্রারত ব্যক্তির সামনে কিছু বলা ফলপ্রসূ নয়। জাগ্রত হবার পরে বর্ণনা করুন।" কিন্তু কেউ কেউ উত্তরে বললেন, "তাঁর নিদ্রা অন্য কারো মত নয়; তিনি ঘুমন্ত অবস্থায়ও অন্যান্য জাগ্রত লোকের চেয়েও বেশি সজাগ।"
স্মর্তব্য যে, ফিরিশ্‌তাদের এ কথোপকথনও আমাদেরকে শুনানোর জন্য, যা'তে আমরা নবীর ঘুম সম্বন্ধে এ ধরনের আক্বীদাই পোষণ করি। নতুবা এ মাসআলা সম্বন্ধে সমস্ত ফিরিশ্‌তা অবগত। মিরক্বাত প্রণেতা বলেছেন যে, পবিত্র শক্তির অধিকারীরা নিদ্রা অবস্থায়ও অধিক শক্তিশালী অনুভূতি রাখেন। এ জন্যেই সম্মানিত নবীগণের নিদ্রার কারণে ওযূ' ভঙ্গ হয় না। কারণ, তাঁরা একেবারে অচেতন হন না। তা'রীসের রাতে (لَيْلَةُ التَّعْرِيْس) হুযূর ফজরের সময় জাগ্রত না হওয়া এবং নামায ক্বাযা হয়ে যাওয়া অবহেলার কারণে ছিলো না; বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নিজের দিকে মনোনিবেশ করিয়ে নামায ক্বাযা করিয়ে দেন, যা'তে উম্মত ক্বাযা নামাযের বিধান সম্বন্ধে অবগত হয়।
১৩. مَادُبَةٌ - اَدَبٌ হতে গঠিত। এর অর্থ খাবারের জন্য আহ্বান করা। যেমন- عَتَبٌ হতে مَعْتُبَةٌ। ইসলামের পরিভাষায় সকল খাবারকেই مَادُبَةٌ বলে। যেমন- ওলীমাহ ইত্যাদি। এ উপমা থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বিমুখ হয়ে ইবাদতকারী না বেহেশতে যেতে পারবে, না সেখানকার নি'মাতসমূহ ভোগ করতে পারবে, না মহান রব তার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন। কেননা, আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী হলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই। এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায় যে, শুধু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মান্য করে আমল করা ব্যতীতও মানুষ জান্নাতী হয়ে গেছে।
১৪. অর্থাৎ এ স্বপ্নও ওহী এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাও ওহী দ্বারা

قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا الدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِيْ مُحَمَّدٌ فَمَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصٰى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ

তখন একজন বললেন, তিনি তো ঘুমোচ্ছেন। কেউ কেউ বললেন, তাঁর বরকতময় চক্ষুদ্বয় ঘুমোচ্ছে, অন্তর জাগ্রত।[১৫] অতঃপর তাঁরা বললেন, ঘর হলো জান্নাত এবং আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মদ মুস্তফা।[১৬] যে ব্যক্তি হুযূরের আনুগত্য করবে সে আল্লাহর অনুগত এবং যে ব্যক্তি হুযূরের অবাধ্য হবে সে আল্লাহ্‌রই অবাধ্য হলো।[১৭] আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড।[১৮] [বোখারী]

১৩৮ || হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বিবিগণের নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য হাযির হলো।[১৯]

বুঝানো হচ্ছে, অন্যথায় হুযূরের বুঝা এ বর্ণনার উপর নির্ভরশীল ছিলো না।

১৫. তাঁদের এক কথা দু'বার বলা নিশ্চয়তা প্রকাশের জন্য; যেন কোন মুসলমান এ মর্মে সন্দেহ পোষণ না করে যে, নবীর নিদ্রা অলসতার কারণে নয়।

১৬. হুযূর সৃষ্টিকুলকে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী। মহান রব এরশাদ ফরমান- دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী তাঁর অনুমতিক্রমে)। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর দীদার জান্নাতেই হবে সেহেতু হুযূরকে এখানে জান্নাতের দিকে আহ্বানকারী বলা হয়েছে। এ হাদীস ক্বোরআন শরীফের বিপরীত নয়।

১৭. এর তাফসীর হচ্ছে এ-ই আয়াত-مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ (যে রসূলের আনুগত্য করেছে, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করেছে।৪:৮০)

সুবহানাল্লাহ! এ এক আশ্চর্যজনক গূঢ় রহস্য যে, শুধু আল্লাহর অনুগত ব্যক্তি হুযূরের অনুগত নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরও অনুগত নয়। কিন্তু হুযূরের অনুগত ব্যক্তি আল্লাহরও অনুগত। শয়তান তো আল্লাহর অনুগত ছিলো, নুবূয়তকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর অনুগত থাকে নি।

১৮. অর্থাৎ কুফর ও ঈমান। কাফির ও মু'মিনের মধ্যে পার্থক্য শুধু হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'র পবিত্র স্বত্ত্বা দ্বারাই হয়ে থাকে বলে তাঁকে মান্যকারীই মু'মিন, আর তাঁকে অস্বীকারকারী কাফির।

তাওহীদ, জান্নাত ও দোযখে বিশ্বাস এবং ফিরিশ্‌তাদেরকে মেনে নেওয়া ঈমান নয়। কেননা, শয়তান এসব কিছু মানতো, কিন্তু কাফির হয়েছে।

অনুরূপ, জাতিগত ভ্রাতৃত্বের দিক থেকে এক কিংবা পৃথক হওয়া হুযূরের মাধ্যমেই। হুযূরকে মান্যকারী আমাদের একই জাতি, ভাই এবং আমাদের আত্মীয় সম্পর্কীয় হয়, সে যেকোন দেশেরই হোক না কেন? পক্ষান্তরে হুযূরকে অস্বীকারকারী না আমাদের জাতি হয়, না আমাদের আত্মীয়- স্বজন, না আমাদের স্বদেশী; যদিও সম্পর্কে সহোদর হয়। হুযূরের সাথে যার সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তার সম্পর্ক সৃষ্টি থেকেও বিচ্ছিন্ন, স্রষ্টা থেকেও।

তাওরীত শরীফে হুযূরের নাম 'ফারক্বলীত্ব' (فارقليط)। হযরত ঈসা মসীহ হাওয়ারীদেরকে বলেছিলেন, আমার পর 'ফারক্বলীত্ব' আসবেন। ইউহান্নার ইঞ্জীলে আছে, হযরত মসীহ বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আমি যবো না, ফারক্বলীত্ব আসবেন না। তিনি এসে তোমাদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ দেবেন, গোপনীয় রহস্যের কথা জানাবেন।"

[আশি''আতুল লুম'আত ও কিতাবুল ওয়াফা বি আখবারিল মুস্তফা]

১৯. رهط দশজনের কম লোকের দলকে বলা হয়। এখানে খুব সম্ভব 'ব্যক্তি' (فرد) অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তিনজন সাহাবী: হযরত আলী, হযরত উসমান ইবনে মায'উন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা কিংবা মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। তারা হুযূরের রাতের ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য হুযূরের কোন পুণ্যবতী বিবির নিকট হাযির হয়েছিলেন। নতুবা দিনের ইবাদত সম্পর্কে তো তাঁরা জানতেনই। [মিরক্বাত]

فَلَمَّا اُخْبِرُوْابِهَا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا وَّقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا
اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبَدًا وَّلَا اُفْطِرُ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَآءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَآءَ
النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ
وَاَتْقَاكُمْ لَهٗ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَآءَ

যখন তাঁদেরকে ইবাদত সম্বন্ধে অবহিত করা হলো, তখন খুব সম্ভব তারা যেন তা কিছুটা কম মনে করলো।[২০] তাঁরা বললেন, আমাদের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কী তুলনা হতে পারে? মহান রব তো তাঁর আগের ও পরের (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন।[২১] সুতরাং, তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, আমি প্রত্যহ সারারাত নামায পড়তে থাকবো।[২২] দ্বিতীয়জন বললেন, আমি সর্বদা দিনের বেলায় রোযা রাখবো, কখনো রোযা ভাঙ্গবোনা।[২৩] তৃতীয়জন বললেন, আমি নারীদের থেকে পৃথক থাকবো, কখনো বিয়ে করবো না।[২৪] এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিকট তাশরীফ আনলেন এবং এরশাদ করলেন, তোমরা ওইসব লোক, যারা এমন এমন বলেছো। সাবধান! আল্লাহরই শপথ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং অধিক তাক্বওয়া অবলম্বনকারী; কিন্তু আমি রোযাও রাখি, ইফতারও করি (রোযা ছেড়েও দিই), নামাযও পড়ি, নিদ্রাও যাই, বিবিদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধও হই।[২৫]

২০. কেননা, তাঁদের ধারণা ছিলো যে, হুযূর সারারাত জেগেই থাকেন এবং ইবাদত ছাড়া কোন কাজই করেন না; কিন্তু এটাই তাঁদেরকে জানানো হয়েছিলো যে, রাতে তিনি নিদ্রাও যেতেন, জেগেও থাকতেন এবং জাগ্রত অবস্থায় ইবাদতও করতেন। পার্থিব কাজও করতেন। তখন তাঁদের মনে এ ধারণা জাগলো।

২১. সুবহানাল্লাহ্! এ কেমন আদব! এ অল্প ইবাদতকে হুযূরের মহান মর্যাদার দলীল সাব্যস্ত করেছেন এবং এ বিশ্লেষণ করেছেন যে, গুনাহ্ মাফ করার জন্যই ইবাদত বেশি হওয়া চাই। হুযূর তো নিষ্পাপ। যদি ইবাদত একেবারে নাও করেন, তবুও সঠিক।

স্মর্তব্য যে, এ কথাটি ক্বোরআন করীম হতে গৃহীত। তা'হল

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

তরজমা: "যাতে আল্লাহ্ আপনার কারণে আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের গুনাহ্ ক্ষমা করেছেন।" [৪৮:২]

এ আয়াতের অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে ذَنْبٌ মানে 'বিচ্যুতি'; গুনাহ্ নয়। 'ইশক্ব' বা মুহাব্বতের দাবী এটাই যে, ذَنْبِكَ মানে 'আপনার উম্মতের গুনাহ্' যেগুলো মাফ করানো হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'র যিম্মায় রয়েছে। যেমনিভাবে নিয়োজিত উকিল বলেন, "আজ আমার মুক্বাদ্দামা রয়েছে।" (অথচ মুক্বাদ্দামা তো মুআক্কিলের।)

২২. অর্থাৎ প্রত্যেক রাতে, সারারাত জাগ্রত থেকে নামায পড়বো।

২৩. নিষিদ্ধ ৫টি দিন ব্যতীত। সেগুলো হচ্ছে শাওয়াল মাসের প্রথম দিন (ঈদুল ফিত্র), ক্বোরবানীর ঈদের দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ তারিখ, যেগুলোতে রোযা রাখা হারাম।

২৪. যেহেতু বিবাহ্ করাই মহান রব হতে উদাসীন হওয়া ও দুনিয়ায় আটকে পড়ার মাধ্যম। এ কারণেই জীবিকা অর্জনের চিন্তা করতে হয়।

২৫. সুবহানাল্লাহ্! কত উৎকৃষ্ট শিক্ষা যে, হুযূর 'আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আমাদেরকে খ্রিস্টান এবং সন্যাসীদের ন্যায় সংসার বিরাগী বানান নি; বরং দুনিয়াকেও দ্বীন বানিয়েছেন। কেননা, হুযূরের প্রতিটি কাজ সুন্নাত। সুতরাং ইফতার করাও সুন্নাত, রাতে তাহাজ্জুদ পড়া এবং নিদ্রা যাওয়াও সুন্নাত, বিবাহ করা ও সন্তান অর্জন করা, দুনিয়াবী কাজ-কারবার করা সবই সুন্নাত ও ইবাদত;

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ اَصْنَعُهٗ فَوَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهٗ خَشْيَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُأَبِّرُوْنَ النَّخْلَ

আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়, সে আমার নয়।[২৬] [বোখারী, মুসলিম]

১৩৯ || হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন কাজ সম্পন্ন করলেন। অতঃপর সেটার অনুমতি হয়ে গেলো।[২৭] কিন্তু একদল লোক তা থেকে বিরত রইলো।[২৮] এ সংবাদ হুযূরের নিকট পৌঁছালো। তিনি তখন খোত্‌বা পাঠ করলেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতঃপর এরশাদ করলেন, ওই সব লোকের কী অবস্থা যে, তারা এমন সব জিনিস থেকে বিরত থাকছে, যেগুলো আমি করি? আল্লাহরই শপথ! আমি তাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বেশি জানি এবং সবচেয়ে আল্লাহকে বেশী ভয় করি।[২৯] [বোখারী ও মুসলিম]

১৪০ || হযরত রাফি' ইবনে খাদীজ[৩০] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনলেন। (তখন) মদীনাবাসীরা খেজুর গাছগুলোর শাদী দিতেন।[৩১]

যেগুলো করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে ইনশা- আল্লাহ্। মু'মিনের এসব কাজে সাওয়াব রয়েছে। এখানে মিরক্বাত প্রণেতা সম্মানিত সাহাবীদের খোদাভীতির অনেক দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

২৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সুন্নাতকে খারাপ মনে করবে, সে ইসলাম বহির্ভূত। অথবা যে ব্যক্তি কোন ওযর ব্যতীত সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, সে আমার পরহেযগার উম্মতের দল থেকে খারিজ। সুতরাং হাদীসের বিপক্ষে কোন আপত্তি নেই।

স্মর্তব্য যে, বিবাহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুন্নাত। কখনো ফরয, কখনো হারাম। সুতরাং পুরুষত্বহীন লোকের জন্য বিয়ে করা নিষেধ। হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'র প্রতিটি সুন্নাত অনুসারে আমাল করায় সচেষ্ট থাকা চাই।

২৭. অর্থাৎ হুযূর আলায়হিস্ সালাত ওয়াস্ সালাম যখন পার্থিব কোন মুবাহ্ কাজ করেন, তখন এ কারণে তা মানুষের জন্য মুবাহ্ নয়, বরং সুন্নাত হয়ে যায়। হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি সেটা কোন্ কাজ ছিলো। সম্ভবতঃ রোযাদারের জন্য স্ত্রীকে চুম্বন করা ছিলো। কিংবা সফরের সময় রমযানের রোযা ছেড়ে দেওয়া। [মিরক্বাত]

২৮. এটা মনে করে যে, যদিও এটা করাও জায়েয, কিন্তু সেটা না করাই তাক্বওয়া। হুযূরের এ কাজ শুধু বৈধতার অনুমোদনের জন্যই।

২৯. তাদেরকে বলো যে, এটা ঠিক নয়। তাক্বওয়া ও পরহেযগারী আমার আনুগত্য দ্বারাই অর্জিত হবে। রাতে যেমনিভাবে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা সুন্নাত ও এবাদত, অনুরূপ আরামে নিদ্রা যাওয়াও সুন্নাত এবং এবাদত। কেননা, দু'টিই আমার ত্বরীক্বাভুক্ত।

৩০. তাঁর উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্। তিনি হারেসী ও আনসারী। উহুদের যুদ্ধে তীরবিদ্ধ হন; তবে আঘাত মারাত্মক ছিলো না, সেরে ওঠেছিলো। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে ওই আঘাত উথলে ওঠে; এতেই তাঁর ওফাত হয়। বদর যুদ্ধের সময় তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। বদর ব্যতীত অন্যান্য সকল যুদ্ধেই তিনি হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'র সাথে ছিলেন। ৮৬ বছর বয়সে ৭৩ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় তিনি ওফাত পান। সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়।

৩১. এভাবে যে, নর খেজুর গাছের ডাল মাদী খেজুর গাছের ডালে সংযোজন করে দিতেন। এতে ফলন বেশী ও ভাল হতো। পাকিস্তানে এ কাজকে 'গাছ বা বাগানের শাদী' বলা হয়। ওই সময় বাগানের মালিকগণ খুব আনন্দ-উৎসব করে। স্মর্তব্য যে, গাছপালার মধ্যেও নর এবং মাদী রয়েছে। কিছু লোক এ সম্পর্কে জানে এবং কতেক এ সম্পর্কে জানে

فَقَالَ مَاتَصْنَعُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوْا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوْهُ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَّائِىْ فَاِنَّمَا اَنَابَشَرٌ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ

তখন তিনি এরশাদ করলেন, "তোমরা এটা কি করছো?" তাঁরা বললেন, "আমরা তো আগে থেকেই এরূপ করে আসছি।" হুযূর এরশাদ করলেন, "সম্ভবত তোমরা এরূপ না করলে ভালই হতো।"[৩২] লোকেরা এ শাদী করানো ছেড়ে দিলেন। ফলন কম হলো। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা এ ঘটনা হুযূরের দরবারে আরয করলেন।[৩৩] তখন তিনি এরশাদ করলেন, "আমি একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদেরকে কোন দ্বীনী কাজের আদেশ দিই, তখন তা গ্রহণ করো এবং যখন নিজের রায় দ্বারা কিছু বলবো, তখন আমি তো মানুষই।"[৩৪] [মুসলিম]

না। নর গাছে বায়ু স্পর্শ করে যখন মাদী গাছে লাগে, তখন তাতে ফল আসে। মিরক্বাত প্রণেতা বলেছেন যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র সৃষ্টির পর উদ্বৃত্ত মাটি দ্বারা খেজুর গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য তাতে নর ও মাদী একত্রিত হওয়া আবশ্যক।

৩২. যাতে তোমরা এ কষ্ট থেকে রেহাই পাও এবং ফলন ও যা তাক্বদীরে রয়েছে তা অর্জিত হয়। সাথে সাথে যেন তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর ভরসার মর্যাদাও তোমাদের নসীব হয়।

৩৩. কিছু সংখ্যক আলিম এ ক্ষেত্রে বলেন যে, তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেন নি, বরং তাড়াতাড়ি অভিযোগ করে বসলেন, যদি তাওয়াক্কুল করে কিছুদিন ক্ষতি বরদাশ্ত করতেন, তাহলে বড় বরকত পেতেন। হুযূরের রায়ও বরকতপূর্ণ।

স্মর্তব্য যে, হুযূর বাগানের এ রহস্য সম্পর্কে অনবগত ছিলেন না; বরং তাঁদেরকে তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দিয়েছিলেন। অনবগত কিভাবে থাকবেন? হুযূর তো 'আ'লামুল আউওয়ালীন ওয়াল আখিরীন' (পূর্ব ও পরবর্তী সকল মাখলূকের চেয়ে বেশি জ্ঞানী)। এটা কিভাবে হতে পারে যে, বাগানের মালিকরা জানেন, কিন্তু হুযূর তা জানতেন না? হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম কখনো কৃষিকাজ করেন নি, কিন্তু মিসরের বাদশাহকে বলেছিলেন, فَمَاحَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْبُلِه অর্থাৎ গমকে খোসা থেকে আলাদা করো না, যাতে তা নষ্ট না হয় এবং দুর্ভিক্ষের সময় কাজে আসে। তাছাড়া, তিনি কখনো বাদশাহী করেননি, অথচ মিসরের বাদশাহকে বলেছিলেন আমাকে কোষাগারের হাকিম নিযুক্ত করো। اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ (আমি সুরক্ষক, সর্বজ্ঞ।১২:৫৫) দুর্ভিক্ষে পতিত সকল মানুষকে আমি রক্ষা করবো। যখন হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম'র 'ইলম'র এ অবস্থা, তাহলে আমাদের হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম কিভাবে এ সাধারণ বিষয় সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারেন? এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'জা-আল্ হক্ব'-এ দেখুন।

৩৪. অর্থাৎ আমার নির্দেশ দু'প্রকার: 'শর'ঈ আহকাম' (শরীয়তের বিধানাবলী) ও 'দুনিয়াবী রায়' শরীফ। 'শর'ঈ আহকাম' অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। কেননা, তাতে নুবূয়ত এবং নূরানিয়াত দু'টিই সমন্বিত। কিন্তু রায় মুবারককে কবূল করা মুস্তাহাব; তদনুযায়ী আমল না করারও ইখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু মন্দ কিংবা নগণ্য মনে করা কুফর হবে। এটাই আহলে সুন্নাতের আক্বীদা এবং এটাই এ আলোচ্য হাদীসের মর্মার্থ যে, 'আমার বাণী ক্বোরআনকে রহিত করতে পারে না, অর্থাৎ আমার রায় ও পরামর্শ। কেননা, 'রায়'র মধ্যে হুযূরের বাশারিয়াতের সমুজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ রয়েছে।

স্মর্তব্য যে, হুযূর নিজেকে 'বাশার' (মানুষ) বলা তাঁর পরিপূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ। আমরা যদি এই শব্দটি তুচ্ছার্থে কিংবা তাঁকে আমাদের সমকক্ষ দাবী করে বলি, তাহলে কাফির হয়ে যাবো (না'উযু বিল্লাহ)। শয়তান নবীকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং তাঁকে 'বাশার' বা মানুষ বলেই কাফির হয়েছে। সে বলেছে مَاكُنْتُ لِاَسْجُدَ لِبَشَرٍ (অর্থাৎ আমার জন্য কোন মানুষকে সাজদা করা শোভা পায়না।) হযরত ইয়ূনুস আলায়হিস্ সালাম নিজেকে 'যালিম' বলে আখ্যায়িত করেছেন- اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে।২১:৮৭)। অন্য কেউ নবীকে যালিম বললে নিজে যালিম হয়ে যাবে। বাদশাহ বলে থাকেন, "আমি তোমাদের খাদিম (সেবক)"। এটা তাঁর বিনয়রূপী গুণের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু অন্য কেউ তা বললে শাস্তি পাবে।

স্মর্তব্য যে, حكم (নির্দেশ) ও مشوره (পরামর্শ)-এর

وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُ مَابَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتٰى قَوْمًا فَقَالَ يَاقَوْمِ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ وَاِنِّىْ اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ فَاَطَاعَهٗ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ فَاَدْلَجُوْا فَانْطَلَقُوْا عَلٰى مَهَلِهِمْ فَنَجُوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَاَصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَاتَّبَعَ مَاجِئْتُ بِهٖ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِىْ وَكَذَّبَ مَاجِئْتُ بِهٖ مِنَ الْحَقِّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪১ **॥** হযরত আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার এবং আল্লাহ্ পাক যা কিছু দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তার উপমা ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বললো, "আমি স্বচক্ষে একটি সৈন্যবাহিনী দেখেছি।[৩৫] আমি প্রকাশ্য ভীতিপ্রদর্শনকারী।[৩৬] সুতরাং তোমরা সতর্ক হও! সতর্ক হও!" তখন ওই সম্প্রদায়ের একটি দল তাঁর কথা মেনে নিলো এবং অন্ধকার থাকতেই উঠে সময়মত বেরিয়ে গেলো। ফলে তারা রক্ষা পেলো।[৩৭] আর তাদের মধ্যে অন্য একদল তাঁকে অস্বীকার করলো। তারা সেখানেই রয়ে গেলো। অতঃপর ভোরেই সৈন্যবাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদেরকে ধ্বংস করে তছনছ করে দিলো[৩৮]-এটা ওই ব্যক্তির উপমা, যে আমার আনুগত্য করেছে ও আমার আনীত বিধান মেনে চলেছে; আর ওই ব্যক্তির উপমা, যে আমার নির্দেশ অমান্য করছে এবং আমার আনীত সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বসেছে।।বোখারী, মুসলিম।

মধ্যেকার পার্থক্য ক্বোরআন হাকীমে বিদ্যমান। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন-اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (নামায ক্বায়েম করো), এটা হচ্ছে حكم বা নির্দেশ; যার বর্জণকারী গুনাহ্গার। অন্যত্র এরশাদ করেছেন, اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ অর্থাৎ "যখন তোমরা একটা নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত কোন ঋণের লেনদেন করো, তখন তা লিখে নাও।"।২:২৮২। এটা ক্বোরআনের পরামর্শ; যা অনুসরণ করা গুনাহ্ নয়। পার্থিব বাদশাহ্গণও নিজের প্রজাকে কখনো নির্দেশ দেন এবং কখনো পরামর্শ দেন। ক্বোরআনের বিধানাবলীর মধ্যে মহান রবের রাজত্ব ও ক্বুদরতের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। আর তাঁর পরামর্শগুলোর মধ্যে মহান রবের রাহমানিয়াত (পরম করুণাময় হওয়া)'র বহিঃপ্রকাশ রয়েছে।

৩৫. এটা 'তাশ্বীহ্-ই মুরাক্কাব' (تشبيه مركب) পূর্ণ ঘটনাকে পূর্ণ ঘটনার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, ওই ব্যক্তি দ্বারা ওই আমানতদার ও সত্যবাদী ব্যক্তি বুঝায়, যার কথার উপর মানুষের নির্ভরযোগ্যতা থাকে। হুযূর সত্যবাদী হওয়া নুবূয়াত প্রকাশের পূর্ব থেকেই সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এ উপমা দ্বারা বুঝা গেলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পার্থিব ও পরকালীন ঘটমান সকল আযাব স্বীয় চক্ষু মুবারকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর সুসংবাদ কিংবা ভীতি প্রদর্শন করা প্রত্যক্ষ করার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। মহান রব এরশাদ করেছেন-اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا (নিশ্চয় আমি আপনাকে হাযির-নাযির করে প্রেরণ করেছি।৩৩:৪৫)

৩৬. আরবের প্রচলিত নিয়ম ছিলো যে, বিপজ্জনক শত্রুর সংবাদদাতা স্বীয় জামা লাঠিতে উঁচিয়ে মানুষের মধ্যে ঘোষণা করত 'সতর্ক হয়ে যাও'। তাকে বলা হতো نَذِيْرِ عُرْيَان (উলঙ্গ সতর্ককারী)।

৩৭. শ্রবণকারীরা দু'দল হয়ে গেলো। একদল এ ভীতিপ্রদর্শনকারীকে বিশ্বাস করলো এবং শত্রুবাহিনীর হামলার পূর্বে অন্ধকারেই পালিয়ে গেলো। তারা তাতে লাভবান হলো।

৩৮. সুতরাং যেভাবে মুক্তি ও ধ্বংস এ ঘোষণাকারীর সত্যায়ন ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উপর নির্ভরশীল, তেমনি আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া এবং না পাওয়াও (যথাক্রমে) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মান্য করা ও না করার উপর নির্ভরশীল।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَاحَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِىْ تَقَعُ فِى النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهٗ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيْهَا فَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا - هٰذِهٖ رِوَايَةُ الْبُخَارِىِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهَا وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهَا قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ اَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُوْنِىْ تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪২ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার উপমা ওই ব্যক্তির মতো,[৩৯] যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করলো। যখন আগুন সেটার আশেপাশে আলোকিত করলো, তখন পতঙ্গ এবং যেগুলো আগুনে পতিত হওয়ার (প্রাণী), সেগুলো তাতে পতিত হতে লাগলো।[৪০] আর লোকটি সেগুলোকে বাধা দিতে লাগলো এবং ওই প্রাণীগুলো তার উপর বিজয়ী হয়ে আগুনে পতিত হয়ে যায়।[৪১] অনুরূপ, আমি তোমাদের কোমর ধরে আগুন হতে রক্ষা করছি, আর তোমরা তাতে পতিত হচ্ছো।[৪২] হাদীসের এ অংশটা বোখারী শরীফের বর্ণনা। মুসলিম শরীফের বর্ণনাও অনুরূপ। তবে এর শেষে তিনি বর্ণনা করেছেন, হুযূর-ই আন্ওয়ার এরশাদ করেছেন, এটা আমার ও তোমাদের উপমা। আমি তোমাদেরকে কোমরে ধরে আগুন থেকে রক্ষা করছি, তোমরা আগুন থেকে পালিয়ে এসো। কিন্তু তোমরা আমার উপর বিজয়ী হয়ে যাচ্ছো এবং তাতে পতিত হচ্ছো।[বোখারী, মুসলিম]

আল্লাহ্র আযাব হচ্ছে সেনাদলের ন্যায়। মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করে নেওয়া সঠিক সময়ে বিপজ্জনক স্থান থেকে বের হয়ে যাওয়ার নামান্তর, পক্ষান্তরে শেষ পর্যন্ত গুনাহ্র উপর হঠ ধরে থাকা ও হুযূর-ই আন্ওয়ারকে মিথ্যারোপ করার মতো বিপজ্জনক স্থানে রয়ে দুশমনের হাতে আক্রান্ত হওয়ার নামান্তর।

৩৯. এটাও 'তাশবীহ্-ই মুরাক্কাব' অর্থাৎ এতে পুরো ঘটনাকে পুরো ঘটনার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও এখানকার কর্মব্যবস্থাগুলোকে দ্বীনের মাধ্যম বানানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু মানুষ সেগুলোকে ভুলপন্থায় ব্যবহার করে ধ্বংসের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। যেমন- কোন জঙ্গলে মুসাফিরদের পথপ্রদর্শন ও আলো দেখানোর জন্য আগুন জ্বালানো হলো। কিন্তু কীট-পতঙ্গসমূহ ওই আগুনকে নিজেদের ধ্বংসের মাধ্যম করে নিলো এবং ধ্বংস হওয়াকে নিজের মুক্তি মনে করলো।

৪০. যেমন দুনিয়ার উপভোগ্য বস্তুসমূহ আগুনস্বরূপ। আর আমরা অবুঝ বান্দারা হলাম পতঙ্গের মতো। কারণ, আমরা সেটার অপব্যবহার করে নিজেদেরকে ধ্বংস করতে চাই।

৪১. স্মর্তব্য যে, এ উপমায় আগুন প্রজ্জ্বলিতকারী একজন এবং রক্ষাকারী অন্যজন; যে দু'জনই رَجُل শব্দটির অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ, এখানে দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ্ এবং সেটার অপব্যবহার থেকে রক্ষাকারী হলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

৪২. হুযূরের আপন উম্মতকে নম্রতা ও কঠোরতার মাধ্যমে বুঝানো তাদের কোমর ধরে আগুন (দোযখ) থেকে রক্ষা করার নামান্তর। এ রক্ষা করার নিয়ম ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ওলামা ও পীর-বুযুর্গদের দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো এবং মুজাহিদগণের জিহাদ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'রই দ্বীন প্রচারের শামিল। এ থেকে বুঝা গেলো যে, কেউ আপন জ্ঞান কিংবা আপন স্থিরকৃত বুদ্ধিভিত্তিক ইবাদতগুলো দিয়ে দোযখ হতে রক্ষা পেতে পারে না, যতক্ষণ না হুযূরের হিদায়াতকে ক্বুবূল করে নেবে। অন্যথায় হিন্দু সন্যাসী এবং খ্রিষ্টান পাদ্রীরা দুনিয়া ত্যাগ করে সারাজীবন উপাসনা করে থাকে; কিন্তু তবুও তারা দোযখী।

وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ مَابَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَاَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً اُخْرٰى اِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لَاتُمْسِكُ مَاءً وَلَاتُنْبِتُ كَلَاءً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهٗ بِمَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ

১৪৩ ‖ হযরত আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **এরশাদ করেছেন, ওই হিদায়ত ও ইল্‌ম'র উপমা, যা দিয়ে মহান রব আমাকে পাঠিয়েছেন,[৪৩] প্রবল বৃষ্টির মতো,[৪৪] যা কোন জমিতে পৌঁছেছে সেটার কিছু অংশ ভালো ছিলো, যা পানি শোষণ করেছে এবং ঘাস ও বহু চারা জন্মিয়ে দিয়েছে এবং কিছু অংশ শক্ত ছিলো,[৪৫] যা পানি জমিয়ে রেখেছে, যা দ্বারা আল্লাহ্ মানুষকে উপকৃত করেছেন এভাবে যে, তারা নিজেরা পান করেছে, অন্যদেরকেও পান করিয়েছে এবং ক্ষেত করেছে। আর তা থেকে কিছু অন্য এক অংশে পৌঁছেছে, যা (অনুর্বর) খোলা মাঠ ছিলো; তাতে পানিও জমে না, ঘাসও জন্মায় না।[৪৬] এটা তাঁরই উপমা, যিনি দ্বীনী আলিম হয়েছেন, আর তাঁকে ওই জিনিস উপকৃত করেছে, যা দিয়ে আমাকে মহান রব প্রেরণ করেছেন। তিনি নিজে শিখেছেন এবং অন্যকেও শিখিয়েছেন।[৪৭]**

৪৩. এ থেকে ইঙ্গিতে বুঝা গেলো যে, 'ইল্‌ম' ও 'হিদায়াত' এক নয়। কখনো 'ইলম' থাকে, 'হিদায়াত' থাকে না। যেমন এ উম্মতের বে-দ্বীন আলিমগণ। কখনো হিদায়ত নসীব হয়ে যায়, কিন্তু বেশি ইলম থাকে না। যেমন- জ্ঞানহীন সাধারণ লোকেরা, যারা ঈমানদার হয়। কখনো ইল্‌ম ও হিদায়ত দু'টিই একত্রিত হয়ে যায়। যেমন দ্বীনী আলিমগণ। হিদায়ত ইল্‌ম অপেক্ষা উত্তম। এ জন্য সেটার উল্লেখ প্রথমে করা হয়েছে। ইল্‌ম কিতাব দ্বারা অর্জিত হয়, হিদায়ত অর্জিত হয় কারো কৃপাদৃষ্টি দ্বারা।

৪৪. এ থেকে ইঙ্গিতে বুঝা গেলো যে, হুযূরের পবিত্র দরবারে ইল্‌ম ও ফুয়ূযাতের ঘাটতি নেই। সমস্ত দুনিয়াবাসী ফয়য নিলেও তাতে ঘাটতি হবে না। কেউ না নিলেও তা বেকার থেকে যাবে না। যেমন- সূর্যের আলো এবং বৃষ্টির পানি।

৪৫. اَجَادِبُ – اَجْدَبُ'র বহুবচন। এর অর্থ ওই শক্ত ভূমি, যা পানিকে চুষে নিঃশেষ করে দেয় না। এ জন্যই قحط বা দুর্ভিক্ষকে جدب বলা হয়। এখানে এর অর্থ হলো নিম্নভূমিসমূহ, যেগুলোতে পুকুর হয়ে যায়।

৪৬. এ উপমার সারকথা হলো, হুযূর রহমতের বৃষ্টির ন্যায়। হুযূরের যাহেরী ও বাতেনী ফয়য ও নূরানী কথাবার্তা রহমতের বৃষ্টিধারার মতো মানুষের অন্তর বিভিন্ন প্রকারের ভূমির ন্যায়। সুতরাং মু'মিনের অন্তর হচ্ছে চাষাবাদযোগ্য ভূমি, যেখানে আমল ও তাক্বওয়ার চারা জন্মে। ওলামা ও পীর-বুযুর্গদের বক্ষ যেন পুকুর সদৃশ এবং ওই ধনভাণ্ডার, যা থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের ঈমানের ক্ষেতসমূহ পরিপুষ্ট হতে থাকবে। মুনাফিক্ব ও কাফিরদের বক্ষগুলো লবণাক্ত ভূমির মত। তা নিজেও কোনরূপ উপকৃত হতে পারে না, অন্য কারো উপকারেও আসে না।

৪৭. এ উপমা দ্বারা দুটি বিষয় জানা গেলো: **এক.** কোনো ব্যক্তি যে কোনো স্তরে উন্নীত হোক না কেনো, হুযূরের অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। জমি যতোই উত্তম হোক না কেন এবং তাতে যতোই ভালো বীজ বপন করা হোক না কেন, তা কিন্তু বৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী। দ্বীন ও দুনিয়ার সকল সৌন্দর্য হুযূরের বদৌলতেই। পংক্তি

شکر فیض تو چمن چوں کندا ے ابر بہار
کہ اگر خار و گر گل ہمہ پرورد ۂ تست

অর্থাৎ ওহে বসন্তের মেঘ! যখন বাগান তোমরা 'ফয়য' বা বারিধারার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, (তখন তো সেটা যথার্থই করে) কারণ, বাগানে ফুলগাছের কাঁটা জন্মাক আর ফুলই জন্মাক- সবই তো তোমারই লালিত।

দুই. ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানগণ আলিমদের মুখাপেক্ষী।

وَمَثَلُ مَنْ لَّمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَّلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ﴿هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ﴾ وَقَرَأَ اِلٰى ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ﴾ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا رَأَيْتِ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আর ওই ব্যক্তিরও উপমা, যে এদিকে মাথা উঠায় নি এবং আল্লাহ্ আমাকে যে হিদায়ত দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা ক্বূল করে নি।[৪৮] [বোখারী, মুসলিম] ১৪৪ || হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'হুয়াল্লাযী- আন্‌যালা 'আলায়কাল কিতা-বা মিনহু আ-য়া-তুম্ মুহকামা-তুন' (তিনি ওই মহান রব, যিনি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে) এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করলেন।[৪৯] আর তা 'ওয়ামা- ইয়ায্‌যাক্কারু ইল্লা- উলুল্ আল্‌বা-বি' পর্যন্ত পড়েন। তিনি (হযরত আয়েশা) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যখন 'তুমি দেখবে' আর মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে "যখন তোমরা ওই সকল লোককে দেখবে, যারা 'মুতাশা-বিহাত (দ্ব্যর্থবোধক আয়াত)'র পেছনে লেগে থাকে, তারাই ওইসব লোক, যাদের কথা আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে উল্লেখ করেছেন, তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকো।"[৫০] [বোখারী, মুসলিম]

কারণ তাদের ক্ষেতগুলো পানি পাবে এ ওলামারূপী পুকুর থেকেই। তাঁদের মাধ্যমেই হুযূরের কৃপা নসীব হবে।

৪৮. এতে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, যদি অসম্ভব কল্পনায়, কারো কাছে হুযূরের নুবূয়তের সংবাদ পৌঁছে নি বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তার জন্য তাওহীদের আক্বীদায় বিশ্বাসই যথেষ্ট।☆

স্মর্তব্য যে, 'উপমেয়' (مشبه به)তে ভূমির তিনটি অংশের কথা বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু 'উপমিত (مشبه)তে শুধু মানুষের দু'টি দলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, আলিমগণ হিদায়তের দিক থেকে শীর্ষস্থানীয় এবং কাফিরগণ গোমরাহীর অগ্রভাগে। মধ্যস্তরের লোক অর্থাৎ পুণ্যবান মু'মিনগণের কথা এমনিতেই বুঝে আসে। তাই তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয় নি।

স্মর্তব্য যে, পুকুর বহু প্রকারের রয়েছে: বড়, ছোট, বেশি উপকারী ও কম উপকারী। কোন কোন পুকুর থেকে নহর প্রবাহিত হয়ে যায়। যেমন ভূপালের পুকুর। তেমনিভাবে আলিমদেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কেউ কেউ মুজতাহিদ। যেমন- চার ইমাম। কেউ কেউ কামিল (বুযুর্গ), কেউ কেউ 'রা-সিখ' (পরিপক্ব জ্ঞানী)। তারপর তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ মুহাদ্দিস (হাদীস বিশারদ), কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সির। এ উপমা এদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৪৯. এখানে 'মুহকাম' দ্বারা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য অর্থবোধক আয়াতসমূহ বুঝানো উদ্দেশ্য। যেমন এর বিপরীতে 'মুতাশা-বিহ' (দ্ব্যর্থবোধক আয়াত) উল্লেখ করা থেকে বুঝা গেছে। 'উসূলুত্ তাফসীর'র পরিভাষায় 'মুহকাম' হচ্ছে ওই আয়াত, যাতে না 'তা'ভীল' বা ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ আছে, না রহিত হবার সম্ভাবনা আছে। যেমন- আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশংসা (না'ত) ও সম্মানিত সাহাবীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ।

৫০. অর্থাৎ যারা আয়াতসমূহের ভিন্ন ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে লেগে থাকে এবং ফিত্‌না বিস্তারের জন্য ওইগুলোর অপব্যাখ্যা বর্ণনা করে থাকে, তাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে। তাদের কাছ থেকে দূরে সরে পড়ো।

স্মর্তব্য যে, দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহ (মুতাশা-বিহাত) দু'প্রকার: এক. যেগুলোর অর্থ সর্বসাধারণের নিকট নিশ্চিত নয়(مُشْتَبَهُ الْمَعْنٰى)।যেমন- الٓرٰ,الٓمّٓ ইত্যাদি, ক্বোরআনের সূরাসমূহের প্রারম্ভে উল্লেখিত বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ (حُرُوْف مُقَطَّعَات); যেগুলোর অর্থ বুঝাই যায় না।

দুই. যেগুলোর মর্মার্থ(مُشْتَبَهُ الْمُرَاد) সর্বসাধারণের নিকট

☆ স্মর্তব্য যে, যারা কট্টর তাওহীদপন্থী বা তাওহীদী জনতা বলে দাবীদার, তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ, 'রিসালাত'-এ বিশ্বাস ছাড়া কোনক্রমেই শুধু তাওহীদ ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ هَجَّرْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ اَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اِخْتَلَفَا فِىْ اٰيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْرَفُ فِىْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِى الْكِتَابِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

১৪৫ || হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন দ্বিপ্রহরে আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি দু'ব্যক্তির আওয়াজ শুনলেন, যারা কোন আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। তখন তাঁর চেহারা মুবারকে ক্রোধের চিহ্ন অনুভূত হচ্ছিলো। তিনি এরশাদ করলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে বিবাদ করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।[৫১] মুসলিম

১৪৬ || হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস[৫২] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

---

নিশ্চিত নয়। যেমন- فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ☆ ইত্যাদি আল্লাহ্র গুণবাচক আয়াতসমূহ।

এ দু'প্রকার মুতাশা-বিহ্ আয়াত সম্বন্ধে আলোচনা-সমালোচনা করা এবং ফিত্না সৃষ্টির জন্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হারাম; কিন্তু দলীলভিত্তিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বর্তমানে গুনাহ্ নয়; যাতে মানুষ অপব্যাখ্যাবলী থেকে রক্ষা পায়। আলোচ্য হাদীস শরীফে প্রথম প্রকারের লোকের কথা 'ফিৎনা বিস্তারকারী' বুঝানো হয়েছে। এ জন্যেই ক্বোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে- اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ (ফিৎনা অনুসন্ধানার্থে)। নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর ওসীলায় কোন কোন মাক্ববূল বান্দাকে 'মুতাশা-বিহা-ত' (দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহ)'র জ্ঞান দান করেছেন। মহান রব এরশাদ করেন اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ (স্বীয় মাহবূবকে রহমান ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন)। প্রকাশ থাকে যে, সমগ্র ক্বোরআনই শিখিয়েছেন, যাতে 'মুতাশা-বিহা-ত'ও অন্তর্ভুক্ত।

৫১. 'কিতাব' নিয়ে বিবাদ করার তিনটি ধরন রয়েছে: **এক.** ক্বোরআনকে নিজের মতানুসারে করার চেষ্টা করা। যেমন- বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। **দুই.** স্বয়ং ক্বোরআনের আয়াতের মধ্যে মতবিরোধ করা যে, এটা কিতাবুল্লাহ্র আয়াত কিনা। **তিন.** ক্বোরআনে করীম হতে মাসআলাদি বের করার মধ্যে মতানৈক্য। প্রথম দু'প্রকারের মতানৈক্য হারাম; বরং ক্ষেত্রভেদে কুফর পর্যায়ের। তৃতীয় প্রকারের মতভেদ ইবাদত, যা সাহাবা-ই কেরামের যুগ থেকে চলে আসছে। এ মতভেদ মুজতাহিদীন ইমামদের মধ্যে হতে পারে। আলোচ্য হাদীসে প্রথম দু'প্রকারের মতভেদ বুঝানো হয়েছে। কিতাবী সম্প্রদায়ও আসমানী কিতাবগুলোতে এ ধরনের মতবিরোধ সৃষ্টি করেছিলো।

৫২. তাঁর নাম মুবারক সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস এবং উপনাম 'আবূ ইসহাক্ব'। তাঁর পিতার নাম মালিক ইবনে ওহায়ব এবং উপনাম আবূ ওয়াক্কাস। তিনি যুহরী ও কোরাঈশী। বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অগ্রণী। সুতরাং তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তৃতীয়। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স শরীফ ছিলো ১৭ বছর। তিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী। হুযূর তাঁর প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন, "তোমার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক।" সমস্ত জিহাদে হুযূরের সাথে ছিলেন। তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের দো'আ নিঃসন্দেহে ক্ববূল হতো। মানুষ ভয় পেতো যেন তিনি কারো বিপক্ষে দো'আ না করেন। ফারূক্ব-ই আ'যম ও হযরত ওসমান গনী উভয়ের খিলাফতকালে তিনি কূফার গভর্নর ছিলেন। ৭০ বছরের অধিক হায়াত পান। ৫৫ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী 'আক্বীক্ব' নামক স্থানে ওফাত পান। সেখান থেকে তাঁর পবিত্র শবদেহ মদীনা মুনাওয়ারায় আনা হয়েছিলো। মারওয়ান ইবনে হাকাম তাঁর নামায-ই জানাযার ইমামত করেন। আর মদীনা শরীফের কবরস্থান 'জান্নাতুল বাক্বী'তে তাঁকে দাফন করা হয়।

☆ এখানে وَجْهُ اللّٰهِ'র আভিধানিক অর্থ (আল্লাহ্র চেহারা) করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ

মুসলমানদের মধ্যে বড় গুনাহ্‌গার হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে হারাম করা হয়নি এমন জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করে।[৫৩] আর তার জিজ্ঞাসাবাদের কারণে ওই জিনিসটি হারাম করে দেওয়া হয়েছে[৫৪]।বোখারী, মুসলিম।

১৪৭ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, শেষ যুগে মিথ্যুক দাজ্জালদের আবির্ভাব হবে,[৫৫] যারা তোমাদের মধ্যে এমন এমন হাদীস নিয়ে আসবে, যেগুলো না তোমরা শুনেছো, না তোমাদের পিতৃপুরুষরা শুনেছে![৫৬]

৫৩. এখানে কথার ইঙ্গিত ওইসব সমালোচনাকারীদের প্রতি, যাদের বিনা প্রয়োজনে প্রত্যেক কথায় কুতর্ক করার অভ্যাস রয়েছে, নতুবা মাসআলা শেখার জন্য প্রশ্ন করা অত্যন্ত ভাল। মহান রব এরশাদ করেন- فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ (সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে।২১:৭) সুতরাং এ হাদীস ক্বোরআনের বিরোধী নয়; আর 'জিজ্ঞাসা করা' মানে নবীর নিকট জিজ্ঞাসা করা। কেননা, হালাল ও হারাম ওই দরবার থেকে জারী হয়। যেমন- হুযূর বলেছেন, "তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে।" একজন সাহাবী আরয করলেন, "তা কি প্রত্যেক বছর?" হুযূর বললেন, "আমি যদি 'হ্যাঁ' বলতাম, তাহলে প্রত্যেক বছরই হজ্জ করা ফরয হয়ে যেতো।" এগুলো হচ্ছে- ক্ষতিকারক প্রশ্ন।

৫৪. এ থেকে তিনটি মাসআলা জানা গেলো:

এক. প্রত্যেক বস্তুর আসল বা মূল হলো 'মুবাহ্ হওয়া', অর্থাৎ যা থেকে শরীয়ত নিশ্চুপ থাকে, তা হালাল। হারাম সেটাই, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। যেমন- لَمْ يُحَرَّمْ (হারাম করা হয় নি) হতে বুঝা যায়। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন- قُلْ لَّا اَجِدُ فِيْمَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا (আপনি বলুন! আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে, তাতে আমি কোন আহারকারীর উপর কোন খাদ্য নিষিদ্ধ পাচ্ছি না।৬:১৪৫) বুঝা গেলো যে, যা হারাম হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না, তা হালাল। কিন্তু বর্তমানে কতেক মূর্খলোক দলীল ব্যতীত প্রত্যেক জিনিসকে হারাম বলে ফেলে এবং হালাল হবার দলীল চায়। তারা বলে থাকে, "কোথায় লিখা আছে মীলাদ শরীফ ও গেয়ারভী শরীফ হালাল?" অথচ নিজেরা বলতে পারে না যে, 'হারাম' কোথায় লিখা রয়েছে? এ হাদীস ও আয়াত হতে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

দুই. কখনো কখনো অধিক প্রশ্নের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোরতা আরোপ করা হয়। দেখুন, বনী ইসরাঈল 'গাভী' সম্পর্কে বেশি জিজ্ঞেস করতে থাকে। ফলে শর্তও বেশি পরিমাণে আরোপিত হতে থাকে।

তিন. পীরের ওযীফা ও শরীয়তের বিধাণাবলীর ক্ষেত্রে নিজ থেকে কোন শর্তারোপ করবেন না; বরং সেগুলোর শর্তহীনতা থেকে সুযোগ গ্রহণ করা চাই।

৫৫. دَجَّال শব্দটি دجل হতে গঠিত। এর অর্থ প্রতারণা ও ধোঁকা। 'দাজ্জাল' মানে বড় প্রতারক, কূটকৌশলী ও ধোঁকাবাজ। বড় দাজ্জাল শেষ যুগে বের হবে, এর পূর্বে ছোট খাটো বহু দাজ্জাল বের হবে।

৫৬. এতে যারা মিথ্যা হাদীস রচনা করে তাদের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এখানে সম্বোধন হয়তো শুধু সাহাবীদেরকে করা হয়েছে, অথবা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত আলিমকে, যাঁরা ইলম্-ই হাদীস সম্পর্কে অবগত। যদি কোন মূর্খ ব্যক্তি কোন প্রসিদ্ধ হাদীস নাও শুনে, তাহলে সেটা তার নিজেরই ত্রুটি। হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর শাসনামলে ঘোষণা করেছিলেন, "আমি ওই হাদীস গ্রহণ করবো, যা ফারূক্ব-ই আ'যমের খিলাফতকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।" কেননা, তাঁর শাসনামলে কিছু সংখ্যক অপ্রকাশ্য মুনাফিক্ব হযরত আলীর বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে এবং কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে বহু হাদীস রচনা করেছিলো। তখন থেকে রাফেযী ও খারেজী মতবাদরূপী ব্যাধি মুসলিম সমাজে বিস্তার লাভ করেছিলো। বুঝা গেলো যে, হাদীস রচনা করা জঘন্য গুনাহ এবং রচনাকারী জঘন্য গুনাহ্‌গার। কেননা, হুযূর তাকে 'দাজ্জাল' ও 'কায্যাব' বলেছেন।

فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَايُضِلُّوْنَكُمْ وَيُفْتِنُوْنَكُمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلَاتُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الْاٰيَةَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِيْ اُمَّتِهٖ قَبْلِيْ اِلَّا كَانَ لَهٗ فِيْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ

তাদেরকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদেরকে তাদের থেকে দূরে রেখো, যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ্ করতে না পারে, ফিত্‌নায় লিপ্ত না করে।[৫৭] [মুসলিম] **১৪৮ ॥ তাঁরই** হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আহলে কিতাব' (ইহুদী-খ্রিষ্টান) মুসলমানদের সামনে হিব্রুভাষায় তাওরাত পড়ে আরবীতে অনুবাদ করতো। তখন হুযূর এরশাদ করলেন, "আহলে কিতাবদের না সত্যবাদী বল, না মিথ্যাবাদী।[৫৮] এটা বলে দাও, "আমরা আল্লাহ্‌র উপর এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছি।"[৫৯] [বোখারী] **১৪৯ ॥ তাঁরই** হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কোন মানুষ মিথ্যাবাদী হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে প্রতিটি শ্রুতকথা বর্ণনা করে দেয়।"[৬০] [মুসলিম] **১৫০ ॥ হযরত** ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার পূর্বে এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নি, যাঁর উম্মতের মধ্যে কিছু লোক তাঁর বিশেষ গুপ্ত রহস্যের ধারক ছিলেন না।[৬১]

৫৭. এ থেকে বুঝা গেলো যে, ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী বাতিলপন্থীদের নিকট থেকে নিজেকে রক্ষা করা জরুরি। কেননা, তাদের সঙ্গ দ্বীন ও ঈমাদের জন্য বিপজ্জনক।

৫৮. এখানে তাওরাতের ওই সকল আয়াত বুঝানো উদ্দেশ্য, যেগুলোর সত্য ও মিথ্যা প্রকাশ পায় না। অন্যথায় যদি আহলে কিতাব হযরত মসীহ্ কিংবা হযরত 'ওযায়র আলায়হিমাস্ সালাম তাদের ভাষায় 'ইলাহ' ছিলেন মর্মে কোন আয়াত পেশ করে, তাহলে অবশ্য তাকে মিথ্যা বলা হবে। হাদীসের মর্মকথা এ যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের কিছু অংশ সহীহও ছিলো, কিছু মিশ্রিতও।

সুতরাং প্রত্যেক আয়াতে সত্য-মিথ্যার অবকাশ ছিলো। তাই সতর্কতা অবলম্বনের জন্য এ হুকুম দেওয়া হয়েছিলো। স্মর্তব্য যে, বর্তমানে ওই কিতাবগুলোতে মূল আয়াত একটিও মওজূদ নেই। এগুলো 'কালাম-ই ইলাহী'র অনুবাদ নয়।

৫৯. যেন মূল কিতাবের অস্বীকার করা না হয় এবং কিতাব নয় এমন কিছুর স্বীকৃতিও দেওয়া না হয়।

স্মর্তব্য যে, এ বিধান প্রাথমিক অবস্থায় ছিলো, পরবর্তীতে তো হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফারূক্ব-ই আ'যম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মত সাহাবীকেও তাওরাত পড়তে ও শুনতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

৬০. অর্থাৎ পরিচিত-অপরিচিত সকলের কথা যাচাই করা ছাড়া বর্ণনা করে দেয়। বিশেষতঃ হাদীস শরীফের ক্ষেত্রে; নতুবা মুহাদ্দিস, ফক্বীহ্ ও আলিমগণের প্রতিটি কথার উপর সর্বসাধারণের নির্ভর করতে হবে। মহান রব এরশাদ করেছেন, لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا (যাতে তারা সতর্ক করে দেয় তাদের সম্প্রদায়কে যখন তারা ফিরে আসে।৯:১২২।)। সুতরাং এ হাদীস ফক্বীহ্‌গণের এ কথার বিরোধী নয় যে, 'দ্বীনী বিষয়ে একজনের সংবাদও গ্রহণযোগ্য।' মুহাদ্দিসগণ 'খবর-ই ওয়াহিদ' (একজন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস) গ্রহণ করেন।

৬১. حوارى শব্দটি حور হতে গঠিত। অর্থ- পরিচ্ছন্নতা, একনিষ্ঠতা, সাহায্য। যেহেতু ওই বিশেষ ব্যক্তিবর্গের অন্তর পরিষ্কার ছিলো, তাঁরা খাঁটি মু'মিন ছিলেন এবং আপন দ্বীনের সাহায্যকারী ছিলেন, সেহেতু তাঁদেরকে 'হাওয়ারী' বলা হতো। তাছাড়া, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম'র 'হাওয়ারী' কাপড় পরিষ্কারকারী ধোপা ছিলেন।

وَاَصْحَابٌ يَاْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اَنَّهَا تَخْلُفُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَالَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ-رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا

এমন কিছু সাহাবী ব্যতীতও প্রেরণ করেননি যাঁরা তাঁর সুন্নাত গ্রহণ করতেন এবং তাঁর বিধানাবলীর অনুসরণ করতেন।[৬২] অতঃপর তাঁদের পরে এমন অযোগ্য উত্তরসূরী আসতো, যারা এমন কথা বলতো, যা করতো না এবং এমন কাজ করতো, যা তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় নি।[৬৩] যারা তাদের সাথে হাত দ্বারা জিহাদ করবে তারা মু'মিন, যারা মুখ দ্বারা জিহাদ করবে তারাও মু'মিন এবং যারা তাদের সাথে স্বীয় অন্তর দ্বারা জিহাদ করে তারাও মু'মিন।[৬৪] আর এতদ্ব্যতীত যারা আছে, তাদের মধ্যে সরিষার বীজ পরিমাণ ঈমানও নেই।[৬৫] [মুসলিম]

১৫১ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হিদায়তের দিকে আহ্বান করবে, সে সমস্ত আমলকারীর মতো সাওয়াব পাবে। এতে তাদের (আমলকারী) সাওয়াব হতে কিছুই কমবে না।[৬৬]

৬২. প্রকাশ্য কথা এটাই, এখানে স্বতন্ত্র শরীয়তের ধারক দ্বীন প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত নবী বুঝানো উদ্দেশ্য, যাঁদের দস্তুর মত প্রত্যক্ষ উম্মত ছিলো। আর এ 'আসহাব' (সহচরবৃন্দ) হচ্ছেন 'হাওয়ারী' ব্যতীত অন্য দল। হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে- প্রত্যেক স্বতন্ত্র শরীয়তের ধারক পয়গাম্বরকে আল্লাহ্ সাধারণ সাহাবাও দান করেছেন এবং গোপন রহস্যের ধারক সাহাবাও দান করেছেন। অনুরূপ, আমাদের প্রিয়নবীর সাহাবার সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, যাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাহাবী বিশেষ গোপন রহস্যের ধারক ছিলেন। যেমন- খোলাফা-ই রাশিদীন প্রমুখ। সুতরাং এ হাদীসের বিপক্ষে এ অভিযোগ করা যাবে না যে, 'কিছু সংখ্যক নবী এমনও ছিলেন, যাঁদের কথা কেউ মানে নি এবং কিছু সংখ্যক নবী এমন ছিলেন, যাঁদের এক/দু'জন মানুষই আনুগত্য করেছেন।'

৬৩. অর্থাৎ ওই সকল সাহাবীর পর এমন ভ্রান্ত আক্বীদা এবং মন্দ আমলসম্পন্ন লোকের জন্ম হচ্ছিলো। অনুরূপ, আমার সাহাবীদের পরেও হবে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে হুযূরের সাহাবীগণ মন্দ আমল ও ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করা থেকে পবিত্র।

৬৪. অর্থাৎ এরূপ ভ্রান্ত আক্বীদা বিশিষ্ট ও অসৎকর্ম পরায়ণ লোকদেরকে তিনটি দল তিনভাবে সংশোধন করবে: শাসকগণ শক্তি দ্বারা, অর্থাৎ অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে, জ্ঞানীগণ মুখ দ্বারা, অর্থাৎ তাদেরকে ওয়ায করে এবং সাধারণ মু'মিনগণ অন্তর দ্বারা, অর্থাৎ তাদেরকে ঘৃণা করার মাধ্যমে এবং দূরে র'য়ে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ বিধান বলবৎ থাকবে।

৬৫. অর্থাৎ যারা তাদেরকে অন্তর দ্বারা খারাপও মনে করবে না, তাদের আক্বীদায় সন্তুষ্ট থাকে, তারা তাদের মত বে-ঈমান। এ জন্যই আলিমদের উপর ফরয হচ্ছে, স্বীয় মুখ ও কলম দ্বারা মুসলমানদেরকে বে-দ্বীনদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করাবেন, তাদের ভ্রান্ত আক্বীদাগুলো জানিয়ে দেবেন এবং সেগুলোর খণ্ডন করবেন।

স্মর্তব্য যে, দুর্বল ঈমানকে সরিষার দানার সাথে উপমা দেওয়া অবস্থার বিবরণের জন্য, পরিমাণ বর্ণনা করার জন্য নয়। কেননা, ঈমানের পরিমাণে কম-বেশি হয় না। প্রত্যেক মু'মিন পূর্ণ মুসলমান, আধা বা সিকি মুসলমান নয়।

৬৬. এ বিধান নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর মাধ্যমে সমস্ত সাহাবী, ইমামগণ, পূর্ব ও পরবর্তী বিজ্ঞ আলিমগণ সকলই অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ- যদি কারো দ্বীন প্রচারের কারণে এক লক্ষ

وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَدَا الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَّسَيَعُوْدُ كَمَابَدَاً فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَآءِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَارِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে, সে সকল অনুসরণকারী পথভ্রষ্টদের সমান গুনাহ্গার হবে এবং এটা তাদের গুনাহ্ থেকে কিছুই কমিয়ে দেবে না।[৬৭] [মুসলিম]

১৫২ ॥ তাঁরই হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইসলাম নিঃসঙ্গ অসহায় আরম্ভ হয়েছে এবং যেমনিভাবে আরম্ভ হয়েছিলো সে অবস্থায়ই ফিরে যাবে। নিঃসঙ্গ ও অসহায়দের জন্য সুসংবাদ।[৬৮] [মুসলিম]

১৫৩ ॥ তাঁরই হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় ঈমান মদীনার দিকে এমনভাবে কুঞ্চিত হয়ে আসবে, যেভাবে সাপ স্বীয় গর্তের দিকে ফিরে আসে।[৬৯] [বোখারী ও মুসলিম]

লোক নামাযী হয়, তাহলেই দ্বীন প্রচারক প্রত্যেক ওয়াক্তে এক লক্ষ নামাযের সাওয়াব পাবেন। আর ওইসব নামাযী নিজ নিজ নামাযের সাওয়াব পাবেন। এ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাওয়াব সৃষ্টিকুলের অনুমানের উর্ধ্বে। মহান রব এরশাদ করেন- وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ (এবং নিশ্চয় আপনার জন্য রয়েছে অশেষ প্রতিদান।৬৮:৩।)। এভাবে, ওইসব গ্রন্থপ্রণেতা, যাঁদের কিতাব থেকে মানুষ হিদায়ত পাচ্ছে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোকের সাওয়াব তাঁদের কাছে পৌঁছতে থাকবে। এ হাদীস এ-ই আয়াতের বিরোধী নয়, لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى (মানুষের জন্য নেই, কিন্তু সে যতটুকু চেষ্টা করেছে। ।৫৩:৩৯।) কেননা, এ সাওয়াবের আধিক্য তার দ্বীন প্রচারেরই সুফল।

৬৭. এতে পথভ্রষ্টতাগুলোর প্রবর্তক ও প্রচারক সকলেই অন্তর্ভুক্ত। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সব সময় লক্ষ লক্ষ গুনাহ্ পৌঁছতে থাকবে। এ হাদীস এই আয়াতের বিরোধী নয়, وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ (এবং তার মন্দ উপার্জনের ক্ষতি তার উপর বর্তাবে।২:২৮৬।)। কেননা, সেটা তার কৃতকর্ম অর্থাৎ মন্দ আমল প্রচারেরই শাস্তি।

৬৮. غُرْبَت (গুরবত)'র আভিধানিক অর্থ একাকীত্ব ও অসহায়ত্ব। এ জন্য মুসাফির এবং দরিদ্রকে গরীব বলা হয়। যেহেতু মুসাফির সফরের মধ্যে একাকী এবং রিক্তহস্ত ও অসহায় থাকে। অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় স্বল্প লোকেরাই ইসলাম কবূল করেছেন এবং শেষ যামানায়ও স্বল্প লোকের মধ্যেই তা থেকে যাবে। এ দু'দল অত্যন্ত বরকতপূর্ণ; আলহামদু লিল্লাহ্। স্বল্প পরিমাণ মুসলমান অধিক সংখ্যক মানুষের উপর বিজয় লাভ করতে থাকে এবং থাকবে। স্বল্প স্বর্ণ অধিক লোহার উপর এবং স্বল্প কস্তুরী অধিক মাটির উপর বিজয়ী। এটাও দেখা গেছে যে, গরীব-মিসকীন লোকেরা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং অধিকাংশ ধনী পথচ্যুত হয়ে যায়।

৬৯. এটা আখেরী যামানায় হবে, অর্থাৎ দুনিয়ার কোথাও মুসলমানদের নিরাপত্তা থাকবে না। তখন তারা নিজের ঈমান রক্ষার জন্য মদীনা মুনাওয়ারার দিকে ধাবিত হবে। মদীনা মুনাওয়ারাহ্ পূর্বেও মুসলমানদের নিরাপত্তার স্থান ছিলো, ভবিষ্যতেও হবে। হবেও না কেন? সেখানে তো দু'জাহানের আশ্রয়স্থল রসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ রাখছেন। খুব সম্ভব এ ঘটনা দাজ্জালের আবির্ভাবের নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। সাপের সাথে উপমা দেওয়ার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাপকে যেমন কেউ আশ্রয় দেয় না, তেমনিভাবে আখেরী যামানায় মানুষ ইসলামকে সাপের ন্যায় কষ্টদায়ক মনে করবে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মদীনা শরীফ কখনো ইসলামশূণ্য হবে না।

وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فِىْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَحَدِيْثَىْ مَعَاوِيَةَ وَجَابِرٍ لَايَزَالُ مِنْ اُمَّتِىْ وَلَايَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ فِىْ بَابِ ثَوَابِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ ◆اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ◆ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِىِّ قَالَ اُتِىَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْلَ لَهٗ لِتَنَمْ عَيْنُكَ وَلْتَسْمَعْ اُذُنُكَ وَلْيَعْقِلْ قَلْبُكَ قَالَ فَنَامَتْ عَيْنَىَّ وَسَمِعَتْ اُذُنَاىَ وَعَقَلَ قَلْبِىْ قَالَ فَقِيْلَ لِىْ سَيِّدٌ بَنٰى دَارًا فَصَنَعَ فِيْهَا مَادُبَةً وَّاَرْسَلَ دَاعِيًا

আমি হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বর্ণিত হাদীস 'কিতাবুল হজ্জ'-এ এবং হযরত মু'আবিয়া ও জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার হাদীসগুলো- لَايَزَالُ مِنْ اُمَّتِىْ الخ এবং لَايَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ الخ ইনশা- আল্লাহ 'বাবু সাওয়াবি হাযিহিল উম্মাহ'য় বর্ণনা করবো।[৭০]

◆দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ◆

১৫৪ ॥ হযরত রবী'আহ্ জুরাশী[৭১] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হুযূরের খিদমতে জনৈক আগমনকারী আসলেন এবং হুযূরের দরবারে আরয করা হলো, এটাই উপযোগী যে, আপনার চোখ মুবারক তো ঘুমোবে, আর আপনার কান মুবারক শ্রবণ করতে থাকবে এবং অন্তর মুবারক অনুধাবন করতে থাকবে।[৭২] হুযূর এরশাদ করলেন, আমার চক্ষুযুগল ঘুমালো, কর্ণযুগল শুনতে থাকলো এবং অন্তর অনুধাবন করছিলো।[৭৩] হুযূর এরশাদ করলেন, আমাকে বলা হলো, সরদার ঘর তৈরি করলো। সেখানে দস্তরখানায় খাবারের আয়োজন করলেন এবং আহ্বানকারী প্রেরণ করলেন।

---

৭০. অর্থাৎ এ তিনটি হাদীস মাসাবীহতে এখানেই ছিলো; কিন্তু আমি সম্পৃক্ততার কারণে ওই 'বাব' বা অধ্যায়গুলোয় বর্ণনা করেছি।

৭১. তাঁর নাম রবী'আহ্ ইবনে 'আমর। ইয়ামেনের জুরাশ এলাকার বাসিন্দা। হযরত আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে নাসকের মুফ্তী ছিলেন। তিনি সাহাবী কিনা তাতে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু সঠিক অভিমত হচ্ছে তিনি সাহাবী।

৭২. অর্থাৎ হুযূর জাগ্রত ছিলেন। একজন ফিরিশ্তা এসে এটা আরয করেন। এই কথাগুলো বলতে বলতে হুযূরের চক্ষু মুবারকে নিদ্রা এসে গেলো। অতঃপর স্বপ্নে ওই সব কথা হয়েছিল, যেগুলো পরবর্তীতে আসছে।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, ফিরিশ্তাদের কিছু কথাবার্তা আমাদের চোখে ঘুম এনে দেয়, কিছু কথাবার্তা আমাদেরকে মৃত্যু দেয়। শিঙ্গার আওয়াজ (দ্বিতীয় ফুৎকার) সকলকে জীবিত করবে।

হাদীসের অর্থ সুস্পষ্ট, এতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এটাও বুঝা গেলো যে, হুযূরের নিদ্রা অলসতা সৃষ্টি করে না। এ জন্যই ঘুমালেও তাঁর ওযূ' ভঙ্গ হয় না। তাঁর স্বপ্ন আল্লাহর ওহী। ফিরিশ্তা তাঁকে ঘুমিয়ে এই কথাগুলো এ জন্যই বলেছিলেন, যাতে এটা বুঝা যায় এবং মানুষ রসূলের স্বপ্নের উপরও ঈমান আনে।

৭৩. অর্থাৎ ফিরিশ্তাদের ওই কথাবার্তার কারণে আমার চক্ষুদ্বয়ে ঘুম এসে যায়, যেমনিভাবে মায়ের ঘুমপাড়ানি গানে শিশুদের চোখে ঘুম এসে যায়।

অথবা কিছু কিছু জিনিস এমনও রয়েছে যেগুলো দেখলে অবচেতনতা এসে যায়।

فَمَنْ اَجَابَ الدَّاعِیَ دَخَلَ الدَّارَ وَاَکَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَرَضِیَ عَنْهُ السَّیِّدُ وَمَنْ لَّمْ یُجِبِ الدَّاعِیَ لَمْ یَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ یَأْکُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَسَخِطَ عَلَیْهِ السَّیِّدُ قَالَ فَاللّٰهُ السَّیِّدُ وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِیْ وَالدَّارُ الْاِسْلَامُ وَالْمَأْدُبَةُ الْجَنَّةُ ۔ رَوَاهُ الدَّارِمِیُّ وَعَنْ اَبِیْ رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَااُلْفِیَنَّ اَحَدَکُمْ مُتَّکِئًا عَلٰی اَرِیْکَةٍ

তখন যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর দাওয়াত ক্বূল করলো, সে ঘরে আসলো, আয়োজিত খাদ্য থেকে আহার করলো। তার উপর ঘরের মালিক সন্তুষ্ট হলো।[৭৪] আর যে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিলো না, সে ঘরেও আসলো না, দস্তরখানা থেকেও আহার করলো না, মালিক তার উপর অসন্তুষ্ট হলো।[৭৫] হুযূর এরশাদ করলেন, ঘরের মালিক হলেন আল্লাহ্, (হযরত) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হলেন আহ্বানকারী, ঘর হচ্ছে ইসলাম, আর দস্তরখানা হচ্ছে বেহেশ্ত।[৭৬] [দারেমী]

১৫৫ || হযরত আবূ রাফি'[৭৭] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমি তোমাদের মধ্যে এমন কাউকে মশারীসজ্জিত পালঙ্কে হেলান দেওয়া অবস্থায় অবশ্যই পাবো না,[৭৮]

৭৪. অর্থাৎ আহ্বানকারীর কথা মেনে নেওয়ার তিনটি উপকার হলো ঘর পরিদর্শন, বিভিন্ন নি'মাত আহার করা এবং মালিক বা বাদশাহ্র সন্তুষ্টি। এ সবই ওই আহ্বানকারীর মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

৭৫. অর্থাৎ অমান্যকারীর দ্বীনও বরবাদ, দুনিয়াও বরবাদ। খাবার থেকেও বঞ্চিত হলো। মালিক বা বাদশাহ্র অবাধ্যতার বেড়ীও গলায় আটকে পড়লো।

৭৬. এ থেকে কয়েকটি মাসআলা বুঝা গেলো :

এক. আল্লাহ্কেও 'সায়্যিদ' বলা যায়। তখন এর অর্থ- মালিক, মাওলা (মুনিব)।

দুই. কোন মানুষ শুধু আমাল দ্বারা আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করতে পারে না। যতক্ষণ না হুযূরের গোলামী করে।

তিন. শুধু ইসলামই নাজাতের মাধ্যম।

কিছু সংখ্যক মূর্খলোক বলেছে যে, যেকোন দ্বীনের উপর র'য়ে নেককাজ করলে নাজাত পেয়ে যাবে। তা এই হাদীসেরও বিরোধী, পবিত্র কোরআনেরও। মহান রব এরশাদ করেন- وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ অর্থাৎ যে ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন অন্বেষণ করবে তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। [৩:৮৫]

কেননা, এ হাদীসে জান্নাতকে ইসলাম গ্রহণের মধ্যেই দেখানো হয়েছে।

৭৭. তাঁর নাম ইব্রাহীম অথবা আসলাম। তিনি হুযূরের আযাদকৃত গোলাম। তিনি বংশগতভাবে ক্বিবতী। হযরত আব্বাসের মালিকানায় ছিলেন। তিনি তাঁকে উপহার স্বরূপ হুযূরের মালিকানায় দিয়ে দেন। যখন হযরত আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তিনিই হুযূরকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিয়েছিলেন। হুযূর খুশী হয়ে তাঁকে আযাদ করে দিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধ ব্যতীত সকল জিহাদে হুযূরের সাথে ছিলেন। হযরত আলী মুরতাদ্বার খিলাফতকালে ওফাত পান। [মিরক্বাত ও আশি''আতুল লুম'আত]

৭৮. সুবহানাল্লাহ্! এটাই হচ্ছে, আমার প্রিয় রসূলের দৃষ্টিশক্তি। হাদীস অস্বীকারের ক্ষেত্রগুলোতে এ দু'টি বাক্য সর্বদা বলা যায়।

কেননা, 'আহলে ক্বোরআন' নামক ফির্কার উদ্ভাবক হচ্ছে- আবদুল্লাহ্ চাকড়ালভী, যে চাকড়ালা, জিলা মিয়াঁওয়ালী, পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেছে।

সে বড় ধনী ও খোঁড়া ছিলো। আলোচ্য হাদীসে مُتَّكِئًا বলে সে খোঁড়া হওয়ার দিকে এবং اَرِيْكَه বলে ধনী হবার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অথবা এর অর্থ হচ্ছে, ওই দলের উদ্ভাবক আরামপ্রিয় হবে, ঘরে থাকবে, ইলম-ই দ্বীন অর্জন করার জন্য সফর করবে না। শুধু ক্বোরআনের অনুবাদ দেখে এটা বলবে। সেহেতু, আবদুল্লাহ্ চাকড়ালভী এবং তার সমস্ত অনুসারীর অবস্থা এটাই। মোটকথা, এখানে হয়তো প্রকাশ্য দোষ-ত্রুটিগুলোর উল্লেখ রয়েছে, অথবা অপ্রকাশ্য দোষের।

৭৯. 'জানতো না' মানে মানতো না। অর্থাৎ সে বলবে

يَاْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِىْ مِمَّا اَمَرْتُ بِهٖ اَوْنَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ مَاوَجَدْنَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اتَّبَعْنَاهُ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اِنِّىْ اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنَ وَمِثْلَهٗ مَعَهٗ اَلَا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَقُوْلُ

যার নিকট আমার ওই বিধানগুলো থেকে, যেগুলোর আমি নির্দেশ দিয়েছি, কিংবা নিষেধ করেছি, কোন বিধান পৌঁছেছে, আর সে বলে দেয়, আমি জানি না "আমি যা কিছু ক্বোরআন শরীফে পাবো, তার অনুসরণ করবো।"[৭৯] এ হাদীস ইমাম আহমদ, আবু দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন এবং বায়হাক্বী 'দালাইলুন্ নুবুয়ত'-এ বর্ণনা করেছেন। **১৫৬ ॥ হযরত মিক্বদাম ইবনে মা'দীকারিব[৮০] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সাবধান! আমাকে ক্বোরআনও দেওয়া হয়েছে এবং সেটার সাথে অনুরূপ বস্তুও দেওয়া হয়েছে।[৮১] সাবধান! শীঘ্রই এক পেটভর্তি লোক স্বীয় মশারী সজ্জিত পালঙ্কের উপর বলবে,[৮২]**

'আমি ক্বোরআন ব্যতীত হাদীস ইত্যাদি সঠিক বলে স্বীকার করি না। ক্বোরআনে সবকিছু আছে। অতঃপর হাদীসের কি প্রয়োজন? আবদুল্লাহ্ চাকড়ালভী ও তার অনুসারীদের কথা এটাই।

সুবহানাল্লাহ্! مَاوَجَدْنَا এরশাদ করে কেমন উত্তমপন্থায় ইঙ্গিত করেছেন। তা হচ্ছে, যদিও ক্বোরআন পরিপূর্ণ; কিন্তু মানুষের পাওয়া বা বোধশক্তি অপরিপূর্ণ। ক্বোরআনে সবকিছু আছে; কিন্তু পাবে সে-ই, যাকে আমি উদ্ঘাটন করে দেবো। প্রত্যেক মানুষ সমুদ্র থেকে মুক্তা আহরণ করতে পারে না। মুক্তা সমুদ্র থেকেই বের হয়; কিন্তু পাওয়া যায় জহুরীর দোকানেই। ওই ভাষাবিশারদকুল শিরোমণি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাত্র এ দু'/একটি শব্দের মধ্যে তাদের প্রমাণাদির খণ্ডন সহকারে জানিয়ে দিয়েছেন।☆

৮০. তিনি সাহাবী। তিনি 'বনী কান্দা'র সাথে সম্পর্কিত। কান্দী প্রতিনিধিদলের সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে হাযির হন। ৮৭ হিজরীতে সিরিয়ায় ওফাত পান। তখন তাঁর বয়স ছিলো ৯১ বছর।

৮১. অর্থাৎ হাদীস শরীফ, যা ক্বোরআনের ন্যায় আল্লাহর ওহী এবং সেটার মতই 'ওয়াজিবুল ইত্তিবা' (যা অনুসরণ করা ওয়াজিব)। ক্বোরআন শরীফের এ আয়াত- وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (এবং তিনি কিতাব ও প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান (হিকমাত) শিক্ষা দেন।।২:১৫১)-ও আলোচ্য হাদীসের সহায়ক। 'কিতাব' তো ক্বোরআন-ই হাকীম এবং 'হিকমত' হচ্ছে হাদীস শরীফ।

স্মর্তব্য যে, ক্বোরআন শরীফের বচনও ওহী, বিষয়বস্তুও ওহী; কিন্তু হাদীস শরীফের বিষয়বস্তু ওহী, বচনগুলো হুযূরের নিজের। এ জন্যেই হাদীসের বচনগুলোর বিধান ক্বোরআনের সমপর্যায়ের নয়। যেমন- এর তিলাওয়াত নামাযে করা যাবে না, ওযূ' ব্যতীত সেটা স্পর্শ করা যায়। এ কারণেই ক্বোরআনকে 'ওহী-ই মাতলূ' (পঠিত ওহী), হাদীসকে 'ওহী-ই গায়র-ই মাতলূ' (অপঠিত ওহী)।☆☆ 'মিরক্বাত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল আমীন হাদীস নিয়েও অবতীর্ণ হতেন। এর গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'এক ইসলাম'-এ দেখুন।

৮২. এ اَلَا (আলা-) শব্দটি হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য। এ কারণে আমাদের ইমাম-ই আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, দুর্বল সনদ বিশিষ্ট হাদীস থাকা সত্ত্বেও 'ক্বিয়াস' জায়েয নয়। দুর্বল সনদ বিশিষ্ট হাদীস শরীফ শক্তিশালী ক্বিয়াসের উপরও প্রাধান্য পাবে। যদিও ওই হাদীস অস্বীকারকারীর জন্ম তেরশ' বছর পরে হয়েছে; কিন্তু তা হুযূরের মুবারক দৃষ্টির

☆বাহ্যিকদৃষ্টিতে مَاوَجَدْنَا الخ (আমরা যা পাবো) কথাটি বাতিলপন্থী আহলে ক্বোরআনের উক্তি বলে মনে হচ্ছে। প্রকৃত অর্থে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের বক্তব্যকে নিজে উদ্ধৃত করে ভাষাগত পারদর্শিতা দিয়ে তাদেরই খণ্ডন করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা স্বীয় বোধশক্তি দিয়ে যা পাবে সেটাকে তারা ক্বোরআন বুঝার চূড়ান্ত পর্যায় বলে মনে করে। এটাও এক ধরনের জঘন্য ভ্রান্তি। প্রকৃত অর্থে, আল্লাহ্ ও রসূলের প্রদত্ত জ্ঞানই ক্বোরআন বুঝার একমাত্র সহজ মাধ্যম।

☆☆ অর্থাৎ যথাক্রমে হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম কর্তৃক পঠিত আকারে অবতীর্ণ ওহী ও ফিরিশ্তার মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হুযূরের ক্বলব মুবারকে প্রদত্ত ওহী, যা তিনি নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ فَمَاوَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَاَحِلُّوْهُ وَمَاوَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ وَاِنَّ مَاحَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كَمَاحَرَّمَ اللّٰهُ اَلَا لَايَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْاَهْلِيُّ وَلَاكُلُّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَلَالُقْطَةُ مُعَاهِدٍ اِلَّا اَنْ يَّسْتَغْنِىَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ اَنْ يَّقْرُوْهُ فَاِنْ لَّمْ يَقْرُوْهُ فَلَهٗ اَنْ يُّعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَرَوَى الدَّارِمِىُّ نَحْوَهٗ وَكَذَا اِبْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ كَمَاحَرَّمَ اللّٰهُ

শুধু ক্বোর্আনকে আঁকড়ে ধরো, তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল জানবে এবং যা হারাম পাবে তা হারাম জানবে;[৮৩] অথচ রসূলুল্লাহ্ কর্তৃক হারাম কৃত বস্তু তেমনই হারাম, যেমন আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তু হারাম।[৮৪] দেখো, তোমাদের জন্য না গৃহপালিত গাধা হালাল, না শিকারী দাঁতবিশিষ্ট হিংস্রজন্তু, না চুক্তিবদ্ধ কাফিরের হারানো বস্তু, কিন্তু যখন সেটার মালিক তা থেকে বেপরোয়া হয়ে যাবে তখন বৈধ।[৮৫] আর কোন সম্প্রদায়ের নিকট অতিথি- মেহমান গেলে তাদের উপর তার আতিথ্য করতে হবে। যদি মেহমানদারী না করে তাহলে সে তার মেহমানদারীর পরিমাণ বস্তু তাদের কাছ্ থেকে নিয়ে যাবে।[৮৬] এটি হযরত আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন। দারেমীও এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে মাজাহ্ حَرَّمَ اللّٰهُ (হাররামাল্লাহু) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

অতি নিকটে ছিলো। এ জন্য يُوْشِكُ (অদূর ভবিষ্যতে) এরশাদ করেছেন; شَبْعَانٌ (পেটভর্তি) শব্দদ্বারা তার 'ধনী হওয়া' এবং 'মশারী সজ্জিত পালঙ্ক' দ্বারা তার 'খোঁড়া হওয়া' বুঝানো হয়েছে।

৮৩. অর্থাৎ 'নিজের গবেষণার উপর নির্ভর করো, ক্বোরআন ধারী (নবী) থেকে পৃথক হয়ে যাও।' এ প্রলাপই বে-দ্বীনদের শিকড়।

৮৪. অর্থাৎ অকাট্যভাবে হারাম ও তা বর্জন করা ওয়াজিব। এজন্য সাহাবা-ই কেরাম হুযূরের এরশাদ অনুসরণে ক্বোরআনের ন্যায় আমল করতেন। আমাদের উপর যেমন নামায ফরয, তেমনি নামাযের সংখ্যা ও পরিমাণ অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্বত নামায এবং প্রত্যেক নামাযে নির্ধারিত রাক'আত ফরয। আমরা যে হাদীসকে শরীয়তে শরীয়তের, প্রায় চূড়ান্ত বিধান বলি, তা সনদের কারণেই বলে থাকি। কিন্তু যাঁরা সরাসরি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসসমূহ শুনেছেন, তাঁদের জন্য সেগুলো ক্বোরআনের মত অকাট্য ছিলো। দেখুন, সিদ্দীক্ব-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাদীসের উপর ভিত্তি করে হুযূরের 'মীরাস' বন্টন করেন নি; অথচ ক্বোরআনী বিধান হচ্ছে, মীরাস বন্টন করা।

৮৫. অর্থাৎ হাদীস অস্বীকারকারীদের উচিত হচ্ছে গাধার মাংস খাওয়া, কুকুর-বিড়ালের মাংসও আহার করা এবং পরিত্যক্ত জিনিসও কুঁড়িয়ে নেওয়া। কেননা, ক্বোরআন এগুলোকে হারাম করে নি; বরং হাদীসই হারাম করেছে। ইনশা- আল্লাহ্ এর উত্তর তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত দিতে পারবে না।

মাসআলা: পরিত্যক্ত কোন জিনিস পাওয়া গেলে সেটার মালিককে খোঁজ করে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। তা কোন মুসলমানের হোক কিংবা কোন যিম্মী কাফিরের☆ হোক। 'হারবী কাফির'র☆☆ মাল, যা বিনা প্রতারণায় পাওয়া যাবে তা হালাল। যখন মালিককে খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে যাবে তখন তা দান করে দিতে হবে। আর যদি যে কুঁড়িয়ে পায় সে যদি দরিদ্র হয়, তাহলে নিজে ব্যবহার করবে। এ সম্পর্কিত অন্যান্য মাসআলাগুলো ফিক্বহের কিতাবে দেখুন।

৮৬. অর্থাৎ এ মাসআলাও ক্বোরআনে বাহ্যিকভাবে পাওয়া যায় না, রয়েছে হাদীস শরীফে।

স্মর্তব্য যে, ওই যুগে গ্রাম্য কাফিরদের থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হতো, 'যদি ইসলামী সেনাদল বা কোন মুসলমান তোমাদের গ্রামের উপর দিয়ে যায়, তাহলে তোমরা তাকে দু'/এক বেলার খাদ্য দেবে।' এ অঙ্গীকারের অধীনে ইসলামী সৈন্যদের, নিজেদের রেশন তাদের কাছ থেকে উসূল করার অধিকার ছিলো। হাদীস শরীফে সেটার উল্লেখ করা রয়েছে। বর্তমানেও কোন জরুরী অবস্থায় সৈনিক

☆ জিযিয়া (কর) দিয়ে মুসলিম দেশে অবস্থানরত কাফির।

☆☆ জিহাদ করে মুসলমান বেঁচে থাকতে হয় এমন অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফির-নাগরিক।

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيَحْسَبُ اَحَدُكُمْ مُتَّكِيًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا اِلَّا مَافِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ اَلَا وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ قَدْاَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَشْيَآءَ اِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْاٰنِ اَوْ اَكْثَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا بِاِذْنٍ وَّلَاضَرْبَ نِسَآئِهِمْ وَلَااَكْلَ ثِمَارِهِمْ اِذَا اَعْطَوْكُمُ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤدَ وَفِيْ اِسْنَادِهٖ اَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ الْمِصِّيْصِيُّ قَدْتُكُلِّمَ فِيْهِ ـ

১৫৭ || হযরত 'ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়াহ্'[৮৭] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান হয়ে এরশাদ করলেন, "তোমাদের মধ্যে কি কেউ মশারী সজ্জিত পালঙ্কে হেলান দিয়ে এটা ধারণা করতে পারে যে,[৮৮] আল্লাহ্ ওই জিনিসগুলো ব্যতীত অন্য কিছু হারাম করেন নি, যেগুলো পবিত্র ক্বোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে? সাবধান! আল্লাহ্‌রই শপথ! আমি বিধানাবলী দিয়েছি, ওয়ায করেছি এবং এমন অনেক কিছু নিষিদ্ধ করেছি, যেগুলো ক্বোরআনের মতো কিংবা তদপেক্ষাও অধিক।[৮৯] নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এটা হালাল করেন নি যে, কিতাবীদের ঘরে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করবে, না তাদের নারীদেরকে মারধর করবে এবং না তাদের ফলমূল খেয়ে ফেলবে, যখন তারা নিজেদের দায়িত্বাধীন প্রাপ্যসমূহ তোমাদেরকে পরিশোধ করবে।[৯০] এটা আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে আশ'আস ইবনে শো'বা মিস্‌সিসীও রয়েছেন, যাঁর ব্যাপারে কিছু বিতর্ক রয়েছে।

কিংবা পুলিশের ব্যয়ভার শহরবাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এ বাক্যের অন্যান্য ব্যাখ্যাও রয়েছে; কিন্তু এ ব্যাখ্যা অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য। এ অবস্থায় আলোচ্য হাদীসটি রহিত নয়। বর্তমানেও যদি কাফিরদের সাথে এ ধরনের চুক্তি হয়ে যায়, তাহলে তাদের জন্য তা অনুসরণ করা আবশ্যক হবে।

৮৭. তিনি সাহাবী। তাঁর পিতা সারিয়াহ্'র উপনাম 'আবূ নাজীহ' ছিলো। হযরত 'ইরবাদ্ব আসহাব-ই সোফ্‌ফা'র অন্তর্ভুক্ত। অন্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আগ্রহ এবং তাঁর ভয় খুবই বেশি রাখতেন। সিরিয়ায় অবস্থান করতেন এবং ৭৫ হিজরীতে সেখানে ওফাত পান। তাঁর থেকে ৩১টি হাদীস বর্ণিত। হামাসে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত।

৮৮. এখানে শুধু সম্মানিত সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হয় নি; বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানদের করা হয়েছে। কেননা, সম্মানিত সাহাবীদের যুগ হতে প্রায় তেরশ' বছর পর্যন্ত হাদীস অস্বীকারকারী কেউ হয় নি। এ রোগ চতুর্দশ শতাব্দীতে বিস্তার লাভ করেছে। আর এ প্রশ্নটি আশ্চর্য প্রকাশের জন্য। অর্থাৎ আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে এমন নির্বোধ লোকেরও জন্ম হবে, যারা এরূপ বাজে আক্বীদা পোষণ করবে।

৮৯. অর্থাৎ আমার প্রদত্ত বিধানাবলী এবং আমার হালাল ও হারামকৃত জিনিসগুলো ক্বোরআনী আহকাম ও ক্বোরআন কর্তৃক হালাল ও হারামকৃত জিনিস হতেও অধিক। দেখুন! ক্বোরআন করীম শুধু শুকরের মাংস হারাম করেছে। যেমন- এরশাদ হচ্ছে, وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ (এবং শূকরের মাংস) শূকরের কলিজা, যকৃত (گردہ), হাড় ও মস্তিষ্ক; এ ছাড়া কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি হাদীসই হারাম করেছে। এরূপই সমস্ত বিধি-বিধানের অবস্থা। হাদীস অস্বীকার করে এসব জিনিসের হারাম হওয়া কি দিয়ে সাব্যস্ত করা যাবে?

৯০. অর্থাৎ 'যখন যিম্মী, আহলে কিতাব জিযিয়া (কর) পরিশোধ করে দেবে, তখন তোমরা না তাদের ঘরে যেতে পারবে, না তাদের মাল বাজেয়াপ্ত করতে পারবে, না তাদেরকে শাস্তি দিতে পারবে। এই মাসআলার স্পষ্ট বিবরণও ক্বোরআনে নেই; আমি এরশাদ করছি।' 'আহলে কিতাব'র শর্ত (قيد) এ জন্য আরোপ করা হয়েছে যে, আরবের মুশরিকদের নিকট থেকে জিযিয়া (কর) গ্রহণ করা হয় না। তাদেরকে মুসলমান হয়ে যেতে হবে।

স্মর্তব্য যে, যদি 'যিম্মী' ব্যক্তি জিযিয়া (কর) প্রদান করতে

وَعَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَارَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّ هٰذِهٖ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا فَقَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَاِنَّهٗ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا

১৫৮ ॥ তাঁরই হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, একদিন আমাদেরকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ালেন। তারপর আমাদের দিকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে বসলেন এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ওয়ায করলেন, যার প্রভাবে অশ্রু প্রবাহিত হলো, ভয়ে অন্তর কেঁপে ওঠলো।[৯১] এক ব্যক্তি আরয করলেন, এয়া রসূলাল্লাহ্! সম্ভবত এটা বিদায়-ভাষণ।[৯২] সুতরাং কিছু ওসীয়ত করুন! হুযূর এরশাদ করলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্কে ভয় করার, বাদশাহ্র কথা শ্রবণ ও আনুগত্য করার নির্দেশ দিচ্ছি,[৯৩] যদিও সে হাবশী গোলাম হয়।[৯৪] কেননা, আমার পরে তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে প্রচুর মতপার্থক্য হতে দেখবে।[৯৫]

অস্বীকার করে, তাহলে সে 'হারবী' হয়ে যাবে। তখন তাদের জমি-জমা ইসলামী রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত এবং তাদেরকে বন্দী করতে পারবে। এ জন্য 'জিযিয়া' প্রদানের শর্তারোপ করা হয়েছে।

৯১. এমনিতেই হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি ওয়াযই চিত্তাকর্ষক বা হৃদয়গ্রাহী হতো। কিন্তু বিশেষ করে এ ওয়ায অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিলো। যা'তে খোদাপ্রেম ও আল্লাহ্র ভয়ের সাগরে ঢেউ খেলছিল। ইশক্ব বা প্রেমের কারণে অশ্রু ঝরে এবং ভয়ের কারণে অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হয়। بَلِيْغٌ (বালীগ) শব্দ দ্বারা 'প্রভাবপূর্ণ' বুঝায়।

৯২. অর্থাৎ হুযূরের ওফাত শরীফ নিকটবর্তী এবং তিনি তেমনভাবে কথা বলছেন, যেমন- বিদায়কালে বলা হয়। তিনি যেন আপন উম্মতকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং আখেরী উপদেশমালা প্রদান করছেন। সুবহানাল্লাহ্! স্বাহাবা-ই কেরামের তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির উপর আমাদের প্রাণ উৎসর্গ হোক।

৯৩. বুঝা গেলো যে, বাস্তবিকই হুযূরের ওফাত শরীফ নিকটবর্তী ছিলো, এ জন্য তাঁদের কথা প্রত্যাখ্যান করা হয় নি; বরং আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা হয়েছে। জানা গেলো যে, হুযূর আপন ওফাতের সময় সম্পর্কে জানেন এবং এটা এমন পূর্ণাঙ্গ বাণী যে, সমস্ত বিধান এতে এসে গেছে। تَقْوَى الله (আল্লাহ্র ভয়)'র মধ্যে সমস্ত দ্বীনী বিধান এবং বাদশাহ্র আনুগত্য ও সমস্ত রাজনৈতিক বিধান রয়েছে।

৯৪. অর্থাৎ যদি তোমাদের বাদশাহ্ কালো হাবশী গোলামও হয়, তবুও তার আনুগত্য করো; তার বংশ ও গড়ন দেখো না। তার আদেশ মান্য করো।

স্মর্তব্য যে, 'খিলাফত' ক্বোরাঈশ বংশীয়দের জন্য নির্দিষ্ট; কিন্তু 'রাজত্ব' যেকোন মুসলমান লাভ করতে পারে। সুতরাং আলোচ্য হাদীস এ হাদীস اَلْخِلَافَةُ مِنْ قُرَيْشٍ-এর বিরোধী নয়। তাছাড়া, শাসকের আনুগত্য ওই সব বিধানে করা হবে, যেগুলো শরীয়ত বিরোধী নয়। তাছাড়া, শাসক হবার পরেই তার আনুগত্য করা হবে। ইয়াযীদ বৈধ শাসকই হয় নি; হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে শাসকই মানেন নি। সুতরাং তাঁর আমল এ হাদীসের বিরোধী নয়। শাসক বানানো এক কথা এবং শাসক হবার পর আনুগত্য করা অন্য কথা।

৯৫. রাজনৈতিক মতভেদও, ধর্মীয় মতভেদও। যেমন হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফতকালের শেষের দিকে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফতকালে রাজনৈতিক মতভেদের সাথে সাথে ধর্মীয় মতভেদও প্রকাশ পায়। যেমন- জবরিয়া, ক্বদরিয়া, রাফেযী, খারেজী (বাতিল সম্প্রদায়গুলো)'র উদ্ভব হলো।

স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমে সম্মানিত সাহাবীদের মধ্যে দ্বীনী মতভেদ সৃষ্টি হয় নি। সমস্ত সাহাবী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হুযূরের এ পবিত্র বাণী অত্যন্ত ব্যাপক এবং তাঁর এ পূর্বাভাস হুবহু সঠিক হয়েছিলো।

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْابِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِفَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَّكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرِ الصَّلٰوةَ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ

সুতরাং তোমরা আমার এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফা-ই রাশিদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।[৯৬] তা দাঁত দ্বারা মজবুতভাবে চেপে ধরো। প্রত্যেক নতুন কথাবার্তা থেকে দূরে থাকো। কেননা, প্রতিটি নতুন জিনিস বিদ্‌'আত এবং প্রত্যেক বিদ্‌'আত গোমরাহী।[৯৭] এটা আহমদ, আবূ দাঊদ এবং তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু (তাঁরা তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্) উভয়েই নামাযের ঘটনা বর্ণনা করেন নি।

১৫৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্মুখে একটি রেখা অঙ্কন করলেন। অতঃপর এরশাদ করলেন, "এটা আল্লাহ্‌র রাস্তা।"[৯৮]

---

৯৬. প্রত্যেক 'সুন্নাত' অনুসরণযোগ্য। কিন্তু প্রতিটি হাদীসের অনুসরণ করা যায় না। হুযূরের বৈশিষ্ট্যাবলী (خُصُوْصِيَات) সম্বলিত হাদীস, রহিত বিধান এবং আমালসমূহ ও হাদীস, কিন্তু 'সুন্নাত' নয়। এ জন্য এখানে হাদীসকে আঁকড়ে ধরার আদেশ দেওয়া হয় নি; বরং সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার জন্য বলা হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ্, আমরা 'আহলে সুন্নাত'। দুনিয়ায় 'আহলে হাদীস' কেউ হতে পারে না। সাহাবা-ই কেরামের আমল এবং কার্যাবলীও শাব্দিক অর্থে 'সুন্নাত'; অর্থাৎ দ্বীনের উত্তম তরীক্বা বা পন্থা; যদিও সেগুলোর উদ্ভাবন 'বিদ্‌'আত-ই হাসানাহ্'। ফারূক্ব-ই আ'যম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যথারীতি তারাভীহ্'র নামায জামা'আত সহকারে চালু করেছিলেন, যাকে তিনি নিজেই বিদ্‌'আত বলেছেন। তিনি বলেন- نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ (এটা কতই উত্তম বিদ্‌'আত!) তাঁর এ বাণী আলোচ্য হাদীসের বিরোধী নয়। কেননা, তা শরীয়তের ভাষায় বিদ্‌'আত, আভিধানিক অর্থে সুন্নাত। অথচ মুসলমানদের জন্য তা একটি বাধ্যতামূলক করণীয়।

স্মর্তব্য যে, সমস্ত সাহাবী হিদায়াতের নক্ষত্র। বিশেষতঃ খোলাফা-ই রাশিদীন। সুতরাং আলোচ্য হাদীস এ-ই হাদীসের বিরোধী নয়- اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ (আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য)। প্রত্যেক সাহাবীর অনুসরণই নাজাতের মাধ্যম।

৯৭. এখানে 'নতুন জিনিস' দ্বারা 'নতুন আক্বীদা' বুঝানো উদ্দেশ্য, যা ইসলামে হুযূরের পরে উদ্ভাবিত হয়েছে। এ জন্য যে, এখানে সেটাকে গোমরাহী বলা হয়েছে। গোমরাহী আক্বীদাতেই হয়ে থাকে, আমলে নয়। সুতরাং এ হাদীস আপন স্থানে ব্যাপকার্থক। সুতরাং ক্বাদিয়ানী, চকড়ালভী, রাফেযী ও খারেজী-এ সবই বিদ্‌'আত ও গোমরাহী। আর যদি এটা দ্বারা 'নতুন আমল' বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ হাদীসটি عَام مخصوص منه البعض অর্থাৎ প্রতিটি মন্দ বিদ্‌'আতই গোমরাহী। 'বিদ্‌'আত-ই হাসানাহ্' (উত্তম বিদ্‌'আত) কখনো মুবাহ্, কখনো মুস্তাহাব, কখনো ওয়াজিব এবং কখনো ফরযও হয়ে যায় থাকে। হাদীসের কিতাবসমূহ এবং ক্বোরআনের পারাগুলো বিদ্‌'আত; কিন্তু উত্তম বিদ্‌'আত। এর গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

৯৮. সুবহানাল্লাহ্! কতই উত্তম শিক্ষা। সত্য দ্বীনকে ক্বোরআন শরীফে 'সিরাত্ব-ই মুস্তাক্বীম' বলা হয়েছে। অর্থাৎ সোজাপথ, যা অত্যন্ত সহজভাবে মহান রব পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম রেখা অঙ্কন করে এর উদাহরণ দেখিয়ে দিয়েছেন। এখানে 'সাবীলিল্লাহ্' মানে সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাস এবং নেক আমলসমূহ।

স্মর্তব্য যে, শরীয়ত ও তরীক্বতের সিলসিলা চতুষ্টয় যথাক্রমে- হানাফী, শাফে'ঈ, মালিকী ও হাম্বলী এবং ক্বাদেরী, চিশ্‌তী, নক্বশবন্দী, সোহরাওয়ার্দী ইত্যাদি একই তরীক্বাহ্, যেগুলোকে একশব্দে 'আহলে সুন্নাত' বলা হয়। কেননা, তাদের আক্বীদাগুলো অভিন্ন। বাহ্যিক আমলের

ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَقَالَ هٰذِهٖ سُبُلٌ عَلٰى كُلِّ سَبِيْلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَّدْعُوْ اِلَيْهِ وَقَرَأَ ﴿وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ﴾ اَلْاٰيَةَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ - رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ النَّوَوِىُّ فِىْ اَرْبَعِيْنِهٖ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَيْنَاهُ فِىْ كِتَابِ الْحُجَّةِ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

এরপর সেটার ডানে-বামে আরো রেখা অঙ্কন করলেন এবং এরশাদ করলেন, এগুলো ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা; যেগুলোর মধ্যে প্রতিটি রাস্তায় শয়তান রয়েছে, যে ওই দিকে আহ্বান করছে।[৯৯] আর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন- "ইন্না হা-যা- সেরা-ত্বী- মুস্তাক্বী-মা-; ফাত্তাবি'উ-হু... (নিশ্চয় এটা আমারই সরল-সঠিক পথ, তোমরা সেটারই অনুসরণ কর)। [এটা আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী বর্ণনা করেছেন]

১৬০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার কামনা আমার আনীত বিধানের অনুগত হবে।[১০০] এটি শরহে সুন্নাহয় বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাওয়াভী স্বীয় আরবা'ঈন কিতাবে[১০১] উল্লেখ করেছেন- এ হাদীস 'সহীহ', যা আমি সহীহ সনদ দ্বারা 'কিতাবুল হুজ্জাহ্'য় বর্ণনা করেছি।

১৬১ ॥ হযরত বেলাল ইবনে হারিস মুযানী[১০২] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন- সম্মানিত সাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য হতো এটা কা'বা-এ ঈমান'র চারটি রাস্তা অথবা নুবূয়ত-সমুদ্রে পৌঁছার চারটি নদী। এগুলো ব্যতীত অন্য ভ্রান্তদলগুলো হচ্ছে বাঁকা পথ। কারণ, আক্বাইদের ক্ষেত্রে তারা পরস্পর বিরোধী।

৯৯. এখানে 'শয়তান' মানে হয়তো ওই মতবাদগুলোর প্রবর্তক, যেমন- ক্বাদিয়ানী মতবাদের জন্য গোলাম আহমদ এবং চাকড়ালভী মতবাদ (আহলে ক্বোরআন)'র জন্য আবদুল্লাহ্ কিংবা ওই মতবাদগুলোর প্রচারকগণ অথবা এর মানে স্বয়ং ইবলীসই। পবিত্র ক্বোরআনে দুষ্ট জিন ও পথভ্রষ্টকারী লোকদেরও 'শয়তানগণ' (شَيَاطِيْنُ) বলা হয়েছে।

১০০. অর্থাৎ মু'মিন হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যার 'আমল' আমার প্রদত্ত বিধানাবলীকে পছন্দ করে এবং সেগুলো ব্যতীত অন্যগুলোকে অপছন্দ করে। হাদীস ও ক্বোরআনের যাবতীয় বিধান 'আনীত' শব্দটির অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আর 'ঈমান' মানে 'মূল ঈমান'। বাস্তবিকই কেউ যদি কোন দ্বীনী বিষয়কে মন্দ মনে করে, তবে সে কাফির। আর এমতাবস্থায় আলোচ্য হাদীসের বিপক্ষে না কোন অভিযোগ আছে, না আছে কোন ভিন্ন ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কোন গুনাহ্গার ফাসিক্ব-বদকার পাপগুলোকে ভাল এবং সৎকাজগুলোকে মন্দ মনে করে না। এ কারণেই সে মু'মিন থেকে যায়, যদিও ফাসিক্ব হয়।

১০১. কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্‌সালাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট ৪০টি হাদীস পৌঁছিয়ে দেয়, ক্বিয়ামতের দিন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এ জন্য ওলামা ও মুহাদ্দিসীন 'চল্লিশ হাদীস' সঙ্কলন করেছেন।

ইমাম নাওয়াভী সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারীও 'চল্লিশ হাদীস' সঙ্কলন করেছেন, যার উল্লেখ এখানে করা হয়েছে।

১০২. তিনি সাহাবী। ৫ম হিজরীতে মুযাইনাহ্ গোত্রের প্রতিনিধিদলের মধ্যে হুযূরের খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ৮০ বছর বয়সে ৬০ হিজরীতে ওফাত পান। মদীনা মুনাওয়ারার নিকটে আশ'আর নামক স্থানে বসবাস করেন।

مَنْ اَحْيٰ سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِيْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِيْ فَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَّمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَايَرْضٰهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ كَثِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدِّيْنَ لَيَأْرِزُ اِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا

যে ব্যক্তি আমার মৃত সুন্নাতকে, যা আমার পরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, জীবিত করবে,[১০৩] সে ওইসব লোকের সমান সাওয়াব পাবে, যারা তদনুযায়ী আমল করে- ওইসব আমলকারীর সাওয়াবের মধ্যে হ্রাস পাওয়া ছাড়াই।[১০৪] আর যে ব্যক্তি এমন ভ্রান্ত বিদ্'আত উদ্ভাবন করবে, যাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অসন্তুষ্ট,[১০৫] তার উপর ওইসব লোকের সমান গুনাহ্ বর্তাবে, যারা তদনুযায়ী আমল করবে; আর এতে তাদের গুনাহ্ হতে কিছুই হ্রাস পাবে না। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর হতে বর্ণনা করেছেন এ ধারায়- তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।[১০৬] **১৬২ ||** হযরত 'আমর ইবনে 'আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় দ্বীন হিজাযের দিকে এমনভাবে গুটিয়ে আসবে, যেমনি সাপ তার গর্তের দিকে ফিরে আসে।[১০৭]

---

১০৩. অর্থাৎ যে সুন্নাত মুসলিম সাধারণ ছেড়ে দিয়েছে, তা নিজেও আমল করে এবং অন্যদেরকেও আমল করার প্রতি উৎসাহিত করে। যেমন বর্তমান যুগে দাড়ি রাখা।

১০৪. কেননা,আল্লাহ্র এ বান্দা সুন্নাতকে জীবিত করার ক্ষেত্রে মানুষের তিরস্কার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করে। সুন্নাতের খাতিরে সব কষ্ট সহ্য করে থাকে। সুতরাং সে বড় মুজাহিদ। কোন উত্তম কাজের উদ্ভাবনকারী যে সাওয়াব পাবে সেটার প্রচার-প্রসারকারীও একই সাওয়াব পাবে।

১০৫. এখানে بِدْعَة শব্দটি مَوْصُوْف (বিশেষিত) এবং ضَلَالَة-শব্দটি صِفَت (বিশেষণ); আর نكره (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য) দ্বারা نكره (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য)কে বিশেষিত করা হলে تخصيص বা নির্দিষ্টকরণের অর্থ বুঝায়। এখানে بِدْعَة কে ضَلَالَة(ভ্রান্তি) দ্বারা বিশেষিত করা 'বিদ্'আত-ই হাসানাহ' (উত্তম বিদ্'আত)কে পৃথক করে দেওয়ার জন্যই।[মিরক্বাত] অর্থাৎ মন্দ বিদ্'আতসমূহের উদ্ভাবক জঘন্য অপরাধী। যেমন উর্দূ ভাষায় ক্বিরআত ও আযান বলা, অথবা অন্য সব সুন্নাতবিরোধী কাজ। পক্ষান্তরে, উত্তম বিদ্'আতগুলোর উদ্ভাবক সাওয়াবের উপযোগী হবে। যেমন- ইলম-ই সরফ (শব্দপ্রকরণ) ও ইলম-ই নাহ্ভ (আরবী ব্যাকরণ)'র আবিষ্কারক, দ্বীনী মাদরাসাসমূহ, বুযুর্গদের ওরস, মীলাদ শরীফ এবং গেয়ারভী শরীফের মাহফিলের প্রবর্তক। এর আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এ হাদীস বিদ্'আতের প্রকারভেদ বিন্যস্ত করার উৎস। 'কিতাবুল ইলম'-এও এ বিষয়ে আলোচনা আসবে (ইনশা- আল্লাহ্)।

১০৬. কাসীর ইবনে 'আমর সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল বর্ণনাকারী। ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ''লোকটি বড় মিথ্যুক ছিলো।'' তার দাদা আমর ইবনে 'আউফ সাহাবী ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয় تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ (ফলে, তারা এভাবে ফিরে যায় যে, তাদের চোখগুলো থেকে অশ্রু বিগলিত হতে থাকে।[৯:৯২]) তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন এবং হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র শাসনামলে ওফাত পান। বদরের যুদ্ধে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'র সাথেই ছিলেন।

১০৭. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের পূর্বে মুসলমানগণ হিজায ব্যতীত অন্য কোথাও আশ্রয় পাবে না। এ জন্য সবাই সেখানেই একত্রিত হয়ে যাবে। হিজায হচ্ছে আরবের ওই প্রদেশ, যেখানে মক্কা মু'আযযমাহ্, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ এবং তায়েফ ইত্যাদি অবস্থিত।

وَلَيُعْقَلَنَّ الدِّيْنُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْاَرْوِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ اِنَّ الدِّيْنَ بَدَا غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَآءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ **وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو** قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَاْتِيَنَّ عَلٰى اُمَّتِىْ كَمَا اَتٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتٰى اُمَّهٗ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِىْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّصْنَعُ ذٰلِكَ

আর দ্বীনকে হিজাযের সাথে তেমনিভাবে বেঁধে দেওয়া হবে, যেমন পাহাড়ী মেষ পাহাড়ের চূড়ার সাথে বেঁধে রাখা হয়।[১০৮] নিশ্চয় দ্বীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় আরম্ভ হয়েছে। আর যেভাবে আরম্ভ হয়েছে, সেভাবেই ফিরে যাবে। সুতরাং নিঃসঙ্গদের জন্য সুসংবাদ! ওই সব নিঃসঙ্গ হচ্ছে তারাই, যারা আমার পরে আমার ওই সব সুন্নাহকে সংশোধন করবে, যেগুলোকে লোকেরা বিকৃত করে ফেলবে।[১০৯] [তিরমিযী] **১৬৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর** রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের উপর হুবহু ওইরূপ অবস্থা আসবে, যেমনটি বনী ইসরাঈলের উপর এসেছে। যেভাবে একটি জুতো অপর জুতোর সমান হয়।[১১০] এমনকি যদি তাদের কেউ স্বীয় মায়ের সাথে প্রকাশ্যে যিনা করে থাকে, তাহলে আমার উম্মতেও তেমন লোক পয়দা হবে, যে সেরূপ করবে।[১১১]

স্মর্তব্য যে, মুসলমানগণ প্রথমে হিজাযে আশ্রয় নেবে, অতঃপর সেখানেও নিরাপত্তা পাবে না, তখন মদীনা মুনাওয়ারায় গুটিয়ে আসবে। সুতরাং এ হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসের বিরোধী নয়। কারণ দ্বীন মদীনা মুনাওয়ারার দিকে গুটিয়ে আসবে। মদীনা মুনাওয়ারাতেই নুবূয়তের সূর্য চোখের আড়াল হয়েছে এবং এখান থেকে সেটার কিরণ অর্থাৎ শরীয়ত অদৃশ্য হয়েছে।

১০৮. অর্থাৎ পাহাড়ী মেষগুলো সারাদিন সব জায়গায় বিচরণ করে এবং সন্ধ্যার সময় স্বীয় আশ্রয়স্থলে অর্থাৎ পাহাড়ের চূড়ায় বেঁধে দেওয়া হয়, যেখানে সেগুলো হিংস্র জন্তু থেকে নিরাপদ থাকে। হিজায, বিশেষতঃ মদীনা মুনাওয়ারাহ্ ইসলামের আশ্রয়স্থল। এতে ইঙ্গিতে এটা বলা হয়েছে যে, ইসলাম হেরমাঈন শারীফাঈন হতে কখনো বেরিয়ে যাবে না এবং সকল মুসলমানের সম্পর্ক সেটার সাথে অব্যাহত থাকবে, যেমনিভাবে সাপের সম্পর্ক স্বীয় গর্তের সাথে এবং মেষগুলোর সম্পর্ক থাকার জায়গার সাথে সবসময় থাকে। সেটার ওই অর্থ নয়, যা 'বারাহীনে ক্বাতি'আহ্'র প্রণেতা (মৌং খলীল আহমদ আম্বেঠভী প্রমুখ) বুঝে বসেছেন। তা হচ্ছে- 'সেখানে ইসলাম ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে পৌঁছবে। এর পূর্বে দুনিয়ার অন্যান্য জায়গায় ইসলাম থাকবে। হিজায কিংবা মদীনা মুনাওয়ারায় থাকবে না।'

১০৯. এর ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ যেমনিভাবে, প্রথমে স্বল্প সংখ্যক মিসকীন লোক ইসলাম ক্বূল করেছিলেন, তেমনিভাবে ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে অল্প কিছু গরীব লোকই ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যাবেন। ওই পূর্বের গরীবরাও মুবারক ছিলেন এবং এ পরবর্তী গরীবরাও মুবারক হবেন। দুনিয়ার বাকী অংশে কুফরই থাকবে। এর অর্থ এ নয় যে, 'ইসলামে নতুন ফির্কা বেরুবে এবং তাদের অনুসারী অল্প সংখ্যক হবে, তারাই সত্যের উপর থাকবে।' যেমনটি ক্বাদিয়ানী ও ওহাবীরা বুঝে বসেছে। পরবর্তী হাদীসে বিবরণ আসবে; যার মর্মার্থ হচ্ছে- মুসলমানদের বড় দল (আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত)'র সাথে থেকো।

১১০. সুবহানাল্লাহ্! সেই 'মুত্তালা'উল্ গুয়ূব' (অদৃশ্যজ্ঞান প্রাপ্ত) মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কতই নির্ভুল সংবাদ দিয়েছেন এবং কতই উত্তম উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন! তা হচ্ছে যেমনিভাবে ডান পায়ের জুতো বাম পায়ের জুতোর সাথে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকার-আকৃতিতে এক রকম হয়, তেমনিভাবে আমার উম্মতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থাদি আক্বীদা ও আমালগুলোতে বনী ইসরাঈলের ন্যায় হয়ে যাবে।

১১১. এটা আমলসমূহে সাদৃশ্যের কথা; নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর গুনাহ্ও আমার উম্মতের মধ্যে পাওয়া যাবে। আমরা দেখেছি যে, ইংরেজদের দাড়ি মুণ্ডানো এবং গোঁফ বড়, মুসলমানদেরও এরূপ আকৃতি হয়ে গেছে। অতঃপর ইংরেজগণ নাকের নিচে গোঁফ মাছির ন্যায় রেখেছে।

وَانَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَفِىْ رِوَايَةِ اَحْمَدَ وَاَبِىْ دَاؤُدَ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَّوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ -

নিশ্চয় বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিলো এবং আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে।[১১২] একটি দল ব্যতীত সবই দোযখী হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এয়া রসূলাল্লাহ্! সেটা কোন্ দল? তিনি এরশাদ করলেন, ওই দল, যার উপর আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছি।[১১৩] এটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমদ ও ইমাম আবূ দাউদের বর্ণনায় হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে বর্ণিত আছে- বাহাত্তর দল দোযখী ও একটি জান্নাতী এবং সেটা হচ্ছে মুসলমানদের বড় দল।[১১৪]

মুসলমানরাও তো তা করতে লাগলো। তারপর আরেক যুগ আসলো, দাড়ির সাথে গোঁফও সম্পূর্ণ পরিস্কার হয়ে গেছে। তখন মুসলমানরাও সেরূপ হয়ে গেছে। যদি কোন ইংরেজ নাক কেটে ফেলতো, তাহলে অবশ্যই মুসলমানদের মধ্যেও শত শত নাক কেটে যেতো। এটা এ হাদীসেরই বাস্তব রূপ।

১১২. এভাবে যে, বনী ইসরাঈলের ৭২ দলের সবই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ৭২ দল গোমরাহ্ হবে এবং ১টি হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। স্মর্তব্য যে, যেমনিভাবে কিছুসংখ্যক বনী ইসরাঈল নবীগণের শত্রু, তেমনিভাবে মুসলমানদের মধ্যেও কিছু দল 'সায়্যিদুল আম্বিয়া' (নবীকুল সরদার)'র শত্রু। আর যেমনিভাবে কতেক বনী ইসরাঈল নবীগণকে খোদার পুত্র মেনে বসেছে, মুসলমানদের মধ্যেও কিছু মূর্খ ফক্বীর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাদের খোদা কিংবা খোদার অংশ বলে বিশ্বাস করে। মোটকথা, এভাবে এ হাদীসের বাস্তবতা পুরোপুরিভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

১১৩. অর্থাৎ আমি এবং আমার সাহাবীগণ ঈমানের কষ্টিপাথর। যার ঈমান তাঁদের (সাহাবীগণ) মত হবে, সে মু'মিন, অন্যরা বে-দ্বীন। মহান রব এরশাদ করেছেন-

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِاهْتَدَوْا

(অতঃপর তারাও যদি এভাবে ঈমান আনতো, যেমন তোমরা এনেছো, তবে তো তারা হিদায়ত পেয়ে যেতো।[২:১৩৭]) স্মর্তব্য যে, 'مَآ'দ্বারা আক্বীদা ও মৌলিক আমলসমূহ বুঝানো উদ্দেশ্য; বাহ্যিক কার্যাবলী নয়। অর্থাৎ যাদের আক্বাইদ সাহাবীদের মতো হবে এবং যাদের আমলসমূহের মূলভিত্তি সম্মানিত সাহাবীদের যুগে পাওয়া যায়, তারা জান্নাতী; নতুবা বর্তমানে এমন লক্ষ লক্ষ বাহ্যিক আমল রয়েছে, যেগুলো সাহাবা-ই কেরামের যুগে ছিলো না। এগুলো পালনকারী দোযখী নয়। যেমন- সাহাবা-ই কেরাম হানাফী, শাফে'ঈ কিংবা ক্বাদেরী ছিলেন না; আমরা সেভাবে আছি। তাঁরা বোখারী, মুসলিম লিখেন নি। ইসলামী মাদরাসা তৈরী করেন নি, তারা উড়োজাহাজ ও রকেট (মিসাইল) দ্বারা যুদ্ধ করেন নি। আমরা এসব কিছুও করি। সুতরাং এ হাদীস (আমাদের বিরুদ্ধে) ওহাবীদের দলীল হতে পারে না। কেননা, আমরা আক্বাইদে সম্মানিত সাহাবীদের অনুসারী এবং আমাদের যাবতীয় আমলের ভিত্তি তাঁদেরই মধ্যে বিদ্যমান। মোটকথা, ইসলাম বৃক্ষটি নবী করীমের যুগে লাগানো হয়েছে, সাহাবা-ই কেরামের যুগে তা ফুলেফলে সুশোভিত হয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত ফল আসতে থাকবে। তোমরা খেতে থাকো। তবে শর্ত হচ্ছে, ওই গাছেরই ফল হতে হবে।

১১৪. এখানে বলা হয়েছে যে, জান্নাতী হবার জন্য দু'টি জিনিসের প্রয়োজন। সুন্নাতের অনুসরণ এবং মুসলমানদের বড় দলে থাকা। এ জন্যই আমাদের মাযহাবের নাম 'আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত।' জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য 'মুসলমানদের বড় দল', যাতে ফিক্বহ্‌বিশারদগণ, বিজ্ঞ আলিমগণ ও সম্মানিত সূফীগণ এবং আল্লাহ্‌র ওলীগণ রয়েছেন। আলহামদু লিল্লাহ্! এ মর্যাদাও আহলে সুন্নাতই অর্জন করেছে। এ দল ব্যতীত অন্য কোন দলে আল্লাহর ওলী নেই।

স্মর্তব্য যে, এ '৭৩' সংখ্যাটি আক্বীদা-ভিত্তিক মূল দলগুলোর। অর্থাৎ মূল দলগুলোর মধ্যে ১টিই জান্নাতী এবং ৭২টি জাহান্নামী। সুতরাং হানাফী, শাফে'ঈ, মালিকী, হাম্বলী, চিশ্তী, ক্বাদেরী, নক্‌শবন্দী, সোহরাওয়ার্দী, অনুরূপ, 'আশা-'ইরাহ্ এবং মাতুরীদিয়্যাহ্ সবই আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আক্বাইদে সবই অভিন্ন, আর এদের সকলে একটি দলে গণ্য। এভাবে ৭২ দোযখী দলগুলোর অবস্থাও এরূপ যে, ওইগুলোর একেকটি দলের

وَاِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِىْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ تَتَجَارٰى بِهِمْ تِلْكَ الْاَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهٖ لَايَبْقٰى مِنْهُ عِرْقٌ وَّلَامَفْصِلٌ اِلَّا دَخَلَهٗ وَعَنْ اِبْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَايَجْمَعُ اُمَّتِىْ اَوْ قَالَ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ-رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ

আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতগুলো সম্প্রদায় বেরুবে, যাদের মধ্যে বিদ্'আত তেমনিভাবে প্রসার লাভ করবে, যেমন পাগলা কুকুরের বিষ দংশিতের মধ্যে। অর্থাৎ যার কোন রগ ও জোড়ায় বিষ না ছড়িয়ে থাকে না।[১১৫]

১৬৪ || হযরত ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার উম্মতকে অথবা এরশাদ করেছেন, উম্মতে মুহাম্মদ মুস্তফাকে গোমরাহীর উপর একমত হতে দেবেন না।[১১৬] ঐক্যবদ্ধ মুসলিম দলের উপর আল্লাহ্র দয়ার হাত রয়েছে।[১১৭] যে ব্যক্তি এ মুসলিম দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে, সে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দোযখে যাবে।[তিরমিযী]

১৬৫ || তাঁরই (হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- তোমরা বৃহত্তম দলের অনুসরণ করো।[১১৮]

বহু উপদল রয়েছে। যেমন, একটি রাফেযী দলের বহু উপদল রয়েছে- বার ইমামীয়, ছয় ইমামীয়, তিন ইমামীয়। অনুরূপ, অন্যান্য দলগুলোর অবস্থা। সুতরাং হাদীসের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ নেই যে, ইসলামী দল তো কয়েকশ' রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ মিরক্বাত ইত্যাদি কিতাবে দেখুন!

১১৫. অর্থাৎ ভ্রান্ত আক্বীদা এবং বিদ্'আতগুলো তাদের আক্বীদা ও আমলসমূহে ছড়িয়ে পড়বে। স্মর্তব্য যে, হুযূর সাপে দংশন করার সাথে উপমা দেন নি। কেননা, এর বিষ হৃদপিণ্ড কিংবা মগজে পৌঁছানোর সাথে সাথেই মৃত্যু সংঘটিত হয়ে যায়। সেটা অন্য কাউকে দংশন করে না; কিন্তু পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে অনেক দিন জীবিত থাকে, সেও যাকে কামড় দেয় তাকেও নিজের মত বানিয়ে ফেলে, বদমাযহাব লোকদেরও এ-ই অবস্থা।

১১৬. এখানে 'উম্মত' মানে 'উম্মত-ই ইজাবাত' অর্থাৎ হুযূরের প্রতি ঈমান আনয়নকারী লোক। এ হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসের তাফসীরস্বরূপ। অর্থাৎ যদিও আমার উম্মতে বনী ইসরাঈলের চেয়েও অধিক দল হবে, কিন্তু পার্থক্য এ যে, ওইদলগুলোর সবই পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু এ উম্মতের প্রত্যেক দল পথভ্রষ্ট হবে না; বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এদের মধ্যে একটি দল সত্যের উপর থাকবে। এটা এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য। এখানে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের 'ইজমা' (ঐকমত্য) সত্য; যার উপর সমস্ত আলিম, সম্মানিত ওলীগণ একমত হয়ে যান। ওই মাসআলার উপর আমল করা তেমনি আবশ্যক, যেমন ক্বোরআনের আয়াতের উপর আমাল করা আবশ্যক। আলোচ্য হাদীসের সমর্থন এ আয়াতে পাওয়া যায়-

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ

(এবং মুসলমানদের পথ থেকে আলাদা পথে চলে, আমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেবো এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো।[৪:১১৫]) অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথে চলবে, আমি তাকে দোযখে প্রেরণ করবো। ইজমা'-ই উম্মত 'দলীল' হওয়াও এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য। বুঝা গেলো যে, শায়খাঈন তথা সিদ্দীক্ব-ই আকবর ও ফারূক্ব-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার খিলাফত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১১৭. 'দস্তে করম' (দয়ার হাত) মানে সংরক্ষণ, সাহায্য ও রহমত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সংগঠিত মুসলিম দলকে ভুল-ভ্রান্তি ও শত্রুদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করবেন। তাদের উপর প্রশান্তি ইত্যাদি অবতীর্ণ করবেন।

১১৮. অর্থাৎ সর্বদা ওই আক্বীদা পোষণ করবে, যা মুসলমানদের বৃহত্তম দলের হয়। এ হাদীস সরাসরি ক্বোরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত এবং ইজমা' ও ক্বোরআন-

فَاِنَّهٗ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ- رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيْثِ اَنَسٍ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابُنَىَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِىَ وَلَيْسَ فِىْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَىَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِىْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ

কেননা, যে ব্যক্তি তা থেকে পৃথক থাকে সে পৃথকভাবেই দোযখে যাবে।[১১৯]এটি হযরত আনাস'র সূত্রে ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন।। **১৬৬ ||** হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "হে আমার স্নেহের পুত্র! যদি তুমি সকাল ও সন্ধ্যা এভাবে কাটাতে পারো যে, তোমার অন্তরে কারো প্রতি বিদ্বেষ থাকবে না, তাহলে তা করো।"[১২০] তারপর এরশাদ করলেন, "হে আমার স্নেহের পুত্র! এটা আমার সুন্নাত এবং যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসে, সে আমাকেই ভালবাসে।

সুন্নাহ্ ভিত্তিক ক্বিয়াস দ্বারা প্রমাণিত সমস্ত বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে। আয়াত ও হাদীসসমূহের যে অর্থ মুসলমানদের বড় দল (ইমামগণ) বুঝেছেন, সেটাই হক্ব। আজ যদি কেউ নতুন অর্থ বলে তবে তা মিথ্যা। যেমন 'খাতামুন্ নাবীয়্যীন' অর্থ 'আখেরী নবী', সালাত ও যাকাত মানে প্রচলিত নামায ও সাদক্বাহ্। যে ব্যক্তি বলে, 'খাতামুন্ নাবীয়্যীন' অর্থ 'আসল নবী', সালাত ও যাকাত -এর অন্য কোন অর্থ করে তাহলে তা একেবারে ভুল। এভাবে মুসলমানদের বড় দল মীলাদ, ফাতিহা, ওরস ইত্যাদিকে উত্তম আমল বুঝেছেন। বাস্তবিকই এসব কাজ উত্তম। যদি কেউ এগুলোকে হারাম বলে, তবে সে মিথ্যুক।

হাদীস শরীফে আছে মুসলমানগণ যা উত্তম মনে করেন, তা আল্লাহর কাছেও উত্তম। মহান আল্লাহ্ এরশাদ ফরমাচ্ছেন- لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ (যাতে তোমরা লোকদের উপর সাক্ষী হও।২:১৪৩)। হুযূর এরশাদ করেছেন- اَنْتُمْ شُهَدَآءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ (তোমরা যমীনে আল্লাহর সাক্ষী) এসব হাদীস এ মিশকাত শরীফেই আসবে। সুতরাং যে কাজকে সর্বস্তরের আলিমগণ, বুযুর্গানে দ্বীন এবং সাধারণ মুসলমানগণ ভাল মনে করে, তা-ই ভাল। 'বৃহত্তম দল' নির্ণয়ের ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানদের দল হওয়াই বিবেচ্য। কোন নির্দিষ্ট স্থান বা সময় বিবেচনা করে নয়।

সুতরাং যদি কোন বস্তিতে একজন সুন্নী থাকে, বাকী সকলেই বদ-মাযহাবী হয়, তাহলে ওই একজনই 'সাওয়াদ-ই আ'যম' (বৃহত্তম দল) হিসেবে গণ্য। কেননা, সে সাহাবা-ই কেরাম থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের বড় দলের সাথেই রয়েছে।

এটাও স্মর্তব্য যে, ইজতিহাদী মাসআলাগুলোতে বড় দলের কথা বিবেচ্য নয়। একজন মুজতাহিদ মুজতাহিদগণের বৃহত্তম দলের বিপক্ষেও মতামত দিতে পারেন এবং তাঁ অনুসরণ করা বৈধ। এর বিস্তারিত আলোচনা মিরক্বা ইত্যাদি কিতাবে দেখুন।

স্মর্তব্য যে, কোন কোন মন্দকাজেও সাধারণ মুসলমানগ জড়িয়ে পড়ে। যেমন- বর্তমানে দাড়ি মুণ্ডানো; কিন্তু তা সকলেই এটাকে মন্দ মনে করে থাকে এবং গুনাহ্ ম করেই এ কাজে লিপ্ত হয়। সুতরাং এটা বলা যাবে না দাড়ি মুণ্ডানো বড় দলের আমল।

১১৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমানদের বড় দলের বিপরী আক্বীদা পোষণ করলো, তাহলে বড়দল তো জান্নাতে যা এবং এ ব্যক্তি যাবে দোযখে। এ হাদীস ক্বিয়ামত পর্যন্ত ভ আক্বীদা সম্পন্ন দল হতে বেঁচে থাকার বড় মাধ্যম (দলীল যদি মুসলমানগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করে তাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফির্কাগুলো এমনিতেই খতম হয়ে যাবে।

১২০. অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের পক্ষ থেকে পা ব্যাপারে স্বচ্ছ অন্তরবিশিষ্ট হও। হৃদয় যেন বিদ্বেষমুক্ত তবেই তাতে মদীনা মুনাওয়ারার নূর আসবে। অ আয়না এবং মলিন অন্তর যত্ন ও সম্মানের উপযোগী কিন্তু কাফিরদের সাথে শত্রুতা ঈমানের মূল। আল্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

(আপনি পাবেন না ওইসব লোককে, যারা দৃঢ়বিশ্বাস আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর, এমন যে, তারা বন্ধুত্ব ওইসব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূ বিরুদ্ধাচরণ করেছে...।৫৮:২২)

এভাবে, ফাসিক্ব মুসলমানদের মন্দ কাজে অসন্তুষ্ট হও ইবাদত। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ স্পষ্ট।

وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ ـ وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ اَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَّهُوْدَ تُعْجِبُنَا اَفَتَرٰى اَنْ نَّكْتُبَ بَعْضَهَا فَقَالَ اَمُتَهَوِّكُوْنَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَآءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهٗ اِلَّا اتِّبَاعِىْ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ

আর যে আমাকে ভালবাসে, সে বেহেশ্‌তে আমার সাথে থাকবে।[১২১] ।তিরমিযী।

১৬৭ || হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিপর্যয়ের সময় আমার সুন্নাতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে, তার জন্য একশ' শহীদের সাওয়াব রয়েছে।[১২২]

১৬৮ || হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, যখন হুযূরের খেদমতে (সামনে) হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলেন এবং আরয করলেন, "আমরা ইহুদীদের কিছু কথাবার্তা শুনে থাকি, যা আমাদের ভাল লাগে, হুযূর! আপনি কি অনুমতি দেবেন যে, আমরা তা থেকে কিছু লিখে নিই?" হুযূর এরশাদ করলেন, "তোমরা কি ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মত বিভ্রান্ত হচ্ছো?[১২৩] আমি তোমাদের নিকট উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট শরীয়ত নিয়ে এসেছি।[১২৪] আর যদি হযরত মূসাও পার্থিব জীবনে থাকতেন, তাহলে তাঁর জন্যও আমার অনুসরণ করা ব্যতীত কোন উপায় থাকতো না।[১২৫] ।এ হাদীস আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে।

১২১. অর্থাৎ আমালের মধ্যে সুন্নাতের অনুসরণ যেভাবে সাওয়াবের মাধ্যমে, তেমনিভাবে অন্তর পরিষ্কার রাখা, সচ্চরিত্রবান হওয়াও সুন্নাত। যা দ্বারা রসূলুল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হবে। আফসোস! অধিকাংশ মানুষ এতে বিচ্যুত হয়ে যায়। সুন্নাতের অনুসারী হবার দাবী করে, কিন্তু অন্তর হিংসা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। আল্লাহ্ আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত সুন্নাত অনুসারে আমল করার তাওফীক্ব দান করুন।☆

১২২. কেননা, শহীদ তো একবার তরবারির আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পার পেয়ে যান; কিন্তু আল্লাহ্‌র এ বান্দা জীবন ভর মানুষের তিরস্কার ও কটুক্তির আঘাত সহ্য করতে থাকে। আল্লাহ্-রসূলের খাতিরে সবকিছু সহ্য করে। তার জিহাদই হচ্ছে 'জিহাদ-ই আকবার'। যেমন- বর্তমানে দাড়ি রাখা, সুদ থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি।

১২৩. অর্থাৎ ক্বোরআন ও সুন্নাহ্‌কে নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করছো না? যে কারণে অন্যদের কাছে ইলম ও হিদায়ত পাবার জন্য যাচ্ছো! যেমনিভাবে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আপন আপন কিতাব ছেড়ে পাদ্রী ও সন্যাসীদের অনুসরণ শুরু করে দিয়েছে। আলোচ্য হাদীস দ্বীন ও হিদায়াতের ক্ষেত্রে একেবারে স্পষ্ট। যে ব্যক্তিই ইসলামকে পরিপূর্ণ মানে না, সে বে-ঈমান। দুনিয়াবী বিষয়গুলো সব জায়গায় শেখা যায়। এ প্রসঙ্গে এ-ই হাদীস প্রযোজ্য, যাতে এরশাদ হয়েছে "হিকমতপূর্ণ বাক্য মুসলমানদের হারানো দৌলত, তা যেখানেই পাও কুঁড়িয়ে নাও।" সুতরাং হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী নয়। এ থেকে ওই সব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা বে-দ্বীনদের পুস্তিকা এবং বাতিল মতবাদীদের মজলিসে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করে না। ফারূক্ব-ই আ'যমের ন্যায় মু'মিনকে আহলে কিতাবের আলিমদের সংস্পর্শে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

১২৪. যাতে না কোন কিছুর ঘাটতি আছে, না কোন অস্পষ্টতা। তারপরও অন্যদিকে কেন যাচ্ছো?

১২৫. কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত নবী থেকে হুযূরের আনুগত্য ও অনুসরণ করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন- لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ (নিশ্চয় নিশ্চয় তোমরা তার উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে।।৩:৮১।) এরপরও তোমরা তাঁদের উম্মত থেকে

☆যাদের আক্বীদা বাতিল, নবী-ওলীর সাথে যাদের মনোভাব এবং আচরণ বেআদবী ও বিদ্বেষপূর্ণ তাদের হাজারো সুন্নাতের উপর আমল নিষ্ফল। এ কথা এ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত।

وَعَنْ اَبِیْ سَعِيْدِالْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ طَيِّبًاوَّعَمِلَ فِیْ سُنَّةٍ وَاَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا الْيَوْمَ لَكَثِيْرٌ فِی النَّاسِ قَالَ وَسَيَكُوْنَ فِیْ قُرُوْنٍ بَعْدِیْ رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَعَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ فِیْ زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا اُمِرَ بِهٖ هَلَكَ ثُمَّ يَاْتِیْ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا اُمِرَ بِهٖ نَجَا۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ

১৬৯ ॥ হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি পবিত্র ও হালাল খায়, সুন্নাত অনুসারে আমল করে এবং মানুষ তার ফিৎনা থেকে রক্ষা পায়, সে বেহেশ্‌তে যাবে।"[১২৬] এক ব্যক্তি আরয করলো, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আজকাল এমন লোক তো অনেক।" তিনি এরশাদ করলেন, "আমার পরবর্তী সময়েও হবে।"[১২৭][তিরমিযী]

১৭০ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমরা এমন যুগে রয়েছো, যে যুগে কোন ব্যক্তি শরীয়তের বিধানাবলীর এক দশমাংশ ছেড়ে দেবে, অতঃপর সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর ওই যামানা আসবে, যাতে কোন ব্যক্তি বিধানাবলীর এক দশমাংশের উপর আমল করে নাজাত পেয়ে যাবে।"[১২৮][তিরমিযী]

আমার উপস্থিতিতে হিদায়ত নেবার জন্য যাচ্ছো? সূর্য থাকা অবস্থায় বাতির আলো নেওয়া হয় না। আজ মুসলমানগণ নিজেদেরকে ভুলে গেছে। এ কারণে তারা অন্য জাতির স্বভাব ও তথাকথিত বিশ্বস্ততার প্রশংসা করে থাকে। এগুলো আমাদের পকেট থেকে পতিত মুক্তা, যা অন্যরা কুঁড়িয়ে নিয়েছে।

১২৬. এ হাদীস ইবাদত ও পার্থিব কার্যকলাপ পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যাপকার্থক। দু'টি মাত্র শব্দের মধ্যে দু'জাহানের সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

'فِی السُّنَّةِ'-এর মধ্যে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, কোন সুন্নাতকে নগণ্য মনে করবে না, এমনকি বসে পানি পান করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাকেও না। কখনো এক ঢোক্ পানিও জীবন রক্ষা করে।

'اَمِنَ' এরশাদ করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানের চরিত্র এমন পবিত্র হওয়া চাই, যেন অনায়াসে লোকেরা তার পক্ষ থেকে নিরাপদে থাকে। কারণ, সে কাউকে কোন কষ্ট দেয় না।

১২৭. অর্থাৎ আমার কল্যাণের ধারা শুধু এ যুগের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতে এমন পরহেযগার হতে থাকবে, ইন্‌শা- আল্লাহ্। এ উম্মত পুণ্যময় ব্যক্তিশূন্য হবে না। অবশ্য, যতই যুগ দীর্ঘ হবে, ততই এমন লোকের সংখ্যা হ্রাস পাবে। হুযূরের এ ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে সত্য ও বাস্তব। আলহামদু লিল্লাহ্!

১২৮. স্মর্তব্য যে, আলোচ্য হাদীসে 'আহকাম' (বিধানাবলী) মানে দ্বীন প্রচার করা, সুন্নাত ও নফল ইত্যাদির উপর আমল করা; ফরয ও ওয়াজিবসমূহ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

অর্থাৎ যেহেতু বর্তমানে দ্বীন প্রচার ও যে কোন নেক কাজের জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, সেহেতু বর্তমানে কিছু বিধান ছেড়ে দেওয়া নিজেরই ত্রুটি। আখেরী যামানায় প্রতিবন্ধকতা অনেক বেড়ে যাবে। ওই সময় আজকের তুলনায় এক দশমাংশের উপর আমল করাও অতি সাহসিকতার কাজ হবে।

সুতরাং হাদীস সুস্পষ্ট। এর বিপক্ষে এ অভিযোগ করা যাবে না যে, 'তাহলে তো বর্তমানে এক ওয়াক্বত নামায, এক সহস্রাংশ যাকাত এবং রমযানের তিনটি রোযাই যথেষ্ট হওয়া চাই।'

অথবা এ সামঞ্জস্য সামগ্রিক বিধান অনুসারে। সুতরাং (আফসোস!) আজ ইসলামী জিহাদ ও বিচার কার্যের বিধানসমূহ অনুসারে পরিপূর্ণভাবে আমল করা অসম্ভব। আমরা চোরের হাত কাটতে এবং যিনাকারীকে পাথর নিক্ষেপ করতে পারছি না, ইত্যাদি।

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَهُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ اِلَّا اُوْتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ ﴿مَاضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ﴾ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَاتُشَدِّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

১৭১ ॥ হযরত আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কোন সম্প্রদায় হিদায়তের উপর থাকার পর গোমরাহ হয় নি, কিন্তু তাদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন- "ওই সব লোক আপনার জন্য উদাহরণ বর্ণনা করে না, কিন্তু বিবাদ করার জন্য; বরং ওই সম্প্রদায় ঝগড়াটে।"[১২৯] [আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ] **১৭২ ॥** হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "নিজেদের সত্তার উপর কঠোরতা করো না;[১৩০] নতুবা আল্লাহ্ তোমাদের উপর কঠোরতা করবেন।[১৩১] একটি সম্প্রদায় নিজেদের সত্তার উপর কঠোরতা করেছিলো, তখন আল্লাহ্ও তাদের উপর কঠোরতা করেছেন।"[১৩২]

১২৯. অর্থাৎ যেসব লোক সত্য দ্বীন হতে বিচ্যুত হয়ে যায়, সে স্বীয় বাতিল ধর্মের প্রসারের জন্য গোঁড়ামী, শত্রুতা ও ঝগড়া করতে থাকে। কেননা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের সাহায্য হয় না। যেমনটি বর্তমানেও বে-দ্বীনদের কর্মপদ্ধতি থেকে সুস্পষ্ট যে, তারা ক্বোরআন ও হাদীসকে জবরদস্তি নিজেদের ভ্রান্ত মত অনুযায়ী করতে চায়; নিজে ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র অনুগত হতে চায় না।

যে আয়াতটি পেশ করা হয়েছে সেটার শানে নুযূল হচ্ছে- যখন আয়াত শরীফ اِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (হে কাফিরগণ! তোমরা এবং তোমাদের সকল উপাস্য দোযখের ইন্ধন।[২২:৯৮]) নাযিল হলো, তখন কাফিরগণ হুযূরের দরবারে আরয করলো, "তাহলে কি হযরত ঈসা এবং হযরত 'ওযায়র আলাহিমাস্ সালামও সেরূপ দোযখী হবেন? (না'উযু বিল্লাহ) কেননা, কিতাবীগণ তাদেরও পূজা করেছিলো।" তখন এ আয়াতে শরীফ অবতীর্ণ হলো। আর তখনই হুযূর সেটা এরশাদ করেছেন। অর্থাৎ এ কাফিররা জানে যে, مَا শব্দটি জড় পদার্থের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ওই সম্মানিত নবীগণ কিভাবে এর অন্তর্ভুক্ত হবেন? কিন্তু এরপরও কুতর্ক করে নিজেরাই জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বর্তমানে এদের বহু উদাহরণ দেখা যাচ্ছে।

১৩০. অর্থাৎ নিজেদের উপর বাধ্যতামূলক নয় এমন ইবাদত অপরিহার্য করে নিও না। যেমন- সব সময় রোযা রাখা বা সারারাত জেগে থাকা। আর শরীয়ত সম্মত হালাল জিনিসকে হারাম করে নিও না, যেমন- বিয়ে করা ও সুস্বাদু নি'মাতসমূহ থেকে বিরত থাকা। হালাল থেকে বাঁচার নাম 'তাক্বওয়া' নয়, হারাম থেকে বেঁচে থাকার নামই তাক্বওয়া বা পরহেযগারী। কিছু লোক গোশ্‌ত খায় না, কিন্তু গীবত করা ত্যাগ করে না।

১৩১. যেমন কেউ সারা জীবন রোযা ও রাত্রি জাগরণের মান্নত করে নিলো। এখন দু'টিই মান্নতের কারণে অপরিহার্য হয়ে গেলো। পালন না করলে গুনাহ্‌গার হবে। এমন মান্নত থেকে বেঁচে থাকবে। সুতরাং হাদীস সুস্পষ্ট। এর অর্থ এ নয় যে, "হুযূরের পরে কোন নবীর আগমন ঘটবে, যার মাধ্যমে ওই কঠোরতাগুলো ফরয হয়ে যাবে। (বরং এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র জীবদ্দশারই ঘটনা, তখনতো ফরয হবার অবকাশ ছিলো।)

১৩২. যেমন বনী ইসরাঈলকে এক ঘটনায় গাভী যবেহ করার আদেশ দেন। তারা যেকোন ধরনের গাভী যবেহ করলে যথেষ্ট হতো। কিন্তু তারা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র নিকট জিজ্ঞেস করতেই লাগলো যে, সেটার রঙ কিরূপ, বয়স কতো ইত্যাদি ইত্যাদি। (তারপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) এগুলোর উত্তর আসতে লাগলো। কঠোরতাও বৃদ্ধি পেলো। অথবা যেভাবে খ্রিষ্টান পাদ্রীরা নিজেদের জন্য বৈরাগ্যকে এবাদত বানিয়ে নিয়েছে। অতঃপর তারা তা পালন করতে পারে নি; বরং হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে গেলো।

فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ رَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى خَمْسَةِ اَوْجُهٍ حَلَالٍ وَّحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ وَّمُتَشَابِهٍ وَّاَمْثَالٍ فَاَحِلُّوا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَاٰمِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْاَمْثَالِ هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَلَفْظُهٗ فَاعْمَلُوْا بِالْحَلَالِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ

অতঃপর গীর্জা ও উপাসনালয়গুলোতে তাদের অবশিষ্ট লোকেরা রইলো। তারা নিজেরাই দুনিয়া ত্যাগ করার নিয়ম উদ্ভাবন করলো। আমি তাদের উপর তা অপরিহার্য করি নি।[১৩৩] [আবূ দাঊদ]

১৭৩ || **হযরত** আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,"ক্বোরআন পাঁচ প্রকারের আয়াতসহ অবতীর্ণ হয়েছে-[১৩৪] হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশা-বিহ ও আমসাল (যথাক্রমে- বৈধ, অবৈধ, স্পষ্ট অর্থবোধক, দ্ব্যর্থবোধক ও উপমাদি বা ঘটনাবলী)।[১৩৫] সুতরাং হালালকে হালাল জানবে এবং হারামকে হারাম মানবে, মুহকাম অনুসারে আমল করবে এবং মুতাশাবিহের উপর ঈমান রাখবে।[১৩৬] আর উপমাদি থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।"[১৩৭] এ বচন 'মাসাবীহ'র। ইমাম বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে এভাবে বর্ণনা করেছেন- "হালালের উপর আমল করো, হারাম হতে বেঁচে থাকো এবং মুহকামের অনুসরণ করো।"

---

১৩৩. অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের উপর 'পাদ্রী' কিংবা নান (সন্যাসী) হওয়া খোদায়ী বিধান ছিলো না। তারা নিজেরা আবেগপ্রবণ হয়ে তা উদ্ভাবন করেছিলো। এভাবে যে সব মহিলা বিবি-মারয়ামের নামে কুমারীরূপে এবং পুরুষরা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম'র নামে কুমাররূপে গীর্জায় থাকতে লাগলো। অতঃপর এসব কুমার ও কুমারী একত্রে থাকার ফলশ্রুতিতো সুস্পষ্ট! দেখুন- 'আযবালা' কিতাব। এ আয়াত ও হাদীস দ্বারা ইঙ্গিতে বুঝা গেলো যে, বিদ'আতে হাসানাহ্ উদ্ভাবন করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ওই পাদ্রীদের সম্পর্কে, যারা তাদের এ অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলো, সাওয়াবের ওয়াদা করেছেন। যেমন এরশাদ করলেন-
فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○
(সুতরাং তাদের মধ্যকার ঈমানদারদেরকে আমি তাদের পুরস্কার দান করেছি এবং তাদের মধ্যে অনেকে ফাসিক্ব।[৫৭:২৭])

১৩৪. সংক্ষিপ্তভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ (পবিত্র বস্তুগুলো তাদের জন্য হালাল করবেন) অথবা وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ (আর অপবিত্র বস্তুসমূহ তাদের উপর হারাম করবেন।)[৭:১৫৭]
এ আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে সমস্ত হালাল ও হারামের বর্ণনা এসে গেছে।

১৩৫. 'মুহকাম'-এর পারিভাষিক অর্থ হলো 'নুস্খ' বা রহিত করণের অনুপযোগী আয়াত; কিন্তু এখানে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াতগুলো বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা, সেটার বিপরীতে 'মুতাশ-বিহ্' এরশাদ করা হয়েছে। 'মুতাশা-বিহ্' হচ্ছে ওইসব আয়াত, যেগুলোর অর্থ কিংবা মাহাত্ম্য বুঝে আসে না। 'আমসাল' দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মতদের কাহিনী কিংবা উপমাদি বুঝানো উদ্দেশ্য।

১৩৬. অর্থাৎ 'মুতাশা-বিহ্'র মধ্যে যে মর্মার্থ নিহিত তা সত্য বলে বিশ্বাস করা, যদিও সে সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

১৩৭. অর্থাৎ যে সব কারণে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর উপর আযাব এসেছে, সেগুলো তোমরা পরিহার করো। এ থেকে 'ক্বিয়াস-ই শার'ঈ' (শরীয়তের দলীল ভিত্তিক ক্বিয়াস)'র পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَمْرُ ثَلٰثَةٌ اَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهٗ فَاتَّبِعْهُ وَاَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهٗ فَاجْتَنِبْهُ وَاَمْرٌ اُخْتُلِفَ فِيْهِ فَكِلْهُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ - رَوَاهُ اَحْمَدُ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ

১৭৪ || হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তিন প্রকারের বিষয় রয়েছে: (এক) ওই বিষয়, যা হিদায়ত হওয়া প্রকাশ্য। সুতরাং সেটার অনুসরণ করো। (দুই) যা গোমরাহী হওয়া সুস্পষ্ট, তা থেকে বেঁচে থাকো এবং (তিন) যা বিরোধপূর্ণ। সুতরাং সেটাকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দাও।[১৩৮] [আহমদ]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ◆ ১৭৫ || হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "শয়তান মানুষের নেকড়ে মেষ-ছাগলের নেকড়ের মত, যে পাল থেকে পৃথক, দূরবর্তী ও একপ্রান্তে অবস্থানকারী ছাগলকে ধরে নিয়ে যায়।[১৩৯] তোমরা দু'পর্বতের মধ্যবর্তী সরু গিরিপথ থেকে বেঁচে থাকো।[১৪০] তোমরা মুসলমানদের দল এবং সর্বসাধারণের পথ অবলম্বন করো।[১৪১] [আহমদ]

১৩৮. আহকাম-ই শর'ইয়্যাহ' তথা শরীয়তের বিধানাবলী তিন প্রকার: কতগুলো নিশ্চিতরূপে উত্তম। যেমন- রোযা, নামায ইত্যাদি। কতগুলো নিশ্চিতভাবে মন্দ। যেমন- কিতাবীদের মেলা ইত্যাদিতে যাওয়া, তাদের সাথে মেলামেশা করা। আর কতগুলো হচ্ছে, যেগুলো এক দৃষ্টিভঙ্গীতে উত্তম বলে মনে হয় এবং অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে মন্দ। উদাহরণস্বরূপ, ওই সব জিনিস, যেগুলোর হালাল ও হারাম হবার পক্ষে দলীলাদি বিদ্যমান। যেমন- গাধার উচ্ছিষ্ট পানি, যাকে শরীয়তে 'মাশকূক' বা সন্দেহযুক্ত বলা হয়। অথবা যেমন- ক্বিয়ামতের দিন নির্ণয় করা এবং কাফিরদের মৃত শিশুসন্তান সম্পর্কে বিধান ইত্যাদি। এটাই উচিত যে, হালালের উপর নির্দ্বিধায় আমল করা, হারাম থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকা এবং সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা। এ হাদীসের অর্থ এ নয় যে, 'একটি হালাল জিনিসকে কেউ নিজের মতানুসারে হারাম বলে দেবে, ফলে ওই জিনিসটি সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।' সকল মুসলমান মীলাদ ও ওরস ইত্যাদিকে হালাল মনে করে, আর এক ব্যক্তি সেটাকে হারাম মনে করে;' এতে ওই বস্তু বা আমলগুলো সন্দেহযুক্ত হবে না; বরং দলীল ছাড়া যে ব্যক্তি হারাম বলবে তার উক্তিই প্রত্যাখ্যাত হবে।

১৩৯. 'শা-য্যাহ' (شَاذَّةٌ) হচ্ছে ওই ছাগল, যা স্বজাতীয় ছাগলগুলোর প্রতি অনীহা প্রকাশ করে পাল থেকে দূরে থাকে। 'ক্বা-সিয়্যাহ' (قَاصِيَةٌ) হচ্ছে ওই ছাগল, যা স্বজাতীয়দেরকে ঘৃণা তো করে না, কিন্তু চরার জন্য পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 'না-হিয়াহ' (نَاحِيَةٌ) হচ্ছে ওই ছাগল, যা পাল থেকে আলাদা তো হয় না, কিন্তু পালের প্রান্তভাগে চলে।

উপমার সারকথা এ যে, দুনিয়া হচ্ছে এক মরুভূমি স্বরূপ, যেখানে আমরা মেষ-ছাগলের মতো। আর শয়তান যেন নেকড়ে বাঘ, যে সর্বদা আমাদেরকে শিকার করার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলমানদের বড় দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, সে শয়তানের শিকার হয়ে গেলো।

১৪০. شِعَابٌ শব্দটি شُعْبَةٌ'র বহুবচন। দুই পাহাড়ের মধ্যেবর্তী সরু রাস্তাকে শু'বাহ্ বলে; যেখানে কীট-পতঙ্গ, ডাকাত দল ও চোর, বরং জিনদেরও ভয় থাকে। এখানে মুসলমানদের ওই দল বুঝানো উদ্দেশ্য, যারা আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের বিরোধী।

১৪১. অর্থাৎ ওই সব আক্বীদা গ্রহণ করো, যেগুলো সাধারণভাবে সকল মুসলমানের আক্বীদা; অর্থাৎ যে দলে আল্লাহর ওলীগণও আছেন। ছোটখাটো দলগুলো থেকে পৃথক থাকো। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে- পূর্ববর্তী হাদীস। অর্থাৎ বড় দলের অনুসরণ করো। আর ওই হাদীসও, যাতে এরশাদ

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَعَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ ـ رَوَاهُ فِى الْمُوَطَّا

১৭৬ ॥ হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হলো, সে ইসলামের রজ্জুকে স্বীয় ঘাড় হতে খুলে ফেললো।[১৪২] [আহমদ, আবূ দাঊদ]

১৭৭ ॥ হযরত মালিক ইবনে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণিত,[১৪৩] **তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি তোমাদের কাছে এমন দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেগুলো শক্ত হাতে ধরবে, গোমরাহ্ হবে না- আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাত।**[১৪৪] **তিনি হাদীসখানা মুআত্তা কিতাবে বর্ণনা করেছেন।**

করা হয়েছে, 'মুসলমানগণ যা উত্তম মনে করে তা আল্লাহ্র কাছেও উত্তম'; আলহামদু লিল্লাহ্। সর্বদা আহলে সুন্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো এবং আছে। সাধারণ মুসলমানগণ 'মুক্বাল্লিদ' (কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী), বুযর্গদের প্রতি আস্থাশীল, মীলাদ শরীফ ও ফাতিহাকে ভাল বলে বিশ্বাস করে। তারা ব্যতীত সকল দল মিলে আহলে সুন্নাতের অর্ধেকও হবে না। সুতরাং আহলে সুন্নাতই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, সে শয়তানের শিকার হবে। এর ব্যাখ্যা ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্য আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের আক্বীদা থেকে বিচ্ছিন্ন হলো অথবা কোন আক্বীদার ছোটখাট ব্যাপারেও তাঁদের বিরোধী হলো, তাহলে ভবিষ্যতে সে মুসলমান থাকবে কিনা তাও আশঙ্কাজনক। ওই ছাগলই রক্ষিত থাকে, যা খুঁটির সাথে আবদ্ধ থাকে। মালিকের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া ছাগলের জন্য ধ্বংসের কারণ। মুসলমানদের জামা'আত হচ্ছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র রজ্জু, যাতে সকল সুন্নী আবদ্ধ। এটা মনে করো না যে, শুধু ফরযের অস্বীকারই বিপজ্জনক; কখনো কখনো মুস্তাহাবকে অস্বীকার করাও ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শুধু উটের গোশ্ত থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন, তখনই মহান রব এরশাদ করলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

অর্থাৎ: হে মুসলমানগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করো আর শয়তানের কুপ্ররোচণার অনুসরণ করো না। [২:২০৮]

১৪৩. হাদীস বিশারদগণের মতে, 'মুরসাল' হচ্ছে ওই হাদীস, যার সূত্র বর্ণনায় সাহাবীর উল্লেখ থাকে না। তাবে'ঈ বলেছেন, "হুযূর এরশাদ করেছেন।" কিন্তু ফক্বীহ্গণের মতে ওই হাদীসও 'মুরসাল', যাতে তাবে'ঈ এবং সাহাবী উভয়ের উল্লেখ থাকে না। তাব'ই তাবি'ঈ বলেছেন, "হুযূর এরশাদ করেছেন।" এখানে ফিক্বহ্ শাস্ত্রবিদদের পরিভাষার 'মুরসাল' বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা, ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাবে'ঈ নন, তাব'ই তাবে'ঈ। তিনি বলেছেন, "হুযূর এটা এরশাদ করেছেন।"

১৪৪. 'কিতাবুল্লাহ্' দ্বারা ক্বোরআন-ই করীমের ওই সব আয়াত বুঝানো উদ্দেশ্য, যেগুলো রহিত হয় নি। 'সুন্নাত' দ্বারা ওই সব হাদীস বুঝানো উদ্দেশ্য, যেগুলো উম্মতের জন্য আমল করার উপযোগী। 'মানসূখ' আয়াত ও হাদীসসমূহ এবং তেমনিভাবে হুযূরের বৈশিষ্ট্যাবলী অনুসারে আমল করা অসম্ভব। এ হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা গেলো যে, দ্বীনের 'মূলভিত্তি' (اَصْلُ الْاُصُوْلِ) হচ্ছে ক্বোরআন ও সুন্নাহ্। যেহেতু হুযূরের যুগে 'ইজমা' অসম্ভব ছিলো, আর মুজতাহিদগণের ক্বিয়াস' ক্বোরআন ও সুন্নাহ্র সাথে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ যদি আয়াতের উপর ক্বিয়াস করা হয়, তাহলে ওই ক্বিয়াস ক্বোরআনের সাথে সম্পৃক্ত, আর যদি সুন্নাহ্র উপর হয়, তাহলে সুন্নাহ্র সাথে সম্পৃক্ত। এ জন্য ওই দু'টি (ইজমা' ও ক্বিয়াস) এখানে উল্লেখ করা হয় নি। তাছাড়া, ইমামদের অনুসরণ (তাক্বলীদ) হচ্ছে কিতাব ও

وَعَنْ غُضَيْفِ ابْنِ الْحَارِثِ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ -رَوَاهُ اَحْمَدُ وَعَنْ حَسَّانَ قَالَ

১৭৮ ‖ হযরত গুদ্বায়ফ ইবনে হারিস সুমালী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[১৪৫] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন সম্প্রদায় বিদ্'আত উদ্ভাবন করে না, কিন্তু অনুরূপ সুন্নাত উঠিয়ে নেওয়া হয়।[১৪৬] সুতরাং সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা বিদ্'আত উদ্ভাবন করা থেকে উত্তম।[১৪৭] [আহমদ]

১৭৯ ‖ হযরত হাস্‌সান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[১৪৮] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

সুন্নাহকে সঠিক অর্থে বুঝার জন্য; সেগুলো ছেড়ে দেবার জন্য নয়। সুতরাং এ হাদীস মাযহাব অমান্যকারীদের দলীল হতে পারে না। যখন ওই সব লোক, হাদীস বুঝার জন্য 'ইল্‌ম-ই সরফ', নাহভ, অভিধান ও আরবী সাহিত্যের সাহায্য নিয়ে থাকে, তখন আমরাও যদি ক্বোরআন-হাদীস বুঝার জন্য ফিক্বহর সাহায্য নিই, তাহলে ক্ষতি কি? এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমার কিতাব 'জা-আল্ হক্ব' : ১ম খণ্ড দেখুন।

১৪৫. তাঁর সাহাবী হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে হাব্বান 'কিতাবুস্ সিক্বাত' গ্রন্থে বলেছেন, হযরত গুদ্বায়ব বলেছেন, "আমি হুযূরের যুগে জন্মগ্রহণ করেছি এবং বাল্যকালেই তাঁর সাথে করমর্দন ও বায়'আত গ্রহণ করেছি।" যদি এ বর্ণনা সহীহ হয়, তাহলে তিনি সাহাবী। 'সুমালা' 'বনী আযদ' গোত্রের একটি শাখা, যার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো, এ জন্যই তাঁকে সুমালী বলা হতো।

১৪৬. এ হাদীস ওই সব হাদীসের ব্যাখ্যা, যেগুলোতে বিদ্'আতের কুফলের বর্ণনা এসেছে। অর্থাৎ মন্দ বিদ্'আত হচ্ছে ওই আমল, যা সুন্নাতের বিপরীত উদ্ভাবন করা হয়, যে অনুসারে আমল করলে, সুন্নাত ছুটে যায়। যেমন- আরবীতে নামাযের খোতবা ও আযান দেওয়া। এখন এগুলো (বাংলায় কিংবা) উর্দূতে সম্পন্ন করলে তা এ সুন্নাতকে বিদায় করে দেবে। কারণ, উর্দূতে আযান সম্পন্নকারী আরবীতে দিতে পারছে না। অনুরূপ, মাথা ঢেকে পায়খানায় যাওয়া সুন্নাত। খালি মাথায় পায়খানায় গমনকারী এই সুন্নাতের উপর আমল করতে পারে। প্রতিটি মন্দ বিদ্'আতের এ-ই অবস্থা। ছোট বিদ্'আত ছোট সুন্নাতকে বিলুপ্ত করে ফেলে এবং বড় বিদ্'আত বড় সুন্নাতকে। 'مِثْلُهَا' দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য। 'বিদ্'আত-ই হাসানাহ্' (উত্তম বিদ্'আত) কোন সুন্নাতকে বিলুপ্ত করে না; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা সুন্নাতের প্রসার করে। দেখুন- ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া সুন্নাত। সুতরাং এর জন্য কিতাবাদি ছাপানো, মাদরাসা তৈরি করা, সেখানে পাঠদানের পাঠ্যতালিকা ও কোর্স চালু করা, যদিও বিদ্'আত বা নব উদ্ভাবিত, কিন্তু এগুলো সুন্নাতের সহায়ক; পরিপন্থী নয়। বুযুর্গ লোকদের স্মৃতিস্মারক প্রতিষ্ঠা করা সুন্নাত। সুতরাং সে জন্য মীলাদ শরীফের মাহফিল, ওরসের অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্বায়েম করা এর সহায়ক; পরিপন্থী নয়। এ স্থানে 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, 'বিদ্'আত-ই হাসানাহ' সুন্নাতের সাথে সংশ্লিষ্ট।

১৪৭. এখানে خَيْرٌ (কল্যাণ), شَرٌّ (মন্দ)-এর মোকাবেলায় এসেছে। অর্থাৎ মন্দ বিদ্'আতগুলো উদ্ভাবন করা মন্দ এবং এর বিপরীতে সুন্নাত অনুসারে আমল করা উত্তম। কেননা, সুন্নাতের মধ্যে 'নূর' রয়েছে এবং মন্দ বিদ্'আতে অন্ধকার রয়েছে। এ অর্থ নয় যে, 'মন্দ বিদ্'আতগুলোও ঠিক; কিন্তু সুন্নাতসমূহ উত্তম।'

১৪৮. তাঁর নাম মুবারক হাস্‌সান ইবনে সাবিত, উপনাম 'আবুল ওয়ালীদ'। তিনি আনসারী, খাযরাজ গোত্রীয়। তিনি আরব কবিদের শিরমণি। হুযূরের প্রিয় কবি এবং হুযূর মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশংসাযুক্ত কবিতা আবৃত্তিকারী। তাঁর জন্য হুযূর স্বীয় মসজিদে মিম্বর শরীফ স্থাপন করতেন, যার উপর দাঁড়িয়ে হুযূরের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি হুযূরের প্রশংসামূলক ক্বসীদা আবৃত্তি করতেন। তিনি একশ' বিশ বছর বয়স পান। ৪০ হিজরীর কিছু পূর্বে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র খেলাফতকালে ওফাত পান। (ইমাম ইবনে আবদুল বার মালিকী তাঁর ওফাতের সন তিনটি উল্লেখ করেছেন: উল্লিখিত সন, ৫০ হিজরী ও ৫৪ হিজরী।[আল্ ইস্তী'আব]) ইনশা- আল্লাহ্! ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত না'ত পরিবেশনকারী হযরত হাস্‌সান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র পতাকাতলে থাকবেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ

مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِىْ دِيْنِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَايُعِيْدُهَا اِلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ - رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مُرْسَلًا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللّٰهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيْهِ

কোন সম্প্রদায় স্বীয় দ্বীনে বিদ্‌'আত উদ্ভাবন করে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছ থেকে অনুরূপ সুন্নাত উঠিয়ে নেন।[১৪৯] তারপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেটা তাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেন না।[১৫০] [দারেমী]

১৮০ ॥ হযরত ইব্রাহীম ইবনে মায়সারাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[১৫১] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মন্দ বিদ্‌'আতের উদ্ভাবক বা অনুসারীকে সম্মান করলো, নিশ্চয় সে ইসলামকে ধ্বংস করতে সাহায্য করলো।[১৫২]

[এ হাদীস ইমাম বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমান'-এ 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

১৮১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ক্বোরআন শিখেছে[১৫৩] তারপর সেটার অনুসরণ করেছে,[১৫৪]

بِاِمَامِهِمْ (যে দিন আমি প্রত্যেক দলকে আহ্বান করবো তাদের ইমাম সহকারে।[১৭:৭১])।

১৪৯. এর ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। 'দ্বীন'র শর্তারোপ করা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'বিদ্‌'আত-ই সায়্যিআহ' (মন্দ বিদ্‌'আত) সর্বদা দ্বীনের মধ্যেই উদ্ভাবিত হবে। দুনিয়াবী আবিস্কারগুলোকে 'বিদ্‌'আত-ই সায়্যিআহ' বলা যাবে না। বিদ্‌'আতের যত কুফল বর্ণিত হয়েছে, সবই ওই বিদ্‌'আত সম্পর্কে করা হয়েছে, যা দ্বীনের মধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং যা সুন্নাতকে বিলুপ্ত করে দেয়। আর যদি 'দ্বীন' দ্বারা আক্বাইদ বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, যেমন-বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়, তাহলে হাদীসের অর্থও সুস্পষ্ট।

১৫০. অর্থাৎ মন্দ বিদ্‌'আত যে সম্প্রদায়ের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তনের তাওফীক্ব বা সামর্থ্য তাদের অর্জিত হয় না। সুন্নাত হচ্ছে বৃক্ষস্বরূপ এবং ওই সব বিদ্‌'আত হচ্ছে সেটার জন্য কোদালস্বরূপ। যখন বৃক্ষকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলা হয়, তখন সেগুলো আর তাতে সংযুক্ত হয় না।

১৫১. তিনি তাবে'ঈ এবং তায়েফ শরীফের অধিবাসী। তিনি মুত্তাক্বী ও পরহেযগার ছিলেন। সুতরাং এ হাদীস 'মুরসাল' হলো। কেননা, এতে সাহাবীর উল্লেখ নেই।

১৫২. এখানে 'বিদ্‌'আত' মানে 'দ্বীনী বিদ্‌'আত', 'বিদ্‌'আতের উদ্ভাবক' বা বিদ্‌'আতের অনুসারী' মানে 'বে-দ্বীন ব্যক্তি' এবং 'সম্মান করা' মানে তাকে বিনা প্রয়োজনে 'সম্মান করা'। প্রয়োজন হলে তখন তা ক্ষমাযোগ্য। অর্থাৎ 'বে-দ্বীনদের সম্মান করা' মানে 'ইসলামকে ধ্বংস করা'। কেননা, আমাদের সম্মান করার মাধ্যমে সর্বসাধারণের মনে তাদের প্রতি ভক্তি সৃষ্টি হবে। এতে তারা তাদের শিকারে পরিণত হবে। মুসলমানদেরকে সম্মান করা যেমন সাওয়াবের কাজ, বে-দ্বীনদের অপমান করাও তেমনি সাওয়াবের কাজ। কেননা, সে ঈমানের দুশমন। 'বাবুল ক্বদর' (তাক্বদীরের বিবরণ শীর্ষক অধ্যায়)-এ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক ক্বদরিয়া মতবাদে বিশ্বাসী লোকের সালামের উত্তর দেননি। ওই আমলই এই হাদীসের ব্যাখ্যা।

১৫৩. অর্থাৎ ক্বোরআন পড়া শিখেছে অথবা ক্বোরআন হিফয করেছে কিংবা সেটার বিধানাবলী শিখেছে কিংবা ইলমে তাজবীদ শিখেছে। এ (تَعَلَّم) শব্দটি সব ধরনের ক্বোরআনী ইল্মকে অন্তর্ভুক্ত করে।

স্মর্তব্য যে, ফিক্বহ, উসূল-ই ফিক্বহ এবং হাদীস শিক্ষা করাও পরোক্ষভাবে ক্বোরআন শিক্ষা করারই নামান্তর। ইনশা- আল্লাহ্ এ জন্যও সাওয়াব রয়েছে।

১৫৪. অর্থাৎ ক্বোরআনের বিধানাবলী অনুসারে হাদীস ও ফিক্বহ'র আলোকে যথাযথভাবে আমল করেছেন। সুতরাং এ থেকে চাকড়ালভী (আহলে ক্বোরআন) সম্প্রদায় দলীল গ্রহণ করতে পারবে না।

هَدَاهُ اللّٰهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ سُوْءَ الْحِسَابِ - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مَنِ اقْتَدٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ لَايَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَايَشْقٰى فِي الْاٰخِرَةِ ثُمَّ تَلَاهٰذِهِ الْاٰيَةَ ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَايَضِلُّ وَلَايَشْقٰى﴾ - رَوَاهُ رَزِيْن وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا وَّعَنْ جَنْبَتِي الصِّرَاطِ سُوْرَانِ فِيْهِمَا اَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْاَبْوَابِ سُتُوْرٌ مُّرْخَاةٌ وَّعِنْدَ رَاْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُوْلُ اِسْتَقِيْمُوْا عَلَى الصِّرَاطِ وَلَاتَعْوَجُّوْا وَفَوْقَ ذٰلِكَ دَاعٍ يَدْعُوْا كُلَّمَا هَمَّ عَبْدٌ اَنْ يَّفْتَحَ شَيْئًا مِّنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لَاتَفْتَحْهُ فَاِنَّكَ اِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ

আল্লাহ্ তাকে দুনিয়ায় পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন এবং ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখবেন।[১৫৫] অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্বোরআনের অনুসরণ করবে, সে দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট এবং আখিরাতে হতভাগা হবে না। তারপর তিনি এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করলেন- 'যে ব্যক্তি আমার হিদায়তের অনুসরণ করবে, সে না গোমরাহ্ হবে, না হতভাগা।'[১৫৬] [রযীন]

১৮২ || হযরত ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ সরল পথের উপমা দিয়েছেন[১৫৭] এবং এ পথের দু'ধারের দু'টি দেয়াল রয়েছে, যেগুলোয় রয়েছে বহু খোলা দরজা। দরজাগুলোতে পর্দা ঝুলন্ত রয়েছে। পথটির মাথায় আহ্বানকারী এ বলে আহ্বান করছে- 'এ পথে সোজা চলে যাও, বাঁকা যেও না।' এর উপর একজন আহ্বানকারীও রয়েছে, যে আহ্বান করছে, যখন কোন বান্দা ওই দরজাগুলো থেকে কোন একটি খুলতে চায়, তখন আহ্বানকারী বলে, "হায়, আফসোস্! সেটা খোলো না, যদি খোলো, তবে তাতে ঢুকে পড়বে।"[১৫৮]

১৫৫. বুঝা গেলো যে, ওলামা-ই দ্বীন এবং ক্বোরআনের খাদিমদের দুনিয়াও কামিয়াব, আখিরাতও কামিয়াব। কিন্তু তাঁরা হচ্ছেন ওইসব লোক, যাঁরা সঠিকভাবে ক্বোরআন বুঝেন এবং সঠিকভাবে তদনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য লাভ করেন। চাকড়ালভীর মত নিছক যুক্তির নিরীখে যারা ক্বোরআন বুঝে, তারা পথভ্রষ্ট হবে। মহান রব এরশাদ করেন, يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا (তিনি তা দ্বারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেন এবং অনেককে হিদায়ত করেন।[২:২৬])।

১৫৬. স্মর্তব্য যে, এ হাদীসের ভিত্তিতে আমরা আল্লাহ্‌র রসূলের সুন্নাতের অমুখাপেক্ষী হতে পারি না এবং শুধু ক্বোরআনের উপর ক্ষান্ত থাকতে পারি না। অনুরূপ, পূর্ববর্তী হিদায়তের উপর ভিত্তি করে, যাতে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র বর্ণনা রয়েছে, আমরা ফিক্‌হ ও মুজতাহিদগণের ক্বিয়াসের অমুখাপেক্ষী হতে পারি না। এ থেকে আহলে হাদীসদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

১৫৭. এটি 'হাদীস-ই কুদ্সী'। কেননা, এ বিষয়বস্তু ক্বোরআন শরীফে আসে নি। হুযূরের নিকট এর ওহী হয়েছে, যা হুযূর মহান রবের দিকে সম্পৃক্ত করে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এটাকে 'হাদীস-ই কুদ্সী' বলা হয়। 'সরলপথ' দ্বারা নুবূয়তের পথ বুঝানো উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারে। এখন সেটা হলো ক্বোরআনী পথ। কারণ, কেউ এখন হযরত মূসা কিংবা হযরত ঈসা আলায়হিমাস্ সালাম'র দ্বীনের উপর র'য়ে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। পুরাতন পঞ্জিকা বিভ্রান্ত করে।

১৫৮. সুবহানাল্লাহ্! কত হৃদয়গ্রাহী উপমা! যার সারকথা হলো, সত্য ও মিথ্যা, নকল ও আসল পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বিরাট ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ডেইরি ফার্মের দুধ এবং খাঁটি দুধ উভয়ই সাদা, বিলাতী এবং দেশী সোনা দু'টিই সোনালী

ثُمَّ فَسَّرَهُ فَاَخْبَرَاَنَّ الصِّرَاطَ هُوَالْاِسْلَامُ وَاَنَّ الْاَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللّٰهِ وَاَنَّ السُّتُوْرَ الْمُرْخَاةَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَاَنَّ الدَّاعِىَ عَلٰى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْاٰنُ وَ اِنَّ الدَّاعِىَ مِنْ فَوْقِهٖ هُوَوَاعِظُ اللّٰهِ فِىْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ- رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ النَّوَاسِ اِبْنِ سَمْعَانَ وَ كَذَا التِّرْمِذِىُّ عَنْهُ اِلَّا اَنَّهٗ ذَكَرَاَخْصَرَمِنْهُ وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَنًّافَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتَ

অতঃপর এর ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন- 'পথ' হচ্ছে ইসলাম,[১৫৯] 'খোলা দরজা' হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বিষয়াবলী,[১৬০] 'ঝুলন্ত পর্দাগুলো' হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা।[১৬১] আর 'পথের মাথায় আহ্বানকারী' হচ্ছে ক্বোরআন এবং 'এর উপর আহ্বানকারী' হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওয়া'ইয বা নসীহতকারী, যা প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে বিদ্যমান।[১৬২] এ হাদীস রাযীন বর্ণনা করেছেন। আর আহমদ এবং বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমান'-এ হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন হতে বর্ণনা করেছেন। এভাবে ইমাম তিরমিযীও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তিরমিযী কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেছেন।

১৮৩ || হযরত ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,[১৬৩] যে ব্যক্তি সরল পথের সন্ধান করে, সে যেন ওফাতপ্রাপ্ত বুযুর্গদের পথ অনুসরণ করে।[১৬৪]

রঙের। আসল ও নকল ঘি উভয়ই এক রকম। কিন্তু আল্লাহ্ এগুলোতে পার্থক্য করার জন্য পরশপাথর এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিও সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

অনুরূপ, এখানে নকল নবীও আছে, নকল ধর্মও আছে, নকল কিতাবও আছে, নকল মৌলভীও আছে। এমনকি নকল খোদাও বানিয়ে নিয়েছে। কেননা, দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষাক্ষেত্র। সেগুলোতে পার্থক্য করার জন্য আল্লাহ্ ওইসব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেগুলোর আলোচনা পরবর্তীতে করা হচ্ছে।

১৫৯. কারণ, এটা ব্যতীত আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানো অসম্ভব। আল্লাহ্ এরশাদ করেন- وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ (আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম চাইবে, তা তার থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে না।।৩:৮৫।)

১৬০. যেগুলোকে আল্লাহ্ গুনাহ্ (অপরাধ) বলে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন- মুরতাদ্দ হওয়া, চুরি করা, যিনায় লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি। সুতরাং ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করা এবং অপকর্মে লিপ্ত হওয়া সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

১৬১. যা অতিক্রম করা গুনাহ্। এর অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ্ তা'আলার সমুদয় বিধি-নিষেধ; বরং কোন কোন গুনাহ্র শাস্তিও রয়েছে। যেমন- মুরতাদ্দ হলে হত্যা, যিনার জন্য চাবুক বা পাথর নিক্ষেপ, চুরির কারণে হাত কাটা ইত্যাদি।

১৬২. অর্থাৎ আল্লাহ্ অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক দু'জন উপদেশদাতা দান করেছেন। বাহ্যিক উপদেশদাতা হচ্ছে পবিত্র ক্বোরআন এবং অভ্যন্তরীন উপদেশ দাতা হলেন ওই ফিরিশ্তা, যিনি মু'মিনের অন্তরে ভাল ধারণা এবং মন্দ কার্যাবলীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে থাকেন।

১৬৩. এ হাদীস শরীফ 'মাওকূফ' পর্যায়ের, 'মারফূ' নয়। অর্থাৎ হযরত ইবনে মাস'উদ (সাহাবী)'র নিজের কথা। সাহাবীর কথা ও কাজকে 'হাদীস-ই মাওকূফ' বলা হয়, আর হুযূরের পবিত্র বাণী ও আমলকে 'হাদীস-ই মারফূ' বলা হয়।

১৬৪. এ অনুবাদ অত্যন্ত উঁচুমানের। আশি''আতুল লুম'আত প্রণেতা এটাকে গ্রহণ করেছেন। এতে তাবে'ঈদের সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ সরলপথে চলতে চায়, সে যেন সাহাবা-ই কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে; নিজে ক্বোরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা অনুমান করে ক্ষান্ত না হয়।

এ জন্যই মুজতাহিদ ইমামগণ সাহাবা-ই কেরামের অনুসারী। এ অভিমতের সমর্থন করছে ওই হাদীস, যাতে এরশাদ করা হয়েছে, ''আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রস্বরূপ, তাঁদের মধ্যে যাঁরই অনুসরণ করবে, হিদায়তপ্রাপ্ত হবে।'' আর ক্বোরআন-ই করীমের এ আয়াতও (সেটার সমর্থন করে)- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (হে খোদা! আমাদেরকে তাঁদেরই পথে পরিচালিত করো, যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো।।১:৬।) সর্বশ্রেষ্ঠ নি'মাতপ্রাপ্ত হলেন সাহাবা-ই কেরাম।

فَاِنَّ الْحَیَّ لَاتُؤْمَنُ عَلَیْهِ الْفِتْنَةُ اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ مُحَمَّدٍ ﷺ کَانُوْا اَفْضَلَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَّاَعْمَقَهَا عِلْمًا وَّاَقَلَّهَا تَکَلُّفًا

কারণ, জীবিতরা ফিত্না হতে নিরাপদ নয়।[১৬৫] **ওই বুযুর্গগণ হলেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাহাবা-ই কেরাম, যাঁরা এ উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,**[১৬৬] **অন্তরের দিক দিয়ে সৎ, ইলমের দিক দিয়ে গভীরতাসম্পন্ন এবং লৌকিকতার দিক দিয়ে কম।**[১৬৭]

স্মর্তব্য যে, এখানে 'জীবিতগণ' মানে সাহাবা-ই কেরাম ব্যতীত অন্য সবাই এবং 'ওফাতপ্রাপ্তগণ' মানে সমস্ত সাহবা-ই কেরাম -জীবিত হোন কিংবা ওফাতপ্রাপ্ত হোন। যেমনটি পরবর্তী বিষয়বস্তু দ্বারা সুস্পষ্ট হয়। যেহেতু ওই সময় অধিকাংশ সাহাবী ওফাত পেয়েছিলেন, সেহেতু এরূপ বলেছেন।

সুতরাং হাদীসের বিপক্ষে এ আপত্তি করা যাবে না যে, 'তাহলে তো মৃত কাফিরদেরও অনুসরণ করতে হবে, আর জীবিত আউলিয়া, ওলামা বরং সাহাবীদেরও অনুসরণ করা যাবে না!'

'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেন, এ কথা হযরত ইবনে মাস'উদ বিনয় প্রকাশার্থে বলেছেন, নতুবা ওই সময় তিনি এবং সকল জীবিত সাহাবী ও অনুসরণের যোগ্য ছিলেন।

১৬৫. এখানে 'জীবিতগণ' মানে তখনকার তাবে'ঈগণ। কেননা, সাহাবীদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَاَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوٰی

(এবং খোদাভীরুতার বাণী তাদের উপর অপরিহার্য করেছেন।৪৮:২৬) আরো এরশাদ করেছেন-

اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰی

(তারা হচ্ছে ওই সব লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ্ খোদাভীরুতার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন।৪৯:৩)

আরো এরশাদ করেছেন-

وَکَرَّهَ اِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْیَانَ

(আর কুফর, নির্দেশ অমান্য করা এবং অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন।৪৯:৭)

যা'দ্বারা বুঝা গেলো যে, মহান আল্লাহ্ সাহাবা-ই কেরামের জন্য ঈমানকে নিশ্চিত করে দিয়েছেন। তাঁদের অন্তরে কুফর ও পাপাচারের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বিশেষত হযরত ইবনে মাস'উদ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে তো জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, কেউ মুরতাদ্দ হয়ে গেলে সে আর সাহাবী থাকে না; মুরতাদ্দ হওয়ার কারণে 'সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য' নিঃশেষ হয়ে যায়। (সুতরাং বর্তমানে কোন মুরতাদ্দকে মু'মিন, আলিম, মুহাদ্দিস, সুন্নী বলে আখ্যায়িত করা যাবে না।)

১৬৬. অর্থাৎ যাঁদের ওফাত ঈমানের উপর হয়ে থাকে, তাঁদের সাহাবী হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়ে যায়।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, সমস্ত ওলী ও আলিম একজন সাহাবীর কদমের ধূলির মার্যাদায়ও পৌঁছুতে পারে না। ফুলের সংস্পর্শে সরিষাও সুবাসিত হয়ে যায়। হুযূরের সংস্পর্শের ফলে অন্তর কেন সুবাসিত হবে না?

এর গবেষণালব্ধ আলোচনা আমার কিতাব 'আমীর-ই মু'আবিয়া' দেখুন। অতঃপর সাহাবীদের মধ্যে একজন অপরজনের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্নও রয়েছেন। এরশাদ ফরমায়েছেন-

لَایَسْتَوِیْ مِنْکُمْ مَنْ اَنْفَقَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ

(তোমাদের মধ্যে সমান নয় ওই সব লোক, যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে।৫৭:১০)

মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান গ্রহণকারী সাহাবীগণ মক্কা বিজয়ের পরে ঈমান গ্রহণকারী সাহাবীদের চেয়ে উত্তম।

স্মর্তব্য যে, 'সাহাবী' হলেন, যাঁরা ঈমান সহকারে ও স্বজ্ঞানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং ঈমানের উপর ওফাত পেয়েছেন।

১৬৭. সুবহানাল্লাহ্! এগুলো হচ্ছে সাহাবা-ই কেরামের গুণাবলী; অর্থাৎ তাঁরা হলেন, সব দিক দিয়ে হুযূরের অনুগত, সকল প্রকার জ্ঞানের ধারক, লৌকিকতা ও লোকদেখানো থেকে পবিত্র। তাঁদের প্রত্যেকেই মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, ক্বারী, সূফী এবং ইলমে ফরায়েয সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

এতদসত্ত্বেও তাঁরা খালি পায়ে চলাফেরা করতেন, মাটির বিছানায় শুয়ে পড়তেন, সামান্য খাবার খেয়ে দিনাতিপাত করতেন। না জেনে ফাতওয়া দেবার সাহস করতেন না। শারীরিক দিকে দিয়ে ছিলেন যমীনের, আর আত্মার দিক দিয়ে ছিলেন আরশের। প্রকাশ্যভাবে সৃষ্টির সাথে ছিলেন, অপ্রকাশ্যে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে, সর্বোপরি, ছেঁড়া পোশাকে আবৃত মুক্তাই ছিলেন তারা।

اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَلِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْاهُمْ عَلٰى اٰثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَاِنَّهُمْ كَانُوْاعَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ - رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَعَنْ جَابِرٍاَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِنُسْخَةٍ مِّنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهٖ نُسْخَةٌ مِّنَ التَّوْرٰةِ فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَتَغَيَّرُ

আল্লাহ্ তাঁদেরকে স্বীয় নবীর সাহচর্য লাভ এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে নিয়েছেন।[১৬৮] তাদের মহত্ব মেনে নাও, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো এবং যথাসাধ্য তাঁদের স্বভাব-চরিত্র মজবুতভাবে ধারণ করো। কারণ, তাঁরা সঠিক হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।[১৬৯] [রাযীন]

১৮৪ || হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে তাওরাতের একটি কপি নিয়ে আসলেন এবং আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! এটি তাওরাতের একটি কপি।" হুযূর নীরব রইলেন।[১৭০] তিনি তা পড়তে শুরু করলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী চেহারা (ক্রোধে) পরিবর্তিত হতে লাগলো।

---

১৬৮. হুযূরের সাহচর্য পরশপাথরের প্রভাব রাখতো। যদি তাঁদের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকতো, তাহলে মহান আল্লাহর স্বীয় হাবীবকে তাঁদের সাথে রাখতেন না। স্নেহবৎসল পিতা স্বীয় স্নেহের সন্তানের জন্য ভাল বন্ধুর খোঁজ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হাবীবের সাহচর্যের জন্য উত্তম সাহাবা নির্বাচন করেছেন।

তাছাড়া, মুক্তাকে উত্তম পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। মহান রব পবিত্র ক্বোরআনকে উত্তম বক্ষসমূহেই আমানত রেখেছেন। ওই মহা মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ হলেন- ক্বোরআন ও হাদীসের ধারক। তাঁরাই দ্বীনকে আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। মহান রব তাঁদেরকে ঈমানের কষ্টিপাথরস্বরূপ বানিয়েছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন-

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا

(অতঃপর তারাও যদি এভাবে ঈমান আনতো যেমন তোমরা ঈমান এনেছো, তবেই তো তারা হিদায়ত পেয়ে যেতো।[২:১৩৭]) অর্থাৎ হে সাহাবীগণ! যারা তোমাদের মত ঈমান আনবে, তারা হিদায়াত পাবে।

স্মর্তব্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিষ্ঠাবান ঈমানদার এবং মুনাফিক্বদের মধ্যে পার্থক্য নিজেই নির্ণয় করে দিয়েছিলেন।

সূরা তাওবাহ্ অবতীর্ণ হবার পর মুনাফিক্বগণ আলাদা হয়ে গিয়েছিলো। যেমনটি ক্বোরআন-ই করীম হতে বুঝা যায়। এরশাদ হচ্ছে- حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ (যে পর্যন্ত না পৃথক করবেন অপবিত্রকে পবিত্র থেকে।)[৩:১৭৯]

১৬৯. যেভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য হুযূরের অনুসরণ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তেমনিভাবে, সাহাবা-ই কেরামের অনুসরণ ব্যতীত হুযূরের অনুসরণ অসম্ভব। হুযূর হচ্ছেন- খোদা দর্শনের দর্পণস্বরূপ আর সাহাবীগণ হচ্ছেন, রসূল -দর্শনের দর্পণ। সুবহানাল্লাহ্।

যখন হযরত ইবনে মাস'উদের মত একজন মহা মর্যাদাবান মু'মিন সাহাবীগণের এরূপ প্রশংসা করছেন, তখন তাঁদের উত্তম হওয়া সম্পর্কে কে বাদানুবাদ করতে পারে?

সাহাবা-ই কেরামকে অস্বীকার করা বাস্তবিক পক্ষে হুযূরের কল্যাণধারাকে অস্বীকার করার নামান্তর। না'উ-যু বিল্লা-হ্! হুযূর কি স্বীয় তেইশ বছর দ্বীন প্রচার করে শুধু চার-পাঁচ জন সাহাবী বানিয়েছেন?

(মহাভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় আহ্লে বায়তের কয়েকজন ইমাম ছাড়া অন্যান্য সাহাবা-ই কেরামের অপসমালোচনা করে থাকে, এখানে তাদের খণ্ডন করা হয়েছে।)

১৭০. এ চুপ থাকা অসন্তুষ্টির কারণে ছিলো, এ জন্য যে, হযরত ওমর ইহুদীদের কাছে যান কেন? তাওরাতে কি খোঁজেন? কিন্তু হযরত ওমর বুঝেছিলেন এ চুপ থাকা অনুমতির ছিলো। এ জন্য তিনি তা পড়তে শুরু করেন। সুতরাং ফারূক্ব-ই আ'যমের এ কাজের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি নেই। 'ইজতিহাদী' বা গবেষণাপ্রসূত ত্রুটি ক্ষমাযোগ্য।

فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَاتَرٰى مَابِوَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ عُمَرُ اِلٰى وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَ غَضَبِ رَسُوْلِهٖ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْبَدَالَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْكَانَ حَيًّا وَّاَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لَاتَّبَعَنِىْ - رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ

তখন হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "তোমার জন্য ক্রন্দনকারীরা ক্রন্দন করুক! তুমি কি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চেহারা-ই আন্‌ওয়ার'র অবস্থা দেখতে পাচ্ছো না?"[১৭১] তখন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চেহারা-ই আন্‌ওয়ারের দিকে লক্ষ্য করলেন। অতঃপর আরয করলেন, "আমি আল্লাহ্ ও রসূলের ক্রোধ থেকে আল্লাহর পানাহ্ চাচ্ছি! আমরা সন্তুষ্ট আছি আল্লাহ্ রব হওয়াতে, ইসলাম দ্বীন হিসেবে এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবী হওয়াতে।"[১৭২] তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "ওই মহান সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতের হাতে মুহাম্মদ মুস্তফার প্রাণ, আজ যদি হযরত মূসাও তোমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করো ও আমাকে ত্যাগ করো, তবে তোমরা নিশ্চয় সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে।[১৭৩] যদি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম জীবদ্দশায় থাকতেন[১৭৪] এবং আমার নুবূয়তের যামানা পেতেন, তাহলে তিনিও নিশ্চিতভাবে আমারই অনুসরণ করতেন।"[১৭৫] [দারিমী]

১৭১. ঘটনার বিবরণ এ যে, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে কাগজ ছিলো এবং তিনি তা পড়ায় লিপ্ত ছিলেন। আর হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর হুযূরের চেহারা-ই আন্‌ওয়ার প্রত্যক্ষ করছিলেন। সিদ্দীক্ব-ই আকবরের এ উক্তি মৃত্যু কামনার জন্য ছিলো না। বরং আরবের পরিভাষা অনুযায়ী ক্ষোভ প্রকাশের জন্য ছিলো। তাঁর এ অসন্তুষ্টি এ জন্য ছিলো যে, হযরত ওমর ফারুক্ব'র এ কাজ হুযূরের কষ্টের কারণ হয়েছিলো। ব্যক্তিস্বার্থে ছিলো না, হুযূরের কারণেই ছিলো। সুতরাং এ থেকে এটা সাব্যস্ত হয় না যে, 'সাহাবীগণ একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ রাখতেন।'

১৭২. হযরত ফারুক্ব-ই আ'যম হুযূরকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রায়শ এ কথাগুলো আরয করতেন। যেগুলোতে স্বীয় ওয়াদা পূরণের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহরই পানাহ! এ ভুল অবাধ্যতার ভিত্তিতে নয়, আমরাতো পুরাতন আস্তানা চুম্বনকারী ও অসহায় বান্দা।

১৭৩. অর্থাৎ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এ থেকে কয়েকটি মাসআলা জানা গেলো: এক. এখন থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত হিদায়ত হুযূরের অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি আসল তাওরাত ও ইঞ্জীল পাওয়া যায়, বরং স্বয়ং তাওরাত ও ইঞ্জীলের ধারক নবীও তাশরীফ নিয়ে আসেন, তবুও হিদায়ত হুযূরের কাছেই পাওয়া যাবে। পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহ তখনকার হিদায়ত ছিলো, বর্তমানে নয়। চাঁদ, তারা ও চেরাগ রাতে আলো দেয়, দিনে নয়। যুবক লোকেরা কিঞ্চিত খাদ্য ও মায়ের দুধে জীবিত থাকতে পারে না। দুই. ক্বোরআন ও সুন্নাহ্ ব্যতীত অন্যান্য কিতাব হতে হিদায়ত অর্জন করতে চাওয়া এবং সেগুলো পড়া নিষেধ। তিন. কোন ব্যক্তি যেন নিজের ঈমানের উপর ভরসা করে নির্ভয় হয়ে না যায়, যে কোন কিতাব যেন না পড়ে, প্রত্যেকের ওয়ায যেন না শুনে।
যখন হযরত ওমর ফারুক্বের মত সাহাবীকে তাওরাতের মত কিতাব পড়তে বাধা দেওয়া হয়েছিলো, তখন আমরা কিসে গণ্য? ঈমানের সম্পদকে চৌমুহনীতে রেখো না। চুরি হয়ে যাবে।

১৭৪. অর্থাৎ যদি প্রকাশ্যভাবে জীবিত থাকতেন; নতুবা বাস্তবে তো জীবিতই আছেন। [মিরক্বাত]

১৭৫. কেননা, তাঁর দ্বীন রহিত হয়ে গেছে, এ জন্যই মি'রাজের রাতে সমস্ত নবী আমাদের হুযূরের দ্বীনের নামায হুযূরের পেছনে ইক্বতিদা করে সম্পন্ন করেছেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম'র কাছে পৌঁছে তাওরাতের বিধানাবলী জারী করতে পারেন নি; যদিও তাওরাতের বিধান তখনও কার্যকর ছিলো; কিন্তু হযরত খাদ্বির'র উপর বাস্তবায়িত হয় নি।

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلَامِىْ لَايَنْسَخُ كَلَامَ اللّٰهِ وَكَلَامُ اللّٰهِ يَنْسَخُ كَلَامِىْ وَكَلَامُ اللّٰهِ يَنْسَخُ بَعْضُهٗ بَعْضًا وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَادِيْثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْاٰنِ وَعَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَاتُضَيِّعُوْهَا

১৮৫ ॥ তাঁরই (হযরত জাবির) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার বাণী আল্লাহ্র বাণীকে রহিত করে না, আল্লাহ্র বাণী আমার বাণীকে রহিত করে।[১৭৬] আর আল্লাহ্র কোন কোন বাণী কোন কোন বাণীকে রহিত করে।[১৭৭]

১৮৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার কিছু হাদীস কিছু হাদীসকে ক্বোরআনের ন্যায় রহিত করে।[১৭৮]

১৮৭ ॥ হযরত আবূ সা'লাবা খোশানী[১৭৯] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেন, আল্লাহ্ কতগুলো ফরয কাজ বাধ্যতামূলক করেছেন, সেগুলো বরবাদ করো না।[১৮০]

---

১৭৬. অর্থাৎ হাদীস শরীফ দ্বারা ক্বোরআন মজীদের আয়াত তিলাওয়াতের দিক দিয়ে রহিত হতে পারে না। তবে বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক আয়াত হাদীস দ্বারা রহিত হয়। যেমন- لَاوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ হাদীস দ্বারা ওয়ারিসের জন্য ওসীয়ত বৈধ সাব্যস্তকারী আয়াতগুলোর বিধান রহিত হয়ে গেছে।

এভাবে হুযূরের এরশাদ 'নবীগণের মীরাস বন্টন করা হয় না।' হুযূরের বেলায় মীরাসের আয়াতকে রহিতকারী। তা'যীমী সাজদার বৈধতা ক্বোরআন দ্বারা সাব্যস্ত হলেও হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে; অথবা এখানে كَلَامِىْ (আমার বাণী) মানে হুযূরের ইজতিহাদসমূহ, অর্থাৎ আমার ইজতিহাদী বাণীগুলো ক্বোরআনের বিধানকে রহিত করে না। সুতরাং আলোচ্য হাদীস শরীফ সুস্পষ্ট।

১৭৭. স্মর্তব্য যে, نَسْخٌ (নুস্খ) তথা রহিতকরণ চার প্রকার: **এক.** ক্বোরআনকে ক্বোরআন দ্বারা রহিত করা। যেমন- কাফিরদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শনের আয়াতগুলো জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসূখ। **দুই.** হাদীসকে হাদীস দ্বারা রহিত করা। যেমন- হাদীসের আলোকে কবর যিয়ারত প্রথমে নিষেধ ছিলো, তারপর হাদীসই সেটাকে বৈধ করেছে। এরশাদ হচ্ছে, اَلَا فَزُوْرُوْهَا (শোন! এখন সেগুলোর যিয়ারত করো)। **তিন.** ক্বোরআনকে হাদীস দ্বারা রহিত করা।যেমন- সাজদাহ্-ই তাহিয়্যাহ্। **চার.** হাদীসকে ক্বোরআন দ্বারা রহিত করা। যেমন- বায়তুল মুক্বাদ্দাস ক্বেবলা হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এর রহিতকরণ ক্বোরআন দ্বারা হয়েছে। যেমন- মহান রব এরশাদ করেন, فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ (অতঃপর তোমরা তোমাদের চেহারা সেটার দিকে ফেরাও।[২:১৪৪])। এ সম্পর্কে গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ আমার 'তাফসীরে না'ঈমী': ৩য় পারায় দেখুন।

১৭৮. অর্থাৎ যেমন কতেক আয়াত কতেক আয়াতকে রহিত করে, তেমনি কতেক হাদীস কতেক হাদীসকে রহিত করে।

স্মর্তব্য যে, نُسْخٌ (নুস্খ)'র অর্থ 'সময়সীমার বর্ণনা', 'পরিবর্তন' নয়। অর্থাৎ 'রহিতকারী' (نَاسِخٌ) এটা বর্ণনা করে যে, রহিত বিধানের 'মুদ্দত' বা সময়সীমা আজ পর্যন্ত ছিলো। যেমন, ডাক্তার স্বীয় চিকিৎসাপত্র পরিবর্তন করে থাকেন।

১৭৯. তাঁর নাম 'জরসূম ইবনে নাশের'। তিনি বনূ ক্বোযা'আহ্ নামক গোত্রের 'খোশান' বংশের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী। 'বায়'আত-ই রিদ্বওয়ান'-এ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কারণে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সিরিয়ায় বসবাস করতেন। ৭৫ হিজরীতে ওফাত পান। তাঁর নিকট থেকে চল্লিশটি হাদীস বর্ণিত আছে।

১৮০. অর্থাৎ ফরয আমলসমূহ, ক্বোরআন দ্বারা সাব্যস্ত হোক কিংবা হাদীস দ্বারা। ওইগুলোকে অবশ্যই মেনে চলবে এবং নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করবে।

স্মর্তব্য যে, ফরয বলা হয়, যা সাব্যস্তও হয় নিশ্চিতভাবে, যা পালন করা বান্দা থেকে চাওয়াও হয় অকাট্যভাবে। সেটার বর্জনকারী ফাসিক্ব এবং অস্বীকারকারী কাফির।

وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَاتَعْتَدُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَآءَ مِنْ غَيْرِنِسْيَانٍ فَلَاتَبْحَثُوْاعَنْهَا ـ رَوَى الْاَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ الدَّارُقُطْنِىُّ

كِتَابُ الْعِلْمِ

◆اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ◆ وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْاٰيَةً

কিছু হারাম বিষয় হারাম করেছেন, ওইগুলোর হারাম হওয়াকে ভঙ্গ করো না,[১৮১] কিছু সীমা নির্ধারণ করেছেন, ওইগুলো অতিক্রম করো না।[১৮২] আর কতিপয় বিষয় হতে, ভুলে যাওয়া ব্যতীত, নীরব রয়েছেন। সেগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান করো না।[১৮৩] উক্ত তিনটি হাদীস দারে কুত্বনী বর্ণনা করেছেন।

ইল্‌ম পর্ব [১]

প্রথম পরিচ্ছেদ◆ ১৮৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দাও, যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।[২]

১৮১. এভাবে যে, হারামের কাছেও যাবে না; সম্পন্ন করাতো অনেক দূরের কথা।

১৮২. অর্থাৎ হালাল-হারামের সীমাগুলো ভঙ্গ করো না। নামায ৫ওয়াক্‌ত ফরয। কেউ ৪ওয়াক্‌ত কিংবা ৬ওয়াক্‌ত ফরয বললেও তা মানবে না। সম্পদের ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেওয়া ফরয। এর চেয়ে কম বা বেশির উপর আক্বীদা পোষণ করবে না। ৪জন পর্যন্ত মহিলাকে একসাথে বিয়ে করা বৈধ। সুতরাং ৫ম মহিলাকে হালাল ও ৪র্থ স্ত্রীকে হারাম মনে করো না, ইত্যাদি।

১৮৩. অর্থাৎ কতগুলো জিনিসের হালাল ও হারাম হওয়া সুস্পষ্টভাবে ক্বোরআন অথবা হাদীসে বর্ণিত হয় নি। সেগুলোর অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়ো না। অর্থাৎ সেগুলো কি মুবাহ? (না অন্য কিছু, এ সব না ভেবে) আমল করতে থাক। সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন, عَفَى اللّٰهُ عَنْكَ (আল্লাহ্‌ আপনাকে ক্ষমা করুন।[৯:৪৩]) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যেগুলো বলা হয়নি সেগুলো ক্ষমাযোগ্য।" যেমনটি 'কিতাবুল আত্‌'ইমা'তে আলোচনা করা হবে।[মিরক্বাত]

১. অর্থাৎ 'ইল্‌ম' শিক্ষা করা এবং অপরকে শেখানোর ফযীলতসমূহ। 'ইল্‌ম' দ্বারা শরীয়ত বিষয়ক জ্ঞান বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ক্বোরআন, হাদীস, ফিক্বহ ইত্যাদি।

স্মর্তব্য যে, 'ইল্‌ম' আল্লাহ্‌র নূর, যা বান্দাকে দান করা হয়। যদি তা কোন মানুষের কাছ থেকে অর্জিত হয়, তবে তাকে 'কসবী' (অর্জিত) বলা হয়; নতুবা 'লাদুন্নী' (খোদাপ্রদত্ত) বলা হয়। ইল্‌মে লাদুন্নীর অনেক প্রকার রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-ওহী, ইল্‌হাম, ফিরাসত☆ইত্যাদি।

'ওহী' নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট, 'ইলহাম' আল্লাহ্‌র ওলীগণের জন্য খাস এবং 'ফিরাসাত' প্রত্যেক মু'মিনের ঈমানী শক্তি অনুযায়ী নসীব হয়। ফিরাসত ও ইল্‌হামের মধ্যে ওইগুলোই বিবেচ্য, যেগুলো শরীয়ত-বিরোধী নয়। শরীয়ত বিরোধী হলে তা ওয়াস্‌ওয়াসাহ্‌ বা শয়তানের কুমন্ত্রণা।

২. 'আয়াত'র আভিধানিক অর্থ আলামত বা চিহ্ন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হুযূরের মু'জিযাসমূহ, হাদীসসমূহ, বিধানাবলী এবং পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতসমূহ সবই 'আয়াত'র অন্তর্ভুক্ত। পরিভাষায়, ক্বোরআনের ওই বাক্যকে 'আয়াত' বলা হয়, যার স্বতন্ত্র নাম নেই। নাম বিশিষ্ট বিষয়বস্তুকে 'সূরা' বলা হয়। এখানে 'আয়াত' দ্বারা আভিধানিক অর্থ বুঝায়।

অর্থাৎ যার কাছে কোন মাসআলা, হাদীস অথবা ক্বোরআন শরীফের আয়াত জানা থাকে, সে যেন তা অপরকে পৌঁছিয়ে দেয়। দ্বীন প্রচার শুধু আলিমদের উপর ফরয নয়; প্রত্যেক মুসলমান তার জ্ঞান অনুযায়ী দ্বীনের প্রচারক। আর এও হতে পারে যে, এখানে আয়াতের পারিভাষিক অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য। তখন তা দ্বারা আয়াতের শব্দাবলী, অর্থ, মর্মার্থ ও তা থেকে অনুমিত মাসাইল সবই বুঝাবে। অর্থাৎ যার একটি আয়াত ও এতদসংক্রান্ত কিছু মাসআলা জানা থাকে, সে তা মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে। দ্বীন প্রচার করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

☆'ওহী' হচ্ছে নবীর সাথে আল্লাহ্‌র গোপন কথা, ফিরিশতার মাধ্যমে হোক, কিংবা সরাসরি। 'ইলহাম' হচ্ছে নবী ছাড়া আল্লাহ্‌র অন্য কোন প্রিয় বান্দার কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরাসরি অন্তরে ঢেলে দেওয়া ইল্‌ম। আর 'ফিরাসাত' হচ্ছে ঈমানী নূরের জ্যোতিতে মু'মিনের অন্তর্চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট ইল্‌ম। [হাশিয়ায়ে বোখারী -সংক্ষেপিত

وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَاحَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يُّرٰى اَنَّهٗ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আর তোমরা বনী ইসরাঈল থেকে ঘটনাবলীর বর্ণনা গ্রহণ করো; এতে কোন ক্ষতি নেই।[৩] যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়।"[৪] [বোখারী]

১৮৯ || হযরত সামুরাহ্ ইবনে জুন্দুব ও মুগীরাহ্ ইবনে শু'বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত,[৫] তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন কথা বর্ণনা করে, যা সে মিথ্যা বলে জানে, তাহলে সে মিথ্যাবাদীদের একজন।"[৬] [মুসলিম]

---

৩. অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে কাহিনী, সংবাদ ও উপমাদি শোনো এবং মানুষের নিকট তা বর্ণনা করো, যদি তা ইসলামের পরিপন্থী না হয়।

স্মর্তব্য যে, বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে সংবাদাদি গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে। তবে তাওরাত ও ইঞ্জীলের বিধানাবলী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। কেননা, ওই কিতাবগুলোর বিধানাবলী 'মানসূখ' (রহিত) হয়ে গেছে; সংবাদগুলো নয়। সুতরাং এ হাদীস হযরত ওমর ফারূক্বের ওই বর্ণনার পরিপন্থী নয়; যা'তে হুযূর তাঁকে তাওরাত পড়তে নিষেধ করে দিয়েছেন। কেননা, ওখানে বিধানাবলী গ্রহণ করা হচ্ছিলো। সুতরাং উভয় হাদীসই সুস্পষ্ট ও কার্যকর অর্থবোধক। কোনটিই 'মানসূখ' (রহিত) নয়।

৪. অর্থাৎ মিথ্যা হাদীস রচনাকারী দোযখী। এ থেকে বুঝা গেলো যে, হাদীস বানানো 'কবীরা গুনাহ', বরং ক্ষেত্রভেদে কুফর।☆

কেননা, এতে মিথ্যাও রয়েছে এবং দ্বীনের মধ্যে ফিত্না বিস্তারও। কিছু সংখ্যক মূর্খ সূফী তাহাজ্জুদের নামায ও ক্বোরআনী সূরাসমূহের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে কিছু হাদীস রচনা করে নিয়েছে। তারা যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

স্মর্তব্য যে, 'হাদীস-ই মাওদ্বূ' (বানোয়াট হাদীস) এক জিনিস, 'হাদীস-ই দ্ব'ঈফ' (দুর্বল হাদীস) অন্য জিনিস। 'দ্ব'ঈফ হাদীস' কোন আমলের সাওয়াব বা ফযীলত বুঝানোর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু 'হাদীস-ই মাওদ্বূ' কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্য সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ হাদীসের খিদমতে গোটা জীবনই উৎসর্গ করেছেন। আলহাম্দু লিল্লাহ্! তাঁদের এ প্রচেষ্টায় 'মাওদ্বূ' হাদীসগুলো আলাদা হয়ে গেছে।

স্মর্তব্য যে, এখানে 'ইচ্ছাকৃত' (عَمَدًا)-এর শর্তারোপ করা হয়েছে। যদি কেউ অজ্ঞাতসারে মাওদ্বূ' হাদীস বর্ণনা করে দেয়, তাহলে গুনাহ্গার হবে না।

নোট: এটা 'হাদীস-ই মুতাওয়াতির'। এটা বায়ট্টিজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যাঁদের মধ্যে 'আশারাহ্-ই মুবাশ্শারা' (বেহেশ্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী)ও রয়েছেন। এ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আশারাহ্ মুবাশ্শারা'র সকলে একত্রিত হন নি। [মিরক্বাত]

৫. সামুরাহ্ বনূ নাযার গোত্রের লোক। আনসারের মিত্র (حليف)। তিনি বহু হাদীসের হাফিয। ৫৯ হিজরীতে বসরায় ওফাত পান।

হযরত মুগীরাহ্ বনী সক্বীফ গোত্রের লোক। খন্দকের যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরত করে মদীনা-এ ত্বাইয়্যবায় চলে আসেন। আমীর-ই মু'আবিয়ার পক্ষ থেকে কূফার গভর্নর ছিলেন। সত্তর বছর বয়সে ৫০ হিজরীতে কূফায় ওফাত পান।

৬. অর্থাৎ হাদীস রচনা করাও গুনাহ্ এবং জেনেশুনে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করাও গুনাহ্; বরং যে হাদীস সম্পর্কে তা বানোয়াট হবার ধারণা অধিক হয়, তাও যেন বর্ণনা না করে; শুধু বানোয়াট হবার সন্দেহ যথেষ্ট নয়। তবে হ্যাঁ, সেটা বানোয়াট বলে ঘোষণা দিয়ে বর্ণনা করা জায়েয, যাতে মানুষ তা থেকে বাঁচতে পারে।

☆ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীস বানানো হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি মিথ্যারোপের নামান্তর। হুযূরের উপর মিথ্যারোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যারোপের মত নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, لَيْسَ الْكَذِبُ عَلَىَّ الْكَذِبَ عَلٰى غَيْرِىْ অর্থাৎ আমার নামে মিথ্যাচার করা অন্য কারো নামে মিথ্যাচারের মত নয়; বরং তা আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুসারে কুফর। [মোল্লা আলী ক্বারী কৃত. 'মওদ্বূ'আত-ই কবীর']

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

১৯০ || হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[৭] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের ফক্বীহ্ বানিয়ে দেন।[৮] আমি বন্টনকারী, আল্লাহ্ দান করেন।[৯] [বোখারী, মুসলিম]

১৯১ || হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

---

৭. তাঁর নাম শরীফ- মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদুস্ শাম্‌স ইবনে আব্দে মানাফ। তাঁর বংশধারা পঞ্চম পুরুষে, অর্থাৎ আব্দে মানাফে গিয়ে হুযূরের বংশধারার সাথে মিলে যায়। তাঁর মাতা হিন্দ বিনতে 'উতবা ইবনে রবী'আহ ইবনে আব্দে শাম্‌স ইবনে আব্দে মানাফ। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর ইসলাম গ্রহণ করেন; কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিনই ইসলাম প্রকাশ করেন। তিনি হুযূরের শ্যালক। ওহী লিখক। ফারূক্ব-ই আ'যম'র যুগে সিরিয়ার শাসক হয়েছিলেন। চল্লিশ বছর সেখানকারই শাসক ছিলেন। ইমাম হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা তাঁর অনুকূলে খিলাফতের পদ ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করেছিলেন। তিনি ৭৮ বছর বয়সে ৬০ হিজরীতে ৪ রজব (মুখের) অর্দ্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। তাঁর কাছে হুযূরের বরকতময় লুঙ্গী, চাদর শরীফ, কামীজ মুবারক এবং কিছু চুল ও নখ মুবারক ছিলো। তিনি ওসীয়ত করেছিলেন, "আমাকে এ পোষাক শরীফে কাফন দেবে এবং আমার মুখ ও নাকে হুযূরের নখ ও চুল মুবারক রেখে দেবে।" তাঁর পূর্ণাঙ্গ আদর্শ জীবনী আমার কিতাব 'আমীরে মু'আবিয়া'তে দেখুন।

৮. অর্থাৎ যাকে দ্বীনী ইল্‌ম, দ্বীনী বোধশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা দান করেন, স্মর্তব্য যে, 'ফিক্বহ্-ই যাহেরী' হচ্ছে 'শরীয়ত' এবং 'ফিক্বহ্-ই বাত্বেনী' হচ্ছে 'তরীক্বত ও হাক্বীক্বত'।☆ আলোচ্য হাদীসে উভয় ধরনের ফিক্বহ্ অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীস থেকে দু'টি মাসআলা প্রতীয়মান হয়: **এক.** ক্বোরআন ও হাদীসের তরজমা ও শব্দাবলী মুখস্থ করা 'ইলমে দ্বীন' নয়; বরং সেগুলো বুঝাই হচ্ছে 'ইলমে দ্বীন'। এটা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ (যোগ্যতা অর্জনের) কারণেই ফক্বীহ্‌গণের অনুসরণ (তাক্বলীদ) করা হয়। এর ভিত্তিতে সমস্ত তাফসীর ও হাদীস বিশারদগণ মুজতাহিদ ইমামগণের মুক্বাল্লিদ (অনুসারী) হয়েছেন। হাদীস সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞানের উপর অহংবোধ করেন নি।☆☆ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন- وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا (এবং যাকে 'হিকমত' (প্রজ্ঞা) দান করা হয়, নিশ্চয় তাকে বহু কল্যাণ দেওয়া হয়।।২:২৬৯।) এখানে 'হিকমত' অর্থ ফিক্বহ্। ক্বোরআন ও হাদীসের অনুবাদ তো আবূ জাহলও জানতো। **দুই.** ক্বোরআন ও হাদীসের নিছক জ্ঞানার্জন পরিপূর্ণতার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং সেগুলোর মর্মার্থ বুঝার মধ্যেই রয়েছে পরিপূর্ণতা। 'আলিম-ই দ্বীন' হচ্ছেন ওই ব্যক্তি, যাঁর মুখে আল্লাহ্-রসূলের বাণী থাকে এবং অন্তরে থাকে সেগুলোর ফয়য ও বরকত। ফয়য ও বরকত অর্জনে ব্যর্থ হলে বাণীগুলো থেকে উপকৃত হতে পারবে না। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সংযোজন ব্যতীত বিদ্যুৎশক্তি কার্যকর হয় না।

৯. এ থেকে বুঝা গেলো যে, দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত ইল্‌ম, ঈমান, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দেন আল্লাহ্, বন্টন করেন হুযূর। যে যা পেয়েছে হুযূরের পবিত্র হাতেই পেয়েছে। কেননা, এখানে না আল্লাহর দানের শর্তারোপ করা হয়েছে, না হুযূরের বন্টনের ক্ষেত্রে। সুতরাং এ ধারণা সঠিক নয় যে, তিনি শুধু ইল্‌ম বন্টন করেন। নতুবা, তখন এটা অনিবার্য হয়ে যাবে যে, আল্লাহ্‌ও শুধু ইল্‌ম দান করেন। স্মর্তব্য যে, হুযূরের দান সমান্তরাল; কিন্তু গ্রহণকারীদের লওয়ার মধ্যে ব্যবধান আছে। বৈদ্যুতিক শক্তি (পাওয়ার) সমান্তরালভাবে আসে; কিন্তু বিভিন্ন পাওয়ারের বাল্ব সেগুলোর শক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ গ্রহণ করে। তারপর বাল্বের কাঁচের রঙ যেমন হয়, বিদ্যুতের আলোর রঙও তেমন হয়। হানাফী, শাফে'ঈ, অনুরূপ ক্বাদেরী,

---

☆শরীয়তের বাহ্যিক বিধিবিধান, ঈমান-আমল ইত্যাদি বুঝার নাম 'যাহেরী ফিক্বহ্'। আর ইলমে বাত্বিন বা ত্বরীক্বত সম্পৃক্ত বিষয়াদিসহ শরীয়ত বুঝা হলো 'ফিক্বহে বাত্বেনী।

☆☆ ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযীসহ সিহাহ্'র ইমামগণ যেখানে কোন না কোন ইমামের তাক্বলীদ করেছেন, সেখানে ক্বোরআন-হাদীস সম্পর্কে সামান্য লেখাপড়া করে 'তাক্বলীদ' (মুজতাহিদ-ইমামের অনুসরণ) করা (মাযহাবের অনুসরণ করা)কে উপেক্ষা করে 'আহ্‌লে ক্বোরআন' বা 'আহ্‌লে হাদীস' হবার ইসলামী শরীয়তে কোন সুযোগ নেই। শাহ্ ওলী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভীও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاحَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هُلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَامَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ

"মানুষ হচ্ছে খনি, স্বর্ণ-রৌপ্যের বিভিন্ন খনির মত।[১০] যে কুফরের সময় উত্তম ছিলো, সে ইসলামী যুগেও উত্তম; যদি আলিম হয়ে যায়।[১১][মুসলিম] **১৯২ ॥ হযরত** ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "দু'জিনিস ব্যতীত অন্য কিছুতে ঈর্ষা বৈধ নয়:[১২] এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন, অতঃপর সে তা উত্তম খাতে ব্যয় করতে থাকে। আর অপরজন হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ ইল্‌ম দান করেছেন, অতঃপর সে তদনুসারে বিচারকার্য সমাধা করে এবং মানুষকে তা শিক্ষাদান করে।"[১৩][বোখারী, মুসলিম] **১৯৩ ॥ হযরত** আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়-[১৪]

চিশ্‌তী হচ্ছে বিভিন্ন রঙের; কিন্তু প্রত্যেকটিতে পাওয়ার একই ধরনের। একই সমুদ্র হতে সমস্ত নদ-নদীর সৃষ্টি; কিন্তু রাস্তার ভিন্নতার কারণে ওইগুলোর নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। অনুরূপ, ক্বাদেরী, চিশ্‌তী ইত্যাদি ওই সব বৃক্ষের নাম, যেগুলো থেকে এ ফয়য ও বরকত আসে।

১০. অর্থাৎ গড়নের দিক দিয়ে সকল মানুষ এক রকম, কিন্তু স্বভাব-চরিত্র এবং গুণাবলীতে ভিন্নতর। যেমন বাহ্যিকদৃষ্টিতে ভূমি একরকম, কিন্তু তার অভ্যন্তরে খনিগুলো বিভিন্ন ধরনের। ভাল মানুষ থেকে ভাল আচরণ এবং মন্দলোক থেকে মন্দ আচরণই প্রকাশ পায়।

১১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরের যুগে উত্তম চরিত্র ও সৎগুণাবলীর কারণে স্বীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন, তিনি যখন মুসলমান হয়ে ইল্‌ম শিখে নেন, তখন তিনি মুসলমানদের মধ্যেও সর্দারই হয়ে থাকেন। ইসলামের কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়; হ্রাস পায় না। ওই সব লোক ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাদা-আবৃত মুক্তা ছিলেন। মুসলমান হয়ে আলিম হলেন, ধুয়ে পরিস্কার হয়ে গেলেন। এ থেকে বুঝা গেলো যে, নওমুসলমানদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা জঘন্য অপরাধ। আর কাফিরদের সর্দার মুসলমান হলে মুসলমানদের সর্দারই থাকবেন। তাঁর পদমর্যাদা হ্রাস করা যাবে না।

১২. কোন নি'মাতপ্রাপ্তকে দেখে জ্বলে ওঠা, তার নি'মাতের ধ্বংস কামনা করা এবং তা নিজের জন্য কামনা করার নাম 'হিংসা' (حَسَد)। এটা অতি জঘন্য দোষ, যার কারণে শয়তান মার খেয়েছে; কিন্তু অন্যের মত নি'মাত নিজের জন্যও কামনা করার নাম 'ঈর্ষা' (غِبْطَة)। 'হিংসা' (حَسَد) নিঃশর্তভাবে হারাম। 'ঈর্ষা' (غِبْطَة) দু'ক্ষেত্রে জায়েয। আলোচ্য হাদীসে حَسَد(হিংসা) শব্দটি غِبْطَة (ঈর্ষা) অর্থে ব্যবহৃত।

১৩. অর্থাৎ বিত্তবান দানশীল, যাকে আল্লাহ্ ভাল কাজে সম্পদ ব্যয় করার তাওফীক্ব দিয়েছেন; অনুরূপ, ফয়যপ্রাপ্ত আলিম-ই দ্বীন, যাঁর ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, তারা দু'জনই ঈর্ষাযোগ্য। সুবহানাল্লাহ্! কতেক আলিমের ইলম এবং কিছু সংখ্যক দানশীলের সম্পদ দ্বারা মানুষ ক্বিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা অধমের এ কিতাব দ্বারা মুসলমানদেরকে উপকৃত করুন! আ-মীন!! স্মর্তব্য যে, নেকীর আশা পোষণকারীরা ইনশা- আল্লাহ্! ক্বিয়ামত দিবসে নেক্কারদের সাথেই থাকবেন।

১৪. اِنْسَان মানে মুসলমান। 'আমল' মানে নেক্কাজসমূহের সাওয়াব; যেমন পরবর্তী বিষয়বস্তু হতে স্পষ্ট হয়। সুতরাং এ হাদীসের উপর এ অভিযোগ নেই যে, আল্লাহ্‌র কোন কোন মাক্ববূল বান্দা কবরে নামায পড়েন ও ক্বোরআন তিলাওয়াত করেন। যেমনটি অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, ওইসব আমলে সাওয়াব নেই। (তাঁরা শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে পড়ে থাকেন)। এ জন্যই মৃতরা জীবিতদের কাছ থেকে সাওয়াব পৌঁছানোর আশা করে থাকে। যেমনটি

اِلَّامِنْ ثَلٰثَةٍ اِلَّامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُّؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَّسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

তিন ধরনের আমল ব্যতীত: একটি হচ্ছে- স্থায়ী সাদক্বাহ্, কিংবা ওই ইল্ম, যা দ্বারা উপকার পৌঁছতে থাকে, কিংবা ওই সুসন্তান, যে তার কল্যাণের জন্য দো'আ করতে থাকে।"[১৫] [মুসলিম]

১৯৪ || তাঁরই হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে দুনিয়াবী কষ্ট থেকে মুক্ত করবে, আল্লাহ্ তার থেকে ক্বিয়ামত-দিবসের মুসীবত দূর করে দেবেন।[১৬] আর যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তের অভাব লাঘব করবে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাব দূরীভূত করবেন।[১৭] আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন।[১৮]

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, সাওয়াব দেওয়া হয় জীবদ্দশায় কৃত আমলের ভিত্তিতে।

১৫. এগুলো হচ্ছে ওই তিন ধরনের আমল, যেগুলোর সাওয়াব মৃত্যুর পর অনায়াসেই পৌঁছতে থাকে। কেউ 'ঈসাল-ই সাওয়াব' করুক কিংবা না-ই করুক। 'সাদক্বাহ্-ই জারিয়াহ্' মানে 'আওক্বাফ' (اَوْقَافْ) তথা ওয়াক্ফসমূহ; যেমন- মসজিদ, মাদরাসা, ওয়াক্ফকৃত বাগান, যেগুলো থেকে মানুষ উপকার পেতে থাকে। অনুরূপ, ইল্ম মানে দ্বীনী কিতাবপত্র রচনা করা, দীনদার ছাত্র, যাদের কাজ দ্বারা দ্বীনী ফয়য-বরকত পৌঁছতে থাকে। 'নেক সন্তান' মানে আলিম কিংবা নেক আমলকারী সন্তান। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন- يَدْعُوْ (সে দো'আ করে)-এর শর্তারোপ উৎসাহমূলক।

অর্থাৎ পুত্রসন্তানের উচিত যেন পিতাকে উত্তম দো'আগুলোতে স্মরণ রাখে। এমনকি, নামাযেও মাতাপিতার জন্য দো'আ প্রথমে করবে, তারপর সালাম ফেরাবে। নতুবা সুসন্তান যদি দো'আ নাও করে, তবুও মাতাপিতা সাওয়াব পেতে থাকবেন।

স্মর্তব্য যে, আলোচ্য হাদীস ওই হাদীসের বিপরীত নয়, যা'তে এরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তমপন্থা উদ্ভাবন করবে, সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সাওয়াব পেতে থাকবে।" অথবা এরশাদ হয়েছে, "নামাযী সর্বদা সাওয়াব পেতে থাকবে।" কেননা, ওই সব আমল সাদক্বাহ্-ই জারিয়াহ্ অথবা উপকারী ইল্ম'র অন্তর্ভুক্ত।

১৬. অর্থাৎ তুমি কারো অস্থায়ী মুসীবত দূর করো, আল্লাহ্ তোমার স্থায়ী মুসীবত দূরীভূত করে দেবেন। তুমি মু'মিনের কাছে অস্থায়ী ও পার্থিব সুখ পৌঁছাও। আল্লাহ্ তোমাকে আখিরাতের স্থায়ী শান্তি দান করবেন। কেননা, ইহসানের বদলা ইহসানই। এ হাদীস শরীফ অতি ব্যাপক অর্থবোধক। কোন মুসলমানের পা থেকে কাঁটা অপসারণ করাও বৃথা যাবে না। হাদীসের মর্মার্থ এ নয় যে, শুধু ক্বিয়ামতেই প্রতিদান পাওয়া যাবে; বরং ক্বিয়ামত দিবসে তো প্রতিদান অবশ্যই মিলবে, যদিও কখনো কখনো দুনিয়াতেও পাওয়া যায়।

১৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্তকে ক্ষমা কিংবা সুযোগ দেবে, গরীবের অভাব দূর করবে, তাহলে ইন্শা- আল্লাহ্ দ্বীন ও দুনিয়ায় তার কঠিন সমস্যাদি সহজ হয়ে যাবে।

'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, এ বিধানে মু'মিন-কাফির সবাই অন্তর্ভুক্ত। বিপদগ্রস্ত কাফিরের বিপদ দূর করার জন্যও সাওয়াব পাওয়া যায়; বরং হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যভিচারিনী তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলো। আল্লাহ্ এ জন্য তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

১৮. হয়তো এভাবে যে, বস্ত্রহীনকে পরিধানের কাপড় দিয়েছে; অথবা এভাবে যে, তার গোপন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে না -এ শর্তে যে, প্রকাশ করার কারণে যদি দ্বীন বা জাতির ক্ষতি না হয়। নতুবা অবশ্যই প্রকাশ করে দেবে। কাফিরদের গুপ্তচরদেরকে ধরিয়ে দেবে। গোপন ষড়যন্ত্রকারীদের গোপনীয়তা ফাঁস করে দেবে। অন্যায়ভাবে হত্যার তদ্বীর করা হলে মযলূমকে এর সংবাদ দিয়ে দেবে। সচ্চরিত্র এক জিনিস, পার্থিব বিষয়াদি ও রাজনৈতিক কৌশল ভিন্ন জিনিস।

وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنْ عِنْدَهٗ

আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার আপন ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।[১৯] যে ব্যক্তি ইল্ম অন্বেষণের পথে অগ্রসর হবে, এর বরকতে আল্লাহ্ তার উপর বেহেশ্তের পথ সহজ করে দেবেন।[২০] আর এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যারা আল্লাহ্র ঘরগুলো থেকে কোন ঘরে ক্বোরআন পাঠ করার এবং পরস্পর ক্বোরআন শিক্ষা করার ও শিক্ষা দেবার জন্য একত্রিত হয়,[২১] কিন্তু তাদের উপর অন্তরের প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, আর আল্লাহ্র রহমত তাদেরকে আবৃত করে এবং ফিরিশ্তারা তাদেরকে ঘিরে রাখে।[২২] আর আল্লাহ্ তাদেরকে ওই দলের মধ্যে স্মরণ করেন, যাঁরা তাঁর কাছে থাকেন।[২৩]

---

১৯. এ শব্দগুলো অত্যন্ত ব্যাপকার্থক; দ্বীন ও দুনিয়ার বহুবিধ সাহায্য যার অন্তর্ভুক্ত- সাহায্য শারীরিকভাবে হোক কিংবা জ্ঞান বা সম্পদ ইত্যাদি দিয়ে হোক।

২০. অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বীনী ইল্ম শেখার জন্য কিংবা দ্বীনী বিষয়ে ফাত্ওয়া তলবের জন্য সফর করে বা কয়েক কদম হেঁটে আলিমের ঘরে যাবে, এর বরকতে মহান আল্লাহ্ দুনিয়ায় তার জন্য বেহেশ্তে যাবার কাজ সহজ করে দেবেন, মৃত্যুর সময় ঈমান নসীব করবেন, কবর ও হাশরের হিসাবে সফলতা এবং সহজে পুলসেরাত পার হবার ব্যবস্থা করবেন। 'বেহেশ্তের পথে'-এর মধ্যে এসব কিছুই রয়েছে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, দ্বীনী ইল্ম অর্জন করার জন্য সফর করা বড়ই সাওয়াবের কাজ। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ইল্ম তালাশ করার জন্য হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম'র নিকট সফর করে গিয়েছিলেন। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি হাদীস শরীফ সংগ্রহের জন্য এক মাসের পথ সফর করে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ক্বায়েস'র নিকট পৌঁছেন। [মিরক্বাত]

২১.এখানে 'আল্লাহ্র ঘর' মানে মসজিদ, দ্বীনী মাদরাসা এবং সম্মানিত সূফীগণের খানক্বাহসমূহ, যেগুলো আল্লাহ্র যিক্রের জন্য ওয়াক্ফকৃত। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের উপাসনালয়গুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ সেখানে তো মুসলমানের জন্য বিনা প্রয়োজনে যাওয়াও নিষিদ্ধ। 'দরসে ক্বোরআন' মানে ক্বোরআন শরীফের তিলাওয়াত, তাজবীদের বিধানাবলী শেখা। সুতরাং সরফ, নাহ্ভ, ফিক্বহ্, হাদীস ও তাফসীর ইত্যাদির শিক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি মিরক্বাত ইত্যাদিতে এরশাদ করা হয়েছে। এ জন্যই তিলাওয়াতের পরে 'দর্স' শব্দটি আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন।

২২. 'সাকীনাহ্' (سَكِيْنَةٌ) আল্লাহ্র একটি সৃষ্টি, যা অবতীর্ণ হলে অন্তরসমূহে প্রশান্তি আসে। তা কখনো মেঘের আকৃতিতে প্রকাশ পায় এবং দেখাও যায়; এর বরকতে অন্তর হতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ভয় দূরীভূত হয়। 'রহমত' মানে বিশেষ রহমত। যা যিক্রকারীকে যিক্রের সময় চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে থাকে। 'ফিরিশ্তাগণ' মানে ভ্রাম্যমান ফিরিশ্তাগণ, যারা যিক্রের মাহফিল-মজলিসগুলোর তালাশ করে বেড়ান। অন্যথায় আমল লিখক ও সংরক্ষক ফিরিশ্তাগণ সবসময় মানুষের সাথে থাকেন। সারকথা হচ্ছে- যেখানে সম্মিলিত আকারে আল্লাহ্র যিক্র হতে থাকে, সেখানে এ তিনটি রহমত অবতীর্ণ হয়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, একাকী যিক্র করার চেয়ে সম্মিলিতভাবে যিক্র করা উত্তম। জামা'আত সহকারে নামাযের মর্যাদা অধিক। কারণ, যদি একজনের কবূল হয়, তাহলে সকলের কবূল হয়।

২৩. অর্থাৎ ফিরিশ্তাদের জামা'আত। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে- ওই হাদীস, যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে একাকী স্মরণ করে আল্লাহ্ তাকে সেভাবে স্মরণ করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সম্মিলিতভাবে স্মরণ করে, আল্লাহ্ও তাকে ফিরিশ্তাদের জামা'আতে স্মরণ করেন।" ক্বোরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে-فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ (সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।[২:১৫২])। আর আল্লাহ্র ওই স্মরণের প্রভাব এ হয় যে, মাখলূক্বও এই বান্দাকে স্মরণ করতে থাকে। বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের মাযারসমূহে যিয়ারতকারীদের ভিড়, সেখানে

وَمَنْ بَطَّأَ بِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ

যাকে আমল পেছনে ফেলে দেয়, বংশমর্যাদা তাকে অগ্রগামী করতে পারে না।[২৪] [মুসলিম]

১৯৫ || তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ক্বিয়ামতের দিন প্রথমে যার ফায়সালা হবে সে হলো শহীদ।[২৫] তাকে হাযির করা হবে। তখন আল্লাহ্ তাকে স্বীয় নি'মাতগুলোর কথা স্বীকার করাবেন, সে তা স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন, "এরই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কী আমল করেছো?"[২৬] আরয করবে, "তোমার পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছি।" (আল্লাহ্) বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলেছো, তুমি তো এজন্যই জিহাদ করেছিলে যেন তোমাকে বীরপুরুষ বলা হয়, তাতো বলা হয়েছে।"[২৭] অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে। সুতরাং তাকে চেহারার উপর উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে,

আল্লাহ্‌র যিক্‌রের ধুম পড়ে যাওয়া ওই স্মরণেরই সুফল।

২৪. অর্থাৎ বংশমর্যাদা আমলের ঘাটতিকে পূর্ণ করে না। পংক্তি

بندۂ عشق شدی ترکِ نسب کن جامی
کہ دریں راہ فلاں ابنِ فلاں چیزے نیست

অর্থ: ওহে জামী! আশিক্ব বান্দা হও, বংশীয় মর্যাদার চিন্তা-ভাবনা পরিহার করো; কারণ, ইশক্বের পথে 'অমুকের পুত্র অমুক' কোন কিছুই নয়।

তোমরা কি জানো না, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম'র কিশ্‌তিতে কুকুর-বিড়ালের স্থান ছিলো, কিন্তু তাঁর কাফির পুত্র কেনানের স্থান ছিলো না। সারকথা হচ্ছে- বংশমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি যেন আমল থেকে বেপরোয়া হয়ে না যায়। এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, 'বংশমর্যাদা কিছুই নয়।' এর বিশ্লেষণ আমার পুস্তিকা 'আল্ কালামুল ক্বূল ফী ত্বাহারাতে নাসাবির রসূল'-এ দেখুন।

মু'মিনকে রসূলের বংশধর হওয়া উপকৃত করবে। সমগ্র দুনিয়ার পুণ্যবতী মহিলাগণ হযরত ফাতিমা যাহরার পবিত্র ক্বদমের মর্যাদায়ও পৌঁছুতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন- اَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে তোমাদের যুগে পুরো দুনিয়ার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[২:৪৭]) বনূ ইসরাঈল তদানীন্তনকালীন সমগ্র বিশ্বের উপর উত্তম হওয়ার কারণ এটাই ছিলো যে, তারা নবীগণের বংশধর। সুতরাং আলোচ্য হাদীস কোন আয়াতের বিরোধী নয়।

২৫. এটা 'তুলনামূলক প্রথম' (اَوَّلِيَّتْ اِضَافِى)। 'প্রকৃত প্রথম' নয়। অর্থাৎ রিয়াকারদের (লোকদেখানো) মধ্যে প্রথমে রিয়াকার শহীদের ফায়সালা হবে। সুতরাং এ হাদীস ওই হাদীসের বিরোধী নয়, যাতে এরশাদ হয়েছে- প্রথমে নামাযের হিসাব হবে।

অথবা প্রথমে অন্যায় হত্যার হিসাব হবে। এবাদতসমূহের মধ্যে নামাযের এবং পার্থিব বিষয়াদির মধ্যে হত্যার হিসাব হবে। রিয়ার মধ্যে এরূপ শহীদের ফায়সালা প্রথমে হবে। 'শহীদ' মানে ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে। (অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে মুজাহিদ। যার উদ্দেশ্য ছিলো বীরত্ব প্রকাশ করা।)

২৬. অর্থাৎ আমি তোমাকে অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য অসংখ্য নি'মাত দান করেছি। তুমি কি পুণ্য করেছো? বুঝা গেলো যে, নেক্ কাজগুলো আল্লাহ্‌র নি'মাতের শোকরিয়া জ্ঞাপনও বটে।

২৭. অর্থাৎ তোমার জিহাদ ও শাহাদাতের বদলা তো এটাই পেয়ে গিয়েছিলে যে, লোকেরা তোমাকে বাহ্‌বা দিয়েছে। কেননা, তুমি ওই উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছিলে, দ্বীন ইসলামের খিদমতের জন্য নয়।

বুঝা গেলো যে, যদি জিহাদে বিজেতার মধ্যে নিষ্ঠা থাকে, তাহলে মানুষের বাহ্‌বা'র কারণে সাওয়াব হ্রাস পাবে না। এটা তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পার্থিব পুরস্কার। সাহাবা-ই কেরাম এবং স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সুনামের চর্চা উভয় জগতে চলছে।

স্মর্তব্য যে, শুধু গনীমত কিংবা রাজ্য জয়ের উদ্দেশে জিহাদ করার পরিণামও এ ধরনের। জিহাদ শুধু আল্লাহ্- রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা চাই।

حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَءَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَءْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَءْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَقَارِئٌ فَقَدْقِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَاعَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَاتَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَالَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَّادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ بِهٖ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِىَ فِى النَّارِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

শেষ পর্যন্ত দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।[২৮] আর যে ব্যক্তি ইল্ম শিখেছে, শিক্ষাদান করেছে এবং ক্বোরআন পড়েছে তাকে হাযির করা হবে। তখন আল্লাহ্ স্বীয় নি'মাতসমূহ তাকে স্বীকার করাবেন। সে স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন,"তুমি এর শোকরিয়ায় কী আমল করেছো?" সে আরয করবে, "ইল্ম শিখেছি এবং শিখিয়েছি, তোমার পথে ক্বোরআন পড়েছি।" আল্লাহ্ বলবেন, "তুমি মিথ্যে বলেছো। তুমি এ জন্যই ইল্ম শিখেছো যেনো তোমাকে আলিম বলা হয়।[২৯] এ জন্য ক্বোরআন পড়েছিলে যেন তোমাকে ক্বারী বলা হয়, তাতো বলা হয়েছে।" তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে। তখন তাকে চেহারার উপর উপুড় করে নিয়ে যাওয়া হবে, শেষ পর্যন্ত দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।[৩০] আর ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ প্রাচুর্য দান করেছেন এবং সব ধরনের সম্পদ দান করেছেন, তাকে হাযির করা হবে। তাকে প্রদত্ত নি'মাতসমূহ স্বীকার করানো হবে, সে তা (স্বীকার) করবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, "তুমি এর শোকরিয়ায় কী করেছো?" সে আরয করবে, "আমি এমন কোন পথ ছাড়িনি, যেখানে ব্যয় করা তোমার পছন্দনীয়, কিন্তু আমি সেখানে তোমারই উদ্দেশে ব্যয় করেছি।" তিনি বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলেছো, তুমি এ কাজ এ জন্য করেছিলে যেন তোমাকে দানশীল বলা হয়। তাতো বলা হয়েছে।" তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন তাকে চেহারার উপর উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।[৩১] [মুসলিম]

২৮. অর্থাৎ অতি তুচ্ছভাবে মৃত কুকুরের মত পায়ে রশি বেঁধে জাহান্নামের তীর থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নামের গভীরতা আসমান-যমীনের দূরত্ব থেকে কোটি কোটি গুণ বেশি। আল্লাহ্রই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

২৯. তোমার এ সমস্ত পরিশ্রম দ্বীনের খেদমতের জন্য ছিলো না; বরং ইলমের মাধ্যমে সম্মান ও সম্পদ অর্জনের জন্য ছিলো, তা তো তোমার অর্জিত হয়েছে। আমার নিকট কী চাও? এ হাদীস শরীফ দেখে কোন কোন আলিম স্বীয় কিতাবে নিজের নামও লিখেন নি। যাঁরা লিখেছেন তাও খ্যাতি অর্জনের জন্য নয়, বরং মানুষের দো'আ পাবার জন্য।

৩০. বুঝা গেলো যে, যেমনিভাবে নিষ্ঠাপূর্ণ নেক আমল বেহেশ্ত পাবার মাধ্যম, তেমনি রিয়া বিশিষ্ট (লোক দেখানো) নেকী জাহান্নাম ও লাঞ্ছনা অর্জনের কারণ।

৩১. এখানে ৪টি মাসআলা স্মরণ রাখতে হবে: এক. এখানে রিয়াকার (লোকদেখানো) শহীদ, আলিম এবং দানশীল (৩ প্রকার) ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, তারা অত্যন্ত উত্তম আমল করেছিলো। যখন এ আমলগুলো রিয়ার কারণে বরবাদ হয়ে গেলো, তখন অন্যান্য আমলের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। লোকদেখানো হজ্জ, যাকাত এবং নামাযেরও একই অবস্থা হবে।

দুই. কোন কোন রিয়াকার এমনও আছে, যারা রিয়ার জন্যই নেককাজ করে থাকে। যদি তাদের প্রশংসা করা না হয়, তাহলে তারা নেকী মোটেই করে না। কেউ কেউ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَايَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهٗ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَّقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَآءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৯৬ || হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্ ইল্‌মকে টেনে তুলে নেবেন না যে, তা বান্দাদের থেকে ছিনিয়ে নেবেন; বরং আলিমদের ওফাতের মাধ্যমে ইল্‌ম তুলে নেবেন[৩২] শেষ পর্যন্ত যখন কোন আলিম থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদেরকে নেতা বানাবে, যাদের থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হবে। তারা ইল্‌ম ছাড়া ফাত্ওয়া দেবে। ফলে, নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।[৩৩] [বোখারী, মুসলিম]

এমনও রয়েছে, যারা লোকদেখানোর জন্য ভালভাবে আমল করে, একাকী অবস্থায় দায়সারাভাবে আমল করে। কেউ কেউ এমন রয়েছে, যারা একাকী ও লোকালয়ে একই ধরনের আমল করে; কিন্তু সুনাম করলে খুশী হয়। এখানে প্রথম প্রকারের রিয়াকার বুঝানো উদ্দেশ্য। অপর দু'প্রকার রিয়াকার মূল নেকীর সাওয়াব পাবে; কিন্তু অর্ধেক পাবে।

তিন. এ হাদীসে কানূন (খোদায়ী বিধান) এবং আল্লাহ্‌র ন্যায়-বিচারের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ভিন্ন জিনিস। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ

"অতঃপর মহান আল্লাহ্ তাঁদের পাপসমূহকে পুণ্যে বদলে দেবেন"-[২৫:৭০]

সুতরাং এ হাদীস শরীফ ক্ষমা প্রদর্শনের আয়াত ও হাদীসগুলোর বিরোধী নয়। পংক্তি-

عدل کرے تو تھر تھر کانپیں اونچی شانوں والے
فضل کرے تو بخشے جاویں مجھ جیسے منہ کالے

অর্থাৎ আল্লাহ্ বিচার করলে মহা মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও থরথর করে কাঁপবেন, আর অনুগ্রহ করলে আমার মত কালোমুখ (পাপী)কেও ক্ষমা করা হবে।

চার. মু'মিনের এ সব শাস্তি নির্জনে হবে; প্রকাশ্যে নয়। আল্লাহ্ তাকে অসম্মান ও অবমাননা থেকে রক্ষা করবেন। অসম্মান ও লজ্জা শুধু কাফিরদের জন্য হবে। এটা পবিত্র ক্বোরআনের বহু আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। সম্মানিত সূফীগণ বলেন, "রিয়ার ভয়ে আমল ত্যাগ করবে না। আমল করতে থাকো, কখনো নিষ্ঠা অর্জিত হয়েই যাবে।" মাছির ভয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিও না।

৩২. এটা হাদীসের পরিশিষ্ট, যাতে বলা হয়েছে যে, ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হলে ইল্‌ম ওঠে যাবে, মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে। অর্থাৎ ইল্‌ম উঠে যাবার মাধ্যম এটা হবে না যে, মানুষ পঠিত বিষয় ভুলে যাবে, বরং আলিমগণ ওফাত পেতে থাকবেন। পরবর্তীতে আলিম তৈরী হবে না; যেমনটি বর্তমানে ঘটছে।

এক শ্রেণীর মানুষ ইংরেজী শিক্ষার পেছনে ঘুরপাক খাচ্ছে; রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দ্বীন এয়াতীম হয়ে র'য়ে গেছে। ইল্‌ম দ্বারা ইলমে দ্বীন বুঝানো উদ্দেশ্য।

৩৩. 'নেতা' মানে এখানে বিচারক, মুফতী, ইমাম ও পীর-মাশাইখ, যাঁদের দায়িত্বে দ্বীনী কার্যাবলী সম্পৃক্ত থাকে।

অর্থাৎ ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো মূর্খরাই দখল করে নেবে এবং নিজের মুর্খতা প্রকাশ পাওয়া পছন্দ করবে না। মাসআলা জিজ্ঞেস করলে এটা বলবে না যে, আমি জানি না; বরং ইল্‌ম ছাড়া মনগড়াভাবে ভুল মাসআলা বলে দেবে। এর পরিণাম সুস্পষ্ট। অজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর জীবন কেড়ে নেয় এবং অজ্ঞ মুফ্তী এবং খতীব ইত্যাদিও ঈমান নষ্ট করে।☆

☆ বর্তমানে আলোচ্য হাদীস শরীফের বাস্তবতা মধ্যাহ্নের সূর্যের ন্যায় প্রকাশ পাচ্ছে। আলিমদের মধ্যে শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সঠিক গবেষণা ছাড়া সিদ্ধান্ত দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। এমনকি আল্লাহ্ ও রসূলের শানে মানহানিকর ভ্রান্ত উক্তি করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। অধিকাংশ পীর-মাশাইখের দরবারগুলো ইলমে দ্বীনশূন্য হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এ সমস্যা থেকে উত্তরণের তাওফীক্ব দিন।

وَعَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِيْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُّ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اِنَّهٗ يَمْنَعُنِيْ مِنْ ذٰلِكَ اَنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّيْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّاٰمَةِ عَلَيْنَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلٰثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَاِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلٰثًا ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৯৭ ॥ হযরত শাক্বীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত,**[৩৪] তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রতি বৃহস্পতিবার ওয়ায করতেন।[৩৫] এক ব্যক্তি আরয করলো, "হে আবূ আবদুর রহমান! আমার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, আপনি যদি প্রতিদিন ওয়ায করতেন!" তিনি বললেন, "এ ক্ষেত্রে আমার সামনে বাধা হচ্ছে- আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করা পছন্দ করছি না।[৩৬] আমি তোমাদের প্রতি তেমনি লক্ষ্য রাখি, যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ওয়ায করার সময় আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন- আমাদের বিরক্তির আশঙ্কায়।"[৩৭] [বোখারী ও মুসলিম] **১৯৮ ॥ হযরত আনাস** রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত,** তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন কোন শব্দ বলতেন, তখন তা তিন বার বলতেন, যেন তা বুঝে নেওয়া যায়।[৩৮] আর যখন কোন গোত্রের নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে সালাম করতেন, তখন তিনবার সালাম করতেন।[৩৯] [বোখারী]

৩৪. তাঁর নাম শাক্বীক্ব ইবনে আবূ সালমাহ্। উপনাম আবূ ওয়া-ইল। তিনি বনূ আসাদ গোত্রের লোক। তিনি মহামর্যাদা সম্পন্ন তাবে'ঈ। তিনি হুযূরের যমানা পেয়েছেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করতে পারেন নি। তিনি হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মত মর্যাদাবান সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বিশিষ্ট সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত এবং হাজ্জাজ ইবনে ইয়ূসুফের সময় ওফাত পান।

৩৫. এ থেকে বুঝা গেলো যে, নেক আমলের জন্য দিন ও সময় নির্ধারণ করা শির্ক বা হারাম নয়; বরং সুন্নাত-ই সাহাবা। এ জন্যই বর্তমানে দ্বীনী মাদরাসাগুলোর পরীক্ষা ও বন্ধের জন্য দিন ও মাস এবং শিক্ষাদানের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়। সুতরাং মীলাদ শরীফ, ফাতিহা, ওরস ইত্যাদির জন্য দিন নির্দিষ্ট করা জায়েয; এটাকে হারাম বলা ভুল। মিরক্বাত প্রণেতা বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ বৃহস্পতিবারকে ওয়াযের জন্য এ কারণে নির্ধারণ করেছেন যে, এ দিন জুমু'আর সাথে সম্পৃক্ত; এর বরকত জুমু'আহ্ পর্যন্ত পৌঁছুবে। কেউ কেউ প্রতি বৃহস্পতিবার মীলাদ শরীফ এবং মৃতদের ফাতিহাখানী করে থাকেন; তাদের দলীল হচ্ছে এ হাদীস।

৩৬. অর্থাৎ প্রতিদিন ওয়ায করলে তোমরা বিরক্ত হয়ে যাবে এবং এ আগ্রহ ও উৎসাহ হ্রাস পেতে থাকবে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, এতো দীর্ঘ ওয়াযও না করা চাই, যাতে মানুষ ভয় পেয়ে যায়; বরং তেমনি করবে যেন ইল্ম ও ওয়াযের অমর্যাদা না হয়।

৩৭. অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও আমাদেরকে সব সময় এবং প্রতিদিন ওয়ায শুনাতেন না, যেন আমরা বিরক্ত না হই। সম্মানিত সূফীগণ বলেন, যে আলিম কিংবা পীর মানুষের সম্মুখে সর্বদা 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' করতে থাকে, সে ধোঁকাবাজ। হুযূরের মজলিস শরীফে দুনিয়াবী আলাপ-আলোচনাও করা হতো।

৩৮. 'শব্দ' দ্বারা পূর্ণ বিষয় বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মাসআলা বর্ণনা করার সময় এক একটি মাসআলা তিন বার এরশাদ করতেন, যাতে মানুষের হৃদয়ঙ্গম হয়ে যেতো। প্রত্যেক বাক্য উদ্দেশ্য নয়। এ জন্য মিশকাত প্রণেতা আলোচ্য হাদীসটি 'কিতাবুল ইল্ম'-এ এনেছেন।

৩৯. এক সালাম অনুমতি লাভের জন্য, দ্বিতীয়টি সাক্ষাতের জন্য, তৃতীয়টি বিদায়ের। এ হাদীস এর বিরোধী নয় যে, "হুযূর সাক্ষাতের সময় একবার সালাম করতেন।" কেননা, সেখানে শুধু সাক্ষাতের সালাম বুঝানো উদ্দেশ্য। এ থেকে

وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ ِالْاَنْصَارِىِّ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهٗ اُبْدِعَ بِىْ فَاحْمِلْنِىْ فَقَالَ مَاعِنْدِىْ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا اَدُلُّهٗ عَلٰى مَنْ يُّحْمِلُهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِفَاعِلِهٖ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ جَرِيْرٍ قَالَ كُنَّا فِىْ صَدْرِالنَّهَارِعِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَآءَهٗ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُّجْتَابِى النِّمَارِاَوِالْعَبَآءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَبَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُّضَرَ

১৯৯ || হযরত আবূ মাস্'উদ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[৪০] তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে হাযির হলেন, বললেন, "আমার উট দুর্বল হয়ে পড়েছে, আমাকে একটি আরোহণের পশু দিন!" তখন হুযূর এরশাদ করলেন, "আমার নিকট নেই।"[৪১] এতে এক ব্যক্তি বললেন, "এয়া রসূলাল্লাহ! আমি তাকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলবো, যে তাকে আরোহণের পশু দিয়ে দেবে।" তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি কাউকে সৎকাজের দিকনির্দেশনা দেবে, সেও তা পালনকারীর ন্যায় সাওয়াব পাবে।"[৪২] [মুসলিম]

২০০ || হযরত জারীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[৪৩] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা অতি প্রত্যুষে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বরকতময় সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর খিদমতে একদল লোক আসলো, যাঁরা খোলাদেহ ও কম্বল পরিহিত ছিলো, তলোয়ারসমূহ গলায় ঝুলন্ত ছিলো।[৪৪] তাঁদের প্রায় সবই, বরং সকলেই মুদ্বার গোত্রীয় ছিলো।

বুঝা গেলো যে, ঘরে প্রবেশের অনুমতির জন্য চিৎকার করবে না, দরজায় অধিক করাঘাত করবে না; বরং শুধু এটা বলবে, "আস্ সালামু আলায়কুম, আমি কি আসতে পারি?" এটাও বুঝা গেলো যে, আগমনকারী ও প্রস্থানকারী সালাম করবে, যদিও পরিত্যক্ত বাড়ি হয়।

৪০. তাঁর নাম ওক্ববা ইবনে 'আমর। উপনাম 'আবূ মাস'উদ আনসারী'। তিনি বদরী অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে শরীক হন। কিংবা ওই বস্তিতে কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় আক্বাবার বায়'আতে শরীক ছিলেন। কূফায় অবস্থান করেছিলেন। হযরত আলী মুরতাদ্বার খিলাফতকালে ওফাত পান।

৪১. এ থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো:

এক. প্রয়োজনের সময় কিছু চাওয়া জায়েয, বিশেষত হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু চাওয়াতো প্রত্যেকের জন্য গর্বের বিষয়।

দুই. যখন কোন জিনিস মওজূদ থাকে, তখন প্রার্থীকে 'তা নেই' বলা কৃপণতা নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বড় দানশীল ও দাতা। কিন্তু ওই সময় 'নেই' বলা মাসআলা প্রকাশ করার জন্য।

অর্থাৎ ঋণ নিয়ে দান করো না। যে সকল বর্ণনায় রয়েছে যে, "হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনো 'না' বলেন নি, তার মর্মার্থ হয়তো এটা যে, থাকা সত্ত্বেও নেই বলেন নি।

অথবা কখনো একথা বলেন নি, 'তোমাকে দেব না।' সুতরাং হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী নয়।

৪২. অর্থাৎ নেক কাজ নিজে সম্পন্নকারী, অপরের দ্বারা যে সম্পন্ন করায়, যে তা করতে বলে এবং সুপরামর্শদাতা -সবাই সাওয়াবের উপযোগী; সুতরাং তুমিও সাওয়াব পাবে।

৪৩. তাঁর নাম জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বাজালী। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী, অত্যন্ত সুন্দর ও সচ্চরিত্রবান ছিলেন। হযরত ওমর ফারূক্ব তাঁকে ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম'র সাথে উপমা দিতেন। হুযূরের ওফাতের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, হুযূরের ওফাত শরীফের চল্লিশ দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। প্রথমে কিছুদিন তিনি কূফায় অবস্থান করেন। ক্বার ক্বোসিয়া নামক স্থানে ৫১ হিজরীতে ওফাত পান। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

৪৪. অর্থাৎ দরিদ্রতার কারণে তাঁদের কাছে একটি করে কম্বল ছাড়া শরীর ঢাকার অন্য কোন কাপড় ছিলো না। এতদসত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে জিহাদের প্রতি অতি আগ্রহ ছিলো; এ কারণে প্রত্যেকেরই সাথে তলোয়ার ছিলো।

فَتمعَرَّوَجهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمَّا رَاى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَمَرَ بِلَالًا
فَاَذَّنَ وَاَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ ﴿ يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ
مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ﴾ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ﴿ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾ وَالْاٰيَةَ الَّتِىْ
فِى الْحَشْرِ ﴿ اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِيْنَارِهٖ
مِنْ دِرْهَمِهٖ مِنْ ثَوْبِهٖ مِنْ صَاعِ بُرِّهٖ مِنْ صَاعِ تَمْرِهٖ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
قَالَ فَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهٗ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ

তাদের অভাব দেখে হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চেহারা মুবারকের রঙ বদলে গেলো।[৪৫] সুতরাং তিনি ঘরের ভিতর তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তারপর বাইরে তাশরীফ আনলেন। হযরত বেলালকে আদেশ দিলেন। তিনি আযান ও তাকবীর বললেন। তারপর নামায পড়লেন। তারপর খোৎবা দিলেন।[৪৬] এরশাদ করলেন, "হে লোকেরা! স্বীয় রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন।" আয়াতের শেষাংশ 'রাক্বী-বান' পর্যন্ত পাঠ করলেন।[৪৭] আর ওই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যা সূরা হাশরে রয়েছে, "আল্লাহকে ভয় করো এবং মানুষ যেন এ চিন্তা-ভাবনা করে যে, সে আগামীকালের জন্য কী পেশ করেছে?"[৪৮] মানুষ স্বীয় দীনার ও দিরহাম, স্বীয় কাপড়, গম ও খেজুরের সা' (পরিমাপক পাত্র) থেকে যা কিছু দান করবে, এমনকি তিনি এরশাদ করলেন, "যদিও খেজুরের একাংশ হয়।"[৪৯] বর্ণনাকারী বলেন, এক আনসারী একটি থলে আনলেন, যার ভারে তার হাত অক্ষম হবার উপক্রম হয়েছিলো, বরং অক্ষম হয়ে পড়েছিলো।[৫০]

৪৫. অর্থাৎ তাঁদের দরিদ্রতার কারণে হুযূর করীমের অন্তর মুবারক খুব ব্যথিত হয়েছে; যার প্রভাব চেহারা-ই আন্ওয়ারে প্রকাশ পায়। তা হবেও না কেন? যিনি অসহায় ও গরীবদের আশ্রয়স্থল, আমরা গরীবদের উপর তিনি দুঃখিত না হলে কে দুঃখিত হবেন? পংক্তি-

من از بے نوائی نیم روئے زرد — غم بے نوایاں رخم زرد کرد

অর্থাৎ "অসহায়ত্ব দেখে আমার চেহারার অর্ধেক হলদে হয়ে গেছে, আর অসহায়দের দুঃখ দেখে আমার পূর্ণ চেহারাই হলদে হয়ে গেছে।" এটা এ আয়াত-عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ (অর্থাৎ তোমাদের কষ্টে পড়া (রসূলের নিকট) কষ্টদায়ক, (তিনি) তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী।[৯:১২৮])-এর তাফসীর

৪৬. এ ওয়ায মানুষকে দান করার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য ছিলো। ওই সময় হুযূরের পবিত্র আস্তানা শরীফে সম্ভবতঃ কিছু মওজুদ ছিলো না।

৪৭. এ আয়াত যথাস্থানে তিলাওয়াত করেছেন। অর্থাৎ সকল ধনী-দরিদ্র পরস্পর ভাই। কেননা, সকলেই হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র সন্তান। ধনীর উচিত দরিদ্র ভাইয়ের সাহায্য করা। 'মিরক্বাত' কিতাবে এ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত হাওয়া আলায়হাস্ সালাম'র বিশ বারে ৪০টি সন্তানের জন্ম হয়- ২০জন পুত্র, ২০টি কন্যা।

৪৮. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের জন্য নেক আমল; বিশেষতঃ সাদক্বাহ-খয়রাত করতে থাকো।

৪৯. কেননা, মহান রবের দরবারে দান-খায়রাতের পরিমাণ দেখা হয় না, বরং দাতার নিষ্ঠাই দেখা হয়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যদি গরীব মানুষ স্বীয় প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে কিছু দান করে, তাহলে সাওয়াবের উপযুক্ত হবে। তবে শর্ত হচ্ছে- যদি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি এবং হক্বদারদের হক্ব বিনষ্ট না করে এবং পরে নিজেও ভিক্ষা না করে।

৫০. অর্থাৎ থলের মধ্যে এতো ফসল ছিলো যে, সেটার বোঝা আনসার লোকটি সহ্য করতে পারছিলেন না এবং অধিক বোঝার কারণে থলেটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গেলো। প্রকাশ থাকে যে, সেটা সম্ভবত যব কিংবা গম ইত্যাদির বড় থলে ছিলো। যেমনটি পরবর্তী বিষয়বস্তু দ্বারা বুঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ নবী-রসূলের দরবারে তখন ফসল ও কাপড়ের স্তূপ হয়ে গিয়েছিলো। কোন কোন ব্যাখ্যাকারী লিখেছেন যে, সেটা টাকার থলে ছিলো, যাতে দিরহাম ও দীনার ভর্তি

ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَّثِيَابٍ حَتّٰى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَاَنَّهٗ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ وَّمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অতঃপর লোকেরা সারিবদ্ধ হয়ে গেলো। এমনকি আমি খাদ্য ও পোষাকের স্তূপ দেখলাম।[৫১] এমনকি আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চেহারা-ই আন্ওয়ার প্রত্যক্ষ করলাম যে, তা চমকাচ্ছিলো; যেন তাতে স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে।[৫২] তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম পন্থা আবিস্কার করবে, তার জন্য স্বীয় আমল এবং ওই সব লোকের আমলসমূহের সাওয়াব রয়েছে, যারা তদনুযায়ী আমল করবে;[৫৩] এতে তাদের সাওয়াব হ্রাস পাবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে মন্দপন্থা আবিস্কার করবে, তার জন্য স্বীয় বদ-আমলের গুনাহ্ রয়েছে এবং তাদের বদ-আমলেরও, যারা পরবর্তীতে ওই অনুসারে আমল করবে। এতে তাদের গুনাহ্ হ্রাস পাবে না।[৫৪] [মুসলিম]

ছিলো; কিন্তু এটা বাস্তবতা বিরোধী। স্মর্তব্য যে, এ আনসারীই সর্বপ্রথম এ দানের থলে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর তাঁকে দেখে অন্যরাও। এ জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওই প্রশংসা করেছেন, যা সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

৫১. যেগুলো দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করার জন্য সঞ্চিত হয়েছিলো। যেহেতু ওই মিসকীনদের পুরো একটি দল ছিলো, সেহেতু এত বেশি সাদক্বাহ্ করা হয়েছিলো। এ থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো: **এক.** প্রয়োজনের সময় চাঁদা নেওয়া জায়েয। **দুই.** মসজিদে অন্যের জন্য চাওয়া জায়েয। যে সব হাদীসে মসজিদে ভিক্ষা করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেগুলোতে নিজের জন্য ভিক্ষা করা উদ্দেশ্য। সুতরাং আলোচ্য হাদীস ওই হাদীসের পরিপন্থী নয়।

৫২. দরিদ্রদের অভাব দূর করা এবং সাহাবীদের দানের উপর আনন্দের কারণে। বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের নেক কাজের উপর খুশী হন, আর এও যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্-রসূলকে সন্তুষ্ট করতে চায়, সে যেন দরিদ্রদের অভাব দূর করে।

স্মর্তব্য যে, যে রূপার টুকরোর উপর স্বর্ণের কারুকার্য করা হয়, কিংবা যে চামড়া বা কাপড়ে স্বর্ণের কাজ করা হয়, সেটাকে আরবীতে 'মুযহাবাহ' (مُذْهَبَةٌ) বলা হয়। এখানে প্রথম অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য।

৫৩. অর্থাৎ ভাল কাজের উদ্ভাবক সমস্ত আমলকারীর সমান প্রতিদান পাবে। সুতরাং যারা ইলমে ফিক্বহ্, হাদীস শাস্ত্র, মীলাদ শরীফ, বুযুর্গানে দ্বীনের ওরস্, উত্তম যিকরের মজলিসসমূহ, ইসলামী মাদ্রাসা এবং তরীক্বতের সিলসিলাহ্ উদ্ভাবন করেছেন, তাঁরা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সাওয়াব পেতেই থাকবেন।

এখানে ইসলামী উত্তম বিদ্'আতসমূহ (নতুন কার্যাদি) উদ্ভাবন করার উল্লেখ করা হয়েছে; ছেড়ে দেওয়া সুন্নাতগুলোর পুনর্জীবিত করার কথা নয়। যেমনটি পরবর্তী বিপরীত জিনিসের উল্লেখ করা থেকে বুঝা যাচ্ছে। এ হাদীস শরীফ দ্বারা 'বিদ্'আত-ই হাসানাহ' (নব উদ্ভাবিত ভালকার্যাদি) পুণ্যময় হওয়া উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়।

৫৪. এ হাদীস শরীফ ওই সকল হাদীসের ব্যাখ্যা, যেগুলোতে বিদ্'আতের কুফলসমূহ বর্ণিত হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেলো যে, বিদ্'আত-ই সায়্যিআহ্ মন্দ এবং ওই সকল হাদীসের অর্থ এটাই। এ হাদীস শরীফ বিদ্'আত দু'প্রকার হবার কথা বুঝাচ্ছে- 'বিদ্'আত-ই হাসানাহ্' ও 'বিদ্'আত-ই সায়্যিআহ্'।

এতে কোন প্রকার ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। ওই সব লোকের জন্য আফসোস! যারা এ হাদীস শরীফ থেকে চোখ বন্ধ করে প্রত্যেক বিদ্'আতকে মন্দ বলে থাকে। অথচ নিজেরা হাজার হাজার বিদ্'আত করে। বিদ্'আতের গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ এবং সেটার প্রকারভেদ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاتُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِّنْ دَمِهَا لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ مُعٰوِيَةَ لَايَزَالُ مِنْ اُمَّتِىْ فِىْ بَابِ ثَوَابِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ كَثِيْرِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِى الدَّرْدَآءِ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَآءَهٗ رَجُلٌ فَقَالَ يَااَبَا الدَّرْدَآءِ اِنِّىْ جِئْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَدِّثُهٗ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ

২০১ || হযরত ইবনে মাস্‌'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে কোন মানুষকেই অন্যায়ভাবে হত্যা কর হোক না কেন, তার এ অবৈধ রক্তপাতে অবশ্যই হযরত আদম আলায়হিস সালাম'র প্রথম পুত্রের অংশ থাকবে। কেননা, সে-ই প্রথমে অন্যায়ভাবে হত্যার কুপ্রথা উদ্ভাবন করেছে।"[৫৫] [বোখারী, মুসলিম] আর আমি হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস لَايَزَالُ مِنْ اُمَّتِىْ الخ 'বাবু সাওয়া-বে হা-যিহিল উম্মাহ্'-এ ইন্‌শা-আল্লা-হু তা'আ-লা- বর্ণনা করবো।[৫৬]

◆দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ◆

২০২ || হযরত কাসীর ইবনে ক্বায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবুদ্দারদার সাথে দামেস্কের জামে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম।[৫৭] তখন তাঁর কাছে একজন লোক আসলো এবং বললো, হে আবূদ্দারদা! আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে আপনার কাছে শুধু একটি হাদীসের জন্য এসেছি। আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি হুযূরের সূত্রে ওই হাদীস বর্ণনা করে থাকেন।[৫৮]

৫৫. অর্থাৎ ক্বাবীল, যে নিজের ভাই হাবীলকে স্বীয় বোন আক্বলীমার মোহে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলো।
স্মর্তব্য যে, হত্যার অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা অন্যায়ভাবে হত্যার নামান্তর। হত্যাকারী, মুরতাদ্দ, (বিবাহিত) যিনাকারী ও ফ্যাসাদকারী ইত্যাদিকে, যাদেরকে শরীয়ত মতে হত্যা করা ওয়াজিব, বিচারক কর্তৃক হত্যা করা সাওয়াবের কাজ।

৫৬. অর্থাৎ এ হাদীস 'মাসাবীহ'তে এ স্থানে ছিলো; কিন্তু আমি সামঞ্জস্য থাকার কারণে ওই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি।

৫৭. দামেস্ক সিরিয়ার রাজধানী। কাসীর ইবনে ক্বায়স তাবে'ঈ। তিনি হযরত আবুদ্ দারদা'র সাহচর্য লাভ করেছেন।

৫৮. প্রকাশ থাকে যে, ওই শিক্ষার্থী হাদীসের 'মতন' বা বচনগুলো শুনেছিলেন। এ আগ্রহে এখানে এসেছেন যে, সাহাবীর মুখ থেকে শুনবেন যেন বরকত ও অধিকতর আস্থা অর্জিত হয়। এ অর্থও হতে পারে যে, তিনি হাদীসের 'মতন' (বচন) শুনেন নি। সংক্ষেপে জেনেছিলেন যে, হযরত আবুদ্ দারদা অমুক বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেন। যেহেতু 'মাদীনা' শব্দের অর্থ 'শহর'; সেহেতু 'মাদীনাতুর্ রসূল' বলেছেন। অর্থাৎ আমি মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে এসেছি। এ থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো:
এক. ইল্‌ম অন্বেষণের জন্য সফর করা বুযুর্গদের বরং নবীগণের সুন্নাত। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ইল্‌ম অন্বেষণের জন্য দীর্ঘ সফর করে হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম'র কাছে তাশরীফ নিয়ে যান।
দুই. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শুধু 'আর-রসূল' (اَلرَّسُوْل) বলা যাবে যখন আলামত দ্বারা বুঝা গেলো যে, এখানে 'হুযূর' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কথা বুঝানো উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ (হে রসূল!) আরো ইরশাদ করেছেন- وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ (যে রসূলের আনুগত্য করে...)। এটাকে নাজায়েয বলা

مَاجِئْتُ لِحَاجَةٍقَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَآءِ

এতদ্ব্যতীত আমি অন্য কোন প্রয়োজনে আসি নি।[৫৯] তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইল্‌ম অন্বেষণের নিমিত্তে কোন পথ অতিক্রম করে, আল্লাহ্ তাকে বেহেশ্‌তের রাস্তাসমূহ থেকে কোন একটি রাস্তায় চালাবেন।[৬০] আর নিঃসন্দেহে ফিরিশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য ডানা বিছিয়ে দেন।[৬১] নিশ্চয় আলিমের জন্য আসমান -যামীনের সকল বস্তু এবং পানিতে মাছগুলো মাগফিরাতের দো'আ করে থাকে।[৬২]

দলীলভিত্তিক নয়।

৫৯. অর্থাৎ হাদীস শ্রবণ করা ব্যতীত অন্য কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্যে সফর করি নি। এ থেকে ওই সব লোকের শিক্ষাগ্রহণ করা চাই, যারা বলে যে, তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন দিকে সফর করা জায়েয নয়; অথচ নিজেরা চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদির জন্য সফর করতে থাকে। এ থেকে বুঝা গেলো, বুযুর্গ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ, কবর যিয়ারত ইত্যাদির জন্য সফর করা জায়েয। যেমন- 'শামী' ইত্যাদিতে রয়েছে এবং ইন্‌শা- আল্লাহ মসজিদসমূহের বর্ণনা শীর্ষক অধ্যায়ে সফরের নিষেধাজ্ঞার হাদীসের ব্যাখ্যা ও গবেষণালব্ধ আলোচনা করা হবে। তাছাড়া, এ জন্য আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' অধ্যয়ন করুন।

৬০. প্রকাশ থাকে যে, এটা ওই হাদীস নয়, যা শুনার জন্য লোকটি এসেছিলেন; বরং তাঁকে সাহস যোগানো এবং তাঁর সফর ক্বুবূল হওয়ার সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এ হাদীস শরীফ শুনিয়েছেন।

এর মর্মার্থ এ যে, যে ব্যক্তি মাসআলা জিজ্ঞেস করা, ইল্‌ম অর্জন করা এবং হাদীস শরীফ শ্রবণ করা ইত্যাদির জন্য সফর করে কিংবা সফর ব্যতীত সামান্য পথ অতিক্রম করে কোথাও গমন করে, তাহলে দুনিয়ায় তার নেক আমল করার তাওফীক্ব হবে, যা বেহেশ্‌ত অর্জনের কারণ কিংবা আখিরাতে পুলসিরাত অতিক্রম করা সহজ হবে এবং সহজে বেহেশ্‌তে পৌঁছবে।

ইমাম শাফে'ঈ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, ইলমে দ্বীন অন্বেষণ করা নফল নামায থেকে উত্তম। কেননা, এটা ফরয, ওটা নফল। [মিরক্বাত]

৬১. এটাই সুস্পষ্ট যে, এখানে প্রকৃত অর্থ জানা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যখন ইল্‌ম অন্বেষণকারী শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনে লিপ্ত হয়, তখন তার কথা শ্রবণ করার জন্য ফেরেশ্‌তারা নিচে নেমে আসেন এবং কথোপকথন শ্রবণ করেন। যেমন- ক্বোরআন তিলাওয়াতের সময়। অথবা ক্বিয়ামতের দিন ইল্‌ম অন্বেষণকারীর পায়ের নিচে ফেরেশ্‌তারা স্বীয় ডানা বিছাবেন। অথবা এর অর্থ এ যে, ইল্‌ম অন্বেষণকারীর প্রতি ফিরিশ্‌তাও বিনয় প্রকাশ করে এবং তার কষ্টগুলোকে দুরীভূত করে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ (এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও...।১৭:২৪) এখানে মিরক্বাত প্রণেতা এ সম্পর্কে বিস্ময়কর ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন।

৬২. অর্থাৎ দ্বীনের আলিমদের জন্য চাঁদ, সূর্য, তারা এবং আসমানী ফেরেশ্‌তা, অনুরূপ যমীনের বালুকণা, তৃণলতা ও গাছপালার পাতা আর কিছুসংখ্যক জিন্ ও মানুষ এবং সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণী, মাছ ইত্যাদি মাগফিরাতের দো'আ করে থাকে। কেননা, ওলামা-ই দ্বীনের কারণে দ্বীন টিকে আছে এবং দ্বীন টিকে থাকার কারণে দুনিয়া টিকে আছে। আলিমগণের বরকতেই বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং মাখলূক্ব রিযক্ব পায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- بِهِمْ يُمْطَرُوْنَ وَبِهِمْ يُرْزَقُوْنَ (অর্থাৎ তাঁদেরই কারণে বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং তাঁদেরই কারণে রিযক্ব দেয়া হচ্ছে)। আলিমগণ উঠে গেলে ইসলাম উঠে যাবে এবং ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। আলিমগণ হলেন দুনিয়ার রক্ষাকবচ। [মিরক্বাত ও আশি''আহ]

স্মর্তব্য যে, আলিমগণের মধ্যে ওলামা-ই শরীয়তও রয়েছেন আর ওলামা-ই তরীক্বতও; বরং কোন ব্যক্তি ইলম ব্যতীত ওলী হয় না। আল্লাহ মূর্খদেরকে ওলী বানান না। আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا (নিশ্চয় আল্লাহ্‌কে ভয় করেন তাঁর বান্দাদের মধ্যে আলিমগণ।।৩৫:২৮)

وَانَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهٗ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ- رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ وَسَمَّاهُ التِّرْمِذِىُّ قَيْسَ بْنَ كَثِيْرٍ- وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَّالْاٰخَرُ عَالِمٌ

আলিমের মর্যাদা ইবাদতকারীর উপর তেমনি, যেমন পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মর্যাদা সমস্ত তারকার উপর।[৬৩] আর আলিমগণ নবীগণের 'ওয়ারিস'।[৬৪] নবীগণ কাউকে দীনার ও দিরহামের ওয়ারিস করেন নি। তাঁরা শুধু ইল্‌মের ওয়ারিস বানিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইল্‌ম অর্জন করলো, সে পূর্ণ অংশই নিলো।[৬৫] [এ হাদীস আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী বর্ণনা করেছেন।] ইমাম তিরমিযী ওই বর্ণনাকারীর নাম ক্বায়েস ইবনে কাসীর বলেছেন।

২০৩ || হযরত আবূ উমামা বাহেলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মহান দরবারে দু'ব্যক্তির আলোচনা করা হলো, যাদের মধ্যে একজন আবিদ ও অন্যজন আলিম।[৬৬]

৬৩. 'আলিম' মানে ওই আলিম, যিনি শুধু অপরিহার্য আমলসমূহ করে ক্ষান্ত হন এবং নফলসমূহের স্থলে ইলমী খিদমত আঞ্জাম দেন।
আর 'আবিদ' মানে ওই ব্যক্তি, যিনি শুধু নিজের জরুরী মাসাইল সম্পর্কে অবগত থাকেন এবং নফল ইবাদত করে জীবনের সময় অতিবাহিত করেন। বে-দ্বীন ও পাপিষ্ট আলিম এবং নিরেট মূর্খ আবিদ এ আলোচনা বহির্ভূত।
স্মর্তব্য যে, চাঁদ সূর্য থেকে আলো নিয়ে রাতে সমগ্র পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে দেয়। এভাবে আলিমগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে 'ফয়য' গ্রহণ করে দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দেন। তারকারাজি নিজেরা আলোকিত; কিন্তু চাঁদ আলো দান করে।
'আবিদ' নিজের জন্য এবং 'আলিম' দুনিয়ার জন্য চেষ্টা করে থাকেন। 'আবিদ' নিজের কম্বল রক্ষা করে, 'আলিম' তুফান থেকে মানুষের জাহাজ বের করে আনেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিক হবার চেয়ে সামগ্রিক হওয়া উত্তম।

৬৪. সুবহানাল্লাহ্! যখন 'মূ'রিস' (যার সম্পত্তি বণ্টন করা হয়) -এর মর্যাদা এতই উঁচু, তখন ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী)ও কতই মর্যাদাবান হবেন!
মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, মুজতাহিদ ইমামগণ রসূলগণের ওয়ারিস এবং মুজতাহিদ নন এমন আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিস। 'ওলামা' বলতে 'মুজতাহিদ' ও 'মুজতাহিদ নন' উভয় প্রকারের আলিম বুঝায় এবং 'আম্বিয়া' (নবীগণ) শব্দে 'নবী' ও 'রসূলগণ' সকলেই অন্তর্ভুক্ত।
স্মর্তব্য যে, ওলামা-ই ইসলাম হুযূরের ওয়ারিস। আর যেহেতু হুযূর সমস্ত নবীর গুণাবলীর ধারক, সেহেতু আলিমগণ সমস্ত নবীর ওয়ারিস।

৬৫. স্মর্তব্য যে, কোন কোন নবী দুনিয়াত্যাগী ছিলেন, যাঁরা কিছুই সঞ্চয় করেন নি। যেমন হযরত ইয়াহ্‌য়া ও হযরত ঈসা আলায়হিমাস্ সালাম। আর কেউ কেউ বহু সম্পদও রেখেছেন। যেমন হযরত সুলায়মান ও হযরত দাউদ আলায়হিমাস্ সালাম।
কিন্তু কোন নবীরই সম্পদগত 'মীরাস' (উত্তরাধিকার) বণ্টন করা হয় নি। তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পদ দ্বীনের জন্য ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়। ক্বিয়ামত পর্যন্ত আলিমগণই তাঁদের (ইল্‌ম'র) ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী)। এ জন্য আলিমগণকে নবীগণের উত্তরাধিকারী বলা হয়।

৬৬. এটাই সুস্পষ্ট যে, তাদের দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা সাধারাণার্থক প্রশ্ন।
অর্থাৎ যদি দু'ব্যক্তির মধ্যে একজন 'আলিম' ও একজন 'আবিদ' হন, তাহলে কার মর্যাদা অধিক হবে? 'আলিম' ও 'আবিদ'-এর অর্থ আমি ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ الدَّارِمِىُّ عَنْ مَكْحُوْلٍ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلَانِ وَقَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ ﴿اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا﴾ وَسَرَدَ الْحَدِيْثَ اِلٰى اٰخِرِهٖ-

---

তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "আলিমের মর্যাদা আবিদের উপর তেমনি, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর।"[৬৭] অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ্ তাঁর ফিরিশ্তাগণ, আসমান ও যামীনবাসী, এমনকি গর্তের মধ্যে পিঁপড়া এবং পানির মাছগুলো সালাত প্রেরণ করে ওই ব্যক্তির প্রতি, যে মানুষকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়।[৬৮] হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম দারেমী হাদীসটি হযরত মাকহূল হতে 'মুরসাল'রূপে বর্ণনা করেছেন। আর উক্ত হাদীসে দু'ব্যক্তির আলোচনার কথা উল্লেখ করেন নি এবং বলেছেন, 'আলিমের মর্যাদা আবিদের উপর তেমনি, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর। অতঃপর হুযূর করীম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন- "আল্লাহ্কে তাঁর বান্দাদের মধ্যে শুধু আলিমগণই ভয় করে" এবং হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

---

৬৭. এ উপমা প্রকারভেদ বর্ণনার জন্য; পরিমাণ বর্ণনার জন্য নয়। অর্থাৎ যে ধরনের বুযুর্গী সমস্ত মুসলমানের উপর আমার অর্জিত হয়েছে, সে ধরনের বুযুর্গী আবিদের উপর আলিমের রয়েছে। অর্থাৎ দ্বীনী মর্যাদা পার্থিব মর্যাদা নয়; যদিও (নুবূয়তের ও মু'মিনের) দু'মর্যাদার মধ্যে কোটি কোটি গুণ পার্থক্য বিদ্যমান। প্রজাদের উপর বাদশার বাদশাহীর, গরীবের উপর ধনীর (মর্যাদা) সম্পদের দিক দিয়ে, অসহায়দের উপর প্রভাবশালীদের মর্যাদা ক্ষমতার মধ্যে, কুৎসিত বিশ্রীলোকদের উপর সুশ্রী লোকদের সৌন্দর্যের মর্যাদা রয়েছে; কিন্তু এসব মর্যাদা নিছক পার্থিব ও নশ্বর। মাখলূকের উপর নবীর দ্বীনী বুযুর্গী, যা চিরস্থায়ীভাবে কায়েম থাকে; অনুরূপ, মূর্খের উপর আলিমের স্থায়ী মর্যাদা বিদ্যমান। বর্তমানে সেকান্দরের হাতে কোন ফক্বিরের উপর রাজত্বের বুযুর্গী নেই। কিন্তু সমস্ত মুক্বাল্লিদের উপর ইমাম আবূ হানিফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র অশেষ মাহাত্ম্য এখনো বিদ্যমান।

স্মর্তব্য যে, হুযূর-ই আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মর্যাদা অন্যান্য নবীর উপর এক ধরনের, আর সম্মানিত সাহাবীদের উপর অন্য ধরনের রয়েছে, সম্মানিত আউলিয়া ও আলিমদের উপর আরেক ধরনের মর্যাদা, সর্বসাধারণের উপর ভিন্ন ধরনের বুযুর্গী রয়েছে। اَدْنٰكُمْ শব্দের মধ্যে শেষোক্ত মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। হুযূর আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করতেন- وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ (অর্থাৎ মিসকীনদের দলে আমার হাশর করুন)। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ (অর্থাৎ তাঁর নূরের উপমা ওই থাকের মত, যাতে রয়েছে প্রদীপ...।২৪:৩৫।)। এ আয়াতে নূর-ই ইলাহীর উপমা প্রদীপের আলোর সাথে দেওয়া হয়েছে; অথচ প্রদীপের আলোর সাথে আল্লাহ্র নূরের তুলনা কীভাবে? এটাও এমনি একটি উদাহরণ।

৬৮. ফিরিশ্তাগণ (مَلٰئِكَة) দ্বারা আরশ বহনকারী ফিরিশ্তাগণ এবং 'আসমানবাসী' দ্বারা অন্যান্য ফিরিশ্তা বুঝানো উদ্দেশ্য। আল্লাহ্র 'সালাত' মানে তাঁর বিশেষ রহমত এবং মাখলূকের 'সালাত' দ্বারা 'বিশেষ রহমতের দো'আ' বুঝানো উদ্দেশ্য। নতুবা সাধারণ রহমত এবং সাধারণ দো'আতো সকল মুসলমানের জন্যই রয়েছে।

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّ رِجَالًا يَاْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ فَاِذَا اَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا

২০৪ ॥ হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "লোকেরা তোমাদের অনুসারী,[৬৯] বহুসংখ্যক লোক পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তোমাদের কাছে দ্বীনী বিষয়ে বুঝার জন্য আসবে। যখন তারা আসবে, তখন তাদেরকে সৎকাজের উপদেশ দেবে।"[৭০] [তিরমিযী]

২০৫ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'ইল্মী বাক্য' আলিমের হারানো জিনিস। যেখানেই সে তা পাবে, সে সেটার হক্বদার।[৭১]

মহান রব এরশাদ ফরমান-

هُوَالَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ

(তিনি ওই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্‌তাগণও তোমাদের মাগফিরাত কামনা করেন।৩৩:৪৩)। আরো এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

(এবং তারা মুসলমানদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে।৪০:৭)।

সুতরাং, এ হাদীস না ক্বোরআনের বিরোধী, না এটা দ্বারা এ কথা অনিবার্য হয় যে, আলিমগণ হুযূরের সমান হয়ে যাবেন। কেননা, হুযূরের উপরও মহান রব সালাত প্রেরণ করেন এবং আলিমদের উপরও।

৬৯. এতে সম্বোধন সাহাবীদেরকে, বিশেষ করে তাঁদের মধ্যেকার আলিমদেরকে করা হয়েছে; অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানগণ তোমাদের আদর্শ চরিত্র, কার্যাবলী এবং বাণীসমূহের অনুসরণ করবে। কেননা, তোমরা মাধ্যম ব্যতীত আমার থেকে 'ফয়য' গ্রহণ করেছো। শরীয়ত হচ্ছে আমার বাণীসমূহ, তরীক্বত হচ্ছে আমার কার্যাবলী, হাক্বীক্বত হচ্ছে আমার অবস্থাদি। তোমরা এ সবকিছু সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছো এবং নিজ কানে শুনেছো।

স্মর্তব্য যে, 'তাবে'ঈ' শব্দটি এ হাদীস থেকেই নেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ সম্মানিত সাহাবীদের পরিপূর্ণ অনুসারী। [মিরক্বাত]

৭০. অর্থাৎ বড় বড় কামিল লোক তোমাদের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য মদীনা মুনাওয়ারার দিকে ছুটে আসবে। তখন তোমরা তাদেরকে নির্দ্বিধায় ইলম শিক্ষা দেবে, আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। অথবা আমি তোমাদেরকে তাদের খিদমত করার উপদেশ দিচ্ছি। তা তোমরা গ্রহণ করো। প্রথম অর্থটি 'আশি''আতুল লুম'আত' প্রণেতা এবং দ্বিতীয়টি 'মিরক্বাত' প্রণেতা গ্রহণ করেছেন।

বুঝা গেলো যে, দ্বীনী শিক্ষার্থীদের খিদমত করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, তারা হুযূরের মেহমান। এ জন্য অধিকাংশ আলিম নিজেদের দ্বীনী শিক্ষার্থীদের নিজেরা বহু খিদমত করতেন এবং অন্য লোকদের দ্বারাও করাতেন।

৭১. অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান লোকের নিকট থেকে যে কোন ভাল ও দ্বীনী কথা শুনবে, তাঁর কাছ থেকেই তা গ্রহণ করে নেবে। এটা দেখবে না যে, কে বলছে, বরং দেখবে কি বলছে। যেমনিভাবে নিজের হারানো জিনিস যার কাছেই পাওয়া যায়, নিয়ে নেওয়া হয়। এটা দেখা হয় না যে, সে কে এবং কেমন?

স্মর্তব্য যে, এখানে كلمۂ حكمت (কলেমাহ্-ই হিকমত) বা 'ইল্মী বাক্য' মানে ইসলামী ও ফিক্বহ্ সংক্রান্ত বিষয়। অর্থাৎ যদি দ্বীনের কথা ফাসিক্ব লোকও বলে, তবে তা গ্রহণ করে নাও।

সুতরাং এ হাদীস এর বিরোধী নয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ফারূক্বকে তাওরীত পড়তে নিষেধ করেছিলেন। কেননা, তাওরীতের 'মানসূখ আহকাম' (রহিত বিধানাবলী) তখন 'কলেমাহ্-ই হিকমত'ই ছিলো না।

অনুরূপ, বর্তমানেও মুসলমানদের জন্য কাফিরদের ধর্মীয় রচনাবলী দেখার অনুমতি নেই। তাদের কাছে 'কলেমাহ্-ই হিকমত' বলতে কিছুই নেই।

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَابْرَاهِيْمُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّاوِىْ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ اِلٰى قَوْلِهٖ مُسْلِمٍ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ مَتْنُهٗ مَشْهُوْرٌ وَّاِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ اَوْجُهٍ كُلُّهَا ضَعِيْفٌ

এ হাদীস ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীস 'গরীব' পর্যায়ের এবং বর্ণনাকারী ইব্রাহীম ইবনে ফদ্বলকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল মনে করা হয়।

২০৬ ‖ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, একজন ফক্বীহ্ (দ্বীনী বিষয়ে অধিক বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি) শয়তানের উপর হাজার আবিদ'র চেয়েও বেশি ভারী।[৭২] [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্]

২০৭ ‖ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইল্‌ম অন্বেষণ করা ফরয।[৭৩] আর অনুপযুক্ত লোকের সামনে ইল্‌ম উপস্থাপনকারী ওই ব্যক্তির মতো, যে শুকরকে মণি-মুক্তা এবং স্বর্ণের হার পরিয়ে দেয়।"[৭৪] এ হাদীস ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমান'-এ হুযূরের পবিত্র বাণী 'মুসলিমিন' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীসের বচন 'মা'শহূর' পর্যায়ের। সেটার বর্ণনাসূত্র দ্ব'ঈফ (দুর্বল) পর্যায়ের। আর হাদীসটি বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তবে সব ক'টি সূত্রই দ্ব'ঈফ (দুর্বল) পর্যায়ের।[৭৫]

---

৭২. হাদীস শরীফ শয়তান থেকে রক্ষা পাবার বিরাট মাধ্যম। স্মর্তব্য যে, এখানে 'আলিম' মানে ওই আলিম যাঁর উপর আল্লাহর অনুগ্রহ হয়েছে। এ জন্য 'ফক্বীহ্' বলা হয়েছে, 'আলিম' বলা হয় নি। (ফক্বীহ) অর্থাৎ দ্বীন সম্পর্কে সঠিক-বিশুদ্ধ বোধশক্তির অধিকারী।

৭৩. 'মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা'য় وَمُسْلِمَةٍ শব্দটিও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ইলম শিক্ষা করা ফরয। 'ইল্‌ম' মানে শরীয়তের প্রয়োজনীয় পরিমাণ মাসআলাসমূহ। সুতরাং রোযা- নামাযের জরুরী মাসআলাদি শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। 'হায়য' ও 'নিফাস'র (তথা মাসিক রজঃস্রাব ও প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ সংক্রান্ত) জরুরী মাসাইল শিক্ষা করা প্রতিটি নারীর উপর, ব্যবসার মাসআলা শিক্ষা করা সকল ব্যবসায়ীর উপর, হজ্জে গমণকারীর উপর হজ্জের মাসআলা শেখা 'ফরয্-ই 'আঈন'। কিন্তু দ্বীনের পরিপূর্ণ আলিম হওয়া 'ফরযে কেফায়াহ্'। অর্থাৎ যদি শহরে একজনও এ ফরয সম্পন্ন করে, তাহলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। সম্মানিত সূফীগণ বলেছেন যে, স্বীয় নাফসের বিপদাপদ এবং শয়তানী প্রভাব ইত্যাদি জানাও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী, যেন সেগুলো থেকে রক্ষা পায়।

৭৪. এখানে ইল্‌ম মানে কঠিন ও সূক্ষ্ম মাসাইল এবং জ্ঞানগত গূঢ় রহস্যাবলী, যেগুলো সাধারণ লোক বুঝতে পারে না। অর্থাৎ ওই আলিম, যে সর্বসাধারণের সামনে অপ্রয়োজনীয় এবং সূক্ষ্ম ও কঠিন মাসাইল কিংবা ব্যাখ্যাযোগ্য আয়াত ও হাদীসসমূহ পেশ করে, সে ওই ব্যক্তির মতোই, যে মণি-মুক্তার হার শূকরের গলায় পরিয়ে দেয়। কারণ, অজ্ঞ লোকেরা এ বিষয়গুলো শুনে অস্বীকার করে বসে। এ জন্যই সাইয়্যেদুনা আলী মুরতাদ্বা এরশাদ করেছেন, "মানুষের সাথে তাদের বোধশক্তি অনুসারে কথা বলো।" নতুবা তারা আল্লাহ্-রসূলকে মিথ্যারোপ করে বসবে এবং এর শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে।

৭৫. অর্থাৎ এ হাদীস শরীফ বহু দ্ব'ঈফ (দুর্বল) সনদসূত্রে বর্ণিত। সুতরাং তা শক্তিশালী। কেননা, অধিক সনদ দ্ব'ঈফকেও 'হাসান' পর্যায়ে উন্নীত করে। [মিরক্বাত ইত্যাদি]

وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لَا یَجْتَمِعَانِ فِیْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَّلَا فِقْهٌ فِی الدِّیْنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِیْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ حَتّٰی یَرْجِعَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَالدَّارِمِیُّ وَعَنْ سَخْبَرَةَ الْاَزْدِیِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ کَانَ کَفَّارَةً لِّمَا مَضٰی - رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَالدَّارِمِیُّ وَقَالَ التِّرْمِذِیُّ هٰذَا حَدِیْثٌ ضَعِیْفُ الْاَسْنَادِ وَاَبُوْ دَاؤُدَ الرَّاوِیْ یُضَعَّفُ -

২০৮ ‖ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **এরশাদ করেছেন, "দু'টি স্বভাব মুনাফিক্বের মধ্যে একত্রিত হয় না: না সচ্চরিত্র, না দ্বীনী বোধশক্তি (ফিক্বহ)।"**[৭৬] [তিরমিযী] **২০৯ ‖ হযরত আনাস** রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **এরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি ইল্ম অন্বেষণে বের হলো, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র পথে থাকে।"**[৭৭] **২১০ ‖ হযরত সাখাবিরাহ্ আযদী** রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত,**[৭৮] **তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি ইল্ম অন্বেষণ করলো, এ অন্বেষণ তার পূর্ববর্তী গুনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে গেলো।"**[৭৯] [এটা তিরমিযী ও দারেমী বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীস শরীফের সনদগুলো দ্ব'ঈফ (দুর্বল) পর্যায়ের। এখানে 'আবূ দাউদ নামক বর্ণনাকারী' হাদীস বিশারদগণের মতে দুর্বল সাব্যস্ত হয়েছেন।][৮০]

---

৭৬. প্রকাশ থাকে যে, এখানে মুনাফিক্ব মানে আক্বীদাগত মুনাফিক্ব, আমলগত মুনাফিক্ব নয়। অর্থাৎ আন্তরিকভাবে কাফির, মুখে মু'মিন। আর 'সচ্চরিত্র' মানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আদর্শ চরিত্র; আর 'দ্বীনী ফিক্বহ' মানে সঠিক অর্থে দ্বীন বুঝা। এর মর্মার্থ হচ্ছে 'নিফাক্ব'র সাথে না দ্বীনী চরিত্র একত্রিত হবে, না দ্বীনী ইল্ম। মুনাফিক্ব ইসলামী আদর্শ থেকেও বঞ্চিত এবং দ্বীন থেকেও। কেননা, এগুলো তো নূর। আঁধারের সাথে কিভাবে একত্রিত হবে? মহান রব ফরমাচ্ছেন- لَا یَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (সেটাকে যেনো স্পর্শ না করে, কিন্তু ওযূ সম্পন্নরা।।৫৬:৭৯।) অর্থাৎ অপবিত্র অন্তর বিশিষ্ট ব্যক্তি ক্বোরআনও স্পর্শ করতে পারে না, তাদের অবস্থা এরূপ- পংক্তি

کتابیں پڑھیں دینداری نہ آئی - بخار آ گیا پھر بخاری نہ آئی

অর্থাৎ "কিতাবাদি পড়েছে, ধার্মিকতা আসে নি, 'বোখার' (জ্বর) এসেছে, কিন্তু বোখারী (শরীফের জ্ঞান) আসে নি।" ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন,-

فَاِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِّنْ اِلٰـــهٖ ـ وَاِنَّ النُّوْرَ لَا یُعْطٰی لِعَاصٍ

অর্থাৎ কেননা, ইল্ম হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক নূর; আর নিশ্চয় নূর কোন পাপীকে দান করা হয় না।

ইল্ম ও আখলাক্ব (জ্ঞান ও সচ্চরিত্র) তাক্বওয়া অনুযায়ী অর্জিত হয়। আবর্জনাময় ঘরে বাদশাহ্ আসে না এবং ময়লাযুক্ত অন্তরে হুযূরের চরিত্র ও হুযূরের ইল্ম আসে না।

৭৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য আপন ঘর হতে অথবা ইল্ম অন্বেষণের জন্য স্বীয় জন্মভূমি থেকে আলিমদের নিকট গিয়েছে, সেও আল্লাহর পথে জিহাদকারী। যুদ্ধবিজয়ী মুজাহিদের ন্যায় ঘরে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত তার পুরো সময় ও প্রতিটি মুহূর্ত এবং সব ধরনের নড়াচড়া ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। ঘরে আসার পর এ সাওয়াব পাবার পরম্পরা শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর আমল ও দ্বীন প্রচার করার সাওয়াব শুরু হবে। সুতরাং এ হাদীস ওই হাদীসের বিরোধী নয়, যাতে হুযূর এরশাদ করেছেন, "ইল্ম হচ্ছে সাদক্বাহ-ই জারিয়াহ্, যার সাওয়াব মৃত্যুর পরও পেতে থাকে।"

৭৮. সঠিক অভিমত হচ্ছে তিনি সাহাবী। উপনাম- আবূ আবদুল্লাহ্। তিনি আযদ ইবনে গাউসের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কাছ থেকে শুধু এ একটি হাদীসই বর্ণিত।

৭৯. ইল্ম অন্বেষণকারীর ছোটখাটো গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। যেমন, ওযূ-নামায ইত্যাদি ইবাদত দ্বারা হয়ে থাকে। সুতরাং এর অর্থ এ নয় যে, 'ইল্ম অন্বেষণকারী যথেচ্ছ গুনাহ্ করতে থাকবে।' অন্যথায় এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা সদুদ্দেশ্যে ইল্ম অন্বেষণকারীদেরকে যাবতীয় গুনাহ্ থেকে বাঁচার এবং পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফ্ফারা আদায় করার তাওফীক্ব দান করেন।

৮০. এ 'আবূ দাউদ' অন্যজন। তিনি সুলায়মান ইবনে আশ'আস্ সিজিস্তানী নন, যাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আবূ দাউদ

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَّشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ- رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَنَسٍ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

২১১ ॥ হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- মু'মিন ভাল কথা শ্রবণ করে কখনো পরিতৃপ্ত হবে না যে পর্যন্ত না তার শেষ বেহেশ্‌তে হয়ে যায়।[৮১] [তিরমিযী]

২১২ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যাকে কোন ইল্‌মী কথা জিজ্ঞেস করা হয়, যা সে জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।[৮২] [আহমদ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ্ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে]

২১৩ ॥ হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[৮৩] **তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,**

শরীফ' রয়েছে। আলোচ্য আবূ দাঊদ'র নাম হচ্ছে- 'নক্বী ইবনে হারিস'। তিনি কূফার বাসিন্দা ছিলেন। হামদানের বিচারক ছিলেন। তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁকে দুর্বল মনে করা হয়।

৮১. অর্থাৎ ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ ঈমানের আলামত। ঈমান যত মজবুত, এ আগ্রহও তত বেশি হয়। বড় বড় আলিমগণ এত ইল্‌ম অর্জন করেও ক্ষান্ত হতেন না। সম্মানিত সূফীগণ বলেন, اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحْدِ। অর্থাৎ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্‌ম শিক্ষা করো। এ হাদীসে ইলমের প্রতি আগ্রহীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। ইনশা- আল্লাহ্! ইলমে দ্বীনের অনুসন্ধানকারী মৃত্যুর সাথে সাথেই জান্নাতী হন। আলিমগণ বলেছেন, আলিম-ই দ্বীন ব্যতীত অন্য কেউ নিজেদের 'খাতিমাহ্' (শেষ পরিণতি) সম্পর্কে অবগত নয়, যেহেতু হুযূর তাঁদের জন্য ওয়াদা করেছেন যে, "আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাঁকে ইলমে দ্বীন দান করেন।"

৮২. অর্থাৎ যদি কোন আলিমকে দ্বীনী প্রয়োজনীয় মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয় এবং ওই আলিম বিনা কারণে তা না বলে, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন সে পশু থেকেও নিকৃষ্ট হবে। কারণ পশুর মুখে চামড়ার লাগাম দেওয়া হয়, এবং তার মুখে আগুনের লাগাম দেওয়া হবে। স্মর্তব্য যে, এখানে 'ইল্‌ম' মানে হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদির জ্ঞান। দ্বীনের প্রচার বিষয়ক মাসাইল, যেগুলো গোপন করা অপরাধ (গুনাহ), আলিমের জন্য শর'ঈ মাসআলা মানুষকে বলে দেওয়া জরুরী; লিখে দেওয়া নয়।

সুতরাং মুফ্‌তীগণ ফাতওয়া লিখে পারিশ্রমিক নিতে পারেন; বিশেষতঃ ওই ফাতওয়াগুলো, যেগুলোর মামলা- মুক্বাদ্দামা চলে এবং মুফ্‌তীকে কোর্টে হাজিরা দিতে হয়। মহান আল্লাহ্ এরশাদ ফরমায়েছেন وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ (এবং না লেখক ক্ষতিগ্রস্ত করবে, না সাক্ষী।[২:২৮২])

৮৩. তিনি আনসারী ও খাযরাজী। আক্বাবার দ্বিতীয় বায়'আতে হাযির ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রসিদ্ধ কবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে মদীনা মুনাওয়ারাই থেকে যান। এ জন্য তাঁকে 'বয়কট' করা হয়েছিলো। কিছুদিন (৫০দিন) পর তাঁর এবং তাঁর দু'জন সঙ্গী হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারাহ্ ইবনে রবী'আহ্'র তাওবা ক্বূল হয়েছিলো। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন। وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا (এবং ওই তিন জনের প্রতি, যাদেরকে মওকূফ রাখা হয়েছিলো... [৯:১১৮])। তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যান। ৭৭ বছর বয়সে ৫০ হিজরীতে ওফাত পান।

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَآءَ اَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَآءَ اَوْيَصْرِفَ بِهٖ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَايَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَعْنِيْ رِيْحَهَا - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অন্বেষণ করে যে, আলিমগণের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, কিংবা মুর্খদের সাথে বাকবিতণ্ডা করবে, অথবা মানুষের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করবে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে দোযখে প্রবেশ করাবেন।[৮৪] [তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ্ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে]

২১৪ || হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ওই ইল্‌ম শিখে, যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টিই অন্বেষণ করা যায়, সে ওই ইল্‌ম শিখে না, কিন্তু এ জন্য যে, তা দ্বারা দুনিয়াবী সম্পদই অর্জন করবে,[৮৫] সে ক্বিয়ামতের দিন বেহেশ্‌তের সুগন্ধও পাবে না। 'আরফ মানে সুগন্ধ।[৮৬] [আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্]

---

৮৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বীনী ইল্‌ম দ্বীনের জন্য শিখে না, বরং সম্মান কিংবা সম্পদ অর্জনের জন্য শিখে, অথবা দ্বীনের মধ্যে ফ্যাসাদ ছড়ানোর জন্য শিখে, তাহলে সে প্রথম সারির জাহান্নামী।

এ থেকে ওই সব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা চাই, যারা ক্বোরআনের তরজমা দেখে এবং দু'চারটি হাদীস পড়ে মুজতাহিদ ইমামগণ ও ওলামা-ই দ্বীনের মুখোমুখী হওয়ার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম নিয়্যত করার তাওফীক্ব দান করুন।

স্মর্তব্য যে, আলিমগণের 'মুনাযারাহ্' (তর্কযুদ্ধ) এক জিনিস, বাড়াবাড়ি অন্য জিনিস। 'মুনাযারাহ্'র মধ্যে গবেষণা করে সত্য উদ্‌ঘাটন করা উদ্দেশ্য থাকে, আর মোকাবেলা (বাড়াবাড়ি)তে নিজের বড়াই প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য থাকে। প্রয়োজন সাপেক্ষে 'মুনাযারা' করা উত্তম এবং মোকাবেলা (বাড়াবাড়ি) করা মন্দ।

এখানে মোকাবেলা করার মন্দ দিক উল্লেখ করা হয়েছে। 'মুনাযারা' মুজতাহিদ ইমামগণ বরং সাহাবা-ই কেরামের মধ্যেও হয়েছিলো।

৮৫. এ হাদীস শরীফ পূর্ববর্তী হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা, যাতে এরশাদ করা হয়েছে, "ইলমে দ্বীন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জন করো। শুধু দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিও না।" 'দুনিয়ার সরঞ্জাম' দ্বারা 'টাকা-পয়সা' বুঝানো উদ্দেশ্য এবং দুনিয়াবী মান-সম্মানও। সম্মানিত মিরক্বাত প্রণেতা বলেছেন, ইলমে দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জন করার দু'টি ধরন রয়েছে:

এক. দুনিয়া হবে মূল উদ্দেশ্য এবং ইলমে দ্বীন নিছক সেটার মাধ্যম মাত্র। এটা অত্যন্ত মন্দ দিক। এখানে এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য।

দুই. 'ইলমে দ্বীন' দ্বারা 'দ্বীন হাসিল করা'ই উদ্দেশ্য। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে দুনিয়াও হাসিল করা যাবে। যাতে সচ্ছলতার মধ্যে দ্বীনের খিদমত করা যায়; এটা নিষেধ নয়। কেননা, এখানে দ্বীন'ই উদ্দেশ্য এবং 'দুনিয়া' এর উসীলা বা মাধ্যম মাত্র।

দরিদ্র আলিমের ওয়ায অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে না। হযরাত খোলাফা-ই রাশিদীন খেলাফতের দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে মাসিক বেতন-ভাতা গ্রহণ করেছিলেন। 'জিহাদ'-এর হুকুমও এটা। যদি শুধু গনীমতের জন্য করে, তাহলে তা মন্দ। আর যদি দ্বীন প্রচারের জন্য করে এবং গনীমত, রাজ্য ও রাজত্ব সেটার মাধ্যমে পাওয়া যায়, তাহলে তা উত্তম।

৮৬. অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে। যদিও সে রিয়াকারীর শাস্তি ভোগ করে কিংবা হুযূরের শাফা'আত বা সুপারিশের মাধ্যমে ক্ষমা পেয়ে যায়।

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيْهٍ وَّ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ ثَلٰثٌ لَايُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ اِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ

২১৫ ।। হযরত ইবনে মাস্'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ ওই বান্দাকে সজীব রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করে, তা সংরক্ষণ করে, স্মরণ রাখে এবং পৌঁছিয়ে দেয়।[৮৭] কেননা, অনেক ফিক্বহের ধারক নিজে ফক্বীহ্ নয় এবং বহু ফিক্বহের ধারক নিজের চেয়েও বড় ফিক্বহ্ বিশারদের নিকট ফিক্বহ্ পেশ করে।[৮৮] মুসলমানদের অন্তর তিনটি জিনিসের ব্যাপারে খিয়ানত করতে পারে না[৮৯]: আল্লাহর জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত করা,[৯০] মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা এবং তাদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা।[৯১]

৮৭. এ হাদীস ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুহাদ্দিসকে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হাদীস সংরক্ষণকারী ও হাদীসের প্রচারককে সমৃদ্ধশালী রাখুন, আখিরাতে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল রাখুন এবং এ আয়াতে বর্ণিত দলের অন্তর্ভুক্ত করুন-وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ۝ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ۝ (কিছু মুখমণ্ডল সেদিন তরুতাজা হবে; আপন রবকে দেখবে।।৭৫:২২-২৩।) হুযূরের এ দো'আ নিশ্চিত ক্ববূল। হাদীসের খাদিমগণ আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবেন; যেমনটি পরীক্ষিত। হাদীসের 'যিক্র' বা চর্চা করা সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত এবং মুখস্থ করে ভুলে না যাওয়া স্মরণ রাখার নামান্তর। কোন কোন মুহাদ্দিস পবিত্র ক্বোরআনের মত হাদীস শরীফও মুখস্থ করতেন।

৮৮. এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'মুহাদ্দিস' যেন সরাসরি হাদীস অনুসারে আমল না করেন; নতুবা ধোঁকায় পতিত হবেন; বরং মুজতাহিদ ফিক্বহ্ বিশারদদের সমীপে পেশ করবেন। তাঁর তাক্বলীদ (অনুসরণ) করে তাঁর নির্দেশিত মর্মার্থানুসারে আমল করবেন।

ফক্বীহ্ হচ্ছেন রূহানী চিকিৎসক এবং মুহাদ্দিস হচ্ছেন রূহানী ঔষধ বিক্রেতা। ঔষধ বিক্রেতা স্বীয় দোকানের ঔষধ চিকিৎসকের নিকট জিজ্ঞেস করে ব্যবহার করবে। এ জন্যই প্রায় সব মুহাদ্দিস মুক্বাল্লিদ (কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী) এবং এ হাদীস অনুসারে আমলকারী। এ থেকে ওই সব লোকের শিক্ষাগ্রহণ করা চাই, যারা স্বল্প দাড়ি বিশিষ্টদের অনুবাদ পড়ে 'তাক্বলীদ' থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। ক্বোরআন-হাদীসের সমুদ্রে নিজে লাফ দিও না। কোন ইমামের জাহাজে বসেই পার হও। ফিক্বহ্ দ্বারা ওই সব হাদীস বুঝায়, যেগুলো থেকে শরীয়তের বিধানাবলী অনুমিত হতে পারে। হুযূরের পবিত্র উদ্দেশ্যও এটাই। কখনো এরূপও হতে পারে যে, হুযূরের হাদীস সংরক্ষণকারী তা থেকে সরাসরি মাসআলা বের করতে সক্ষম হবে না এবং যেসব ইমামের নিকট হাদীস পেশ করেন তাঁদের মধ্যে মাসআলা বের করার সামর্থ্য থাকবে। সুতরাং মুহাদ্দিস হাদীসকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখবেন না; বরং ফিক্বহ্ বিশারদদের সামনে পেশ করবেন। স্মর্তব্য যে, হাদীসের উৎস হচ্ছে হুযূরের মহান পবিত্র স্বত্তা এবং এর গতিধারা ফক্বীহগণের নিকট পৌঁছেই শেষ হয়।

৮৯. এ বাক্যের দু'টি ব্যাখ্যা রয়েছে: এক. على অব্যয়টি 'ب' অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ যে অন্তরে ওই তিনটি আমল থেকে কোন একটি আমল এসে যায়, তা'হলে ওই অন্তরে খিয়ানত ও হিংসা-বিদ্বেষ থাকে না। দুই. على অব্যয়টি স্বীয় অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ মুসলমানের পরিচয় এ'যে, এ তিনটি কাজে অলসতা করে না। প্রথম অর্থটি অধিক শক্তিশালী। এ তিনটি জিনিস অন্তরের রোগ-ব্যাধির ঔষধ।

৯০. অর্থাৎ নেক আমলসমূহ না দুনিয়া হাসিল করার জন্য করবে, না জান্নাত পাবার জন্য ও দোযখ থেকে রক্ষা পাবার জন্যও; বরং নিরেট আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে। যখন মহান রব সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তখন সবই অর্জিত হবে।

৯১. এভাবে যে, শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী মুসলমানদের সাহায্য করবে। যা নিজের জন্য পছন্দ করবে না, তা তাদের জন্যও পছন্দ করবে না। আক্বাইদ ও নেক আমলসমূহে তাদের সাথে থাকবে। একাকী থাকার চেয়ে মিলেমিশে থাকাকে প্রাধান্য দেবে। এ জন্যই ইসলাম ধর্ম

فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَّرَآءَهُمْ ـ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُدْخَلِ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اِلَّا اَنَّ التِّرْمِذِيَّ وَاَبَادَاؤُدَ لَمْ يَذْكُرَا ثَلٰثٌ لَايُغِلُّ عَلَيْهِنَّ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَضَّرَاللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ ـ

কেননা, তাদের দো'আ তারা ব্যতীত অন্য মুসলমানদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে।[৯২] এ হাদীস ইমাম শাফে'ঈ বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বায়হাক্বী 'মুদখাল' কিতাবে। ইমাম আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং দারেমী হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম হতে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আবূ দাউদ ثَلٰثٌ لَايُغِلُّ হতে হাদীসের শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি।

২১৬ ॥ হযরত ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহ্ পাক ওই ব্যক্তিকে সজীব রাখুন, যে আমার কাছ থেকে কোন কিছু শুনবে,[৯৩] অতঃপর যেরূপ শুনবে হুবহু সেটা অন্যকে পৌঁছিয়ে দেবে।[৯৪] কেননা, এমন বহু লোক রয়েছে, যাদের কাছে পৌঁছানো হয়, তারা ওই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বোধশক্তিসম্পন্ন হয়, যে শুনে পৌঁছিয়ে দেয়। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম দারেমী হযরত আবূদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

জুমু'আহ ও দু'ঈদ ইত্যাদিতে জামা'আতকে ফরয করেছে।

৯২. অর্থাৎ সম্মিলিত মুসলমানদের দো'আ মানুষকে শয়তানের গোমরাহীর ধোঁকা থেকে রক্ষা করে। মুসলমানদের জামা'আত থেকে যারা পৃথক হয়, তারা তাদের দো'আ থেকে বঞ্চিত। বুঝা গেলো যে, মুসলমানদের দো'আ সংরক্ষণের দুর্গ।

৯৩. অর্থাৎ আমার কাছ থেকে কিংবা আমার সাহাবীদের কাছ থেকে আমার কিংবা তাদের বাণী অথবা আমল শুনে। সুতরাং হাদীস চার প্রকারের হয়ে থাকে। হুযূরের বাণী ও কর্ম, সম্মানিত সাহাবার বাণী ও কর্ম। এ জন্য مِنَّا বহুবচন এবং شَيْئًا অনির্দিষ্ট বাচক (نَكِرَةٌ) এরশাদ হয়েছে।

৯৪. এভাবে যেন বিষয়বস্তুর পরিবর্তন না হয়, কিংবা হাদীসের শব্দাবলীতেও কোন বিকৃতি না ঘটে।

স্মর্তব্য যে, হযরত ইবনে ওমর, হযরত মালিক ইবনে আনাস, হযরত ইবনে সীরীন প্রমুখের মতে, হাদীসের মর্মার্থ নিজ ভাষায় হাদীস বলে বর্ণনা করা (رِوَايَت بِالْمَعْنٰى) হারাম। কেননা, কখনো শব্দ পরিবর্তনের কারণে অর্থও পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং বর্ণনাকারী তা বুঝতেও পারে না। আর ইমাম হাসান, শা'বী, নাখ'ঈ ও মুজাহিদ প্রমুখের মতে, অর্থগত বর্ণনা (رِوَايَت بِالْمَعْنٰى) বৈধ। কেননা, এতে বর্ণনাকারী হাদীসের শব্দাবলীকে এমনভাবে পরিবর্তন করেন, যাতে অর্থ পরিবর্তিত না হয়।

প্রথমোক্ত অভিমতে সাবধানতার কথা এবং দ্বিতীয় অভিমতে বৈধতার কথা বলা হয়েছে। তবে, উত্তম হচ্ছে শব্দগুলোও পরিবর্তন করবে না।

দেখুন, হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর নামাযে 'আ-মী-ন' বলা প্রসঙ্গে বলেছেন مَدَّبِهَا صَوْتَهٗ, কোন কোন বর্ণনাকারী তা رَفَعَ بِهَا صَوْتَهٗ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বুঝেছেন যে, উভয়ের অর্থ একই। কিন্তু পরবর্তীগণ এতে এ সংশয়ে পড়েছেন যে, এর অর্থ হয়তো উঁচু স্বরে 'আ-মী-ন' বলা। অথচ এর তরজমা ছিল 'আ-মী-ন' শব্দটিকে টেনে, 'আলিফ' বর্ণটিকে 'মদ' সহকারে বলা। অর্থগত বর্ণনার মধ্যে এ ধরনের আশঙ্কা বিদ্যমান। এ জন্যই এরশাদ হয়েছে- যেমনি শুনবে তেমনি পৌঁছিয়ে দেবে।

৯৫. দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা কিংবা প্রবল ধারণা দ্বারা এ মর্মে যে, এটা আমার হাদীস। সুতরাং 'হাদীস-ই মুতাওয়াতির' এবং 'মাশহূর' নির্দ্বিধায় বর্ণনা করো এবং 'হাদীস-ই দ্ব'ঈফ'-এর দুর্বল দিক উল্লেখ করে বর্ণনা করো। আর হাদীস-ই

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّىْ اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَّجَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّىْ اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَاْيِهٖ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

২১৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **এরশাদ করেছেন, আমার হাদীস বর্ণনা করা থেকে বেঁচে থাকো, ওইগুলো ব্যতীত, যেগুলো তোমরা ভালভাবে জানো।**[৯৫] **কেননা, যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়।**[৯৬] এ হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম ইবনে মাজাহ্ হযরত ইবনে মাস'উদ ও হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ থেকে শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। **২১৮ ॥ তাঁরই থেকে** বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ক্বোরআনের মধ্যে স্বীয় মতানুসারে কিছু বলবে, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়।**[৯৭] অপর এক বর্ণনায় আছে, **যে ব্যক্তি ক্বোরআনের কোন বিষয়ে না জানা সত্ত্বেও কিছু বলে, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়।**[৯৮] [তিরমিযী]

মাওদ্বূ'র দিকে কখনো হাতে বাড়িও না। তবে তা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য এটা বলা যায় যে, ''এটি বানোয়াট হাদীস।'' এরই ভিত্তিতে কতেক মুহাদ্দিস যথাসম্ভব 'হাদীস-ই দ্ব'ঈফ' বর্ণনাই করেন নি। যেমন- ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম। কেউ কেউ বর্ণনা তো করেছেন, তবে দুর্বল দিক অবশ্যই উল্লেখ করেছেন। যেমন- ইমাম তিরমিযী। সারকথা হচ্ছে- হাদীসের ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা চাই। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, লিপিবদ্ধ কপির উপর ভিত্তি করে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ।

৯৬. যদিও যেকোন ব্যক্তির প্রতি মিথ্যারোপ করা অপবাদের অন্তর্ভুক্ত এবং গুনাহ; কিন্তু হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি মিথ্যারোপ করা অতি জঘন্য গুনাহ্। কেননা, এটা দ্বারা দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন এসে যায়। مُتَعَمِّدًا-এর শর্তারোপ থেকে বুঝা গেলো যে, ভুলের জন্য পাকড়াও করা হবে না। যদি কোন হাদীস 'মাওদ্বূ' হওয়া সম্পর্কে জানা না থাকে এবং বর্ণনা করে বসে, তাহলে গুনাহগার হবে না।

৯৭. অর্থাৎ ক্বোরআনের 'তাফসীর-ই বির্ রায়' বা মনগড়া ব্যাখ্যাকারী জাহান্নামী। স্মর্তব্য যে, পবিত্র ক্বোরআনের কিছু বিষয় শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত দলীলের উপর নির্ভরশীল। যেমন- শানে নুযূল (অবতরণের প্রেক্ষাপট); নাসিখ-মানসূখ (রহিতকারী-রহিত) এবং তাজভীদের ক্বায়েদাসমূহ। এগুলো মনগড়াভাবে বর্ণনা করা হারাম। এখানে সেটাই উদ্দেশ্য। আর কতগুলো বিষয় শরীয়তসম্মত যুক্তি দ্বারাও বুঝা যায়। যেমন- আয়াতের জ্ঞানগত সূক্ষ্ম বিষয়াদি, উত্তম ও বিশুদ্ধ ভিন্ন ব্যাখ্যাবলী এবং উদ্ভাবিত প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিমূলক দলীল বাধ্যতামূলক নয়। মোটকথা, ক্বোরআনের মনগড়া তাফসীর হারাম এবং 'তা'ভীল বির রায়' (গবেষণালব্ধ ভিন্ন ব্যাখ্যা) ওলামা-ই দ্বীনের জন্য সাওয়াবের কাজ। এর বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' এবং (মোল্লা আলী ক্বারীর) মিরক্বাত'র এ স্থানে দেখুন। মহান রব এরশাদ করেছেন- اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ (তবে কি তারা গভীরভাবে চিন্তা করে না ক্বোরআনের মধ্যে?৪:৮২)। বুঝা গেলো যে, ক্বোরআনের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার নির্দেশ রয়েছে।

৯৮. এতে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, দ্বীনের বিজ্ঞ আলিমদের জন্য পবিত্র ক্বোরআনের দলীল ভিত্তিক ব্যাখ্যার অনুমতি রয়েছে। আলিম নয় এমন ব্যক্তির জন্য এটা হারামই। এ থেকে ওই সব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা শুধু ক্বোরআনের অনুবাদ দেখে ভুল মাসআলা বের করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে থাকে। ফিক্বহের আলো ব্যতীত, ক্বোরআন ও হাদীসের নিছক অনুবাদ সাধারণ লোকদের জন্য জীবন-নাশক বিষ সদৃশ।

وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمِرَاءُ فِي الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمًا يَتَدَارَءُوْنَ فِي الْقُرْاٰنِ

২১৯ ॥ হযরত জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত,**[৯৯] **তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ক্বোরআনের স্বীয় মতানুসারে কোন ব্যাখ্যা দিলো, অতঃপর তা যদি সঠিকও হয়, তবুও সে ভুল করলো।**[১০০] [তিরমিযী, আবূ দাঊদ] **২২০ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা** রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **এরশাদ করেছেন- ক্বোরআনের মধ্যে ঝগড়া করা কুফর।**[১০১] [আহমদ, আবূ দাঊদ] **২২১ ॥ হযরত 'আমর ইবনে শু'আয়ব** রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন,**[১০২] **তিনি বলেন, নবী করীম** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **একদল লোককে ক্বোরআনের ব্যাপারে ঝগড়া করতে শুনলেন।**[১০৩]

৯৯. তাঁর নাম জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সুফিয়ান আলাফী বাজালী। 'আলাফ' বাজালী গোত্রের একটি শাখা। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের'র ওফাতের চার বছর পর তাঁর ওফাত হয়।

১০০. অর্থাৎ যদি আলিম স্বীয় মতানুসারে ক্বোরআনের তাফসীর করে, কিংবা মূর্খ লোক মনগড়াভাবে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয় এবং ঘটনাক্রমে ওই তাফসীর ও ভিন্ন ব্যাখ্যা সঠিকও হয়ে যায়, তবুও তারা উভয়ে গুনাহ্গার হবে। কেননা, তারা নাজায়েয কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতে এরূপ হবারও সম্ভাবনা আছে যে, এ কাজে তারা দুঃসাহসী হয়ে ভুল ব্যাখ্যাও দিয়ে বসবে। সম্মানিত আলিমগণ বলেছেন যে, ক্বোরআনের তাফসীরের জন্য ওই আলিমের পনেরটি বিষয়ের পূর্ণ দক্ষতা থাকা চাই। তখনই তিনি ক্বোরআনের তাফসীরে হাত দিতে পারেন। এরূপ আলিম যদি ক্বোরআনের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ভুলও করেন তবুও সাওয়াব পাবেন। মুজতাহিদের জন্য ভুলের উপর একটি সাওয়াব এবং শুদ্ধ হলে দু'টি সাওয়াব রয়েছে। যেমন- এর বর্ণনা পরবর্তী হাদীস শরীফগুলোতে আসবে। তাফসীর ও ভিন্ন ব্যাখ্যার পার্থক্য আমি ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। তাফসীরের মধ্যে অর্থগত দৃঢ়তা থাকে। কারণ, সেটা হাদীসের কোন বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। আর তা'ভীল বা 'ভিন্ন ব্যাখ্যা'য় থাকে প্রবল ধারণা। স্মর্তব্য যে, ক্বোরআনের ওই 'তা'ভীল' (ভিন্ন ব্যাখ্যা), যা উদ্ধৃত দলীলের বিপরীত হয়, হারাম।

১০১. অর্থাৎ ক্বোরআনের আয়াতসমূহের অর্থের ক্ষেত্রে এরূপ ঝগড়া করা, যার কারণে সাধারণ মানুষ সন্দেহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তা কুফরের কাছাকাছি। কেননা, তা মানুষের কুফরের মাধ্যম।
অথবা 'মুতাশা-বিহ' (দ্ব্যর্থবোধক) আয়াতসমূহের তা'ভীল বা ভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে বিবাদ করা নি'মাতকে অস্বীকার করার নামান্তর অথবা ক্বোরআনের আয়াতসমূহ এবং 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের ক্বিরআতের আয়াতসমূহে এ ঝগড়া করা যে, সেটা আল্লাহর কালাম কিনা, কুফর।
অথবা ক্বোরআনকে নিজস্ব মতানুসারে গড়ে নেওয়ার জন্য ঝগড়া করা। অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ মতামত ও উদ্ভাবিত মাযহাব অনুসারে সেটার অনুবাদ বা তাফসীর করা কুফর। মোটকথা, হাদীসটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং এর সাথে মুফাসসির ও মুজতাহিদগণের মতভেদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তা ঝগড়া নয়; বরং তাহক্বীক্ব বা গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা।

১০২. ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর নাম 'আমর ইবনে শু'আয়ব ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে 'আস। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস সাহাবী। তাঁর পুত্র মুহাম্মদ তাবে'ঈ। যদি جَدِّهٖ'র (ه) সর্বনামটি 'আমর'র দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তাহলে এ হাদীস 'মুরসাল' পর্যায়ের। কেননা, 'আমর'র দাদা মুহাম্মদ তাবে'ঈ ছিলেন। আর যদি 'ه'(সর্বনামটি) শু'আয়ব'র দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে এ হাদীস 'মুত্তাসিল' পর্যায়ের। কেননা, শু'আয়ব'র দাদা 'আমর ইবনে 'আস সাহাবী ছিলেন। মোটকথা হাদীসটি 'মুদাল্লাস' পর্যায়ের। [মিরক্বাত]

১০৩. এভাবে যে, এক ব্যক্তি স্বীয় বক্তব্য একটি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত করছিলো এবং অপরজন তার বিপরীত বক্তব্য অন্য আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত করছিলো। এর

فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهٰذَا ضَرَبُوْا كِتَابَ اللّٰهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَّاِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللّٰهِ يُصَدِّقُ بَعْضَهُ بَعْضًا فَلَاتُكَذِّبُوْا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِّنْهُ فَقُوْلُوْا وَمَاجَهِلْتُمْ فَكِلُوْهُ اِلٰى عَالِمِهٖ۔ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ

তখন তিনি এরশাদ করলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ তারা কিতাবের কিছু অংশকে কিছু অংশের সাথে দ্বন্দ্বপূর্ণ বলে স্থির করেছিলো।[১০৪] আল্লাহ্‌র কিতাব তো এ জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে যে, তার একাংশ অন্য অংশকে সত্যায়িত করবে। সুতরাং তোমরা কোন অংশ দ্বারা অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না।[১০৫] 'কিতাব' যতটুকু জানো ততটুকুই বলো, যা জানো না তা আলিমের নিকট পেশ করো।[১০৬] [আহমদ, ইবনে মাজাহ]

ফলশ্রুতিতে শ্রোতাদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়- এভাবে যে, ক্বোরআনের আয়াতগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; ওই গুলোর মধ্যে জটিল দ্বন্দ্ব ও মতভেদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন- এক ব্যক্তি বলছে, "ভাল-মন্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়।" আল্লাহ্ পাক এরশাদ করছেন- قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ (অর্থাৎ আপনি বলুন, সবকিছু আল্লাহ্‌র নিকট থেকে)[৪:৭৮]। অপর ব্যক্তি বলছে, "না, এরূপ নয়, বরং 'ভাল' আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং 'মন্দ' আমাদের পক্ষ থেকে।" আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ؗ وَمَآاَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ

(হে শ্রোতা! তোমার নিকট যা কল্যাণ পৌঁছে, তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই এবং যে অকল্যাণ পৌঁছে, তা তোমার তরফ থেকেই।[৪:৭৯]) এটাই হচ্ছে ক্বোরআন নিয়ে ঝগড়া করা, যা হারাম; বরং কখনো কুফরের পর্যায়ের।☆

১০৪. অর্থাৎ দ্বন্দ্ব দেখিয়েছে। তারা খ্রিস্টান ও ইয়াহুদী ইত্যাদি ছিলো, যারা তাওরীত ও ইঞ্জীলের আয়াতগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেক দল ওই কিতাবদু'টির কিছু সংখ্যক আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করতে লাগলো। (আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন।)

১০৫. 'কিতাবুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র কিতাব) মানে হয়তো ক্বোরআন শরীফ অথবা সমস্ত আসমানী কিতাব। প্রথম অর্থ অধিক স্পষ্ট অর্থাৎ ক্বোরআনী আয়াতগুলো পরস্পর বিরোধী নয়; বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি বৈপরিত্য মনে হয়, তবে তা হবে আমাদের অনুধাবনের ত্রুটি; অথবা আমরা ইতিহাস সম্বন্ধে অনবগত। 'নাসিখ-মানসূখ' (রহিতকারী ও রহিত আয়াত) চিনতে পারি না। অথবা আমরা আয়াতগুলোর সঠিক অর্থ বুঝি নি।

১০৬. সুবহানাল্লাহ্! কতই উত্তম শিক্ষা! মূর্খ লোকেরা ক্বোরআনের তাফসীরের দিকে যেন হাত না বাড়ায়। যখন অজ্ঞ লোক রোগীর চিকিৎসা করতে পারে না, ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত কেউ হাত লাগাতে পারে না, এমনকি অনভিজ্ঞ নাপিতও মাথা মুণ্ডাতে পারে না, তখন কোন অজ্ঞ লোক ক্বোরআনের তাফসীরে কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে?

সূক্ষ্মবিষয়

জনৈক ব্যক্তি একজন আলিমকে বললেন, "ক্বিয়ামতের দিন কত বড়? ক্বোরআন সেটাকে এক হাজার বছরও বলে এবং পঞ্চাশ হাজার বছরও বলে। হাদীস তো সেটাকে মহা গযবেই পরিণত করে দিয়েছে। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে যে, তা চার রাক্'আত নামায সম্পন্ন করার পরিমাণ হবে। এখন তো না ক্বোরআনের গ্রহণযোগ্যতা রইলো, না হাদীসের? (না'উযু বিল্লাহ্!)" তখন বিজ্ঞ আলিমটি বললেন, ক্বোরআন ও হাদীস আপন আপন জায়গায় সঠিক। তোমার বোধশক্তি ত্রুটিপূর্ণ। ওই দিনটি এক হাজার বছরের সমান; কিন্তু কাফিরদের নিকট কষ্টের কারণে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমতুল্য অনুভূত হবে আর মু'মিনের নিকট প্রশান্তির কারণে দশ মিনিটের ন্যায় অনুভূত হবে; যেমনিভাবে, একটি রাত অসুস্থ ব্যক্তির কাছে অতি দীর্ঘ, সুস্থ লোকের নিকট ক্ষুদ্র এবং যে ব্যক্তি তার প্রিয় বন্ধুর সান্নিধ্যে কাটায় তার নিকট কয়েক মিনিটের মতই অনুভূত হয়।

☆ লক্ষণীয় যে, এখানে এ বিষয়ের প্রতি মনযোগ দিলে বাদানুবাদের কোন অবকাশ থাকে না যে, প্রতিটি আরাম ও মুসীবৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই আসে; হ্যাঁ, আমরাই এর কারণাদি প্রস্তুত করি। নেকী হচ্ছে আরামের মাধ্যমে, পক্ষান্তরে গুনাহ্ হচ্ছে মুসীবতের কারণ। সুতরাং এ আয়াত এর পরবর্তী আয়াত (فَمِنْ نَّفْسِكَ...)'র মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। উভয় আয়াত আপন আপন স্থানে ঠিক আছে। এতদসত্ত্বেও ক্বোরআন নিয়ে বাদানুবাদ করতে হুযূর কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। -[তাফসীর-ই নূরুল ইরফান]

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ لِكُلِّ اٰيَةٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَّبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُّطَّلَعٌ - رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২২২ ॥ হযরত ইবনে মাস্‌'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ক্বোরআন সাত পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে।[১০৭] ওইগুলোর প্রতিটি আয়াতের প্রকাশ্য অর্থও আছে, অপ্রকাশ্য অর্থও।[১০৮] আর প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের একটি সীমা রয়েছে, যেখান থেকে তা অবগত হওয়া যায়।[১০৯] (শরহে সুন্নাহ্)

১০৭. 'তরীক্বাগুলো' (পদ্ধতিসমূহ) দ্বারা হয়তো আরবির পরিভাষাসমূহ বুঝানো উদ্দেশ্য, যেহেতু আরবে সাতটি গোত্র 'ফাসাহাত' ও 'বালাগাত' (অলঙ্কার শাস্ত্র)-এ প্রসিদ্ধ ছিলো- ক্বোরাঈশ, সাক্বীফ, ত্বাই, হাওয়াযিন, হুযায়ল, ইয়ামেন ও তামীম। তাদের ভাষায় পরস্পরের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা ছিলো; যেমনিভাবে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌবাসীর উর্দূ ভাষায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

পবিত্র ক্বোরআন ক্বোরাঈশের ভাষায় নাযিল হয়েছে, যা অন্যান্য গোত্রের জন্য কিছুটা কঠিন ছিলো। এ জন্য তাদেরকে নিজ ভাষায় তিলাওয়াত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। নবী করীমের যুগে সাধারণত ক্বোরাঈশের ভাষায় তিলাওয়াত করা হতো। কিন্তু কিছু লোক অন্য ক্বিরআতেও তিলাওয়াত করতো। হুযূরের ওফাত শরীফের পর এ ভিন্নতা ফ্যাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফতকালে যখন পবিত্র ক্বোরআন কিতাবাকারে সঙ্কলন করা হলো। তখন ক্বোরাঈশের পরিভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছিলো, যা অনুসারে ক্বোরআন নাযিল হয়েছিলো। অন্য ক্বিরআতগুলো নিঃশ্বেষ করে দেওয়া হলো। যাতে মুসলমানদের মধ্যে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের মতো মতবিরোধ সৃষ্টি না হয়। এতে ক্বোরআনের মধ্যে বিকৃতিসাধন ছিলো না; বরং ফ্যাসাদকে দূরীভূত করারই উদ্দেশ্য ছিলো। উহারণস্বরূপ- وَلَاتَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ আয়াতাংশে اُفٍّ শব্দটি ক্বোরাঈশের ভাষায় 'আলিফ' বর্ণে পেশ, 'ফা' বর্ণে তাশদীদ-যের ও তানভীন দ্বারা পড়া হয়। কিন্তু অন্যান্য গোত্রগুলোর ভাষায় 'আলিফ' বর্ণে যবর কিংবা যের, 'ফা' বর্ণে যবর কিংবা যের তানভীন ব্যতীত, তাশদীদ কিংবা তাশদীদ ব্যতীত (যথাক্রমে اَفْ, اَفِ ,اَفَّ ,اَفِّ ও اِفِّ)। অর্থ সবক্ষেত্রে একই, (কেবল) উচ্চারণের ক্ষেত্রেই এতো পার্থক্য।

অথবা, এটা দ্বারা 'সাত ক্বিরআত' বুঝানো উদ্দেশ্য। যেমন مَالِكِ/مَلِكِ/مَلِيْكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ইত্যাদি।

অথবা এর অর্থ হচ্ছে- সাতটি অর্থের উপর পবিত্র ক্বোরআন নাযিল হয়েছে- 'আমর' (আদেশ), 'নাহী' (নিষেধ), 'মেসাল' (উপমা), 'কিস্‌সা' (পূর্ববর্তী ঘটনাবলী), 'ওয়াদা' (প্রতিশ্রুতি), ধমক এবং নসীহতসমূহ।

অথবা, ক্বোরআন সাতটি বিষয় নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে- 'আক্বাইদ' (ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াদি), 'আহকাম' (আমল সম্পর্কিত বিষয়াদি), 'আখলাক্ব' (স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়াদি), 'হালাল' (বৈধ), 'হারাম' (অবৈধ), 'মুহকাম' (সুস্পষ্ট অর্থবোধক) ও 'মুতাশাবিহ' (দ্ব্যর্থবোধক)। তাছাড়া, আলোচ্য হাদীসের আরো বহু ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১০৮. অর্থাৎ ক্বোরআনের প্রতিটি আয়াতের যাহেরী (প্রকাশ্য) অর্থও রয়েছে এবং বাত্বেনী (অপ্রকাশ্য) অর্থও। যাহেরী অর্থ হচ্ছে এর শাব্দিক অনুবাদ। বাত্বেনী অর্থ হচ্ছে সেটার মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য।

অথবা, যাহেরী হচ্ছে শরীয়ত এবং বাত্বেনী হচ্ছে তরীক্বত।

অথবা, যাহেরী হচ্ছে আহকাম (শরীয়তের বিধানাবলী), এবং বাত্বেনী হচ্ছে আসরার (গোপনীয় রহস্যাবলী)।

অথবা, যাহের হচ্ছে ওই সব বিষয়, যেগুলো সম্পর্কে আলিমগণ অবগত, আর বাত্বেন হচ্ছে ওই সব বিষয়, যেগুলো সম্পর্কে সম্মানিত সূফী ও ওলীগণ অবগত।

অথবা, যাহের হচ্ছে, যা শরীয়তের উদ্ধৃতিমূলক দলীল দ্বারা অবগত হওয়া যায় আর বাত্বেন হচ্ছে, যা কাশ্‌ফ (আউলিয়া-ই কেরামের অন্তর্দৃষ্টি) দ্বারা জানা যায়। যেমন- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ (হে ঈমানদারগণ! জিহাদ করো ওইসব কাফিরদের সাথে, যারা তোমাদের নিকটবর্তী।(৯:১২৩) এ আয়াতের যাহেরী অর্থ হচ্ছে-"নিজেদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে লোহার তরবারী ইত্যাদি দ্বারা জিহাদ করো।" আর বাত্বেনী অর্থ হচ্ছে- "নিকটবর্তী কাফির অর্থাৎ নাফ্‌সে আম্মারার সাথে কঠোরতম ইবাদত- বন্দেগীর তরবারী এবং আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমে জিহাদ করো।"

১০৯. 'হদ্দে মুত্তালা' পাহাড়ের ওই চূড়া বা উঁচু টিলা, যেখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত জিনিসপত্র দেখা যায়। অর্থাৎ ক্বোরআনের 'যাহের' ও 'বাত্বেন' অনুধাবন করার জন্য

وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِلْمُ ثَلٰثَةٌ اٰيَةٌ مُّحْكَمَةٌ اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَّمَا كَانَ سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ- رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

২২৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **এরশাদ করেছেন, "ইল্ম তিনটি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, স্থায়ী ও মজবুত সুন্নাত এবং ওইগুলোর সমকক্ষ, 'ফরয'।**[১১০] **এগুলো ছাড়া বাকী সবই অতিরিক্ত।"**[১১১] [আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ]

আলাদা আলাদা ক্ষেত্র বিদ্যমান। সুতরাং সেটার 'যাহের' আলেমদের কাছ থেকে এবং 'বাত্বেন' পীর-মাশাইখের নিকট থেকে জানা যায়।

অথবা, 'যাহের' উক্তি থেকে এবং 'বাত্বেন অবস্থা থেকে,

অথবা, 'যাহের' কার্যকলাপ দ্বারা এবং 'বাত্বেন' বিলীন হওয়া দ্বারা,

অথবা, 'যাহের' কিতাব দ্বারা এবং 'বাত্বেন' কোন নেক বান্দার কৃপাদৃষ্টি দ্বারা অনুধাবন করা যায়। কবির ভাষায়-

دین مجو اندر کتب اے بے خبر
علم و حکمت از کتب دین از نظر

صد کتاب و صد ورق در نار کن
روئے دل را جانب دلدار کن

অর্থাৎ: ক. ওহে নির্বোধ! দ্বীনের গূঢ় রহস্য কিতাবাদিতে অনুসন্ধান করো না। জ্ঞান-বিজ্ঞান কিতাবগুলো থেকে পাওয়া যায়, আর দ্বীন পাওয়া যায় আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের কৃপাদৃষ্টি থেকে।

খ. শত কিতাব ও শত কিতাবের পাতা আগুনে নিক্ষেপ করো। হৃদয়কে হৃদয়সম্পন্ন (ওলীগণের)-এর দিকে ফিরিয়ে দাও। (কবির এ উক্তির মর্মার্থ এও হতে পারে যে, তিনি কিতাবগুলো খোদাপ্রেমের আগুনে নিক্ষেপ করতে বলেছেন)।☆

মোটকথা, যেমনিভাবে ক্বোরআনের যাহেরী শব্দাবলী মিয়াজীর কাছ থেকে, তাজভীদ ক্বারীর কাছ থেকে, হিফয্ হাফিযের কাছ থেকে, অর্থ আলিমের কাছ থেকে, আহকাম (বিধানাবলী) মুজতাহিদের কাছ থেকে শেখা যায়, তেমনিভাবে সেটার আসরার (গোপন নিগূঢ় তত্ত্ব) পীর-মাশাইখের নিকট থেকেই অর্জন করা যায়। প্রত্যেকটি সম্পর্কে অবগত হবার ক্ষেত্র আলাদা।

স্মর্তব্য যে, পীর-মাশাইখ হলেন- ওই সমস্ত ব্যক্তি, যাঁরা শরীয়ত ও তরীক্বতের ধারক, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অকৃত্রিম প্রেমিক এবং তাঁর দ্বীনের একনিষ্ঠ প্রচারক। ওই মূর্খ সূফী, যে শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে ওলী হয়ে বসেছে, অথচ ফাসিক্ব ও পাপাচারী, তার কথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

১১০. অর্থাৎ 'ইলমে দ্বীন' হচ্ছে ওইসব বিষয় জানার নাম, (যেগুলো) আহকাম বা বিধানাবলী বলবৎ (রহিত হয় নি এমন) আয়াতগুলো বিস্তারিতভাবে, রহিত হয় নি এমন সহীহ হাদীসসমূহ, উম্মতের ইজমা' এবং ওই ক্বিয়াস, যা অনুসারে কিতাব ও সুন্নাহ্র মতো আমল করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

স্মর্তব্য যে, এখানে 'ফরী-দ্বাহ্' দ্বারা 'ইলমে ফারাইদ্ব' (ইলমে মীরাস) বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা, তা কিতাব ও সুন্নাহ্র অন্তর্ভুক্ত; বরং 'ইলমে ফিক্বহ' বুঝানো উদ্দেশ্য। 'আ-দিলাহ্' অর্থ বরাবর বা সমান। [মিরক্বাত ও আশি"আহ]

১১১. অর্থাৎ এ তিনটি ব্যতীত বাক্বীগুলো 'ইলম-ই দ্বীন' নয়; বরং অতিরিক্ত।

স্মর্তব্য যে, 'সরফ' (শব্দপ্রকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান) ও 'নাহভ' (শব্দ ও বাক্য প্রকরণ) ইত্যাদি ক্বোরআন ও হাদীস বুঝার জন্যই। আর 'উসূল ফিক্বহ' ও 'উসূলে হাদীস' ইত্যাদি এই ইলমের সহযোগী। যারা ওইগুলোকেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে, তারা বড় বোকা। কবির ভাষায়-

علم دین فقہ است تفسیر و حدیث
ہر کہ جوید غیر ازیں باشد خبیث

অর্থাৎ ইলমে দ্বীন হচ্ছে ফিক্বহ, তাফসীর ও হাদীস। এগুলো ব্যতীত যে ব্যক্তি অন্য কিছু (মূল হিসেবে) অন্বেষণ করে সে খবীস।

☆ অর্থাৎ ক্বোরআন-হাদীস আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রেম ও ভক্তিসহকারে পড়তে হবে। আর নিজে আল্লাহ্র ওলীগণের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। অর্থাৎ এখানে 'আগুন' রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কিতাব আগুনে জ্বালিয়ে ফেলা উদ্দেশ্য নয়। বরং এতে প্রেম-ভক্তিসহকারে কিতাব পড়ে আল্লাহ্র প্রিয়বান্দাদের রূহানী ফুয়ূয হাসিল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, ইলম-ই দ্বীন ছাড়া আল্লাহ্র পরিচিতি (মা'রিফাত) লাভ করা আদৌ সম্ভবপর নয়।

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقُصُّ اِلَّا اَمِيْرٌ اَوْ مَامُوْرٌ اَوْ مُخْتَالٌ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ فِىْ رِوَايَتِهٖ اَوْمُرَاءٍ بَدْلَ اَوْمُخْتَالٌ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهٗ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهٖ فَقَدْ خَانَهٗ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاُغْلُوْطَاتِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ

২২৪ ॥ হযরত 'আউফ ইবনে মালিক আল্-আশ্জা'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত,**[১১২] **তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **এরশাদ করেছেন, হাকিম (শাসক) কিংবা প্রজা অথবা অহঙ্কারী ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কিস্সা-কাহিনী বলে না।**[১১৩] এ হাদীস আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন। আর দারেমী হযরত 'আমর ইবনে শু'আইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনায় **مختال** (অহঙ্কারী)'র স্থলে **مِرَآءٍ** বা 'রিয়াকার' রয়েছে। **২২৫ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা** রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি না জানা সত্ত্বেও ফাত্ওয়া দেয়, তার গুনাহ্ ফাত্ওয়া গ্রহণকারীর উপর বর্তায়।**[১১৪] **যে ব্যক্তি আপন ভাইকে কোন বিষয়ের পরামর্শ এ কথা জানা সত্ত্বেও দেয় যে, সেটার বিপরীতটাই সঠিক, তাহলে সে তার খিয়ানত করলো।**[১১৫] [আবূ দাঊদ] **২২৬ ॥ হযরত মু'আবিয়া** রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু **হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম **জটিল বিষয়াদি জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করেছেন।**[১১৬] [আবূ দাঊদ শরীফ]

---

১১২. তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী। খায়বরের যুদ্ধে প্রিয়নবীর সাথে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন আশ্জা' গোত্রের পতাকা তাঁর হাতেই ছিলো। তিনি সিরিয়ায় বসবাস করতেন এবং ৭৩ হিজরীতে সেখানেই ওফাত পান।

১১৩. পরিভাষায়, রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং সাধারণ বক্তব্যগুলোকে 'কিস্সা' (قِصَّةٌ) বলা হয় আর যাতে শরীয়তের বিধানাবলীর প্রচারণা থাকে, তাকে ওয়ায-নসীহত বলা হয়। বর্তমানে প্রচলিত ওয়ায কিস্সার নামান্তর। ওয়া'ইযগণ হলেন সাধারণ বক্তা। অর্থাৎ রাজনৈতিক বক্তৃতা হয়তো বাদশাহ্ করেন অথবা তাঁর অধীনস্থ প্রশাসকগণ অথবা করেন রাজনৈতিক অহঙ্কারী নেতৃবৃন্দ- জনগণের মধ্যে নিজের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। আলিমদের কাজ এটা নয়, আলিমদের ওয়ায শরীয়তের বিধানাবলীর প্রস্রবণ এবং দ্বীন প্রচারের উৎস হওয়া চাই। এ হাদীস হিদায়াতের ভাণ্ডার।

১১৪. এর দু'টি অর্থ হতে পারে: এক. যে ব্যক্তি আলিমদের বাদ দিয়ে মূর্খদেরকে মাসআলা (সমাধান) জিজ্ঞেস করে এবং সে ভুল মাসআলা বলে, তাহলে জিজ্ঞেসকারীও গুনাহ্গার হবে। কারণ সে আলিমকে বাদ দিয়ে তার কাছে কেন গেলো? সে তা জিজ্ঞেস না করলে ওই ব্যক্তিও ভুল বলতো না। তখন اُفْتِىَ অর্থ اِسْتُفْتِىَ হবে। (অর্থাৎ যে ফাত্ওয়া তলব করে।) দুই. যে ব্যক্তিকে ভুল ফাত্ওয়া দেওয়া হলো তার গুনাহ্ ফাত্ওয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে। তখন প্রথম اُفْتِىَ শব্দটি مَجْهُوْل শব্দরূপে হবে। সারকথা হলো- ইলমশূন্য ব্যক্তির শরীয়তের মাসআলা বর্ণনা করা জঘন্য গুনাহ্।

১১৫. অর্থাৎ যদি কোন মুসলমান কারো কাছ থেকে পরামর্শ নেয় এবং সে জেনেশুনে ভুল পরামর্শ দেয়, যেন সে মুসীবতে পতিত হয়, তাহলে ওই পরামর্শদাতা পরিপক্ক খিয়ানতকারী। খিয়ানত শুধু মালের ব্যাপারে হয়না, বরং গোপন তথ্য, মান-মর্যাদা ও পরামর্শ সবকিছুতেই (খিয়ানত) হয়ে থাকে।

১১৬. অর্থাৎ সর্ব সাধারণের সামনে ফিক্বহী শাস্ত্রের জটিল বিষয়াদি পেশ করা এবং সেগুলোর সমাধান না করা, অথবা আলিমদের একজন অন্যজনকে অপমান করা এবং নিজের বড়াই প্রকাশ করার জন্য শরীয়তের জটিল বিষয়াদি

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَاِنِّىْ مَقْبُوْضٌ-رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَشَخَصَ بِبَصَرِهٖ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا اَوَانٌ يُخْتَلَسُ فِيْهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتّٰى لَايَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلٰى شَىْءٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

২২৭ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা ইলমে মীরাস ও ক্বোরআন মজীদ শিক্ষা করো এবং মানুষকে শিক্ষাদান করো। কারণ, আমি ওফাতবরণকারী।[১১৭] [তিরমিযী]

২২৮ ॥ হযরত আবুদ্দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে ছিলাম। তিনি আসমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। অতঃপর এরশাদ করলেন, এটা ওই সময়, যখন মানুষের কাছ থেকে ইল্‌ম তুলে নেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তারা কোন কিছুতে সক্ষম হবে না।[১১৮] [তিরমিযী]

জিজ্ঞেস করা না-জায়েয। কেননা, এটা মু'মিনকে কষ্ট দেওয়ার কারণ হয়। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা তীক্ষ্ণ করে তোলার জন্য শিক্ষক ফিক্বহ্ শাস্ত্রের জটিল- কঠিন বিষয়াদি জিজ্ঞেস করা সম্পূর্ণ জায়েয। যেমন- এটা জিজ্ঞেস করা যে, কোন্ সফরে 'ক্বসর' নেই। কিংবা কোন্ অবস্থায় নামাযী স্বীয় ঘরে ওয়াক্বতিয়া নামায 'ক্বসর' সহকারে পড়বে? অথবা কোন্ অবস্থায় নামায পড়লে তা শুদ্ধ হবে না কিন্তু পরে নিজে নিজেই শুদ্ধ হয়ে যাবে? অথবা ওই বুযুর্গ ব্যক্তি কে, যাঁর নিজের বয়স চল্লিশ বছর, পুত্রের বয়স একশ' বছর আর পৌত্রের বয়স নব্বই বছর ছিল? এবং তিন জনই একই সময়ে জীবিত ছিলেন।☆ এ ধরনের শরীয়তের বহু সূক্ষ্ম বিষয় আল্লামা শামী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এগুলো দ্বারা মেধাকে তীক্ষ্ণ করা উদ্দেশ্য; কাউকে অপমান করা নয়।

১১৭. অর্থাৎ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বদা থেকে যাবো না। আমার ওফাতের আগে ক্বোরআন-ই হাকীমের সকল বিধান বিশেষতঃ ইলমে মীরাস আমার নিকট থেকে শিখে নাও এবং তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের নিকট থেকে শিখবে। যেহেতু ইল্‌মে মীরাস দ্বারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল প্রকার ইল্‌ম'র সম্পর্ক জীবনের সাথে আর এটার সম্পর্ক মৃত্যুর সাথে। তাছাড়া, ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে ওই ইল্‌ম দুনিয়া থেকে ওঠে যাবে। এ জন্য বিশেষভাবে সেটা শেখার তাকীদ দিয়েছেন।

১১৮. ইল্‌ম দ্বারা 'ইলমে দ্বীন' বুঝানো উদ্দেশ্য এবং এ ঘটনা ক্বিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে ঘটবে; যখন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, ইলমে দ্বীন হ্রাস পাবে; বরং একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ আলিমগণ ওফাত পাবেন এবং অন্য আলিম জন্ম নেবেন না।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূরের মুবারক দৃষ্টি হাজার বছর পরে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীও প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। তাঁর জন্য অস্তিত্বহীন, অস্তিত্বসম্পন্ন, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই সমান। যেমন এরশাদ ফরমাচ্ছেন- هٰذَا اَوَانٌ, যেমনিভাবে আমরা ধারণা ও স্বপ্নে আগের পেছনের বিভিন্ন জিনিস, সেগুলোর আকৃতিসহ দেখে থাকি। মিসরের বাদশাহ অনাগত দুর্ভিক্ষের বছরগুলোকে গাভী ও গমের শীষের আকৃতিতে স্বপ্ন দেখেন। নবীগণ এবং তাঁদের বদৌলতে কতেক ওলীর দৃষ্টিশক্তি আমাদের ধারণা ও স্বপ্ন থেকে বহুগুণ বেশী শক্তিশালী হয়। মাওলানা রূমী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন-

اب بلکہ قبل از زادن تو سالہا - مرا ترا بینید بچندیں حالہا

(এখন, বরং তোমার জন্মের বহু বছর পূর্বের, আমার, তোমার সব অবস্থাই তিনি দেখতে পান।) হুযূর মি'রাজে দোযখীদের ওই আযাব প্রত্যক্ষ করেছেন, যা ক্বিয়ামতের পরে সংঘটিত হবে।

☆ আখিরাতের সফরে ক্বসর নেই। আরাফাতের ময়দানে হাজ্বীগণ নিজ তাঁবুতে ক্বসর পড়বেন। সাহেবে তারতীব (যার নামায ক্বাযা হয়না) সঙ্গত কারণে নামায ক্বাযা হলে ওই ক্বাযা নামায না পড়া পর্যন্ত (তাঁর নামায হবে না,) ঝুলন্ত থাকবে। অতঃপর ক্বাযা পড়া মাত্রই ওই ঝুলন্ত নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর ওই বুযুর্গ ব্যক্তি হলেন- হযরত ওযায়র আলায়হিস্ সালাম; যিনি ১০০ বছর পর জীবিত হয়ে তাঁর পুত্র ও পৌত্রকে জীবিত অবস্থায় পেয়েছিলেন; তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর।

وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رِوَایَةً یُوْشِکُ اَنْ یَّضْرِبَ النَّاسُ اَکْبَادَ الْاِبِلِ یَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَلَایَجِدُوْنَ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِیْنَةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَفِیْ جَامِعِهٖ قَالَ اِبْنُ عُیَیْنَةَ اَنَّهٗ مَالِکُ بْنُ اَنَسٍ وَمِثْلُهٗ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰی وَسَمِعْتُ اِبْنَ عُیَیْنَةَ اَنَّهٗ قَالَ هُوَ الْعُمَرِیُّ الزَّاهِدُ وَاسْمُهٗ عَبْدُ الْعَزِیْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَنْهُ فِیْمَا اَعْلَمُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ یَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰی رَأْسِ کُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَّنْ یُّجَدِّدُ لَهَا دِیْنَهَا - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ

২২৯ ॥ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে একটি হাদীস বর্ণিত,[১১৯] মানুষ ইল্‌ম অন্বেষণ করতে গিয়ে উটের বুক চিরে ফেলবে। তখন মদীনার একজন আলিমের চেয়ে বড় কোন আলিম পাবে না।[১২০] এটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর জামে' কিতাবে আছে যে, ইবনে উয়ায়নাহ্ বলেছেন, তিনি হচ্ছেন মালেক ইবনে আনাস। অনুরূপ, আবদুর রায্‌যাক্ব হতে বর্ণিত আছে,[১২১] ইসহাক্ব ইবনে মূসা বলেছেন, আমি ইবনে উয়ায়নাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি হচ্ছেন- 'উমরী যাহিদ।' তাঁর নাম আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ্।[১২২]

২৩০ ॥ তাঁরই হতে বর্ণিত, আমার জানা মতে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত,[১২৩] তিনি এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের জন্য প্রতি একশ' বছরের মাথায় একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করতে থাকবেন, যিনি তাঁদের দ্বীনকে পুনর্জীবিত করবেন।[১২৪] [আবূ দাঊদ]

১১৯. অর্থাৎ এ কথাটি তাঁর নিজের নয়, বরং হুযূরের বাণী। এটা মারফূ' পর্যায়ের হাদীস (অর্থাৎ এর বর্ণনাসূত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে সমাপ্ত হয়); 'মওকূফ' (অর্থাৎ এর সূত্র সাহাবীতে সমাপ্ত) নয়।

১২০. অর্থাৎ আমার পরে অদূর ভবিষ্যতে লোকেরা ইল্‌ম অন্বেষণের জন্য চতুর্দিকে সফর করবে। আর তখন মদীনা মুনাওয়ারায় এমন একজন আলিম হবেন যে, ওই সময় মদীনা মুনাওয়ারায়ও কোন আলিম তাঁর সমকক্ষ থাকবেন না; অন্য কোথাও তো দূরের কথা।

১২১. অর্থাৎ দু'জন বুযুর্গ (হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ্ ও ইমাম আবদুর্ রায্‌যাক্ব)-এর অভিমত হচ্ছে- ওই আলিম হলেন হযরত ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলায়হি; যেহেতু তিনি মাযহাবের ইমাম এবং ইমাম শাফে'ঈ রহমাতুল্লাহি আলায়হির ওস্তাদ।

স্মর্তব্য যে, এটা ওই সময়ানুসারে। অন্যথায় ইমাম মালিকের পূর্বে হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রমুখ বড় বড় আলিম ছিলেন।

১২২. তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে হাফ্‌স ইবনে আসিম ইবনে খাত্তাব। কিন্তু প্রথম অভিমত অধিকতর শুদ্ধ। আশি''আতুল লুম'আত প্রণেতা বলেছেন যে, এ ঘটনা ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে, যখন ইল্‌মে দ্বীন মদীনা মুনাওয়ারায় সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

১২৩. এ উক্তি হাদীস বর্ণনাকারীর সূত্রের কোন অধস্তন বর্ণনাকারীর। তিনি বলেছেন আমার বেশীর ভাগ ধারণা হচ্ছে- এ হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটা তাঁর নিজস্ব উক্তি নয়।

১২৪. অর্থাৎ এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এমনি তো তাদের মধ্যে সর্বদা ওলামা ও আউলিয়া হতে থাকবেন; কিন্তু প্রতি শতাব্দির শুরুতে কিংবা শেষভাগে বিশেষ বিশেষ সংস্কারকের জন্ম হতে থাকবে, যাঁরা সুন্নাতগুলো প্রচার করবেন, বিদ'আতগুলো নির্মূল করবেন এবং ক্বোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যার মূলোৎপাটন করবেন। সঠিক অর্থে দ্বীনের প্রচার করবেন।

স্মর্তব্য যে, এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে অনেক লোক নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী 'মুজাদ্দিদ' গণনা করেছে।

وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَذَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهٗ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ- رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ كِتَابِ الْمُدْخَلِ مُرْسَلًا وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ جَابِرٍ فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ فِىْ بَابِ التَّيَمُّمِ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

২৩১ ‖ হযরত ইব্রাহীম ইবনে আবদুর রহমান 'আযারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[১২৫] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এ ইল্‌মকে পরবর্তী প্রত্যেক দলের পরহেয্‌গার লোকেরাই বহন করে নিয়ে যাবে,[১২৬] যারা সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিবর্তন, মিথ্যুকদের মিথ্যা বর্ণনা এবং মূর্খদের হেরফের (অপব্যাখ্যা) ওই ইল্‌মে দ্বীন থেকে দূরীভূত করতে থাকবে।[১২৭] এ হাদীস ইমাম বায়হাক্বী 'মুদখাল' কিতাবে 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[১২৮] আমি হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র হাদীস- فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা 'তায়াম্মুম'র বিবরণ শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণনা করবো।

অর্থাৎ প্রথম শতাব্দীতে অমুক, দ্বিতীয় শতাব্দীতে অমুক। দ্বীনের মধ্যে অনেক ফিৎনা-ফ্যাসাদকারী লোকও নিজেদেরকে 'মুজাদ্দিদ' বলে দাবী করেছে।

মির্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী প্রথমে নিজেকে মুজাদ্দিদ বানিয়েছিলো। অতঃপর নবী দাবী করলো।

সঠিক অভিমত হচ্ছে- এটা দ্বারা না কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে, না কোন নির্দিষ্ট দল। কখনো ইসলামী বাদশাহ্, কখনো মুহাদ্দিসীন-ই কেরাম, কখনো সম্মানিত ফিক্বহ্ বিশারদগণ, কখনো সূফীগণ, কখনো ধনীগণ, কখনো কোন শাসক দ্বীনের সংস্কার সাধন করবেন। কখনো একজন, কখনো তাঁর দল। যিনি দ্বীনের এ বিশেষ খিদমত করবেন, তিনিই 'মুজাদ্দিদ'। যেমন- এক যুগে হযরত সুলতান মুহিউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর রহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন, যিনি ইসলাম ধর্ম থেকে আকবরী বিদ'আতকে দূর করেছেন এবং যেমন যুগের কুত্‌ব হযরত মুজাদ্দিদ-ই আলফ-ই সানী শায়খ আহমদ সরহিন্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

অথবা এ যুগের শীর্ষস্থানীয় আলিম আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রেযা খান সাহেব বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। যেহেতু তাঁরা স্বীয় বক্তব্য ও লেখনী দ্বারা হক্ব ও বাত্বিলকে পৃথকভাবে বাছাই করে রেখেছেন।

১২৫. 'আযারী' 'বনী খুযাফা' গোত্রের একটি শাখার দিকে সম্পৃক্ত। যারা আযরাহ্ ইবনে সা'দের বংশধর। খুবসম্ভব, তিনি সাহাবী।

আর তিনি যদি তাবে'ঈ হন, তাহলে এ হাদীস 'মুরসাল' পর্যায়ের। কেননা, সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয় নি।

১২৬. এতে অদৃশ্যের বিষয়ের শুভসংবাদ রয়েছে। অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার দ্বীনের মধ্যে দ্বীনদার ওলামা-ই কেরামের জন্ম হতে থাকবে, যাঁরা ইল্‌মে দ্বীন পড়তে পড়াতে এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসার করতে থাকবে।

স্মর্তব্য যে, পূর্ববর্তী নেক বান্দাদেরকে 'সালাফ (سَلَف) এবং পরবর্তী নেক বান্দাদেরকে 'খলফ' (خَلَف) বলা হয়। সুতরাং নেক বান্দাদের প্রত্যেক দল পূর্ববর্তীদের 'খলাফ' এবং পরবর্তীদের তুলনায় 'সালাফ' হিসেবে বিবেচ্য।

১২৭. অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে কিছু মূর্খলোক আলিম সেজে ক্বোরআন ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা এবং অর্থগত পরিবর্তন সাধন করবে। আর ওইসব মাক্ববূল বান্দার দল ওইসবক'টি দূরীভূত করবেন।

আলহামদু লিল্লাহ্! আজ পর্যন্ত এমনি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। দেখুন- ওলামা-ই দ্বীনের পৃষ্ঠপোষকতা না সরকার করছে, না জাতি। কিন্তু তবুও এ দল উত্তরোত্তর জন্মলাভ করছে এবং দ্বীনের খিদমত ধারাবাহিকভাবে করেই যাচ্ছেন। বা-রাকাল্লা-হু তা'আ-লা- ফী-হিম (মহান আল্লাহ্ তাঁদের মধ্যে বরকত দান করুন।)

১২৮. এতে বুঝা গেলো যে, হযরত ইব্রাহীম ইবনে আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাবে'ঈ।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ◆ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَّاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَّجُلَيْنِ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ◆ ২৩২ || হযরত হাসান[১২৯] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার নিকট এমতাবস্থায় মৃত্যু আসবে যে, সে ইসলামকে জীবিত করার জন্যই ইল্‌ম শিক্ষা করছে,[১৩০] তাহলে বেহেশ্‌তে তার ও নবীগণের মধ্যে একটি মাত্র ব্যবধান থাকবে।[১৩১] [দারেমী]

২৩৩ || তাঁরই (হযরত হাসান বসরী) হতে 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণিত,[১৩২] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওই দু'ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো,

---

১২৯. হাদীস শাস্ত্রে যখন 'হাসান' নামটি নিঃশর্তভাবে বলা হবে, তখন তা দ্বারা হযরত খাজা হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বুঝায়। তাঁর পিতার নাম আবূ সা'ঈদ, যিনি যায়দ ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর পিতা ইয়াসারকে রুবাইয়্যা' বিনতে নাদ্বীর আযাদ করেছিলেন।

খাজা হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত ফারূক্ব-ই আ'যমের খিলাফতকালে হযরত ফারূক্ব-ই আ'যমের শাহাদাতের দু'বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় মুবারক হাতে তাঁর 'তাহনীক' (বরকতের জন্য চিবিয়ে শিশুর মুখে খেজুর ইত্যাদি মিষ্টান্নদ্রব্য প্রদান) করেছিলেন। তাঁর মাতা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা'র দাসী ছিলেন। বহুবার হযরত উম্মে সালমাহ্ তাঁর মায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁকে দুধ মুবারক পান করিয়েছেন। এর বরকতেই তিনি এত বড় আলিম এবং ওই সময়কার ইমাম হয়েছিলেন।

হযরত ওসমানের শাহাদাতের পর তিনি বসরায় চলে যান। তিনি অনেক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি আপন যুগের ইমাম, বড় মুত্তাক্বী-পরহেযগার ছিলেন। ১১০ হিজরীর রজব মাসে বসরায় তাঁর ইন্তিক্বাল হয়। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মাযার শরীফ সর্বযুগের মানুষের যিয়ারতস্থল। (ইকমাল) আমি অধম তাঁর নূরানী মাযার যিয়ারত করেছি।

১৩০. প্রকাশ থাকে যে, এতে ওই শিক্ষার্থী সম্পর্কে বুঝানো হয়েছে, যে পরিপূর্ণ আলেমে দ্বীন হবার সুযোগ পায় নি। ছাত্রজীবনেই তাঁর মৃত্যু এসে গেছে। যখন তার এ ফযীলত, তখন ওলামা-ই দ্বীনের মর্যাদার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অথবা এতে ওইসব লোকের কথা বুঝানো হয়েছে, যাঁরা আলেমে দ্বীন; কিন্তু ইল্‌ম দ্বারা তৃপ্ত হন না, সর্বদা কিতাব অধ্যয়ন ও আলিমগণের সান্নিধ্যে থেকে স্বীয় ইল্‌ম বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং নিজেকে সর্বদা শিক্ষার্থী মনে করে থাকেন; আর এসব কিছুই দ্বীনের খিদমতের নিয়্যতেই করে থাকেন।

১৩১. অর্থাৎ তাঁরা সম্মানিত নবীগণের অতি নৈকট্যধন্য হবেন। অর্থাৎ আ'লা-ই ইল্লিয়্যীনে থাকবেন এসব মর্যাদাবান নবীগণ। আর তাঁদের নিকটবর্তী নিম্নস্তরে থাকবেন এ আলিমগণ। কেননা, তাঁরা দুনিয়ায় নবীগণের ওয়ারিস হিসেবে ছিলেন।

স্মর্তব্য যে, কোন কোন মু'মিন বেহেশ্‌তে নবীগণের সাথে থাকবেন। মহান রব ফরমাচ্ছেন ...... فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ (অতঃপর তাঁরা তাদেরই সঙ্গ লাভ করবে, যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন...[৪:৬৯])। তবে, এ সাথে থাকা তেমনি হবে, যেমন বাদশাহর বিশেষ খাদেমগণ তাঁর সাথে একই প্রাসাদে থাকে। অথচ তারা এতে বাদশাহ্ হয়ে যায় না। অনুরূপ, এ ব্যক্তিবর্গ নবীগণের স্তরের হবেন না; বরং তাঁদের খাস খাদিম হবেন। সুতরাং হাদীস ও পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতের মর্মার্থ একেবারে স্পষ্ট।

১৩২. খাজা হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীর উল্লেখ হয়তো এ জন্য করেন নি যে, হাদীসের বর্ণনাকারী অনেক সাহাবী রয়েছেন, ক'জনের নাম নেবেন।

অথবা এ জন্য যে, হাদীস সহীহ হওয়ার বিষয়ে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে। মোটকথা, তাঁর মত বুযুর্গদের 'মুরসাল'সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা নির্ভরযোগ্য এবং তাদের 'মুরসাল' পর্যায়ের বর্ণনাসমূহ গ্রহণযোগ। [মিরক্বাত]

كَانَا فِى بَنِى اِسْرَائِيلَ اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْاٰخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِىْ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ـ رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ

وَعَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِى الدِّيْنِ اِنْ اُحْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِنِ اسْتُغْنِىَ عَنْهُ اَغْنٰى نَفْسَهُ ـ رَوَاهُ رَزِيْنٌ

যারা উভয়েই ছিলো বনী ইসরাঈলের লোক। তাদের একজন তো আলিম ছিলো,[১৩৩] যে শুধু ফরযগুলো পড়তো, তারপর বসে মানুষকে ইল্‌ম শিক্ষা দিতো।[১৩৪] আর অপর ব্যক্তি দিনের বেলায় রোযা রাখতো এবং সারারাত ইবাদতের মধ্যে মগ্ন থাকতো।[১৩৫] তাদের দু'জনের মধ্যে কে উত্তম? হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ওই আলিম, যে শুধু ফরয নামায পড়ে বসে যায়, এরপর মানুষকে ইলমে দ্বীন শিক্ষাদান করে, তার মর্যাদা ওই আবিদের উপর, যে দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং সারারাত ইবাদতে অতিবাহিত করে[১৩৬] তেমনি, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপর।[১৩৭] [দারেমী]

২৩৪ || হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ওই আলিম-ই দ্বীন অত্যন্ত উত্তম, যে যদি তার প্রয়োজন হয় তাহলে সে উপকার করে, আর যদি তার প্রতি বেপরোয়াভাব দেখানো হয়, তাহলে নিজেকে অমুখাপেক্ষী রাখে।[১৩৮] [রাযীন]

১৩৩. অর্থাৎ তাঁর ইল্‌ম ইবাদতের চেয়ে বেশী ছিলো এবং অধিকাংশ সময় ইলমী খিদমতে অতিবাহিত করতেন, যা পরবর্তী বিষয়বস্তু থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। স্মর্তব্য যে, হয়তো ওই দু'ব্যক্তির ঘটনা আরবে প্রসিদ্ধ ছিলো। নতুবা হুযূরই স্বয়ং তা বর্ণনা করেছেন।

১৩৪. 'ইল্‌ম' দ্বারা ইলমে দ্বীন বুঝানো উদ্দেশ্য। হয়তো তিনি পাঠদান করতেন, অথবা দ্বীনী কিতাবাদি প্রণয়ন করতেন, অথবা দু'টিই করতেন।

১৩৫. অর্থাৎ 'সা-ইমুদ্ দাহর্ (সারাবছর রোযাদার) ও 'ক্বা-ইমুল্ লায়ল' (ইবাদতে রাত্রিযাপনকারী) ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁদের শরীয়তে তা জায়েয ছিলো। ইসলামে বছরে ৫দিন রোযা রাখা হারাম- শাওয়ালের ১ম দিন এবং ক্বোরবানীর ঈদের (যিলহজ্জ মাসের) ১০ম থেকে ত্রয়োদশ দিন পর্যন্ত (৪দিন)।

১৩৬. উত্তরে এত দীর্ঘ বাক্য এরশাদ করাটা আলিমের মর্যাদা মানুষের হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য; নতুবা এতটুকু যথেষ্ট ছিলো যে, প্রথমজন দ্বিতীয়জন অপেক্ষা উত্তম।

১৩৭. এর ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ উদাহরণ 'পর্যায়' (বা মর্যাদার স্তর) বর্ণনার জন্য, অর্থাৎ যে পর্যায়ের মর্যাদা তোমাদের উপর আমার রয়েছে ওই পর্যায়ের মহত্ব আবিদের উপর আলিমের রয়েছে। যেমন- মহান রব ইরশাদ করেছেন- مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ الآية অর্থাৎ "তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ওই দীপাধারের মত যাতে আছে প্রজ্বলিত প্রদীপ -আল-আয়াত।" সুতরাং এটা দ্বারা একথা অনিবার্য হয় না যে, আলিম নবীর সমান হয়ে যাবেন। স্মর্তব্য যে, ইলমে দ্বীন অর্জন করা হয়তো 'ফরযে আইন' অথবা 'ফরযে কিফায়াহ্'। আর অতিরিক্ত ইবাদত করা নফল। তাছাড়া আলিম দ্বারা সৃষ্টিজগৎ উপকৃত হয়, আর আবিদ দ্বারা শুধু ইবাদতকারী নিজেই উপকৃত হয়। সুতরাং আলিম আবিদ অপেক্ষা উত্তম। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম আলিম ছিলেন, ফিরিশ্‌তাগণ লক্ষ বছর যাবৎ ইবাদতকারী; কিন্তু আবিদগণই সাজদা করেছিলেন আলিমকে।

১৩৮. অর্থাৎ না অহঙ্কারী হবে, না মুখাপেক্ষী। মানুষের প্রয়োজনের সময় মনপ্রাণ দিয়ে উপস্থিত হয়ে যায় এবং যখন লোকেরা তাকে চাইবে না তখন নিজ থেকে কিছু বলবে না। ধনী গরীবের দ্বারে যাওয়া উত্তম, কিন্তু গরীব ধনীর দ্বারে যাওয়া ভাল নয়। 'মিরক্বাত'-এ উল্লেখ রয়েছে যে, দ্বীনদার আলিমের চর্চা ফিরিশ্‌তা-জগতেও হয়ে থাকে।

وَعَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَلَاتُمِلَّ النَّاسَ هٰذَاالْقُرْاٰنَ وَلَااُلْفِيَنَّكَ تَاْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِيْ حَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَااَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهٗ وَانْظُرِالسَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ

২৩৫ ‖ হযরত ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[১৩৯] হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন, মানুষকে প্রতি জুমু'আয় (অর্থাৎ সপ্তাহে একবার) ওয়ায শুনাও। যদি তা না মানো, তাহলে দু'বার, যদি আরো বেশি করতে চাও, তাহলে তিনবার (ওয়ায শুনাও)। এ 'ক্বোরআন' দ্বারা মানুষকে বিরক্ত করে তুলবে না।[১৪০] আমি যেন তোমাদেরকে এ অবস্থায় না পাই যে, তোমরা এমন কোন সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছবে, যারা নিজেদের কোন কথাবার্তায় লিপ্ত রয়েছে, তখন তোমরা ওয়ায শুরু করে তাদের কথা কেটে দেবে। কেননা, এতে তোমরা তাদেরকে বিরক্ত করে ছাড়বে; বরং নীরব থাকো। যখন তারা নিজেরা আরয করবে, তখন তাদেরকে হাদীস শুনাবে। তখন তারা এর প্রতি আগ্রহী হবে।[১৪১] আর লক্ষ্য রাখবে, দো'আর মধ্যে ছন্দপূর্ণ বাক্য থেকে বিরত থাকবে।

ফিরিশ্‌তারা তাঁকে 'আযীম' (মহান) বলে থাকেন।
স্মর্তব্য যে, যেই আলিমের মধ্যে তিনটি বিষয় থাকবে, তিনি যুগের সর্দার হবেন: পরিপূর্ণ ইলমে দ্বীন, অল্পে তুষ্টি -অমুখাপেক্ষিতা এবং নেক আমল।

১৩৯. তাঁর নাম ইকরামা, উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্। বরবরের অধিবাসী। হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র আযাদকৃত ক্রীতদাস। মক্কা মুকাররমার সুদক্ষ ফক্বীহ তাবে'ঈ। তিনি ৮০ বছর বয়সে ১০৭ হিজরীতে ওফাত পান। [ইকমাল]
ইকরামা ইবনে আবূ জাহল অন্যজন। যেখানে 'ইকরামা' নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করা হয়, সেখানে তাঁর কথা বুঝানো হয়।

১৪০. অর্থাৎ প্রতিদিন ওয়ায শুনাবে না। সপ্তাহে এক বা দু/তিনবার শুনাবে। তাও এত বেশীক্ষণ পর্যন্ত ওয়ায করবে না, যাতে লোকেরা বিরক্ত হয়ে যায়; বরং তাদের আগ্রহ থাকতেই শেষ করে দাও। সুবহানাল্লাহ্! কতই উত্তম প্রশিক্ষণ!
ওসব বুযুর্গের মজলিসগুলো যেন স্বাভাবিক স্কুল সদৃশ ছিলো, যেগুলোতে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান সবই সম্পন্ন হতো। এ থেকে বিনা প্রয়োজনে চার চার ঘন্টা যাবৎ ওয়াযকারী ওয়া'ইযীনের শিক্ষা নেওয়া চাই।
স্মর্তব্য যে, এ ফরমান ওখানকার জন্য, যেখানে মানুষ বিরক্ত হয়ে থাকে; কিন্তু যদি তারা উৎসাহী হয়, তবে প্রতিদিন ওয়ায করাও মন্দ নয়, দীর্ঘক্ষণ ওয়ায করাও মন্দ নয়। মাদরাসাগুলোতে ক্বোরআন মজীদের পাঠদান প্রতিদিনই হয়ে থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একবার ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ওয়ায করেছিলেন। আলিমদের জন্য উচিত মানুষের আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রাখা।

১৪১. এটি অপর উপদেশ, যার উপর ওয়া'ইযদের সতর্কদৃষ্টি থাকা চাই। অর্থাৎ যেখানে লোকেরা কথা বা কাজে লিপ্ত থাকে, সেখানে তাদের কথা বা কাজ ব্যাহত করো না; ওয়ায শুরু করে দিও না। কেননা, ওই অবস্থায় যদিও তারা কোন কিছু না বলে; কিন্তু অন্তরে কষ্ট পাবে।
তাছাড়া, এতে ইল্‌ম ও আলিমের অবমাননারও আশঙ্কা থাকে। এ থেকে ওই সকল ওয়া'ইযের শিক্ষা নেওয়া উচিত, যারা শক্তিশালী লাউড-স্পিকারে অর্ধরাত পর্যন্ত তাক্বরীর করে শ্রমিক ও অসুস্থদেরকে পেরেশান করে তোলে, সমস্ত এলাকাবাসীদেরকে জাগিয়ে তোলে। এমনও দেখা গেছে যে, এরপর জনগণ প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করে, যার উপর ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। কত বড় অবমাননা এবং ইলমের অমর্যাদা।
যদি এ সকল ওয়া'ইয এ এরশাদ অনুযায়ী আমল করতো তাহলে এরূপ ঘটনা কীভাবে ঘটতো? শাসকবর্গ এবং কর্মকর্তাগণ নিজেরাই তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁদেরই খিদমতে হাযির হতেন।

فَاِنِّىْ عَهِدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابَهٗ لَا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَاَدْرَكَهٗ كَانَ لَهٗ كِفْلَانِ مِنَ الْاَجْرِ فَاِنْ لَّمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهٗ كِفْلٌ مِنَ الْاَجْرِ - رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهٖ وَحَسَنَاتِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ

আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-ই কেরামকে এরূপ করতে পাই নি।[১৪২] [বোখারী শরীফ]

২৩৬ || হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসক্বা' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[১৪৩] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি ইল্ম অন্বেষণ করে এবং তা অর্জনও করে নেয়, তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।[১৪৪] কিন্তু যদি অর্জন করতে না পারে, তাহলে একগুণ সাওয়াব পাবে।"[১৪৫] [দারেমী শরীফ]

২৩৭ || হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় যে সব আমল ও নেকী মু'মিনের মৃত্যুর পরও তার কাছে পৌঁছতে থাকে,

১৪২. অর্থাৎ দো'আর মধ্যে লৌকিকতা করে ছন্দযুক্ত বাক্য ব্যবহার করো না। কেননা, এতে বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতা থাকে না। সুন্দর বাক্য তৈরীর দিকেই মনযোগ থাকবে। ওই মহান দরবারে অনুনয়-বিনয় দেখানো হয়; ভাষার পাণ্ডিত্য নয়।

স্মর্তব্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অধিকাংশ দো'আ ছন্দযুক্ত বাক্য। কিন্তু তা লৌকিকতার জন্য বানানো হয় নি; বরং ওই শ্রেষ্ঠতম ভাষাবিদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র মুখ মুবারক থেকে লৌকিকতা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে নিঃসৃত হয়েছিলো। সুতরাং তা এ হাদীস এর বিরোধী নয়। এখানে লৌকিকতা ও বানানোর পন্থা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পংক্তি-

اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود
اس کی دل کش بلاغت پہ لاکھوں سلام
بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود
بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام
میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود
اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام

অর্থাৎ

ক. তাঁর প্রিয় অলঙ্কারসমৃদ্ধ স্পষ্টার্থক ভাষার প্রতি অশেষ-অসংখ্য দুরূদ; তাঁর চিত্তাকর্ষক ভাষাশৈলীর প্রতি লাখো সালাম।

খ. তাঁর সম্পূর্ণ কৃত্রিমতামুক্ত উক্তি ও কর্মের প্রতি হাজারো দুরূদ; তাঁর লৌকিকতাশূন্য লাবণ্যের প্রতি লাখো সালাম।

গ. তাঁর মিষ্ট মিষ্ট বচনের প্রতি সুমিষ্ট দুরূদ; তাঁর ভাল ভাল ইঙ্গিতের প্রতি লাখো সালাম।

১৪৩. তিনি বনী লাইস গোত্রের লোক। তাবূক যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিন বছর হুযূরের খিদমত করেছিলেন। তিনি আসহাব-ই সোফ্ফার অন্যতম। হুযূরের ওফাত শরীফের পর প্রথমে বসরা পরে সিরিয়ার 'বালাত্ব' নামক বস্তিতে বসবাস করতেন, যা দামেস্ক থেকে তিন ক্রোশ (=৬ মাইল) দূরে অবস্থিত। ১০০ বছর বয়সে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ওফাত পান। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

১৪৪. একটি হচ্ছে ইল্ম অন্বেষণ করার, অপরটি অর্জন করতে পারার। কেননা, এ দু'টিই ইবাদত।

১৪৫. হয়তো ইল্ম অন্বেষণের সময়কালে মৃত্যুবরণ করে এবং তা পূর্ণ করার সুযোগ না পায়।

অথবা তার মেধা কাজ করে না; কিন্তু সে ওই কাজে লেগে রয়েছে, তবুও সাওয়াব পাবে। যেমন মুজতাহিদ যদি তাঁর গবেষণায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, তবে তিনি দ্বিগুণ সাওয়াব পাবেন এবং যদি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যান, তাহলে একগুণ সাওয়াব পাবেন।

عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ اَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ اَوْمَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْبَيْتًا لِاِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْنَهْرًا اَجْرَاهُ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِيْ صِحَّتِهِ وَحَيٰوتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ـ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَوْحٰى اِلَىَّ اَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ ـ

তন্মধ্যে ওই ইল্‌মও, যা সে শিক্ষা দিয়েছে এবং প্রসারিত করেছে,[১৪৬] নেককার সন্তান, যাকে সে রেখে গেছে;[১৪৭] অথবা ওই ক্বোরআন শরীফ, যা সে মীরাস স্বরূপ রেখে গেছে,[১৪৮] অথবা ওই মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গেছে, অথবা মুসাফিরখানা, যা সে প্রতিষ্ঠা করে গেছে,[১৪৯] অথবা ওই নহর, যা সে চালু করে গেছে, অথবা ওই সাদক্বাহ্, যা সে তার সুস্থতার সময়ে এবং জীবদ্দশায় আপন সম্পদ থেকে করে গেছে।[১৫০] কারণ, এ সব কিছুর সাওয়াব তার কাছে মৃত্যুর পরেও পৌঁছতে থাকবে।[১৫১]

[ইবনে মাজাহ্, বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমানে' বর্ণনা করেছেন।]

২৩৮ ॥ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা আমার কাছে এ মর্মে ওহী পাঠিয়েছেন যে,[১৫২] যে ব্যক্তি ইলমের সন্ধানে একটি পথ অতিক্রম করেছে, আমি বেহেশ্‌তের একটি রাস্তা তার জন্য সহজ করে দেবো।[১৫৩]

---

১৪৬. মুখে অথবা কলমে। এভাবে যে, নিজের যোগ্য ছাত্র এবং স্বরচিত উত্তম কিতাবপত্র রেখে গেছেন। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানগণ ওইগুলো থেকে উপকৃত হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তার কাছে সাওয়াব পৌঁছতে থাকবে।

১৪৭. হয়তো সন্তান-সন্ততি সৎকর্মপরায়ণ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। অথবা তার মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততি সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে গেছে। উভয় অবস্থাতেই সে সাওয়াব পেতে থাকবে।

১৪৮. এভাবে যে, স্বীয় হাতে ক্বোরআন লিখে অথবা ক্রয় করে রেখে গেছে। সমস্ত দ্বীনী কিতাবের ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য।

১৪৯. প্রচেষ্টা দ্বারা অথবা নিজের অর্থে অথবা স্বহস্তে মাদরাসা ও খানক্বাহ্ ইত্যাদি (প্রতিষ্ঠা করা)ও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

১৫০. সুস্থতার শর্তারোপ এ জন্য করা হয়েছে যে, মৃত্যুশয্যায় দান-খায়রাত করার সাওয়াব অর্ধেক। কেননা, ওই সময় নিজের জন্য কোন সম্পদের প্রয়োজন থাকে না। এরই মধ্যে সব সাদক্বাহ্-ই জারিয়াহ্ এসে গেছে। যেমন- কূপ খনন করানো, পানির নল ও নলকূপ বসানো, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে যাওয়া ইত্যাদি।

১৫১. কতেক সাওয়াব ক্বিয়ামত পর্যন্ত, আর কতেক সাওয়াব তা থেকে কম। সাদক্বাহ্‌র স্থায়িত্ব অনুসারে সাওয়াব অব্যাহত থাকবে।

১৫২. ইলহামের মাধ্যমে কিংবা হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম'র মাধ্যমে। অর্থাৎ বিষয়বস্তু মহান রবের পক্ষ থেকে এবং বচনগুলো হুযূরের; এটাকে 'ওহী-ই গায়রে মাত্‌লূ' বলা হয়। 'হাদীস-ই ক্বুদসী' ও 'ক্বোরআন'র মধ্যে পার্থক্য এ যে, ক্বোরআনের বচন ও বিষয়বস্তু দু'টিই মহান রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

১৫৩. অর্থাৎ ওই ব্যক্তি যে কোন মাধ্যম অবলম্বন করে ইল্‌ম তালাশ করুক, তজ্জন্য সফর করুক কিংবা দ্বীনী কিতাবাদি অধ্যয়ন করুক, তার জন্য দুনিয়ায় ইবাদত ও মা'রিফাত ইত্যাদির মত বেহেশ্‌তের পথগুলোর তাওফীক্বও অর্জিত হবে।

অথবা ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য পুলসিরাত অতিক্রম করে বেহেশ্‌তে পৌঁছানো সহজ হবে। মিরক্বাত প্রণেতা বলেছেন, ইল্‌ম ব্যতীত বেহেশ্‌তের সকল দরজা বন্ধ। 'ইলমে দ্বীন' হচ্ছে ওই দরজাগুলোর চাবি।

وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيْمَتَيْهِ اَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضْلٌ فِىْ عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ فَضْلٍ فِىْ عِبَادَةٍ وَمَلَاكُ الدِّيْنِ الْوَرْعُ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَائِهَا - رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَّاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ

আর যার দু'টি প্রিয়বস্তু আমি নিয়ে নেবো, তাকে আমি বেহেশ্‌ত দান করবো।[১৫৪] ইল্‌মের আধিক্য ইবাদতের আধিক্য হতে উত্তম।[১৫৫] দ্বীনের কারখানার শৃঙ্খলা হচ্ছে- পরহেযগারী।[১৫৬]

[হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান কিতাবে বর্ণনা করেছেন]

২৩৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাত্রিকালে কিছু সময় দ্বীনী ইল্‌ম'র আলোচনা, সারা রাত জেগে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।[১৫৭] [দারেমী]

২৪০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মসজিদে দু'টি মজলিসের পাশ দিয়ে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন।[১৫৮] তখন তিনি এরশাদ করলেন, উভয় মজলিসই কল্যাণের উপর রয়েছে, কিন্তু একটি মজলিস অপরটির চেয়ে উত্তম।[১৫৯]

---

১৫৪. অর্থাৎ আমি যার চক্ষুযুগলকে অকেজো করে অন্ধ করে দেবো এবং সে এর উপর ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকবে, তাহলে এ ধৈর্যের বিনিময়ে তার বেহেশ্‌ত অর্জিত হবে।
বুঝা গেলো যে, পার্থিব কষ্টসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার রহমতপ্রাপ্তির মাধ্যম; তবে শর্ত হলো- যদি তাতে ধৈর্য ধারণ করে।

১৫৫. অর্থাৎ 'ইল্‌ম'র সামান্য আধিক্যও ইবাদতের বহু আধিক্য অপেক্ষা উত্তম। [আশি''আতুল লুম'আত]

১৫৬. স্মর্তব্য যে, দ্বীনদারী ও তাক্বওয়া অপেক্ষা ওয়ারা' উত্তম। وَرَع (ওয়ারা') হচ্ছে- হারাম, সন্দেহপূর্ণ বিষয়, লোভ ও লৌকিকতাপূর্ণ আমল থেকে বেঁচে থাকা এবং সব ধরনের ইবাদত করা। শুধু হারাম থেকে বেঁচে থাকা হচ্ছে তাক্বওয়া। মুত্তাক্বী ব্যতীত অন্য লোকেরা স্বীয় দ্বীনের শৃঙ্খলা কায়েম রাখতে পারে না।

১৫৭. তেমনিভাবে দিনের বেলায় কিছুক্ষণ ইলমে দ্বীনের চর্চায় ব্যস্ত থাকা সারা দিনের ইবাদত থেকে উত্তম। ইবাদত দ্বারা নফল ইবাদতসমূহ বুঝানো উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য নয় যে, ফরযগুলো বাদ দিয়ে ইল্‌ম শিখবে।
সম্মানিত সূফীগণ বলেন, দ্বীনদার আলিমের ঘুমানোও ইবাদত। আলিমগণ বলেছেন, ''ক্বোরআন তিলাওয়াত অপেক্ষা ফিক্বহ্ শেখা উত্তম।''
এ দু'টি মাসআলার উৎস হচ্ছে এ হাদীস শরীফ। এর কারণ আমি বারবার বর্ণনা করেছি। আলিম সামান্য ইবাদতের মাধ্যমে মূর্খ ব্যক্তির অধিক ইবাদতের চেয়েও বেশী সাওয়াব অর্জন করতে সক্ষম হন।

একটি মজার ঘটনা

এক বুযুর্গ ব্যক্তি পাটনা থেকে পবিত্র বায়তুল্লাহ্‌র হজ্ব আদায়ের জন্য পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। প্রতি পাঁচ ক্বদম এগিয়ে গিয়ে তিনি দু'রাক্'আত নফল পড়তেন। তিনি দশ বছরে গুজরাট পৌঁছেন।
তার খিদমতে আরয করা হলো-
আপনি যদি উড়োজাহাজে এক রাতেই মক্কা মু'আয্‌যমায় পৌঁছে যেতেন এবং এ পরিমাণ নফল নামায ওখানে পড়তেন, তাহলে প্রতি রাক্'আতে এক লক্ষ রাক্'আত নামাযের সাওয়াব পেতেন।

১৫৮. অর্থাৎ মসজিদে নববী শরীফে সাহাবা-ই কেরামের দু'টি দল দু'প্রান্তে ছিলেন। এক প্রান্তে একদল নফল নামায ও ক্বোরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতে রত ছিলেন; অন্যপ্রান্তে অপর দল ইল্‌মে দ্বীনের আলোচনা ও পাঠদানোত্তর পর্যালোচনা করছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উভয় দলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

১৫৯. অর্থাৎ ইল্‌মের মজলিস ইবাদতের মজলিস অপেক্ষা উত্তম। এর কারণ পরবর্তীতে বর্ণিত হবে।

اَمَّاهٰؤُلَآءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ فَاِنْ شَآءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَآءَ مَنَعَهُمْ وَاَمَّا هٰؤُلَآءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ اَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ ـ رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ **وَعَنْ** اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاحَدُّ الْعِلْمِ الَّذِىْ اِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا وَّ كُنْتُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شَافِعًا وَّشَهِيْدًا

এ মজলিসের লোকেরা আল্লাহ্র কাছে দো'আ করছে, তাঁরই প্রতি মনোনিবেশকারী, যদি তিনি ইচ্ছে করেন, তবে তাদেরকে দান করবেন, যদি চান দান না-ও করতে পারেন;[১৬০] কিন্তু ওইসব লোক ফিক্বহ্ ও ইল্ম নিজেও শিক্ষা করছে, অজ্ঞদেরকেও শিক্ষা দিচ্ছে। তারাই উত্তম।[১৬১] আমি শিক্ষাদাতা হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তিনি তাঁদেরই মধ্যে তাশরীফ রাখলেন।[১৬২] [দারেমী শরীফ]

২৪১ ॥ হযরত আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে আরয করা হলো, "ওই ইলমের সীমা কতটুকু, যেখানে পৌঁছুলে মানুষ আলিম হয়?" হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের সামনে দ্বীনের বিধানাবলী সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীস হিফয করে (পেশ করে), তাকে আল্লাহ্ ফক্বীহ হিসেবে পুণরুত্থিত করবেন এবং ক্বিয়ামতের দিন আমি তার সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবো।"[১৬৩]

---

১৬০. অর্থাৎ আবিদগণের পরিশ্রম নিজের জন্য, যার গ্রহণযোগ্যতা ও সাওয়াব নিশ্চিত নয়। কেননা, এটা আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভরশীল। তিনি এ জিনিসগুলোর ব্যাপারে ওয়াদা করেন নি। এ হাদীসে মু'তাযিলাদের সুস্পষ্ট খণ্ডন করা হয়েছে। কারণ, তারা ইবাদতের সাওয়াব দেওয়া আল্লাহ্র উপর আবশ্যক বলে ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে।

স্মর্তব্য যে, আয়াত শরীফ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ-এর অর্থ হচ্ছে- তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো। অথবা তোমরা আমার কাছে দো'আ করো আমি সাওয়াব দেবো। [৪০:৬০] এতে দো'আ ক্ববূল হবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি। সুতরাং আলোচ্য হাদীস শরীফ এ আয়াতের বিরোধী নয়।

১৬১. অর্থাৎ নিজের জন্য কোন কিছু চাচ্ছে না; দ্বীনের প্রচার-প্রসার করছে। তাদের এ খিদমত নিশ্চিতভাবে মর্যাদাপূর্ণ।

স্মর্তব্য যে, বে-আমল আলিম ওই প্রদীপ ধারণকারীর ন্যায়, যে নিজের প্রদীপ দ্বারা নিজে উপকৃত হয় না; কিন্তু অন্য লোকেরা উপকৃত হয়ে থাকে। বস্তুত ক্ববূল হয় নি এমন ইবাদত সম্পূর্ণ অর্থহীন, যা দ্বারা কারো উপকার হয় না। সুতরাং হাদীসের বিপক্ষে কোন অভিযোগ নেই। বে-আমল আলিম তেমনি, যেমন- অসুস্থ ডাক্তার অন্য লোকের চিকিৎসা করে থাকে।

১৬২. সুবহা-নাল্লাহ্! ইলমের মজলিস কতই বরকতময়। বর্তমানেও হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আলিমগণের মাঝেই তাশরীফ রেখে থাকেন। তাই, তাঁকে (দ্বীনী) ইলমের মজলিসেই তালাশ করো।

স্মর্তব্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যদিও আবিদগণের মধ্যে শীর্ষে, কিন্তু হুযূরের ইবাদত বাস্তব শিক্ষাও। সুতরাং তিনি নামায পড়ার সময়ও শিক্ষাদাতা। আর হুযূরের শুভাগমনের মূল লক্ষ্যও শিক্ষা দেওয়া। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

অর্থাৎ: "এবং তিনি তাদেরকে (তোমার) কিতাব ও প্রজ্ঞাপূর্ণ (পরিপক্ক) জ্ঞান শিক্ষা দেবেন।"

১৬৩. এ হাদীসের বিভিন্ন দিক রয়েছে; চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করে মুসলমানদেরকে শুনানো, ছাপিয়ে তাঁদের মধ্যে বন্টন করা, অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝানো, বর্ণনাকারীদের নিকট থেকে শুনে কিতাব আকারে একত্রিত করা সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেকোনভাবে দ্বীনী বিধান সম্পৃক্ত চল্লিশটি হাদীস শরীফ আমার উম্মতের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে, ক্বিয়ামতের দিন তার হাশর দ্বীনদার আলিমদের সাথে হবে

وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ اَجْوَدُ جُوْدًا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اَللّٰهُ تَعَالٰى اَجْوَدُ جُوْدًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِىْ اٰدَمَ وَاَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهٗ

২৪২ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমরা কি জানো বড় দানশীল কে?" আরয করলেন, "আল্লাহ্-রসূলই অধিক জ্ঞাতা।"[১৬৪] তিনি এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বড় দানশীল।[১৬৫] অতঃপর আদম-সন্তানের মধ্যে আমিই বড় দাতা।[১৬৬] আর আমার পর বড় দাতা ওই ব্যক্তি, যে ইল্‌ম-ই দ্বীন শিক্ষা করে, অতঃপর তার প্রচার-প্রসার করে।"[১৬৭]

এবং আমি তার পক্ষে বিশেষ সুপারিশও করবো এবং তার ঈমান ও তাক্বওয়ার পক্ষে বিশেষ সাক্ষ্য দেবো। নতুবা, সাধারণভাবে শাফা'আত ও সাক্ষ্য তো প্রতিটি মুসলমানের নসীব হবে। এ হাদীস শরীফের ভিত্তিতেই প্রায় সব সম্মানিত মুহাদ্দিস হাদীসের বড় বড় গ্রন্থ লিখার পরও তাঁরা আলাদাভাবে 'চল্লিশ হাদীস'র কিতাবও লিখেছেন, যাকে 'আরবা'ঈনিয়াহ্' বলা হয়। ইমাম নাওয়াভী ও শায়খ আবদুল হক্ব দেহলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিমার 'আরবা'ঈনিয়াত' প্রসিদ্ধ। আমিও স্বীয় কিতাব 'সালতানাত -ই মুস্তফা'য় 'চল্লিশ হাদীস' সঙ্কলন করেছি।

১৬৪. এটা সম্মানিত সাহাবীদের শিষ্টাচার যে, তাঁরা 'না' বলেননি, 'হ্যাঁ- জানি'ও বলেননি। যাতে হুযূরের চেয়ে এগিয়ে না যান। এ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূরকে আল্লাহর সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করা এবং উভয় মহান স্বত্তার জন্য একটি শব্দ ব্যবহার করা বৈধ। মহান রব এরশাদ করেন- اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ (আল্লাহ-রসূল তাঁদেরকে ধনী করে দিয়েছেন) [৯:৭৪]।

সুতরাং এটা বলা যাবে- আল্লাহ-রসূল মহাজ্ঞাতা (عَلِيْمٌ) ও 'অবগত' (خَبِيْرٌ)। 'আল্লাহ-রসূল ধনী করে দিয়েছেন', 'আল্লাহ-রসূল কল্যাণ করুন! ইত্যাদি।

১৬৫. আরবের প্রচলিত ভাষায়- সাধারণত سَخِىٌّ (দানশীল) ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি নিজেও খান, অন্যদেরকেও খাওয়ান। আর جَوَّادٌ (দানশীল) হলেন ওই ব্যক্তি, যিনি নিজে খান না, অন্যদেরকে খাওয়ান। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলাকে سَخِىٌّ (সাখী) বলা যায় না। سَخِىٌّ (সাখী)'র বিপরীত শব্দ হলো بَخِيْلٌ (বাখীল)। আর بَخِيْلٌ (বাখীল) হচ্ছে- যে নিজে খায়, আর কাউকে খাওয়ায় না। جَوَّادٌ (জাউওয়াদ)'র বিপরীত হচ্ছে مُمْسِكٌ (মুমসিক) যে নিজেও খায় না, অন্য কাউকেও খেতে দেয় না।☆ আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত পার্থিব ও পরকালীন নি'মাত দুনিয়াবাসীর জন্য, তাঁর নিজের জন্য নয়।

১৬৬. এ বরকতময় বাণী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য, অহংবোধের জন্য নয়। হুযূর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক দানশীল। যেহেতু মানুষ 'সৃষ্টির সেরা', সেহেতু মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বদান্যতার প্রকাশস্থল। মহান রবের যাহেরী-বাত্বেনী সমস্ত নি'মাত হুযূরের পবিত্র হাতেই সৃষ্টিকুল পেয়ে থাকে। তিনি স্বয়ং এরশাদ করেন- "আল্লাহ্ দান করেন, আমি বন্টনকারী।" এ হাদীসে আল্লাহ্ তা'আলা ও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দানশীলতার কথা নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর প্রকাশ থাকে যে, سَخِىّ (দানশীল) ওই ব্যক্তিই হতে পারে, যে মালিকও হয়ে থাকে। সুতরাং হুযূর উভয়জগতের মালিকও।

১৬৭. এখানে 'মর্যাদাগতভাবে পরবর্তী' বুঝানো উদ্দেশ্য, 'সময়গতভাবে পরবর্তী' নয়। সুতরাং সাহাবা-ই কেরাম এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আলিমগণ এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আমার দানশীলতার পর আলিম-ই দ্বীনের মর্যাদা। অর্থাৎ সম্পদ দান করা থেকে ইলম দান করা উত্তম। তা হবেও না কেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন রহমতের মেঘমালা। আলিম-ই দ্বীন হলেন ওই মেঘমালার পুকুর। স্মর্তব্য যে, আলিমগণের দানশীলতায় ইলমে দ্বীনের শর্তারোপ করা হয়েছে, কিন্তু হুযূরের দানশীলতা শর্তহীন। ইলমের প্রসার করা- চাই শিক্ষাগ্রহণ করার মাধ্যমে হোক অথবা শিক্ষাদান করার মাধ্যমে হোক, কিংবা পুস্তকাদি রচনার মাধ্যমে হোক।

☆ আর شَحِيْحٌ (শাহীহ) হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে নিজেও দান করে না, অন্য কেউ দান করুক তাও পছন্দ করে না।

يَأْتِى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمِيْرًا وَّحْدَهٗ اَوْ قَالَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْهُوْمَانِ لَايَشْبَعَانِ مَنْهُوْمٌ فِى الْعِلْمِ لَايَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُوْمٌ فِى الدُّنْيَا لَايَشْبَعُ مِنْهَا رَوَى الْبَيْهَقِىُّ اَلْاَحَادِيْثُ الثَّلٰثَةَ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ قَالَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ فِىْ حَدِيْثِ اَبِى الدَّرْدَآءِ هٰذَا مَتْنٌ مَّشْهُوْرٌ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهٗ اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وَعَنْ عَوْنٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ مَنْهُوْمَانِ لَايَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلَايَسْتَوِيَانِ

সে ক্বিয়ামতের দিন একক আমীর হিসেবে আসবে, অথবা এরশাদ করেছেন, একটা দল হিসেবে আসবে।[১৬৮]

২৪৩ ॥ তাঁরই (হযরত আনাস) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দু'জন লোভী ব্যক্তি তুষ্ট হয় না; একজন হচ্ছে- জ্ঞানপিপাসু, যে তা দ্বারা তুষ্ট হয় না এবং অপরজন দুনিয়ালোভী, যে তা দ্বারা তুষ্ট হয় না।[১৬৯] এ তিন হাদীস ইমাম বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমান' কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হযরত আবুদ্দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, সর্বসাধারণের মধ্যে আলোচ্য হাদীসের বচনগুলো প্রসিদ্ধ, কিন্তু সেটার সনদ 'সহীহ' পর্যায়ের নয়।[১৭০] ২৪৪ ॥ হযরত 'আউন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[১৭১] তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, দু'জন লোভী তৃপ্ত হয় না: জ্ঞানী ব্যক্তি ও দুনিয়ালোভী। কিন্তু উভয়ে সমান নয়।[১৭২]

---

১৬৮. অর্থাৎ ওই দিন আলিম-ই দ্বীন ইমাম হবেন এবং সমস্ত আবিদ, নামাযী ও শহীদ ইত্যাদি তাঁর অধীনস্থ। কেননা, যে যা নেকী করেছেন তা আলিমের দিক-নির্দেশনায় করেছেন। অথবা একজন আলিম সমস্ত মুসলমানের সমান সাওয়াব পাবেন। সকলের হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদিতে তাঁর অংশ থাকবে। এটাই হচ্ছে 'এক উম্মত' হওয়া। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً (নিশ্চয় ইব্রাহীম এক 'উম্মত' (ইমাম) ছিলো)।১৬:১২০।।

১৬৯. حِرْصٌ অর্থ হচ্ছে সর্বদা অতিরিক্ত পাওয়ার কামনা, পার্থিব লোভ মন্দ, দ্বীনী লোভ উত্তম। আলিমের অন্তরে ইলম দ্বারা কখনো তুষ্টি আসে না -এটা আল্লাহর নি'মাত। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-قُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا (হে হাবীব! আপনি আরয করুন, হে মহান রব, আমাকে জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।২০:১১৪।)। দুনিয়াদার দুনিয়া দ্বারা কখনো তুষ্ট হয় না, যেমনিভাবে উদরী রোগী পানি পানে কখনো তৃপ্ত হয় না।

স্মর্তব্য যে, এরা সবাই নিজেদের জন্য, হুযূর উম্মতের জন্য। তারা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে তৃপ্ত হয় না, আর হুযূর দান করে তৃপ্ত হন না। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ (তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী;।৯:১২৮।) শব্দ একই, অর্থ ভিন্নতর।

১৭০. ইমাম নাওয়াভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি স্বীয় 'চেহেল হাদীস' (চল্লিশ হাদীস সম্বলিত) কিতাবে বলেছেন, হযরত আবুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত। যার সবক'টিই দ্ব'ঈফ (বর্ণনাসূত্র দুর্বল) পর্যায়ের; কিন্তু সনদের আধিক্য এবং বিজ্ঞ আলিমদের নিকট গ্রহণযোগ্যতার কারণে হাদীস শক্তিশালী হয়। কেননা, সনদের সংখ্যাধিক্যের কারণে 'দ্ব'ঈফ' (দুর্বলসূত্র বিশিষ্ট) হাদীস 'হাসান' পর্যায়ের হয়ে যায়। তাছাড়া, আমলের ফযীলত প্রমাণের ক্ষেত্রে 'য'ঈফ' (দুর্বলসূত্র বিশিষ্ট হাদীস)ও গ্রহণযোগ্য।

।মিরক্বাত ও আশি''আতুল লুম'আত।

১৭১. তিনি তাবে'ঈ। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে মাস'উদ ও হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম'র নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর নিকট থেকে ইমাম যুহরী এবং ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন।

১৭২. مَنْهُوْمٌ শব্দটি نَهْمٌ থেকে নিগর্ত। এর অর্থ হচ্ছে খাওয়ার প্রতি অত্যাধিক আগ্রহ। অর্থাৎ ইলম অন্বেষণকারী ও দুনিয়া অন্বেষণকারী দু'জনই লোভী। কিন্তু পরিণামে

اَمَّاصَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضًى لِلرَّحْمٰنِ وَاَمَّاصَاحِبُ الدُّنْيَافَيَتَمَادٰى فِى الطُّغْيَانِ ثُمَّ قَرَءَ عَبْدُاللّٰهِ ﴿كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى﴾ قَالَ وَقَالَ لِاٰخَرَ ﴿اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا﴾ ـ رَوَاهُ الدَّرِمِىُّ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُنَاسًا مِّنْ اُمَّتِىْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَقُوْلُوْنَ نَاْتِى الْاُمَرَآءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلَايَكُوْنُ ذٰلِكَ كَمَا لَايُجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ اِلَّا الشَّوْكُ كَذٰلِكَ لَايُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ اِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ كَاَنَّهٗ يَعْنِى الْخَطَايَا ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

জ্ঞানী ব্যক্তি তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে থাকে এবং দুনিয়াদারের অবাধ্যতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।[১৭৩] অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ এ-ই আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করলেন- كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى অর্থাৎ "সাবধান! নিশ্চয় মানুষ অবাধ্যতা অবলম্বন করে। এজন্য যে, সে নিজেকে বেপরোয়া মনে করে থাকে।" বর্ণনাকারী বলেছেন, আর অপরজন সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে- اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا অর্থাৎ "আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই ভয় করে।"[১৭৪] দারেমী শরীফ। **২৪৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস** রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "নিশ্চয় আমার উম্মতের কিছু লোক ইলমে দ্বীন শিখবে এবং ক্বোরআন পড়বে, তারা বলবে, আমরা ধনী লোকের নিকট যাবো, তাদের দুনিয়া নিয়ে আসবো, আর নিজেদের দ্বীনকে রক্ষা করবো।[১৭৫] কিন্তু এরূপ হতে পারে না, যেমনিভাবে বাবুল গাছ থেকে শুধু কাঁটাই সংগ্রহ করা যায়, তেমনি ধনীদের নৈকট্য থেকেও। মুহাম্মদ ইবনে সাবাহ্ বলেছেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে পাপরাশিই অর্জিত হবে।"[১৭৬] ইবনে মাজাহ্ শরীফ।

পার্থক্য রয়েছে।

১৭৩. সম্মানিত সূফীগণের পরিভাষায় 'দুনিয়া' হচ্ছে তা-ই, যা আল্লাহ্ থেকে অমনোযোগী করে। মুনাফিক্বদের নামায দুনিয়া ছিলো এবং হযরত উসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহু'র সম্পদ স্বয়ং দ্বীন ছিলো। এখানে এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য, সুতরাং হযরত সুলায়মান, হযরত উসমান গনী এবং ইমাম আবূ হানীফার মত বিত্তশালীদেরকে দুনিয়াদার বলা যাবে না। তাঁদের সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম।

১৭৪. অর্থাৎ এটা আমি শুধু আমার নিজের মতানুসারে বলছি না, বরং মহান রব দুনিয়াদারের সম্পদকে অধিক অবাধ্যতা এবং আলিমের ইলমকে অধিক রহমতের মাধ্যম বলেছেন।

১৭৫. অর্থাৎ কোন কোন আলিম ও ক্বারী সাহেব বিনা প্রয়োজনে নাফ্সের কুপ্রবৃত্তির চাহিদার কারণে এবং মাল ও ইজ্জত হাসিলের জন্য ফাসিক ধনীদের এবং শাসকবর্গের কাছে আসা-যাওয়া ও উঠা-বসা করে থাকে শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যেই।

১৭৬. আমার ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা গেলো যে, 'ধনী' মানে ফাসিক্ব ও ধর্মবিমুখ ধনী। তাদের নিকট আলিমের আসা-যাওয়া করা দ্বীনের জন্য বিপজ্জনক। যেহেতু তারা তাঁদের নিকট থেকে নিজেদের মর্জি অনুযায়ী ভুল ফাতওয়া অর্জন করে। যেমন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, ফাসিক্ব ধনীরা নির্বাচনের সময় ভোটের জন্য আলিম ও পীর-মাশাইখকে অবৈধভাবে ব্যবহার করে থাকে। দ্বীনদার ধনীদের কাছে দ্বীনী স্বার্থে আলিমদের আসা-যাওয়া জায়েয; বরং অত্যন্ত উপকারী। হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস সালাম মিসরের বাদশাহ্ (আযীয)'র অর্থ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁর এ বরকতে 'আযীয' ঈমান পেয়েছেন এবং দুনিয়া দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পেয়েছে। ক্বাযী (বিচারপতি) ইমাম আবূ ইয়ূসুফ বাদশাহ্ হারূনুর রশীদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তাঁর বরকতে বাদশার তাক্বওয়া নসীব হয়েছে এবং দুনিয়া

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَوْاَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوْا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهٖ لَسَادُوْابِهٖ اَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِاَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْابِهٖ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْاعَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّاوَّاحِدًاهَمَّ اٰخِرَتِهٖ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ اَحْوَالُ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِىْ اَىِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكَ ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَمِنْ قَوْلِهٖ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ اِلٰى اٰخِرِهٖ ـ

২৪৬ ‖ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি আলিমগণ ইল্‌মের সংরক্ষণ করতেন[১৭৭] এবং তা যোগ্য লোকদের নিকট পেশ করতেন,[১৭৮] তাহলে সেটার বরকতে তারা তাদের সমসাময়িক লোকদের নেতৃত্ব লাভ করতেন।[১৭৯] কিন্তু তারা ইল্‌ম দুনিয়াদারদের জন্য ব্যয় করেছেন যাতে তারা তা দিয়ে দুনিয়া অর্জন করতে পারে; এতে তারা তাঁদের কাছে হালকা হয়ে গেছে।[১৮০] আমি তোমাদের নবীকে এরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সমস্ত পেরেশানীকে একমাত্র আখিরাতের পেরেশানীতে পরিণত করে, আল্লাহ্ তার দুনিয়ার পেরেশানীগুলোর জন্য যথেষ্ট হবেন। আর যাকে দুনিয়ার পেরেশানী সবদিক থেকে পেয়ে বসবে, আল্লাহ্ তার পরোয়াই করবেন না যে, কোন্ জঙ্গলে সে ধ্বংস হলো।[১৮১] এ হাদীস ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমান'-এ হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

'ইল্‌ম' দ্বারা ধন্য হয়েছে। এ সকল ঘটনা আলোচ্য হাদীসের বিরোধী নয়।

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ্ বলেন, পায়খানার উপর বসে এমন মাছি (ধর্মবিমুখ) ধনী ও শাসকদের দরজায় গমনকারী আলিম ও ক্বারী অপেক্ষা উত্তম। কেননা, মাছি আবর্জনা নিয়ে আসে আর এরা দ্বীনের বিনিময়ে যুল্‌ম্ নিয়ে আসে।

১৭৭. অর্থাৎ ইল্‌মকে অপমান ও অসম্মান থেকে রক্ষা করতেন। এভাবে যে, নিজে লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে দুনিয়াদারদের দরজায় গিয়ে ধিক্কৃত হতেন না, যেহেতু আলিমের অবমাননায় ইলমের অবমাননা এবং ইলমের অমর্যাদায় দ্বীনের অমর্যাদা বিদ্যমান।

১৭৮. অর্থাৎ গুণগ্রাহী এবং উন্নত স্বভাব বিশিষ্ট লোকদেরকে ইল্‌ম শিক্ষা দান করতেন।

১৭৯. এভাবে যে, রাজা-বাদশাহ্ তাঁদের ক্বদমের নিচে এবং তাদের আইন-ক্বানূন আলিমদের কলমের নিচে থাকতো। মহান রবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে- وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ (এবং যাদেরকে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে, তাদের বহু মর্যাদা দেওয়া হয়েছে)।

১৮০. বুঝা যাচ্ছে যে, তাবে'ঈদের যুগেও দুনিয়ালোভী আলিমের জন্ম হয়েছিলো, যাদেরকে দেখে সম্মানিত সাহাবীগণ এরকম বলেছেন।

১৮১. সুবহানাল্লাহ্! অভিজ্ঞতাও এ হাদীসের সমর্থন করে। আল্লাহ্ তা'আলা কোন মুসলমানকে দু'টি দুঃখ ও দু'টি দুশ্চিন্তা দেন না। যে অন্তরে আখিরাতের আশঙ্কা ও চিন্তা-ভাবনা রয়েছে, ইনশা- আল্লাহ্ তাতে দুনিয়ার দুঃখ ও চিন্তা আসে না। পার্থিব দুঃখ-কষ্ট যদি এসেও যায়, তাহলে অন্তরে তার প্রভাব পড়ে না।

ক্লোরাফর্ম ইনজেকশন প্রয়োগ করলে অপারেশনের কষ্ট অনুভূত হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতের চিন্তা নসীব করুন। হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ ক্লোরাফর্ম ইনজেকশনই নিয়েছিলেন, যার কারণে কারবালার মুসীবতসমূহ (হাসিমুখে) প্রশস্ত ললাটে সহ্য করেছিলেন।

وَعَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَاِضَاعَتُهٗ اَنْ تُحَدِّثَ بِهٖ غَيْرَ اَهْلِهٖ - رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ مُرْسَلًا وَعَنْ سُفْيَانَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِكَعْبٍ مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ - رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ

২৪৭ || হযরত আ'মাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[১৮২] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, **"ইলমের বিপদ হচ্ছে- ভুলে যাওয়া এবং সেটার বিনষ্ট হওয়া হচ্ছে- অনুপযুক্ত লোককে তা বর্ণনা করা।**[১৮৩] [এটি ইমাম দারেমী 'মুরসাল' পর্যায়ের হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।]

২৪৮ || হযরত সুফিয়ান সাওরী[১৮৪] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদিন হযরত কা'ব[১৮৫] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললেন, "আহলে ইল্ম (ইলমের অধিকারী) কারা?" তিনি বললেন, "যাঁরা স্বীয় ইল্ম অনুযায়ী আমল করেন।" (হযরত ওমর) বললেন, "আলিমদের অন্তর হতে কোন্ জিনিস ইল্মকে বের করে দিয়েছে?" তিনি (হযরত কা'ব) বললেন, "লোভ-লালসা।"[১৮৬] [দারেমী]

---

১৮২. তাঁর নাম সুলায়মান। উপনাম আবূ মুহাম্মদ। তিনি আসাদী, কূফী। তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তাবে'ঈ ছিলেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছে। তাঁর নিকট থেকে ১৩০০ হাদীস শরীফ বর্ণিত আছে। ৭০ বছর যাবৎ 'সর্বপ্রথম তাকবীর' (তাকবীর-ই তাহরীমা) সহকারে জামা'আতে নামায পড়েছেন। তাঁর জন্ম হয় ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র শাহাদাতের দিনে। ১৪৮ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। তাঁকে 'সায়্যিদুল মুহাদ্দিসীন' (মুহাদ্দিসগণের শিরমণি) বলা হয়। কিন্তু রাফেযী মতবাদের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিলো। [আশি"আতুল লুম'আত]

১৮৩. অর্থাৎ সম্পদ ও স্বাস্থ্য যেমন কোন বিপদাপদ দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি ইল্মও ভুলে যাওয়া দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং আলিমের উচিত ইলমের কাজে লিপ্ত থাকা, কিতাব অধ্যয়ন ছেড়ে না দেওয়া, স্মৃতিশক্তি দুর্বলকারী অভ্যাস ও বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা। আল্লামা শামী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, ছ'টি জিনিস স্মৃতিশক্তিকে দুর্বল করে দেয়-

১. ইঁদুরের উচ্ছিষ্ট খাওয়া, ২. উকূন ধরে জীবিত ছেড়ে দেওয়া, ৩. স্থির পানিতে প্রস্রাব করা, ৪. আঁঠা জাতীয় বস্তু চিবানো, ৫. টক আপেল খাওয়া এবং ৬. আপেলের ছিল্কা চিবানো।

নোট: যে কেউ নামাযের পর ডান হাত মাথায় রেখে একুশবার يَاقَوِىُّ (ইয়া ক্বভিয়্যু) পড়ে দম করে নেবে ইনশা- আল্লাহ্ তাঁর স্মৃতিশক্তি শক্তিশালী হবে।

স্মর্তব্য যে, এখানে 'অনুপযুক্ত' দ্বারা ওই সকল লোক বুঝানো উদ্দেশ্য, যারা ইলমের সূক্ষ্মতম বিষয়াদি অনুধাবন করতে সক্ষম নয়। এ সব লোক ইল্ম অর্জন করে দুনিয়ায় ফ্যাসাদই প্রসার করবে।

১৮৪. তাঁর নাম সুফিয়ান ইবনে সা'ঈদ। তিনি 'সাওর' গোত্রীয়। কূফার অধিবাসী। তিনি একজন অতি সম্মানিত তাবে'ঈ। অন্যতম মুজতাহিদ ইমাম ও এক বিশ্বখ্যাত কুত্বব পর্যায়ের বুযুর্গ। ৯৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬১ হিজরী সালে বসরায় ওফাত পান।

১৮৫. তাঁর উপাধি ছিলো 'কা'ব-ই আহ্বার।' তিনি তাওরীত কিতাবের বড় আলিম ও বনী ইসরাঈলের সর্দার ছিলেন। হুযূরের জাহেরী যুগ পেয়েছেন; কিন্তু সাক্ষাৎ লাভ হয় নি। হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর, হযরত সুহায়ব ও হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রমুখ হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র খিলাফতকালে ৩২ হিজরীতে 'হামাস' নামক স্থানে ওফাত পান। তিনি একজন সম্মানিত তাবে'ঈ।

১৮৬. হযরত কা'ব-ই আহবার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ দু'টি বিষয় খুব সম্ভব তাওরীত শরীফ থেকে দেখে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত ফারূক্ব-ই আ'যম এটাই জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তাওরীতের মধ্যে কাকে 'আলিম' বলা হয়েছে। 'ইল্ম বের হয়ে যাওয়া' মানে ইলমের নূর বের হয়ে যাওয়া। কেননা, দুনিয়ালোভী আলিম হক্ব (সত্য)

وَعَنِ الْاَحْوَصِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ لَاتَسْأَلُوْنِىْ عَنِ الشَّرِّ وَسَلُوْنِىْ عَنِ الْخَيْرِ يَقُوْلُهَا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ اَلَا اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَآءِ وَاِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَآءِ - رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَالِمٌ لَايَنْتَفِعُ بِعِلْمِهٖ - رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ عُمَرُ

২৪৯॥ হযরত আহ্ওয়াস ইবনে হাকীম[১৮৭] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি আপন পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মন্দ কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন,[১৮৮] তখন উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "আমাকে মন্দ কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, বরং ভালো কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো।" এ কথা তিনি তিনবার এরশাদ করেছেন।[১৮৯] অতঃপর এরশাদ করলেন, "জেনে রেখো! সবচেয়ে মন্দ লোক হচ্ছে- মন্দ আলিমগণ, আর সর্বাপেক্ষা ভাল লোক হচ্ছে সৎকর্মপরায়ণ আলিম।[১৯০] [দারেমী]

২৫০॥ হযরত আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্তরের লোক হচ্ছে, ওই আলিম, যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না।[১৯১] [দারেমী]

২৫১॥ হযরত যিয়াদ ইবনে হোদাইর[১৯২] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হযরত ওমর বললেন,

---

প্রকাশ করতে পারে না। যেমন আজকাল দেখা যায়।

১৮৭. হযরত আহ্ওয়াস ইবনে হাকীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন তাবে'ঈ। তিনি হযরত আনাস ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়ুস্‌র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি 'দুর্বল' (ضَعِيْف) পর্যায়ের। তাঁর পিতা হাকীম ইবনে উমায়র হলেন সাহাবী।

১৮৮. অর্থাৎ গুনাহ ও গুনাহ্‌র কারণগুলো কি কি? আর তা থেকে বিরত থাকার উপায় কি?

স্মর্তব্য যে, সৎ কাজ করার জন্য এবং গুনাহ্ হতে বিরত থাকার জন্য সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা চাই। আলিমগণ বলেছেন, কী কী কাজে কুফর হয়, সেগুলো শিখে নেওয়া ফরয, যাতে তা থেকে বিরত থাকা যায়।

১৮৯. অর্থাৎ শুধু মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, ভালো ও সৎকাজ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করো।

১৯০. কেননা, আলিম বিপথগামী হলে জগৎ পথভ্রষ্ট হয়। আলিম সংশোধন হলে জগৎও সংশোধিত হয়ে যায়। আলিম মুসলমানদের জন্য জাহাজের কাপ্তান স্বরূপ। উদ্ধার হলে সবাইকে নিয়ে উদ্ধার হবে আর নিমজ্জিত হলে সবাইকে নিয়ে নিমজ্জিত হবে। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে যতো দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে, সবাই ওলামা-ই সূ' (মন্দ আলিমগণ)-এর বদান্যতায় (!)। এতদসত্ত্বেও ইসলাম আপন মৌলিক বৈশিষ্ট্যে আজও বিদ্যমান। আর তা একমাত্র উলামা-ই খায়র (উত্তম আলিমগণ)-এর বরকতে।

১৯১. অর্থাৎ মানুষ তার 'ইলম', থেকে উপকৃত হয় না; না সে দ্বীনী মাসআলাসমূহ বর্ণনা করে, না কোন ধর্মীয় কিতাব রচনা করে। অথবা মর্মার্থ এ যে, ইল্‌ম দ্বারা নিজে উপকৃত হয় নি; অর্থাৎ আমলবিহীন আলিম।

ইল্‌ম হচ্ছে বৃক্ষস্বরূপ আর আমল হচ্ছে তার ফল স্বরূপ। বড় হতভাগা ওই ব্যক্তি, যে নিজের বৃক্ষের ফল নিজে খায় না। আমলবিহীন (অজ্ঞ) লোকেরা শাস্তি একগুণ, আর আমলবিহীন আলিমের শাস্তি সাতগুণ; হাদীস শরীফে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

১৯২. তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) হলো আবূ মুগীরাহ্। তিনি 'বনী আসাদ' গোত্রের লোক। কূফায় বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন তাবে'ঈ।

তিনি ফারূক্ব-ই আ'যম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন।

هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وِعَائَيْنِ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيْكُمْ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُوْمُ يَعْنِيْ مَجْرَى الطَّعَامِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"তুমি কি জানো, ইসলামকে কোন্ জিনিস ধ্বংস করবে?"[১৯৩] আমি বললাম, "জী-না।" তিনি বললেন, "আলিমের পদস্খলন, মুনাফিক্বের ক্বোরআন নিয়ে ঝগড়া করা এবং পথভ্রষ্টকারী নেতাদের শাসন ইসলামকে ধ্বংস করবে।[১৯৪] [দারেমী]

২৫২ || হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "ইল্‌ম দুই প্রকার: এক প্রকার ইল্‌ম হচ্ছে অন্তরে; আর এ ইল্‌ম উপকারী।[১৯৫] অন্য প্রকার ইল্‌ম হচ্ছে, শুধু মুখের উপর; আর এ-ই ইল্‌ম মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষে দলীল।[১৯৬] [দারেমী]

২৫৩ || হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে দু'পাত্র ইল্‌ম আয়ত্ব করেছি। তন্মধ্যে এক পাত্র ইল্‌ম তোমাদের মাঝে বিস্তার করেছি আর অপর পাত্র ইল্‌ম যদি বিস্তার করি তবে কেটে ফেলা হবে এ-ই কণ্ঠনালী অর্থাৎ গলা।[১৯৭] [বোখারী]

---

১৯৩. অর্থাৎ ইসলামের ইজ্জত-সম্মান মানুষের অন্তর থেকে দূরীভূত করে।

১৯৪. অর্থাৎ যখন আলিমগণ আরামপ্রিয় হওয়ার কারণে অলসতা শুরু করে দেয়, ইসলামের বিধি-বিধানের গবেষণার চেষ্টা না করে ভুল মাস্‌আলা বর্ণনা করে, বে-দ্বীন আলিমগণের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে, বিদ'আতগুলোকে সুন্নাত সাব্যস্ত করে ক্বোরআন করীমকে স্বীয় রায় অনুযায়ী করে নেয়। পথভ্রষ্ট লোক হাকিম (বিচারক) নিযুক্ত হয় এবং লোকদেরকে নিজের আনুগত্য করতে বাধ্য করে। তখন ইসলামের প্রতি ভক্তিপ্রযুক্তভয় মানুষের হৃদয় থেকে বেরিয়ে যায়। যেমনটি বর্তমানে হচ্ছে। কতেক বিজ্ঞ আলিম বলেছেন, 'আলিমের পদস্খলন' মানে তার পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়া। আলিমের আমলও খোদ্ দ্বীনের প্রচার হওয়া চাই।

১৯৫. অর্থাৎ ইলমে দ্বীনের দু'টি দিক রয়েছে, একটি হচ্ছে তা-ই, যার হৃদয়ে স্থান করে নেওয়ার কারণে আলিমের হৃদয় আলোকিত ও শরীর অনুগত হয়ে যায়- এ ইল্‌ম আলিমকেও উপকৃত করে এবং অন্য লোককেও। এমন আলিমের ওয়ায (বক্তৃতা) ও তাঁর সাহচর্য পরশপাথর তুল্য। আর এটার আলামত হলো এ যে, আলিমের হৃদয়ে খোদাভীতি ও হুযূর মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ভালবাসায় চোখে পানি, মুখে আল্লাহর যিক্‌র থাকে। সম্মানিত সূফীগণ বলেন, তাসাউফ বিহীন ইল্‌ম হচ্ছে ফাসেক্বী (পাপাচার), আর ইল্‌ম বিহীন তাসাউফ হচ্ছে বে-দ্বীনী।

১৯৬. অর্থাৎ যখন আলিম কথা ভাল বলে, কিন্তু তার অন্তর ইলমের নূর থেকে এবং শরীর ইলমের প্রভাব থেকে শূন্য হয়। এ ইল্‌ম ক্বিয়ামতে আলিমের বিরুদ্ধে এ অভিযোগের কারণ হবে যে, মহান রব বলেন- তুমি তো সবকিছু জানতে, তারপরও পথভ্রষ্ট ও বদ-আমল কেন হলে? সম্মানিত সূফীগণ বলেন, যে ইলমের মধ্যে তাসাউফের মিশ্রণ ঘটে নি, তা হচ্ছে মৌখিক জ্ঞান ও শয়তানের উত্তরাধিকার মাত্র। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর ইল্‌ম ছিলো ক্বলব ও হৃদয়ের আর শয়তানের ইল্‌ম ছিলো নিছক মুখের।

১৯৭. অর্থাৎ আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'প্রকারের ইল্‌ম লাভ করেছি। **এক.** ইলমে শরীয়ত- যা আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছি। **দুই.** ইলমে আসরার- তরীক্বত ও হাক্বীক্বত, তা যদি প্রকাশ করি,

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهٖ وَمَنْ لَّمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ تَقُوْلَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهٖ ﴿قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ﴾ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৫৪ || হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে লোকেরা! যে কেউ কিছু জানে সে যেন তা বর্ণনা করে দেয়। আর যে জানে না, সে যেন বলে দেয়, "আল্লাহ্ই ভাল জানেন"।[১৯৮] কেননা, এ-ও ইল্ম যে, তুমি যা জানো না, তা সম্পর্কে বলে দাও যে, আল্লাহ্ই ভালো জানেন।[১৯৯] আল্লাহ্ তা'আলা আপন নবীকে বলেছেন, (হে রসূল!) আপনি বলে দিন! 'আমি নুবুয়তের (মহাদায়িত্ব পালনের জন্য) তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি বানোয়াট লোকদের অন্তর্ভুক্তও নই।[২০০] [বোখারী, মুসলিম]

তবে সাধারণ লোক বুঝবে না, আর আমাকে বে-দ্বীন মনে করে হত্যা করে ফেলবে। অথবা একটি 'ইলমে আহকাম' (বিধানাবলীর জ্ঞান); আর অন্যটি ইলমে আখবার (ইতিহাস), যাতে অত্যাচারী শাসকবৃন্দের এবং বে-দ্বীন নেতৃবৃন্দের নাম বিদ্যমান। যদি আমি তা বলে দিই, তবে তাদের বংশধরগণ আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহুত তা'আলা আনহু কখনো ইশারা-ইঙ্গিতে কিছু কিছু বলে ফেলতেন। সুতরাং তিনি এ বলে বর্ণনা করতেন, "হে আল্লাহ্! আমাকে ৬০ হিজরীর ফিত্না ও বালকদের শাসন থেকে আশ্রয় দিন।" কাজেই ৬০ হিজরী সালে হযরত আমীর মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহুর ওফাত হয়, নাপাক ইয়াযীদ সিংহাসনে আরোহন করেছে। এ প্রার্থনায় এ দু'টি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত ছিলো। তাঁর এ দো'আ ক্বূল হয়েছে। আর হযরত আমীর মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন। এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি মাসআলা প্রতীয়মান হয়: যেমন-

এক. শরীয়তের মাসআলাসমূহ যেন নির্দ্বিধায় বর্ণনা করা হয়, কিন্তু তাসাউফের রহস্যাবলী অনুপযুক্তকে বলা যাবে না। দুই. অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি যেগুলো প্রকাশ করার দরুন ফিত্না ছড়ায়, তা কখনো যেন প্রকাশ করা না হয়। তিন. আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবকে 'ইলম-ই গায়ব' (অদৃশ্যজ্ঞান) দান করেছেন। হুযূরের মাধ্যমে সাহাবা-ই কেরামকেও; হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ইলমের অবস্থা যদি এই হয়, তবে সম্মানিত খোলাফা-ই রাশিদীনের ইল্ম তো আমাদের বোধগম্য হবার অনেক উর্ধ্বে।

১৯৮. এটা 'হাদীস-ই মাওকূফ' অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র নিজের উক্তি। হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে- কোন আলিম স্বীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করতে যেন লজ্জাবোধ না করে। যদি কোন মাসআলা জানা না থাকে, তবে মনগড়াভাবে বলে দেবে না। ইলমের চেয়ে আমাদের অজ্ঞতা বেশী। মহান রব এরশাদ করেছেন- وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا (তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।[১৭:৮৫]) ফিরিশ্তাগণ আরয করেছেন لَا عِلْمَ لَنَا অর্থাৎ আমাদের কোন ইল্ম নেই।[২:৩২]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মিম্বরের উপর অবস্থানকালে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, "আমার জানা নেই।" ওই (প্রশ্নকারী) বে-আদব বললো, "অজ্ঞতা সত্ত্বেও আপনি মিম্বরের উপর কেন দাঁড়িয়েছেন?" তিনি বললেন, "আমি ইলম পরিমাণ মিম্বরে আরোহন করেছি। যদি অজ্ঞতা পরিমাণ আরোহন করতাম, তবে তো আসমানের উপর পৌঁছে যেতাম।[মিরক্বাত]

১৯৯. অর্থাৎ নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে জানাও ইলমের শামিল। নিজের মূর্খতা সম্পর্কে অনবগত হওয়া গণ্ডমূর্খতা। সম্মানিত মুফতীগণ ফাতাওয়ার শেষে লিখে থাকেন- اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ (আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাতা)। এটা এ হাদীস থেকে গৃহীত।

২০০. অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার চেয়ে বড় আলিম (জ্ঞানী) এবং সমগ্র জগতের শিক্ষক। তারপরও তাঁকে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে বিষয়ের ইল্ম আপনাকে কখনো দেওয়া হয় নি তা নিজ থেকে বানিয়ে বলবেন না। সুতরাং যখন হুযূরের নিকট 'আসহাব-ই কাহাফ'-এর সংখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, তখন হুযূর তা বলেন নি। কারণ, সেটার ইল্ম তাঁকে পরে প্রদান করা হয়েছে। হযরত ওমর

وَعَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَاْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يَامَعْشَرَ الْقُرَّآءِ اِسْتَقِيْمُوْا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيْدًا وَاِنْ اَخَذْتُمْ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ

২৫৫ || হযরত ইবনে সীরীন[২০১] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় ইল্‌ম হলো 'দ্বীন'। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো, তোমরা দ্বীন কার নিকট হতে গ্রহণ করেছো।[২০২] [মুসলিম]

২৫৬ || হযরত হুযায়ফা[২০৩] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হে ক্বারীগণের দল! তোমরা সরল-সোজা থেকো। কেননা, তোমরা অনেকেরই পূর্বে।[২০৪] যদি তোমরা উল্টো-সিধে হয়ে যাও, তা হলে তোমরা বড়ো গোমরাহীর মধ্যে পতিত হবে।[২০৫] [বোখারী]

২৫৭ || হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমরা দুশ্চিন্তার কূপ হতে আল্লাহর আশ্রয় চাও।"

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো فَاكِهَةً ও اَبًّا (ফল ও উদ্ভিদ)-এর মধ্যে পার্থক্য কি? উত্তরে তিনি বললেন, "আমার জানা নেই।" হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ৩৬টি মাসআলা সম্পর্কে বলেছেন, "আমি জানি না।" হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো دَهْر (দাহ্‌র) কি জিনিস? উত্তরে তিনি বললেন, "আমার জানা নেই।"

২০১. তাঁর প্রকৃত নাম 'মুহাম্মদ ইবনে সীরীন'। আর কুনিয়ত (উপনাম) আবূ বকর। তিনি ছিলেন একজন শানদার তাবে'ঈ। তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সীরীন হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি (মুহাম্মদ ইবনে সীরীন) একজন বড় আলিম, ফক্বীহ্ ও ইলমে তা'বীর (স্বপ্নব্যাখ্যা বিদ্যা)'র ইমাম ছিলেন। তিনি ৭৭ বছর বয়সে ১১০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। বসরা থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে 'আশ্‌রা' নামক স্থানে খাজা হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মাযার শরীফের মধ্যে তাঁর মাযার শরীফও অবস্থিত। ফক্বীর (আহমদ ইয়ার খান) সেটার যিয়ারত করেছি।

২০২. ইলমে শরীয়ত, ইলমে দ্বীন তখনই হবে, যখন শিক্ষাদাতা উস্তাদ আলিম-ই দ্বীন হবেন। বে-দ্বীন আলিম থেকে অর্জিত জ্ঞান অধার্মিকতাই হবে। বর্তমানে বে-দ্বীন উস্তাদ থেকে তাফসীর ও হাদীস পড়ে বে-দ্বীনই হচ্ছে। বাণীর সাথে সাথে ফয়যের ধারাও জরুরী।

২০৩. তাঁর প্রকৃত নাম হুযায়ফাহ্ ইবনে ইয়ামান। উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্। তাঁর পিতা ইয়ামান-এর নাম ছিলো 'জামাল', উপাধি ছিলো 'ইয়ামান'। হযরত হোযায়ফাহ্ ইবনে ইয়ামান হুযূর-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র রহস্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত সাহাবী ছিলেন। মুনাফিক্বগণ এবং ক্বিয়ামতের পূর্বেকার সংঘঠিতব্য এক একটি ফিত্‌না সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিলো। ৩৫ বা ৩৬ হিজরীতে হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র শাহাদাত লাভের পর মাদায়েনে তাঁর ওফাত হয়। সেখানেই তাঁর মাযার শরীফ রয়েছে। [মিরক্বাত]

২০৪. অর্থাৎ হে আলিমগণ, সাহাবা ও তাবে'ঈগণ! তোমরা আক্বীদা ও আমলে সঠিক থাকো। কেননা, তোমরা সকল মুসলমানের চেয়ে অগ্রগামী। তোমরা যেরূপ হবে, তোমাদের পরবর্তী মুসলমানগণও সেরূপ হবে। কেননা, তাঁরা তোমাদের পদাঙ্কের উপর চলবে। তোমাদেরকে অনুসরণ করবে।

স্মর্তব্য যে, সাধারণতঃ ওই যুগে আলিমগণ ক্বারীও হতেন, তাই তাঁদেরকে 'ক্বারীগণ! (قُرَّاء)' বলা হয়েছে। সূফীগণ বলেন, দ্বীনের উপর একটা অটলতা হাজার কারামত থেকে উত্তম। হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, এর অর্থ এ যে, "হে সাহাবীগণ! তোমরা সমস্ত মুসলমান থেকে উত্তম।" অন্য কেউ যতো আমলই করুক না কেন, সে তোমাদের পায়ের ধুলোর মর্যাদায়ও পৌঁছতে পারবে না। তাই তোমাদের আমল ও সবার চেয়ে উত্তম হওয়া চাই।

২০৫. অর্থাৎ যদি তোমাদের আক্বীদা ও আমলে ভুল হয়ে যায়, তবে তোমাদেরকে দেখে সমস্ত উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং তোমাদের ভুল বড় বিপজ্জনক।

قَالُوْايَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاجُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍفِيْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَمِائَةِمَرَّةٍقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَّدْخُلُهَاقَالَ اَلْقُرَّاءُ الْمُرَاءُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَكَذَا ابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ فِيْهِ وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِ الْقُرَّآءِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْاُمَرَآءَ قَالَ الْمُحَارِبِيُّ يَعْنِى الْجَوَرَةَ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهٗ وَلَايَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ

লোকেরা আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! দুশ্চিন্তার কূপ কি?" এরশাদ করলেন, "দোযখের মধ্যে একটি উপত্যকা রয়েছে, যা হতে স্বয়ং দোযখ প্রত্যেহ চারশ' বার আশ্রয় প্রার্থনা করে।"[২০৬] আরয করা হলো, "হে আল্লাহ্র রসূল! তাতে কে যাবে?" এরশাদ করলেন, "আপন আমলসমূহ (অন্যকে) প্রদর্শনকারী ক্বারীগণ।"[২০৭] এ হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, অনুরূপ ইবনে মাজাহও। তবে তাতে এতটুকু বেশি আছে যে, "আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় হচ্ছে ওই ক্বারী, যে আমীরদের সাথে সাক্ষাৎ করে।" মোহারবী বলেন, অর্থাৎ অত্যাচারী শাসকদের সাথে।[২০৮] **২৫৮ ||** হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "অদূর ভবিষ্যতে মানুষের উপর এমন সময় আসবে, যখন ইসলামের শুধু নাম[২০৯] আর ক্বোরআনের শুধু প্রথাই থেকে যাবে।[২১০]

২০৬. এ হাদীস পুরোপুরি প্রকাশ্য অর্থে প্রযোজ্য। যেহেতু ওই উপত্যকা অত্যন্ত গভীর এবং সেখানে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু নেই; সেহেতু সেটাকে 'দুশ্চিন্তার কূপ' বলা হয়েছে। দোযখের চারটি সীমানা রয়েছে। প্রত্যেক সীমানা প্রত্যেহ একশ' বার ওই উপত্যকা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, অথবা তথায় নিযুক্ত 'যুবানিয়্যাহ্' ফিরিশ্তা তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। অথবা স্বয়ং দোযখের আগুন। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অনুভূতি শক্তি রয়েছে, যা দ্বারা সেটা জানে ও চিনে থাকে।

স্মর্তব্য যে, দুনিয়ার আগুনে যেমন উত্তাপ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন শুকনো ঘাস ও খড়ের আগুনে উত্তাপ কম, বাবুল গাছের আগুনে উত্তাপ তীব্র, পেট্রোল ও ইস্পিরিটের আগুনে উত্তাপ আরো বেশী; কতেক আগুন তো লোহা ও ইস্পাতকেও গলিয়ে ফেলে, তদ্রূপ দোযখের আগুনও বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে।

২০৭. অর্থাৎ ওই সব বে-দ্বীন আলিম, যারা নেক আমলের পোশাক নিয়ে লোকদের সামনে আসে এবং লোকদেরকে গোমরাহ ও বে-দ্বীন বানিয়ে ছাড়ে।

২০৮. যাতে তার থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে তার অপকর্মগুলোকে জায়েয প্রমাণ করে, আর যুল্মের মধ্যে তার সাহায্যকারী হয়; বরং চাটুকার আলিমও বড় বিপজ্জনক। সে প্রত্যেক স্থানে গিয়ে ওই পরিবেশের সঙ্গী হয়ে যায়। আমাদের আল্লাহ্, নবী, ক্বোরআন ও কা'বা এক, সুতরাং দ্বীনও এক হওয়া চাই।

২০৯. এভাবে যে, মুসলমানদের নামটুকু ইসলামী হবে এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে মনে করবে; কিন্তু আবরণ-আভরণ, রঙ-ঢঙ সবই হবে কাফিরদের মতো; যেমনটা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। অথবা ইসলামের নাম ও আকৃতি তো অবশিষ্ট থাকবে, কিন্তু উদ্দেশ্য হাতছাড়া হয়ে যাবে। নামাযের বাহ্যিক গঠন ও পদ্ধতি থাকবে, কিন্তু দৈহিক বিনয় ও অন্তরের নম্রতা থাকবে না। যাকাত দেবে ঠিকই; কিন্তু সম্প্রদায় তথা জাতির প্রতিপালন নিঃশেষ হয়ে যাবে। হজ্জ করবে শুধু ভ্রমণের নিমিত্তে; জিহাদ হবে, কিন্তু তাও রাজত্ব লাভের উদ্দেশ্যে।

২১০. 'রসম' (প্রথা) নকশা বা কারুকার্যকেও বলা হয় এবং তরীক্বা বা পদ্ধতিকেও। এখানে উভয় অর্থই প্রযোজ্য। অর্থাৎ ক্বোরআনের নকশাগুলো কাগজের মধ্যে এবং শব্দাবলী মুখের উপর থাকবে; কিন্তু হৃদয়ে ক্বোরআনের প্রতি সম্মান এবং শরীরে আমল থাকবে না। অথবা প্রথাগতভাবে ক্বোরআন পড়া বা রাখা হবে- আদালতে মিথ্যাশপথ করার জন্য এবং ঘরে মৃতের উপর পড়ার জন্য; কিন্তু আমল বা কার্যকর করার জন্য থাকবে খ্রিষ্টানদের আইন-কানূন, প্রথা ও রীতি।

مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدٰى عُلَمَآءُهُمْ شَرٌّ مِنْ تَحْتِ اَدِيْمِ السَّمَآءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ

وَعَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ اَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ وَنُقْرِئُهُ اَبْنَآءَنَا وَيُقْرِئُهُ اَبْنَاءُنَا اَبْنَآءَهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ زِيَادُ اِنْ كُنْتُ لَاُرَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ

তাদের মসজিদগুলো আবাদ (জাঁকজমকপূর্ণ) থাকবে; কিন্তু হিদায়ত শূন্য হবে।[২১১] তাদের থেকে ফিত্না প্রকাশ পাবে। আর তাদের মধ্যে (ওই ফিত্না), ফিরে যাবে।"[২১২] ।এ হাদীস ইমাম বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমান'-এ বর্ণনা করেছেন।। **২৫৯ ॥ হযরত** যিয়াদ ইবনে লবীদ[২১৩] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন কিছু নিয়ে আলোচনা করলেন এবং এরশাদ করলেন, "এটা ইলম চলে যাওয়ার সময়ে হবে।"[২১৪] আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহর রসূল! ইলম কীভাবে চলে যেতে পারে? অথচ আমরা ক্বোরআন পড়ছি এবং আমাদের সন্তানদেরকেও পড়াতে থাকবো, আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমাদের সন্তানগণ তাদের সন্তানদেরকে (পড়াতে থাকবে)।"[২১৫] তখন হুযূর এরশাদ করলেন, "তোমার জন্য তোমার মা ক্রন্দন করুক! হে যিয়াদ! আমি তো তোমাকে মদীনার বড় সমঝদার ব্যক্তিদের একজন মনে করতাম।[২১৬]

২১১. মসজিদসমূহের সুউচ্চ ইমারত দ্বারা দেয়ালে কারুকার্য, বিদ্যুতের ফিটিংস মনোরম থাকবে, কিন্তু (প্রকৃত) নামাযী কেউ থাকবে না। তাদের ইমাম হবে বে-দ্বীন। মসজিদসমূহ যেন হিদায়তের স্থলে বে-দ্বীনদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবে। প্রত্যেক মসজিদ থেকে লাউড- স্পীকারের মাধ্যমে (ক্বোরআন-হাদীসের) পাঠদানের আওয়াজ শুনা যাবে, কিন্তু ওই পাঠদান হবে হত্যাকারী বিষতুল্য; যেগুলোতে ক্বোরআনের নামে কুফর ও সীমালঙ্ঘনের কথাবার্তা প্রচার করা হবে।

২১২. অর্থাৎ বে-দ্বীন, ওলামা-ই সু' (মন্দ আলিমগণ)'র আধিক্য হবে, যাদের ফিতনা সমস্ত মুসলমানকে ঘিরে ফেলবে। যেমন, বৃত্তের রেখা যেখান থেকে শুরু হয়, সেখানে পৌঁছে বৃত্তকে পরিপূর্ণ করে দেয় এবং মধ্যবর্তী পূর্ণস্থানকে সেটা ঘিরে ফেলে, তেমনি তাদের ফিত্না হবে। এটার অর্থ এ নয় যে, সমগ্র বিশ্ব খারাপ হয়ে যাবে। অন্যথায় দ্বীন (পৃথিবী থেকে) মুছে যেতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ দ্বীনের সত্যপন্থী নেক্কার লোকদেরকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখবেন; যাঁরা এ দ্বীনকে তার মৌলিক অবস্থায় অম্লান করে রাখবেন। যেমন আজকালও দেখা যাচ্ছে।

২১৩. তাঁর উপনাম 'আবূ আবদুল্লাহ'। তিনি আনসারী ও যুরাক্বী (যুরাক্ব গোত্রীয়) লোক। তিনি হুযূরের সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হিজরতের পূর্বে মক্কা-ই মু'আযযমায় হুযূরের নিকট চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে আসেন। এ জন্য তাঁকে সমস্ত সাহাবী 'মুহাজির-ই আনসার' বলে ডাকতেন। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে 'হাদ্বারা মাওত'-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হযরত আমীর মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র শাসনামলের প্রাক্কালে ওফাত পান।

২১৪. অর্থাৎ অতি ভয়াবহ ঘটনাবলী তখনই সংঘটিত হবে, যখন দুনিয়া হতে ইলম উঠে যাবে।

২১৫. এখানে ক্বোরআন পড়া ও পড়ানো মানে পূর্ণ ইলম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া। অর্থাৎ যখন শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তখন ইলম কীভাবে উঠে যাবে? 'মাসদার' (উৎস) থাকাবস্থায় 'হাসিল-ই মাসদার' (মূল থেকে উৎসারিত বস্তু) কোথায় যাবে?

২১৬. এ থেকে বুঝা গেল যে, শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার জন্য মৃদু তিরস্কার করতে পারেন। হুযূরের এ বরকতময় শব্দগুলো 'আমি তোমাকে এরূপ জানতাম' তিরস্কারের জন্য ছিলো, নিজের কোন প্রকার অজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ছিলো না। অর্থাৎ কতেক বোধশক্তিহীন লোক এ হাদীস থেকে হুযূরের ইলমকে অস্বীকার করেছে।

اَوَلَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ لَايَعْمَلُوْنَ بِشَيْءٍ مِمَّافِيْهِمَا- رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ نَحْوَهُ وَكَذَا الدَّارِمِيُّ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَآئِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ فَاِنِّيْ اِمْرُءٌ مَقْبُوْضٌ وَالْعِلْمُ سَيُنْقَبَضُ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ اِثْنَانِ فِيْ فَرِيْضَةٍ لَايَجِدَانِ اَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا -رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالدَّارُ قُطْنِيُّ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ عِلْمٍ لَايُنْتَفَعُ بِهٖ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَايُنْفَقُ مِنْهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ

এ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান কি তাওরীত ও ইনজীল পাঠ করে না? কিন্তু ওই দু'টিতে যা আছে, তা অনুসারে মোটেই আমল করে না।"[২১৭] [এ হাদীস ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীও সেটা তাঁরই থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তেমনিভাবে দারেমী সেটা আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।] **২৬০ ॥ হযরত ইবনে মাস'উদ** রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমরা ইল্‌ম্ শিক্ষা করো এবং লোকদেরকে শিক্ষা দাও। ফরাইয শিক্ষা করো এবং লোকদেরকে শিক্ষা দাও। ক্বোর'আন শিক্ষা করো এবং লোকদেরকে দাও।[২১৮] কেননা, আমি ওফাত প্রাপ্ত হবো। অতি সত্বর ইল্‌ম্ উঠে যাবে। ফিত্না প্রকাশ পাবে; এমনকি একটি ফরয নিয়ে দু'ব্যক্তি ঝগড়া করবে, কিন্তু তারা এমন কোন ব্যক্তি পাবে না, যে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে।"[২১৯] [এ হাদীস দারেমী ও দারু কুত্বনী বর্ণনা করেছেন।]

২৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ইল্‌ম্ দ্বারা উপকার সাধিত হয় না, সেটার উপমা ওই ধনভাণ্ডারের মতো, যা হতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হয় না।"[২২০] [আহমদ ও দারেমী]

২১৭. অর্থাৎ 'ইল্‌ম' দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ইলমের ফলশ্রুতি বুঝানো। অর্থাৎ ইল্‌ম থাকবে; কিন্তু আমল থাকবে না।

স্মর্তব্য যে, খ্রিষ্টানদের পাদ্রী ও যুগীগণ ঘুষ নিয়ে সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় কর্তব্যাদি থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয় এবং তাদের গুনাহ্ ক্ষমা (!) করে দিতে থাকে। সুতরাং নিজেরা আর কি আমল করতো? বরং সপ্তাহে একদিন গির্জায় গান-বাজনা করাই ছিলো তাদের আমল (ধর্মকর্ম)।

২১৮. 'ফারা-ইদ্ব' দ্বারা ইসলামী ফরয কার্যাদি, যেমন নামায-রোযা ইত্যাদির বিধি-বিধান (মাসআলা-মাসাইল) বুঝানো হয়েছে।

অথবা ইল্‌ম-ই মীরাস (উত্তরাধিকার আইন বিষয়ক জ্ঞান) বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থই বেশি প্রযোজ্য, যা পরবর্তী বিষয়বস্তু দ্বারা বুঝা যাচ্ছে। যদিও ইল্‌ম ও ক্বোর'আনের মধ্যে এটাও এসে গিয়েছিলো, কিন্তু অধিক গুরুত্বের কারণে সেটাকে (ফারাইদ্ব তথা উত্তরাধিকার জ্ঞানের কথা) পৃথকভাবে এরশাদ করেছেন।

২১৯. অর্থাৎ এখন তো তোমাদের জন্য সহজ যে, প্রত্যেক মাসআলা আমার নিকট থেকে জেনে নিচ্ছো; কিন্তু আমার পর একটি কঠিন সময় উপস্থিত হবে, যাতে আলিমগণকে উঠিয়ে নেওয়া হবে, এমনকি একজন মৃত ব্যক্তির 'মীরাস' (ত্যাজ্য সম্পত্তি) বন্টনের জন্য একজন মুফ্তীও পাওয়া যাবে না। প্রকাশ থাকে যে, এখানে 'দুই' মানে মৃতের দু'জন ওয়ারিস আর 'ফরয' দ্বারা মীরাসের মাসআলা বুঝানো হয়েছে। অথবা 'ফরীদ্বাহ্' দ্বারা শরীয়তের অন্য মাসআলাও বুঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে।

২২০. সুবহানাল্লাহ্! কী পবিত্র উদাহরণ। অর্থাৎ যে ইল্‌ম দ্বারা না আলিম নিজে উপকৃত হয়, না অন্য কেউ, তা ওই সম্পদের মতো, যা হতে না মালিক উপকৃত হয়, না অন্য লোক। এমন সম্পদ যেমন অনর্থক বরং ক্ষতিকর, তেমনি ইল্‌মও অনর্থক মন্দ পরিণতির কারণ।

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اَبِىْ مَالِكِ نِ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاٰنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَّ الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ

পর্ব ঃ পবিত্রতা[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ২৬২।। হযরত আবূ মালিক আশ্'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু[২] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পবিত্রতা হচ্ছে- ঈমানের অর্ধেক।[৩] 'আল্হামদুলিল্লাহ্' দাড়ি-পাল্লা ভর্তি করে দেবে;[৪] 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যকে ভর্তি করে দেয়,[৫] নামায হচ্ছে আলো,[৬] সাদক্বাহ্-খায়রাত হচ্ছে দলীল-প্রমাণ,[৭]

---

১. 'ত্বাহারাত' (طہارت) শব্দের অর্থ আবর্জ্জনা ও অপবিত্রতা দূরীভূত করা। আবর্জ্জনা এবং অপবিত্রতা রূহানী (আত্মিক)ও হয় এবং শারীরিকও। সুতরাং 'ত্বাহারাত' বা পবিত্রতাও আত্মিক এবং শারীরিক (উভয় প্রকারের) হয়ে থাকে।

এ দু'পবিত্রতার অনেক প্রকারভেদ রয়েছে; কেননা, অপবিত্রতাও অনেক প্রকারের। শারীরিক পবিত্রতা আবার দু'প্রকারের হয়ে থাকে। এক. ত্বাহারাত-ই হাক্বীক্বী এবং দুই. 'তাহারাত-ই হুকমী' (বিবেচনাগত পবিত্রতা)। 'ত্বাহারাত-ই হাক্বীক্বী' (প্রকৃত বা বাস্তব পবিত্রতা) হচ্ছে- প্রকৃত অপবিত্রতা অর্থাৎ 'অপবিত্র আবর্জ্জনা' দূরীভূত করা। আর 'ত্বাহারাত-ই হুকমী' হচ্ছে- 'হাদ্স' বা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবেচ্য শারীরিক অপবিত্রতা দূর করা। এ অধ্যায়ে এ দু'প্রকার পবিত্রতার বর্ণনা আসবে।

২. তিনি একজন সাহাবী। হযরত আবূ মূসা আশ্'আরীর চাচা। তিনি হযরত ফারূক্ব-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু-এর খিলাফতকালে ওফান পান।

৩. প্রকাশ থাকে যে, 'তুহূর' (طہور) মানে বাহ্যিক পবিত্রতা আর 'ঈমান' (ایمان) দ্বারা 'পারিভাষিক ঈমান' বুঝানো হয়েছে। যেহেতু ঈমানও গুনাহ্সমূহকে নিশ্চিহ্ন করে এবং ওযূও। কিন্তু ঈমান ছোট-বড় সমস্ত গুনাহ্ নিশ্চিহ্ন করে আর ওযূ শুধু ছোট-গুনাহগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে। এ জন্য ওযূকে ঈমানের অর্দ্ধেক বলেছেন। 'ঈমান' অভ্যন্তরীণ দিককে দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র করে আর ওযূ বাহ্যিক দিককে আবর্জ্জনা-অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে। জাহির (বাহ্যিক দিক) যেনো বাত্বিন (অভ্যন্তর)'র অর্দ্ধেক।

অথবা 'ঈমান' অন্তরের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র ও গুণাবলী দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, আর পবিত্রতা শরীরকে শুধু আবর্জ্জনার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে। সুতরাং অর্ধেক হলো। আর এটাও হতে পারে যে, 'ঈমান' দ্বারা নামায বুঝানো হয়েছে। যেমন মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ [আল্লাহ্র জন্য এটা শোভা পায়না যে, তোমাদের ঈমান (নামায)কে ব্যর্থ করবেন। ২ : ১৪৩, তরজমা- কান্যুল ঈমান]

অর্থাৎ নামাযের সকল পূর্বশর্ত 'তাহারাত' বা পবিত্রতার সকল পূর্বশর্তের সমান। সুতরাং হাদীসের বিপক্ষে এ আপত্তি করা যাবে না যে, 'ঈমান হলো 'বসীত্ব' বা অবিমিশ্র; সুতরাং সেটার অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ কিভাবে হয়?'

৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বাবস্থায় 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে ক্বিয়ামত দিবসে তার নেকীর পাল্লা (মীযানের পাল্লা) এটা দ্বারা ভর্তি হয়ে যাবে। একবার 'আলহামদুলিল্লাহ্' সমস্ত গুনাহ্র উপর ভারী হবে। কারণ, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ আর ওটা হচ্ছে মহান রবের নাম।

৫. অর্থাৎ এ দু'কলেমার সাওয়াব যদি পৃথিবীতে বিলিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা এতো বেশী বিস্তৃত হবে যে, তাতে সমগ্র পৃথিবী ভরে যাবে।

অথবা অর্থ এ যে, 'সুবহা-নাল্লাহ্'-এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত বলে স্বীকার বা ঘোষণা করা হয় এবং 'আলহামদুলিল্লাহ্'-এর মধ্যে তাঁর সমস্ত পূর্ণতা ও গুণের কথা প্রকাশ করা হয়। আর এ দু'টি বিষয় এমনি যে, এ দু'টিরই

وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَّكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْا فَبَايِعٌ نَّفْسَهٗ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَمْلَاٰنِ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَمْ اَجِدْهٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِىِّ وَلَا فِى الْجَامِعِ وَلٰكِنْ ذَكَرَهَا الدَّارِمِىُّ بَدْلَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ.

'সবর' (ধৈর্য) হচ্ছে জ্যোতি,[৮] ক্বোরআন হচ্ছে তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রমাণ।[৯] প্রত্যেক ব্যক্তি ভোর পায়, তখন সে আপন আত্মাকে বিক্রি করে। অতঃপর সে হয়তো আপন আত্মাকে মুক্ত করে কিংবা ধ্বংস করে।[১০] (মুসলিম) অন্য এক বর্ণনায় এভাবে আছে– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং 'আল্লাহু আকবর' আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যকে ভর্তি করে দেয়। আমি এ বর্ণনা না বোখারী ও মুসলিমে পেয়েছি, না ইমাম হুমাইদীর কিতাবে, না জামি'-এর মধ্যে। কিন্তু ইমাম দারেমী (সেটা) উল্লেখ করেছেন। আর 'সুবহানাল্লাহ্'র স্থলে 'আলহামদুলিল্লাহ্' উল্লেখ করেছেন।[১১]

প্রমাণাদিতে পৃথিবী ভর্তি হয়ে আছে। কেননা, প্রত্যেক অণু-পরমাণু ও প্রতিটি বিন্দু সর্বদা মহান রবের 'তাস্‌বীহ' ও 'হামদ' (পবিত্রতা ও স্তুতিবাক্য) বর্ণনা করছে।

৬. অর্থাৎ 'নামায' মুসলমানের অন্তর, চেহারা ও কবরের এবং ক্বিয়ামতের আলো। সাজদার নিশানা পুলসিরাতের উপর টর্চের কাজ দেবে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন– يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ الاٰية (তাদের আলো তাদের সম্মুখে ও তাদের ডানে ছুটাছুটি করবে। ৫৭ : ১২)

আর এটাও সম্ভব যে, সালাত দ্বারা দুরূদ শরীফ বুঝানো হয়েছে। কারণ, এটাও সব দিক দিয়ে নূর বা আলো।

৭. মু'মিনের ঈমানের পক্ষে, কেননা, মুনাফিক্ব ও কাফির সঠিক দান-খায়রাত করার সামর্থ্য পায় না। অথবা কাল ক্বিয়ামতে সাদ্‌ক্বাহ্ মহান রবের প্রতি ভালবাসার প্রমাণ এবং ক্ষমার যিম্মাদার হবে। কেননা, মহান রব সেটাকে কর্জ বলেছেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে– مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ الاٰية (কে আছে, যে আল্লাহ্‌কে কর্জ দেবে? ৫৭ : ১১, তরজমা– কান্‌যুল ঈমান)

স্মর্তব্য যে, যাকাত, ফিত্‌রা ইত্যাদি সমস্ত ফরয ও নফল দানসমূহ এ দানের অন্তর্ভুক্ত।

৮. 'সবর' শব্দের শাব্দিক অর্থ– বাধা দেওয়া (বিরত রাখা)। অর্থাৎ নাফ্‌সকে সকল গুনাহ থেকে বিরত রাখা অথবা ইবাদতের উপর কায়েম রাখা। অথবা বিপদ-আপদে ভীত-সন্ত্রস্থ হতে না দেওয়া। ধৈর্য অন্তর কিংবা চেহারার আলো।

স্মর্তব্য যে, প্রত্যেক আলোকে 'নূর' বলা হয়; তা হাল্কা হোক কিংবা তীব্র। কিন্তু 'দ্বিয়া' (ضِيَا) বলা হয় শুধু তীব্র আলোকে। মহান রব বলেন– الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا (সূর্যকে 'দ্বিয়া' এবং চন্দ্রকে আলো....)

যেহেতু 'সবর' প্রত্যেক ইবাদতের জন্য জরুরী, সেহেতু নামাযকে 'নূর' আর 'সবর'কে 'দ্বিয়া' বলা হয়েছে। এও হতে পারে যে, 'সবর' দ্বারা রোযা বুঝানো উদ্দেশ্য। যেহেতু রোযা শুধু আল্লাহ্‌রই জন্য রাখা হয়, সেহেতু সেটাকে 'দ্বিয়া' বা 'তীব্র ঔজ্জ্বল্য' বলা হয়েছে।

৯. এ ভাবে যে, যদি তুমি সেটা অনুসারে আমল করে থাকো, তবে সেটা ক্বিয়ামতে তোমার জন্য সাক্ষী এবং তোমার ঈমানের পক্ষে প্রমাণ হবে। আর যদি সেটার বিপরীত আমল করো তাহলে সেটা তোমার বিপক্ষে সাক্ষী হবে।

১০. অর্থাৎ প্রত্যহ্ ভোরে প্রত্যেকে স্বীয় জীবনের দোকান খুলে; শ্বাস-প্রশ্বাসগুলো ব্যয় করে আমলসমূহ উপার্জন করে। যদি ভাল আমলের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যয় হয়, তবে ব্যবসায় লাভ হলো, আত্মা জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেলো। আর যদি মন্দ কাজ করে, তবে ব্যবসা লোকসানেরই হলো, আত্মাকে ধ্বংস করে ফেললো। 'নাফস' মানে সত্তা, অন্তর ও প্রশ্বাসসমূহ-সবক'টিই হতে পারে। সুব্‌হা-নাল্লাহ্। আল্লাহ্‌র ওই সর্বাধিক মহান ভাষা বিশারদ (রসূল)'র প্রতি উৎসর্গিত হই! কতোই ব্যাপকার্থক শব্দাবলী এরশাদ করেছেন!

স্মর্তব্য যে, আমাদের মতো গুনাহ্‌গারদের জীবনের দোকান ভোরে খুলে নিদ্রা যাওয়ার সময় বন্ধ হয়ে যায়। তখন কতেক সৌভাগ্যবান লোকও রয়েছেন, যাঁদের দোকান কখনো বন্ধই হয় না। তাঁদের বাজার কখনো জনশূন্যই হয় না, নিদ্রাকালেও তাঁরা দোকানদারী করে থাকেন। কেননা, তাঁদের অন্তর সদা জাগ্রত; বরং ওফাতের পরও তাঁদের মেলা (বাজার) চলতে থাকে।

১১. অর্থাৎ এ বর্ধিত বচনগুলো ওইগুলোর মধ্যে কোন কিতাবেই

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجٰتِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ ثَلٰثًا.

২৬৩।। হযরত আবূ হোরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে ওই জিনিস বলে দেবো না, যা দ্বারা আল্লাহ্ গুনাহসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন?[১২] লোকেরা আরয করলেন, "হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল![১৩] (অবশ্যই বলুন!)" এরশাদ করলেন, "কষ্টকর সময় ও অবস্থাদিতে[১৪] পূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক কদম রাখা[১৫] এবং নামাযের পর নামাযের জন্য প্রতীক্ষায় থাকা।[১৬] আর এটা হচ্ছে– সীমান্তের প্রতিরক্ষা।[১৭] মালিক ইবনে আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, 'এটা সীমান্তের প্রতিরক্ষা', 'এটা সীমান্তের প্রতিরক্ষা'– দু'বার। এ হাদীস ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীর বর্ণনায় তিনবার রয়েছে।

পাওয়া যায় নি। সুতরাং মাসাবীহ্-তেও না থাকা উচিত ছিলো। কেননা, প্রথম পরিচ্ছেদে 'সহীহাঈন' (বোখারী ও মুসলিম)-এর বর্ণনাদি উল্লেখ করা হয়।

১২. 'গুনাহ্‌সমূহ' দ্বারা 'গুনাহ্-ই সগীরাহ্' (ছোট গুনাহ) বুঝানো হয়েছে; 'গুনাহ-ই কবীরাহ্' (বড় গুনাহ) ও বান্দার হক্ব বুঝানো হয়নি। 'নিশ্চিহ্ন করা' মানে হয়তো ক্ষমা করে দেওয়া, নতুবা আমলনামা থেকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যেন সেটার চিহ্নও অবশিষ্ট না থাকে। 'মর্যাদাসমূহ' দ্বারা জান্নাতের উন্নত মর্যাদাদি অথবা দুনিয়ায় ঈমানের উন্নত স্তরসমূহ বুঝানো হয়েছে।

১৩. এ প্রশ্নোত্তর এজন্য যে, এতে সামনে বর্ণিত বাণী মনযোগ সহকারে শোনা হবে। অন্যথায়, হুযূরের দ্বীন প্রচার তাদের আমল করার উপর নির্ভরশীল নয়।

১৪. 'পূর্ণভাবে করা' মানে ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পরিপূর্ণভাবে ধৌত করা, তিনবার ধোয়া এবং ওযূর সুন্নাতসমূহ পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করা। আর 'কষ্টকর অবস্থাদি' মানে শীতকাল কিংবা অসুস্থাবস্থায় অথবা পানির সংকটের সময়। অর্থাৎ যখন ওযূ পরিপূর্ণ করা কষ্টসাধ্য হয়, তখন পূর্ণরূপে করা।

১৫. হয়তো এজন্য যে, মসজিদ থেকে ঘর দূরে অবস্থিত, নতুবা কাছাকাছি ঘন ঘন কদম ফেলা। মোট কথা, প্রতিটি ওয়াক্বতের নামায মসজিদে সম্পন্ন করা; নামায ছাড়া ওয়ায ইত্যাদির জন্যও মসজিদে উপস্থিত হওয়া সাওয়াবের কারণ। এর এ অর্থ নয় যে, বিনা কারণে নিকটবর্তী মসজিদ ছেড়ে দূরে গিয়ে নামায পড়বে।

১৬. অর্থাৎ এক ওয়াক্বতের নামায পড়ে পরবর্তী ওয়াক্বতের নামাযের অপেক্ষায় থাকা হয়তো মসজিদে বসে অথবা এভাবে যে, শরীর থাকবে ঘরে বা দোকানে আর কান থাকবে আযানের দিকে এবং অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকবে।

১৭. 'রিবাত্ব' (رباط) শব্দের আভিধানিক অর্থ– ঘোড়া পালন করা। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা। অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে অবস্থান গ্রহণ করে কাফিরদের মোকাবেলায় অবিচল থাকার নাম 'রিবাত্ব'। 'রিবাত্ব' বড় ইবাদত। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا (অর্থাৎ ধৈর্যে শত্রুদের চেয়ে এগিয়ে থাকো আর সীমান্তে ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ করো। ৩ : ২০০, তরজমা– কান্‌যুল ঈমান) আলোচ্য হাদীসের মর্মার্থ হলো এ যে, শত্রুর মোকাবেলায় মোর্চাগুলো রক্ষা করা হলো 'প্রকাশ্য রিবাত্ব'। আর উপরোল্লিখিত আমলসমূহ হলো অপ্রকাশ্য রিবাত্ব'। অর্থাৎ নাফ্‌স-ই শয়তানের মোকাবেলায় ঈমানের সীমান্ত সংরক্ষণ করা।

وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَ مِنْ وَّجْهِهٖ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ

২৬৪।। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ তা'আলা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ওযূ করে, তবে উত্তমরূপে ওযূ করে, তার গুনাহ্সমূহ শরীর হতে বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নিচে থেকেও বের হয়ে যায়।[১৮] [বোখারী, মুসলিম]

২৬৫।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন মুসলমান বান্দা কিংবা মু'মিন বান্দা ওযূ করতে আরম্ভ করে, অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তার মুখমণ্ডল হতে পানি বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক ওই গুনাহ্ বের হয়ে যায়, যেদিকে সে চক্ষুযুগল দ্বারা দেখেছে।[১৯] অতঃপর যখন আপন হাত ধৌত করে তখন দু'হাত হতে ওই প্রতিটি গুনাহ্ বের হয়ে যায়, যা তার দু'হাতে ধরেছিলো, পানি কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে।[২০] তারপর যখন স্বীয় দু'পা ধৌত করে তখন ওই প্রতিটি গুনাহ্ বের হয়ে যায়,

১৮. এখানে 'উত্তমরূপে ওযূ করা' মানে সুন্নাতসমূহ ও মুস্তাহাবসমূহ সহকারে ওযূ করা। আর গুনাহ্সমূহ দ্বারা 'গুনাহ্-ই সগীরাহ্' (ছোট গুনাহ) বুঝানো হয়েছে। কেননা, গুনাহ্-ই কবীরাহ্ (বড় গুনাহ্) তাওবা ছাড়া এবং বান্দাদের হক্বসমূহ হক্ব প্রাপকের ক্ষমা করা ছাড়া ক্ষমা হয় না।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করবে, তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ ওই (ওযূর) পানির সাথে বের হয়ে যায়।

সূক্ষ্ম কথা

আমরা গুনাহ্গারদের ওযূর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়া পানি 'ব্যবহৃত পানি' হিসেবে বিবেচ্য; যা দিয়ে দ্বিতীয়বার ওযূ করা যায় না এবং তা পান করাও মাকরূহ। কেননা, তা আমাদের গুনাহ্ নিয়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওযূর ব্যবহৃত পানি; বরং কদম শরীফ ধোয়া পানিও বরকতময়। কেননা, ওই পূতঃপবিত্র অঙ্গ থেকে তা নূর নিয়ে বের হয়। আমাদের শরীর বিধৌত পানি অনেক রোগ-ব্যাধি, বিশেষতঃ মৃগী রোগ সৃষ্টি করে; কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র শরীর বিধৌত পানি রোগ-ব্যাধি দূর করে। মহান রব এরশাদ করেন-

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ

(আমি বললাম) তোমার পা দ্বারা ভূমিকে আঘাত করো, এটা হচ্ছে সুশীতল প্রস্রবণ গোসল ও পান করার জন্য; ৩৮ : ৪২)

যমযমের পানিও যেনো হযরত ইসমাইল আলায়হিস্ সালাম-এর পা মোবারক বিধৌত পানি, যাতে আমাদের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কুল্লি মোবারক পড়েছে, যা আমরা সকলের জন্য শেফা বা প্রতিষেধক।

১৯. যদিও মানুষ কান, নাক ও মুখ ইত্যাদি অঙ্গ দ্বারা গুনাহ্ করে থাকে, কিন্তু বেশী গুনাহ্ চোখ দ্বারা সংঘটিত হয়। যেমন পর-নারী কিংবা অন্যের সম্পদ অবৈধ দৃষ্টিতে দেখা। এ কারণে

خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَآءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَآءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنِ امْرِءٍ مُّسْلِمٍ تَحْضُرُهٗ صَلٰوةٌ مَّكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْئَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا اِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِّمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَالَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً وَّ ذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهٗ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْهُ اَنَّهٗ تَوَضَّاَ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ

যে দিকে তার দু'পা অগ্রসর হয়েছে, পানি কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে। শেষ পর্যন্ত সে সমস্ত গুনাহ্ হতে পাক-পবিত্র হয়ে বের হয়ে যায়।[২১] [মুসলিম]

২৬৬।। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এমন কোন মুসলমান নেই, যার নিকট ফরয নামায আসে,[২২] তখন তার ওযূ ও (হৃদয়ের) বিনয় এবং রুকূ' উত্তমরূপে সম্পন্ন করে,[২৩] কিন্তু এটা তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায় যতক্ষণ না সে কবীরা গুনাহ্ করে।[২৪] আর এটা সর্বদাই হতে থাকে।[২৫] [মুসলিম]

২৬৭।। তাঁরই হতে বর্ণিত, (একবার) তিনি ওযূ করলেন, এতে তিনি তিনবার দু'হাতের উপর পানি প্রবাহিত করলেন, তারপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি নিলেন।[২৬] অতঃপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন।

এখানে শুধু চোখের কথা এরশাদ করেছেন। ইন্শা-আল্লাহ্! অন্যথায় চেহারার প্রতিটি অংশের গুনাহ্ মুখ ধৌত করতেই ক্ষমা হয়ে যায়।

২০. যেমন- মুহরিম নয় এমন মহিলাকে স্পর্শ করা অথবা অপরের ধন-সম্পদ অনুমতি ব্যতীত স্পর্শ করা-এ সব হলো ছোট গুনাহ্।

২১. 'পা অগ্রসর হওয়া বা চলা' মানে অবৈধ স্থানে যাওয়া। স্মর্তব্য যে, এখানে শুধু ওইসব অঙ্গের গুনাহ্র কথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং সমস্ত গুনাহ্ উদ্দেশ্য। এমনকি, হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুনাহ্ও। এসব অঙ্গের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, বেশীর ভাগ গুনাহ্ এ সব অঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং এ হাদীস পূর্ববর্তী হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র বর্ণিত হাদীসের বিপরীত নয়। আর এ-ও হতে পারে যে, প্রথম হাদীসে পরিপূর্ণ ওযূর কথা উল্লেখ করা হয়েছিলো, যাতে সমস্ত সুন্নাত ও মুস্তাহাব সম্পন্ন করা হয়। আর সেটা সমস্ত গুনাহ্র ক্ষমার মাধ্যম। আর এ হাদীসে ওই ওযূর কথা বুঝানো উদ্দেশ্য, যা ততোটুকু পরিপূর্ণ হয় না। এতে শুধু ওইসব অঙ্গের গুনাহ্ই ক্ষমা হবে। সুতরাং উভয় হাদীসই সঠিক।

২২. অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ও জুমু'আহ্। স্মর্তব্য যে, ফরযের উল্লেখ করে অন্যগুলোকে বাদ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। কেননা, তাহাজ্জুদ, ইশরাক্ব ও দু'ঈদের নামাযের ওযূর অবস্থাও অনুরূপ। যেহেতু অধিকাংশ ওযূ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যই হয়ে থাকে, সেহেতু সেটার উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া যদি কেউ ওয়াক্তের পূর্বে ওযূ করে, তবুও এ-ই সাওয়াব হবে।

২৩. নামাযের খুশূ' (অন্তরের নম্রতা বা বিনয়) হলো সেটার প্রতিটি রুক্ন সঠিকভাবে পালন করবে, অন্তরে কাকুতি-মিনতি ও খোদাভীতি থাকবে। দৃষ্টি সেটার যথাযথ স্থানে রাখবে। অর্থাৎ 'ক্বিয়াম' অবস্থায় সাজদার স্থানে, রুকূ' অবস্থায় পায়ের পৃষ্ঠের উপর, সাজদায় নাকের অগ্রভাগে আর ক্বা'দায় (বৈঠক) কোলের উপর (দৃষ্টি রাখবে)। খুশূ' হচ্ছে নামাযের রূহ বা প্রাণ। মহান রব এরশাদ করেন- اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে বিনীত-নম্র হয়। ২৩ : ২, তরজমা- কান্যুল ঈমান) (আলোচ্য হাদীসে) শুধু রুকূ'র কথা এজন্য উল্লেখ করেছেন যে, এটা সাজদার অগ্রদূত বিশেষ আর সাজদার মোকাবেলায় এতে কষ্ট বেশী। তদুপরি, রুকূ' মুসলমানের নামাযের বৈশিষ্ট্য। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের নামাযে এটা ছিলো না। এটা পাওয়া গেলে রাক'আত পাওয়া যায়। তদুপরি, রুকূ' স্বতন্ত্র ইবাদত নয়, শুধু নামাযের মধ্যে ইবাদত। আর

ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهٗ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلٰثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهٖ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهٗ الْيُمْنٰى ثَلٰثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهٗ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهٗ لِلْبُخَارِىْ-

তারপর কুনুই পর্যন্ত ডান হাত ধুলেন তিনবার। অতঃপর বাম হাত কুনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। তারপর মাথা মসেহ করলেন।[২৭] অতঃপর ডান পা, পরে বাম পা তিন তিন বার ধুলেন। তারপর বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি আমার এ ওযূর মতো ওযূ করেছেন।[২৮] অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার মতো ওযূ করবে তারপর দু'রাক'আত নফল নামায পড়ে নেবে, যাতে আপন অন্তরে কোন কথা বলবে না, তবে তার বিগত সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[২৯] (বোখারী, মুসলিম) আর এ হাদীসের বচনগুলো ইমাম বোখারীর।

সাজদাহ্ নামাযের বাইরেও ইবাদত। যেমন, 'সাজদা-ই শোকর' (কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সাজদাহ্) ও 'সাজদাহ্-ই তিলাওয়াত' ইত্যাদি।

২৪. অর্থাৎ এতে কাবীরাহ্ গুনাহ্র (বড় গুনাহ্) ক্ষমা হয় না। শুধু সগীরাহ্ গুনাহ্ (ছোট গুনাহ্)'রই ক্ষমা হয়। সুতরাং এ হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা। অবশ্য এর এ অর্থ নয় যে, কাবীরাহ্ গুনাহ্কারীর সগীরাহ্ গুনাহ্ও ক্ষমা হয় না। [লুম'আত]

২৫. অর্থাৎ এ সাওয়াব কোন নির্দিষ্ট নামাযের নয়; বরং জীবনের প্রতিটি নামাযেরই।

২৬. এভাবে যে, প্রথমে তিনবার কুল্লি করলেন, তারপর তিনবার নাকের ভেতর পানি নিয়ে নাক পরিষ্কার করবেন, যেমন অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার তারতীবে রয়েছে। সুতরাং এ হাদীস হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের পক্ষে দলীল। শাফে'ঈগণ এক অঞ্জলি পানির অর্ধেক দিয়ে কুল্লি করেন আর বাকী অর্ধেক পানি নাকে নিয়ে থাকেন। অর্থাৎ তাদের মতে, সংখ্যার একক সংখ্যার এককের পেছনে, আর আমাদের মাযহাবানুসারে, 'জাতি' 'জাতি'র অনুসারী। (অর্থাৎ আলোচ্য হাদীসের বচনে যেহেতু কুল্লি ও নাকে পানি নেওয়ার তিন বারের কথা উল্লেখ নেই, আর উভয়টি একই সাথে ثُمَّ (অতঃপর) অব্যয় দ্বারা সমন্বিত হয়েছে, তাই এক অঞ্জলী দিয়ে কুল্লি ও নাকে পানি নেওয়া সম্পন্ন করার কথা বলেছেন; কিন্তু আমাদের মাহযাবানুসারে, কুল্লি ও নাকে পানি দেওয়াকে একেকটি 'প্রকার' (نوع) গণ্য করে পূর্ববর্তী তিন বারের সাথে সমন্বিত করে তিন তিনবারের কথা বলা হয়েছে।)

২৭. এ থেকে দু'টি মাস্'আলা প্রতীয়মান হয়। যথা ঃ

এক. হাত কুনুইসহ ধৌত করতে হবে।

দুই. মাথা মসেহ শুধু একবার করবে। কেননা, ধোয়ার ব্যাপারে তিনবারের উল্লেখ আছে; মসেহ-এর ব্যাপারে নেই। তদুপরি, যদি মসেহ তিনবার করা হয়, তবে তা ধোয়াই হয়ে যাবে। এটাই ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র অভিমত। শাফে'ঈদের মতে মসেহও তিনবার করতে হবে। এ হাদীস তাদের মতের বিপরীত।

২৮. যেহেতু হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র ওযূ ওই সব লোকের সামনেই ছিলো, আর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওযূ ওইসব লোকের কাছ থেকে গোপন ছিলো, সেহেতু তিনি এভাবে বলেছেন; নতুবা বাস্তবতা হচ্ছে– হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র ওযূ হুযূরের ওযূর মতো ছিলো; হুযূরের ওযূ তাঁর মতো ছিলো না।

২৯. অর্থাৎ ওযূর পর দু'রাক'আত 'তাহিয়্যাতুল ওযূ'র নামায পড়বে; যখন নফল নামায পড়া মাকরূহ নয়। আর যদি নফল নামায পড়া মাকরূহ হয়, যেমন ফজর ও মাগরিবের ওযূ, তবে ওযূর পর ফরয নামাযের মধ্যে তাহিয়্যাতুল ওযূ ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এরও সাওয়াবও মিলে যাবে। [মিরক্বাত]

لَا يُحَدِّثُ বলে এ কথা বলা হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদিকে মনযোগ ফেরাবে না; অনিচ্ছাকৃতভাবে মনযোগ স্থির

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْئَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهٖ وَوَجْهِهٖ اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ

২৬৮।। হযরত ওক্ববাহ ইবনে আমির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[৩০] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে কোন মুসলমানই ওযূ করে, তবে স্বীয় ওযূ উত্তমরূপে করে, অতঃপর দাঁড়িয়ে অন্তর ও মুখ দ্বারা পূর্ণ মনোনিবেশ করে দু'রাকআত নফল নামায পড়ে,[৩১] তার জন্য জান্নাত অবশ্যই ওয়াজিব হয়ে যায়।[৩২] [মুসলিম]

২৬৯।। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ ওযূ করবে[৩৩] এবং ওযূতে অতিশয়তা করবে কিংবা পরিপূর্ণভাবে করবে, অতঃপর বলবে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই এবং নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ তাঁর প্রিয় বান্দা ও রসূল।" অপর এক বর্ণনায় এভাবে আছে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ মোস্তফা তাঁর প্রিয় বান্দা ও রসূল"[৩৪] তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া

না থাকলে তা ক্ষমাযোগ্য। যেমনটি লুম'আত ও মিরক্বাত-এ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে শর্ত হলো, যদি তা দূরীভূত করার চেষ্টা করা হয়। 'গুনাহ্' মানে 'গুনাহ্-ই সগীরাহ্' আর বে-গুনাহ্ লোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কেননা, যে কাজ গুনাহ্গারদের জন্য ক্ষমার মাধ্যম হয়, তা নেক্কারদের জন্য উন্নতির কারণ হয়।

৩০. তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি হযরত আমীর মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র পক্ষ হতে শাসক। তাঁর আপন ভাই ওত্বাহ ইবনে আবূ সুফিয়ানের পর মিশরের শাসক ছিলেন। যদিও তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু মিসরেই তিনি অবস্থান করেন। ৫৮ হিজরীতে সেখানে ওফাত পান।

৩১. অর্থাৎ জাহির ও বাতিন একাগ্র হয়ে, এমনভাবে যে, না শরীর নিয়ে খেলা করবে, না এদিক-সেদিক দেখবে, না অন্তরকে অন্যদিকে ফেরাবে।

৩২. মহান রবের দয়া ও অনুগ্রহক্রমে, এভাবে যে, দুনিয়াতে তার নেক আমল করার সামর্থ্য হয়ে যায়। মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকে এবং কবর ও হাশরে সহজভাবে উত্তীর্ণ হয়। হাদীসের অর্থ এ নয় যে, শুধু ওযূ করে তাহিয়্যাতুল ওযূর দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নিলে জান্নাতী হয়ে যাবে, অন্য কোন আমলের প্রয়োজন হবে না। এ ধরণের হাদীসের এ অর্থই হয়ে থাকে।

৩৩. 'অতিশয়তা' (مبالغہ) মানে সেটার সৌন্দর্যাবলীকে চূড়ান্ত সীমানায় পৌছিয়ে দেওয়া আর 'পরিপূর্ণভাবে করা' মানে ওযূর পূর্ণ অঙ্গ ধৌত করা, যাতে চুল পরিমাণ জায়গাও শুষ্ক না থাকে। مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্যে) এরশাদ করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমস্ত পুণ্যকর্ম মুসলমানদের জন্য উপকারী; কিন্তু পথভ্রষ্ট, গোমরাহ্, বদ-মাযহাবীদের জন্য নয়। ঔষধ জীবিতদেরকে উপকার দেয়, মৃতদেরকে নয়।

لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَآءَ . هٰكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِىْ صَحِيْحِهٖ وَالْحُمَيْدِىُّ فِىْ اِفْرَادِ مُسْلِمٍ وَكَذَا ابْنُ الْاَثِيْرِ فِىْ جَامِعِ الْاُصُوْلِ وَ ذَكَرَ الشَّيْخُ مُحِىُّ الدِّيْنِ النَّوَوِىُّ فِىْ اٰخِرِ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ عَلٰى مَا رَوَيْنَاهُ وَزَادَ التِّرْمِذِىُّ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَالْحَدِيْثُ الَّذِىْ رَوَاهُ مُحِىُّ السُّنَّةِ فِى الصِّحَاحِ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ اِلٰى اٰخِرِهٖ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ فِىْ جَامِعِهٖ بِعَيْنِهٖ اِلَّا كَلِمَةَ اَشْهَدُ قَبْلَ اَنَّ مُحَمَّدًا.

হবে, যা দিয়ে তার ইচ্ছা হয় প্রবেশ করবে।[৩৫] ইমাম মুসলিম এভাবেই তাঁর সহীহ গ্রন্থে এবং হুমায়দী 'ইফরাদ-ই মুসলিম' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, অনুরূপ, ইবনে আসীর 'জামি'উল উসূল'-এ এবং শায়খ মুহি উদ্দীন নাওয়াভী[৩৬] মুসলিমের হাদীসের শেষ ভাগে আমাদের বর্ণনার মতো বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী এ বর্ণনার সাথে আরো বৃদ্ধি করেছেন, 'হে আল্লাহ্! আমাকে অতিমাত্রায় তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো এবং আমাকে অত্যন্ত পবিত্রতা অর্জনকারীদের দলভুক্ত করো।'[৩৭]

আর ইমাম মুহীউস্ সুন্নাহ যে হাদীস সিহাহ্র মধ্যে বর্ণনা করেছেন, 'যে ব্যক্তি ওযূ করলো এবং উত্তরূপে ওযূ করলো....' সেটা ইমাম তিরমিযী স্বীয় জামি' গ্রন্থে ওইভাবে বর্ণনা করেছেন, (اَشْهَدُ) শব্দের পূর্বে[৩৮] اَنَّ مُحَمَّدًا শব্দটি বর্ণনা করা ব্যতীত।

৩৪. অর্থাৎ প্রত্যেক ওযূর পর 'দ্বিতীয় কলেমা' পড়ে নেবে। কোন কোন হাদীসে আছে যে, اِنَّا اَنْزَلْنَا (সূরা ক্বদর) পড়বে। কতেক বর্ণনায় এ-ও আছে, এ দো'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ (আল্লাহুম্মাজ্'আলনী মিনাত্ তাওয়াবী-ন।)

তবে উত্তম হলো, এ সবই পড়বে। তাহলে ইন্শা আল্লাহ্ এ সব দো'আর বরকতে শারীরিক পবিত্রতার সাথে সাথে আত্মিক (রূহানী) পবিত্রতাও ভাগ্যে জুটবে। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, গোসল করার পরও এ সব দো'আ এবং ইস্তিগফার পড়া মুস্তাহাব।

৩৫. অর্থাৎ এ আমলের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তার হাশর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র গোলামদের সাথে করবেন। অর্থাৎ সে তাঁর সাথে জান্নাতে যাবে। আর যেভাবে তাঁকে প্রত্যেক দরজায় আহ্বান করা হবে– 'এ দরজা দিয়ে আসুন', সেভাবে তাঁর ওসীলায় তাকেও ডাকা হবে। সুতরাং হাদীসের বিপক্ষে এ আপত্তি আসে না যে, আটটি দরজা উন্মুক্ত হওয়া হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবরের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যেমন সামনে তাঁর গুণাবলীর বর্ণনায় (হাদীসসমূহে) আসবে। কেননা, তার এ প্রবেশ তাঁরই ওসীলায় হবে।

স্মর্তব্য যে, যদিও প্রত্যেক জান্নাতবাসী একটি দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে; কিন্তু প্রত্যেক দরজায় আহুত হওয়া তাঁর সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের নিমিত্তে হবে।

৩৬. ইমাম মুহি উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া নাওয়াভী হলেন মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার। 'নাওয়া' দামেস্কের অদূরে একটি গ্রামের নাম। তাঁকে সেটার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। কারণ, তিনি ওই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

৩৭. স্মর্তব্য যে, تَوَّابٌ (তাওয়াব) হচ্ছেন তিনিই, যিনি সর্বদা সর্বাবস্থায় তাওবা করেন। গুনাহ্ করেও, গুনাহ্ না করেও। কখনো মহান রবের দরজা থেকে সরে দাঁড়ান না, নিরাশও হন না। আর تائب হলো ওই ব্যক্তি, যে এক/ আধবার তাওবা করে। তেমনিভাবে, مُتَطَهِّر (মুতাত্বো-য়াহ্হির) হলেন ওই ব্যক্তি, যিনি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন উভয়-অপবিত্রতা থেকে নিজেকে নিজে পবিত্র করেন। আর طَاهِر (ত্বাহির) হচ্ছে সেই, যে শুধু জাহেরী বা বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হয়। মহান আল্লাহ্র দরবারে 'তাওয়াব' ও 'মুতাত্বোয়াহ্হির'-এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন– اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ [নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন (সর্বদা সর্বাবস্থায়) তাওবাকারীকে। ২ : ২২২] আরো এরশাদ ফরমান– وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ [এবং তিনি পছন্দ করেন (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়) পবিত্রতা অবলম্বনকারীকে। ২ : ২২২]

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَه فَلْيَفْعَلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭০।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে 'পাঁচ অঙ্গে সাদা চিহ্ন বিশিষ্ট' বলে ডাকা হবে– তাদের ওযূর চিহ্নের দরুন।[৩৯] সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি আপন উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করতে পারে করুক।[৪০] [বোখারী, মুসলিম]

২৭১।। তাঁরই (হযরত আবূ হোরায়রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মু'মিনের অলঙ্কার ততটুকু পর্যন্ত পৌঁছবে, যতটুকু পর্যন্ত ওযূর পানি পৌঁছবে।[৪১] [মুসলিম]

---

৩৮. এটা 'মাসাবীহ' প্রণেতার প্রতি এ প্রশ্ন উত্থাপন করা যে, তিনি প্রথম পরিচ্ছেদে ওই হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা বোখারী ও মুসলিম শরীফে নেই; শুধু তিরমিযী শরীফে রয়েছে।

৩৯. 'পাঁচ অঙ্গে সাদা চিহ্ন বিশিষ্ট' হচ্ছে ওই লাল বা কালো ঘোড়া, যার চার হাত-পা ও কপাল সাদা হয়। এটা অত্যন্ত মূল্যবান, সুশ্রী এবং শক্তিশালী হয়ে থাকে।

এখানে 'উম্মত' দ্বারা সমস্ত নামাযী মুসলমান বুঝানো উদ্দেশ্য। কারণ, ক্বিয়ামতে তাদের চেহারা ও হাত-পাগুলো ওযূর চিহ্নের দরুন সমুজ্জ্বল হবে। স্মর্তব্য যে, যদিও পূর্বেকার উম্মতগণও ওযূ করেছে, কিন্তু এ নূর শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর উপরই হবে। তেমনিভাবে, যেসব সাহাবী নামায ফরয হওয়ার পূর্বে ওফাত প্রাপ্ত হয়েছেন অথবা মুসলমানদের ছোট শিশুরা, অথবা ইসলাম কবূল করতেই ওফাতপ্রাপ্ত লোক, যারা নামায ও ওযূ করার সময়ই পায় নি, তাঁদের উপরও ইনশা-আল্লাহ্ ওযূর এ চিহ্ন হবে। কেননা, তারা নামাযীদের দলভুক্ত। হ্যাঁ, বে-নামাযী ফাসিক্বগণ, যারা শরীয়তসম্মত কোন কারণ ছাড়া নামায না পড়ার অভ্যাস করে নিয়েছে, তারা শাস্তিস্বরূপ তা হতে বঞ্চিত হবে। স্মর্তব্য যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আপন উম্মতকে চেনা ওই নূরের উপর নির্ভরশীল হবে না। কেননা, তিনি নেক্কার আলোকিতদেরকেও চিনবেন এবং গুনাহ্গার অন্ধকারাচ্ছন্নদেরকেও (চিনবেন)।

৪০. খুব সম্ভব এ শেষ বাক্য হযরত সাইয়্যেদুনা আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র। অর্থ এ যে, ওযূর অঙ্গগুলো ফরয সীমানারও বেশী ধৌত করবে, যাতে ঔজ্জ্বল্য ও চমক দীর্ঘ হয়। এটা সম্ভব যে, সেটা (শেষ বাক্য) হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ। তখন অর্থ হবে যে, ওযূর অঙ্গসমূহ সীমার চেয়ে কম ধৌত করবে না। অতিরিক্ত কিছু ধৌত হয়ে গেলেও কোন অসুবিধা নেই।

স্মর্তব্য যে, (غرة) (গুররাহ্) চেহারার শুভ্রতাকে বলা হয় আর (تَحْجِيْل) (তাহজীল) বলা হয়– হাত ও পায়ের শুভ্রতাকে। যেহেতু অধিকাংশ লোক চেহারা ধৌত করার ক্ষেত্রে অসাবধানতা অবলম্বন করে থাকে, ফলে কানপাট্টি ইত্যাদি শুষ্ক থেকে যায়, সেহেতু সেটার উল্লেখ বিশেষভাবে করেছেন।

৪১. حليه শব্দে ح (হা) যের সহকারে। এর অর্থ উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য আর ح (হা) যবর সহকারে হলে অর্থ হবে 'অলঙ্কার'।

হাদীস শরীফে উভয়টি দ্বারা পঠিত হয়েছে। এখানে ওযূ (وضو) শব্দের (واو) পেশ সহকারে। এটা ওই প্রসিদ্ধ ওযূকে বলা হয়। আর (واو) তে যবর হলে অর্থ হবে ওযূর পানি। এখানে (واو) যবর সহকারে। অর্থাৎ যতটুকু পর্যন্ত ওযূর পানি পৌঁছবে, যতটুকু পর্যন্ত নূর, সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য হবে অথবা

اَلْفَصْلُ الثَّانِى ◆ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلٰوةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلَّا مُؤْمِنٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهْرٍ كُتِبَ لَهٗ عَشْرُ حَسَنٰتٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ২৭২।। হযরত সাওবান[৪২] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা সরল সোজা থাকো; কিন্তু তোমরা এটা করতে পারবে না।[৪৩] এবং জেনে রাখো যে, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হচ্ছে নামায।[৪৪] আর ওযূর হিফাযত মু'মিনই করে থাকে।[৪৫] [মালিক, আহমদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

২৭৩।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্রতার উপর ওযূ করে, তার জন্য দশটি নেকী (পুণ্য) লেখা হয়।[৪৬] [তিরমিযী]

ততটুকু পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হবে। দুনিয়ায় মুসলিম পুরুষের জন্য অলংকার পরিধান করা হারাম, যাতে সে জিহাদের বীরত্ব হারিয়ে না বসে। জান্নাতে অলঙ্কার সেখানকার নি'মাতগুলোর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪২. তাঁর নাম সাওবান ইবনে বুজদাদ, উপনাম 'আবূ আব্দুল্লাহ্'। তিনি হুযূরের আযাদকৃত ক্রীতদাস। নিজ বাসস্থানে ও সফরকালে সর্বদা হুযূরের সাথে থাকতেন। হুযূরের পর প্রথমে সিরিয়ায়, তারপর 'হামাস'-এ স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ৫৪ হিজরীতে ওফাত পান।

৪৩. অর্থাৎ আক্বীদা, ইবাদত ও লেনদেন ইত্যাদিতে ঠিক থাকো। পথভ্রষ্ট হয়ে এদিক-সেদিক যেও না। কিন্তু পুরোপুরি সঠিক ও সোজা থাকা মানুষের সাধ্যের বাইরে। তাই যথাসাধ্য সোজা ও সঠিক থাকো। আর ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা চাইতে থকো।

অথবা এ অর্থ যে, অবিচলভাবে সরল-সঠিক থাকার সাওয়াব তোমরা গণনা করতে পারবে না। اِحْصَاء শব্দের অর্থ হচ্ছে কঙ্কর দিয়ে গণনা করা। বস্তুতঃ সামান্য জিনিস আঙ্গুল দ্বারা আর বেশী জিনিস কঙ্কর দ্বারা গণনা করা হয়। আর যা কঙ্কর দিয়েও গণনা করা যায় না, তা 'গণনার বাইরে' বলে থাকে।

৪৪. কেননা, ইসলামে সর্বপ্রথম নামাযই ফরয হয়েছে। সমস্ত আমল পৃথিবী-পৃষ্ঠে এসেছে, কিন্তু নামায আরশের উপর ডেকে নিয়ে দান করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নামায সঠিক ও শুদ্ধ করে নিয়েছে, ইন্‌শা-আল্লাহ্ তার সমস্ত আমল সঠিক ও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া, নামায অনেক ইবাদতের সমষ্টি এবং অনেক পাপাচার থেকে রক্ষাকারী। কারণ, নামায সম্পন্ন করার সময় মিথ্যা ও গীবত ইত্যাদি কিছুই সংঘটিত হতে পারে না।

৪৫. অর্থাৎ সর্বদা ওযূ সহকারে থাকা অথবা সর্বদা শুদ্ধভাবে ওযূ করা পরিপূর্ণ (কামিল) মু'মিনের পরিচয়।

৪৬. অর্থাৎ যার পূর্ববর্তী নামাযের ওযূ আছে, তারপরও পরবর্তী নামাযের জন্য ওযূ করে তাহলে তার এ ওযূ বেকার ও অনর্থক নয়; বরং এতে অনেক সাওয়াব রয়েছে।

স্মর্তব্য যে, ওযূর উপর ওযূ করা মুস্তাহাব তখনি, যখন ওযূর পর নামায কিংবা এমন কোন ইবাদত করে নেয়, যা ওযূর উপর নির্ভরশীল। নতুবা বার বার ওযূ করা মাকরূহ এবং পানির অপচয় মাত্র। সুতরাং হাদীসের বিপক্ষে কোন আপত্তি নেই। আর ফিক্বহ্র মাসআলাও এ হাদীসের বিপরীত নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صلى الله عليه وسلم مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ. رَوَاهُ اَحْمَدُ

وَعَنْ شَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم صَلّٰى صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ وَ اِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ اُوْلٰئِكَ. رَوَاهُ النَّسَائِىُّ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ২৭৪।। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জান্নাতের চাবি হলো নামায আর নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা।[৪৭] [আহমদ]

২৭৫।। হযরত শাবীব ইবনে আবূ রাওহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[৪৮] হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কোন সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে,[৪৯] হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়লেন, 'সূরা রূম' শরীফ তিলাওয়াত করলেন। তখন তাঁর তিলাওয়াতে 'মুশা-বাহ' (অন্য আয়াতের সাথে সাদৃশ্যজনিত খট্‌কা) লেগে গেলো। যখন তিনি নামায পড়ে নিলেন, তখন এরশাদ করলেন, লোকদের এ কী অবস্থা, তারা আমাদের সাথে নামায পড়ে, অথচ ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করে না।[৫০] এ সব লোকই আমাদের ক্বোরআন পাঠে 'সাদৃশ্য জনিত খট্‌কা' লাগিয়ে দেয়।[৫১] [নাসাঈ]

৪৭. অর্থাৎ জান্নাতের স্তরগুলোর চাবি হচ্ছে– নামায। সুতরাং এ হাদীস ওই হাদীসের বিপরীত নয়, যাতে এরশাদ করা হয়েছে যে, জান্নাতের চাবি হলো কালিমা-ই তায়্যিবাহ্। এখানে (কলেমা তাইয়্যেবাহ্) হচ্ছে জান্নাতের 'মূল' চাবি (অর্থাৎ প্রবেশের অনমুতির চাবি) বুঝানো উদ্দেশ্য।

যদিও নামাযের শর্তাবলী অনেক, যেমন সময় হওয়া, ক্বিবলামুখী হওয়া ইত্যাদি, কিন্তু 'তাহারাত' বা পবিত্রতা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে সেটাকে 'নামাযের চাবি' বলে এরশাদ করা হয়েছে।

৪৮. তিনি একজন তাবে'ঈ। হামাসের অধিবাসী। তাঁর পিতার নাম না'ঈম। 'কুনিয়াত' (উপনাম) হচ্ছে 'আবূ রাওহ্'। না তিনি নিজে সাহাবী, না তাঁর পিতা।

৪৯. যেহেতু সমস্ত সাহাবী পরহেয্গার ও 'আদিল' (তাক্বওয়া ও মানবিক গুণসম্পন্ন, তাঁদের মধ্যে কেউ ফাসিক্ব নেই), সেহেতু এভাবে হাদীস বর্ণনা করা জায়েয। সাহাবী ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। অন্যথায় হাদীস 'মাজরূহ' (সমালোচিত) হবে। কারণ, ওই ব্যক্তি কি 'ফাসিক্ব', না 'আদিল' তা জানা যাবে না। খুব সম্ভব এ সাহাবী হলেন 'আগার গিফারী'। [মিরক্বাত]

৫০. অর্থাৎ ওযূ ও গোসলের সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করে না; কেননা, ওযূর মধ্যে কোন ওয়াজিব নেই।

৫১. অর্থাৎ তাদের অসতর্কতার প্রভাব আমাদের উপর এভাবে পড়ে যে, ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াতে 'লুক্বমা' লেগে যায়। 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, "এতে বুঝা গেলো যে, হুযূরের মতো মহান সত্তার নামাযে যখন (মুক্বতাদিদের) ওযূর অসম্পূর্ণতার কারণে প্রভাব পড়ে, তখন আফ্‌সোস ওইসব লোকের জন্য, যারা বদ্‌কার ও বে-দ্বীনদের সংস্পর্শে থাকে। নিঃসন্দেহে তাদের ঈমানেও এর কু-প্রভাব পড়বে। এ রোগ উড়ে গিয়ে লেগে যায়।

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ عَدَّهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِى يَدِى اَوْفِى يَدِهٖ قَالَ التَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَاُهٗ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَاُ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ وَاِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَنْفِهٖ

২৭৬।। বনী সুলায়ম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত,[৫২] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার হাতে এ জিনিসগুলো গুণিয়েছেন অথবা নিজ হাতে (গুণেছেন), এরশাদ করেছেন, 'তাসবীহ্' হলো দাঁড়ি-পাল্লা (মীযান)'র অর্ধেক। 'আল্হামদুলিল্লাহ্' সেটাকে ভর্তি করে দেবে। আর 'তাকবীর' আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ করে দেয়।[৫৩] 'রোযা হলো ধৈর্যের অর্ধেক[৫৪] এবং পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক। এ হাদীস শরীফ ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন– এ হাদীস 'হাসান' পর্যায়ের।

২৭৭।। হযরত আব্দুল্লাহ্ সুনাবিহী[৫৫] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন মু'মিন বান্দা ওযূ করতে থাকে– কুল্লি করে, তখন তার মুখ হতে গুনাহ্সমূহ বের হয়ে যায়।[৫৬] আর যখন নাকে পানি নেয়, তখন গুনাহ্সমূহ তার নাক হতে বের হয়ে যায়।

৫২. আমরা এক্ষুনি উল্লেখ করেছি যে, সমস্ত সাহাবী 'আদিল' (তাক্বওয়া ও মানবিক গুণসম্পন্ন) ও দ্বীনের উপর সর্বদা অবিচল। সুতরাং তাঁর নাম জানা না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই।

৫৩. এর ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে করা হয়েছে যে, পুণ্য কার্যাদির পাল্লা এ দু'কলেমার সাওয়াব দ্বারা ভরে যাবে। কারণ, 'তাসবীহ্'-এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা দোষ-ত্রুটিমুক্ত হওয়ার স্বীকারোক্তি রয়েছে আর 'হামদ'-এর মধ্যে তাঁর পূর্ণতাসূচক গুণাবলী প্রকাশ করা হয়েছে।

৫৪. কেননা, কণ্ঠনালী ও গুপ্তাঙ্গকে রোযা বিরত রাখে আর বাকী অঙ্গসমূহকে (বিরত রাখে) ধৈর্য। অথবা প্রকাশ্য পাপাচারগুলো থেকে রোযা বিরত রাখে আর অপ্রকাশ্য গুনাহসমূহ থেকে বাধা দেয় ধৈর্য। অথবা ঈমান ও আল্লাহ্র আনুগত্য এমন সব গুনাহ থেকেও ধৈর্যধারণ করায়, যেগুলোর কারণ হলো নাফ্সের কু-প্রবৃত্তি। আর নাফ্সের কু-প্রবৃত্তি রোযার কারণে দমিত হয়। অর্থাৎ সকল প্রকারের ধৈর্য একদিকে, আর রোযা অন্যদিকে।

৫৫. সঠিক অভিমত অনুসারে তাঁর নাম আব্দুর রহমান ইবনে 'ওসায়লাহ্'। 'কুনিয়াত' (উপনাম) আবূ আব্দুল্লাহ্। তিনি 'সানাবিহ' গোত্রের লোক, যা 'মুরাদ' গোত্রের একটি শাখা। তিনি তাবে'ঈ, সাহাবী নন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জাহেরী হায়াতে হিজরত করে মদীনা শরীফের দিকে রওনা হন। তিনি যখন জুহ্ফাহ্ নামক স্থানে পৌঁছেছিলেন, তখন (ওইদিকে) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফ সংঘটিত হয়। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। সুতরাং এ হাদীস 'মুরসাল' পর্যায়ের। কেননা, সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে।

৫৬. অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা গীবত ও মিথ্যা সদৃশ যে সব সগীরাহ্

وَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ فَاِذَا مَسَحَ بِرَاْسِهٖ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَاْسِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ اُذُنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ اَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهٗ اِلَى الْمَسْجِدِ وَ صَلٰوتُهٗ نَافِلَةً لَّهٗ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِىُّ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ

আর যখন আপন মুখ ধৌত করে, তখন তার পাপসমূহ তার চেহারা হতে বের হয়ে যায়।[৫৭] এমনকি তার চোখের পাতার নিচে থেকেও বের হয়ে যায়। আর যখন আপন হাত ধৌত করে, তখন পাপসমূহ দু'হাত হতে বের হয়ে যায়। এমনকি হাতের নখগুলোর নিচে থেকেও বের হয়ে যায়। আর যখন আপন মাথা মসেহ করে, তখন গুনাহ্সমূহ তার মাথা হতে বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু'কান হতেও বের হয়ে যায়।[৫৮] অতঃপর যখন সে পা ধৌত করে, তখন পাপসমূহ তার দু'পা হতে বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু'পায়ের নখগুলোর নিচে থেকেও বের হয়ে যায়।[৫৯] অতঃপর তার মসজিদের দিকে যাওয়া এবং নামায পড়া তার জন্য অতিরিক্ত কাজ হয়।[৬০] [মালিক, নাসাঈ]

২৭৮।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে যান। তখন বলেন, "তোমাদের উপর সালাম (শান্তি) হোক–

পর্যায়ের গুনাহ্ হয়েছিলো, তা-ই কুল্লির বরকতে ক্ষমা হয়ে যায়। 'মু'মিন'-এর শর্তারোপ এজন্য করা হয়েছে যে, কাফিরের ওযূর এ প্রভাব নেই। অবশ্য, যদি ঈমান গ্রহণের জন্য ওযূ করে, তবে হয়তো বর্ণিত উপকার তারও অর্জিত হয়ে যাবে। 'ওযূ'কে নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করা দ্বারা বুঝা গেলো যে, প্রত্যেক ওযূতে এ উপকারিতা রয়েছে, চাই নামাযের জন্য হোক কিংবা অন্য কোন ইবাদতের জন্য হোক।

৫৭. নাকের মধ্যে পানি নেওয়ার বরকতে নাক কিংবা মস্তিষ্কের গুনাহ ঝরে যায়। যেমন, অবৈধ সুগন্ধি গ্রহণ করা এবং মস্তিষ্কে অপবিত্র চিন্তা বা ধারণা পোষণ করা ইত্যাদি।

স্মর্তব্য যে, এখানেও 'গুনাহ্-ই সাগীরাহ্' বা ছোট-খাটো গুনাহ্ বুঝানো উদ্দেশ্য। আর চেহারা ধোয়াতে চোখের গুনাহ্ ঝরে যায়। যেমন– অবৈধ বস্তুসমূহ দেখা কিংবা অবৈধ ইশারা-ইঙ্গিত করা ইত্যাদি।

৫৮. এ থেকে বুঝা গেলো যে, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত, চেহারার নয়। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাথার সাথে সেটার উল্লেখ করেছেন। সুতরাং উভয় কান না চেহারার সাথে ধোয়া হবে, না আলাদা পানি দিয়ে। তা মসেহ করা হবে; বরং মাথা মসেহ-এর আর্দ্রতা দ্বারা সেটার মসেহও করা হবে। এটাই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মাযহাব (অভিমত)। এ হাদীস ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র পক্ষে দলীল।

৫৯. অর্থাৎ যে কদম অবৈধ জায়গায় যাওয়ার সময় পড়ে সেগুলোর গুনাহ্ এটার বরকতে মাফ হয়ে যায়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, উভয় পা ধৌত করা ফরয, মসেহ করা নয়। যেমন রাফেযীগণ (শিয়াগণ) মনে করেছে।

৬০. অর্থাৎ গুনাহ্সমূহের ক্ষমা তো ওযূ দ্বারাই হয়ে গেছে, এখন এ আমলগুলো গুনাহ্ ক্ষমার উপর অতিরিক্ত, যেগুলো

قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَدِدْتُّ اَنَّا قَدْ رَاَيْنَا اِخْوَانَنَا قَالُوْا اَوَلَسْنَا اِخْوَانَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَاِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاْتُوْا بَعْدُ فَقَالُوْا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَاْتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ

হে মু'মিন জনগোষ্ঠী।[৬১] ইন্শাআল্লাহ্ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো।[৬২] আমার এ আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে– আমরা যদি আমাদের ভাইদেরকে দেখতাম!''[৬৩] সাহাবীগণ আরয করলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আপনার ভাই নই?" হুযূর এরশাদ করলেন, "তোমরা হলে আমরা সহচর ও বন্ধু। আমাদের ভাই হচ্ছে তারাই, যারা এখনও (পৃথিবীতে) আসে নি।[৬৪] লোকেরা আরয করলেন, "আপনার যে সব উম্মত এখনো পর্যন্ত আসে নি, তাদেরকে হুযূর কীভাবে চিনবেন?"[৬৫] হুযূর এরশাদ করলেন,

দ্বারা মর্যাদাসমূহ বৃদ্ধি পায়। এখানে 'নফল' আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত। যেমন এরশাদ হচ্ছে–

وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً

অর্থাৎ আমি তাঁকে দান করেছি– ইসহাক্বকে আর এয়া'কুবকে (অতিরিক্ত অর্থাৎ পৌত্ররূপে)। [২১ : ৭২]

৬১. 'মাক্ববারাহ' (مقبره) বা 'কবরস্থান' মানে মদীনা-ই মুনাওয়ারার কবরস্থান জান্নাতুল বাক্বী', যেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কবরগুলোর যিয়ারতের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন। 'দার' (دار) শব্দের অর্থ 'ঘর' ও 'বাসভবন'। এখানে اهل (আহ্ল) শব্দটি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ঘরের অধিবাসীগণ। 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেন, "সাধারণ মানুষের কবরের নিকট পৌঁছে সালাম করা সুন্নাত। কেননা– মৃতরা যিয়ারতকারীদেরকে দেখে ও চিনে, তাদের কথা-বার্তা ও সালাম শুনে ও বুঝে। কেননা, শুনে না এবং জবাব দিতে পারেনা এমন কাউকে সালাম করা নিষেধ। মহান রব এরশাদ করেন–

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا الاٰية

(অর্থাৎ এবং যখন তোমাদেরকে কেউ কোন বচন দ্বারা সালাম করে, তবে তোমরা তা অপেক্ষা উত্তম বচন তার জবাবে বলো, কিংবা অনুরূপই বলে দাও। ৪ : ৮৬; তরজমা– কান্যুল ঈমান)

এতে বুঝা গেলো যে, মৃত ও জীবিত উভয়কে সালাম একই নিয়মে করা হবে। অর্থাৎ এভাবে যে, প্রথমে 'সালাম', পরে 'আলাইকুম' বলবে। আর যে হাদীসে 'আলাইকুমুস্ সালাম' মৃতদের সালাম বলে বর্ণিত আছে, তা দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, যখন মৃত ব্যক্তিরা পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, তখন এ সালাম করে থাকে। অতএব, এ হাদীস ওই হাদীসের বিপরীত নয়।

৬২. অর্থাৎ অতিসত্ত্বর ওফাত পেয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবো। 'ইন্শা-আল্লাহ্' বরকতের জন্য বলা হয়েছে। অন্যথায় মৃত্যু তো সুনিশ্চিত। অথবা ঈমানের উপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা এবং কোন নির্দিষ্ট স্থানে মৃত্যুবরণ করা আমাদের নিকট সন্দেহযুক্ত। অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ চান তবে আমরা ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মু'মিনদের সাথে মিলিত হবো। এ সবই উম্মতের শিক্ষার জন্য এরশাদ হয়েছে।

৬৩. অর্থাৎ যদি ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী মুসলমানদেরকে যাহেরী জীবদ্দশায় সাক্ষাৎ করতাম! অন্যথায় হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো সকল উম্মতকে প্রত্যক্ষ করছেন। তাদেরকে নিজের ভাই বলা চূড়ান্ত দয়া প্রদর্শনার্থে। উম্মতের জন্য এটা বৈধ নয় যে, হুযূরকে নিজেদের ভাই বলবে। বাদশা স্বীয় প্রজাদের উদ্দেশ্যে বলে থাকেন, "আমি আপনাদের ভাই ও খাদিম (সেবক)।" তাই বলে প্রজাগণ তাকে খাদিম (সেবক) বলে আহ্বান করলে শাস্তি পাবে। মহান রব এরশাদ করেন–

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ الاٰية

(অর্থাৎ রসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনি স্থির করো না, যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।... আল-আয়াত। ২৪ : ৬৩, তরজমা– কান্যুল ঈমান)

৬৪. অর্থাৎ তোমরা আমার ভাইও এবং সাহাবীও। আর যে সব মুসলমান ভবিষ্যতে আগমনকারী তারা শুধু ভাই হবে, সাহাবী হবে না। স্মর্তব্য যে, 'ভাই হওয়া' বাহ্যিক দৃষ্টিতে, ঈমানের সম্পর্কের ভিত্তিতে। অন্যথায় উম্মতের জন্য হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন রূহানী

اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً لَّهٗ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ اَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهٗ، قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّهُمْ يَاْتُوْنَ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَاَنَا فَرْطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوَّلُ مَنْ يُّؤْذَنُ لَهٗ بِالسُّجُوْدِ

"বলো দেখি! যদি কারো ঘোড়ার পঞ্চাঙ্গ সাদা চিত্র বিশিষ্ট হয়, আর সেটা গাঢ় কালো বর্ণের ঘোড়াসমূহের মধ্যে মিশে যায়, তবে কি সে তার ঘোড়াকে চিনতে পারবে না?"[৬৬] তাঁরা আরয করলেন, "হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল।" হুযূর এরশাদ করলেন, "তারা ওযূর চিহ্নগুলো দ্বারা পঞ্চ অঙ্গ সাদা চিত্র বিশিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হবে। আর আমি হাওযের নিকট তাদের অগ্রণী হবো।[৬৭] [মুসলিম]

২৭৯।। হযরত আবুদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি হলাম ওই প্রথম ব্যক্তি, যাঁকে সাজদার অনুমতি দেওয়া হবে-

পিতা। আর তাঁর সম্মানিত স্ত্রীগণ মুসলমানদের মা; ভাবী নন। ঈমানের সম্পর্কের কারণে আপন পিতা ও দাদা ইসলামী ভাই, আর আপন মা ও স্ত্রী ইসলামী বোন। কিন্তু এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই তাঁদেরকে না ভাই-বোন বলা হয়, না তাদের জন্য ভাই-বোনের বিধান প্রযোজ্য হয়। এমনকি যদি স্ত্রীকে বোনের সাথে উপমাও দেওয়া হয়, তবে 'যিহার'★ হয়ে যায়, যার শাস্তি স্বরূপ (লাগাতার) ৬০টি রোযা পালন ইত্যাদি দ্বারা কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি হুযূরকে ভাই বলে এবং ভাই বলে জানে সেও কঠিন শাস্তির উপযোগী।

৬৫. সাহাবীদের এ প্রশ্ন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'ইল্‌ম' (জ্ঞান)কে অস্বীকার করার ভিত্তিতে নয়; বরং তাঁরা ইলমের উপকরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। অর্থাৎ যে সব মুসলমানকে দুনিয়ায় আপনি পবিত্র যাহেরী জীবনে যাহেরী চোখে দেখেন নি, তাদেরকে কাল ক্বিয়ামতে কীভাবে চিনবেন? এবং কীভাবে শাফা'আত (সুপারিশ) করবেন? নিরেট নুবূয়তের নূর কিংবা ওহীর মাধ্যমে তাদের মধ্যে এমন কিছু চিহ্নও জানা যাবে, যেগুলো দ্বারা আমরাও চিনতে পারবো। (তা আমাদের জন্য এরশাদ করুন!) অন্যথায় সম্মানিত সাহাবীদের আক্বীদা তো এ-ই ছিলো যে, হুযূর আপন সকল উম্মতের প্রকাশ্য ও গোপন এক একটি আমল সম্পর্কেও অবগত আছেন। হযরত 'আয়শা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা একদা আরয করেছিলেন, "হুযূর! আপনার উম্মতের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যার নেকীগুলো আসমানের তারকারাজির সমান?" হুযূর এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ। (তা হচ্ছে) ওমরের।" এ প্রশ্নোত্তর 'আলীম' (সর্ববিষয়ে জ্ঞাত) ও 'খাবীর' (সর্ববিষয়ে অবগত)-এর সাথেই হতে পারে।

৬৬. সুব্‌হানাল্লাহ্! কতোই উত্তম উপমা! 'পঞ্চ অঙ্গে সাদা চিত্র বিশিষ্ট ঘোড়া' যেমন কালো ঘোড়াগুলোর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে না, তেমনি আমার উম্মতগণ অন্যান্য উম্মতের মধ্যে লুক্কায়িত থাকবে না। এর অর্থ এ নয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে সকল মু'মিনের চেহারা কালো হবে। কালো চেহারা বিশিষ্ট হওয়া তো কাফিরদের জন্যই; বরং অর্থ এ যে, ওযূর চিহ্নাদির সুনির্দিষ্ট ঔজ্জ্বল্য শুধু হুযূর মোস্তফার উম্মতের উপরই থাকবে।

৬৭. 'হাওয' দ্বারা 'হাওয-ই কাওসার' বুঝানো হয়েছে, যা আমাদের হুযূরের হবে। অন্যান্য নবীগণেরও হাওয থাকবে। কিন্তু 'কাওসার' অন্য কারো হবে না।

★ যিহার হচ্ছে- নিজের স্ত্রীকে মা, বোন ইত্যাদির সাথে এমনভাবে তুলনা করা, যার কারণে স্ত্রী নিজেদের উপর শরীয়ত মতো হারাম হয়ে যায়, যতক্ষণ না নির্দিষ্ট কাফ্ফারা আদায় করা হয়। [ফিক্বহর কিতাবাদি]

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُّؤْذَنُ لَه، اَنْ يَّرْفَعَ رَاْسَه، فَاَنْظُرُ اِلٰى مَا بَيْنَ يَدَىَّ فَاَعْرِفُ اُمَّتِى مِنْ بَيْنِ الْاُمَمِ وَمِنْ خَلْفِى مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ يَّمِيْنِىْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ شِمَالِىْ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَعْرِفُ اُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْاُمَمِ فِىْ مَا بَيْنَ نُوْحٍ اِلٰى اُمَّتِكَ قَالَ هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُوْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ لَيْسَ اَحَدٌ كَذٰلِكَ غَيْرُهُمْ وَ اَعْرِفُهُمْ اَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِاَيْمَانِهِمْ وَاَعْرِفُهُمْ تَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ. رَوَاهُ اَحْمَدُ

ক্বিয়ামতের দিন। আর আমি ওই প্রথম ব্যক্তি, যাকে মাথা উঠানোর জন্য অনুমতি দেওয়া হবে।[৬৮] তখন আমি আমার সামনে (জনসমুদ্রের) ভিড় দেখবো। তখন আমি সমস্ত উম্মতের মধ্য হতে আমার উম্মতকে চিনে নেবো। আর আমার পেছনের দিকেও এরূপ থাকবে। আর আমার ডান দিকেও ওইরূপ এবং আমার বাম দিকেও ওইরূপ হবে।[৬৯] তখন এক ব্যক্তি আরয করলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম হতে (আরম্ভ করে) আপনার উম্মত পর্যন্তের এতো উম্মতের মধ্যে নিজের উম্মতকে কীভাবে চিনবেন?[৭০] হুযূর এরশাদ করলেন, "তারা ওযূর চিহ্নাদির কারণে 'পঞ্চঅঙ্গ সাদা চিত্র বিশিষ্ট' হবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ হবে না।[৭১] আর তাদেরকে এরূপেও চিনবো যে, তাদের কিতাবসমূহ তাদের ডান হাতে থাকবে।[৭২] আর এভাবেও চিনবো যে, তাদের শিশু সন্তানরা তাদের সম্মুখে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে।[৭৩] [আহমদ]

فرط ওই ব্যক্তিকে বলে, যিনি আগে গিয়ে ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করেন। মর্মার্থ এ যে, হাওয-ই কাওসারের নিকট আমি তোমাদের পূর্বে পৌঁছে গিয়ে তোমাদের জন্য ব্যবস্থাপনা ও অপেক্ষা করতে থাকবো। তোমাদেরকে আমার ব্যবস্থাপনায় পানি পান করাবো। 'হাওয'-এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ, ইনশা-আল্লাহ্ সামনে 'হাওয' শীর্ষক অধ্যায়ে আসবে।

৬৮. এটা ইবাদতের সাজদা হবে না, বরং শাফা'আত-ই কুবরা'র অনুমতির জন্য হবে। এটা ওই সময় হবে, যখন সমস্ত নবী 'নাফ্সী' 'নাফ্সী' বলে জবাব দিয়ে দেবেন আর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শাফা'আতের দ্বার উন্মুক্ত করবেন। এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ, ইনশা-আল্লাহ্ 'শাফা'আত' শীর্ষক অধ্যায়ে আসবে।

'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেন, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সবার পূর্বে হুযূরের নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু সেখানেও সবার পূর্বে শাফা'আত তিনিই করবেন। প্রত্যেক স্থানে প্রথম হওয়ার গৌরব-মুকুট তাঁরই শির মুবারকে শোভা পায়। এ সাজদা এক সপ্তাহকাল স্থায়ী হবে, যাতে হুযূর আল্লাহ্র এমন প্রশংসা করবেন, যা কখনো কেউ করে নি। এজন্য হুযূরের পবিত্র নাম 'আহমদ' (অধিক প্রশংসাকারী)।

৬৯. অর্থাৎ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি হুযূরকে এমনভাবে ঘিরে থাকবে, যেরূপ 'দুলহা'কে বরযাত্রীরা (পরিবেষ্টিত করে রাখে)। এমন হবেও না কেন? সবার ফায়সালা তো আজকের এ দিনে হুযূরের আপন ওষ্ঠযুগল শরীফকে নাড়া দেওয়ার উপর নির্ভরশীল হবে। প্রত্যেক চোখ তাঁর নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে, প্রতিটি মাথা তাঁরই দিকে ঝুঁকবে। ওই দিন হুযূরের এমন শান বা মর্যাদা প্রকাশ পাবে, যা শুধু দেখেই বুঝা যাবে। এ ভিড়ের মধ্যে সকল নবীও থাকবেন এবং তাঁদের উম্মতগণও (থাকবেন)।

৭০. অর্থাৎ এতে উম্মতের ভিড়ের মধ্যে আপনার উম্মতের পরিচিতির চিহ্ন কী হবে? হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর উল্লেখ তাঁর প্রসিদ্ধির ভিত্তিতেই করা হয়েছে, অন্যথায় তাঁর পূর্বেকার নবীগণও তাঁদের উম্মত সমেত সেখানে উপস্থিত

بَابُ مَا يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অধ্যায় ঃ যা ওযূ ওয়াজিব করে[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ২৮০।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার ওযূ ভঙ্গ হয়েছে তার (ওযূ বিহীন মুসাল্লী) নামায কবূল হয় না, যতক্ষণ না সে ওযূ করে নেয়।[২] [বোখারী, মুসলিম]

থাকবেন। অথবা (এজন্য যে,) ওই নবীগণের পূর্বে কাফিরদের নিকট দ্বীনের প্রচার সর্বপ্রথম হযরত নূহ আলায়হিস সালামই করেছেন।

৭১. অর্থাৎ যদিও ওযূ পূর্ববর্তী সকল উম্মতও করেছিলেন, কিন্তু এর এ নূর শুধু এ উম্মতের জন্যই হবে।

৭২. অর্থাৎ আমার উম্মতের আমলনামা তাদের ডান হাতে প্রদান করা হবে আর কাফিরদেরকে বাম হাতে। পূর্ববর্তী উম্মতের মু'মিনগণ তখনও আমলনামা পাবে না। তখন তাদের হাত খালি থাকবে। পরে তাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।

৭৩. জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এতে বুঝা গেলো যে, ছোট শিশুরা তাদের মা-বাবার আগে আগে চলা এবং শাফা'আত করা এ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট।

স্মর্তব্য যে, এ তিন চিহ্নের উপর হুযূরের চেনা নির্ভরশীল নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমানের স্তর ও মর্যাদা সম্পর্কেও খবর রাখেন। প্রত্যেকের ঈমানের শিরার উপরও হুযূরের মোবারক হাত রয়েছে। এমন হবেনও না কেন? হুযূর তো প্রত্যেকের প্রতিটি অবস্থার উপর নিঃশর্ত সাক্ষী। এরশাদ হচ্ছে- وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا (অর্থাৎ আর এ রসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী। ২ : ১৪৩, তরজমা- কান্‌যুল ঈমান) হুযূরের নেক্‌কার উম্মতগণও গুনাহ্‌গারদেরকে দোযখ হতে বের করে নিয়ে আসবেন; প্রথমে তাদেরকে, যাদের অন্তরে দিনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তারপর অর্ধ দিনার পরিমাণ ঈমানধারীদেরকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাকেও। যখন এ মু'মিন অন্তরের ঈমানের পরিমাণ জানেন, তখন হুযূরের জানার ব্যাপারে জিজ্ঞাসার কী আছে?

وہ لینگے چھانٹ اپنے نام لیواؤں کو محشر میں
غضب کی بھیڑ میں ان کی میں پہچان کے صدقے

অর্থাৎ তিনি নিজের নাম জপনাকারীদেরকে হাশরের ময়দানে বেছে নেবেন। ক্রোধের ভিড়ের মধ্যে আমিও ওই বেছে নেওয়া লোকদের মধ্যে থাকবো এ পরিচিতির সুবাদে।

অন্যথায় হুযূরের উম্মতের মধ্যে কতেক লোকের মধ্যে এ তিনটি চিহ্নও থাকবে না, না তারা ওযূ করেছে, না কোন নেক আমল করেছে, না তাদের কোন সন্তান আছে, বরং এসব চিহ্ন তো সাধারণ লোকের পরিচয় লাভ করার জন্য এরশাদ করা হয়েছে। এ জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এটা এরশাদ করেন নি যে, 'এ চিহ্নগুলো ব্যতীত'।

****

১. আটটি জিনিস ওযূ ভেঙ্গে দেয় ঃ

এক. যা কিছু পায়খানা-প্রসাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়, **দুই.** মুখভর্তি বমি, **তিন.** প্রবহমান রক্ত, **চার.** অজ্ঞান হওয়া, **পাঁচ.** নিশাগ্রস্ত হওয়া, **ছয়.** অলসতার নিদ্রা, **সাত.** রুকূ'-সাজদা বিশিষ্ট নামাযে অট্টহাসি দেওয়া (সশব্দে হাসা) এবং **আট.** মুবাশারাত (নারী ও পুরুষ বিবস্ত্র হয়ে একজনের গোপনাঙ্গ অপর জনের গোপনাঙ্গের সাথে লাগানো, যদিও প্রবেশ না করে)

২. 'কবূল হওয়া' মানে নামায বৈধ হওয়া। আর 'ওযূ' দ্বারা

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَّ لَا صَدَقَةٌ مِّنْ غُلُوْلٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ اَسْتَحْيِىْ اَنْ اَسْأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهٖ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهٗ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهٗ وَيَتَوَضَّأُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَوَضَّؤُا مِمَّا مَسَّتِ

২৮১।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "পবিত্রতা ব্যতীত নামায ক্বুবূল হয় না এবং খিয়ানতের মালের সাদ্ক্বা-খায়রাত ক্বুবূল হয় না।[৩] [মুসলিম]

২৮২।। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত মযী বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলাম। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জাবোধ করছিলাম তাঁর সাহেবজাদীর কারণে।[৪] তাই আমি মিক্বদাদকে বললাম। তিনি হুযূরকে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন (হুযূর উত্তরে) এরশাদ করলেন, "সে লজ্জাস্থান ধুয়ে নেবে এবং ওযূ করে নেবে।"[৫] [বোখারী, মুসলিম]

২৮৩।।হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, "তোমরা ওযূ করো যে বস্তুকে

'ওযূ-ই হাক্বীক্বী' (নামাযের পূর্ণাঙ্গ ওযূ) এবং 'ওযূ-ই হুকমী' (অর্থাৎ তায়াম্মুম)– উভয়ই বুঝানো উদ্দেশ্য। ওযূ বিহীন ব্যক্তির নামায ওযূ কিংবা তায়াম্মুম করা ব্যতীত জায়েয নয়। (আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামদের মতে, যে ব্যক্তি ওযূর উপযুক্ত পানি এবং তায়াম্মুমের উপযোগী মাটি পায় না, সে নামায ক্বাযা করবে। আর যদি ক্বাযা করার সুযোগ পাওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে গুনাহগার হবে না। এ হাদীস ইমাম-ই আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র পক্ষে দলীল। বিজ্ঞ আলিমগণ বলেন, "ইচ্ছাকৃতভাবে ওযূ বিহীন নামায পড়া কুফর; কারণ সে তখন নামাযকে হালকা জ্ঞান করে।"

৩. এখানে 'তাহারাত' (পবিত্রতা) মানে 'ওযূ' ও 'গোসল' উভয়ই। আর 'খিয়ানত' দ্বারা সমস্ত হারাম সম্পদের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র হয়ে নামায পড়ো এবং হালাল সম্পদ থেকে দান করো। হারাম মাল তার মালিককে ফেরৎ দাও। যদি মালিকের খোঁজ পাওয়া না যায়, তবে সেটার মালিকের পক্ষ থেকে দান করে দাও। কারণ, তার জন্য এটা হালাল।

৪. যৌন উত্তেজনার সময় যে পাতলা পানি বের হয় তা হলো 'মযী' (مذى)। আর প্রস্রাবের পর যে সাদা ফোঁটা বের হয়, তাকে 'ওয়াদী' (ودى) বলা হয়। এ দু'টি নির্গত হওয়ার কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়; কিন্তু গোসল ফরয হয় না।

এ ঘটনা দ্বারা বুঝা গেলো যে, বুযুর্গদের প্রতি লজ্জাবোধ করা পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক। তবে লজ্জার কারণে (শরীয়তের) মাস্'আলা (বিধি-বিধান) জিজ্ঞাসা না করা এবং জ্ঞানহীন থেকে যাওয়া গুনাহ্। হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু মাস্'আলাও জেনে নিয়েছেন এবং লজ্জাবোধও কায়েম রেখেছেন।

৫. অর্থাৎ সেটার বিধান প্রস্রাবের বিধানের মতোই। অর্থাৎ এটা 'হুক্মী' (বিধানগত) নাপাকীও এবং হাক্বীক্বী (বস্তুগত) নাপাকীও। স্মর্তব্য যে, যদি 'মযী' ইত্যাদি দ্বারা এক টাকার মুদ্রা পরিমাণ জায়গা লেপ্‌টে (ভিজে) যায়, তবে পানি দ্বারা

النَّارُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْاَجَلُّ مُحِيُّ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ هٰذَا مَنْسُوْخٌ بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَجُلاً سَئَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَاِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ. قَالَ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ، قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ، قَالَ اُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ، قَالَ

আগুন রন্ধন করে তা খাওয়ার পর।"[৬] (মুসলিম) মহান ইমাম শায়খ মুহী-উস সুন্নাহ বলেন, এ বিধান হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা'র হাদীস দ্বারা মান্সূখ (রহিত) হয়ে গেছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছাগলের কাঁধের গোশ্ত আহার করেছেন। অতঃপর ওযূ করা ব্যতীত নামায পড়ে নিয়েছেন।[৭] [বোখারী, মুসলিম]

২৮৪।। হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[৮] হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি (সাহাবী) রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আরয করলেন, "আমরা কি মেষের গোশ্ত খেয়ে ওযূ করবো?" (উত্তরে হুযূর) এরশাদ করলেন, "যদি ইচ্ছে হয় করো, আর ইচ্ছে না হলে করো না।" আরয করলেন, "আমরা কি উটের গোশ্ত খেয়ে ওযূ করবো?" এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ। উটের গোশ্ত খেয়ে ওযূ করো।"[৯] আরয করলেন, "আমি কি মেষ রাখার জায়গায় নামায পড়তে পারবো?" এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ পারবে।" আরয করলেন,

---

ইস্তিন্জা করা ওয়াজিব।

৬. এখানে 'ওযূ' আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত, যা وضائة শব্দ হতে বের হয়েছে। এর অর্থ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা; শরীয়তের পরিভাষার ওযূ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ আগুনে রন্ধনকৃত খাদ্য খেয়ে হাত ধোয়া ও কুল্লি করা উত্তম। ফলমূল খাওয়ার পর সেটার প্রয়োজন হয় না। যেমন পরবর্তী হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া, একদা হুযূর-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম গোশ্ত খেয়ে হাত ধৌত করলেন ও কুল্লি করলেন। আর এরশাদ করলেন, আগুনে রন্ধনকৃত বস্তু খাওয়ার পর ওযূ হলো এটাই। এ অর্থে এ হাদীস 'মান্সূখ' (রহিত) নয়। খানা খাওয়ার পর হাত ধোয়া মুস্তাহাব।

৭. 'মাসাবীহ্' প্রণেতা শায়খ মুহি-উস্ সুন্নাহ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'শরহে সুন্নাহ' গ্রন্থে এ হাদীসকে 'মান্সূখ' (রহিত) বলেছেন। কারণ, তিনি 'ওযূ' দ্বারা 'শর'ঈ ওযূ'-এর অর্থ গ্রহণ করেছেন। আর 'আমর' (নির্দেশ)কে 'ওয়াজিবসূচক' সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আমার উপস্থাপিত ব্যাখ্যায় হাদীস 'মান্সূখ' (রহিত) নয়। আর রহিত বলে সাব্যস্ত করার জন্য ঘটনার প্রেক্ষাপটের ইতিহাস জানা থাকা জরুরী। তদুপরি, 'হাদীস-ই ক্বাওলী' (বাণীগত হাদীস) 'হাদীস-ই ফে'লী' দ্বারা তখনি মান্সূখ হতে পারে, যখন ওই কাজ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর (খাস) বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত না হয়। এ জন্য উচিত হচ্ছে- এ হাদীসকে 'মান্সূখ' বলে মেনে না নেওয়া।

৮. তাঁর উপনাম (কুনিয়াত) 'আবূ আবদুল্লাহ্'। তিনি 'আ-মির গোত্রভুক্ত। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ভাগিনা। তিনি নিজেও সাহাবী, তাঁর পিতাও সাহাবী। কূফায় অবস্থান করেন। ৭৪ হিজরীতে ওফাত পান।

৯. এখানেও 'ওযূ করা' মানে হাত ধোয়া ও কুল্লি করা। যেহেতু উটের গোশ্তের মধ্যে গন্ধ ও চর্বি বেশী হয়, যা হাত-মুখ ধৌত করা ছাড়া যায় না। কিন্তু মেষ-ছাগলের গোশতে তা নেই। এ কারণে উটের গোশ্ত খেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইমাম আহমদ

أُصَلِّىْ فِىْ مَبَارِكِ الْإِبِلِ، قَالَ لَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِىْ بَطْنِهٖ شَيْئًا فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْئٌ اَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهٗ دَسَمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"আমি কি উট রাখার জায়গায় নামায পড়তে পারবো?" এরশাদ করলেন, "না।"[১০] [মুসলিম]

২৮৫।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের পেটের মধ্যে কিছু (পীড়া) পায়, আর এতে এ সন্দেহ পোষণ করে যে, (পেট হতে) কিছু বের হলো কিনা, তখন সে যেন মসজিদ হতে বের হয়ে না যায়, যে পর্যন্ত না সে কোন শব্দ শুনতে পায় অথবা দুর্গন্ধ অনুভব করে।[১১] [মুসলিম]

২৮৬।। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন, তারপর কুল্লি করলেন আর এরশাদ করলেন, "এতে চর্বি থাকে।"[১২] [বোখারী, মুসলিম]

রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মতে উটের গোশ্ত খেয়েও ওযূ করা ওয়াজিব। তাও এ হাদীসের ভিত্তিতে।

১০. অর্থাৎ যেখানে উট বাঁধা হয়, সেখানে নামায পড়ো না। কারণ তখন নামাযীর মনে এ ভয় থাকে যে, হয়তো উট খুলে গিয়ে তাকে পদদলিত করবে। এতে হৃদয়ের একাগ্রতা অর্জিত হবে না। মেষ-ছাগলের মধ্যে এ ভয় থাকে না। পার্থক্যের কারণ এটাই। অন্যথায় উট ও মেষ-ছাগল উভয়ের প্রস্রাব 'নাজাসত-ই খফীফাহ্' (পাতলা নাপাক বস্তু)। আর মাটি শুকিয়ে পবিত্র হয়ে যায়।

এখানে নামায পড়তে নিষেধের কারণ এও হতে পারে যে, উটের প্রস্রাবের ছিট্কা দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে; কিন্তু ছাগলের প্রস্রাবের ছিটকে তেমন নয়। সুতরাং নামাযীর মনে সেখানে চিন্তা থাকবে; এখানে নয়।

তেমনিভাবে, উটের রাখাল বা মালিক উটের অন্তরালে প্রস্রাব করে নিতো। সেখানে জমি অত্যন্ত অপবিত্র হয়ে যেতো।

১১. অর্থাৎ কেউ যদি মসজিদে জমা'আত সহকারে নামায পড়ছে, এমতাবস্থায় তার পেটে গোলমাল শুরু হলো, কিন্তু এতে না দুর্গন্ধ অনুভূত হয়েছে, না বাতাস বের হয়েছে- মর্মে নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে; বরং এমনিতেই সামান্য সন্দেহ হয়েছে মাত্র, তাহলে এ সন্দেহের উপর নির্ভর করবে না; বরং সে ওযূ সহকারেই আছে। নামায পড়তে থাকবে। 'শব্দ শুনা' মানে শব্দ বের হওয়ার নিশ্চিত ধারণা হওয়া।

এতে বুঝা গেলো যে, নিশ্চিত ওযূ সন্দেহযুক্ত 'হাদস' (ওযূ ভঙ্গ হওয়া) দ্বারা ভঙ্গ হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, আমার নিশ্চিত মনে আছে যে, যোহরের সময় আমি ওযূ করেছিলাম, কিন্তু ওযূ ভঙ্গ হয়েছে মর্মে শুধু সন্দেহ রয়েছে, তবে নিশ্চিত ধারণা (ইয়াক্বীন) হয় নি, তাহলে এতে আমার ওযূ বহাল রয়েছে।'

১২. এ হাদীস 'আহারের ওযূ'র ব্যাখ্যা। এতে বুঝা গেলো যে, চর্বিযুক্ত বস্তু আহার কিংবা পান করার পর কুল্লি করা উচিত; যদিও তা আগুনের রন্ধনকৃত না হয়। প্রকাশ থাকে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাঁচা দুধ

وَعَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ وَّ مَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَّمْ تَكُنْ تَصْنَعُهٗ فَقَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهٗ يَا عُمَرُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ اَنَّهٗ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ اَدْنٰى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلَّا بِالسَّوِيْقِ فَاَمَرَ بِهٖ فَثُرِّيَ فَاَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ

২৮৭।। হযরত বুরায়দাহ্[১৩] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন এক ওযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়েছেন এবং স্বীয় মোজা যুগলের উপর মসেহ করেছেন।[১৪] তখন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, "আজ হুযূর ওই কাজ করলেন, যা ইতোপূর্বে করতেন না।" এরশাদ করলেন, "হে ওমর! আমি এটা ইচ্ছা করে করেছি।"[১৫] [মুসলিম]

২৮৮।। হযরত সুয়াইদ ইবনে নু'মান[১৬] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে খায়বারের বছর গিয়েছেন। যখন 'সাহ্বা' নামক স্থানে পৌঁছলেন, যা খায়বারের নিকটবর্তী, তখন হুযূর আসরের নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি খাদ্য-রসদ তলব করলেন, তখন শুধু ছাতু আনা হলো।[১৭] তারপর তাঁর নির্দেশে তা ভেজানো হলো। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও খেলেন, আমরাও খেলাম।[১৮] অতঃপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন।

পান করেছিলেন। কেননা, চর্বিযুক্ত বস্তুর চিহ্ন মুখের মধ্যে লেগে থাকে। যদি ওই অবস্থায় নামায পড়া হয়, তবে সেটার প্রভাব পেটের মধ্যে পৌঁছতে থাকবে, যা মাক্রূহ না হয়ে পারে না। [মিরক্বাত]

১৩. তাঁর নাম বুরায়দাহ ইবনে আবী হোসায়ব আস্লামী বদরের যুদ্ধের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বায়'আত-ই রিদ্বওয়ান-এ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে মদীনা-ই তাইয়্যেবাহ্য়, অতঃপর বসরায় বসবাস করেন। অতঃপর খোরাসানে যোদ্ধা হিসেবে গমন করেন। 'মারভ' নামক স্থানে ৭২ হিজরীতে ওফাত পান।

১৪. মক্কা বিজয়ের দিন এক ওযূ দিয়ে পাঁচ ওয়াক্তের নামায সম্পন্ন করেছেন। আর ওযূর ক্ষেত্রে চামড়ার মোজার উপর মসেহও করেছেন। ইতোপূর্বে প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ করতেন এবং পা মোবারকও ধৌত করতেন। এ জন্য হযরত ওমর ফারূক্বের আশ্চর্যবোধ হলো।

১৫. যাতে স্বীয় আমল শরীফ দ্বারা উম্মতকে দু'টি মাস্'আলা জানিয়ে দিই ঃ

এক. এক ওযূ দিয়ে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করা জায়েয এবং দুই. মোজার উপর মসেহ করা সুন্নাত; যদিও প্রত্যেক নামাযের জন্য তাজা ওযূ করা উত্তম।

স্মর্তব্য যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য মুস্তাহাব নয় এমন কাজ করাও সাওয়াবের কারণ। কেননা, এতে দ্বীনের প্রচার রয়েছে।

১৬. তিনি একজন আন্সারী সাহাবী। উহুদ ও বায়'আত-ই রিদ্বওয়ান ইত্যাদি অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি মদীনা শরীফের অধিবাসী ছিলেন।

১৭. যুদ্ধগুলোতে এ ছিলো দু'জাহানের সুলতান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খাবার ও শাহী রেশন; যাঁর নাম স্মরণকারীরা আজ সারা দুনিয়ার নি'মাতরাজি খাচ্ছে।

فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوْءَ اِلَّا مِنْ صَوْتٍ اَوْرِيْحٍ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَذِىِّ فَقَالَ مِنَ الْمَذِىِّ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ

তখন তিনি কুল্লি করলেন এবং আমরাও কুল্লি করে নিলাম। তারপর নামায পড়লেন, ওযূ করেন নি।[১৯] [বোখারী]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ২৮৯।। হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "শব্দ কিংবা গন্ধ পাওয়া ব্যতীত ওযূ ওয়াজিব হয় না।"[২০] [আহমদ, তিরমিযী]

২৯০।। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে 'মযী' সম্পর্কে জানার জন্য আরয করলাম, তখন তিনি এরশাদ করলেন, "মযীর কারণে ওযূ আর বীর্যের কারণে গোসল (ওয়াজিব হয়)।"[২১] [তিরমিযী]

২৯১।। তাঁরই (হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "নামাযের চাবি হচ্ছে–

بوریا ممنون خواب راحتش تاج کسری زیر پائے امتش

অর্থাৎ যাঁর আরাম ও ঘুমের জন্য চাটাই-ই ধন্য হতো, ইরানের বাদশার মাথার মুকুট তাঁর উম্মতের পায়ে নিচে।

দেখুন! খায়বারের যুদ্ধে মুজাহিদগণ; বরং স্বয়ং হুযূর সাইয়্যেদুল মুরসালীন (রসূলকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র খাবার ছিলো শুধু ছাত্তু।

১৮. ওই যুগে 'ছাত্তু' পানিতে মিশিয়ে পান করার প্রচলন ছিলো না। তাছাড়া ওই সময় চিনি বা গুড় মওজুদ ছিলো না। তাই পানি মিশিয়ে নেওয়া হয়েছে, যাতে কণ্ঠনালী দিয়ে নামতে সহজ হয়।

১৯. অর্থাৎ শুধু কুল্লি করে ক্ষান্ত হন, যদিও ছাত্তু আগুনে ভুনা হয়। এ হাদীস আহারের ওযূ সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যা।

২০. এ সীমাবদ্ধকরণ (حصر) 'বাতাস'-এর প্রতি দৃষ্টি রেখেই। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত 'বাতাস' বের হওয়া নিশ্চিত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ওযূ ভঙ্গ হবে না। এ অর্থ নয় যে, 'বাতাস' ব্যতীত অন্য কিছু বের হলে ওযূ ভঙ্গ হয় না।

২১. হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র এ প্রশ্ন হযরত মিক্বদাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু'র মাধ্যমে করা হয়েছিলো; মাধ্যম ছাড়া ছিলো না। যেমন ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরিত্য নেই।

'বীর্য' ও 'মযী'-এর মধ্যে পার্থক্য এ-ই যে, বীর্য কামপ্রবৃত্তি (শাহওয়াত)কে ভঙ্গ করে দেয় আর মযী বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া, 'বীর্য' দুধের মতো সাদা ও গাঢ় চটচটে হয়, আর 'মযী' প্রস্রাবের মতো, কিন্তু আঠাল।

الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَرَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ عَنْهُ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَآءَ فِىْ اَعْجَازِهِنَّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوٗدَ

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّمَا الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَاِذَا

পবিত্রতা।[২২] সেটার ইহ্রাম হচ্ছে তাকবীর আর সেটা থেকে বের হওয়া হলো সালাম।''[২৩]

এ হাদীস আবূ দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে মাজাহ্ও তাঁর (হযরত আলী) থেকে এবং হযরত আবূ সা'ঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

২৯২।। হযরত আলী ইবনে ত্বাল্ক্ব[২৪] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ শব্দহীন বায়ু নির্গত করবে, তখন সে যেন ওযূ করে আর তোমরা স্ত্রীদের পায়ুতে সঙ্গম করো না।''[২৫] [তিরমিযী, আবূ দাউদ]

২৯৩।। হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান[২৬] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "চক্ষুযুগল হচ্ছে পাছা বা গুহ্যদ্বারের বন্ধন। সুতরাং যখন

---

২২. কারণ, চাবি ছাড়া যেমন তালা খুলে না, তেমনিভাবে ওযূ, গোসল কিংবা তায়াম্মুম ছাড়া নামায শুরু হতে পারে না। এ হাদীস ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র দলীল। এ মর্মে যে, যে ব্যক্তি ওযূ বা তায়াম্মুম করতে পারে নি সে নামায পড়বে না। (পরবর্তীতে ক্বাযা করবে।)

২৩. অর্থাৎ হজ্জের ইহ্রাম তাল্বিয়াহ্ (লাব্বায়ক...) দ্বারা বাঁধা হয়। অর্থাৎ 'তালবিয়াহ্' বলার সাথে সাথেই হাজী সাহেবের উপর শত শত বিষয় হারাম হয়ে যায়। তেমনিভাবে নামাযের ইহ্রাম তাক্বীর দ্বারা বাঁধা হয়। অর্থাৎ তাক্বীর বলতেই সালাম-কালাম, পানাহার- সবই হারাম হয়ে যায়। অনুরূপ হজ্জের ইহরাম যেমন মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে খোলা হয়, তেমনিভাবে সালামের মাধ্যমে নামাযের ইহরাম খোলা হয়। কারণ, সালাম ফেরাতেই উল্লেখিত সব কিছু হালাল হয়ে যায়।

স্মর্তব্য যে, 'তাক্বীরে তাহরীমাহ' সমস্ত ইমামের মতে ফরয। কিন্তু ইমাম শাফে'ঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হিম-এর মতে সালামও ফরয। আমাদের ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মতে ওয়াজিব। ওই সব বুযুর্গের দলীলই হচ্ছে- এ হাদীস। ইমাম আ'যম রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হির দলীল ওইসব গ্রাম্য লোকের হাদীস, যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাতে সালামের উল্লেখ নেই। যদি 'সালাম' ফরয হতো, তবে অবশ্যই সেটার উল্লেখ করা হতো। এ হাদীসের ভিত্তিতে আমরা (হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা) সালাম 'ফরয হওয়া'র বিষয়টি অস্বীকার করি। আর এ হাদীসের ভিত্তিতে 'সালাম ওয়াজিব হওয়া'র কথা ঘোষণা করি। উভয় হাদীসের উপরই আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের আমল রয়েছে। তাকবীর ও সালাম সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-বিধান ফিক্বহের গ্রন্থাদিতে দেখতে পারেন।

২৪. তিনি হানাফী ও ইয়ামামী। তাঁর নিকট থেকে ইবনে সালাম হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ত্বালক্ব ইবনে আলী। আর তাঁর নিকট থেকে শুধু এ-ই একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৫. কেননা, এটা অপবিত্রতার স্থান এবং সন্তান জন্মদানের স্থান নয়। স্মর্তব্য যে, স্ত্রীর পায়ু পথে সঙ্গম করা 'হারাম-ই ক্বাত্ব'ঈ' (অকাট্যরূপে হারাম), যার অস্বীকারকারী কাফির। কিন্তু এ 'হারাম-ই ক্বাত্ব'ঈ', 'ক্বিয়াস-ই ক্বাত্ব'ঈ' দ্বারা প্রমাণিত;

نَامَتِ الْعَيْنُ اِسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ هٰذَا فِيْ غَيْرِ الْقَاعِدِ لِمَا صَحَّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَآءَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّؤُنَ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ اِلَّا اَنَّهٗ ذَكَرَ فِيْهِ يَنَامُوْنَ بَدَلَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَآءَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُسُهُمْ

চক্ষু ঘুমায়, তখন বন্ধন খুলে যায়।"[২৭] [দারেমী]

২৯৪।। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "পাছার বন্ধন (ঢাক্না) হলো চক্ষুযুগল। সুতরাং যে ঘুমায় সে যেন ওযূ করে।"[২৮] এ হাদীস আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন। শায়খ ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ বলেন, এ আদেশ ওই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে উপবিষ্ট নয়। কেননা, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ এশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতেন, এমন কি (তন্দ্রার কারণে) তাঁদের মাথা ঝুঁকে পড়তো, অতঃপর নামায পড়তেন; কিন্তু ওযূ করতেন না।[২৯] এটা ইমাম আবূ দাঊদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম তিরমিযী 'এশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতেন'-এর পরিবর্তে বলেছেন, "তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তেন।"

এ হাদীস শরীফগুলো দ্বারা নয়। কেননা, হাদীসগুলো 'যন্নী' (ظنى), (قطعى বা অকাট্যের পর্যায়ের নয়)।

২৬. হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু-এর জীবনী ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর পিতার নাম হারব্, কুনিয়াত 'আবূ সুফিয়ান' ও 'ইবনে সাখ্র'। তিনি ক্বোরাঈশ বংশের উমাইয়া ধারার। ঐতিহাসিক 'হস্তি বাহিনী'র ঘটনার দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর হুযূর-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ও শুভজন্ম 'হস্তি বাহিনী'র ঘটনার চল্লিশ দিন পর হয়েছে। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ঈমান গ্রহণ করেছেন। হুযূরের সাথে হুনায়ইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বড় বড় দানে ধন্য করেন। তায়েফের যুদ্ধে তাঁর একটি চোখ শহীদ হয় আর ইয়ারমুকের যুদ্ধে অপর চোখটিও শহীদ হয়ে যায়। ৩৪ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় ওফাত পান। তাঁকে জান্নাতুল বক্বী শরীফে দাফন করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুমা তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। [মিরক্বাত ইত্যাদি]

২৭. সুতরাং নিদ্রাও ওযূকে ভেঙ্গে দেয়, যেমন মৃত্যু গোসল ভঙ্গ করে দেয়। কিন্তু নবীর নিদ্রা দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হয় না। কেননা, তিনি নিদ্রার মধ্যেও অমনোযোগী হন না। এ জন্য তাঁর স্বপ্নও আল্লাহ্র ওহী হয়ে থাকে। তাছাড়া, শহীদের মৃত্যুও গোসল ভঙ্গ করে না। (গোসল ওয়াজিব বা অপরিহার্য করে না।)

এ হাদীস দ্বারা আরো জানা গেলো যে, অমনোযোগিতার নিদ্রা দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হয়। বসে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে ওযূ ভঙ্গ হয় না। কেননা, এতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হয়ে যায় না।

২৮. অর্থাৎ যদি চোখ খোলা থাকে তবে বায়ু বের হওয়ার ব্যাপারে খবর থাকে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তেই বে-খবর ও অচেতন হয়ে পড়ে। তাই নিদ্রাকেই ওযূ ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে– চাই বায়ু নির্গত হোক, কিংবা না-ই হোক;

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْوُضُوْءَ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَاِنَّهٗ اِذَا اِضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاؤدَ

وَعَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهٗ فَلْيَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهٗ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ

২৯৫।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ওযূ তাঁরই উপর ওয়াজিব হবে যে শু'য়ে ঘুমায়। কেননা, সে যখন ঘুমাবে, তখন তার শরীরের জোড়াগুলো ঢিলা হয়ে যাবে।"[৩০] [তিরমিযী, আবূ দাঊদ]

২৯৬।। হযরত বুসরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা[৩১] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ আপন বিশেষ অঙ্গ স্পর্শ করবে, তখন সে যেন ওযূ করে।"[৩২] (মালিক, আহমদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী)

২৯৭।। হযরত তালক্ব ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যে ব্যক্তি ওযূ করার পর বিশেষ অঙ্গ স্পর্শ করলো, (তার বিধান কি?) উত্তরে, হুযূর এরশাদ করলেন, "সেটাও তো মানব শরীরেরই একটি অঙ্গ।"[৩৩] (আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈ) আর ইবনে মাজাহ্ সেটার মতোই বর্ণনা করেছেন।

নিদ্রা-বিভোর হলেই ওযূ ভঙ্গ হবে।

২৯. সুতরাং যে নিদ্রায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হয়ে পড়বে না, তাতে ওযূ যাবে না। এজন্য বলা হয়েছে যে, যদি মহিলা সাজদার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে, তবে তার ওযূ ভেঙ্গে যায় আর যদি পুরুষ সাজদার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে, তবে ওযূ যাবে না। কারণ, পুরুষ সাজদারত অবস্থায় গাফিল বা অচেতন হতে পারে না। অচেতন হলে সে পড়ে যাবে।

৩০. বসে হেলান দিয়ে ঘুমানোও এ একই বিধানভুক্ত। কেননা, ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কারণ হলো শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হয়ে পড়া। চাই শুয়ে নিদ্রা যাক, কিংবা বসা অবস্থায় হেলান দিয়ে যাক। এমনকি যে কেউ বসা অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় আর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢলে পড়ে এবং ঢলে পড়ার পর চোখ খোলে, তার ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি ঢলে পড়ার আগে চোখ খুলে যায়, তারপর ঢলে পড়ে যায়, তবে তার ওযূ ভঙ্গ হবে না।

৩১. তাঁর পূর্ণ নাম বুসরাহ্ বিনতে সাফ্‌ওয়ান ইবনে নাওফল। তিনি ক্বোরাঈশ বংশীয়া, বনূ আসাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওয়ারক্বাহ ইবনে নাওফলের ভ্রাতুষ্পুত্রী। তিনি প্রসিদ্ধ মহিলা-সাহাবী।

৩২. 'মাস্' (مَسّ) শব্দের অর্থ স্পর্শ করা, লাগা ও লাগানো এবং পৌঁছানো ও পৌঁছিয়ে দেওয়া। মহান রব এরশাদ করেন– مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ (অর্থাৎ তাদেরকে স্পর্শ করেছে সংকট ও দুঃখ-কষ্ট। ২ : ২১৪; তরজমা-কান্‌যুল ঈমান)

এখানে যদি 'স্পর্শ করা'র অর্থ নেওয়া হয়, তবে এতে কিছু ইবারত উহ্য থাকবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশেষ অঙ্গ স্পর্শ করবে এবং সেখানে তারল্য পাবে, তবে ওযূ করবে। শুধু স্পর্শ করার দরুন নয়, বরং তরল পদার্থ বের হওয়ার কারণে (ওযূ করবে)। যেমন মহান রব এরশাদ করেন–

نَحْوَه، وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحِيُّ السُّنَّةِ هٰذَا مَنْسُوْخٌ لِاَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ اَسْلَمَ بَعْدَ قُدُوْمِ طَلْقٍ وَقَدْرَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَفْضٰى اَحَدُكُمْ بِيَدِهٖ اِلٰى ذَكَرِهٖ لَيْسَ بَيْنَه، وَبَيْنَهَا شَيْئٌ فَلْيَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارُ قُطْنِيُّ وَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ بُسْرَةَ اِلَّا اَنَّه، لَمْ يَذْكُرْ لَيْسَ بَيْنَه، وَبَيْنَهَا شَيْئٌ

শায়খ ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ বলেন, "এ বিধান মান্‌সূখ বা রহিত। কেননা, হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু ত্বাল্‌ক্ব আসার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, হুযূর এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ আপন হাত নির্দিষ্ট অঙ্গ পর্যন্ত এমতাবস্থায় পৌঁছায় যে, বিশেষ অঙ্গ ও হাতের মাঝখানে কোন আড়াল থাকে না, তবে সে যেন ওযূ করে নেয়।[৩৪] এ হাদীস ইমাম শাফে'ঈ ও দারে ক্বুত্বনী বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন হযরত বুসরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা হতে; কিন্তু তিনি 'হাত ও ওই অঙ্গের মাঝখানে কোন অন্তরাল থাকে না' অংশটুকু উল্লেখ করেন নি।

اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ
(অর্থাৎ তোমাদের থেকে কেউ শৌচকর্ম করে আসে। ৫:৬) প্রকাশ থাকে যে, শৌচাগার (পায়খানা)য় গিয়ে ফিরে আসলে ওযূ ভঙ্গ হয় না; বরং সেখানে পায়খানা ও প্রস্রাব করে আসলে ওযূ ভঙ্গ হয়।

যদি 'মাস্' (مس) শব্দের অর্থ 'লাগানো' বা 'পৌঁছানো' নেওয়া হয়, তবে অর্থ হবে, "যখন তোমাদের কেউ স্বীয় অঙ্গ স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গের সাথে বিবস্ত্র অবস্থায় লাগায়, তখন যেন ওযূ করে নেয়। অর্থাৎ এখানে নিছক হাতে স্পর্শ করা বুঝানো مس باليد উদ্দেশ্য নয়, বরং স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গের সাথে লাগানোর অর্থ বুঝানো مس بالفرج উদ্দেশ্য। উপরোক্ত দু'অবস্থায় এ হাদীস অত্যন্ত স্পষ্টার্থক এবং পূর্ববর্তী হাদীসের বিপরীতও নয়। ইমাম শাফে'ঈ এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, "বিশেষ অঙ্গ স্পর্শের কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।" কিন্তু এ হাদীস দ্বারা তাঁর মাযহাব প্রমাণিত হয় না। কেননা, তাঁর মতে, কোন আড়াল ব্যতীত শুধু হাতের তালু ও আঙ্গুলের পেট দ্বারা স্পর্শ করলেই ওযূ ভঙ্গ হয়। আর আঙ্গুলগুলো কিংবা হাতের তালুর পিঠ অথবা কব্জি, কুনুই ও রানের সাথে লেগে গেলে ওযূ ভঙ্গ হয় না। অথচ এ হাদীসে স্পর্শ مس শব্দটি নিঃশর্তভাবে مطلق উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এসব শর্ত আরোপ করা হয় নি।

তদুপরি, এ হাদীস পরবর্তী হাদীসেরও বিপরীত হবে। তাহাভী শরীফে বর্ণিত আছে যে, এখানে 'ওযূ' দ্বারা হাত ধোয়া বুঝানো হয়েছে। আর এটাই হযরত মাস'আব ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হুর অভিমত। অর্থাৎ কেউ বিশেষ অঙ্গ স্পর্শ করলে তার জন্য উচিত হাত ধৌত করা। যেমন, আহারের ওযূর মধ্যে ছিলো। (মিরক্বাত ও লুম'আত ইত্যাদি)

৩৩. অর্থাৎ যেমন নাক, আঙ্গুল ইত্যাদি শরীরের অঙ্গ আর সেগুলো স্পর্শ করলে যেমন ওযূ ভঙ্গ হয় না, তেমনি এটাও একটি অঙ্গ। এটা স্পর্শ করলেও ওযূ ভঙ্গ হবে না। এ হাদীস আমাদের ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর মজবুত দলীল এ মর্মে যে, বিশেষ অঙ্গ স্পর্শ করার কারণে ওযূ ভঙ্গ হয় না। হযরত আলী মুরতাদ্বা, হযরত ইবনে আব্বাস, আম্মার ইবনে ইয়াসির, হোযায়ফাহ্, সা'দ এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ প্রমুখ (বহু) সাহাবীর মাযহাবও এটাই। সুতরাং হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, "আমি নাক, কান স্পর্শ করি কিংবা এ বিশেষ অঙ্গ– সবই সমান।" হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হুকেও এ মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, "যদি তা নাপাকই হয়, তবে তা কেটে ফেলো।" এ মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা ত্বাহাভী শরীফ ও সহীহ বোখারী শরীফ ইত্যাদিতে দেখুন।

৩৪. যেহেতু 'মাসাবীহ' প্রণেতা মুহিউস্ সুন্নাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি মিশকাত প্রণেতা এবং ইমাম ওলী উদ্দীন রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি উভয়ে শাফে'ঈ ছিলেন আর এ হাদীস শরীফ তাঁদের মতের বিপরীত, সেহেতু জবাব দিতে বাধ্য হন। আর তাঁরা এ হাদীস রহিত বলে অভিমত

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بِحَالٍ إِسْنَادِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَيْضًا إِسْنَادُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْهَا وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ هٰذَا مُرْسَلٌ

২৯৮।। হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন স্ত্রীদের কাউকে চুম্বন করতেন, অতঃপর নামায পড়তেন এবং ওযূ করতেন না।[৩৫] এ হাদীস আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আমাদের সহপাঠিদের মতে, কোন অবস্থাতেই ওরওয়ার সূত্র (সদন)টি হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে শুদ্ধ নয়।[৩৬] তাছাড়া, ইব্রাহীম তায়মীর সূত্র (সনদ) ও হযরত আয়শা থেকে। আর ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, "এ হাদীস 'মুরসাল' পর্যায়ের।

পেশ করা ছাড়া অন্য কোন জবাবই দিতে পারেন নি। কেননা, এ হাদীস ক্বিয়াস-এর অনুরূপ। আর পূর্ববর্তী হাদীস 'ক্বিয়াস'-এর বিপরীত। সুতরাং ওই হাদীসই প্রাধান্য পাবে, যা ক্বিয়াসের অনুরূপ। এজন্য হযরত মুহিউস্ সুন্নাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ হাদীস রহিত বলে দাবী করেছেন, কিন্তু রহিতকারী কোন হাদীস পান নি। শুধু আন্দাজ করেই 'রহিত' বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ যেহেতু হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু-এর ইসলাম গ্রহণ পরে হয়েছে আর হযরত তাল্‌ক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র নবীর দরবারে উপস্থিতি পূর্ব থেকেই, সেহেতু হযরত তাল্‌ক্ব ওযূ ভঙ্গ না হওয়ার হাদীস পূর্বে শুনেছেন আর হযরত আবূ হোরায়রা হয়তো ওযূ ভঙ্গ হবার বর্ণনা সম্বলিত হাদীস পরে শুনেছেন। এ কারণে হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত হাদীস 'নাসিখ' (রহিতকারী), আর হযরত তাল্‌ক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আলায়হি-এর বর্ণিত হাদীস 'মানসূখ' (রহিত)। প্রকাশ থাকে যে, এ উক্তি কতোই দূর্বল! কারণ, প্রথমতঃ এ জন্য যে, এ উভয় হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে। যেমন আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। তারপরও কোন কারণ ছাড়াই একটিকে 'মানসূখ' (রহিত) কেন মনে করা হবে? দ্বিতীয়তঃ এজন্য যে, হযরত আবূ হোরায়রা ইসলাম গ্রহণের পর হযরত তাল্‌ক্ব না ওফাত পেয়েছেন, না সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ ছিলেন; বরং সর্বদা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকেন। তাই এটাও হতে পারে যে, তিনি এ হাদীস হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু-এর ইসলাম গ্রহণের অনেক দিন পরেই শুনেছেন আর হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু তাঁর বর্ণিত হাদীস প্রথমে শুনেছিলেন। সুতরাং (তখন) হযরত তাল্‌ক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর বর্ণিত হাদীস 'নাসিখ' বা রহিতকারী আর হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর বর্ণিত হাদীস 'মানসূখ' (রহিত)। এর যে কোন অবস্থাতেই এ রহিত হবার দাবী কোন প্রমাণ ব্যতীতই।

স্মর্তব্য যে, হযরত তাল্‌ক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হিজরতের বছর মসজিদ-ই নবভী শরীফ নির্মাণকালে হুযূরের মহান দরবারে উপস্থিত হন আর হযরত আবূ হোরায়রাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু ৭ম হিজরীতে খায়বারের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। তদুপরি, হযরত আবূ হোরায়রা একথা বলেন নি, "আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি" বরং তিনি হুযূর থেকেই বর্ণনা করেছেন। এও হতে পারে যে, এ হাদীস হযরত তাল্‌ক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু-এর শুভাগমনের অনেক পূর্বে অন্য কোন সাহাবী শুনেছেন, তিনি হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু-এর কাছে বর্ণনা করেছেন। যেমন, 'মুরসাল-ই সাহাবা'-এর মধ্যে হয়ে থাকে।

৩৫. এ হাদীস শরীফ হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মজবুত দলীল এ মর্মে যে, স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হয় না। এ অভিমতের সমর্থন ওইসব হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যেগুলো মুসলিম, বোখারী ও নাসা'ঈ ইত্যাদিতেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়শা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা বলেন, "আমি হুযূরের সামনে শায়িত ছিলাম, আর তিনি তাহাজ্জুদ (নামায) সম্পন্ন করেছিলেন। যখন তিনি সাজদাহ্ করতেন, তখন আমার

وَابْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ، بِمَسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ قَرَّبْتُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ اَحْمَدُ

(কারণ) ইব্‌রাহীম তায়মী হযরত আয়শা হতে (হাদীস) শোনেন নি।[৩৭]

২৯৯।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাঁধের গোশ্‌ত আহার করলেন। অতঃপর আপন হাত ওই চট দ্বারা মুছে ফেললেন, যা তাঁর নিচে ছিলো। তারপর দাঁড়ালেন আর নামায পড়লেন।[৩৮] [আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ]

৩০০।। হযরত উম্মে সালমাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে পাঁজরের ভুনা গোশ্‌ত পেশ করলাম। হুযূর তা থেকে আহার করলেন। অতঃপর নামাযের দিকে দাঁড়ালেন এবং ওযূ করলেন না।[৩৯] [আহমদ]

শরীরে তাঁর হাত লাগাতেন, আর আমি আমার পা দু'টি গুটিয়ে নিতাম। তিনি সাজদাহ্ করতেন। সাজদা করার পর পুনরায় আমি পা প্রসারিত করতাম।" (বোখারী, মুসলিম)

তিনি আরো বলেন, "এক রাতে আমি হুযূরকে বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে হাত দ্বারা খুঁজতে লাগলাম। আমার হাত তাঁর কদম শরীফের সাথে গিয়ে লাগলো, যা দাঁড়ানো ছিলো আর তিনি সাজদারত ছিলেন।" (নাসাঈ)

তিনি আরো বলেন, "একদা হুযূর দীর্ঘ সাজদা করলেন। আমি মনে করলাম– তাঁর ওফাত হয়ে গেছে। আমি তাঁর পা মোবারকের বৃদ্ধাঙ্গুলী ধরে নাড়া দিলাম। (বায়হাক্বী)

এ সবক'টি হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, স্ত্রীকে স্পর্শ করার দরুন ওযূ ভঙ্গ হয় না।

৩৬. কেননা, এ 'সনদ' (সূত্র)-এর মধ্যে হাবীব ইবনে সাবিত, হযরত ওরওয়া হয়ে হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা হতে বর্ণনা করেন। হযরত 'ওরওয়া হযরত আয়শা থেকে হাদীস শুনা প্রমাণিত; বরং তিনি তাঁর ছাত্র ছিলেন। কিন্তু হযরত হাবীব হযরত ওরওয়া থেকে হাদীস শুনা সহীহ বা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তাই এ হাদীস 'মুরসাল'। ইমাম তিরমিযী اَصْحَابُنَا (আমাদের সহপাঠি-গণের মতে) এ জন্য বলেছেন যে, 'মুরসাল হাদীস' শাফে'ঈ ইমামগণের মতে দলীল নয়। কিন্তু আমাদের হানাফী মাযহাবের মতে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

৩৭. আপত্তির সারকথা হলো এ যে, এ হাদীস হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা হতে দু'টি সনদে বর্ণিতঃ এক. হযরত আয়েশা হতে ওরওয়া এবং দুই. হযরত আয়েশা হতে ইব্‌রাহীম আত্-তায়মী বর্ণনা করেন। আর উভয় সনদই 'মুরসাল'। কেননা, ইব্‌রাহীম তায়মীও হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা থেকে সরাসরি হাদীস শুনেন নি। কিন্তু এ অভিযোগ ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর উপর বর্তায় না। কেননা, তাঁর মতে, 'মুরসাল হাদীস' দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং শাফে'ঈগণ নিজেদের উসূল (নীতিমালা) দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে কীভাবে অভিযোগ করতে পারেন?

৩৮. হুযূরের নিকট ছাগলের কাঁধের গোশ্‌ত অর্থাৎ সামনের পায়ের গোশ্‌ত পছন্দনীয় ছিলো। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হুযূর গোশ্‌ত আহার করে হাতও ধৌত করেন নি; শুধু হাত মুবারক মুছে নিয়েছেন।

৩৯. না শরীয়তসম্মত (প্রসিদ্ধ) ওযূ করলেন, না আভিধানিক ওযূ অর্থাৎ হাত ধৌত করেছেন; বরং হাতও মুছলেন না, যাতে বুঝা যায় যে, আহারের পর হাত ধোঁয়া ও মোছা ফরয কিংবা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাত, যা করলে সাওয়াব রয়েছে; না করলে গুনাহ্ নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ اَبِیْ رَافِعٍ قَالَ اَشْهَدُ لَقَدْ كُنْتُ اَشْوِیْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلّٰی وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْهُ قَالَ اُهْدِيَتْ لَهٗ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِی الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا هٰذَا يَا اَبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاةٌ اُهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَطَبَخْتُهَا فِی الْقِدْرِ قَالَ نَاوِلْنِیْ الذِّرَاعَ يَا اَبَا رَافِعٍ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِی الذِّرَاعَ الْاٰخَرَ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ الْاٰخَرَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِیْ الذِّرَاعَ الْاٰخَرَ فَقَالَ لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَمَا اَنَّكَ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِیْ ذِرَاعًا

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৩০১।। হযরত আবূ রাফি' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ছাগলের পেট ভুনে দিতাম।[৪০] (তিনি তা আহার করতেন)। অতঃপর হুযুর নামায পড়তেন এবং ওযূ করতেন না। (মুসলিম)

৩০২।। তাঁরই (হযরত আবূ রাফি') হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) তাঁর নিকট একটি ছাগল হাদিয়া দেওয়া হলো। তিনি তা ডেক্‌সীতে রাখলেন। তারপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। আর এরশাদ করলেন, "হে আবূ রাফি'! এটা কি?" তিনি আরয করলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা একটা ছাগল, যা আমাদেরকে হাদিয়া (উপঢৌকন) দেওয়া হয়েছে। তারপর আমি ডেকসীতে তা রান্না করে নিয়েছি।" হুযুর এরশাদ করলেন, "হে আবূ রাফি'! আমাকে সেটার সামনের একটা পা দাও[৪১]। আমি সামনের পায়ের গোশ্‌ত দিলাম। তারপর এরশাদ করলেন, "অন্য ডানাও দাও।" আমি দ্বিতীয় ডানাও পেশ করলাম।[৪২] এরশাদ করলেন, "হে আবূ রাফি'! আরো একখানা ডানা দাও।" আবূ রাফি' বললেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ্! একটি ছাগলের ডানা মাত্র দু'টিই হয়ে থাকে। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, "যদি তুমি নীরব থাকতে, তাহলে তুমি আমাকে ডানার পর ডানা দিতেই থাকতে,

৪০. অর্থাৎ পেটের বস্তুসমূহ। যেমন– হৃৎপিণ্ড, কলিজা, তিল্লি ইত্যাদি। কিন্তু 'মুত্রাশয়' হুযূরের অপছন্দনীয় ছিলো। কেনলা, সেটার সম্পর্ক প্রস্রাবের সাথে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছাগলের ডানা পছন্দনীয় ছিলো। কেননা, তা তাড়াতাড়ি রান্নাও হয় এবং সুস্বাদুও। তাতে রগও থাকে না।

৪১. বুঝা গেলো যে, স্বীয় গোলাম কিংবা বন্ধুদের থেকে কোন জিনিষ বিনা লৌকিকতায় চাওয়া না-জায়েয নয়। যা চাইতে নিষেধ করা হয়েছে, তা হলো অপমানজনক চাওয়া।

৪২. খুব সম্ভব হুযূরের সাথে সম্মানিত সাহাবীদের দলও ছিল। আর সকলকে নিয়ে এ গোশ্‌ত আহার করা হয়েছিলো।

فَذِرَاعًا مَا سَكَتَّ ثُمَّ دَعَا بِمَآءٍ فَتَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ اَطْرَافَ اَصَابِعِهٖ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ عَادَ اِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَارِدًا فَاَكَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَمُسَّ مَآءً. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَرَوَاهُ الدَّارِمِىُّ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ دَعَا بِمَآءٍ اِلٰى اٰخِرِهٖ.

وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاُبَىٌّ وَاَبُوْ طَلْحَةَ جُلُوْسًا فَاَكَلْنَا لَحْمًا وَّ خُبْزًا ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوْءٍ فَقَالَا لِمَ تَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ لِهٰذَا الطَّعَامِ الَّذِىْ اَكَلْنَا فَقَالَا

যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নীরব থাকতে।"[৪৩] তারপর তিনি পানি তলব করলেন। অতঃপর মুখে কুল্লি করলেন এবং আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ ধৌত করলেন।[৪৪] অতঃপর দাঁড়ালেন। তখন নামায পড়লেন। তারপর তিনি পুনরায় তাশরীফ আনলেন। তখন তাদের নিকট ঠাণ্ডা গোশ্‌ত পেলেন। অতঃপর তিনি তা আহার করলেন। তারপর মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। নামায পড়লেন। (অথচ) পানি স্পর্শই করলেন না।[৪৫] এটা ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। আর এ হাদীস ইমাম দারেমী হযরত আবূ ওবায়দা হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি ثُمَّ دَعَا الخ (তারপর তিনি পানি তলব করলেন শেষ পর্যন্ত)" অংশটুকু উল্লেখ করেন নি।

৩০৩।। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি, উবাই এবং আবূ ত্বাল্‌হা[৪৬] (এক স্থানে) উপবিষ্ট ছিলাম। গোশ্‌ত ও রুটি খেলাম। তারপর আমি ওযূর জন্য পানি তলব করলাম।[৪৭] তখন তাঁরা দু'জনই বললেন, "কেন ওযূ করছো?" আমি (উত্তরে) বললাম, "এ-ই খানার কারণে, যা আমরা খেলাম!" তাঁরা বললেন,

৪৩. অর্থাৎ আমি তলব কাতে থাকতাম, আর তুমি দিতে থাকতে। এ ডেক্‌সী থেকে শত শত বাহু বের হতে থাকতো।

এ থেকে দু'টি মাস্‌'আলা বুঝা গেলো ঃ এক. হুযূরের এরশাদ মতো প্রত্যেক প্রকারের বস্তু অদৃশ্য জগত থেকে ব্যবস্থা হয়ে যায়। হযরত তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র ঘরে তিন-চার সের গোশ্‌ত দিয়ে হুযূর শতশত লোককে আহার করিয়েছেন। গোশ্‌তের টুকরা, ঝোলের পানি ও মসল্লা অদৃশ্যজগত থেকেই আসছিলো। দুই. বুযুর্গদের সামনে এমন পরিস্থিতিতে অস্বীকার কিংবা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করা চাই; বরং নির্দ্বিধায় তাঁদের নির্দেশ অনুসারে আমল করা উচিত।

যুক্তি প্রদর্শন ও অস্বীকারের দরুন ফয়য বন্ধ হয়ে যায়।

৪৪. অর্থাৎ পূর্ণ হাত তো দূরের কথা, পুরো আঙ্গুলগুলোও ধৌত করেন নি- বৈধতা প্রকাশের জন্য। নতুবা আহারের পূর্বে ও পরে উভয় হাত ধোয়া সুন্নাত।

৪৫. খুব সম্ভব প্রথমবার নফল নামায পড়েছেন আর দ্বিতীয়বার ফরয। আল্লাহ্‌ই সর্বাধিক জ্ঞাতা।

৪৬. তাঁর নাম যায়দ ইবনে সাহল। উপনাম আবূ তালহা। তিনি আনসারী ও নাজ্জারী। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর সৎপিতা। ৭৭ বছর বয়স পান। ৩১ হিজরীতে সমুদ্র পথে সফর করেন। আরব দ্বীপে ওফাত পান। ৯ দিন পর ওখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। বায়'আত-ই আক্বাবাহ্ এবং বদর সহ সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

৪৭. কেননা, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হু আহারের ওযূ'র হাদীসে ওযূর শরীয়তের পারিভাষিক অর্থ মনে করেছিলেন। এ থেকে বুঝা গেলো যে, মুহাদ্দিস ফক্বীহ'র অভিমত ব্যতীত হাদীস অনুসারে আমল করবে না। এ

اَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهٗ وَجَسُّهَا بِيَدِهٖ مِنَ الْمُلَامَسَةِ وَمَنْ قَبَّلَ اِمْرَاَتَهٗ وَجَسَّهَا بِيَدِهٖ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ.

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ يَقُوْلُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ اِمْرَاَتَهُ الْوُضُوْءُ رَوَاهُ مَالِكٌ

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّأُوْا مِنْهَا

"তুমি কি হালাল জিনিস খেয়েও ওযূ করে থাকো?"[৪৮] (অথচ) এর কারণে তিনি তো ওযূ করেন নি, যিনি তোমার চেয়ে উত্তম।" [আহমদ]

৩০৪।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, পুরুষ আপন স্ত্রীকে চুম্বন করা আর তাকে নিজ হাত দ্বারা স্পর্শ করা হলো 'মুলামাসাত' (পরস্পর স্পর্শ করা)। সুতরাং যে আপন স্ত্রীকে চুম্বন করবে অথবা স্বীয় হাত দ্বারা স্পর্শ করবে, তার উপর ওযূ করা আবশ্যক।[৪৯] [মালিক, শাফে'ঈ]

৩০৫।। হযরত ইবনে মাস্'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, পুরুষ আপন স্ত্রীকে চুম্বন করার দরুন ওযূ করতে হবে।[৫০] [মালিক]

৩০৬।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা হতে বর্ণিত, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেছেন, চুম্বন 'লাম্‌স'-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, সেটার কারণে ওযূ করো। (অর্থাৎ চুম্বন করলে ওযূ করো)[৫১]

কারণে ইমাম তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিস মুক্বাল্লিদ (মাযহাবের ইমামের অনুসারী) ছিলেন।

৪৮. অর্থাৎ ওযূ হচ্ছে পবিত্রতা, তা কোন অপবিত্র বস্তুর কারণে করা উচিত। আর এ খাদ্য না হারাম, না অপবিত্র। অতএব ওযূ কী জন্য? এ থেকে বুঝা গেলো যে, স্ত্রীকে স্পর্শ করার কারণে ওযূ ভঙ্গ হবে না। কারণ, সেও না হারাম, না অপবিত্র।

৪৯. সূরা নিসা ও সূরা মা'ইদার আয়াত শরীফ–

اَوْجَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

অর্থাৎ "অথবা তোমাদের কেউ শৌচকর্ম করে আসো অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করো এবং এ সমস্ত অবস্থায় পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।" [৫:৬; তরজমা-ই কান্‌যুল ঈমান]

ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মতে এখানে (لمس)-এর অর্থ শুধু স্ত্রীর গায়ে হাত লাগানো। এ কারণে তাঁর মতে, ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামদের মতে (لمس) দ্বারা সহবাস করা বুঝায়, যার কারণে গোসল ওয়াজিব হয়। আর এ-ও হতে পারে যে, এর অর্থ বিবস্ত্র অবস্থায় আলিঙ্গন করা, যার কারণে ওযূ ওয়াজিব হয়। হযরত ইবনে উমর স্পর্শ ও চুম্বনকে 'লামস' (لمس) বলছেন। সুতরাং এ হাদীস ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির দলীল। এটার জবাব ইন্‌শা-আল্লাহ্ সামনে দিচ্ছি।

৫০. অর্থাৎ হযরত ইবনে মাস্'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হুর অভিমতও এটাই যে, স্ত্রীকে চুম্বন করা ও স্পর্শ করার দরুন ওযূ করতে হয়। এটার জবাব সামনে আসছে।

৫১. স্মর্তব্য যে, এ তিন বুযুর্গের নিজস্ব অভিমত এ যে, স্ত্রীকে

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ

৩০৭।। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি হযরত তামীম দারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু[৫২] হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক প্রবহমান রক্তের কারণে ওযূ করতে হবে।[৫৩]

উপরোক্ত দু'টি হাদীস 'দারে কুত্বনী' বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয বলেন, তিনি হাদীসগুলো শুনেন নি-

চুম্বন ও স্পর্শ করলে ওযূ করতে হবে। এ সম্পর্কে কোন মারফূ' হাদীস নেই; বরং মারফূ' হাদীস এ অভিমতের বিপরীত। সুতরাং দার-ই কুত্বনী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়শা সিদ্দীক্বাহ্-র নিকট যখন হযরত ইবনে ওমরের এ উক্তি পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, চুম্বনের কারণে ওযূ কীভাবে ভঙ্গ হতে পারে, অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চুম্বন করতেন আর ওযূ করা ব্যতীত নামায পড়ে নিতেন।

অনুরূপ, ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনে আবী শায়বাহ্, নাসা'ঈ, ইবনে আসাকির এবং মুআত্তা-ই ইমাম মুহাম্মদ ইত্যাদিতে হযরত আয়শা সিদ্দীক্বাহ্ থেকে সামান্য ভিন্নতা সহকারে বর্ণনাদি রয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন কোন কোন স্ত্রীকে চুম্বন করতেন, অতঃপর ওযূ করা ছাড়া নামায পড়ে নিতেন। তেমনিভাবে মুসনাদ-ই আবূ আব্দুল্লাহ্ গ্রন্থে হযরত হাফ্সাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওযূ করে কোন কোন স্ত্রীকে চুম্বন করতেন। অতঃপর পুনরায় ওযূ করতেন না। তাছাড়া এ চুম্বন দ্বারা যখন স্ত্রীর ওযূ ভঙ্গ হয় না, তখন স্বামীর ওযূও না যাওয়া যুক্তিযুক্ত। 'মুবাশারাত' (বিবস্ত্র অবস্থায় উভয়ের গোপনাঙ্গ একত্রিত হওয়া) স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ওযূ ভেঙ্গে দেয় আর সহবাস উভয়ের গোসল ভঙ্গ করে (গোসল ওয়াজিব করে) দেয়। সুতরাং কীভাবে হতে পারে যে, চুম্বন ও স্পর্শ পুরুষের ওযূ তো ভেঙ্গে দেয়, কিন্তু স্ত্রীর ওযূ ভেঙ্গে দেয় না? তাই এসব মাওকূফ হাদীসের অর্থ এ যে, স্বামীকে স্পর্শ করে বা চুম্বন করে ওযূ করা মুস্তাহাব। কেননা, অভিধানগতভাবে 'লামস' (لَمْس)-এর মধ্যে এ অর্থও রয়েছে। যদিও ক্বোরআন মজীদে এ অর্থ নেওয়া হয় না। অথবা ওই সব বুযুর্গের কাছে আমাদের পেশকৃত হাদীসগুলো পৌঁছে নি। সুতরাং মারফূ' (مرفوع) হাদীসের মোকাবেলায় মাওকূফ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। যথাসম্ভব উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। যদি সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব না হয়, তবে মাওকূফ' হাদীস ছেড়ে দিতে হবে। 'স্পর্শ করা' সম্পর্কিত হাদীস আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হচ্ছে- হযরত আয়শা সিদ্দীক্বাহ্ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পা শরীফ নামাযরত অবস্থায় স্পর্শ করেছেন আর নামায পড়া অবস্থায়ই হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহকে হুযূর স্পর্শ করেছেন। আর হুযূর উভয় অবস্থায় নামায পড়তে থাকেন। অতএব, সর্বাস্থায় হানাফী মাযহাব অত্যন্ত শক্তিশালী। ওই দুর্বলতার কারণে ইমাম শাফে'ঈ শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে, পর-নারী স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হয়, আপন স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ভঙ্গ হয় না।

'মুসন্নাফ-ই ইমাম আবূ হানীফা'য় আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, "চুম্বনে ওযূ নেই।" শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'আশি''আতুল লুম'আত' গ্রন্থে বলেছেন, মিশকাতের এ তিন মাওকূফ হাদীস সনদগত দিক দিয়ে সহীহ্ নয়।

৫২. তাঁর নাম তামীম ইবনে আওস অথবা তামীম ইবনে খা-রিজাহ্। 'দা-র' তাঁর কোন প্রপিতার নাম; যাঁর কুনিয়াত (উপনাম) ছিলো 'আবূ রুক্বিয়্যাহ'। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। ৯ম হিজরীতে ঈমান আনেন। রাতে এক রাক'আতে পবিত্র ক্বোরআন খতম করতেন। তিনিই সর্বপ্রথম মসজিদ-ই নবভী শরীফে আলোকসজ্জা করেন। মদীনা-ই মুনাওয়ারায় বসবাস করতেন। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদতের পর সিরিয়ায় চলে যান। সেখানে ওফাত পান। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকাম একজন তাবে'ঈ। তাঁর কুনিয়াত হলো 'আবূ হাফ্স'। তাঁর মাতার নাম লায়লা বিনতে ওমর ইবনে খাত্তাব। 'কুনিয়াত' উম্মে 'আসিম। সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের খিলাফতের পর তিনি

تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَلَا رَاٰهُ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُوْلَانِ.

بَابُ اٰدَابِ الْخَلَاءِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا

হযরত তামীম দারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে এবং তাঁকে দেখেনওনি। আর (এ হাদীসের অপর বর্ণনাকারী) ইয়াযীদ ইবনে খালিদ ও ইয়াযীদ ইবনে মুহাম্মদ দু'জনই অপরিচিত লোক।[৫৪]

অধ্যায় ঃ শৌচকর্মের নিয়মাবলী[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৩০৮।। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী[২] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন

খলীফা হন। ৯৯ হিজরীতে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আর ১০১ হিজরী রজব মাসে দিয়ার-ই সাম'আন-এ হামসের সন্নিকটে ইন্তিকাল করেন। ৪০ বছর বয়স পান। ২ বছর ৫ মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক তাঁর বিবাহধীন ছিলেন। তাঁর মতো ইবাদতপরায়ণ, দুনিয়াবিমুখ, খোদার ভয়ে ক্রন্দনকারী লোক উম্মতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে খুবই বিরল। তিনি ন্যায়বিচার ও ইনসাফে হযরত ওমর ফারূক্ব-এর নমুনা ছিলেন। ইয়াযীদ প্রমুখের প্রবর্তিত বিদ'আতগুলোর তিনি মূলোৎপাটন করেছেন।

৫৩. অর্থাৎ যে রক্ত প্রবাহিত হয়ে শরীরের ওই অংশের দিকে চলে আসে, যা ধৌত করা গোসলের মধ্যে ফরয, তা ওযূ ভঙ্গকারী। এ হাদীস ইমাম-ই আ'যমের দলীল এ মর্মে যে, প্রবহমান রক্ত ওযূ ভঙ্গ করে দেয়। ইমাম শাফে'ঈ এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

৫৪. গ্রন্থকার এ হাদীসের উপর দু'টি আপত্তি উত্থাপন করেছেন ঃ

এক. এ হাদীস 'মুরসাল'। অর্থাৎ মধ্যখানে একজন বর্ণনাকারী ছুটে গেছে। দুই. এ হাদীসের সনদে দু'জন বর্ণনাকারী 'মাজহুল' বা অপরিচিত রয়েছে। কিন্তু উল্লেখ্য যে, আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামদের মতে মুরসাল হাদীস আমলযোগ্য। তদুপরি, হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের এ মাস্'আলার ভিত্তি শুধু এ হাদীসই নয়; বরং বোখারী, ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী, ত্বাবরানী, মুআত্তা-ই ইমাম মালিক ও আবূ দাঊদ ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত বহু হাদীসও। সুতরাং বোখারী শরীফে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা বিনতে আবূ হোবায়শকে বলেছেন, যখন তোমার মাসিক ঋতুস্রাবের মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাবে, তখন ইস্তিহাযাহ্ (রোগ বিশেষ)-এর সময় প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন নতুন ওযূ করবে। যদি রক্ত ওযূ ভঙ্গ না করতো তবে ইসতিহাযাহ্ সম্পন্না মহিলাকে কেন ওযরসম্পন্না সাব্যস্ত করা হয়েছে? তাছাড়া, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্ ইত্যাদিতে রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি নামাযের মধ্যে কারো নাক থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে সে যেন নামায ছেড়ে দিয়ে ওযূ করে। অতঃপর নামায পূর্ণ করবে। এ মাস্'আলার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'জা'আল হক্ব' দ্বিতীয় খণ্ডে দেখুন।

স্মর্তব্য যে, ক্বোরআনের বিধান মতে, প্রবাহিত রক্ত অপবিত্র। আর অপবিত্র বস্তু বের হলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। এমন কোন সহীহ মারফূ' হাদীস আমি অধমের চোখে পড়েনি, যাতে এরশাদ হয়েছে যে, রক্ত ওযূ ভঙ্গকারী নয়।

****

১. 'খালা-' (خلاء) অভিধানে খালি জায়গাকে বলা হয়। আর পরিভাষায় ইস্তিনজা বা শৌচকর্ম সম্পন্ন করাকে বলা হয়। যেহেতু এ কাজ একাকীত্বে সম্পন্ন করা হয়, সেহেতু সেটাকে খালা- (خلاء) বলা হয়।

২. তাঁর নাম খালিদ ইবনে যায়দ। তিনি আনসারী খাযরাজী। বায়'আত-ই আক্বাবায় উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত যুদ্ধে হুযূরের সাথে ছিলেন। হুযূর-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَ لاَتَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحِيُّ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِى الصَّحْرَاءِ وَاَمَّا فِى الْبُنْيَانِ فَلاَ بَأْسَ لِمَا رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِرْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِىْ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِىْ حَاجَتَهٗ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

তোমরা পায়খানায় যাবে, তখন ক্বেবলার দিকে মুখ কারো না এবং পিঠও দিও না; কিন্তু হয়তো পূর্বদিকে হয়ে যাও, নতুবা পশ্চিম দিকে।[৩] (বোখারী, মুসলিম) শায়খ ইমাম মুহিউস সুন্নাহ রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, এ হাদীস ময়দানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু বেড়া বা দেওয়াল ঘেরা জায়গায় কোন ক্ষতি নেই। কেননা, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হাফ্সার ঘরের ছাদে কোন কাজে উঠেছিলাম। তখন আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি ক্বেবলাকে পিঠ দিয়ে সিরিয়ার দিকে মুখ করে হাজত পূরণ করছেন।[৪] [বোখারী, মুসলিম]

ওয়াসাল্লাম হিজরতের দিন সর্বপ্রথম তাঁরই ঘরে অবস্থান করেন। সাহাবা-ই কেরামের পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় হযরত আলী মুরতাদ্বার সাথে সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়ার নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে যে সব যুদ্ধ হয়েছিলো, সেগুলোতে তিনি বীরদর্পে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কনস্টান্টিনোপোল-এর উপর আক্রমণের সময় তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আর তখন ওসীয়ৎ করলেন যেন, এ জিহাদে তাঁর লাশ মুজাহিদদের সাথে রাখা হয় আর কনস্টান্টিনোপোল বিজয় হয়ে গেলে মুজাহিদদের পায়ের নিচে তাঁকে দাফন করা হয়। সুতরাং তাঁকে কনসটান্টিনোপোলের নগর-প্রাচীরের নিচে দাফন করা হয়। তাঁর কবর বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও সর্বসাধারণের যিয়ারতস্থল। রোগীরা তাঁর কবরের মাটি থেকে নিরাময় লাভ করে। [মিরক্বাত ও ইক্মাল]

৩. অর্থাৎ পায়খানা-প্রস্রাব করার সময় ক্বেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা হারাম। যেহেতু মদীনা-ই মুনাওয়ারায় ক্বেবলা দক্ষিণ দিকে আর সিরিয়া অর্থাৎ বায়তুল মুক্বাদ্দাস উত্তর দিকে, সেহেতু সেখানকার অবস্থানের দিক লক্ষ্য করে এরশাদ হয়েছে যে, "পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করে নাও।" আর যেহেতু আমাদের এখানে ক্বেবলা পশ্চিম দিকে, সেহেতু আমরা দক্ষিণ কিংবা উত্তর দিকে মুখ করবো।

স্মর্তব্য যে, এ হাদীসের মধ্যে ময়দান বা প্রাচীর ঘেরা স্থানের কোন শর্তারোপ নেই। তাই যে কোন অবস্থায় কা'বার দিকে মুখ কিংবা পিঠ দিয়ে ইস্তিনজাহ করা হারাম। আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামদের অভিমত এটাই।

৪. ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির এ অভিমতের প্রসঙ্গে কয়েক ধরনের আলোচনার অবকাশ রয়েছে ঃ

এক. নিষেধাজ্ঞার হাদীসের মধ্যে ময়দান বা আবাদীর কোন শর্তারোপ নেই। তাই নিঃশর্ত (مطلق)-কে স্বীয় শর্তহীন অর্থের উপর রাখাই আবশ্যক। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার এ হাদীস হুযূরের একটি বরকতময় কর্মের বর্ণনা দিচ্ছে। আর যখন কর্ম (فعل) ও বাণী (قول)-এর মধ্যে, তেমিনভাবে নিষেধাজ্ঞা ও বৈধতার মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে বলে মনে হবে, তখন 'হাদীস-ই ক্বাওলী' (বাণীগত হাদীস)-কে হাদীস-ই ফে'লী (কর্মগত হাদীস)-এর উপর এবং নিষেধাজ্ঞাকে বৈধতার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। কেননা, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কতেক বরকতময় কর্ম তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্গত হয়ে থাকে।

দুই. হয়তো হুযূরের এ বরকতময় কর্ম নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার হবে। তাই এটা 'মান্সূখ' (রহিত) আর নিষেধাজ্ঞার হাদীস 'নাসিখ' (রহিতকারী)।

তিন. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা

وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا يَعْنِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَّسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَآئِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ نَّسْتَنْجِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَّسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ

৩০৯।। হযরত সাল্‌মান (ফারেসী)[৫] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যেন আমরা পায়খানা বা প্রস্রাবের সময় ক্বেবলার দিকে মুখ না করি, ডান হাতে ইস্তেঞ্জা (পবিত্রতা অর্জন) না করি, তিনটির কম সংখ্যক পাথর দ্বারা ইস্তেঞ্জা না করি[৬] এবং গোবর কিংবা হাড় দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা না করি।[৭] [মুসলিম]

৩১০।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী-আ'উযু

আন্‌হুমা দেখতে ভুল করেছেন। হয়তো হুযূর ক্বেবলার দিক থেকে সামান্য সরে বসেছিলেন, যা তাড়াহুড়ার কারণে হযরত ইবনে ওমর দেখতে পান নি। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে মানুষ তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে ফিরে যায়; ভাল করে মনোযোগ দিয়ে দেখে না।

চার. সাহাবা-ই কেরামের এ মাযহাব ছিলো যে, আবাদীতে (প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে)ও কা'বার দিকে পায়খানা-প্রস্রাব না করা। যেমন, মুসলিম, আবূ দাঊদ, আহমদ, বোখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্, দারেমী ও তিরমিযী হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী থেকে বর্ণনা করেন, "যখন আমরা সিরিয়ায় পৌঁছুলাম এবং আমরা সেখানকার পায়খানাগুলোকে ক্বেবলামুখী দেখতে পাই, তখন আমরা ইস্‌তিগফার পড়ছিলাম এবং তাতে ক্বেবলার দিক হতে ঘুরে বসতাম।" ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীস বেশী উত্তম; বেশী সহীহ্।

পাঁচ. ক্বেবলার প্রতি আদব প্রদর্শন করা আবাদী ও ময়দান সর্বত্র সমান। ক্বেবলার দিকে থু থু নিক্ষেপ করা বা পা প্রসারিত করা ময়দানেও হারাম এবং বসতঘরেও। তাই পায়খানা-প্রস্রাবের বেলায় উভয়ের বিধান সমান হওয়া উচিত।

৫. তাঁর কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ্। তিনি ইরানের ইস্‌ফাহান শহরস্থ 'হা-জিন' নামক বস্তির অধিবাসী ছিলেন। সত্য-দ্বীনের তালাশে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন; চৌদ্দ স্থানে বিক্রি হন। শেষ পর্যন্ত তিনি যা তালাশ করে ফিরছিলেন তা পেয়ে যান। তিনি এক পর্যায়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যান। ৩৫০ বছর বয়স পান। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর তাবে'ঈ এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ৫৩ হিজরীতে 'মাদা-ইন' নামক স্থানে ওফাত পান। (মিরক্বাত) কতেক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর হাওয়ারীদের থেকে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্দরতম গুণাবলী শুনেন। তখন হতে তিনি হুযূরের তালাশে বের হন।

৬. স্মর্তব্য যে, ক্বেবলার দিকে মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা করা মাকরূহ-ই তাহরীমী। ডান হাতে ছোট বা বড় শৌচকর্ম সম্পন্ন করা মাকরূহ-ই তান্‌যীহী। সাধারণ অবস্থায় তিনটা ঢিলা বড় শৌচকর্মের জন্য মুস্তাহাব। যদি এর চেয়ে কম বা বেশীতে পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব হয়ে যায়, তবে করে নেবে। এটাই হানাফী মাযহাব। ইমাম শাফে'ঈ'র মতে তিনটা ঢিলা নেওয়া ওয়াজিব।

৭. কেননা, হাড় জিন্‌দের খাদ্য আর গোবর হলো তাদের পশুদের খাদ্য। তদুপরি, গোবর স্বয়ং নাপাক। সুতরাং তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জিত হবে। হাড় কখনো ধারালো, কখনো চর্বিযুক্ত হয়। চর্বিযুক্ত হওয়ার কারণে পবিত্রতা অর্জন

بِکَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِیْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَفِیْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِیْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِیْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা-ইস' (হে আল্লাহ্! আমি দুষ্ট নর জিন্ ও নারী জিন্‌দের থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।[৮] [বোখারী, মুসলিম]

৩১১।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন। তখন এরশাদ করলেন, এ দু'জন কবরবাসীকে আযাব (শাস্তি) দেওয়া হচ্ছে। আর কোন বড় কিছুর জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তাদের মধ্যে একজনতো প্রস্রাব থেকে সতর্ক থাকতো না, ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় আছে, প্রস্রাব থেকে বেঁচে থাকতো না। আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াতো। অতঃপর তিনি একটি তাজা খেজুরের ডালি নিলেন এবং সেটাকে ছিঁড়ে দু'ভাগ করলেন। তারপর প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। লোকেরা আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি এটা কেন করলেন?" হুযূর এরশাদ করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা শুকাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আযাব লঘু করা হবে– এ আশায়।"[৯] [বোখারী, মুসলিম]

হয় না। আর ধারালো হওয়ার কারণে জখম বা ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

৮. এ দো'আ শৌচাগারে (পায়খানায়) প্রবেশ করার পূর্বে পড়ে নেবে। কেননা, নাপাক স্থানে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া নিষিদ্ধ। আর বিবস্ত্র হওয়ার পর তো কথা বলাই নিষিদ্ধ। যেহেতু পায়খানায় দুষ্ট ও অপবিত্র জিনেরা থাকে, সেহেতু এ দো'আ পড়া উচিত। 'খাবীস' ও 'খাবা-ইস'-এর অনেক অর্থ রয়েছে। এখানে ওই অর্থই উপযোগী, যা আমি (অনুবাদে) উল্লেখ করেছি।

৯. এ হাদীস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক বিষয়বস্তুর ধারক। এ থেকে অসংখ্য মাস্'আলা অনুমিত হতে পারে। তন্মধ্যে কতেক নিম্নরূপঃ

এক. কোন কিছু হুযূরের বরকতময় দৃষ্টির আড়ালে নেই। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু তাঁর নিকট সুস্পষ্ট। যেমন আযাব হচ্ছে কবরের ভেতর। হুযূর কবরের উপর তাশরীফ রাখছেন, অথচ আযাব দেখছেন।

দুই. হুযূর সৃষ্টিকুলের প্রত্যেক প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কাজ দেখছেন। যেমন– কে কি করছে, আর সে কি করতো তিনি বলে দিয়েছেন– একজন চোগলখুরী করতো আর অন্যজন প্রস্রাব থেকে বাঁচতো না, অথবা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতো না।

তিন. সগীরাহ গুনাহ্‌র কারণেও হাশরে ও কবরে, আযাব হতে পারে। দেখুন, আলোচ্য হাদীসের পবিত্র ভাষায়, চুগলী ইত্যাদি জটিল-কঠিন কোন বিষয় নয়, কিন্তু তজ্জন্য আযাব হচ্ছে।★

★ আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী তাঁর 'কিতাবুল কাবা-ইর'-এ চোগলখুরীকে কবীরাগুনাহ্ হিসেবে গণ্য করেছেন।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْفِىْ ظِلِّهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِىْ

৩১২।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা দু'টি অভিসম্পাতের কাজ হতে বেঁচে থাকো।[১০] সাহাবীগণ আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্। অভিসম্পাতের কাজ দু'টি কি কি?" এরশাদ করলেন, "তা হলো যে মানুষের চলার পথ কিংবা ছায়ার স্থলে পায়খানা করে।[১১] [মুসলিম]

৩১৩।। হযরত আবূ ক্বাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[১২] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ পান করে, তবে সে যেন নিঃশ্বাস ত্যাগ না করে–

চার. হুযূর প্রত্যেক গুনাহ্‌র চিকিৎসা (প্রতিকার)ও জানেন। দেখুন, কবরের উপর খেজুরের শাখা লাগালেন, যাতে আযাব হাল্কা হয়।

পাঁচ. কবরের উপর সবুজ উদ্ভিদ, ফুল ও ফুলের মালা ইত্যাদি দেওয়া সুন্নাত। এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ওইগুলোর তাসবীহ্ মৃতদের প্রশান্তির কারণ হয়।

ছয়. কবরের পাশে পবিত্র ক্বোরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে হাফেয নিয়োগ করা অত্যন্ত উত্তম কাজ। কারণ, যখন সবুজ উদ্ভিদের কারণে আযাব হাল্কা হয়, তখন মানুষের যিক্‌রের কারণে তা অবশ্যই হাল্কা হবে। আশি''আতুল লুম'আত প্রণেতা 'জামিউল উসূল' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত বুরায়দাহ্ সাহাবী ওসীয়ৎ করেছিলেন যেন তাঁর কবরে দু'টি তাজা খেজুরের ডালি স্থাপন করা হয়, যাতে নাজাত (মুক্তি) নসীব হয়।

সাত. যদিও প্রত্যেক শুষ্ক ও তাজা বস্তু তাসবীহ্ পড়ে থাকে, কিন্তু সবুজ ও তাজা উদ্ভিদের তাসবীহ দ্বারা মৃতদের আরাম বা প্রশান্তি লাভ হয়। তেমনিভাবে, বে-দ্বীনের পবিত্র ক্বোরআন তিলাওয়াতের কোন উপকার নেই। কারণ, সেটার মধ্যে কুফরের শুষ্কতা বিদ্যমান। আর মু'মিনের তিলাওয়াত উপকারী। কারণ, সেটার মধ্যে ঈমানের সজীবতা বিদ্যমান।

আট. গুনাহ্‌গারদের কবরে, সবুজ উদ্ভিদ আযাবকে হাল্কা করবে; কিন্তু বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবরে সবুজ উদ্ভিদ তাঁদের সাওয়াব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

নয়. হালাল প্রাণীর প্রস্রাব নাপাক, যা হতে সতর্ক থাকা ওয়াজিব। দেখুন, উটের রাখাল উটের প্রস্রাবের ছিট্‌কা থেকে নিজেকে রক্ষা না করার কারণে আযাবের শিকার হয়েছে।

দশ. 'শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত'র শর্তারোপ দ্বারা বুঝা যায় যে, এ প্রভাব হুযূরের বরকতময় হাতের সাথে খাস ছিলো না; আমরাও কবরের উপর সবুজ তাজা উদ্ভিদ স্থাপন করলে এ প্রভাব কার্যকর হবে।

এগার. আল্লাহ্‌র পুণ্যাত্মা বান্দা ওলী-বুযুর্গগণ কবরস্থানে কদম রাখার বরকতে সেখান থেকে আযাব উঠে যায়। অথবা কম হয়ে যায়। (মিরক্বাত)

১০. অর্থাৎ যে দু'টি কাজের কারণে ওই কর্ম-সম্পাদনকারীদেরকে লোকেরা ভৎর্সনা ও অভিসম্পাত করে থাকে, তা করা হতে বিরত থাকো।

১১. অর্থাৎ সাধারণত মুসলমাণগণ যে পথ দিয়ে যাতায়াত করেন সেখানে পায়খানা করো না। তেমনিভাবে, যে ছায়ায় লোকেরা গরমের সময় সাধারণত বসে ও শয়ন করে থাকে, সেখানেও করো না। কেননা, এতে মহান রবও অসন্তুষ্ট হন। লোকেরা মন্দ বলে। সুতরাং এ হাদীস ওই হাদীসের বিপরীত নয়, যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খেজুর বাগানে হাজত পূরণ করেছেন। কেননা, ওই জায়গা জনসাধারণের বিশ্রামের ছিলো না। 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, পানির ঘাটে এবং সাধারণ লোকের যাতায়াতের পথেও পায়খানা করবে না, আর কারো মালিকানাভুক্ত জমিতে মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকেও করবে না।

১২. তাঁর নাম হারিস ইবনে রিব'ঈ অথবা ইবনে নু'মান।

الْاِنَاءِ وَاِذَا اَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمُسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَاَحْمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ اِدَاوَةً مِّنْ مَّاءٍ وَّعَنَزَةً يَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

পান পাত্রে [১৩] আর যখন পায়খানায় যায় তখন যেন প্রস্রাবের স্থান ডান হাতে স্পর্শ না করে এবং না ডান হাতে শৌচকর্ম সম্পন্ন করে।[১৪] [বোখারী, মুসলিম]

৩১৪।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ওযূ করবে সে যেন নাকের ভেতর পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে নেয়, আর যে (ঢিলা দ্বারা) ইস্তিন্জা (শৌচকর্ম সম্পন্ন) করে সে যেন বিজোড় করে।[১৫] [বোখারী, মুসলিম]

৩১৫।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন তখন আমি ও অপর একজন বালক পানির পাত্র এবং একটি বর্শারূপী (লাঠি) নিয়ে যেতাম। তিনি পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করতেন।[১৬] [বোখারী, মুসলিম]

আনসারী ও যুফরী। তিনি বায়'আত-ই আক্বাবাহ্ ও সমস্ত যুদ্ধে সামিল হন। বদর কিংবা উহুদের যুদ্ধে তাঁর একটি চোখ বের হয়ে পড়েছিলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেটাকে যথাস্থানে স্থাপন করে থু থু শরীফ লাগিয়ে দেন। ফলে, তা অপর চোখ থেকে বেশী আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। তিনি হযরত আবূ সা'ঈদ খুদ্রী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বৈপিত্রেয় ভাই। ৭০ বছর বয়স পান। ৫৪ হিজরীতে মদিনা-ই মুনাওয়ারায় ওফাত পান।

১৩. বরং পানপাত্র মুখ থেকে পৃথক করে নিয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে, যাতে থু থু বা নাকের আবর্জনা পানিতে না পড়ে। তদুপরি, নিঃশ্বাসের মধ্যে পেটের ভিতরকার তাপ ও বিষাক্ত জীবাণু থাকে, যা পানির সাথে মিশে রোগ সৃষ্টি করে।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, চা ইত্যাদি গরম পানীয় ও খাদ্য বস্তুতে ফুঁক মারা নিষিদ্ধ।

১৪. কেননা, ডান হাত পানাহার ও তাসবীহ্-তাহ্লীল গণনা করার জন্য। তাই সেটাকে অপবিত্র কাজে ব্যবহার করো না। সূফীগণ বলেছেন যে, তেমনিভাবে জিহ্বা, চোখ ও কানকে গুনাহ্সমূহের কাজে ব্যবহার করো না। কারণ, এ সব অঙ্গ আল্লাহ্র যিক্র করা, ক্বোরআন শরীফ পড়া, দেখা ও শুনার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৫. বুঝা গেলো যে, ওযূর মধ্যে নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করা সুন্নাত। আর পায়খানা করার পর ঢিলা দ্বারা ইসতিন্জা করা ও বিজোড় ঢিলা নেওয়া সুন্নাত। পানি দ্বারা ইস্তিনজা (শৌচকর্ম সম্পন্ন) করা কখনো ফরয, কখনো ওয়াজিব, আবার কখনো সুন্নাত।

১৬. ওই অপরজন ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ অথবা আবূ হোরায়রা অথবা হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম, যাঁদের দায়িত্বে এ খিদমত নির্ধারিত ছিলো। পানি দ্বারা তো তিনি ঢিলাসমূহ ব্যবহার করার পর ইস্তিন্জা করতেন আর বর্শা দ্বারা হয়তো জমি থেকে ঢিলা বের করতেন, অথবা প্রস্রাবের জন্য জায়গা নরম করতেন। অথবা প্রস্রাবের পর ওযূ করতেন, তারপর ওই বর্শা বা লাঠিকে সুত্রাহ্ (অন্তরাল) বানিয়ে দু'রাক্'আত ওযূর নফল নামায সম্পন্ন করতেন। এখন কতেক বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে ধার বিশিষ্ট লাঠি থাকে। ওইসব কাজ সম্পাদনের জন্য এটার উৎস হচ্ছে এ-ই হাদীস।

اَلْفَصْلُ الثَّانِی ◆ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتِمَهٗ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِیُّ وَالتِّرْمِذِیُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَقَالَ اَبُوْدَاوٗدَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَفِیْ رِوَايَتِهٖ وَضَعَ بَدْلَ نَزَعَ

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ الْبَرَازَ اِنْطَلَقَ حَتّٰى لَا يَرَاهُ اَحَدٌ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ

وَعَنْ اَبِیْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَّبُوْلَ فَاَتٰى دَمِثًا

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৩১৬।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনুহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন, তখন নিজের আংটি খুলে রাখতেন।[১৭] এটা আবূ দাউদ, নাসা'ঈ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীস 'হাসান', সহীহ্ ও 'গরীব' পর্যায়ের। আর ইমাম আবূ দাউদ বলেন, এ হাদীস মুন্‌কার[১৮] এবং তাঁর বর্ণনায়, 'খুলে রাখতেন'-এর পরিবর্তে 'রেখে দিতেন' উল্লেখ করা হয়েছে।

৩১৭।। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনুহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচকর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা করতেন, তখন ততদূর চলে যেতেন, যেখানে তাঁকে কেউ দেখতে পেতো না।[১৯] [আবূ দাউদ]

৩১৮।। হযরত আবূ মূসা (আশ্'আরী) রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনুহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। হুযূর প্রস্রাব করার ইচ্ছা করলে দেয়ালের গোড়ায় নরম জায়গায় গেলেন,

১৭. অর্থাৎ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আংটি পরিধান করে পায়খানায় যেতেন না; বরং হয়তো খুলে বাইরে রেখে যেতেন, নতুবা পকেটে রেখে দিতেন। কারণ, তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' লিখা ছিলো।

এ থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো ঃ

এক. যে জিনিসে আল্লাহ্ তা'আলা কিংবা সম্মানিত নবীগণের নাম লিখা থাকে, সেটার প্রতি যেন আদব প্রদর্শন করা হয়। সেটাকে অপবিত্র স্থানে ফেলবে না, পায়খানায় নিয়ে যাবে না। যেমন তাবীজ ইত্যাদি, যেগুলোতে আল্লাহ্‌র নামসমূহ বা ক্বোরআনের আয়াতসমূহ লিখা থাকে।

দুই. যদি এসব জিনিস গিলাফের ভেতর থাকে, তবে নিয়ে যাওয়া জায়েয। এজন্য তাবীজকে মোমের জামা পরানো আর ক্বোরআনের আয়াত অঙ্কিত আংটিতে শীশা বা কাঁচ লাগিয়ে নেওয়া হয়। [মিরক্বাত ইত্যাদি]

১৮. কেননা, এ হাদীসের সনদে আবূ আবদুল্লাহ্ হুমাম ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে দিনার আযদী আছেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম ও বোখারী হুমামকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন ও প্রশংসা করেছেন। এ জন্য তিরমিযী এ হাদীসকে 'হাসান' ও 'সহীহ' বলেছেন। মোট কথা, 'হুমাম' সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ তাঁর সমালোচনা করেছেন, আবার কেউ তাঁকে নির্ভরযোগ্য ও উপযুক্ত বলেছেন। আর যখন কারো সমালোচনা جرح হয় ও 'আদিল হওয়া' বা মুত্তাক্বী ও মানবিক গুণ-সম্পন্ন হওয়া (تعديل)-এর প্রসঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়, তখন 'আদিল হওয়া' (تعديل)-কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। অতএব, এ হাদীস সহীহ ও প্রমাণ্য।

১৯. অর্থাৎ হয়তো গাছ কিংবা দেওয়ালের পেছনে বসতেন।

فِى اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهٗ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالدَّارِمِىُّ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهٖ اُعَلِّمُكُمْ، اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَاَمَرَ بِثَلٰثَةِ

তারপর প্রস্রাব করলেন। অতঃপর বললেন, যখন তোমাদের কেউ প্রস্রাব করতে চায়, তখন প্রস্রাব করার জন্য সে যেন নরম জায়গা তালাশ করে।[২০] [আবূ দাউদ]

৩১৯।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন প্রস্রাব-পায়খানার ইচ্ছা করতেন তখন যতক্ষণ পর্যন্ত যমীনের একেবারে নিকটবর্তী হতেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না।[২১] [তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারেমী]

৩২০।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদের জন্য তেমনি, যেমন পুত্রের জন্য পিতা।[২২] আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দান করে থাকি। যখন তোমরা পায়খানায় যাবে, তখন ক্বেবলার দিকে মুখ করো না এবং পিঠও করো না।[২৩] আর (ইসতিন্জার জন্য) নির্দেশ দিয়েছেন তিনটি

আর যদি সমতল ময়দান হতো, তখন এতো দূরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, যেখানে কারো দৃষ্টি পড়তে পারতো না। কেউ কেউ বলেছেন, এতো ছোট দেয়াল, যা উপবিষ্টকে গোপন করে নেয়, আড়ালের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু কারো কারো মতে, মানুষের দেহের উচ্চতার সমান আড়াল হওয়া উচিত। [আশি''আতুল লুম্'আত]

২০. এ থেকে দু'টি মাস্'আলা জানা গেলো ঃ

এক. অন্য লোকের দেয়ালের পেছনে তাকে জিজ্ঞাসা না করেও প্রস্রাব করা জায়েয। তবে শর্ত হলো ঘরের মালিকের যেনো পর্দাহীনতা না হয় এবং না তার কষ্ট হয়। অন্যথায় নিষিদ্ধ। সুতরাং যদি মালিক বিজ্ঞপ্তি লিখে লটকিয়ে দেয়, "এখানে প্রস্রাব করো না।" তবে প্রস্রাব করতে বসবে না।

দুই. নরম জমিতে প্রস্রাব করা উচিত, যাতে সেটার ছিট্কা না উড়ে। যদি নরম জমি আগে থেকে না থাকে, তবে খুঁড়ে নরম করে নেবে। যেমন– পূর্বের হাদীস থেকে জানা গেছে। পায়খানার জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয়। চাই যে কোন স্থানে হোক, কিংবা ময়দানে হোক। কারণ, বিনা প্রয়োজনে সতর খোলা জায়েয নয়।

২১. এজন্য আলিমগণ বলেন, একাকীত্বে বরং অন্ধকারেও বিনা প্রয়োজনে উলঙ্গ থাকবে না। মহান রবের প্রতি লজ্জাবোধ করবে। সুবহানাল্লাহ্! কতোই পবিত্র শিক্ষা!

২২. স্নেহ, দয়া, ভালবাসা ও শিক্ষা প্রদানে আমি তোমাদের পিতার মত। আর আদব, আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শনে তোমরা আমার সন্তানতুল্য। স্মর্তব্য যে, শরীয়তের কতেক বিধানেও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত উম্মতের পিতা। সমগ্র পৃথিবীর পিতাগণ তাঁর বরকতময় কদমে উৎসর্গিত। এজন্য তাঁর সকল স্ত্রী ক্বোরআন-ই করীমের হুকুম অনুসারে মুসলমানদের মাতা। তাঁদের সাথে বিবাহ সর্বদা হারাম। কোন মহিলা হুযূর থেকে পর্দা ফরয নয়। এ জন্য সমস্ত মুসলমান ক্বোরআনের নির্দেশ অনুসারে পরস্পর ভাই; কেননা, তারা সবাই এ রহমতওয়ালে নবীর সন্তান-সন্ততি। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ভাই বলা হারাম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব'-এ দেখুন।

২৩. ময়দানে হোক কিংবা লোকালয়ে, আড়ালে হোক কিংবা খোলা ময়দানে– যে কোন অবস্থায় কা'বার দিকে মুখ কিংবা

اَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَ الرِّمَّةِ وَنَهٰى اَنْ يَّسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهٖ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْيُمْنٰى لِطُهُوْرِهٖ وَطَعَامِهٖ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰى لِخَلَائِهٖ وَمَا كَانَ مِنْ اَذًى. رَوَاهُ اَبُوْدَاوٗدَ

وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهٗ بِثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَاِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ

পাথরের এবং গোবর ও হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আর নিষেধ করেছেন যেন কেউ ডান হাত দ্বারা পবিত্রতা অর্জন না করে।[২৪] [ইবনে মাজাহ্, দারেমী]

৩২১।। হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর বরকতময় ডান হাত পবিত্রতা ও খাওয়ার জন্য ছিলো এবং বাম হাত ছিলো ইস্তিন্জা ও মানব স্বভাবের নিকট অপছন্দনীয় কাজের নিমিত্তে।[২৫] [আবূ দাঊদ]

৩২২।। তাঁরই (হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যায়, তখন সে যেন নিজের সাথে তিনটি পাথর (ঢিলা) নিয়ে যায়,[২৬] যেগুলো দ্বারা ইস্তিন্জা করবে। এগুলো তার জন্য যথেষ্ট হবে। [আহমদ, আবূ দাঊদ, নাসা'ঈ, দারেমী]

পিঠ করে প্রস্রাব-পায়খানা করো না। এ হাদীস ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির সুস্পষ্ট দলীল। যেহেতু এতে কোন স্থানের কোন শর্তারোপ করা হয় নি।

২৪. এ নিষেধের কারণ ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, এ নিষিদ্ধ জিনিসগুলো ছাড়া ওই সব বস্তুর প্রত্যেকটি দ্বারা ইস্তিন্জা (শৌচকর্ম সম্পন্ন) করা জায়েয, যা পবিত্র করতে পারে। যেমন- কাঠ, ঢিলা ও পাথর ইত্যাদি। অবশ্য কাগজ দ্বারা ইস্তিন্জা করা নিষিদ্ধ। যদিও তা সাদা হয় (তাতে কিছু লিখা না হয়)। কেননা, তাতে আল্লাহ-রসূলের নাম লিখা যেতে পারে। এ কারণে তা সম্মান পাবার উপযোগী। (মিরক্বাত) অনুরূপ, ধারালো ও তীক্ষ্ণ বস্তু দ্বারা ইস্তিন্জা করা নিষিদ্ধ। কারণ, তা ক্ষতিকর। স্মর্তব্য যে, মানুষ, জিন্ ও জীব-জন্তুর খাদ্যবস্তু দ্বারাও ইস্তিন্জা করা নিষিদ্ধ। যেমন- রুটির শুষ্ক টুক্রা, ঘাস, ভুষি, কয়লা, পাতা ইত্যাদি। এ সবই সম্মানযোগ্য।

২৫. অর্থাৎ ডান হাত দ্বারা ওযূ-গোসল করতেন এবং প্রথমে তা ধৌত করতেন। তেমনি, তা দ্বারা পানাহার করতেন। আর বাম হাত দিয়ে ইস্তিন্জা করা, নাক, পরিষ্কার করা এবং থু থু নিক্ষেপ করা ইত্যাদি এমন প্রতিটি কাজ করতেন, যা হৃদয়-মন অপছন্দ করতে থাকে। সুতরাং এক হাতের কাজ অন্য হাত দিয়ে করো না। মিরক্বাত প্রণেতা বলেছেন, ধর্মীয় কিতাবাদি ডান হাত দিয়ে ধরো আর জুতা ধরো বাম হাত দিয়ে।

২৬. তিনটি পাথর দ্বারা ইস্তিন্জা করার নির্দেশ মুস্তাহাব সূচক। কারণ, সাধারণ অবস্থায় এ তিনটি যথেষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু পাতলা পায়খানার সময় পাঁচটি বা সাতটির প্রয়োজন হয়। (ঢিলা নেওয়ার) উদ্দেশ্য হলো- পবিত্রতা অর্জন করা। তাই যতটি নিলে পবিত্রতা অর্জন হবে ততটা নেবে। তবে সুন্নাত হচ্ছে বিজোড় নেওয়া। পাথর ও ঢিলা অপবিত্রতাকে চুষে নেয় এমন হওয়া চাই। এ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে,

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَاِنَّهَا زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

وَعَنْ رُوَيْفِعِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيٰوةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِيْ فَاَخْبِرِ النَّاسَ اَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهٗ اَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا اَوِ اسْتَنْجٰى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ اَوْ عَظْمٍ فَاِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيْءٌ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ

৩২৩।। হযরত ইবনে মাস্‘উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা না গোবর দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করো, না হাড্ডি দ্বারা। কেননা, এটা তোমাদের ভাই জিন্‌দের খাদ্য।[২৭] এ হাদীস ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম নাসাঈ এটা 'তোমাদের ভাই জিন্‌দের খাদ্য' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৩২৪।। হযরত রুওয়াইফি' ইবনে সাবিত[২৮] রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হে রুওয়াফি'! সম্ভবতঃ আমার পর তোমার জীবন দীর্ঘ হবে।[২৯] তখন তুমি লোকদেরকে এ সংবাদ প্রদান করবে, যে ব্যক্তি নিজের দাড়িতে গিরা লাগাবে, অথবা গলায় সুতা বাঁধবে[৩০] কিংবা কোন পশুর গোবর কিংবা হাড্ডি দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করবে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার প্রতি অসন্তুষ্ট।[৩১] [আবূ দাঊদ]

রেলের পাথর যথেষ্ট হয় না।

২৭. হাড্ডি জিনদের খোরাক আর গোবর হচ্ছে তাদের পশুগুলোর খাদ্য। এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম اِنَّهَا -এর সর্বনামকে এক বচন ব্যবহার করেছেন। এ সর্বনাম 'হাড্ডিগুলোর' পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, যখন মু'মিন-জিন্‌দের পশুগুলোর খাদ্যের সম্মান রয়েছে, তখন আমাদের পশুগুলোর খাদ্যেরও অবশ্যই সম্মান থাকবে। 'ভাই' বলা থেকে জানা যায় যে, মুসলমান জিন্‌-এর কথা বুঝানো উদ্দেশ্য।

হাদীস শরীফে রয়েছে যে, যখন জিন্‌গণ হাড্ডি তুলে নেয় তখন তাতে গোশ্‌ত পায়। আর যখন তাদের পশু গোবরে মুখ লাগায়, তখন তাতে ওই খাদ্য-শস্যই পায়, যা খাওয়ার ফলে ওই গোবর হয়েছে।

২৮. তিনি একজন আনসারী। হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র শাসনামলে ত্রিপলীর শাসক ছিলেন। তিনি ৪৭ হিজরীতে আফ্রিকায় জিহাদ করেছেন। ৫০ হিজরীতে সিরিয়ায় ওফাত পান। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী।

২৯. বুঝা গেলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মানুষের জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কেও অবগত আছেন। হুযূর বদরের যুদ্ধের একদিন পূর্বে ময়দানে রেখা টেনে এরশাদ করেছেন, "আগামীকাল এখানে অমুক কাফির নিহত হবে এবং এখানে অমুক।" আরো বুঝা গেলো যে, তিনি মানুষের মৃত্যুর সময় এবং স্থান সম্পর্কেও জানেন।

৩০. আরবের মূর্খ লোকেরা যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব দেখানোর জন্য দাড়িতে গিরা লাগাতো। যেমন আজ থেকে কিছুকাল পূর্বে কিছু লোক লম্বা গোঁফে গিরা লাগাতো। কেউ কেউ বলেছেন, আরববাসী, যার একটি স্ত্রী থাকতো, সে দাড়িতে একটি গিরা লাগাতো। দু'স্ত্রীর স্বামী দুই গিরা বাঁধতো। হাদীসে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, দাড়ি আঁচড়ানো সুন্নাত। অনুরূপ, দৃষ্টির কুপ্রভাব থেকে বাঁচার জন্য তারা ঘোড়া ও শিশুদের গলায় সুতা কিংবা বোতগুলোর নামে

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَّا فَلَا حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَّا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهٖ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَّا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اَتَى الْغَآئِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ اِلَّا اَنْ

৩২৫।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে সুরমা লাগাবে, সে যেন বিজোড় লাগায়।[৩২] যে এরূপ করবে, তবে তো ভালোই করবে, আর যে করবে না, তবে তাতে গুনাহ্ নেই।[৩৩] আর যে ইস্তিন্জা করবে, সে যেন বিজোড় (ঢিলা) দিয়ে করে। যে তা করবে সে তো উত্তম কাজই করবে, আর যে করবে না, তার জন্য গুনাহ্ নেই।[৩৪] যে আহার করে সে যেন খিলাল দ্বারা যা বের করে তা থুথুর সাথে ফেলে দেয়; আর যা জিহ্বা দ্বারা বের করে তা যেন গিলে ফেলে।[৩৫] যে এরূপ করবে সে তো উত্তম কাজই করবে, আর যে এরূপ করবে না, তবে কোন গুনাহ্ নেই।[৩৬] আর যে পায়খানায় যায়, সে যেন (নিজেকে) আড়াল করে নেয়। যদি সে না পায়

দমকৃত সুতা বাঁধতো। এটা নিষিদ্ধ। স্মর্তব্য যে, পবিত্র কোরআনের আয়াত এবং আল্লাহ্র নামের তাবীজ ও সুতা বাঁধা জায়েয। ইন্শা-আল্লাহ্ (بَابُ استعاذه) (বাবুল ইস্তি'আযাহ্) শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরো বিশ্লেষণ করা হবে। সাহাবা-ই কেরাম এ আমল করেছেন। সুতরাং এ হাদীস শরীফ দ্বারা তাবীজ-কবচকে নিষেধ করা যাবে না। গঙ্গার পানিকে সম্মান করা এবং তা সম্মানার্থে পান করা কুফর; কিন্তু ঝমঝমের পানির প্রতি সম্মান দেখানো ঈমানের রুকন (স্তম্ভ)। ওই পানি সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে পান করা উচিত। (কারণ) এটা একজন নবীর কদম শরীফের ফয়য (কল্যাণ-ধারা)। বস্তুতঃ মূর্তিগুলোর বিধান সম্মানিত বুর্যুগদের ব্যাপারে প্রযোজ্য বলা জঘন্য বে-দ্বীনী।

৩১. কারণ, তিনি ওই কাজকে ঘৃণা করেন আর এ কাজ সম্পন্নকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট। এখানে এ কথা বলা হয় নি- আমি অসন্তুষ্ট, বরং বলেছেন, হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা অসন্তুষ্ট; যাতে বুঝা যায় যে, হুযূর তো মুহাম্মদ (অতিপ্রশংসিত)-ই; তিনি সবদিক দিয়ে প্রসংসার যোগ্য। যার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট, সে সব ধরনের মন্দ হবে।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, কখনোও গুনাহ-ই সাগীরাও হুযূরের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে যায়। কেননা, উল্লেখিত এ তিনটি কাজ গুনাহ্-ই সাগীরা। এ-ও জানা গেলো যে, জাহেলী যুগের কাজ-কর্ম থেকে মুসলমানের বিরত থাকা চাই।

৩২. প্রত্যেক চোখে তিন শলা। তা এভাবে যে, প্রথমে ডান চোখে তিনবার দেবে। কতেক লোক এভাবে দিয়ে থাকে যে, প্রথমে ডান চোখে দু'বার, তারপর বাম চোখে তিনবার। অতঃপর ডান চোখে একবার, যাতে ডান দিক থেকে শুরু ও শেষ হয়। এতেও কোন অসুবিধা নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতে শোয়ার সময় উভয় চোখ মুবারকে তিন শলা করে সুরমা চোখে লাগাতেন। এ বরকতময় আমল নিয়মিত সম্পন্নকারী, ইন্শা-আল্লাহ্, কখনো অন্ধ হবে না।

৩৩. অর্থাৎ এ নির্দেশ ওয়াজিবসূচক নয়; বরং মুস্তাহাব নির্দেশক। এ থেকে বুঝা গেলো যে, শর্তহীন নির্দেশ (مطلق امر) ওয়াজিব করার জন্য হয়ে থাকে। অন্যথায় হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেওয়ার পর এ কথা বলার প্রয়োজন হতো না।

৩৪. অর্থাৎ বড় ইস্তিন্জার জন্য তিনটি, পাঁচটি কিংবা সাতটি প্রয়োজন মতো ঢিলা নাও। যদি চারটি কিংবা ছয়টি নাও তবুও ক্ষতি নেই। কেননা, উদ্দেশ্য হলো পবিত্রতা অর্জন করা। স্মর্তব্য যে, সুরমা দেওয়ার সময় তিন শলা-ই লাগাবে, পাঁচ বা সাত শলা নয়। কারণ, এটাই সুন্নাত।

৩৫. কেননা, খিলাল দ্বারা বের করা বস্তুতে রক্ত মিশে থাকার সম্ভাবনা থাকে। তাই সাবধানতাবশত তা খাবে না। আর জিহ্বা দ্বারা বের হওয়া বস্তুর মধ্যে এ সম্ভাবনা নেই। তাই সেখানে এ সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

يَّجْمَعَ كَثِيْبًا مِّنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِىْ اٰدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَّا فَلَا حَرَجَ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤدَ وَاِبْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهٖ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ اِلَّا اَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْيَتَوَضَّأُ فِيْهِ.

আড়াল করার মতো বালুর স্তুপ ছাড়া কিছুই, তা হলে যেন ওই স্তুপের দিকে পিঠ দিয়ে বসে।[৩৭] কেননা, শয়তান লোকদের পায়খানার স্থান নিয়ে খেলা করে। যে এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো, আর যে এরূপ করে নি, তবে গুনাহ্ নেই।[৩৮] [আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

৩২৬।। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু[৩৯] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন গোসলখানায় প্রস্রাব না করে, অতঃপর তাতে গোসল কিংবা ওযূ করবে।[৪০] কেননা, সাধারণভাবে কু-মন্ত্রণা এ থেকেই হয়ে থাকে।[৪১] (এটা ইমাম আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।) কিন্তু এ দু'জন 'অতঃপর তাতে গোসল কিংবা ওযূ করবে' বচনটি উল্লেখ করেন নি।

---

৩৬. এটা এ ওই অবস্থাতেই যে, যদি রক্ত মিশ্রিত হওয়ার শুধু সম্ভাবনাই থাকে, নিশ্চিত বিশ্বাস হয় না। যদি নিশ্চিত ধারণা হয়, তবে গিলে ফেলা হারাম। কেননা, প্রবাহিত রক্ত হারামও, অপবিত্রও। যদিও দ্বিতীয় অবস্থায় (অর্থাৎ জিহ্বা দিয়ে বের করা হয়) তবুও।

এতে ইঙ্গিতে বুঝা গেলো যে, প্রবাহিত রক্ত শরীরে প্রবেশ করানো না-জায়েয; যেমন, প্রস্রাব বা পায়খানা প্রবেশ করানো নাজায়েয। কেননা, এ সবই অপবিত্র।

৩৭. মানুষের সামনে আড়াল করাতো ফরযই আর একাকীত্বে আড়াল করা মুস্তাহাব। কেননা, এটা লজ্জার একটি শাখা। এ কারণে একাকীত্বেও বিবস্ত্র থাকা নিষিদ্ধ। বালির স্তুপের দিকে পিঠ করা এ জন্য যে, সামনে তো কাপড় ইত্যাদি দিয়েও আড়াল করা যায়। অন্যথায় উভয় দিক গোপন করারই উপযুক্ত।

৩৮. অর্থাৎ একাকীত্বে এ পর্দা করা মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়। শয়তান খেলা করার অর্থ হলো এ যে, লোকজনকে উলঙ্গ দেখে সে হাসে ও কুমন্ত্রণা দেয় ইত্যাদি।

৩৯. তিনি একজন সাহাবী। তিনি মুয়ায়নাহ্ গোত্রের লোক। বায়'আত-ই রিদ্বওয়ানে অংশ গ্রহণ করেন। মদীনা-মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন। তান্তুর শহর বিজয় হলে সর্বপ্রথম তিনিই তাতে প্রবেশ করেন। হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র শাসনামলে বসরার লোকদেরকে ইল্মে দ্বীন শিক্ষা দানের জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি ৫৯ হিজরীতে ওফাত পান।

৪০. مُسْتَحَمَّة শব্দের অর্থ- গরম পানি ব্যবহার করার স্থান। (حميم) (হামীম) গরম পানিকে বলে। তা হতে (حمام) (হাম্মাম) গঠিত। যদি গোসলখানার জমি পাকা হয় এবং তাতে পানি বের হওয়ার নালাও থাকে, তবে সেখানে প্রস্রাব করতে অসুবিধা নেই। যদিও না করাই উত্তম। কিন্তু যদি জমি কাঁচা হয় আর পানি বের হবার পথও না থাকে, তবে প্রস্রাব করা অত্যন্ত মন্দ। কারণ, এতে জমি নাপাক হয়ে যাবে। আর গোসল কিংবা ওযূ করার সময় নাপাক পানি শরীরের উপর ছিটকাবে। এখানে এ দ্বিতীয় অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য। এ জন্য তাকীদ সহকারে নিষেধ করা হয়েছে।

৪১. অর্থাৎ এ থেকে কু-মন্ত্রণা এবং সন্দেহের রোগ সৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞতা থেকে এমন প্রতীয়মান হয়। অথবা নাপাক ছিটকে পড়ার কু-মন্ত্রণা থাকবে। প্রথমোক্ত অর্থই বেশী স্পষ্ট।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِيْ حُجْرٍ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلٰثَةَ اَلْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩২৭।। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সারজাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[৪২] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ তা'আলা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন গর্তের মধ্যে কখনো প্রস্রাব না করে।[৪৩] [আবূ দাউদ, নাসাঈ]

৩২৮।। হযরত মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা তিনটি অভিসম্পাতের বস্তু হতে বেঁচে থাকো। (আর ওইগুলো হলো-) পানির ঘাটসমূহে, রাস্তার মধ্যভাগে এবং ছায়ায় পায়খানা করা।[৪৪]

৩২৯।। হযরত আবূ সা'ঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দু'ব্যক্তি (একত্রে) পায়খানায় যাবে না এমতাবস্থায় যে, তাদের লজ্জাস্থান খুলবে এবং পরস্পর কথাবার্তা বলতে থাকবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এতে অসন্তুষ্ট হন।[৪৫] [আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

৪২. তিনি মুযায়নাহ্ গোত্রের অথবা বনী মাখদুম নামক গোত্রের লোক। বসরায় বসবাস করতেন। তাঁর পিতার নাম সারজাস বা নারজাস।

৪৩. حُجْر (হুজর) শব্দের অর্থ হয়তো জমির ছিদ্র (গর্ত) বা দেয়ালের ফাটল। যেহেতু বেশীর ভাগ ছিদ্রে বিষাক্ত জীব, পিঁপড়ার মতো দূর্বল প্রাণী অথবা জিন্‌গণ থাকে, পিপড়া প্রস্রাব কিংবা পানির কারণে কষ্ট পাবে, অথবা সাপ কিংবা জিন্ বের হয়ে আমাদেরকে কষ্ট দেবে, সেহেতু ওখানে প্রস্রাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ওফাত এ কারণে হয়েছে যে, তিনি এক গর্তে প্রস্রাব করলেন, যা থেকে জিন্ বের হয়ে তাঁকে মেরে ফেললো। লোকেরা ওই গর্ত থেকে এ শব্দ শুনতে পেলো-

نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَبْنَ عُبَادَةَ وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمٍ وَلَمْ نُخْطِ...

অর্থাৎ আমরা খাযরাজ গোত্রের সরদার সা'দ ইবনে ওবাদাহ্‌কে হত্যা করেছি এবং আমরা তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছি। সুতরাং আমাদের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। [মিরক্বাত, আশি''আতুল লুম'আত]

৪৪. এর ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। তা হচ্ছে ওই স্থান, যেখানে মানুষ বসে কিংবা বিশ্রাম নেয়, সেখানে পায়খানা করা নিষিদ্ধ। কারণ, এতে মহান রবও অসন্তুষ্ট হন এবং লোকেরাও গালি দেয়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, মসজিদের গোসলখানায় ও প্রস্রাবখানায় পায়খানা করা জঘন্য অপরাধ। বান্দাদের কষ্টদাতা লোক মহান রবের শাস্তির উপযোগী।

৪৫. কেননা, অপরের সামনে বিবস্ত্র হওয়াও নিষিদ্ধ। আর প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় কথা-বার্তা বলাও গুনাহ্। এ সময় কথা বলার কারণে ফিরিশ্‌তাদের কষ্ট হয়; বরং ওই সময় আল্লাহ্‌র যিক্‌রও করবে না। হাঁচি আসলে মুখে 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্'ও বলবে না। যদি কেউ সালাম দেয়, তবে জবাবও দেবে না। বস্তুতঃ প্রস্রাব-পায়খানায় ও

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرُ مَا بَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَ عَوْرَاتِ بَنِىْ اٰدَمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ اَنْ يَّقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَاِسْنَادُهٗ لَيْسَ بِقَوِىٍّ

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ.

৩৩০।। হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু[৪৬] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ তা'আলা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– এ পায়খানাগুলো হচ্ছে জিন্দের উপস্থিতির জায়গা।[৪৭] সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানায় যায়, তখন সে যেন বলে, 'আ'উযু বিল্লাহি মিনাল খুবসি ওয়াল খাবা-ইস। (আমি নাপাক পুরুষ-জিন্ ও নারী জিন্ থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)[৪৮]

৩৩১।। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ্ করেছেন, জিন্দের চোখগুলো এবং লোকদের লজ্জাস্থানের মধ্যকার পর্দা হলো এ যে, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানায় যায়, তবে সে যেন 'বিস্মিল্লাহ্' বলে।[৪৯] এ হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি 'গরীব' পর্যায়ের আর এ সনদ (বর্ণনাসূত্র) সবল নয়।

৩৩২।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচগার হতে বের হতেন, তখন বলতেন, "(হে আল্লাহ্!) তোমার ক্ষমা

স্ত্রীসহবাসকালে কথা-বার্তা বলা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

৪৬. তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁর 'উপনাম' আবূ আমর। তিনি আনসারী ও খায্রাজ গোত্রের লোক। কুফায় অবস্থান করেন। ৮৫ বছর বয়স পান। ৭৮ হিজরীতে কুফায় ওফাত পান। আর সেখানে তাকে দাফন করা হয়েছে।

৪৭. কেননা, এখানে নাপাক বস্তুসমূহ পতিত হয়। আল্লাহ্র যিক্র করা হয় না। এ কারণে সেখানে শয়তান মানুষের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকে। এজন্য নির্দেশ রয়েছে প্রয়োজন ছাড়া পায়খানায় যেয়ো না এবং বিনা কারণে সেখানে বসে থেকো না।

স্মর্তব্য যে, গির্জা, মন্দির, শরাবখানা, সিনেমা হল, জুয়ার ঘর, যেখানে লোকেরা জুয়া খেলে এসবই শয়তানের ঠিকানা। হুযূর সরকার-ই দু'-আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বাজারগুলোতে শয়তান থাকে। ফলে, সেখানে মিথ্যা, প্রতারণা ইত্যাদি বেশী সংঘটিত হয়।

৪৮. কিন্তু দো'আর এ কলেমাগুলো পায়খানায় যাওয়ার পূর্বে বলবে। পায়খানার ভেতর আল্লাহ্র যিক্র নিষিদ্ধ। কেননা, সেখানে বহু নাপাকী রয়েছে।

৪৯. অর্থাৎ দেয়াল ও পর্দা যেমন লোকদের দৃষ্টি থেকে অন্তরাল হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্র এ যিক্র জিন্দের দৃষ্টি থেকে অন্তরাল হবে। ফলে, জিন্গণ তাকে দেখতে পাবে না।

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَى الْخَلَاءَ اَتَيْتُه بِمَاءٍ فِىْ تَوْرٍ اَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجٰى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهٗ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُه بِاِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّأَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِىُّ مَعْنَاهُ

وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَه. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ

(চাই)।[৫০] [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

৩৩৩।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচগারে যেতেন তখন আমি তাঁর খিদমতে চামড়ার পাত্রে কিংবা পেয়ালায় পানি নিয়ে যেতাম।[৫১] তিনি (তা দিয়ে) ইস্‌তিন্‌জা করতেন। অতঃপর হাত শরীফ জমিতে ঘষ্‌তেন।[৫২] তারপর আরেক পাত্র পানি আনতাম। তিনি তা দ্বারা ওযূ করতেন।[৫৩] এ হাদীস আবূ দাউদ ও দারেমী বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ এর অর্থগত বর্ণনা করেছেন।

৩৩৪।। হযরত হাকাম ইবনে সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন প্রস্রাব করতেন,[৫৪] তখন ওযূ করতেন এবং লজ্জাস্থানের (লুঙ্গী) উপর পানি ছিটিয়ে দিতেন। [আবূ দাউদ, নাসাঈ]

---

৫০. এ সব হাদীসে 'বায়তুল খালা' দ্বারা পায়খানা থেকে ফিরে আসার স্থান বুঝানো উদ্দেশ্য। সেটা ময়দানে হোক কিংবা ছাদের উপর হোক অথবা ঘরের কোণে; তবে নির্দিষ্ট কক্ষগুলো নয়। কেননা, ওই যুগে ঘরের ভিতর পায়খানা তৈরী করার প্রচলন ছিলো না।

শৌচকর্ম সম্পন্ন করার পর ক্ষমা প্রার্থনা করার দু'টি কারণ রয়েছে ঃ

এক. পায়খানা-প্রস্রাবের সময়টুকু আল্লাহ্‌র যিক্‌র ব্যতীত অতিবাহিত হয়েছে। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ সময় ব্যতীত সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতেন। তাই "হে আল্লাহ্! আমার এ অপারগতা ক্ষমা করো।"

দুই. ঠিকভাবে পায়খানা হয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র বড় নি'মাত। এর শোকরিয়া আদায় করতে রসনা অপারগ। "হে আল্লাহ্! আমার এ অপারগতাকে ক্ষমা করো।"

স্মর্তব্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'ইস্তিগ্‌ফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) করা উম্মতের শিক্ষার জন্যই।

৫১. এতে বুঝা গেলো যে, নবী উম্মত থেকে, পীর মুরীদ থেকে, শিক্ষক ছাত্র থেকে, পিতা সন্তান থেকে খিদমত নিতে পারেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুযুর্গদের খিদমত ও সেবা করা সৌভাগ্যের কারণ।

৫২. যাতে মাটিতে হাত ঘষে দুর্গন্ধ দূরীভূত করা হয়। তাই ইস্‌তিন্‌জার পর সাবান ইত্যাদি দ্বারা হাত ধৌত করা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। স্মর্তব্য যে, হুযূরের এ পবিত্র কাজও উম্মতের শিক্ষার জন্যই; অন্যথায় হুযূরের পরিত্যক্ত বস্তুতে দুর্গন্ধ ছিলো না; বরং জনৈক মহিলা হুযূরের প্রস্রাব মোবারক অজ্ঞতাবশতঃ পান করে ফেলেছিলেন। ইন্‌শা-আল্লাহ্! ওই ঘটনার বর্ণনাকালে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৫৩. বেশীরভাগ সময়ে, সর্বদা নয়; যেমন অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেহেতু, পাত্র ছোট ছিলো ইস্‌তিন্‌জা করার পর ওযূ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পানি অবশিষ্ট থাকতো না, সেহেতু, অন্য পাত্রের পানি দ্বারা ওযূ করতেন। অন্যথায় ইস্‌তিন্‌জা করে বেঁচে যাওয়া পানি দ্বারা ওযূ করা জায়েয।

وَعَنْ اُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِّنْ عِيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِهٖ يَبُوْلُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ رَاٰنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَبُوْلُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحِىُّ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ صَحَّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قِيْلَ كَانَ ذٰلِكَ لِعُذْرٍ۔

৩৩৫।। হযরত উমায়মা বিনতে রুক্বায়ক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা[৫৫] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি কাঠের পাত্র ছিলো, যা তাঁর খাটের নিচে থাকতো, যাতে তিনি রাতে প্রস্রাব করতেন।[৫৬] [আবূ দাঊদ, নাসাঈ]

৩৩৬।। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখলেন, আমি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছিলাম। তখন এরশাদ করলেন, "হে ওমর! দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না।'' অতঃপর আমি আর কখনো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করি নি।[৫৭] (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্) শায়খ ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ বলেন, হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন এক গোত্রের ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থানে তশরীফ নিয়ে যান এবং সেখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন। (বোখারী, মুসলিম) কথিত আছে যে, এটা ওযরবশতঃ ছিলো।[৫৮]

৫৪. সুফিয়ান ইবনে হাকাম সাহাবী ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অনুরূপ, তাঁর নাম নিয়েও মতভেদ রয়েছে। হয়তো তাঁর নাম হাকাম ইবনে সুফিয়ান, নতুবা সুফিয়ান ইব্নে হাকাম।

লুঙ্গি শরীফের উপর পানি ছিটানো সংশয় দূরীভূত করার মহৌষধ। কতেক বিজ্ঞ আলিম প্রত্যেক ওযূর পর এ পানি ছিটানোকে মুস্তাহাব বলেন। কেউ কেউ বলেন, যদি প্রস্রাব করার পর ওযূ করা হয়, তবে পানি ছিটানো হবে, যাতে যদি লুঙ্গির উপর আর্দ্রতা দেখা যায়, তবে তা প্রস্রাব কিনা সন্দেহ না থাকে। এটাই সঠিক অভিমত।

৫৫. তিনি এক মহিলা-সাহাবী। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ্। তাঁর মায়ের নাম রুক্বায়ক্বাহ্। অথবা তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফী। অর্থাৎ তাঁর পিতার বৈ-পিত্রেয় বোন অথবা হযরত খাদীজাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হার বোন। এও হতে পারে যে, তাঁরা দু'জন পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ।

৫৬. عيدان শব্দটি عود শব্দের বহুবচন। অর্থ, কাঠ। অথবা عيدانة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ খেজুরের গাছ। সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেশীরভাগ সময় মাটিতে (মেঝেতে) শয়ন করতেন। আর কখনো খাটের উপর। খাটের পায়ের দিকে এ পেয়ালা থাকতো, যাতে প্রস্রাব করার জন্য শীত ইত্যাদি মৌসুমে বাইরে যেতে না হয়।

৫৭. এ থেকে বুঝা গেলো যে, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাকরূহ এবং কাফিরদের স্বভাব। জাহেলী যুগে লোকেরা গাধা-গরুর মতো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতো। যদি পর্দাহীনতা হয় কিংবা কাপড়ের উপর ছিটকে পড়ে, অথবা কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বনে ফ্যাশন হিসেবে তা করা হয়, তবে মাকরূহ-ই তাহ্রীমী। অন্যথায় মাকরূহ-ই তান্যীহী আর যদি অপরাগতাবশতঃ হয়, তবে জায়েয, মাকরূহও হবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُوْلُ قَآئِمًا فَلَا تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ اِلَّا قَاعِدًا. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَ النَّسَآئِىُّ

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ اَتَاهُ فِىْ اَوَّلِ مَا اُوْحِىَ اِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوْءِ اَخَذَ غُرْفَةً مِّنَ الْمَآءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهٗ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارُ قُطْنِىُّ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৩৩৭।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে তোমাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন, তাকে সত্য বলে মেনে নিও না। হুযূর বসেই প্রস্রাব করতেন।[৫৯] [আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈ]

৩৩৮।। হযরত যায়দ ইবনে হা-রিসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা[৬০] হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত জিব্‌রাঈল প্রথম ওহী পেয়ে তাঁর নিকট আসলেন।[৬১] তখন তাঁকে ওযূ ও নামায শেখালেন (নিয়ম বলে দিলেন)।[৬২] অতঃপর যখন ওযূ শেষ করলেন তখন এক অঞ্জলী পানি নিলেন এবং তা লজ্জাস্থানের উপর ছিটিয়ে দিলেন।[৬৩] [আহমদ, দারে কুত্বনী]

---

৫৮. হয়তো সেখানে বসার স্থান ছিলো না। কারণ, আবর্জনার স্তুপে সর্বত্র অপবিত্র বস্তুই থাকে। অথবা তাঁর পা শরীফে জখম কিংবা পিঠ শরীফে ব্যাথ্যা ছিলো, যার কারণে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা তাঁর জন্য উপকারী ছিলো। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন, দাঁড়িয়ে আগুনের অঙ্গারে প্রস্রাব করায় সত্তর রোগের চিকিৎসা রয়েছে। [মিরক্বাত ও আশি''আতুল লুম'আত]

স্মর্তব্য যে, হয়তো ওই সময় হুযূর উঁচু স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে প্রস্রাবের ছিঁটকে থেকে নিরাপদ ছিলেন।

৫৯. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র অভ্যাসের উল্লেখ করেছেন। অথবা বলেছেন, হুযূর ঘরের মধ্যে কখনো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন নি। অন্যথায় এক/আধবার ওযরবশতঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন। সুতরাং হাদীসগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ নেই।

৬০. তাঁর উপনাম আবূ উসামাহ্। তাঁর মাতার নাম সা'দ বিনতে সা'লাবাহ্। তাঁকে ৮ বছর বয়সে বনী মা'আন নামের গোত্র ধরে নিয়ে যায়। আর ওকায বাজারে হাকীম ইবনে হারাম ইবনে খোওয়াইলেদ-এর নিকট চারশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। তাঁকে হাকীম তাঁর ফুফী হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র জন্য ক্রয় করেছিলেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজাকে বিবাহ করলেন, তখন তিনি হযরত যায়দকে হুযূরের খিদমতে উপহার দিলেন। হুযূর তাঁকে আযাদ করে আপন পুত্র করে নিলেন এবং স্বীয় দাসী উম্মে আয়মানের সাথে বিয়ে দিলেন। তাঁর গর্ভে হযরত উসামা ইবনে যায়দ জন্মগ্রহণ করেন। তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যায়নাব বিনতে জাহশের সাথে বিয়ে দেন; যিনি (হযরত যয়নাব) পরবর্তীতে হুযূরের বিবাহাধীন হন। হযরত যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র কাছে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত প্রিয়জন ছিলেন। এমনকি তাঁকে আহলে বায়ত বা নবী-পরিবারের মধ্যে গণ্য করা হয়। লোকেরা তাঁকে যা-য়িদ ইবনে মুহাম্মদ বলে ডাকতো। তখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো- اُدْعُوْا لِاٰبَآئِهِمْ অর্থাৎ "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার নামে ডাকো।" (৩৩:৫)

সমস্ত সাহাবীর মধ্যে শুধু তাঁর নাম পবিত্র ক্বোরআনে এসেছে। যেমন- এরশাদ হচ্ছে-

وَعَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم جَآءَ نِیْ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِی الْبُخَارِیَّ يَقُوْلُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ الْهَاشِمِیُّ الرَّاوِیُّ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَه بِكُوْزٍ مِّنْ مَّاءٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عُمَرُ فَقَالَ مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِه قَالَ مَا اُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ وَلَوْ

৩৩৯।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার নিকট হযরত জিব্রাঈল আসলেন, আর আরয করলেন, হে মুহাম্মদ![৬৪] (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যখন আপনি ওযূ করবেন, তখন পানি ছিঁটিয়ে দেবেন। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন আর বলেছেন, এ হাদীস 'গরীব' পর্যায়ের। আমি মুহাম্মদ অর্থাৎ ইমাম বোখারীকে বলতে শুনেছি যে, হযরত হাসান ইবনে আলী হাশেমী বর্ণনাকারী হলেন 'মুন্কারুল হাদীস'।[৬৫]

৩৪০।। হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব করলেন। তখন হযরত ওমর তাঁর পেছনে পানির পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হুযূর এরশাদ করলেন, "হে ওমর এটা কি?" তিনি আরয করলেন, "পানি, যা দ্বারা আপনি ওযূ করবেন।" হুযূর এরশাদ করলেন, "আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হই নি যে, যখন প্রস্রাব করবো তখনই ওযূ করবো। আর যদি

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا অর্থাৎ ঃ অতঃপর যখন যায়দের উদ্দেশ্য তার (যয়নাব) থেকে পূর্ণ হয়ে গেলো, তারপর আমি তাকে আপনার বিবাহে দিয়ে দিলাম। (৩৩:৩৭ তরজমা- কান্যুল ঈমান)

তিনি ৫৫ বছর বয়স পান। ৮ম হিজরীতে জুমাদাল উলা মাসে মূতার যুদ্ধে শহীদ হন।

৬১. প্রথম ওহী দ্বারা নামায ফরয হওয়া অর্থাৎ মি'রাজ রাতের পর প্রথম ওহী বুঝানো উদ্দেশ্য, যা নুবূয়ত প্রকাশের ১৩শ বছরে হয়েছিলো। কেননা, এর পূর্বে না নামায এসেছিলো, না ওযূ। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ইজ্তিহাদ দ্বারা এসব কিছু সম্পন্ন করতেন। সুতরাং এ হাদীসের বিপক্ষে এ আপত্তির অবকাশ নেই যে, প্রথম ওহী তো اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ (ইক্বরা বিস্মি রাব্বিকা) [পড়ুন, আপনার রবের নামে। ৯৬:১]

৬২. উম্মতের শিক্ষার জন্য। অন্যথায় হুযূর পূর্ব থেকেই এ সবকিছু জানতেন। নুবূয়ত প্রকাশের পূর্বে হেরা ও সাওর পর্বতের গুহায় তিনি ই'তিকাফ ও ইবাদত করতেন। কিন্তু এখন এটা শরীয়তের বিধান হয়ে গেছে। সুতরাং (বুঝা গেলো যে,) জিব্রাঈল আমীন শেখান নি; বরং মহান রবের পক্ষ থেকে বিধান পৌঁছিয়েছেন। সুতরাং হযরত জিব্রাঈল আমীন হুযূরের খাদিম হলেন, ওস্তাদ নন। শিক্ষাদাতা তো মহান রবই।

৬৩. যাতে হুযূর আপন উম্মতকে এটা শিক্ষা দেন। এটার ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। তা হচ্ছে- এটা সংশয় বা কু-মন্ত্রণার চিকিৎসা।

৬৪. সম্ভবতঃ এ হাদীস এ-ই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেকার- (এরশাদ হচ্ছে)

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

(তরজমা ঃ রসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনি স্থির করো না, যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকে। ২৪:৬৩, কান্যুল ঈমান)

فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً. رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

وَعَنْ اَبِي اَيُّوْبَ وَجَابِرٍ وَّ اَنَسٍ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَثْنٰى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا

আমি তা করি, তাহলে এটা সুন্নাতে পরিণত হয়ে যাবে।"[৬৬] (আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্)

৩৪১।। হযরত আবূ আইয়ূব, হযরত জাবির ও হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম হতে বর্ণিত, যখন এ আয়াত নাযিল হলো فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ (এ মসজিদে এমন সব লোক রয়েছে, যারা খুব পবিত্র হওয়াকে পছন্দ করে। আর আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন।)[৬৭] তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "হে আনসারের দল! আল্লাহ্ তোমাদের পবিত্রতার খুব প্রশংসা করেছেন। তোমাদের ওই পবিত্রতা অর্জন কিরূপ?"[৬৮] তাঁরা আরয করলেন,

---

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে শুধু নাম শরীফ নিয়ে হুযূরকে আহ্বান করা হারাম হয়ে গেলো। যখন আমাদের মহান রবই আপন মাহবূবকে 'নবী', 'রসূল', 'মুয্যাম্মিল', 'মুদ্দাস্‌সির' প্রভৃতি উপাধি দ্বারা আহ্বান করেছেন, তখন সৃষ্টি শুধু নাম ধরে কীভাবে আহ্বান করতে পারে? আর এ-ও হতে পারে যে, এ সম্বোধনের বরকতময় শব্দগুলো হুযূরের নিজস্ব। হয়তো হযরত জিব্‌রাঈল আদব সহকারে আহ্বান করেছেন আর হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বিনয়বশতঃ এভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন, বলা হয়, "আমাকে অমুখ বলেছে, তুমি ওই সময় আসবে।" অথচ সে বলেছিলো, "আপনি তাশরীফ আনবেন।"

৬৫. অর্থাৎ এ হাদীসের সনদে হাসান ইবনে আলী নামেরও কোন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি স্বয়ং নির্ভরযোগ্য (সিক্বাহ্) নন। আর এ বর্ননায় তিনি একাকী। কিন্তু তাতেও কোন ক্ষতি নেই। কেননা, আমলের ফযীলত বর্ণনায় (দুর্বল) হাদীসও গ্রহণযোগ্য।

স্মর্তব্য যে, এ 'হাসান ইবনে আলী' কোন অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নন; যেমন কেউ কেউ তা মনে করে বসেছেন।

৬৬. অর্থাৎ 'সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্'। অন্যথায় ওযূ সহকারে থাকা 'সুন্নাত-ই মুস্তাহাব্বাহ্' (মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় সুন্নাত)।

এ থেকে কয়েকটি মাস্'আলা জানা গেলো ঃ

এক. সাহাবা-ই কেরাম হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর খিদমত করার জন্য নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতেন না; বরং সুযোগের তালাশেই থাকতেন।

দুই. যে কাজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বদা করতেন, তা 'সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্' আর যা পালনের আদেশও করতেন তা ওয়াজিব।

তিন. উম্মতের পক্ষে সহজ হবার জন্য অনেকবার সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুস্তাহাব কাজ ছেড়েও দিয়েছেন। আর এ ছেড়ে দেওয়াও হুযূরের জন্য সাওয়াবের কারণ। কেননা, এটা দ্বীনের বিধান প্রচারের সামিল।

৬৭. এ আয়াতে মসজিদ-ই ক্বোবার প্রশংসা করা হয়েছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সেখানে নামায সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ মসজিদের আশেপাশে আনসারীগণ থাকেন, আর তাতে তাঁরাই নামায পড়েন, তারাতো বড় পবিত্র লোক। আপনিও সেখানে নামায পড়ুন।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, যে মসজিদ বুযুর্গগণ নির্মাণ করেছেন অথবা বুযুর্গগণ সেখানে নামায পড়েছেন, অথবা সেটার পাশে কোন বুযুর্গ ব্যক্তি থাকেন কিংবা দাফন হন, সেখানে নামাযের সাওয়াব বেশী। আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেখানে গিয়ে নামায পড়লে তা মহান রবের নিকট পছন্দনীয়। এ থেকে শরীয়ত ও তাসাওফের অনেক

نَتَوَضَّأُ لِلصَّلٰوةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِىْ بِالْمَآءِ فَقَالَ فَهُوَ ذٰكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ

وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ اِنِّىْ لَاَرٰى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتّٰى الْخِرَاءَةَ قُلْتُ اَجَلْ اَمَرَنَا اَنْ لَّا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَنْجِىْ بِاَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِىْ بِدُوْنِ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ لَّيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ وَلَا عَظْمٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهٗ

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ يَدِهٖ

আমরা নামাযের জন্য ওযূ করি। 'জানাবত' (ওই অপবিত্রতা যার কারণে গোসল করা ফরয)'র কারণে গোসল করি আর পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করি।"[৬৯] তখন হুযূর এরশাদ করলেন, "সেটা হলো এ পবিত্রতাই (যার জন্য তোমাদের প্রশংসা করা হয়েছে), তোমরা তা অপরিহার্য করে নাও।[৭০] [ইবনে মাজাহ]

৩৪২।। হযরত সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কতেক মুশরিক বিদ্রূপ করে বললো, "আমরা তোমাদের সাথীকে দেখছি যে, তিনি তোমাদেরকে পায়খানা করা পর্যন্ত শিক্ষা দিচ্ছেন।"[৭১] আমি বললাম, "হ্যাঁ। তিনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা (পায়খানায়) ক্বেবলার দিকে মুখ না করি, ডান হাতে ইস্তিন্জা না করি এবং তিনটির চেয়ে কম পাথর (ইস্তিন্জার জন্য) যথেষ্ট মনে না করি। আর তাতে যেন না গোবর থাকে, না হাড্ডি।[৭২] এ হাদীস ইমাম মুসলিম ও আহমদ বর্ণনা করেছেন। আর এ বচনগুলো হচ্ছে ইমাম আহমদের।

৩৪৩।। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু[৭৩] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট তশরীফ আনলেন। তখন তাঁর পবিত্র হাতে

মাসআলা জানা যেতে পারে। এ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমার লিখিত তাফসীর 'নূরুল ইরফান'-এ দেখুন।

৬৮. এ প্রশ্নোত্তর লোকদেরকে শোনানোর জন্য। অন্যথায় হুযূর-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামতো প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন। যেমন- হুযূর এরশাদ করেছেন- لَايَخْفٰى عَلَىَّ صَلٰوتُكُمْ

অর্থাৎ "আমার নিকট তোমাদের নামায গোপন নয়।"

৬৯. অর্থাৎ ঢিলা নেওয়ার পর পানি দ্বারাও ইস্তিন্জা করি। অথবা শুধু পানি দ্বারাই ইস্তিন্জা করি; ঢিলা দিয়ে নয়। দ্বিতীয় অর্থই বেশী স্পষ্ট। যেমন মিরক্বাত ইত্যাদিতে রয়েছে। অন্যসব লোক শুধু ঢিলা নেওয়াকে যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু এটা শুষ্ক পায়খানার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হতে পারে। পাতলা পায়খানার ক্ষেত্রে পানি দ্বারা ধৌত করা ফরয, যখন এক টাকার মুদ্রার বেশী স্থান লেপ্টে যায়।

৭০. অর্থাৎ পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করো। নামাযের জন্য ওযূ এবং 'জানাবত' (গোসল ওয়াজিবকারী অপবিত্রতা) হতে গোসল তো সকলেই করে থাকে।

৭১. *এমন মা'মুলি বিষয় শিক্ষা দেওয়া তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী; বড় লোক বড় কিছু শিক্ষা দেবেন।*

৭২. সুবহা-নাল্লা-হ! কী প্রজ্ঞাবানসুলভ জবাব! অর্থাৎ এটাতো আমাদের রসূলের পরিপূর্ণতা। তিনি আমাদেরকে কারো মুখাপেক্ষী রাখেন নি। সব কিছু শিখিয়ে দিয়েছেন।

الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ اِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ اُنْظُرُوْا اِلَيْهِ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْحَكَ اَمَا عَلِمْتَ مَا اَصَابَ صَاحِبَ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوْهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِىْ قَبْرِهٖ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِىُّ عَنْهُ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى.

وَعَنْ مَرْوَانَ الْاَصْفَرِ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهٗ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ اِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلَيْسَ قَدْ نُهِىَ عَنْ هٰذَا قَالَ بَلْ

ঢাল ছিলো। তিনি ঢালটি যমীনের উপর রাখলেন। অতঃপর বসে সেটার পেছনে প্রস্রাব করলেন।[৭৪] তখন কাফিরদের কেউ বললো, তাঁকে দেখো তো! তিনি মহিলাদের মতো প্রস্রাব করছেন।"[৭৫] এ কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুনে ফেললেন। আর এরশাদ করলেন, "তোমার জন্য আফসোস! তোমার কি খবর নেই যে, বনী ইস্রাঈলের এক ব্যক্তিকে কি বিপদ স্পর্শ করেছিলো? যখন তাদের শরীরে প্রস্রাব লাগতো, তখন কাঁচি দ্বারা তা কেটে ফেলতো। তখন ওই ব্যক্তি তা করতে তাদেরকে নিষেধ করেছিলো। ফলশ্রুতিতে তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়েছে!"[৭৬] আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ তাঁর নিকট হতে এবং তিনি আবূ মূসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

৩৪৪।। হযরত মারওয়ান আসফার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[৭৭] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ওমরকে দেখলাম যে, তিনি নিজের বাহনের পশুটিকে ক্বেবলার দিকে মুখ করে বসালেন, তারপর বসে সেটার দিকে প্রস্রাব করতে লাগলেন।[৭৮] আমি বললাম, "হে আবূ আব্দুর রহমান! এরূপ করতে কি নিষেধ করা হয় নি?"[৭৯] তিনি বললেন, "বরং

দেখো আমাদেরকে ইস্তিন্জা সম্পর্কে কতোই সুন্দর সুন্দর বিধান দান করেছেন। তোমরাও এসব কথা শিখে নাও।

৭৩. 'হাসানাহ' হচ্ছে তাঁর মাতার নাম। পিতার নাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুত্বা'। তিনি একজন সাহাবী।

৭৪. (درقه) (দারক্বাহ্) হলো চামড়ার ওই ঢাল, যাতে কাঠ এবং আবরণ ব্যবহার করা হয় না; তাই হাল্কা হয়। যুদ্ধের তলোয়ারের আঘাত সহজে প্রতিহত করে নেয়।

ঢালের আড়ালে প্রস্রাব করা থেকে বুঝা গেলো যে, প্রস্রাব করার সময় পুরো শরীর গোপন করা জরুরী নয়। শুধু লজ্জাস্থান গোপন করা যথেষ্ট। কেননা, ঢাল ছোট আকারের হয়ে থাকে।

৭৫. প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের পুরুষগণ অনায়াসে সকলের সামনে উলঙ্গ প্রস্রাব-পায়খানা করে নিতো। সতর, পর্দা ও লজ্জা সবই ইসলাম শিখিয়েছে। তারা এ ইসলামী সভ্যতা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। যেমন, বর্তমানে কতেক বে-দ্বীন মূর্খলোক ইসলামের বিধানাবলী, দাড়ি, নামায ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে। এটা এমনই যে, যেমন- নাক-কান কাটা লোক সুস্থ নাকবিশিষ্ট লোকদেরকে 'নাকবিশিষ্ট' বলে ঠাট্টা করে।

৭৬. জবাবের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে- বনী ইস্রাঈলের শরীয়তে প্রস্রাবের বিধান অত্যন্ত কঠোর ছিলো। যদি কাপড়ে লাগতো তবে জ্বালিয়ে ফেলা হতো, আর শরীরের যে স্থানে লাগতো ওই পরিমাণ কেটে তুলে ফেলতে হতো। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তা পালন না করার পরামর্শ দিলো। এ পরামর্শের কারণে সে কবরের শাস্তিতে গ্রেফতার হলো। অথচ সে এমন কাজে বাধা দিয়েছিলো, যা আত্মার উপর অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ভারী ছিলো। আর তুমি আমাকে এই পর্দা ও লজ্জাবোধ থেকে বারণ করছো, যা না কষ্টদায়ক, না আত্মার উপর ভারী। বলো! তোমার কী অবস্থা হবে?

اِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَاِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذٰى وَعَافَانِيْ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْهَ اُمَّتَكَ اَنْ يَّسْتَنْجُوْا بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثَةٍ اَوْ حَمَمَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ لَنَا فِيْهَا

খোলা ময়দানে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে; কিন্তু যখন তোমার এবং ক্বেবলার মধ্যবর্তীতে কোন বস্তু অন্তরাল থাকে, তা' হলে কোন ক্ষতি নেই।"[৮০] [আবূ দাঊদ]

৩৪৫।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা হতে বের হতেন, তখন বলতেন, "আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী-আয্হাবা 'আন্নিল্ আযা- ওয়া আ-ফা-নী।'' (অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমার কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করেছেন এবং আমাকে আরাম বা শান্তি দান করলেন।)[৮১] [ইবনে মাজাহ]

৩৪৬।। হযরত ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন জিন্দের একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হলো[৮২] তখন তারা আরয করলো, "এয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উম্মতদেরকে নিষেধ করে দিন যেন তারা হাড্ডি, গোবর কিংবা কয়লা দ্বারা ইস্তিন্জা না করে। কেননা, আল্লাহ্ এগুলোর মধ্যে আমাদের

এ থেকে বুঝা গেলো যে, লোকটি বনী ইসরাঈলেরই ছিলো আর এ ঘটনাগুলোও হয়তো ওই যুগে প্রসিদ্ধ ছিলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করুন, হুযূর ওই ব্যক্তির বিদ্রূপের কোন জবাব দিলেন না; বরং অতি নম্রভাবে মাস্'আলাটা বুঝিয়ে দিলেন।

৭৭. তিনি হযরত আয়শা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা'র গোলাম। তিনি তাবে'ঈ। তাঁর থেকে এক বা দু'টি হাদীস বর্ণিত।

৭৮. প্রকাশ থাকে যে, এ ঘটনা মরুভূমির। যেমন, উত্তর থেকে বুঝা যাচ্ছে। তদুপরি, মরুভূমিতেই বাহনের পশু বসানো হয়।

৭৯. এ প্রশ্ন দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সাধারণ সাহাবা ও তাবে'ঈগণের মধ্যে এ কথা প্রসিদ্ধ ছিলো যে, যে কোন অবস্থাতে-ই ক্বেবলামুখী হয়ে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ। এ কারণেই তো ওই তাবে'ঈ হযরত ইবনে ওমরের এ কাজ দেখে আশ্চর্যবোধ করলেন। সুতরাং এ হাদীস ইমাম-ই আ'যমের দলীল।

৮০. এটা হযরত ইবনে ওমরের ইজ্তিহাদী বা নিজস্ব গবেষণাজাত ফাত্ওয়া। মরুভূমি ও বস্তির পার্থক্য হাদীস-ই মারফূ'র মধ্যে নেই। আর এ ফাত্ওয়ার কারণ এ অধ্যায়ের প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি সেখানে এটার উপর পরিপূর্ণ আলোচনা করেছি।

৮১. এখানে দু'টি নি'মাতের জন্য আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে– কষ্টদায়ক বস্তু (বর্জ্য) বের হয়ে যাওয়া আর শান্তি পাওয়া। এভাবে যে, এর সাথে অন্ত্রগুলো বের হয়ে আসে নি। এ কথা মা'মূলী মনে হচ্ছে; কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, এটা মহান নি'মাত।

৮২. নিজের এবং নিজের সম্প্রদায়ের পক্ষ হয়ে ঈমান গ্রহণের জন্য। জিন্দের ঈমান গ্রহণ সংক্রান্ত ঘটনা কয়েক বার সংগঠিত হয়। তন্মধ্যে একবার হযরত ইবনে মাস'উদ

رِزْقًا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤد

بَابُ السِّوَاكِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَآءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

জীবিকা রেখেছেন।" অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা থেকে বারণ করেছেন।[৮৩] [আবূ দাঊদ]

অধ্যায় ঃ মিস্ওয়াক[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৩৪৭।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি না এমন হতো যে, আমি আমার উম্মতের উপর কঠোরতা করবো, তবে আমি তাদেরকে এশার নামায বিলম্বে সম্পন্ন করার এবং প্রত্যেক নামাযের সময় মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।[২] [মুসলিম, বোখারী]

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। ওইবার নির্দেশটি এরশাদ করা হয়েছে।

৮৩. ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, কয়লা ও হাড়সমূহ জিন্দের খাদ্য আর গোবর হচ্ছে তাদের পশুগুলোর খাদ্য। সুতরাং হাদীসের বিপক্ষে এ আপত্তি নেই যে, মু'মিন জিন্ অপবিত্র গোবর কেন আহার করে?' আর এ অভিযোগও করা যাবে না যে, 'যখন তারা অপবিত্র গোবর আহার করে, তখন মানুষের পায়খানাও তাদের খাওয়া উচিত নয় কি? কেননা, তাদের পশুগুলোর খাদ্য এ অপবিত্র বস্তু নয়।'

****

১. مسواك (মিস্ওয়াক) ও سواك (সিওয়াক) سوك (সূ-ক) থেকে গঠিত। এর অর্থ 'মাজা'। 'মিস্ওয়াক' হচ্ছে দাঁতগুলো মাজার বস্তু। শরীয়তের পরিভাষায় 'মিস্ওয়াক' হচ্ছে গাছের ওই শাখা, যা দ্বারা দাঁতগুলো পরিষ্কার করা হয়। সুন্নাত হচ্ছে- তা যেনো কোন ফুল কিংবা ফলবান গাছ না হয়, তিক্ত গাছের শাখা হয়, হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয় এবং দৈর্ঘ্যে যেনো এক বিঘত অপেক্ষা বেশী না হয়; আর মিস্ওয়াক যেনো দাঁতগুলোর প্রস্থে করা হয়, দৈর্ঘ্যে নয়, দাঁতবিহীন ব্যক্তি ও নারীরা মাড়িতে আঙ্গুল বুলিয়ে নেবেন।

কোন্ কোন্ স্থানে মিস্ওয়াক করা সুন্নাত- ওযূতে, ক্বোরআন তেলাওয়াত করার সময়, দাঁতগুলো হলদে বর্ণের হলে, ক্ষুধা পেলে, বেশীক্ষণ যাবৎ নিশ্চুপ থাকলে এবং বিনিদ্র থাকার কারণে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হলে।

হানাফী মযহাবের ইমামদের মতে, মিস্ওয়াক করা ওযূর সুন্নাত, নামাযের সুন্নাত নয়। সুতরাং ওযূসম্পন্ন ব্যক্তি নামাযের জন্য মিস্ওয়াক করবে না।

ইমাম শাফে'ঈর মতে (মিস্ওয়াক) নামাযের সুন্নাত; ওযূর নয়। কারণও সুস্পষ্ট যে, তাঁদের মতে, রক্ত বের হলে ওযূ ভঙ্গ হয় না। সুতরাং মিস্ওয়াক করার কারণে যদি দাঁতে রক্তও বের হয়ে আসে, তবুও তাঁর মতে নামায বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু আমাদের মাযহাবানুসারে প্রবহমান রক্ত ওযূ ভঙ্গ করে দেয়।

২. অর্থাৎ তাদের উপর ফরয করে দিতাম যেনো এশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ হলে পড়ে আর যেনো প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ করে।

এ থকে বুঝা গেলো যে, হুযূর আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে বিধানাবলীর মালিক, যা চাইতেন ফরয করতেন, যা চাইতেন হারাম করতেন। এ কারণে এরশাদ করেছেন, "আমি ফরয করে দিতাম।"

স্মর্তব্য যে, এ হাদীস ইমাম শাফে'ঈর মতে, সেটার প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহৃত; কিন্তু আমাদের মাযহাবানুসারে 'প্রত্যেক

وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِاَىِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا دَخَلَ بَيْتَه، قَالَتْ بِالسِّوَاكِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৮।। হযরত শোরাইহ্ ইবনে হা-নী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু[৩] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হাকে জিজ্ঞাসা করেছি, (আর বলেছি,) "হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে তাশরীফ আনতেন, তখন প্রথমে কি কাজ করতেন?" তিনি বললেন, "মিস্‌ওয়াক।"[৪] [মুসলিম]

৩৪৯।। হযরত হোযায়ফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাজ্জুদের জন্য রাতে উঠতেন, তখন আপন মুখ শরীফ মিস্‌ওয়াক দ্বারা মাজতেন।[৫] [বোখারী, মুসলিম]

নামায' মানে 'সেটার ওযূ'। অর্থাৎ 'ওযূ' শব্দটা উহ্য আছে। কেননা, ইবনে খোযায়মাহ্, ও হাকিম এবং ইমাম বোখারী তাঁর বোখারী শরীফের 'কিতাবুস্ সওম' (রোযা পর্ব)-এর মধ্যে হযরত আবূ হোরায়রা থেকে এ হাদীস শরীফই বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তাতে صلوة শব্দের পরিবর্তে عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ (প্রত্যেক ওযূর সময়)-এর উল্লেখ রয়েছে। আর ইমাম আহমদ প্রমুখের বর্ণনায় আছে- عِنْدَ كُلِّ طُهُوْرٍ (প্রত্যেক পবিত্রতার সময়)। ওই হাদীসগুলো হচ্ছে এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা।

স্মর্তব্য যে, ওযূতেই মিস্‌ওয়াকের তাকীদ রয়েছে বেশী। অন্যথায় ওযূ ছাড়া আরো পাঁচ জায়গায় মিস্‌ওয়াক করা সুন্নাত, যেমনটি এক্ষুনি ইতোপূর্বে আরয করা হয়েছে।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় আছে- 'মিস্‌ওয়াক সহকারে সম্পন্নকৃত নামায মিস্‌ওয়াক ব্যতীত সত্তর নামায অপেক্ষাও উত্তম।'

৩. বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে এটাই যে, হযরত শোরাইহ্ মুজতাহিদ তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁর পিতা হানী ইবনে ইয়াযীদ হলেন সাহাবী। হযরত শোরাইহ্ হুযূরের যমানায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হুযূর হানীকে বললেন, "তোমার সন্তান কয়জন?" আরয করলেন, "তিনজন- শোরাইহ্, আবদুল্লাহ্ ও মুসলিম।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তোমার কুনিয়াৎ (উপনাম) 'আবূ শোরাইহ'।

তিনি সাইয়্যেদুনা আলী মুরতাদ্বার বিশিষ্ট সাথী; বরং তাঁর খিলাফতকালে কাযী (বিচারক) পদে আসীন হন। উষ্ট্র ও সিফফীনের যুদ্ধে তাঁর সাথে ছিলেন। ৭৮ হিজরীতে শহীদ হয়ে যান।

৪. বুঝা গেলো যে, মিস্‌ওয়াক ওযূ ব্যতীত অন্য সময়েও করা উচিত। 'মিরক্বাত' ইত্যাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিস্‌ওয়াকের সত্তরটি উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে একটা হচ্ছে- এর ফলে মৃত্যুকালে কলেমা পড়ার সৌভাগ্য হয়। তাছাড়া এটা পাইওরিয়া রোগ থেকে নিরাপদে রাখে, মুখের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, দাঁতগুলো ও পাকস্থলীকে মজবুত করে এবং চক্ষুযুগলকে আলোকিত করে দেয়। [শামী ইত্যাদি]

প্রসঙ্গতঃ আফীমে রয়েছে সত্তরটি অপকারিতা। তন্মধ্যে একটা হচ্ছে- এর কারণে শেষ পরিণতি খারাপ হবার আশঙ্কা থাকে।

৫. অর্থাৎ ওযূ, বরং শৌচকর্ম সম্পাদনের পূর্বেও, তারপর ওযূর সময় ওটা ব্যতীত আবারও। কারণ, মিস্‌ওয়াক ঘুম থেকে জাগ্রত হবার সময়কারও সুন্নাত, ওযূরও।

وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَآءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَآءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَآءِ يَعْنِى الْاِسْتِنْجَآءَ قَالَ الرَّاوِىُّ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَّفِىْ رِوَايَةٍ اَلْخِتَانُ بَدَلَ اِعْفَآءِ اللِّحْيَةِ لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِىِّ وَلٰكِنْ

৩৫০।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দশটি কাজ নবীগণের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত[৬] – গোঁফ কাটা,[৭] দাড়ি বাড়ানো,[৮] মিস্ওয়াক, নাকে পানি লওয়া, নখ কাটা,[৯] আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলো ধোয়া,[১০] বগলের লোম উপড়ে ফেলা,[১১] নাভীতলের লোম মুণ্ডানো,[১২] পানি ব্যবহার করা অর্থাৎ পানি দ্বারা শৌচকর্ম সম্পন্ন করা[১৩] এবং বর্ণনাকারী বলেছেন, আমি দশম কাজটির কথা ভুলে গেছি, সম্ভবতঃ কুল্লি করা।[১৪] [মুসলিম]

এক বর্ণনায় দাড়ি বাড়ানোর স্থলে খত্না করানোর কথা এসেছে।[১৫] আমি এ বর্ণনা না বোখারী ও মুসলিম (সহীহাঈন)-এর মধ্যে পেয়েছি, না হুমাইদীর কিতাবে পেয়েছি; কিন্তু

৬. فطرت (ফিত্‌রাৎ)-এর আভিধানিক অর্থ 'সৃষ্টি করা'। যেমন মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন– فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা; ৩৫:১)

কিন্তু পরিভাষায়– নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর ওইসব সুন্নাতকে 'ফিত্‌রাৎ' বলে, যেগুলো আমাদের হুযূরেরও আমল ছিলো।

৭. এতটুকু যে, উপরের ওষ্ঠের লাল রং প্রকাশ পাবে, এর চেয়ে বেশী কাটানোও নিষিদ্ধ। কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ আলিম মুজাহিদদের জন্য জিহাদের অবস্থায় গোঁফগুলো বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন। [আশি''আতুল লুম'আত]

৮. চার আঙ্গুল পরিমাণ বাড়ানো ওয়াজিব; এ থেকে কিছুটা বাড়ানো জায়েয; খুব বেশী বাড়ানো মাকরূহ।

চার আঙ্গুল অপেক্ষা কম করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং মুণ্ডানো হারাম; বরং হিন্দু-খ্রিস্টানদের কু-প্রথা। আর যদি কোন নারীর মুখে দাড়ি গজিয়ে যায়, তবে তা মুণ্ডিয়ে ফেলবে।

স্মর্তব্য যে, থুতনীর নিম্নস্থ লোম এক মুষ্ঠির পর কর্তন করাবে, আর এর আশেপাশেও এভাবে রাখবে যেনো চুলের (দাড়ি) বৃত্ত হয়ে যায়। সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমার এটাই নিয়ম ছিলো। [বোখারী শরীফ]

ক্বোরআন-ই হাকীমে এরশাদ হয়েছে– وَلَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِىْ (হযরত হারূন বলেছিলেন, 'আমার দাড়ি ধরো না; ২০:৯৪) বুঝা গেলো যে, এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা নবীগণের সুন্নাত, যা পবিত্র ক্বোরআন থেকে প্রমাণিত।

৯. হাত ও পায়ের। এভাবে যে, প্রথমে ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে কনিষ্ঠায় শেষ করবে। তারপর বাম হাতের কনিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করবে। তারপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কেটে নেবে। তারপর ডান পায়ের কনিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে বাম পায়ের কনিষ্ঠায় শেষ করবে। জুমু'আর দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। আর বৃহস্পতিবার আসরের নামাযের পর খুব ভালো। প্রত্যেক সপ্তাহে কিংবা পনর দিনে একবার কাটবে। চল্লিশ দিনের বেশী না কেটে রাখবে না।

১০. খানা ইত্যাদি খেয়ে অথবা অন্য কোন কাজ করে। এখানে হাতের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ মানে পুরো আঙ্গুলগুলো।

১১. উপড়ে ফেলা সুন্নাত, মুণ্ডানো জায়েয।

১২. সুন্নাত। চুনা (লোমনাশক ক্রিম) ইত্যাদি দ্বারা পরিস্কার করাও জায়েয। কাঁচি দ্বারা কেটে ফেলা সুন্নাতের পরিপন্থী।

ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ وَكَذَا الْخَطَّابِىُّ فِىْ مَعَالِمِ السُّنَنِ عَنْ اَبِىْ دَاوٗدَ بِرِوَايَةِ عَمَّارِبْنِ يَاسِرٍ.

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ وَالدَّارِمِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ فِىْ صَحِيْحِهٖ بِلَا اِسْنَادٍ.

وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْحَيَاءُ

সেটাকে জামে' প্রণেতা এবং এভাবেই খাত্তাবী 'মা'আ-লিমুস্ সুনান'-এ আবূ দাউদ ও 'আম্মার ইবনে ইয়াসির থেকে বর্ণনা করেছেন।[১৬]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৩৫১।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মিস্ওয়াক মুখকে পরিষ্কার করে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মাধ্যম।[১৭]

এটা সর্বইমাম শাফে'ঈ, আহমদ, দারেমী ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বোখারী আপন সহীহ্তে সনদ (সূত্র) উল্লেখ করা ব্যতীত বর্ণনা করেছেন।

৩৫২।। হযরত আবূ আইয়ূব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, চারটি কাজ পয়গাম্বরদের সুন্নাতগুলোর অন্তর্ভুক্ত[১৮] ঃ লজ্জাবোধ,

---

এসব বিধানে নারী ও পুরুষ সমান। [মিরক্বাত]

১৩. অর্থাৎ পায়খানা-প্রস্রাব থেকে শৌচকর্ম পানি দ্বারা সম্পন্ন করা সুন্নাত। আর যদি অপবিত্রতা দিরহাম (টাকার মুদ্রা) পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হলে তা ফরয।

১৪. বর্ণনাকারী মানে মাস'আব অথবা যাকারিয়া ইবনে আবূ যা-ইদাহ্। [মিরক্বাত]

১৫. ছেলের খত্না করা সুন্নাত। সপ্তম দিন থেকে আরম্ভ করে সপ্তম বছর পর্যন্ত করা যায়। বালেগ হবার পূর্বে হওয়া জরুরী। বালেগ হবার পর তার জন্য সতর (গোপনাঙ্গ) খোলা হারাম। কোন যুবক পুরুষ ঈমান আনলে খত্নার কাজ জানে এমন নারীর সাথে তার বিবাহ করানো হবে, যেন সে তার খত্না করায়; অন্যথায় নয়।

১৬. এটা 'মাসাবীহ্' প্রণেতার বিরুদ্ধে আপত্তি। তাহচ্ছে- 'প্রথম অধ্যায়ে তিনি সহীহাঈন (বোখারী ও মুসলিম) ব্যতীত অন্য কিতাবের বর্ণনা কেন নিয়ে এসেছেন?'

১৭. অর্থাৎ তাতে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে। স্মর্তব্য যে, 'মিস্ওয়াক' দ্বারা মুসলমানের ইবাদতের নিয়্যত বুঝানো হয়েছে। কাফিরদের মিস্ওয়াক করা এবং মুসলমানদের নিছক অভ্যাসগত মিস্ওয়াক করা- যদিও মুখ পরিষ্কার করে দেবে, কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হবে না। তাছাড়া, যদিও মিস্ওয়াকে পার্থিব ও ধর্মীয় বহু উপকারিতা রয়েছে, কিন্তু এখানে শুধু দু'টি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। তা হয়তো এ জন্য যে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নতুবা এজন্য যে, অন্যান্য উপকারিতা এ দু'এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মুখ পরিষ্কার থাকলে পাকস্থলীর ক্ষমতা বাড়ে এবং আরো অগণিত রোগ থেকে মুক্তি রয়েছে। আর যখন মহান রব সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, তখন আর অভাব কিসের?

১৮. এ সুন্নাতগুলো বাণীগতও হতে পারে, কার্যতও (হতে পারে)। সুতরাং এ আপত্তি করার অবকাশ থাকে না যে, হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহ্য়া আলায়হিমাস্ সালাম বিয়ে করেন নি। কেননা, ওই বুযুর্গদ্বয় তাঁদের অনুসারীদেরকে

وَيُرْوٰى الْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ .رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَّ لَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ اَنْ يَّتَوَضَّأَ .رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ .

وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيْنِى السِّوَاكَ لِاَغْسِلَه فَاَبْدَأُ بِه فَاَسْتَاكُ ثُمَّ اَغْسِلُه وَاَدْفَعُه اِلَيْهِ .رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ

অন্য এক বর্ণনামতে, খত্‌না,[১৯] আতর লাগানো, মিস্‌ওয়াক করা ও বিয়ে করা।[২০] [তিরমিযী]

৩৫৩।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাত ও দিনে, যখনই শয়ন করে উঠতেন, ওযূর পূর্বে মিস্‌ওয়াক করতেন।[২১] [আহমদ, আবূ দাঊদ]

৩৫৪।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিস্‌ওয়াক করে আমাকে তা ধোয়ার জন্য দিতেন।[২২] তখন আমি প্রথমে তা দ্বারা মিস্‌ওয়াক করে নিতাম, তারপর ধু'য়ে হুযূরকে দিতাম।[২৩] [আবূ দাঊদ]

বিয়ের প্রতি অবশ্যই উৎসাহিত করেছেন।

১৯. অর্থাৎ কোন কোন কপিতে মেহেন্দীও রয়েছে। কিন্তু সেটা ভুল। কেননা, পুরুষের জন্য হাতে ও পায়ে সাজসজ্জার জন্য মেহেন্দী লাগানো কোন নবীর সুন্নাত নয়; বরং নিষিদ্ধ ছিলো। দাড়িতে মেহেন্দী লাগানো ইসলামের সুন্নাত; কোন নবী লাগান নি। [মিরক্বাত]

মানে ওই লজ্জাবোধ, যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচায়। খত্‌না হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সুন্নাত। তাঁর থেকে আরম্ভ করে আমাদের নবী পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর দ্বীনে সুন্নাতই থাকে।

'মিরক্বাত' ইত্যাদিতে আছে- নিম্নলিখিত পয়গাম্বরগণ খত্‌নাকৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছেন ঃ হযরত আদম, হযরত শীস, হযরত নূহ, হযরত হূদ, হযরত সালিহ, হযরত লূত্ব, হযরত শো'আয়ব, হযরত ইয়ূসুফ, হযরত মূসা, হযরত সুলায়মান, হযরত যাকারিয়া, হযরত ঈসা, হযরত হানযালাহ্‌ এবং আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা আলায়হিমুস সালাতু ওয়াস্ সালাম। আল্লামা শামীও কিছুটা কমবেশী সহকারে এ মাস্'আলা বর্ণনা করেছেন।

২০. আতর মানে যে কোন খুশ্‌বু ব্যবহার করা; কাপড়ে হোক কিংবা শরীরে।

স্মর্তব্য যে, এখানে 'চার' সংখ্যাটা সীমাবদ্ধকরণের জন্য নয়; নবীগণের আরো অনেক সুন্নাত রয়েছে; ওইগুলোর মধ্যে এ চারও রয়েছে।

২১. প্রকাশ তো এটাই রয়েছে যে, এ মিস্‌ওয়াক ওযূর মিস্‌ওয়াক ছাড়াই, যার গণনা ওযূর মধ্যে ছিলো না। অর্থাৎ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েও মিস্‌ওয়াক করতেন এবং ওযূতেও। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ওযূ ব্যতীত এমন প্রতিটি স্থানে মিস্‌ওয়াক সুন্নাত, যেখানে মুখে দুর্গন্ধ পয়দা হবার সম্ভাবনা থাকে।

২২. এ হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটা মাস'আলা বুঝা গেলো-

এক. মিস্‌ওয়াক ধুয়েই ব্যবহার করা চাই। করার সময়ও দু'বার ধোয়া চাই এবং ধুয়েই রাখা চাই।

দুই. মিস্‌ওয়াক অন্য কারো দ্বারা ধোয়ানোও জায়েয।

তিন. অন্য কারো মিস্‌ওয়াক ব্যবহার করাও জায়েয; যদি মিস্‌ওয়াকের মালিক অসন্তুষ্ট না হয়।

২৩. হুযূরের থু থু শরীফ বরকতের জন্য ব্যবহার করা সুন্নাত-ই সাহাবা। হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা বরকত হাসিল করার জন্য এ মিস্‌ওয়াক করতেন। তারপর ধুয়ে হুযূরের খিদমতে পেশ করতেন। অন্যথায়, নারীদের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে- দাঁতের মাজন ব্যবহার করা, আঙ্গুল দিয়ে দাঁত সাফ করা; কারণ তাদের দাঁতের মাড়ি নরম হয়ে থাকে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِىْ فِى الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَآءَنِىْ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِىْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهٗ اِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاجَآءَنِىْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ اِلَّا اَمَرَنِىْ بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اُحْفِىَ مُقَدَّمَ فِىَّ. رَوَاهُ اَحْمَدُ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৩৫৫।। **হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মিস্ওয়াক করছি। আমার নিকট দু'জন লোক আসলো, যাদের মধ্যে একজন অপরজন অপেক্ষা বড়। আমি মিস্ওয়াক ছোটজনকে দিলাম। তখন আমাকে বলা হলো, "বড়জনকে দিন!" সুতরাং আমি বড় লোকটিকে দিলাম।"[২৪]** [মুসলিম, বোখারী]

৩৫৬।। হযরত আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার নিকট জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম যখনই এসেছে,[২৫] তখন আমাকে মিস্ওয়াক করতে বলেছে। আমার ভয় ছিলো- কখনো আমার মুখের সম্মুখভাগ ছিলে ফেলবো কিনা।[২৬] [আহমদ]

---

২৪. খুব সম্ভব তারা উভয়ে একই পাশে ছিলো। ছোটজন হুযূরের নিকটে ছিলো। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নৈকট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রথমে তাকে দিলেন। তখন মহান রবের পক্ষ থেকে এরশাদ হলো, "নৈকট্যের উপর বড়ত্বকে প্রাধান্য দিন!"

যদিও এ ঘটনা স্বপ্নের, কিন্তু নবীর স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। সুতরাং এখন নির্দেশ এটাই যে, মিস্ওয়াক কিংবা অন্য কোন জিনিষ তারতীব বা ক্রমানুসারে দেওয়া চাই। সুতরাং বড়কে প্রথমে দেওয়া হবে; এ শর্তে যে, যদি উভয়ে একই দিকে থাকে। আর যদি উভয়ে উভয় পাশে থাকে, তবে প্রথমে ডান দিকের লোককে দেওয়া হবে, তারপর বাম দিকের লোককে। অন্যান্য হাদীসে এমনই রয়েছে। সুতরাং হাদীসগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ নেই।

স্মর্তব্য যে, স্বপ্নে ওই দু'জন আগমনকারী ফিরিশ্তা ছিলেন, যাঁরা মানুষের আকৃতিতে এসেছিলেন। আর মিস্ওয়াক নমুনাস্বরূপ দেখানো হয়েছে; যাতে তা দ্বারা শরীয়তের মাস্আলাদি জানা যায়। যেমন- নিজের মিস্ওয়াক অন্য জনকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া যেতে পারে। আর দেওয়ার পদ্ধতিও এমনি হবে।

অনুরূপ, হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম-এর পবিত্র দরবারে দু'জন ফিরিশ্তা মানুষের আকৃতিতে এসেছিলেন এবং মেষগুলোর মাস্আলা পেশ করেছিলেন।

২৫. সুন্নাতসমূহের বিধান ও নিয়মাবলী বলে দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ যে সুন্নাতের কথাই বলেছেন, মিস্ওয়াকের কথাও এর সাথে আরম্ভ করেছেন। সুতরাং হাদীসের বিপক্ষে এ আপত্তি নেই যে, 'ক্বোরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথেও কি মিস্ওয়াকের নির্দেশ এসেছে?'

স্মর্তব্য যে, নির্দেশদাতা হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। জিব্রাঈল আমীন তা পৌঁছিয়ে দেন। এখানে নির্দেশ'-কে 'কারণ' (মাধ্যম)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ নির্দেশ মুস্তাহাব সূচক। সুতরাং এতে একথা অপরিহার্য হয় না যে, 'মিস্ওয়াক করা ফরয হোক!'

২৬. অর্থাৎ এতো বেশী পরিমাণে মিস্ওয়াক করবো যেন দাঁতের মাড়ি ছিঁড়ে যায়- সেটার কথা বারংবার আরম্ভ করার কারণে।

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِى السِّوَاكِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهٗ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَاُوْحِىَ اِلَيْهِ فِىْ فَضْلِ السِّوَاكِ اَنْ كَبِّرْ اَعْطِ السِّوَاكَ اَكْبَرَهُمَا. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤدَ

وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَفْضُلُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلٰوةِ الَّتِىْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ

৩৫৭।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদেরকে মিস্ওয়াক সম্পর্কে অনেক বলেছি।"[২৭] [বোখারী]

৩৫৮।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনুহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিস্ওয়াক করছিলেন। আর হুযূরের পাশে দু'জন লোক ছিলো, যাদের মধ্যে একজন অপরজন থেকে বড় ছিলো। অতঃপর হুযূরকে অবশিষ্ট মিস্ওয়াক সম্পর্কে ওহী করা হলো- বড় লোকটিকে বিবেচনায় রাখুন! অর্থাৎ বড়জনকে দিন।[২৮] [আবু দাঊদ]

৩৫৯।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে নামাযের জন্য মিস্ওয়াক করা হয়, তা ওই নামায অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশী, যার জন্য মিস্ওয়াক করা হয় না।[২৯] এটা ইমাম বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।

২৭. অর্থাৎ বারংবার এবং বিভিন্নভাবে তোমাদেরকে মিস্ওয়াক করার প্রতি উৎসাহিত করেছি; কখনো সেটার ধর্মীয় উপকারিতা বর্ণনা করেছি, কখনো পার্থিব। তাছাড়া, সবসময় তা কাজে পরিণত করে দেখিয়েছি, যাতে তোমরাও সর্বদা মিস্ওয়াক করো।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, মিস্ওয়াক করা ফরয নয়; অন্যথায় বর্ণনাভঙ্গি অন্যরূপ হতো।

২৮. খুব সম্ভব এটা জাগ্রতাবস্থার ঘটনা; স্বপ্নের ঘটনা ছাড়া। সুতরাং এটা ওই স্বপ্নের ব্যাখ্যা। এটিও হতে পারে যে, ওই স্বপ্নের কথাই উল্লেখ করা হচ্ছে। এর ব্যাখ্যা স্বপ্নের বর্ণনা সম্বলিত হাদীসে করা হয়েছে।

২৯. আলোচ্য হাদীস শরীফ আপন প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহৃত। 'সত্তর' সংখ্যাটা বেশী বুঝানোর জন্য এসেছে। যেমন উর্দুতে বলা হয়- بیسوں سیکڑوں (বিশ-বিশ, শত-শত)। কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ আলিম বলেছেন যে, কখনো সুন্নাতের সাওয়াব ফরয ও ওয়াজিব অপেক্ষাও বেড়ে যায়। দেখুন, জমা'আত পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য ওয়াজিব এবং জুমু'আহ্ ও দু'ঈদের জন্য ফরয। কিন্তু সেটার সাওয়াব ২৭ গুণ বেশী। আর মিস্ওয়াক হচ্ছে সুন্নাত; কিন্তু সেটার সাওয়াব সত্তর গুণ বেশী।

অনুরূপ, সালাম করা সুন্নাত এবং জবাব দেওয়া ফরয। কিন্তু সালাম দেওয়ার সাওয়াব জবাব দেওয়ার চেয়ে বেশী।

এটাও হতে পারে যে, জমা'আতের সাতাশ গুণ মর্যাদা এমন হবে, যার প্রতিটি মর্যাদা মিস্ওয়াকের সত্তর গুণ মর্যাদার সমান।

وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدِ نِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَلَاَخَّرْتُ صَلٰوةَ الْعِشَآءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُبْنُ خَالِدٍ يَّشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِى الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهٗ عَلٰى اُذُنِهٖ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُوْمُ اِلَى الصَّلٰوةِ اِلَّا اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهٗ اِلٰى مَوْضِعِهٖ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوٗدَ اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ وَلَاَخَّرْتُ صَلٰوةَ الْعِشَآءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩৬০।। হযরত আবূ সালামাহ[৩০] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি যায়দ ইবনে খালেদ জুহানী থেকে[৩১] বর্ণনাকারী। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, "যদি আমি আমার উম্মতের উপর ভারী মনে না করতাম, তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম এবং এশার নামাযকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে দিতাম।[৩২] তিনি বলেন, যায়দ ইবনে খালেদ মসজিদে নামাযের জন্য এভাবে আসতেন যে, তাঁর মিস্ওয়াক তাঁর কানের উপর থাকতো। যেমন মুন্শীর কানে কলম। যখনই তিনি নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হতেন, তখন মিস্ওয়াক করে নিতেন। তারপর সেখানেই মিস্ওয়াক রেখে দিতেন।[৩৩] এটা ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু আবূ দাঊদ لَاَخَّرْتُ (আমি পিছিয়ে দিতাম) উল্লেখ করেন নি। ইমাম তিরমিযী বলেছেন- এ হাদীস 'হাসান-সহীহ'।

৩০. তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে 'আওফ। ক্বোরাঈশ বংশীয় 'যোহরাহ্' গোত্রীয় লোক। মদীনা মুনাওয়ার সাতজন প্রসিদ্ধ ফক্বীহ্র অন্যতম। শীর্ষস্থানীয় তাবে'ঈ। ৭২ বছর বয়সে ৯৭ হিজরীতে ওফাত পান।

৩১. প্রসিদ্ধ সাহাবী। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগে ৭৮ হিজরীতে কুফায় ইন্তিকাল করেন। [মিরক্বাত ও আশি''আহ্]

৩২. অর্থাৎ এ দু'টি কাজকে ফরয করে দিতাম। তখন মিস্ওয়াক না করলে নামাযই হতো না এবং রাতের এক তৃতীয়াংশের পূর্বে এশার নামায অবৈধ হতো।

বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিধি-নিষেধের মালিক করেছেন- তিনি ইচ্ছা করলে ফরয করতেন, ইচ্ছা না হলে ফরয করতেন না।

৩৩. এটা হযরত যায়দ ইবনে খালিদের নিজস্ব ইজ্তিহাদ ছিলো। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী, বরং খোদ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করেন নি। হযরত যায়দ كُلِّ صَلٰوةٍ (কুল্লি সালা-তিন) দ্বারা প্রত্যেক নামায বুঝিয়েছেন। অথচ ওখানে নামাযের ওযূ বুঝানো উদ্দেশ্য। যেমন, আমি শুরুতে বিশ্লেষণ করেছি। এ কাজ হচ্ছে তেমনি, যেমন হযরত আবূ হোরায়রা অলঙ্কার-এর হাদীস শুনে ওযূতে বগল পর্যন্ত হাত ধুতেন। সুতরাং এ আমল অনুসরণযোগ্য নয়। আমি কুয়েতে কোন কোন শাফে'ঈ-মাযহাবের অনুসারীকে দেখেছি- তাদের গলায় মিস্ওয়াক ঝুলানো থাকে। তারা প্রত্যেক নামাযের নিয়্যত করার সময় মিস্ওয়াক করছিলো; অথচ মিস্ওয়াককে দাঁড় করিয়ে রাখা সুন্নাত।

খুব সম্ভব হযরত যায়দ كُلِّ صَلٰوةٍ দ্বারা প্রত্যেক ওয়াক্বতের নামায বুঝে নিয়েছেন; 'প্রত্যেক নামায' মনে করেন নি। সুতরাং তিনি এক ওয়াক্বতের সমস্ত নামাযের জন্য এক বার মাত্র মিস্ওয়াক করে নিতেন। কিন্তু কুয়েতের ওইসব লোক আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন- প্রত্যেক নামাযের জন্য কয়েকবার করে মিস্ওয়াক করতে আরম্ভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হাদীসের বিশুদ্ধ বুঝ দান করুন।

****

بَابُ سُنَنِ الْوُضُوْءِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَّوْمِهٖ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهٗ فِى الْاِنَاۤءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلٰثًا فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অধ্যায় ঃ ওযূর সুন্নাতসমূহ[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৩৬১। । হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন সে যেন নিজের হাত পানির পাত্রে না চুবায়- যে পর্যন্ত না তা তিনবার ধু'য়ে নেয়। কেননা, সে জানে না (ঘুমের মধ্যে) তার হাত কোথায় ছিলো।[২] [বোখারী, মুসলিম]

১. سنن (সুনান) শব্দটি سنة শব্দের বহুবচন। سنة (সুন্নাত) শব্দের আভিধানিক অর্থ- তরীক্বা, নিয়ম-নীতি, পথ বা পদ্ধতি। মহান রব এরশাদ করেন-

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا

অর্থাৎ "নিয়ম তাদেরই, যাদেরকে আমি আপনার পূর্বে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি।" (১৭:৭৭, কান্‌যুল ঈমান)। আরো এরশাদ করেন- سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়মগুলো...। ২ : ২১)।

শরীয়তের পরিভাষায়, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওইসব ফরমানকে 'সুন্নাত' বলা হয়, যেগুলোর কথা আল্লাহ্‌র কিতাব (পবিত্র ক্বোরআন)- এ সরাসরি উল্লেখ নেই এবং হুযূরের ওই সব পবিত্র আমল (কর্ম), যেগুলো উম্মতের জন্য আমলের (পালন) উপযোগী। সুতরাং রহিত (منسوخ) ও হুযূরের জন্য খাস আমলসমূহ 'সুন্নাত'র অন্তর্ভুক্ত নয়। হুযূর আপন পবিত্র অভ্যাস অনুসারে যা করেছেন, তা সুন্নাত-ই যা-ইদাহ্ আর যা ইবাদত হিসেবে করেছেন তা সুন্নাত-ই হাদী (هدى)'র অন্তর্ভুক্ত। যা সর্বদা করেছেন তা সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্। যা কখনো কখনো করেছেন তা সুন্নাত-ই গায়রে মুআক্কাদাহ্। আর যে কাজ হুযূর সর্বদা করেছেন, সাথে সাথে তা পালনের জন্য তাকীদ সহকারে নির্দেশও দিয়েছেন, তা ওয়াজিব।

স্মর্তব্য যে, ওযূর মধ্যে ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কার্যাদি তো রয়েছে; কিন্তু কোন ওয়াজিব কাজ নেই।

২. আরববাসী লুঙ্গি পরিধান করতেন আর যতবার প্রস্রাব করতেন ততবার শুধু ঢিলা দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করে শুয়ে পড়তেন। হাদীসের অর্থ এ যে, যখন লোকদের আমল (কর্ম)-ই এমন, তখন এমনও হতে পারে যে, ঘুমন্ত অবস্থায় হাত হয়তো ইস্‌তিন্‌জার স্থলে পৌঁছে যায়। ওই স্থানও এমন হতে পারে যে, ঘর্মসিক্ত হয়েছে। ইত্যবসরে লুঙ্গি খুলে গেছে, আর তোমার হাত এই স্থানে লেগেছে, যেখানে প্রস্রাব ঢিলা দ্বারা শুষ্ক করা হয়েছিলো আর ঘাম আসার কারণে তা নাপাক হয়ে গেছে। সুতরাং এখন যদি তুমি পানির পাত্রে (গামলা) স্বীয় হাত ঢুকিয়ে দাও, তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তাই প্রথমে পাত্রের বাইরে কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত ধু'য়ে নাও।

এ হাদীসের ভিত্তিতে (কব্জি পর্যন্ত দু'হাত ধোয়ার ব্যাপারে) বিজ্ঞ আলিমদের মধ্যে বড় মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ এ ধোয়াকে নিঃশর্তভাবে ফরয বলেছেন, কেউ কেউ শুধু নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর ধোয়াকে ফরয বলেছেন। আর কেউ কেউ ওই পানিকে অপবিত্র বলেছেন, যাতে এভাবে হাত চুবিয়ে নেওয়া হয়। হানাফী মাযহাবের ইমামদের মতে, এ ধোয়া নিঃশর্তভাবে ওযূর সুন্নাত। তা নিদ্রা থেকে জেগে হোক, কিংবা তেমন না-ই হোক।

অথবা নিদ্রার পূর্বে ঢিলা দ্বারা ইসতিন্‌জা করা হোক, কিংবা না-ই করা হোক। লুঙ্গি পরিধান করা হোক, কিংবা না পরা হোক। কেননা, সেখানে হাত লাগা ধোয়ার হুকুমের 'কারণ' (علت حكم) নয়, বরং নির্দেশ দেওয়ার হিকমতই (حكمت حكم)। কারণ (علت) ও হিকমতের (حكمت)মধ্যে পার্থক্য খুব ভালভাবে মনে রাখা উচিত।

স্মর্তব্য যে, নিদ্রা হয়তো প্রস্রাবের মতো 'হাদস' বা ওযূ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهٖ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلٰثًا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِوُضُوْءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهٗ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهٖ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى

৩৬২।। তাঁরই (হযরত আবূ হোরায়রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, অতঃপর সে ওযূ করে, তখন সে যেন তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে নেয়। কেননা, শয়তান তার নাকের বাঁশির উপর রাত যাপন করে।[৩] [বোখারী, মুসলিম]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়দ ইবনে 'আ-সিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলা হলো,[৪] "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ওযূ করতেন?" তখন তিনি পানি তলব করলেন। অতঃপর নিজ দু'হাতের উপর পানি ঢাললেন। দু'হাত দু'বার করে ধৌত করলেন।[৫] অতঃপর কুল্লি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন তিনবার। তারপর তিনবার মুখ ধুলেন। তারপর উভয় হাত দু'বার কুনুই পর্যন্ত ধুলেন। অতঃপর উভয় হাত দ্বারা আপন মাথা মসেহ করলেন এভাবে যে, হাত দু'টি সামনে পেছনে নিয়ে গেলেন। মাথার অগ্রভাগ হতে শুরু করলেন। তারপর তা ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর পুনরায় হাত সামনের দিকে ফিরিয়ে ওই স্থানে ফিরিয়ে আনলেন,

ভঙ্গকারী অপবিত্রতা, নতুবা 'মুবাশারাত' (বিবস্ত্র অবস্থায় পুরুষের লজ্জাস্থান নারীর লজ্জাস্থানের সাথে লাগা)'র মতো ওযূ ভঙ্গকারী অপবিত্রতার কারণ। অন্যথায় প্রস্রাবের পর হাত ধোয়া ফরয। উল্লেখিত মুবাশারাতের পর নয়। সুতরাং নিদ্রার পর তা কেন ফরয হবে?'

৩. এ হাদীস আপন প্রকাশ্য অর্থের উপর রয়েছে। আর 'শয়তান' দ্বারা ওই সহচরকে বুঝানো হয়েছে, যে সর্বদা মানুষের সাথে থাকে। জাগ্রত অবস্থায় মন্দকর্মের পরামর্শ দেয়, নিদ্রাকালে নাকের উপর গিয়ে বসে, যাতে মস্তিষ্কে মন্দ-ধারণাসমূহ সৃষ্টি করে, যেহেতু নাক এ কারণে আবর্জনাময় হয়ে গেছে, সেহেতু ওযূতে তাও ধুয়ে নেওয়া হয়।

স্মর্তব্য যে, প্রতিটি ওযূতে নাক পরিষ্কার করা সুন্নাত– নিদ্রার পরে হোক কিংবা অন্য সময়। তেমনিভাবে কব্জি পর্যন্ত হাত ধোয়াও প্রত্যেক ওযূতে সুন্নাত। কেননা, এটা علت حكم (নির্দেশের কারণ) নয়, বরং حكمت حكم (বিধানের হিকমত)। এতে বুঝা গেলো যে, যেখানে অপবিত্র ব্যক্তি বসে, ওই স্থান ধুয়ে ফেলা ভাল। কেননা, ওযূতে নাক এজন্যই ধৌত করা হয় যে, সেখানে নাপাক শয়তান বসেছিলো।

৪. তিনি আনসারী, মাযেনী। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওযূ করাতেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়দ ইবনে আব্দুল্লাহ্ হলেন অন্যজন। তাঁকে আযান-ওয়ালা বলা হতো। এ কথা প্রসিদ্ধ যে, তিনি হযরত ওয়াহশীর সাথে মিলে ভণ্ডনবী মুসায়লামা কায্যাবকে হত্যা করেছেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে হুযূরের সাথে ছিলেন। হার্‌রার যুদ্ধে ৭৩ হিজরীতে শহীদ হন।

৫. দু'বার হাত ধোয়া বৈধতা বর্ণনার জন্য; যাতে বুঝা যায় যে, এভাবেও ওযূ হয়ে যায়। অন্যথায় তিনবার হাত ধোয়া সুন্নাত। কেননা, অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু

الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَمِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِىُّ وَلِاَبِىْ دَاؤُدَ نَحْوُهٗ ذَكَرَهٗ صَاحِبُ الْجَامِعِ وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِاِنَاءٍ فَاَكْفَأَمِنْهُ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلٰثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلٰثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلٰثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَهَا

যেখান হতে আরম্ভ করেছিলেন।[৬] অতঃপর আপন দু'পা ধুলেন।[৭] (মালিক, নাসাঈ) আর ইমাম আবূ দাউদের বর্ণনাও তেমনি যেমন জামে' গ্রন্থ প্রণেতা বর্ণনা করেছেন।[৮]

আর মুসলিম ও বোখারীর বর্ণনায় আছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়দ ইবনে 'আ-সিমকে বলা হলো, "আপনি আমাদের সামনে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওযূ করুন।" তখন তিনি পানির পাত্র তলব করলেন। তা থেকে হাতের উপর পানি নিয়ে তিনবার ধুলেন। অতঃপর আপন হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করালেন। তারপর বের করলেন।[৯] তারপর এক অঞ্জলী পানি দ্বারা কুল্লি করলেন এবং নাকের ভেতর পানি দিলেন।[১০] এটা তিনি তিনবার করলেন। তারপর আপন হাত পানিতে প্রবেশ করিয়ে বের করলেন এবং আপন মুখ তিনবার ধুলেন। তারপর আবার হাত (পাত্রে) প্রবেশ করিয়ে বের করলেন,

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিনবার করে ওযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করে এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশী বা কম করে সে মন্দ করলো। হযরত আব্দুল্লাহ্ শুধু হুযূরের কর্মগুলো উল্লেখ করেছেন। এজন্য 'বিসমিল্লাহ্' বা 'নিয়্যত'-এর কথাও উল্লেখ করেন নি। ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার দো'আসমূহও উল্লেখ করেন নি। 'মিস্ওয়াক' ওযূর জন্য খাস নয়। অন্যান্য সময়ও করা যায়। এজন্য সেটার উল্লেখ করেন নি। [মিরক্বাত]

৬. প্রকাশ থাকে যে, মাথা মুবারক একবারই মসেহ করেছেন। তিনবার মসেহ করা দ্বারা মাথা ধৌত হয়ে যায়। আর মাথা ধোয়া সুন্নাত নয়। স্মর্তব্য যে, এক চতুর্থাংশ মাথা মসেহ করা ফরয আর পুরো মাথা মসেহ করা সুন্নাত। এখানে মসেহের সুন্নাতের উল্লেখ রয়েছে। (পুরো মাথা মসেহ করার নিয়ম হলো এই যে,) উভয় হাতের তিন আঙ্গুল (কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা) মুখোমুখী করে মাথার উপরিভাগের সামনের অংশে রেখে মাথার শেষ অংশ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। পেছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসার সময় এ আঙ্গুলগুলো পৃথক করে শুধু হাতের উভয় তালু মাথার দু'পার্শ্বে লাগাবে এবং সামনের দিকে টেনে আনবে। এটাই এখানে বুঝানো হয়েছে। শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভেতরের অংশ মসেহ করবে আর বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা কানের বর্হিভাগ মসেহ করবে। মাথা মসেহ করার মুস্তাহাব নিয়ম এটাই।

৭. গোড়ালী সহকারে তিনবার ধৌত করলেন; যেমন অন্য বর্ণনায় রয়েছে। অতএব, এ হাদীস এক দিক দিয়ে 'মুজমাল' বা সংক্ষিপ্ত।

৮. অর্থাৎ ইবনে আসীর যিনি, 'জামি'উল উসূল' (جامع الاصول) গ্রন্থের প্রণেতা, যাতে সিহাহ্ সিত্তার হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন। এ ইবারতে গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি প্রথম পরিচ্ছেদে ওই হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা বোখারী ও মুসলিম শরীফে নেই।

৯. অর্থাৎ ছোট পাত্র মওজুদ ছিলো না; বরং বড় কলসী বা মটকার মধ্যে পানি ছিলো। ফলে তিনি কব্জি পর্যন্ত হাত তো পানি বের করে ধুলেন। তারপর কুল্লি ইত্যাদি করার জন্য তাতে হাত ঢুকিয়ে পানি নিলেন।

স্মর্তব্য যে, আমাদের হানাফী মাযহাবে 'ব্যবহৃত পানি' (ماء مستعمل) হচ্ছে সেটাই, যা দ্বারা 'হাদাস' বা হুকমী নাপাকী (বিধানগত দৃষ্টিতে অপবিত্রতা) দূরীভূত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। অথবা যা সাওয়াবের নিয়্যতে ওযূ কিংবা গোসলের মধ্যে ব্যবহার করা হয়। এখানে ওইগুলো হতে

فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَه، فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَاْسِهٖ فَاَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَاَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَ اَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَاْسِهٖ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَاَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلٰثًا بِثَلٰثِ غُرُفَاتٍ مِنْ مَّاءٍ وَفِىْ اُخْرٰى فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلٰثًا وَّ فِىْ

তখন কুনুই পর্যন্ত উভয় হাত দু'দুবার করে ধৌত করলেন। তারপর পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে বের করলেন। তখন মাথা মসেহ করলেন। আর (মসেহ করার সময়) উভয় হাত মাথার সামনে-পেছনে নিয়ে গেলেন। তারপর গোড়ালী সমেত পা দু'টি ধুলেন।[১১] অতঃপর বললেন, "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওযূ এরূপই ছিলো।"[১২]

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, দু'হাত মাথার আগে-পেছনে নিয়ে গেলেন। মাথার অগ্রভাগ হতে শুরু করেছেন, তারপর ওই দু'টি ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, তারপর ওই স্থান পর্যন্ত ফিরিয়ে আনলেন যেখান থেকে শুরু করেছেন। আপন পা দু'টি ধুলেন। আর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি কুল্লি করলেন, নাকে পানি নিলেন এবং নাক ঝাড়লেন তিনবার তিন অঞ্জলী পানি দ্বারা।[১৩] আর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এক হাত দিয়ে কুল্লি করলেন এবং নাকে পানি নিলেন।[১৪] এটা তিনবার করলেন। আর

কোনটাই পাওয়া যায় নি। কারণ হাতের নাপাকি তো ধুয়ে ফেলার কারণে চলে গেছে। আর এখন যে হাত প্রবেশ করানো হলো, তা ছিলো পানি নেওয়ার জন্য; সাওয়াবের জন্য ধোয়ার উদ্দেশ্যে নয়। সুতরাং এ হাদীস হানাফী মাযহাবের ইমামদের বিপরীত নয়।

১০. এভাবে যে, এক অঞ্জলীর অর্ধেক দ্বারা কুল্লি করলেন আর বাকী অর্ধেক পানি নাকে নিলেন। এটাও বৈধতা বর্ণনার জন্য করেছেন। নতুবা মুস্তাহাব হচ্ছে এ যে, কুল্লি আলাদা অঞ্জলীতে পানি নিয়ে করবে আর আলাদা অঞ্জলীর পানি নাকে দেবে। সুতরাং এ হাদীস আমাদের মাযহাবের বিপরীত নয়। কেননা, আমাদের মতে এভাবে করাও জায়েয। যদিও মুস্তাহাব পদ্ধতি এর বিপরীত; যেমনিভাবে দু'দুবার করে হাত ধোয়া জায়েয, কিন্তু মুস্তাহাব পদ্ধতি এর বিপরীত।

১১. এখানে ثُمَّ (অতঃপর) 'বিলম্ব' বুঝানোর জন্য নয়। কেননা, আমাদের (হানাফী মাযহাব) মতে, ওযূর অঙ্গগুলো একের পর এক তাৎক্ষণিকভাবে ধোয়া সুন্নাত। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর মতে ফরয; বরং এখানে এ ثُمَّ শুধু ধারাবাহিকতা (تَرْتِيْب) বর্ণনার জন্যই। যেমনিভাবে ক্বোরআন শরীফের অনেক স্থানেও তা এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

১২. অর্থাৎ অধিকাংশ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওযূ এ ভাবেই হতো। এটাও হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর অবগতির ভিত্তিতে। অন্যথায় হুযূর বেশীরভাগ সময় ওযূতে প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করতেন। যেমনটি অন্যান্য হাদীসে রয়েছে।

১৩. অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজ পৃথক পৃথক তিন অঞ্জলী পানি দ্বারা করেছেন। কুল্লি আলাদা তিন অঞ্জলী দ্বারা করেছেন, তারপর নাকের ভেতর পানি আলাদা তিন অঞ্জলী নিয়েছেন। যাতে সকল হাদীস এক হয়ে যায়।

১৪. যেমনটি শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারীরা করে থাকেন। তাঁদের মতে, প্রত্যেক কুল্লি, প্রত্যেকবার নাকে পানি দেওয়ার

رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِىِّ فَمَسَحَ رَاْسَهٗ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَفِىْ اُخْرٰى لَهٗ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ مِّنْ غُرْفَةٍ وَّاحِدَةٍ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَّرَّةً لَمْ يَزِدْ عَلٰى هٰذَا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ-

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ تَوَضَّاَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ اَلَا اُرِيْكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّاَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

---

বোখারীর বর্ণনায় আছে যে, মাথা মসেহ করলেন এ রূপে যে, হাত (মাথার) আগে ও পেছনে একবার নিয়ে যান।[১৫] তারপর গোড়ালী পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করলেন। তাঁরই (বোখারী) অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনবার কুল্লি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন এক অঞ্জলী পানি দ্বারা।

৩৬৩।। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (ওযূর অঙ্গসমূহ) একবার করে ধুয়ে ওযূ করেছেন। এর বেশী করেন নি।[১৬] [বোখারী]

৩৬৪।। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (প্রত্যেক অঙ্গ) দু'বার করে ধুয়ে ওযূ করেছেন। (বোখারী)

৩৬৫।। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 'মাক্বা-'ইদ' (বৈঠক খানা)-এ ওযূ করলেন[১৭] এবং বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওযূ করার পদ্ধতি দেখাবো না?" অতঃপর তিনি প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে ওযূ করলেন।[১৮] [মুসলিম]

আগে হয়, আর আমাদের মতে একত্রে তিন কুল্লি একাধারে তিনবার নাকে পানি দেওয়ার পূর্বে হয়ে থাকে। তবে এ আমল বৈধতা বর্ণনার জন্য। সুতরাং এটাও আমাদের বিপরীত নয়। আমরাও ওটাকে জায়েয বলে থাকি।

১৫. অর্থাৎ মসেহ একবার করেছেন। এ হাদীস হানাফী মাযহাবের দলীল। অর্থাৎ মসেহ একবার করা হবে। ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর মতে মসেহ্ও তিনবার হওয়া চাই।

১৬. অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গ একবার করে ধুয়েছেন। আর এ ওযূতে একবারের বেশী (ধৌত) করেন নি। এ হাদীস ওইসব হাদীসের বিপরীত নয়, যেগুলোতে দু'বার কিংবা তিনবার ধোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, একবার বা দু'বার ধোয়া বৈধতা বর্ণনার জন্য, আর তিনবার ধোয়া হলো মুস্তাহাব (সুন্নাত) বুঝানোর জন্য। অথবা পানি স্বল্প হলে একবার বা দু'বার ধু'বে আর পানি পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকলে তিনবার করে ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করবে।

১৭. مقاعد শব্দটি مقعد-এর বহুবচন। এর অর্থ লোকজনের বসার এবং একত্রিত হওয়ার স্থান। যেমন, বাজার, কমিটি-ঘর, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পঞ্চায়েত ইত্যাদি। সাহাবা-ই কেরাম দ্বীন প্রচারের জন্য লোক-সমাগমে যেতেন এবং

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّؤُوْا وَهُمْ عُجَّالٌ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ وَاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৩৬৬।। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কা হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলাম। শেষ পর্যন্ত যখন আমরা ওই পানির নিকট গিয়ে পৌঁছুলাম, যা পথের ধারে ছিলো, তখন আসরের সময়, (আমাদের মধ্যকার) একদল লোক ত্বরা করলো। অর্থাৎ ত্বরা করে ওযূ করলো।[১৯] অতঃপর আমরা তাদের নিকট এসে পৌঁছুলাম। (দেখলাম) তাদের পায়ের গোড়ালী চক্ চক্ করছিলো, যেগুলোতে পানি লাগে নি। তখন রসূলুল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "এ গোড়ালীগুলোর জন্য দোযখের উপত্যকা (ধ্বংসলীলা) অবধারিত।[২০] তোমরা পরিপূর্ণভাবে ওযূ করে নাও।" [মুসলিম]

৩৬৭।। হযরত মুগীরাহ্ ইবনে শু'বাহ্[২১] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওযূ করলেন, তখন আপন কপাল, পাগড়ী এবং মোজার উপর মসেহ করলেন।[২২] [মুসলিম]

তাদেরকে দ্বীনের বিধানাবলী শিক্ষা দিতেন।

১৮. বুঝা গেলো যে, ওই সময় তাঁর ওযূর প্রয়োজন ছিলো না; বরং লোকদেরকে শেখানোর জন্য তাদেরকে দেখিয়ে ওযূ করেছেন। আর প্রকাশ থাকে যে, ধৌত করতে হয় এমন অঙ্গসমূহ তিনবার ধুয়েছেন; কিন্তু মসেহ্ করেছেন একবার। তিন তিনবার ওযূর অঙ্গসমূহ ধোয়া সাধারণভাবে ছিলো। আর ওইগুলো একবার বা দু'বার করে ধোয়া ছিলো কখনো কখনো। আর তাও বৈধতা প্রকাশের জন্য। সুতরাং এ হাদীস না অন্য হাদীসসমূহের সাথে বৈপরিত্যপূর্ণ, না আমাদের বিপরীত।

১৯. অর্থাৎ আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কাফেলার পেছনের ভাগে ছিলাম। আর ওই সব হযরত ছিলেন সম্মুখ ভাগে। তাঁরা আমাদের পূর্বে পানির কাছে পৌঁছে গেলেন। আর তাড়াহুড়া করে ওযূ করলেন। বুঝা গেলো যে, নামাযের মতো ওযূও ধিরস্থিরভাবে করা উচিত।

২০. 'ওয়ায়ল' (ويل) শব্দের অর্থ 'আফসোস'ও এবং দোযখের একটি স্তরের নামও। এখানে দ্বিতীয় অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যদি ওযূর অঙ্গসমূহের মধ্যে কোন একটি নখ পরিমাণও শুষ্ক থেকে যায়, তবে ওই ব্যক্তি 'ওয়ায়ল'-এ যাওয়ার উপযোগী।

এ থেকে তিনটি মাস্আলা প্রতীয়মান হয় ঃ

এক. যখন পাগুলো মোজা পরিহিত না হয়, তখন ওযূতে উভয় পা ধোয়া ফরয; মসেহ জায়েয নয়। এ কথার উপর সকল সাহাবা-ই কেরাম, পবিত্র আহলে বায়ত ও সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য (اجماع) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু সর্বদা পা ধৌতই করতেন। খোদ্ শিয়াদের গ্রন্থসমূহ দ্বারাও এমনটি প্রমাণিত।

দুই. ধুতে হয় এমন অঙ্গগুলোকে পরিপূর্ণভাবে ধোয়া ফরয;

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ شَانِهٖ كُلِّهٖ فِيْ طُهُوْرِهٖ وَتَرَجُّلِهٖ وَتَنَعُّلِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৮।। হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যথাসাধ্য আপন সকল কাজ ডান দিক হতে শুরু করতে পছন্দ করতেন। (যেমন) পবিত্রতা অর্জন করতে, মাথা আঁচড়াতে এবং জুতো পরিধান করতে।[২৩] [বোখারী, মুসলিম]

এমনকি আংটির নিচে, বালি ও নাকফুলের ছিদ্রের মধ্যেও পানি পৌঁছানো ওযূ ও গোসলের মধ্যে ফরয।

তিন. সগীরাহ্ গুনাহ্র কারণেও কঠিন আযাব হতে পারে।

২১. তিনি মুহাজির। সাক্বীফ গোত্রের লোক। খন্দক্বের যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দীর্ঘকাল যাবৎ ছিলেন। অতঃপর হযরত আমীর-ই মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র পক্ষ হতে কূফার শাসক ছিলেন। ৭০ বছর বয়স পান। ৫০ হিজরীতে কূফায় ইন্তিকাল করেন।

২২. এখানে ب অক্ষরটি عَلٰى (উপর) অর্থে ব্যবহৃত। نَاصِيَة দ্বারা মাথার সম্মুখ ভাগকে বুঝায়, যা মাথার এক চতুর্থাংশ হয়ে থাকে। অর্থাৎ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাথার এক চতুর্থাংশ মসেহ করেছেন। এ হাদীস ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র মজবুত দলীল। অর্থাৎ মাথা মসেহের মধ্যে মাথার এক চতুর্থাংশ মসেহ করাই ফরয। এর চেয়ে বেশী করা সুন্নাত। ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর মাযহাব মতে, পুরো মাথা মসেহ করা ফরয। আর ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র মতে একটি চুল স্পর্শ করাও মসেহের জন্য যথেষ্ট। এ হাদীস এ দু'বুযুর্গের মতের বিপরীত। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক চতুর্থাংশের কম মাথা মসেহ করেন নি। যদি একটি চুল স্পর্শ করা মসেহের জন্য যথেষ্ট হতো, তবে বৈধতা প্রমাণের জন্য হুযূর কখনো এমনি করতেন। আর সবচেয়ে কম মসেহের হাদীস হলো এটিই। যদি পুরো মাথাই মসেহ করা ফরয হতো, তবে তিনি এখানে এক চতুর্থাংশ মাথা মসেহ করে ক্ষান্ত হতেন না।

স্মর্তব্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ সময় পাগড়ী শরীফ তুলে ধরেছিলেন, যাতে পড়ে না যায়। আর দর্শক মনে করেছেন যে, তিনি পাগড়ীর উপরও মসেহ করছেন। এজন্য এভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। পাগড়ীর উপর মসেহ করা ক্বোরআন শরীফেরও পরিপন্থী। মহান রব এরশাদ করেছেন- وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ (অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মাথা মসেহ করো; ৫:৬)

সুতরাং কেউ এটা বলতে পারবে না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাথার এক চতুর্থাংশ মসেহ করেছেন আর বাকীটুকু পাগড়ীর উপর করেছেন। যদি পাগড়ীর উপর মসেহ করা হতো, তবে তা মাথা মসেহের প্রতিনিধি (স্থলাভিষিক্ত) হতো। আর প্রতিনিধি ও মূল একত্রিত হতে পারে না। এটাও হতে পারে না যে, এক পা ধুয়ে নাও আর অন্য পায়ের মোজার উপর মসেহ করে নাও। অথবা, অর্ধেক ওযূ করে নাও আর অর্ধেক তায়াম্মুম। অনুরূপ, চামড়া এবং বেশী মোটা সূতার মোজার উপর মসেহ করা জায়েয, যখন না বাঁধলেও তা পায়ের গোছায় আটকে থাকে। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে, ইন্শা-আল্লাহ্।

২৩. এ তিন বস্তু উদাহরণ স্বরূপ ইরশাদ করা হয়েছে। অন্যথায় সুরমা লাগানো, নখ ও বগলের চুল পরিষ্কার করা, ক্ষৌরকর্ম ও গোঁফ কাটা, মসজিদে প্রবেশ করা ও মিস্ওয়াক করা ইত্যাদিতে সুন্নাত হলো- ডান হাত কিংবা ডান পার্শ্ব থেকে আরম্ভ করা। কেননা, সৎকর্ম লেখক ফিরিশতা ডান দিকে থাকেন। এ কারণে এ দিকটি উত্তম। এমনকি ডান পার্শ্বের প্রতিবেশী বাম পার্শ্বের প্রতিবেশীর চেয়ে সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী উপযোগী। [আশি''আতুল লুম'আত]

সম্মানিত আলিমগণ বলেন, অন্যসব মসজিদে কাতারের ডান পার্শ্ব বাম পার্শ্ব থেকে উত্তম; কিন্তু মসজিদ-ই নবভী শরীফে বাম পার্শ্ব ডান পার্শ্ব থেকে উত্তম। কারণ, ওই পার্শ্ব পবিত্র রওযার নিকটে অবস্থিত। পবিত্র রওযা হলো হৃদয়, আর হৃদয় বাম পার্শ্বে অবস্থিত, যার উপর জীবন নির্ভরশীল। এ কথার উৎস হচ্ছে এ-ই হাদীস। সম্মানিত সূফীগণের উক্তিসমূহ দলীলশূন্য নয়। কেননা, যখন পুণ্য লেখক ফিরিশতাগণের কারণে ডান দিক বাম দিক হতে উত্তম হলো, তখন ওখানেও প্রিয় নবী হুযূর মোস্তফার কারণে বাম পার্শ্ব উত্তম হবে। সুতরাং সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নামাযের ক্ষেত্রে ডান দিকে থু থু নিক্ষেপ করো না, জুতোও রাখবে না। কেননা,

اَلْفَصْلُ الثَّانِى ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَبِسْتُمْ وَاِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِاَيَامِنِكُمْ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗد۔

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوٗد عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَالدَّارِمِىُّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ وَزَادُوْا فِىْ اَوَّلِهٖ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّا وُضُوْءَ لَهٗ۔

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৩৬৯।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা পরিধান করবে এবং যখন তোমরা ওযূ করবে, তখন ডান দিক হতে আরম্ভ করবে।[২৪] [আহমদ, আবূ দাঊদ]

৩৭০।। হযরত সা'ঈদ ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু[২৫] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ওই ব্যক্তির ওযূ হয় নি, যে তা'তে আল্লাহ্র নাম নেয় নি।[২৬] এ হাদীস তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ ও ইমাম আবূ দাঊদ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে এবং ইমাম দারেমী হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এটার শুরুতে (এ অংশটুকু) বৃদ্ধি করেছেন- 'যার ওযূ নেই, তার নামাযও নেই।'[২৭]

ওই দিকে রহমতের ফিরিশতা রয়েছে।

২৪. অর্থাৎ পরিধান আরম্ভ করা। জামা-কাপড়, পায়জামা ও জুতা পরিধান করা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আর ওযূ'র মধ্যে গোসল এবং তায়াম্মুমও রয়েছে।

اَيَامِنُ (আয়া-মেন) اَيْمَنُ. (আয়মান) শব্দের বহুবচন। এটা يَمِيْن (ইয়ামীন) অথবা يُمْنٌ (ইয়ুমনুন) থেকে গঠিত। এর অর্থ বরকত, মুবারক। যেহেতু ইসলামে ডান পার্শ্ব বরকতময় সাব্যস্ত হয়েছে, কারণ ক্বিয়ামতে নেক্কারদের আমলনামাও ওই হাতে দেয়া হবে, সেহেতু সেটাকে اَيْمَن. বা يَمِيْن বলে। অর্থাৎ যা কিছু পরিধান করো, তা ডান হাত ডান পায়ে প্রথমে এবং বাম হাত ও বাম পায়ে পরে পরিধান করো। অনুরূপ যখন ওযূ গোসল বা তায়াম্মুম করো, তখন ডান পার্শ্ব থেকে আরম্ভ করো। আর খুলে রাখার সময় এর বিপরীত (অর্থাৎ বাম দিক থেকে আরম্ভ করো।)

২৫. তাঁর কুনিয়াৎ হচ্ছে- 'আবূল আওয়ার'। ক্বোরাঈশ বংশের বনী আদী শাখার লোক। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমান হন। তিনি দশজন জান্নাতের শুভসংবাদ প্রাপ্তদের একজন। বদরের যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধে হুযূরের সাথে ছিলেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু-এর বোন ফাতিমা তাঁর বিবাহধীন ছিলেন, যাঁর মাধ্যমে হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। ৭০ বছরের বেশী বয়স পান। 'আতীক্ব' নামক স্থানে বসবাস করতেন। সেখানেই ৫১ হিজরীতে ওফাত পান। তাঁর লাশ মুবারক মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে আসা হয়। তাঁকে জান্নাতুল বক্বী'তে দাফন করা হয়।

২৬. ওযূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পড়া সাধারণভাবে বিজ্ঞ আলিমদের মতে 'সুন্নাত-ই মুস্তাহাব্বাহ্'। আর এখানে পূর্ণাঙ্গতার কথা অস্বীকার করা হয়েছে; অর্থাৎ যে কেউ ওযূ করার সময় বিসমিল্লাহ্ পড়লো না, সে তার ওযূর পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব পেলো না। যেমন, হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মসজিদের নিকটে অবস্থানকারীদের মসজিদে

وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ اِلٰى قَوْلِهٖ بَيْنَ الْاَصَابِعِ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ اَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهٗ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৭১।। হযরত লক্বীত্ব ইবনে সিব্‌রাহ[২৮] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আমাকে ওযূ সম্পর্কে খবর দিন?" হুযূর এরশাদ করলেন, "পরিপূর্ণভবে ওযূ করো। আঙ্গুলগুলোর মধ্যে খিলাল করো আর নাকে পানি দেওয়ায় অতিশয়তা অবলম্বন করো– যদি তুমি রোযাদার না হও।[২৯] ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ-এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম ইবনে মাজাহ্ ও ইমাম দারেমী 'আঙ্গুলগুলোর মধ্যভাগে' (বায়নাল আসা-বি') পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

৩৭২।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা[৩০] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তুমি ওযূ করবে, তখন নিজ দু'হাত ও দু'পায়ের আঙ্গুলগুলোর খিলাল করবে। (তিরমিযী) আর ইবনে মাজাহ্ অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীস 'গরীব' পর্যায়ের।

ব্যতীত নামায হয় না। অর্থাৎ নামাযের পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব পাওয়া যায় না। কেননা, মহান রব এরশাদ করেন, "যখন তোমরা নামাযের জন্য নিদ্রা থেকে উঠো, তখন স্বীয় মুখ-হাত ধৌত করো...।" ওই আয়াতে 'বিসমিল্লাহ্' পড়ার শর্তারোপ করা হয় নি। তদুপরি, তৃতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আবূ হোরায়রা, হযরত ইবনে মাস'উদ ও হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আসছে, যাতে এরশাদ করা হয়েছে, "যে ব্যক্তি ওযূর প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়লো, তার সমস্ত শরীর পবিত্র হয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি পড়লো না, তার শুধু ওযূর অঙ্গসমূহ পবিত্র হলো।"

এসব আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে, 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়া ওযূর মধ্যে ফরয কিংবা ওয়াজিব নয়। সুতরাং এ হাদীস না ক্বোরআন শরীফের পরিপন্থী, না অন্য সব হাদীসের।

২৭. 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, এখানে দু'টি ভুল রয়েছে ঃ এক. হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু; তাঁর পিতা নন।

দুই. "যার ওযূ নেই, তার নামাযও নেই"-এ বাক্য হাদীসে নেই; বরং হাদীস عليه শব্দে সমাপ্ত হয়ে গেছে।

২৮. তাঁর নাম লক্বীত্ব ইবনে আ-মির ইবনে সিব্‌রাহ। কুনিয়াৎ হলো আবূ যারীন। 'আক্বীল গোত্রীয়। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি তায়েফবাসীদের মধ্যে গণ্য হন।

২৯. অর্থাৎ অঙ্গসমূহ পূর্ণাঙ্গরূপে ধৌত করো আর তিন তিনবার ধৌত করো। হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহে খিলাল করো। যদি পায়ের আঙ্গুলসমূহ লাগানো হয় আর খিলাল করা ব্যতীত তথায় পানি না পৌছে, তবে খিলাল করা আবশ্যক; অন্যথায় সুন্নাত। সঠিক অভিমত হচ্ছে– হাতের আঙ্গুলসমূহেও খিলাল করা উচিত। এতে কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা করা পূর্বশর্ত নয়। যেভাবেই সম্ভব হয় খিলাল করলে যথেষ্ট হয়। নাকের মধ্যে পানি বাঁশী পর্যন্ত পৌছানো জরুরী। এমনকি গোসলে তো ফরযই। আর এ পরিমাণ পানি উপরের দিকে টানা যেন কণ্ঠনালীতে পৌছে যায়, তাহলে তো উত্তম। কিন্তু, রোযা পালনরত অবস্থায় শুধু বাঁশী পর্যন্ত পৌছাবে। যদি কণ্ঠনালীতে পানি চলে যায় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। [আশি''আতুল লুম'আত]

وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهٖ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاؤد وَابْنُ مَاجَةَ

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ اَخَذَ كَفًّا مِّنْ مَّاءٍ فَاَدْخَلَهٗ تَحْتَ حَنَكِهٖ فَخَلَّلَ بِهٖ لِحْيَتَهٗ وَقَالَ هٰكَذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوٗدَ

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩৭৩।। হযরত মুস্তাওরাদ ইবনে শাদ্দাদ[৩১] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন ওযূ করতেন, তখন (বাম হাতের) কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলগুলোর খিলাল করতেন।[৩২] [তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্]

৩৭৪।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন ওযূ করতেন, তখন এক অঞ্জলী পানি নিয়ে থুতনীর নিচে পৌঁছাতেন, যা দ্বারা নিজের দাড়ি মুবারকের খিলাল করতেন। আর এরশাদ করতেন, "আমার রব আমাকে এভাবে করতে নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩৩] [আবূ দাঊদ]

৩৭৫।। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজ দাড়ি মুবারকের খিলাল করতেন।[৩৪] [তিরমিযী, দারেমী]

৩০. উত্তম হচ্ছে, হাতের আঙ্গুলগুলোর খিলাল কুনুই পর্যন্ত হাত ধোয়ার সাথে করবে আর পায়ের আঙ্গুলগুলোর খিলাল পা ধোয়ার সাথে করবে; কিন্তু যদি এ উভয় খিলাল দু'পা ধোয়ার পর করে, তবুও জায়েয। কারণ, واؤ তার পূর্বাপরের নিছক সমন্বয়টুকু চায়। অন্য কোন শর্তের আরোপ তাতে নেই।

৩১. তিনি হন ক্বোরাঈশী। বনী ফিহ্‌র গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে কূফায়, পরে মিসরে অবস্থান করেন। হুযূরের ওফাত শরীফের সময় তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন, কিন্তু ছিলেন সমঝদার। এ জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর হাদীস শুনা প্রমাণিত।

৩২. অর্থাৎ বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা এভাবে খিলাল করতেন যে, ডান পায়ের কনিষ্ঠা (আঙ্গুল) থেকে শুরু করতেন আর বাম পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলে গিয়ে শেষ করতেন। এভাবে খিলাল করা আমাদের বিজ্ঞ ইমামদের মতে মুস্তাহাব। ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু-এর মাযহাবে ফরয। সুতরাং তা করা চাই, যাতে মতবিরোধ থেকে বাঁচা যায়।

৩৩. এটা সুস্পষ্ট যে, দাড়ি শরীফ খিলাল করা চেহারা ধোয়ার সাথে ছিলো। ওযূ করার পর নয়। আর اَمَرَنِىْ رَبِّىْ (আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন) দ্বারা উদ্দেশ্য 'ওহী-ই খফী'; অর্থাৎ ইলহাম। অথবা হযরত জিব্‌রাঈল মারফত। প্রতীয়মান হলো যে, হুযূরের উপর ওহী শুধু ক্বোরআন শরীফ-ই হয়নি, এটা ছাড়াও আরো ওহী হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, এ নির্দেশ ওয়াজিব সাব্যস্ত করণের জন্য নয়; বরং 'মুস্তাহাব নির্দেশক'। কারণ, দাড়ি খিলাল করা কারো মতে ফরয নয়।

৩৪. অর্থাৎ বেশীরভাগ সময়; সর্বদা নয়। এভাবে যে, দাড়ি খিলাল এভাবে করতেন যে, ডান হাতের পবিত্র আঙ্গুলগুলো থুতনীর নিচ থেকে দাড়ির গোড়ায় চিরুনীর মতো রেখে দাড়ির নিচে লম্বাভাবে নিয়ে যেতেন।

وَعَنْ اَبِىْ حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلٰثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا وَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلٰثًا وَّ ذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا وَّ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَاَخَذَ فَضْلَ طُهُوْرِهٖ فَشَرِبَهٗ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ

عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ نَحْنُ جُلُوْسٌ نَنْظُرُ اِلٰى عَلِيٍّ حِيْنَ تَوَضَّأَ فَاَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى فَمَلَأَ فَمَهٗ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى فَعَلَ هٰذَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى طُهُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهٰذَا طُهُوْرُهٗ. رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ

৩৭৬।। হযরত আবূ হাইয়্যাহ[৩৫] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে দেখেছি, তিনি ওযূ করলেন। তখন আপন হাত (উভয় হাতের তালু) ধু'লেন যতক্ষণ না পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর তিনবার কুল্লি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিলেন। অতঃপর আপন মুখমণ্ডল ও হাত কুনুইদু'টিসহ তিনবার করে ধু'লেন। একবার মাথা মসেহ করলেন।[৩৬] অতঃপর আপন দু'পা গোড়ালী পর্যন্ত ধু'লেন।[৩৭] তারপর দাঁড়ালেন এবং ওযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলেন।[৩৮] তারপর বললেন, আমি ইচ্ছা করলাম যে, আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওযূ কিরূপ ছিলো।[৩৯] [তিরমিযী, নাসাঈ]

৩৭৭।। হযরত আব্দে খায়র[৪০] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমরা বসে বসে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে দেখছিলাম। তিনি যখন ওযূ করলেন এবং আপন ডান হাত পানিতে প্রবেশ করালেন, তখন মুখ ভরে কুল্লি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন আর বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়লেন– এটা তিনবার করলেন। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওযূ দেখতে পছন্দ করে, তাহলে হুযূরের ওযূ এরূপই ছিলো।[৪১] [দারেমী]

৩৫. তাঁর নাম আমর ইবনে নাস্র। 'কুনিয়াৎ আবূ হাইয়্যাহ্'। হামদানের অধিবাসী ও তাবে'ঈ। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু-এর সাথে থাকেন।

৩৬. পরিষ্কারভাবে বুঝা গেলো যে, ওযূর অঙ্গসমূহ তিন তিনবার ধোয়া সুন্নাত; কিন্তু মসেহ একবারই। এ হাদীস হানাফী মাযহাবের মজবুত দলীল।

৩৭. অর্থাৎ পায়ের গোড়ালীসহ তিনবার ধু'লেন। এখানে الى অর্থ مع (সমেত/সহ)। আর যেহেতু প্রথমে তিন তিন বারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু এখানে তা উল্লেখ করা হয় নি।

৩৮. বুঝা গেলো যে, অবশিষ্ট পানি ওযূ করার পর দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাত। যেহেতু এ পানি দ্বারা একটি ইবাদত সম্পন্ন করা হয়েছে, সেহেতু এটা বরকতময়ও এবং সম্মানযোগ্যও। যেমন, যম্যমের পানি। এটা হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর কদম শরীফ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্য সেটার সম্মান রয়েছে। তাও দাঁড়িয়ে পান করা হয়। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর ওযূ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَّاحِدٍ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلٰثًا. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَاْسِهٖ وَاُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرَ هُمَا بِاِبْهَامَيْهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৩৭৮।। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়দ[৪২] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি এক হাত দ্বারা কুল্লি করেছেন এবং নাকে পানি নিয়েছেন।[৪৩] এটা তিনবার করেছেন। [আবূ দাউদ, তিরমিযী]

৩৭৯।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথা মুবারক এবং উভয় কান মুবারক মসেহ করতেন। কানের ভেতরের দিক শাহাদত আঙ্গুল দু'টি (তর্জনী) দ্বারা[৪৪] আর বাইরের দিক দু'বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা (মসেহ করতেন)[৪৫] [নাসাঈ]।

শরীফে ব্যবহৃত পানি পান করতেন এবং তাঁদের চোখে লাগাতেন। কতেক মুরীদ আপন পীরের উচ্ছিষ্ট পানি এবং তাঁর প্রদত্ত তাবার্রুক দাঁড়িয়ে পানাহার করে থাকে। সম্মান প্রদর্শনের উৎস-দলীল হচ্ছে এ হাদীসগুলো।

৩৯. অর্থাৎ আমার ওই সময় ওযূ করার প্রয়োজন ছিলো না। তোমাদের শিক্ষাদানের জন্য তোমাদেরকে ওযূ করে দেখিয়েছি। বুঝা গেলো যে, দ্বীনের প্রচার আমলের মাধ্যমেও প্রয়োজন।

৪০. তাঁর নাম হযরত আবদে খায়র ইবনে ইয়াযীদ। কুনিয়াৎ আবূ ওমারাহ্। কুফার অধিবাসী। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় যুগ পেয়েছেন; কিন্তু সাক্ষাৎ করতে পারেন নি। তাই তিনি শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত তাবে'ঈ। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র সাথীদের অন্তর্ভুক্ত। ১২০ বছর বয়স পান।

৪১. এ হাদীস সংক্ষিপ্ত। এতে শুধু কুল্লি ও নাকে পানি দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু পূর্ণাঙ্গ ওযূ করে দেখিয়েছিলেন। হাত প্রবেশ করানো মানে বড় পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে কুল্লি ইত্যাদির জন্য অঞ্জলী ভরে পানি নেওয়া।

৪২. তাঁর নাম আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আবদ্ রাব্বিহ্। তিনি আনসারী, খাযরাজী। বায়'আত-ই আক্বাবাহ্ এবং বদরসহ সকল যুদ্ধে তিনি হুযূরের সাথে ছিলেন। মসজিদে নবভী শরীফ নির্মাণের পর ১ম হিজরীতে তিনিই স্বপ্নে আযান দেখেছেন। তাঁরই আরযকৃত (স্বপ্নে দেখা) আযান ইসলামে প্রচলিত। তিনি নিজেও সাহাবী, পিতা-মাতাও (সাহাবী)। ৬৪ বছর বয়স পেয়েছেন।

৪৩. এটার দু'টি অর্থ হতে পারে ঃ

এক. প্রতি অঞ্জলি পানির অর্ধেক দ্বারা কুল্লি আর বাকী অর্ধেক পানি নাকের মধ্যে নিয়েছেন। যেমনটি ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মাযহাব।

দুই. হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অঞ্জলী ভর্তি পানি দ্বারা কুল্লি করেন নি ও নাকে পানি নেন নি। যেমনিভাবে মুখ ধোয়ার সময় করা হয়; বরং এক হাত দ্বারা করেছেন।

সুতরাং এ হাদীস হানাফী মাযহাবের পরিপন্থী নয়।

৪৪. কলেমার আঙ্গুলকে আরবের কাফিরগণ 'সাব্বা-বাহ্' (سبابه) বলতো। অর্থাৎ গালি দেয়ার আঙ্গুল। যেহেতু গালি-গালাজ করার সময় এ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা হতো, সেহেতু সেটার এ নাম রাখা হয়েছিলো। ইসলামে সেটার নাম রাখা হয় সাব্বাহাহ্ অথবা মুসাব্বিহাহ্ অর্থাৎ তাসবীহ পাঠকারী আঙ্গুল। আর উর্দু ভাষায় সেটাকে 'কলমে-কী উঙ্গলী' (কলেমার আঙ্গুল) বলা হয়। কেননা, এ আঙ্গুল তাসবীহ ও কালেমা পড়ার সময় ব্যবহার করা হয়। কারণ, প্রথমে সেটার উপরই গণনা করা হয়।

وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ اَنَّهَا رَأَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ قَالَتْ فَمَسَحَ رَأْسَهٗ مَا اَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا اَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَاُذُنَيْهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً. وَّ فِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهٗ تَوَضَّأَ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ حُجْرَىْ اُذُنَيْهِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوَى التِّرْمِذِىُّ الرِّوَايَةَ الْاُوْلٰى وَاَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ الثَّانِيَةَ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهٗ رَاَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَاَنَّهٗ مَسَحَ رَأْسَهٗ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَعَ زَوَآئِدَ

৩৮০।। হযরত রুবায়্যি' বিন্‌তে মু'আওভায্[৪৬] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওযূ করতে দেখেছেন। তিনি বলেন, তিনি (নবী করীম) নিজ শির মুবারকের সম্মুখের দিক ও পেছনের দিক এবং উভয় কান পট্টি ও উভয় কান একবার মসেহ করেছেন।[৪৭] অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি ওযূ করলেন, তখন আপন দুই আঙ্গুল দুই কান মুবারকের ছিদ্র দু'টিতে প্রবেশ করালেন।[৪৮] এ হাদীস ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী প্রথম বর্ণনা এবং আহমদ ও ইবনে মাজাহ্ দ্বিতীয় বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

৩৮১।। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওযূ করতে দেখেছেন আর তিনি নিজ শির মুবারক ওই পানি দ্বারা মসেহ করেছেন, যা তাঁর দু'হাতের উদ্বৃত্ত ছিলো না।[৪৯] এ হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন কিছুটা অতিরিক্ত সহকারে।

৪৫. অর্থাৎ মাথা মসেহ করার পর ওই পানি দ্বারা; অন্য পানি দ্বারা নয়। সুতরাং এ হাদীস হানাফী মাযহাবের দলীল। ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মতে কানের ভেতরের অংশ মুখের সাথে ধু'তে হয় আর বাইরের অংশ মাথার সাথে মসেহ করা হয়। এ হাদীস তাঁর মতের বিপরীত। তদুপরি একটি মাত্র অঙ্গ ধৌত করা এবং মসেহ করা নিয়মের পরিপন্থী। ধোয়া ও মসেহ একত্রিত না হওয়া চাই। কতেক ইমামের মতে, কানের মসেহ্‌র জন্য আলাদা পানি দিতে হয়। এ হাদীস তাদের মতেরও বিপরীত।

৪৬. তিনি আনসারী ও নাজ্জারী মহিলা। 'বায়'আতুর রিদ্বওয়ান'-এ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর দাদার নাম আফরা।

৪৭. এ হাদীস দ্বারা সরাসরি বুঝা গেলো যে, কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। তা মসেহ করতে হবে। ধোয়া যাবে না আর মসেহও একবার করতে হবে, তিনবার নয়। সুতরাং এটা হানাফী মাযহাবের মজবুত দলীল। কানের লতি (কানপট্টি) দু'টি চেহারার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, চেহারার প্রশস্ততার সীমা হলো এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত। তাই চেহারার সাথে তিনবার ধোয়া হবে। কান মসেহ করার সময় হুযূরের বরকতময় আঙ্গুলসমূহ কানের লতির উপর হয়তো লেগে গিয়েছিলো। আর বর্ণনাকারী মনে করলেন যে, তিনি তা মসেহ করেছেন; যেমনটি পাগড়ী মসেহ করার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ হাদীস ওই সব হাদীসের বিপরীত নয়, যেগুলোতে কানপট্টি ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪৮. এটাও সুন্নাত। স্মর্তব্য যে, উভয়ের মসেহ একসাথে হবে। ডান দিক হতে আরম্ভ করা ওইসব অঙ্গের মধ্যে হয়, যেগুলোতে উভয় অঙ্গ একসাথে ধোয়া যায় না। এ কারণে কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত একসাথে ধোয়া হয় আর কনুই পর্যন্ত ধোয়া হয় ধারাবাহিকভাবে; অর্থাৎ প্রথমে ডান হাত, পরে বাম হাত। [মিরক্বাত]

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ذَكَرَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ وَقَالَ الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَاَبُوْدَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَذَكَرَ قَالَ حَمَّادٌ لَّا اَدْرِىْ الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ مِنْ قَوْلِ اَبِىْ اُمَامَةَ اَمْ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ جَآءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَسْاَلُهٗ عَنِ الْوُضُوْءِ فَاَرَاهُ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ اَسَآءَ وَتَعَدّٰى وَظَلَمَ. رَوَاهُ النَّسَآئِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوٰى اَبُوْدَاوٗدَ مَعْنَاهُ

৩৮২।। হযরত আবূ উমামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু[৫০] হতে বর্ণিত, একবার তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওযূ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আর বলেছেন, তিনি চোখের দু' কোণও মসেহ করতেন এবং এরশাদ করেছেন যে, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।[৫১] এ হাদীস ইবনে মাজাহ্, আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। এ দু'জন (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)-এর উভয়ে বলেছেন যে, (এ হাদীসের বর্ণনাকারী) হযরত হাম্মাদ বলেছেন যে, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত-এ উক্তি আবূ উমামাহ্র, নাকি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর তা আমার জানা নেই।[৫২]

৩৮৩।। হযরত আমর ইবনে শো'য়াইব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বেদুঈনের একজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ওযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তখন তিনি তাকে তিনবার ওযূ করে দেখালেন আর এরশাদ করলেন, ওযূ এরূপই। যে এর উপর বৃদ্ধি করলো সে গুনাহ্ করলো, সীমা অতিক্রম করলো এবং যুল্ম করলো।[৫৩] এ হাদীস ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন।

৪৯. অর্থাৎ মসেহ করার জন্য আলাদা পানি নিয়েছেন, হাতের অবশিষ্ট পানি দ্বারা মসেহ করেন নি।

৫০. তাঁর নাম সা'দ ইবনে হানীফ। তিনি আনসারী, খাযরাজী এবং আওসীও। তিনি 'আবূ উমামাহ্' কুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হুযূরের ওফাত শরীফের দু'বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি তাবে'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত। ৮২ বছর বয়সে ১০০ হিজরীতে ওফাত পান। উল্লেখ্য, আবূ উমামাহ্ বাহেলী অন্যজন। তিনি সাহাবী।

৫১. অর্থাৎ ওই দু'টির যাহের ও বাতেনের মসেহ মাথা মসেহের পানি দ্বারাই করা হবে। কিন্তু চেহারার সাথে ধোয়া যাবে না। স্মর্তব্য যে, চোখের কোণায় আঙ্গুল ফেরানো, যাতে পানি সেটার ভেতর ছড়িয়ে পড়ে, সুন্নাত। এখানে 'মসেহ' বা মর্দন দ্বারা এ অর্থই বুঝানো উদ্দেশ্য। কারণ, চোখের কোণা মসেহ করার কথা কেউ বলছে না।

৫২. প্রকাশ থাকে যে, এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র উক্তি। কেননা, আবূ উমামাহ্ হুযূরের ওযূর বর্ণনার পরম্পরায় এটা বলেছেন। তাছাড়া কান মাথা কিংবা চেহারার অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নবী করীমের নিকট থেকে শুনে বলা যেতে পারে; নিজ থেকে বলা যায় না। কারণ, ওযূর বিধান মানব-বুদ্ধির অতীত। সুতরাং এ হাদীস ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মজবুত দলীল।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ اَنَّهٗ سَمِعَ اِبْنَهٗ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ عَنْ يَّمِيْنِ الْجَنَّةِ قَالَ اَىْ بُنَىَّ سَلِ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهٖ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ يَّعْتَدُوْنَ فِى الطُّهُوْرِ وَالدُّعَآءِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ

وَعَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُّقَالُ لَهٗ الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَآءِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

৩৮৪।। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল[৫৪] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, (একদা) তিনি তাঁর পুত্রকে এ বলে দো'আ করতে শুনলেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট জান্নাতের ডান দিকের সাদা প্রাসাদটির প্রার্থনা করছি।" তখন তিনি (আব্দুল্লাহ) বললেন, "হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাত প্রার্থনা করো এবং দোযখ থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে, অচিরেই এ উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে, যারা পবিত্রতা অর্জনে এবং দো'আ প্রার্থনায় সীমালংঘন করবে।[৫৫] [আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

৩৮৫।। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, "ওযূর এক শয়তান আছে। তাকে ওয়ালহান বলা হয়।[৫৬] কাজেই তোমরা পানির ওয়াস্‌ওয়াসাহ্ হতে বেঁচে থাকো।[৫৭] ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীস 'গরীব' পর্যায়ের।

৫৩. গুনাহ তো সুন্নাত ত্যাগ করার জন্য হয়েছে, আর সীমাতিক্রম হয়েছে তিনবারের চেয়ে বেশী ধোয়ার কারণে। কেননা, ধোয়ার সর্বোচ্চ সীমা হলো তিনবার। আর যুল্‌ম স্বীয় আত্মার উপর এজন্য করলো যে, সে হুযূরের বিরোধিতা করেছে। তদুপরি, পানির অপচয় করলো, স্বীয় আত্মাকে অনর্থক কষ্টে ফেললো। যে কেউ তিন বারের চেয়ে বেশী ধোয়াকে সুন্নাত মনে করে, তার বিশ্বাসও ভুল এবং ভ্রান্ত হলো। যেকোন অবস্থাতেই তিনবারের চেয়ে কম হতে পারে; বেশী হতে পারে না। অনুরূপ তিনবার ধোয়ার ফলে সমগ্র অঙ্গ ধৌত হয়েছে মর্মে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে। এটার উপর বেশী করাটা শয়তানের কু-মন্ত্রণার ভিত্তিতে হতে পারে।

৫৪. তিনি মুযায়নাহ্ গোত্রের লোক। বায়'আতুর রিদ্বওয়ান-এ উপস্থিত হয়েছেন। মদীনা-ই তায়্যিবাহ্য় বসবাস করতেন। হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'-র শাসনামলে ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁকে বসরায় পাঠানো হয়। সেখানে ৬০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৫৫. দো'আ-প্রার্থনায় সীমালংঘন হলো এ যে, এমন শর্তারোপ করে সুনির্দিষ্ট করা, যার প্রয়োজন নেই। যেমন তাঁর সাহেবজাদা করেছেন। শুধু ফিরদৌস প্রার্থনা করা অত্যন্ত উত্তম। কারণ, তাতে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করা হয় না, বরং একটি বিশেষ প্রকারকে নির্দিষ্ট করা হয়। বস্তুতঃ এটারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওযূতে সীমালংঘন করা দু'ধরনের হতে পারে ঃ

এক. সংখ্যায় সীমালংঘন আর দুই. সংশ্লিষ্ট অঙ্গের সীমানা অতিক্রম করা। যেমন, উভয় পা হাঁটুর গিরা পর্যন্ত ধোয়া আর হাত বগল পর্যন্ত। এর উভয়টি নিষিদ্ধ।

وَلَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ لِاَنَّا لَا نَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَهٗ غَيْرُ خَارِجَةَ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ اَصْحَابِنَا

وَعَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهٗ بِطَرْفِ ثَوْبِهٖ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا اَعْضَائَهٗ بَعْدَ الْوُضُوْءِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَاَبُوْ مُعَاذِ الرَّاوِيُّ ضَعِيْفٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ

আর এটার সনদ মুহাদ্দিসগণের মতে সবল নয়। কেননা, আমরা খা-রিজাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে জানিনা, যিনি এটাকে 'মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর খা-রিজাহ আমাদের বন্ধু (মুহাদ্দিসগণ)-এর নিকট সবল নন।

৩৮৬।। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি ওযূ করতেন তখন নিজের চেহারা নিজ কাপড়ের কিনারা (পার্শ্ব) দিয়ে মুছতেন।[৫৮] [তিরমিযী]

৩৮৭।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি কাপড় ছিলো, যা দ্বারা তিনি ওযূ করার পর নিজের বরকতময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুছতেন।[৫৯] এ হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন আর বলেছেন যে, এ হাদীসের 'সনদ' সবল নয়। আর বর্ণনাকারী আবূ মু'আয মুহাদ্দিসগণের নিকট 'দুর্বল'।[৬০]

---

৫৬. وَلْهَانٌ (ওয়ালহান) শব্দটি وَلَهٌ (ওয়ালূহুন) হতে গঠিত। এর অর্থ, হতভম্বতা কিংবা লোভ-লালসা। যেহেতু শয়তান ওযূকারীকে সংশয়ে ফেলে দেয় এবং পানি বেশী ব্যবহার করতে আগ্রহী করে তোলে, সেহেতু তাকে 'ওয়াল্‌হান' (وَلْهَانٌ) বলা হয়। অত্যোধিক প্রেমকে 'ওয়াল্‌হুন' আর প্রেম-বিভোর আশেক্বকেও 'ওয়ালহান' (وَلْهَانٌ) বলা হয়। শয়তানের দলসমূহ ভিন্ন ভিন্ন। যাদের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে, তাদের মধ্যে একদলের এ নাম, এ কাজ।

৫৭. অন্যের মধ্যে যে সন্দেহ দলীল ছাড়া সৃষ্টি হয়, তাকে 'ওয়াস্‌ওয়াসা' (وسوسه) বা কুমন্ত্রণা বলা হয়। কোন কারণ ব্যতিরেকে এটা মনে করা যে, হয়তো পানি নাপাক, হয়তো কাপড়ে ছিট্‌কে পড়েছে, হয়তো পানি পুরো অঙ্গের উপর প্রবাহিত হয় নি- এ সবই ওয়াস্‌ওয়াসাহ্ (কুমন্ত্রণা)। কতেক লোককে দেখা গেছে যে, তারা হাতের রেখায়ও পানি পৌছায়।

৫৮. এ থেকে কতিপয় মাস্'আলা প্রতীয়মান হয় ঃ

এক. ওযূ করার পর ওযূর অঙ্গসমূহ মুছে নেওয়া নিষিদ্ধ নয়। তবে শর্ত হলো, তা যেন অহঙ্কারবশত না হয়। আর এ ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হলো, বেশী অতিশয়তা সহকারে মুছবে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর আর্দ্রতার কিছুটা চিহ্ন অবশিষ্ট রাখবে।

দুই. অঙ্গগুলোর আর্দ্রতা 'ব্যবহৃত পানি' (ماء مستعمل) হিসেবে বিবেচ্য নয়; বরং পানির যে বিন্দু অঙ্গ থেকে পৃথক হয়ে যায় তাই ব্যবহৃত পানি; যা কারো কারো মতে নাপাক। কিন্তু সঠিক অভিমত হচ্ছে (ব্যবহৃত পানি) নিজে পাক, কিন্তু অন্যকে পাক করতে পারে না। আর হাদীসে পাকে যা

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ ثَابِتِ بْنِ اَبِىْ صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ جَعْفَرٍ هُوَ مُحَمَّدُ نِ الْبَاقِرُ حَدَّثَكَ جَابِرٌ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلٰثًا ثَلٰثًا قَالَ نَعَمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هُوَ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৩৮৮।। হযরত সাবিত ইবনে আবূ সাফিয়্যাহ্[৬১] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ জা'ফরকে (যিনি হলেন মুহাম্মদ বাক্বের)[৬২] বললাম, "আপনাকে হযরত জাবির কি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একেকবার, দু'দু'বার, তিন তিনবার ওযূ করেছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"[৬৩] [তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্]

৩৮৯।। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'দুবার করে ওযূ করেছেন আর এরশাদ করেছেন, "এটা নূরের উপর নূর।"[৬৪]

এসেছে- 'হযরত মায়মুনাহ্' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে ওযূর পর রুমাল পেশ করলে হুযূর তা ক্বূবূল করেন নি। আর ওযূর অঙ্গগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তাশরীফ নিয়ে যান। এর অন্য কারণ বা ব্যাখ্যা থাকতে পারে। যেমন- হয়তো রুমাল পরিষ্কার ছিলো না, অথবা ওই সময় ত্বরা ছিলো। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, মুস্তাহাব হচ্ছে- না মোছা। কিন্তু মোছাও জায়েয, মাকরূহও নয়।

৫৯. অর্থাৎ কখনো কখনো; সব সময় নয়। কেননা, এক্ষুনি আলোচনা করা হয়েছে যে, হুযূর আপন দামন (আঁচল) দিয়ে মুখ শরীফ মুছেছেন। কতেক বর্ণনায় এও রয়েছে যে, অঙ্গসমূহ সম্পূর্ণরূপে মুছতেন না। কতেক বর্ণনায় এ-ও আছে যে, ওযূর পানি ক্বিয়ামত দিবসে নূর হবে। সুতরাং হাদীসগুলোর মধ্যে বৈপরিত্য নেই। কখনো এ আমল করেছেন আর কখনো ওই আমল।

৬০. ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ উভয় হাদীসকে 'দ্বা'ঈফ' (দুর্বল) বলেছেন; প্রথম হাদীস রুশ্দ ইবনে সা'দ এবং আব্দুর রহমান ইবনে যিয়াদ আফ্রিক্বী-র কারণে এবং এ হাদীসকে আবূ মু'আযের কারণে। আর এরশাদ করেছেন যে, কতেক লোক ওযূর অঙ্গসমূহ মোছাকে মাকরূহ মনে করেন। কারণ, এতে ইবাদতের চিহ্নকে দূরীভূত করা হয় এবং ওযূর পানি তাসবীহও পাঠ করে থাকে। আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশী জানেন।

৬১. তাঁর কুনিয়াৎ আবূ হামযাহ্। তিনি ইয়ামনী, আযদ গোত্রীয়। মুহাম্মদ ইবনে আলী বাক্বির -এর সাথী ছিলেন। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, "তিনি কুফায় বসবাস করতেন।" আর অত্যন্ত দ্বা'ঈফ (দুর্বল) ও বেশী সন্দেহপ্রবণ ছিলেন। আক্বীদা ছিলো গোপনে রাফেযীদের, তাই এ হাদীস 'দুর্বল' পর্যায়ের।

৬২. তিনি মুহাম্মদ ইবনে আলী (অর্থাৎ ইমাম যায়নুল আবেদীন) ইবনে হুসাইন ইবনে আলী। (রিদ্বওয়ানুল্লাহি আনহুম)। তাঁর উপাধি ইমাম বাক্বির। বাক্বির শব্দের অর্থ বিদীর্ণকারী। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানকে বিদীর্ণকারী। তাঁর কুনিয়াৎ আবূ জা'ফর। তিনি মদীনা শরীফের বড় ফক্বীহ ও বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ইমাম যায়নুল আবেদীন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হযরত জাবির থেকে অসংখ্য হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন মহা সম্মানিত তাবে'ঈ। ৫৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩ বছর বয়স পান। ১১৮ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় ওফাত পান। জান্নাতুল বাক্বী'তে তাঁর মাযার রয়েছে। এ অধম (আহমদ ইয়ার) তার কবর শরীফের যিয়ারত করেছি।

৬৩. হাদীসের শিক্ষা গ্রহণের তিনটা পদ্ধতি রয়েছে ঃ

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا وَقَالَ هٰذَا وُضُوْئِىْ وَوُضُوْءُ الْاَنْبِيَآءِ قَبْلِىْ وَوُضُوْءُ اِبْرَاهِيْمَ. رَوَاهُمَا رَزِيْنٌ وَالنَّوَوِىُّ ضَعَّفَ الثَّانِىَ فِىْ شَرْحِ مُسْلِمٍ

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَّ كَانَ اَحَدُنَا يَكْفِيْهِ الْوُضُوْءُ مَالَمْ يُحْدِثْ. رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ

৩৯০।। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিন তিনবার ওযূ করেছেন আর এরশাদ করেছেন, "এটা আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের ওযূ এবং হযরত ইব্রাহীমের ওযূ।[৬৫] এ হাদীস দু'টি রাযীন বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাওয়াভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

৩৯১।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ করতেন।[৬৬] আর আমাদের জন্য এক ওযূ যথেষ্ট যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ওযূ ভঙ্গ না হয়।[৬৭] [দারেমী]

এক. ছাত্র পড়বে, শিক্ষক শুনবেন। দুই. শিক্ষক পড়বেন, ছাত্র শুনবে এবং তিন. ছাত্র হাদীসের ইবারত পেশ করে আরয করবে, "আপনি কি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন?" শিক্ষক বলবেন, "হ্যাঁ"।

এখানে বর্ণিত হাদীসটি এ তৃতীয় প্রকারের হাদীস। অর্থাৎ হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওযূর অঙ্গসমূহ কখনো একেক বার ধুয়েছেন, কখনো দু'দুবার আবার কখনো তিন তিনবার ধুয়েছেন।

৬৪. অর্থাৎ ওযূর অঙ্গসমূহ দু'দুবার ধুয়েছেন আর এটাকে 'নূরের উপর নূর' বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, একবার ধোয়া ফরয। দু'বার ধোয়া সুন্নাত। ফরযও নূর আর সুন্নাতও নূর। অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবসে সুন্নাত আদায়কারীদের নূর বেশী প্রখর হবে। অতএব, যে তিন তিনবার ওযূর অঙ্গসমূহ ধু'বে তাও তার জন্য উত্তম হবে।

৬৫. এ থেকে কয়েকটা মাস্'আলা প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. ওযূ শুধু ইসলামের বিধান নয়; বরং পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর শরীয়তেও ওযূ ছিলো। অবশ্য ওযূ দ্বারা চেহারায় ঔজ্জ্বল্য আসা এ উম্মতেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দুই. হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামও ওযূ করতেন। যেমন, বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত সারাহ্ ওযূ করেছেন এবং নামায পড়েছেন। হযরত জুরায়জ ইস্রাঈলী ওযূ করেছেন এবং নামায পড়েছেন। মোট কথা, ওযূ অত্যন্ত প্রাচীন সুন্নাত।

তিন. তিন তিনবার ওযূর অঙ্গসমূহ ধোয়া বড় ফযীলতের কাজ। কারণ, এটা নবীগণের সুন্নাত। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক বা দু'বার করে ওযূর অঙ্গসমূহ ধোয়া বৈধতা প্রমাণের জন্য।

৬৬. 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, প্রথম দিকে হুযূরের উপর প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ করা ফরয ছিলো। পরে এ 'ফরয হওয়া' রহিত হয়ে গেছে। যেমন পরবর্তী হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে। আর এটা ওই সময়ের অবস্থার বর্ণনা অথবা এ-ও হতে পারে যে, এটা ফরয হওয়ার বিধান রহিত হওয়ার পরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে আর এতে বেশীর ভাগ অবস্থার বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অবশ্য হুযূর বেশীর ভাগ সময় প্রতি নামাযের জন্য ওযূ করে নিতেন। পবিত্র ক্বোরআনের আয়াত- اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا (অর্থাৎ যখন তোমরা নামায কায়েম করার জন্য ইচ্ছা করো, তখন তোমরা ধৌত কর ...)-এর প্রকাশ্য অর্থ অনুসারে আমল করতেন। এখনও প্রত্যেক নামাযের জন্য, পূর্ব থেকে ওযূ থাকলেও ওযূ করা মুস্তাহাব। স্মর্তব্য যে, এখানে নামায দ্বারা ফরয নামাযের কথা বুঝানো হয়েছে। আর ইশ্রাক্বের নামায

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ بْنِ حَبَّانَ قَالَ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَرَايْتَ وُضُوْءَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طٰهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّنْ اَخَذَهُ فَقَالَ حَدَّثَتْهُ اَسْمَآءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِىْ عَامِرِنِ الْغَسِيْلِ حَدَّثَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اَمَرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوْءُ اِلَّا مِنْ حَدَثٍ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَرٰى اَنَّ بِهٖ قُوَّةً عَلٰى ذٰلِكَ فَفَعَلَهُ حَتّٰى مَاتَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ

৩৯২।। হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্‌য়া ইবনে হাব্‌বান[৬৮] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমরকে বললাম, "আমাকে বলুন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ করতেন– তিনি ওযূ বিশিষ্ট থাকতেন কিংবা ওযূ বিহীন অবস্থায় (থাকতেন)– এটা তিনি কার নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন?" তিনি জবাবে বললেন, "তাঁকে আস্‌মা বিনতে যায়দ ইবনে খাত্তাব খবর দিয়েছেন[৬৯] যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে হান্‌যালাহ্ ইবনে আবূ 'আমির[৭০] তাঁকে (হযরত আস্‌মা) খবর দিয়েছিলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিলো– তিনি ওযূ সহকারে থাকুন কিংবা ওযূ বিহীন অবস্থায় থাকুন। কিন্তু যখন এ আমল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কঠিন হয়ে পড়লো, তখন প্রত্যেক নামাযের সময় মিস্‌ওয়াকের নির্দেশ দেয়া হলো এবং ওযূ ভঙ্গ হওয়া ব্যতীত ওযূ করার আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।[৭১] তিনি (হযরত ওবায়দুল্লাহ্) বলেন, আব্দুল্লাহ্ (ইবনে ওমর) মনে করতেন যে, তা করতে তাঁর শক্তি রয়েছে। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য তাজা ওযূ করেছেন।[৭২] সুতরাং তিনি তা তাঁর ওফাত পর্যন্ত করতে থাকেন।[৭৩] [আহমদ]

ফজরের নামাযের ওযূ দ্বারা পড়া মুস্তাহাব।

৬৭. অর্থাৎ আমরা অধিকাংশ সময় এক ওযূ দিয়ে অনেক নামায পড়ে নিতাম। স্মর্তব্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন এক ওযূ দ্বারা চার ওয়াক্বতের নামায আদায় করেন। আর কতেক সাহাবী প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন ওযূ করতেন। কিন্তু ওই সব ঘটনা এ-ই হাদীসের বিপরীত নয়। কারণ, এখানে বেশীরভাগ অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৮. তিনি একজন ফক্বীহ তাবে'ঈ ও আনসারী। তাঁর কুনিয়াৎ আবূ আব্দুল্লাহ। তিনি ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর ওস্তাদ। ১২১ হিজরীতে ওফাত পান। ইল্‌ম ও ইবাদত বন্দেগীতে খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৬৯. এ আস্‌মা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র ভ্রাতুষ্পুত্রী। হযরত যায়দ ইবনে খাত্তাব হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র বড় ভাই, যিনি তাঁর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত। বদরসহ সমস্ত যুদ্ধে হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র খিলাফতকালে ইয়ামামাহ্ যুদ্ধে ১২শ হিজরীতে শহীদ হন। হযরত আস্‌মা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হাও মহিলা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ اَفِى الْوُضُوْءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ يُطَهِّرُ جَسَدَهٗ كُلَّهٗ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ لَمْ يُطَهِّرْ اِلَّا مَوْضِعَ الْوُضُوْءِ.

৩৯৩।। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা হতে বর্ণিত, (একদা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ-এর পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, যখন তিনি (সা'দ) ওযূ করছিলেন। তখন এরশাদ করলেন, "হে সা'দ! এ কি অপব্যয়?" তিনি আরয করলেন, "ওযূতেও কি অপব্যয় আছে?" হুযূর এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ। যদিও তুমি প্রবহমান নদীর তীরে থাকো।"[৭৪] [আহমদ, ইবনে মাজাহ]

৩৯৪।। হযরত আবূ হোরায়রা, ইবনে মাস'উদ ও ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং আল্লাহ্‌র নাম নেবে, তবে ওই ওযূ তার সমস্ত শরীরকে পবিত্র করে দেবে। আর যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং আল্লাহ্‌র নাম নেবে না, তবে শুধু ওযূর স্থানকেই পবিত্র করবে।[৭৫]

---

৭০. এ আব্দুল্লাহ্‌ও সাহাবী। তাঁর সম্মানিত পিতাও সাহাবী। হুযূরের ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিলো ৭ বছর। কারবালার ঘটনার পর যখন মদীনাবাসী হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হু'র পুত্র ইয়াযীদের বিরোধিতা করলেন, তখন সকলে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এ কারণে ইয়াযীদ মদীনা তাইয়্যেবাহ্‌র উপর আক্রমণ করিয়েছিলো। এ যুদ্ধের নাম হাররার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

হযরত হান্‌যালাহ্‌ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হ'র শাহাদত এবং ফিরিশ্‌তা কর্তৃক তাঁকে গোসল দেওয়ার ঘটনা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত 'হানযালাহ'-এর পিতা আবূ 'আ-মির রাহিব কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। হযরত হান্‌যালাহ উহুদের যুদ্ধে জানাবত-এর (নাপাক) অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন। এ কারণে তাঁকে ফিরিশ্‌তাগণ গোসল দিয়েছিলেন। তাই, তাঁকে 'গাসীল-ই মালা-ইকাহ্‌' বলা হয়।

৭১. অর্থাৎ মি'রাজে বিশেষভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, উম্মতকে নয়।

৭২. এ হাদীস শরীফ ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র মতের বিপরীত নয়, না ইমাম শাফি'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর সমর্থনকারী। তিনিও প্রত্যেক নামাযের জন্য মিস্‌ওয়াক করাকে মুস্তাহাব বলে অভিমত প্রকাশ করেন। আর এখানে ফরয বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তদুপরি এ নির্দেশও পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক ওযূ দিয়ে একাধিক নামায সম্পন্ন করেছেন, আর প্রত্যেক নামাযের জন্য মিস্‌ওয়াকও করেননি। সারকথা হলো, প্রথম অবস্থায় হুযূরের উপর প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ করা ফরয ছিলো। তারপর মিস্‌ওয়াক ফরয হয়ে রয়ে গেলো, অতঃপর তাও রহিত হয়ে যায়।

৭৩. তিনি মনে করেছেন যে, 'ফরয হওয়া' রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু মুস্তাহাব হওয়ার বিধান বহাল আছে। বস্তুত এটাই সঠিক। এখনও যে ব্যক্তি এটা অনুসারে আমল করবে সে সাওয়াব পাবে।

وَعَنْ اَبِیْ رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا تَوَضَّاَ وُضُوْءَ الصَّلٰوةِ حَرَّكَ خَاتِمَهٗ فِیْ اِصْبَعِهٖ. رَوَاهُمَا الدَّارُ قُطْنِیُّ وَرَوٰی اِبْنُ مَاجَةَ الْاٰخِيْرَ

بَابُ الْغُسْلِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَاِنْ لَّمْ يُنْزِلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৫।। হযরত আবূ রাফি' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য ওযূ করতেন, তখন স্বীয় আঙ্গুলের আংটি নাড়াচাড়া করতেন।[৭৬] (এ দু'টি হাদীস দার-ই কুত্বনী বর্ণনা করেছেন আর শেষোক্তটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজাহ্।)

অধ্যায় ঃ গোসল[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৩৯৬।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রীর চার ডানার মধ্যখানে বসলো, অতঃপর চেষ্টা করলো, তখন তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে গেলো; যদিও বীর্যপাত না হয়।[২] [বোখারী, মুসলিম]

---

৭৪. হযরত সা'দ হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করেছিলেন, অথবা তিনবারের স্থলে চার-পাঁচবার করে অঙ্গসমূহ ধৌত করছিলেন অথবা ওযূর অঙ্গগুলোর সীমা অপেক্ষা বেশী ধৌত করছিলেন- এ সব ক'টিই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
এ থেকে বুঝা গেলো যে, ওযূতে এ সব বিষয় নিষিদ্ধ এবং তা করা অপরাধ (গুনাহ)।

৭৫. এখানে গুনাহ্সমূহ থেকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ওযূর শুরুতে 'বিস্মিল্লাহ' পড়ে নেওয়ার বরকতে শরীরের সমস্ত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। কারণ, হৃদয় এবং মস্তিষ্কও শরীরের অন্তর্ভুক্ত। 'বিসমিল্লাহ্' পড়ার দরুন বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছোট-খাটো গুনাহ্'র ক্ষমা হয়ে যায়। এজন্য ফক্বীহগণ বলেন, 'বিসমিল্লাহ্' বলে ওযূ আরম্ভ করা সুন্নাত।

৭৬. আংটি যদি এমন সংকীর্ণ হয় যে, নাড়াচাড়া করা ব্যতীত, সেটার নিচে পানি পৌঁছেনা, তবে ওযূতে সেটা নাড়াচাড়া করা ফরয। আর যদি ঢিলাঢালা হয়, নাড়াচাড়া করা ব্যতিরেকে সেটার নিচে পানি পৌঁছে, তবে নাড়াচাড়া করা মুস্তাহাব। এ হাদীসে উভয় অবস্থার বর্ণনা রয়েছে।

****

১. ইসলামে গোসল চার প্রকার ঃ ফরয, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও মুবাহ।

ফযর গোসল তিনটি ঃ এক. জানাবত-এর কারণে, দুই. ঋতুস্রাবের কারণে ও তিন. 'নিফাস' বা প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণের কারণে। উল্লেখ্য, 'জানাবত' যৌন কামনার কারণে বীর্যপাত হলে হয়ে থাকে, অথবা স্ত্রী সহবাসের কারণে; বীর্যপাত হোক কিংবা না-ই হোক।

সুন্নাত গোসল ৫টি ঃ

এক. জুমু'আর জন্য গোসল করা, দুই ও তিন. দু'ঈদের জন্য

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّمَا الْمَآءُ مِنَ الْمَآءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحِىُّ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ هٰذَا مَنْسُوْخٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّمَا الْمَآءُ مِنَ الْمَآءِ فِى الْاِحْتِلَامِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَلَمْ اَجِدْهُ فِى الصَّحِيْحَيْنِ

وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ اِذَا رَاَتِ

৩৯৭।। হযরত আবূ সা'ঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় পানি পানি থেকেই।[৩] [মুসলিম] শায়খ ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, এ হাদীস 'মান্সূখ' (রহিত) হয়ে গেছে। আর হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পানি থেকে পানি (অপরিহার্য) হওয়া স্বপ্ন দোষের মধ্যেই।[৪] এটা ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। আমি এ হাদীস বোখারী ও মুসলিম শরীফে পাই নি।

৩৯৮।। হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) উম্মে সুলায়ম আরয করলেন,[৫] "এয়া রসূলাল্লাহ্! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। (অতএব, আমি বলতে লজ্জাবোধ করছি না যে,) স্বপ্নদোষ হলে কি স্ত্রী লোকের ওপরও গোসল ওয়াজিব হয়?" হুযূর এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ, যখন সে পানি (বীর্য) দেখতে পায়।"[৬]

গোসল করা, চার. ইহরাম পরিধানের প্রাক্কালে গোসল করা এবং পাঁচ. আরফাহ্'র দিবসের গোসল।

মুস্তাহাব গোসল অনেক রয়েছে ঃ

যেমন- মুসলমান হওয়ার সময়, মৃতকে গোসল প্রদানের পর, ক্বোরবানীর দিন, তাওয়াফ-ই যিয়ারতের জন্য ও মদীনা-ই মুনাওয়ারায় উপস্থিত হবার প্রাক্কালে ইত্যাদি।

মুবাহ্ গোসল হলো- ঠাণ্ডা বা প্রশান্তি লাভের জন্য যে গোসল করা হয়। এ অধ্যায়ে অনেক প্রকারের গোসলের বর্ণনা আসবে।

গোসলের ফরয তিনটি ঃ এক. কুল্লি করা, দুই. নাকে পানি দেওয়া এবং তিন. গোটা বাহ্যিক শরীরের উপর পানি প্রবাহিত করা।

২. এ হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে ওই হাদীস, যাতে এরশাদ করা হয়েছে যে, 'যখন (পুরুষের) খত্নাংশ (স্ত্রীর) খত্নাংশের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন গোসল করা ওয়াজিব। এখানে এটা বুঝানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যখন যৌন কামনাসম্পন্না স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয় এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন গোসল ওয়াজিব হয়।

'চারি ডানা' মানে চার হাত-পা। 'বসা'র উল্লেখ ঘটনাচক্রের কথা বর্ণনার জন্য। নতুবা যে কোন পদ্ধতিতেই সহবাস (সঙ্গম) করা হোক না কেন, গোসল ওয়াজিব হবে। অতি স্বল্প বয়স্ক ও যৌন কামনাহীনা শিশু-কন্যা এবং পশুর সাথে সঙ্গম করলে বীর্যপাত হওয়া পূর্বশর্ত। বীর্যপাত না হলে গোসল ওয়াজিব হবে না।

৩. অর্থাৎ গোসল বীর্যপাত হওয়ার কারণেই ওয়াজিব হয়, যখন যৌন উত্তেজনা সহকারে হয়।

৪. অর্থাৎ আলোচ্য হাদীস যদি স্ত্রী সহবাস সংক্রান্ত হয়, তবে মানসূখ বা রহিত। এটার নাসিখ (রহিতকারী) হচ্ছে ওই হাদীস, যা ইতোপূর্বে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত। তদুপরি, ওই হাদীসও, যা সামনে আসছে।

আর যদি 'ইহ্তিলাম' (স্বপ্নদোষ) সম্পর্কিত হয়, তবে বিধান হচ্ছে- তাতেও বীর্যপাত হওয়া ব্যতীত গোসল ওয়াজিব হয় না। এর বর্ণনা পরবর্তী হাদীসেও আসছে।

الْـمَـآءَ فَـغَـطَّـتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ اُمِّ سُلَيْمٍ اَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَمِنْ اَيِّهِمَا عَلَا اَوْسَبَقَ يَكُوْنُ مِنْهُ الشَّبَهُ

وَعَنْ عَـآئِشَةَ رَضِـىَ الـلّٰـهُ عَـنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْـجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُدْخِلُ اَصَابِعَهٗ فِىْ

তখন উম্মে সুলাইম (লজ্জায়) মুখ ঢেকে নিলেন এবং বললেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! মেয়ে লোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয়?"[৭] এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ! তোমার হাত ধুলোয় মলিন হোক! তা না হলে, সন্তান তার মায়ের সদৃশ হয় কিরূপে?"[৮] [বোখারী ও মুসলিম] ইমাম মুসলিম উম্মে সুলাইমের বর্ণনার উপর এ-ও বৃদ্ধি করেছেন যে, পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা হয় আর মেয়েলোকের বীর্য পাতলা ও হলুদ বর্ণের হয়।[৯] উভয়ের মধ্যে যা বিজয়ী কিংবা প্রথম হয়, সন্তান তারই সদৃশ হয়।

৩৯৯।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন 'জানাবত'র গোসল করতেন, তখন এভাবে শুরু করতেন– প্রথমে উভয় হাত ধু'তেন।[১০] অতঃপর নামাযের ওযূর মতো ওযূ করতেন।[১১] তারপর স্বীয় আঙ্গুলসমূহ

৫. তাঁর নাম নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। উপনাম 'উম্মে সুলায়ম'। তিনি মালিক ইবনে নযরের বিবাহধীন ছিলেন। তাঁর গর্ভে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু জন্ম লাভ করেন। মালিক ইবনে নযর নিহত হওয়ার পর তিনি আবূ ত্বালহার বিবাহে আসেন। তখনো পর্যন্ত আবূ তালহা মুশরিক ছিলো। তখন তিনি এ শর্তে বিবাহ করেন যে, যদি আবূ ত্বালহা মুসলমান হয়ে যায় (তবে তিনি এ বিয়েতে সম্মত, নতুবা নন)।

৬. এ হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাখ্যা। স্বপ্নের ক্ষেত্রে তরল পদার্থ দেখা ছাড়া গোসল ওয়াজিব হয় না; চাই তা 'বীর্য' হোক বা 'মযী'। কেননা, কখনো বীর্য পাতলা হলে তা 'মযী' বলে অনুভূত হয়। (মযী হচ্ছে– যৌন কামনার প্রাথমিক অবস্থায় নির্গত তরল বস্তু।)

৭. এতে বুঝা গেলো যে, যে সব পবিত্র বিবি হুযূরের বিবাহধীন হন, তাঁদের 'ইহতিলাম' বা স্বপ্নদোষও হতো না। অর্থাৎ মহান রব তাঁদেরকে ব্যভিচারের কিঞ্চিত ধারণা-কল্পনা থেকেও পবিত্র রাখেন। এটাই হলো পবিত্র বিবিগণের পবিত্র চরিত্রের নমুনা।

৮. সুবহা-নাল্লাহ! কী প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব। উদ্দেশ্য হলো একথা বুঝানো যে, স্বপ্নদোষের মূল কারণ হলো– 'বীর্য' আর মহিলার মধ্যেও বীর্য রয়েছে। সুতরাং মহিলারও স্বপ্নদোষ হওয়া চাই। আর মহিলার বীর্য থাকার প্রমাণ হলো– কখনো শিশু মায়ের আকৃতিতে হয়, যখন মায়ের বীর্য পিতার বীর্যের উপর বিজয়ী হয়।

'হাত ধুলোয় মলিন হোক' বলা বদ-দো'আ অর্থে নয়, বরং আরবগণ কখনো ভালবাসাচ্ছলেও এ বাক্য বলে থাকেন। যেমন উর্দু ভাষায় বলা হয়– منڈی مشنڈی (মুণ্ডী-মুশ্‌টাণ্ডী অর্থাৎ মোটাতাজা মাথা ন্যাড়া হয়ে যাক!) আর পাঞ্জাবী ভাষায় বলা হয়–

(রুড়জায়েঁ, উতর জায়েঁ) অর্থাৎ ডুবে যাক, পড়ে থাক!) ইত্যাদি।

৯. এটা আসল অবস্থায়। অন্যথায় কখনো দুর্বল পুরুষের বীর্য দুর্বল ও পাতলা হয়ে থাকে আর সবলা মহিলার বীর্য সাদা ও গাঢ় হয়। শিশু তার বাবা ও মা উভয়ের (যথাক্রমে শুক্র ও ডিম্ব)'র সংমিশ্রণে পয়দা হয়। যার বীর্যের পরিমাণ বেশী হবে, শিশুও তার লিঙ্গের হয়। অর্থাৎ যদি স্ত্রীর বীর্যের অংশ বেশী হয়, তখন মেয়ে হয়, নতুবা ছেলে। আর গর্ভাশয়ে যার বীর্য প্রথমে পতিত হবে, সন্তান তার আকৃতিতেই হয়।

الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا اُصُوْلَ شَعْرِهٖ ثُمَّ يَصُبُّ عَلٰى رَاْسِهٖ ثَلٰثَ غُرُفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَآءَ عَلٰى جِلْدِهٖ كُلِّهٖ . متفق عليه

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهٖ عَلٰى شِمَالِهٖ فَيَغْسِلُ فَرْجَهٗ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ .

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً فَسَتَرْتُهٗ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ عَلٰى يَدَيْهِ

পানিতে প্রবেশ করাতেন এবং তা দ্বারা চুলের গোড়ায় গোড়ায় খিলাল করতেন। অতঃপর স্বীয় শির মুবারকের উপর উভয় হাত দ্বারা তিন অঞ্জলী পানি ঢালতেন। অতঃপর স্বীয় শরীর মুবারকের গোটা ত্বক শরীফের উপর পানি প্রবাহিত করতেন।[১২] [বোখারী, মুসলিম] আর ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, "এভাবে (গোসল) শুরু করতেন– পাত্রে প্রবেশ করানোর পূর্বে প্রথমে উভয় হাত ধুয়ে নিতেন। অতঃপর স্বীয় ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢালতেন। তারপর ইস্তিন্জা করতেন। অতঃপর ওযূ করতেন।[১৩]

৪০০।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মায়মুনা[১৪] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা বলেছেন, আমি (একবার) নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। অতঃপর আমি তাঁকে কাপড় দ্বারা আড়াল করলাম।[১৫] তিনি প্রথমে নিজের উভয় হাতের উপর পানি প্রবাহিত করলেন।

---

১০. স্মর্তব্য যে, সম্মানিত নবীগণের কখনো (স্বপ্নদোষ) হতো না। যেমন– ত্বাব্‌রানী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে। তাঁদের 'জানাবত' শুধু স্ত্রীর সাথে সহবাসের কারণে হতো।

এ হাত ধোয়া ওযূ করার পূর্বেরই ছিলো। কারণ, ওযূর উল্লেখ পরবর্তীতে আসছে। যেহেতু ওই যুগে সাধারণতঃ বড় পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পানি নেওয়া হতো, সেহেতু প্রথমে হাত ধু'য়ে নিতে হতো। তদুপরি, হাতে অপবিত্র কিছু লেগে থাকারও সম্ভাবনা থাকতো।

১১. যদি তক্তা ইত্যাদির উপর হতেন, তবে পাও ধুয়ে নিতেন। আর যদি কাঁচা মাটির উপর হতেন, তখন গোসলের পর উভয় পা ধু'তেন।

১২. ঘন চুল বিশিষ্ট লোকের জন্য (এখনো) সুন্নাত হচ্ছে– প্রথমে চুলের গোড়ায় গোড়ায় খিলাল করবে এবং মাথা ধু'বে। তারপর সমস্ত শরীরের সাথেও মাথার উপর পানি ঢালবে।

১৩. এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গোসল করার পূর্বে ইস্তিন্জা (শৌচকর্ম সম্পন্ন করা কিংবা গোপনাঙ্গ ধৌত করা)ও সুন্নাত।

১৪. তাঁর নাম মায়মুনাহ্ বিনতে হা-রিস। তিনি হিলাল ও 'আ-মির গোত্রের মহিলা। প্রথমে তাঁর নাম 'বার্‌রাহ' ছিলো। হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম পরিবর্তিত করে দিলেন। জাহেলী যুগে মাস'উদ ইবনে আমর সাক্বাফীর বিবাহধীন ছিলেন। তারপর আবূ রাহামের বিবাহধীন হন। তাঁর মৃত্যুর পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ৭ম হিজরীর যিলক্বদ মাসে ক্বাযা উমরাহ্ পালনের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলে তখন মক্কা-ই মু'আয্‌যমাহ্ থেকে ১০ মাইল দূরে 'সারাফ' নামক স্থানে তাঁকে বিবাহ্ করে ধন্য করলেন। আল্লাহ্‌র কী শান! ৬১ হিজরী সালে ওই বিবাহবন্ধনের স্থানেই তাঁর ওফাত হয়। তিনি হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু

فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَه‘ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَه‘ وَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ وَاَفَاضَ عَلٰى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُه‘ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُه‘ لِلْبُخَارِيِّ

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اِمْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَاَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِىْ فُرْصَةً مِّنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِىْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ تَطَهَّرِىْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ

অতঃপর ওই দু'টি ধু'লেন। তারপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং ইস্তিনজা করলেন। তারপর স্বীয় হাত মাটিতে মারলেন এবং সেটা পরিষ্কার করলেন। তারপর ধু'য়ে নিলেন। তারপর কুল্লি করলেন এবং নাকে পানি নিলেন। আর স্বীয় মুখমণ্ডল এবং কুনুই পর্যন্ত দু'হাত ধু'লেন। তারপর নিজ মাথায় উপর পানি প্রবাহিত করলেন।[১৬] অতঃপর ওই স্থান হতে সরে গেলেন এবং নিজের উভয় কদম শরীফ ধু'লেন। অতঃপর আমি তাঁকে কাপড় এগিয়ে দিলাম; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। আর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে তাশরীফ নিয়ে গেলেন।[১৭] [বোখারী ও মুসলিম] তবে এর শব্দগুলো বোখারী শরীফের।

৪০১।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আনসারের এক স্ত্রী নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ঋতুস্রাবের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি তাকে বলে দিলেন কিভাবে সে গোসল করবে। (অর্থাৎ গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে বলে দিলেন)। তারপর এরশাদ করলেন, মুশ্‌কের একটি টুকরো নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করো।

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষ স্ত্রী ছিলেন। তাঁর পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আর কাউকে বিবাহ করেন নি। তিনি উম্মুল ফযল অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের মহীয়সী মাতা ও হযরত আস্‌মা বিনতে ওমায়সের সহোদরা। অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম'র খালা।

১৫. যদিও তিনি লুঙ্গি পরিধান করে গোসল করছিলেন, তবুও তিনি চাদর টেনে ধরে সামনে দাঁড়ালেন। বেশী পর্দা করার জন্য। তাই লুঙ্গি পরিধান করে গোসল করা চাই। কেউ কেউ বলেছেন, এটার অর্থ হলো- তিনি পানি ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। [মিরক্বাত]

১৬. গোসল করার তারতীব (সুবিন্যস্ত নিয়ম) এ-ই হলো যে, প্রথমে হাত ধুয়ে ফেলা হবে। তারপর ইস্তিনজা করবে (গোপনাঙ্গ ধৌত করবে) তারপর সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করা হবে। যেহেতু হুযূর কাঁচা মাটির উপর গোসল করছিলেন, যেহেতু ওযূর সাথে পা ধৌত করেন নি; বরং পরে ধুয়েছেন। যদি পাকা মাটির উপর গোসল করা হয়, তবে পা প্রথমে ধুইয়ে নেওয়া হবে। (তারপর সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে)।

স্মর্তব্য যে, এখানে মাথা মসেহ করার উল্লেখ নেই। হয়তো হুযূর মাথা মসেহ-ই করেন নি। কারণ মাথা ধৌত করার মধ্যে মসেহও হয়ে যায়। অথবা, মসেহ করেছেন, কিন্তু বর্ণনাকারী উল্লেখ করেন নি। অতএব, এ হাদীস প্রথম হাদীসের বিপরীত নয়, যাতে মসেহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

اَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِىْ بِهَا فَاجْتَذَبْتُهَا اِلَىَّ فَقُلْتُ تَبْتَغِىْ بِهَا اَثَرَ الدَّمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِمْرَاَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَرَاْسِىْ اَفَاَنْقُضُه لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِىْ عَلٰى رَاْسِكِ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَآءَ فَتَطْهُرِيْنَ. رَوَاهُ مُسْلِم

আনসারী মহিলা আরয করলেন, "তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবো।" এরশাদ করলেন, "তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করো।" তিনি (মহিলাটি) আরয করলেন, "তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবো?" হুযূর এরশাদ করলেন, 'সুব্হা-নাল্লাহ্! (আল্লাহ্রই পবিত্রতা!) তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করো।"[১৮] তখন আমি তাকে (ওই মহিলা) আমার দিকে টেনে নিলাম এবং বললাম, "(রক্তস্রাব শেষ হলে) খণ্ডটি রক্তের স্থানে লাগিয়ে নাও।"[১৯] [বোখারী, মুসলিম]

৪০২।। হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, "এয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি এমন এক মহিলা যে, আমি আমার চুলের বেণী শক্ত করে বেঁধে থাকি। জানাবতের গোসলের সময় কি আমি তা খুলে ফেলবো?" হুযূর এরশাদ করলেন, "না বরং তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি তোমার মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি প্রবাহিত করবে। অতঃপর তোমার উপর পানি প্রবাহিত করবে; তাহলে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।"[২০] [মুসলিম]

---

১৭. হয়তো এজন্য যে, ওই কাপড় পরিষ্কার ছিলো না, অথবা তাঁর ত্বরা ছিলো। অথবা গরমকাল ছিলো, শরীর ভেজা থাকা আরামদায়ক মনে হচ্ছিলো। অথবা এজন্য যে, গোসল ও ওযূর পানি না মোছা ছিলো উত্তম। যে কোন অবস্থাতেই এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, মুছে ফেলা নিষিদ্ধ। কারণ, পূর্ববর্তী বর্ণনাগুলোতে মোছার প্রমাণও রয়েছে।

এ থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, ওযূ এবং গোসলের পর শরীরের মধ্যে যে আর্দ্রতা থেকে যায়, তা 'ব্যবহৃত পানি' হিসেবে বিবেচ্য নয়।

১৮. এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গোপনীয় মাস্'আলাসমূহের শিক্ষাদান ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে করা উচিত। বিশেষতঃ পর-মহিলার সামনে। কারণ ওই মহিলা বার বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই বাক্যের বিশ্লেষণ করেন নি। একথা বলার ছিলো যে, গোসল করার পর মুশ্কের টুকরা কিংবা মুশ্কে চুবানো কাপড়ের টুকরাও তাতে বুলিয়ে নাও, যেখানে রক্ত লেগে থাকে; যাতে রক্তের দুর্গন্ধ চলে যায়। কোন কোন কপিতে (مُمَسَّكٌ) শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ মুশ্কের লেপযুক্ত কাপড়।

১৯. সুব্হা-নাল্লাহ্! এ থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হার তীক্ষ্ণ মেধার কথা জানা গেলো। এমন হবেনও না কেন? তিনিতো রসূল পাকের মেজাজ শরীফ বুঝতেন। অতি বড় ফক্বীহা ও আলিমা ছিলেন।

২০. এরই ভিত্তিতে ফক্বীহগণ বলেন, মহিলাদের গোসলে সমস্ত চুল ভেজানো ফরয নয়; বরং সমস্ত চুলের মূল (গোড়া) ভিজে যাওয়া যথেষ্ট। যদি পুরুষের চুল থাকে, তবে সব চুল ভেজাতে হবে। তিনবারের শর্তারোপ করা নিশ্চিত ধারণা (يقين) অর্জনের জন্যই। অন্যথায় একবারেই যদি চুলের সকল গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়, তবে তাও যথেষ্ট। আর যদি তিনবার পানি ঢালার পরও পানি না পৌঁছে, তবে আরো বেশী ঢালা জরুরী। আর যদি এতো শক্তভাবে চুল বাঁধা হয় যে, তা খোলা ছাড়া চুলের সমস্ত গোড়ায় পানি পৌঁছতে পারে না, তখন তো খোলাও জরুরী।

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ اِلٰى خَمْسَةِ اَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِىْ حَتّٰى اَقُوْلَ دَعْ لِىْ دَعْ لِىْ قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৩।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক মুদ্ পানি দ্বারা ওযূ করতেন আর এক সা' হতে পাঁচ মুদ্ পর্যন্ত (পানি) দ্বারা গোসল করতেন।"[২১] [বোখারী, মুসলিম]

৪০৪।। হযরত মু'আযাহ্[২২] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেছেন, আমি ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম, যা আমার ও তাঁর মধ্যভাগে থাকতো।[২৩] সুতরাং তিনি আমার চেয়ে ত্বরা সহকারে পানি নিতেন, এমন কি আমি বলতাম, আমার জন্যও পানি রাখুন। আমার জন্যও পানি রাখুন![২৪] বর্ণনাকারী (হযরত মু'আযাহ্) বলেন, (তখন) তাঁরা উভয়েই জানাবতের অবস্থায় ছিলেন। [বোখারী, মুসলিম]

২১. হানাফী মাযহাব অনুসারে এক মুদ্দ হয় দু'রিত্বল-এ আর এক রিত্বল হয় ৪০ তোলায় এবং এক সা' হয় ৪ মুদ্দ-এ। সুতরাং পাকিস্তানী ওজনে ১ রিত্বল হয় অর্ধ সেরে। সুতরাং এ মুদ্দ এক সেরের সমান। কাজেই এক সা' হয় চার সেরের সমান। অবশ্য মুদ্ ও রিত্বলের পরিমাপ নিয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। তদুপরি হালকা বস্তু সা'তে কম আসে, আর ভারী বস্তু বেশী। এ কারণে সাবধানতা হচ্ছে- ফিত্বরার ক্ষেত্রে অর্ধ সা' গম প্রায় সোয়া দুসের ধরে নেওয়া। অর্থাৎ এক সা'তে পানি আনুমানিক চার সের আর গম সাড়ে চার সেরের সঙ্কুলান হবে।

স্মর্তব্য যে, ওযূ ও গোসলে পানির পরিমাণ সুনির্দিষ্ট নেই। সুন্নাত হচ্ছে- ওযূ যেনো এক সের অপেক্ষা কম পরিমাণ পানি দ্বারা না হয়, আর গোসল যেনো চার সের অপেক্ষা কম পানি দ্বারা না করা হয়।

২২. তাঁর নাম মু'আযাহ বিন্‌তে আব্দুল্লাহ্। তিনি বনী আদী গোত্রীয় মহিলা। ৩৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত।

২৩. চওড়া মুখ বিশিষ্ট, যাতে উভয়ের হাত অনায়াসে প্রবেশ করানো যেতো। আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তাঁরা উভয়ে লুঙ্গি পরে গোসল করতেন, যদিও স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে পর্দার প্রয়োজন নেই।

স্মর্তব্য যে, যদি জুনুবী (এমন নাপাক ব্যক্তি যার উপর গোসল ফরয) কিংবা ওযূ বিহীন ব্যক্তির হাত ধুয়ে প্রয়োজনে মটকা বা কলসীর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, তবে ওই পানি 'ব্যবহৃত' বলে গণ্য হবে না; যেমনটি এ হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হলো। কিন্তু যদি পা কিংবা মাথা ঢুকিয়ে দেয়, তবে পানি ব্যবহৃত হয়ে যাবে। কেননা, এটা বিনা প্রয়োজনে করা হয়েছে। তাছাড়া, যদি হাত না ধু'য়ে কিংবা বিনা প্রয়োজনে হাত ঢুকিয়ে দেয়, তবে পানি ব্যবহৃত হয়ে যাবে।

স্মর্তব্য যে, মহিলার বেঁচে যাওয়া পানি দ্বারা পুরুষের গোসল কিংবা ওযূ করা মাকরূহ; কিন্তু (স্বামী-স্ত্রী) একসাথে গোসল করলে মাকরূহ নয়।

২৪. বুঝা গেলো যে, গোসল করার সময় কথা বলা জায়েয। তবে এ শর্তে যে, যদি উভয়ে লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় থাকে। বিবস্ত্র অবস্থায় কথা বলা নিষিদ্ধ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِى ◆ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ اِحْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ الَّذِىْ يَرٰى اَنَّه، قَدْ اِحْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ هَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ تَرٰى ذٰلِكَ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ اِنَّ النِّسَآءَ شَقَآئِقُ الرِّجَالِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوٗدَ وَرَوَى الدَّارِمِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ

وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُه، اَنَا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪০৫।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তরল পদার্থের অস্তিত্ব তো পেয়েছে, অথচ স্বপ্নের কথা মনে নেই (সে কি করবে?) হুযূর এরশাদ করলেন, "সে গোসল করবে।" আর ওই ব্যক্তি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হলো, যার মনে পড়ছে যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে, অথচ তারল্য পায় নি। (সে কি করবে?)। হুযূর এরশাদ করলেন, "ওই ব্যক্তির উপর গোসল (ফরয) নয়।"[২৫] উম্মে সুলায়ম আরয করলেন, "ওই মহিলার উপরও কি গোসল ফরয, যে তা দেখে?" হুযূর এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ। স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের মতো।"[২৬] এটা তিরমিযী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। আর দারেমী ও ইবনে মাজাহ্ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ (তার উপর গোসল ফরয নয়) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

৪০৬।। তাঁরই (হযরত আয়শা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন খত্না খত্না (যথাক্রমে, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ যোনীদ্বারে)'র মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন গোসল করা ওয়াজিব। আমি ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আমল করেছি; অতএব, আমরা গোসল করেছি।[২৭] [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্]

---

২৫. কেননা, স্বপ্নদোষে বীর্য বের হওয়া গোসলকে ওয়াজিব করে দেয়- স্বপ্ন স্মরণ থাকুক কিংবা না-ই থাকুক। সাধারণতঃ তরল পদার্থের অস্তিত্ব গোসলকে ওয়াজিব করে দেয়- যদিও তা মযীই হয়। কারণ, কখনো পাতলা বীর্য মযী বলে অনুভূত হয়। এটাই আমাদের হানাফী মাযহাবের অভিমত। এ হাদীস আমাদের জন্য দলীল।

২৬. অর্থাৎ শরীয়তের অধিকাংশ বিধানে নারীগণ পুরুষের সমান। এ কারণে ক্বোরআন ও হাদীসে পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, আর মহিলাগণও তা'তে অন্তর্ভুক্ত থাকে। شَقَائِق শব্দটি شَقِيْقَة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ টুকরা ও অংশ। এজন্য (সহোদর) ভাইকে আরবীতে শাক্বীক্ব شقيق বলা হয়। হযরত হাওয়া হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর শরীরের অংশ ছিলেন। তাই মহিলাগণ পুরুষদের অংশ-বিশেষ।

২৭. উম্মুল মু'মিনীন স্বীয় কর্মের উল্লেখ নিশ্চয়তা প্রকাশের জন্য করেছেন। অর্থাৎ আমি এ মাস্'আলা নিছক শুনে বর্ণনা করছি না; বরং হুযূরের উপস্থিতিতে এতদনুসারে আমল করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

وَعَنْ اَبِی هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوْا الشَّعْرَ وَاَنْقُوْا الْبَشَرَةَ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِیُّ وَ اِبْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِیُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَالْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ الرَّاوِیُّ وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ

وَعَنْ عَلِیٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِّنْ جَنَابَةٍ لَّمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِیٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاْسِیْ فَمِنْ ثَمَّ

৪০৭।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক চুলের নিচে নাপাকী রয়েছে। সুতরাং চুল ধৌত করো এবং চামড়া পরিষ্কার করো।[২৮] [আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীস 'গরীব' পর্যায়ের। এর বর্ণনাকারী হা-রিস ইবনে ওয়াজীহ্ বৃদ্ধ লোক। তিনি এমন মর্যাদার উপযোগী নন।[২৯]

৪০৮।। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানাবতের গোসলে একটি চুল পরিমাণ স্থানও না ধু'য়ে ছেড়ে দেয়, তাকে দোযখে এমন এমন শাস্তি দেওয়া হবে।[৩০] হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, "এ কারণেই আমি আমার চুলগুলোর শত্রু। এ কারণেই

এটা বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা এজন্য দেখা দেয় যে, এ মাসআলা নিয়ে আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে বড় মত পার্থক্য দেখা দিয়েছিলো। আনসারীগণ বলতেন এমতাবস্থায় বীর্যপাত না হলে গোসল ওয়াজিব হয় না। তখন হযরত আবূ মূসা আশ'আরী বলতেন, তোমরা ঝগড়া করো না। আমি এটার মীমাংসা হযরত আয়শা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা'র মাধ্যমে করিয়ে দিচ্ছি। প্রয়োজনের সময় ক্বোরআন করীমও এমন সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছে। এরশাদ হচ্ছে- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ (অর্থাৎ এবং যারা যৌনাঙ্গগুলোকে সংযত রাখে। ২৩:৫, তরজমা- কান্যুল ঈমান)। আরো এরশাদ হচ্ছে- بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ (অর্থাৎ এসব কিছুর উপর অতিরিক্ত এ' যে, তার মূলে ত্রুটি। ৬৮:১৩, তরজমা- কান্যুল ঈমান)

সুতরাং হাদীসের বিপক্ষে কোন আপত্তি নেই।

২৮. এ হাদীস দ্বারা দু'টি মাস্'আলা জানা গেলো ঃ

এক. গোসলে শরীরের সমস্ত চুল ভেজানো ফরয। যদি একটি চুলও শুষ্ক থেকে যায়, তবে গোসল হবে না।

দুই. যদি শরীরের উপর শুষ্ক মাটি, আটার খামির কিংবা মোম লেগে থাকে, যার নিচে পানি পৌঁছে না, তবুও গোসল হবে না। সুতরাং যদি নখের মধ্যে নেইল পালিশ লাগানো থাকে, তবে গোসল শুদ্ধ হবে না। কারণ সেটার নিচে পানি পৌঁছে না।

স্মর্তব্য যে, ঘন দাড়ি ওযূতে প্রতিবন্ধক নয়। (অর্থাৎ দাড়ি ঘন হলে ওযূতে দাড়ির গোড়ার পানি পৌঁছানো জরুরী নয়।) কেননা, তাতে (জরুরী হলে) বড় কষ্ট হয়। কারণ প্রতিদিন কয়েকবার ওযূ করা হয়। তবে গোসলের মধ্যে দাড়ির গোড়ায় পানি পৌঁছানো চাই। [মিরক্বাত]

২৯. অর্থাৎ বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তাঁর স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। তাই তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ শক্তিশালী নয়। (شَيْخٌ) (শায়খ) শব্দটি عدالت -এর সংজ্ঞা কিংবা স্মরণ-শক্তিতে ত্রুটি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানেও ওই সমালোচনা (جرح)-এর জন্য এসেছে। যেমনটি সামনের ইবারত দ্বারা স্পষ্ট হয়।

৩০. অর্থাৎ শাস্তির উপর শাস্তি হবে। প্রথমতঃ নাপাক থাকার কারণে, দ্বিতীয়তঃ সমস্ত নামায বরবাদ করার কারণে। তাই

عَادَيْتُ رَاسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاسِي ثَلْثًا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَاَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ اِلَّا اَنَّهُمَا لَمْ يُكَرِّرْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاسِي

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ رَاسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذٰلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ

আমি আমার চুলগুলোর শত্রু, এ কারণেই আমি আমার চুলগুলোর শত্রু।'' তিনবার বলেছেন।[৩১] এ হাদীস ইমাম আবূ দাউদ, আহমদ ও দারেমী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ও দারেমী এ কারণেই 'আমি আমার চুলগুলোর শত্রু' (বাক্যটি) বারংবার বলেন নি।

৪০৯।। হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম গোসলের পর ওযূ করতেন না।[৩২] [তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ]

৪১০।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন শির মুবারককে জানাবতের অবস্থায় 'খাত্বমী' দিয়ে ধুতেন। এটা করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন।[৩৩] শির মুবারকের উপর আর পানি ঢালতেন না।[৩৪] [আবূ দাঊদ]

গোসলের মধ্যে বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। নাভী, বগল, কানের লতি- এ সব ক'টিতে অত্যন্ত খেয়াল করে পানি পৌঁছাবে। কারণ, এসব অঙ্গে অমনোযোগী হওয়ার কারণে পানি পৌঁছে না।

৩১. অর্থাৎ চুলের যুলফী ও বাবরী চুল রাখিনা, সর্বদা চুল ছেঁটে ফেলি কিংবা মুণ্ডাতে থাকি।

স্মর্তব্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত সাহাবী হজ্জের সময় ছাড়া কখনো মাথা মুণ্ডান নি। এ হাদীসের ভিত্তিতে হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু সবসময় চুল মুণ্ডাতেন- একথা প্রমাণিত হয় না। কারণ, তিনি চুল ছাঁটতেন। যদিও কখনো মুণ্ডিয়েও থাকতেন তবে তা দ্বারা চুল মুণ্ডানোর বৈধতাই প্রমাণিত হবে, সুন্নাত বলে প্রমাণিত হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বদা চুল মুণ্ডানোকে ওহাবী-নজদীদের চিহ্ন বলে সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং সর্বদা, বিশেষ করে এ যুগে সুন্নী মুসলমানের মাথা মুণ্ডানোর অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকা চাই।

৩২. কেননা, গোসলের পূর্বক্ষণে ওযূ করে নিতেন। ওই ওযূ নামাযের জন্য যথেষ্ট ছিলো; বরং যদি কেউ ওযূ না করেও গোসল করে, তারপর নামায পড়ে, তবে তাও জায়েয। কারণ, বড়তর পবিত্রতার অধীনে ছোটতর পবিত্রতাও হয়ে যায়। 'বড় হাদস্' (গোসল ওয়াজিবকারী অপবিত্রতা)-এর সাথে 'ছোটতর হাদস' (ওযূ ভঙ্গকারী অপবিত্রতা)ও দূরীভূত হয়ে যায়।

৩৩. অর্থাৎ গোসলের পূর্বে খাত্বমী (এক প্রকার ঘাস) দ্বারা মাথা মুবারক ধু'তেন। তারপর সারা শরীর মুবারকের সথে শির মুবারক পুনরায় ধু'তেন না, যাতে 'খাত্বমী'র কিছুটা প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। আর প্রথম পানি ঢালাকে গোসলের জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, যদি গোসলের অঙ্গগুলোর আগে-পরে ধুয়ে নেওয়া হয়, তবে গোসল শুদ্ধ হয়।

৩৪. অর্থাৎ গোসলের সাথে সাদা পানি মাথার উপর ঢালতেন না; (বরং) খাত্বমী বিশিষ্ট পানিকেই যথেষ্ট মনে করতেন।

وَعَنْ يَعْلٰي قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلًا يَّغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَيِيٌّ سَتِيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّرَ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَآئِيُّ وَفِيْ رِوَايَتِهٖ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ سَتِيْرٌ فَاِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ.

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْمَآءُ مِنَ الْمَآءِ رُخْصَةً فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৪১১।। হযরত ইয়া'লা[৩৫] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ময়দানে গোসল করতে দেখলেন।[৩৬] তখন তিনি মিম্বরের উপর আরোহণ করলেন। তারপর আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা করলেন। তারপর এরশাদ করলেন, আল্লাহ্ তা'আলা লজ্জা বিশিষ্ট, পর্দাপোশ; লজ্জা ও পর্দাকে পছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ গোসল করে, সে যেনো পর্দা করে নেয়।[৩৭] [আবূ দাউদ, নাসাঈ]

আর নাসা'ঈর বর্ণনায় এসেছে- 'আল্লাহ্ পর্দাপোশ'। যখন তোমাদের মধ্যে কেউ গোসল করতে চায়, সে যেনো কোন জিনিষকে আড়াল করে নেয়।'[৩৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪১২।। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পানি পানির কারণে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ অনুমতি ছিলো। তারপর তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৩৯] [তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারেমী]

---

৩৫. অর্থাৎ ইয়া'লা দু'জন। একজন হলেন- ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া আর অপরজন হলেন ইয়া'লা ইবনে মুর্‌রাহ্। উভয়ই সাহাবী। এখানে কোন্ ইয়া'লার কথা বুঝানো হয়েছে তার হদিস পাওয়া যায় নি।

৩৬. লোকটি খোলা ময়দানে একাকী ছিলো। এ কারণে বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করছিলো। তাকে তখন কেউ দেখতে পাচ্ছিলো না। তাছাড়া আরবে ইসলাম প্রবর্তিত হবার পূর্বে লজ্জা-শরম বলতে কিছুই ছিলো না। লজ্জা-শরম তো ইসলামই শিক্ষা দিয়েছে।

৩৭. যদিও একাকী হয়, তবে পুরুষ লুঙ্গী পরে ময়দানে গোসল করতে পারে। কারণ, তার সতর হচ্ছে নাভী থেকে দু'হাঁটু পর্যন্ত; কিন্তু নারী গোসলখানা কিংবা আড়াল করে গোসল করবে। কেননা, তার সতর হচ্ছে- মাথা থেকে পা পর্যন্ত। ফক্বীহগণ বলেন, একাকী অবস্থায়ও বিনা কারণে উলঙ্গ হওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহকে লজ্জা করা চাই।

৩৮. একাকী অবস্থায় আড়াল করা মুস্তাহাব। আর সবার সামনে ওয়াজিব। এ বিধানে উভয়ে অন্তর্ভুক্ত।

৩৯. অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগে বীর্যপাত ব্যতীত স্ত্রী সঙ্গম করলে গোসল ওয়াজিব হতো না। এখন পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ (حَشَفَه) অদৃশ্য হলে গোসল ওয়াজিব হবে- বীর্যপাত হোক কিংবা না-ই হোক। 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, ইসলামে সর্বপ্রথম 'তাওহীদ'-এ বিশ্বাস করা ফরয হলো। তারপর 'সূরা মুয্‌যাম্মিল'-এ বর্ণিত নামায ফরয হলো; অর্থাৎ রাতের নামায। তারপর পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয হওয়ার মাধ্যমে ওই রাতের নামায ফরয হওয়ার বিধান রহিত হলো। অতঃপর হিজরতের পর রোযা ও যাকাত ইত্যাদি ফরয হলো।

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَاكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الصَّلٰوةُ خَمْسِيْنَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتّٰى جُعِلَتِ الصَّلٰوةُ خَمْسًا وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪১৩।। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে হাযির হলো, অতঃপর আরয করলো, "আমি 'জনাবত' (ওই অপবিত্রতা যার কারণে গোসল করা ওয়াজিব) থেকে গোসল করেছি এবং ফজরের নামায পড়ে নিয়েছি। তারপর দেখলাম যে, এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছে নি।" রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "যদি তুমি ওই জায়গায় হাত বুলিয়ে নিতে তবে যথেষ্ট হতো।[৪০] [ইবনে মাজাহ]

৪১৪।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামায পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছিলো, 'জনাবত'-এর গোসল ছিলো সাত বার এবং কাপড় থেকে প্রস্রাব ধু'তে হতো সাত বার।[৪১] সুতরাং হুযূর-ই আন্ওয়ার (আল্লাহ্র মহান দরবারে) আরয করতে রইলেন। শেষ পর্যন্ত নামায রইলো পাঁচ ওয়াক্ত, জনাবত-এর গোসল একবার এবং কাপড় প্রস্রাব থেকে ধোয়া রইলো একবার।[৪২] [আবূ দাঊদ]

৪০. অর্থাৎ যদি গোসল করার সময় ওখানে হাত বুলিয়ে নিতে, তবে পানি প্রবাহিত হয়ে যেতো। অথবা যদি গোসলের পর ওযূ ইত্যাদির সময় হাত বুলিয়ে পানি প্রবাহিত করে নিতে, তবুও যথেষ্ট হতো। এখন ওই জায়গাটা ধুয়ে নাও এবং নামায পুনরায় পড়ো।

হাদীস শরীফের অর্থ এ নয় যে, ওই স্থানে শুধু মসেহ করে নিলে যথেষ্ট হতো; পানি প্রবাহিত করার প্রয়োজন ছিলো না। কেননা, গোসলের মধ্যে গোটা শরীরে পানি প্রবাহিত করা ফরয।

এ হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদি গোসলের কোন অঙ্গ শুষ্ক থেকে যায় এবং অনেকক্ষণ পর জানা যায়, তবে তার জন্য পুনরায় গোসল করা জরুরী নয়, বরং শুধু ওই জায়গা ধুয়ে ফেলা যথেষ্ট।

৪১. অর্থাৎ মি'রাজে প্রথমে এ বিধানগুলো দেওয়া হয়েছে, তারপর ওখানেই তা রহিত করা হয়েছে। যেমন- সামনে আসছে। এ বিধানগুলো অনুসারে কাজ কেউই করে নি। কেননা, আমল করার পূর্বেও রহিত হওয়া বৈধ।

৪২. প্রকাশ থাকে যে, এ তিন রহিতকরণ মি'রাজের রাতেই হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে গোসল করা এবং কাপড় ধোয়া সাতবার করেই অপরিহার্য ছিলো, যা কিছুদিন পালিতও হয়েছিলো। (তারপর রহিত হয়েছে।)

بَابُ مُخَالَطَةِ الْجُنُبِ وَمَا يُبَاحُ لَهُ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَخَذَ بِيَدِهٖ فَمَشَيْتُ مَعَهٗ حَتّٰى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَاَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهٗ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ. هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهٖ فَقُلْتُ لَهٗ لَقَدْ

অধ্যায় ঃ গোসল ওয়াজিব হয়েছে এমন অপবিত্র লোকের সাথে মেলামেশা করা এবং এমন অপবিত্র লোকের জন্য কি কি বৈধ[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৪১৫।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাথে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ হলো,[২] অথচ আমি নাপাক ছিলাম। তিনি আমার হাতকে নিজের হাত মুবারকে নিয়ে নিলেন।[৩] আমি হুযূরের সাথে সাথে চললাম। শেষ পর্যন্ত তিনি বসলেন; ইত্যবসরে আমি চুপিসারে বের হয়ে নিজের ঘরে আসলাম। গোসল করলাম ও পুনরায় হাযির হলাম। অথচ হুযূর তখনো (ওখানে) তাশরীফ রাখছিলেন।[৪] হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "হে আবূ হোরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে?" আমি ঘটনা আরয করলাম। হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "সুব্হানাল্লাহ্ (আল্লাহ্রই পবিত্রতা)! মু'মিন অপবিত্র হয় না।"[৫] এ বর্ণনার বচনগুলো ইমাম বোখারীর। মুসলিমের বর্ণনায় এর অর্থই রয়েছে। আর قُلْتُ (আমি আরয করলাম)-এর পর এটাও আছে যে,

স্মর্তব্য যে, ইমাম শাফে'ঈর মতে, নাপাক কাপড় একবার ধোয়াই ফরয; যেমনিভাবে ওযূ ও গোসলের মধ্যে অঙ্গগুলো একবার করে ধোয়াই ফরয। আর আমাদের ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মতে, যদি কাপড়ের উপর অপবিত্র বস্তু দেখা না যায়, তবে এতটুকু ধোয়া ফরয যে, সেটা পাক হয়েছে মর্মে বেশীরভাগ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। তা এভাবে যে, তিনবার ধু'বে এবং প্রত্যেকবার মুচড়ে নেবে। কিন্তু সাহেবাঈনের মতেও যে কাপড় মুচড়ে নেওয়ার উপযোগী নয়, যেমন– খুব মোটা কাপড়, অথবা অতিমাত্রায় দুর্বল ও নাজুক রেশমী কাপড়, তাতেও ওই পরিমাণ পানি প্রবাহিত হওয়া যথেষ্ট হয়। সুতরাং এ হাদীস শরীফ ইমাম সাহেবের বিরোধী নয়।

****

১. جُنُبِى (জুনুবী) শব্দটি جنابت (জানাবত) থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ 'দূরত্ব' ও 'পৃথক থাকা'। শরীয়তের পরিভাষায় حدث اکبر (বড় নাপাকী)-কে 'জানাবত' বলে, যার কারণে গোসল করা ওয়াজিব হয়। কেননা, এর কারণে মানুষ মসজিদ ও নামায ইত্যাদি থেকে পৃথক থাকে। আর পুরুষ, স্ত্রী, এক ও একাধিকের বেলায় جنب (জুনুব) শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। 'মেলামেশা' (اختلاط) মানে তার সাথে পানাহার করা, ওঠাবসা, হাত ও গলা মিলানো।

২. এটা বলেন নি যে, আমি হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, কেননা, তাঁর ইচ্ছা সাক্ষাৎ করা ছিলো না, ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে। তিনি তো গোসল করার জন্য যাচ্ছিলেন।

৩. ভালবাসা ও স্নেহের ভিত্তিতে; পথ চলতে সাহায্য করার জন্য নয়, যেমন কেউ কেউ মনে করে বসেছে।

৪. এটা হচ্ছে সাহাবীগণের চূড়ান্ত আদব। তখন হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র এ ধারণা ছিলো যে, অপবিত্র অবস্থায় করমর্দন করা ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ; কিন্তু লজ্জা ও আদবের কারণে তখন আরয করতে পারেন নি। ইচ্ছা ছিলো– পরবর্তীতে মাস্'আলা জেনে নেবেন। যেহেতু অবৈধ

لَقِيتَنِي وَاَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ حَتّٰى اَغْتَسِلَ وَكَذَا الْبُخَارِىُّ فِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ جُنُبًا فَاَرَادَ اَنْ يَّاْكُلَ اَوْ يَنَامَ تَوَضَّاَ وُضُوْءَهٗ لِلصَّلٰوةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"আমার সাথে আপনার এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ হলো যে, আমি জুনুবী (নাপাক) ছিলাম। আমি গোসল ব্যতীত হুযূরের সাথে বসা পছন্দ করলাম না।[৬]" বোখারীর অন্য বর্ণনায় এমনই রয়েছে।

৪১৬।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে আরয করেছেন যে, রাতে তিনি জানাবতগ্রস্ত হয়ে থাকেন।[৭] তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "ওযূ করে নাও, বিশেষ অঙ্গ ধুয়ে নাও। তারপর শুয়ে পড়ো।"[৮] [বোখারী, মুসলিম]

৪১৭।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন 'জুনুবী' হতেন এবং কিছু আহার ও শয়ন করতে চাইতেন, তখন নামাযের ওযূ করে নিতেন।[৯] [মুসলিম, বোখারী]

হবে বলে নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো না, সেহেতু নীরবতা পালন করেছেন।

৫. অর্থাৎ 'জানাবাত' প্রকৃত (বাস্তব) অপবিত্রতা (نجاست حقيقيه) নয়, যাতে 'জুনুবী'র সাথে করমর্দন ইত্যাদিও নিষিদ্ধ হয়।

স্মর্তব্য যে, মতান্তরে, কাফিরও দৈহিকভাবে অপবিত্র নয়, পবিত্র ক্বোরআনে মুশরিকদেরকে যে 'নাজিস' (নাপাক) বলা হয়েছে, তা দ্বারা আক্বীদা বা 'বিশ্বাসগত নাপাক' বুঝানো উদ্দেশ্য।

এ হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটা মাস্'আলা প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. জুনুবী'র ঘাম ও উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়। দুই. জানাবতের গোসল দেরীতে করাও জায়েয। তিন. জানাবতের অবস্থায় জরুরী কাজকর্ম সম্পন্ন করা জায়েয এবং চার. 'জুনুবী'র সাথে করমর্দন করা, গলা মিলানো, বরং তার সাথে শয়ন করা এবং বসাও জায়েয।

৬. সতর্কতামূলকভাবে একথা মনে করেছেন যে, হয়তো 'জুনুবী'র বেলায় 'প্রকৃত অপবিত্র'র বিধান প্রযোজ্য।

৭. সুতরাং তখনই কি গোসল করে নেবেন, না ভোরে করবেন? তিনি মনে করেছিলেন- হয়তো তাৎক্ষণিভাবে গোসল করে নেওয়া ওয়াজিব; অথচ কখনো কখনো তাৎক্ষণিকভাবে গোসল করে নেওয়া কষ্টকর হয়।

৮. এটা মুস্তাহাব নির্দেশক বিধান। কেননা, ওযূ করে শয়ন করা মুস্তাহাব-তরীক্বা। অর্থাৎ ওযূ ব্যতীত শয়ন করা না হারাম, না মাকরূহ। [মিরক্বাত ইত্যাদি]

৯. এটাও মুস্তাহাব পদ্ধতি। আলিমগণ বলেছেন, জানাবতের অবস্থায় ওযূ না করে পানাহার করলে জীবিকা সংকীর্ণ হয়।

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهٗ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَطُوْفُ عَلٰى نِسَآئِهٖ بِغُسْلٍ وَّاحِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهٖ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ سَنَذْكُرُهٗ فِىْ كِتَابِ الْاَطْعِمَةِ اِنْشَآءَ اللهُ تَعَالٰى.

৪১৮।। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ আপন স্ত্রীর নিকট যায়, তারপর দ্বিতীয় বার যেতে চায়, তবে মধ্যভাগে যেনো ওযূ করে নেয়।"[১০] [মুসলিম]

৪১৯।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক গোসলে আপন সমস্ত বিবির উপর প্রদক্ষিণ করতেন।[১১] [মুসলিম]

৪২০।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সব সময় আল্লাহ্র যিক্র করতেন।[১২] আমরা হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস ইন্শা-আল্লাহ্ আহার্য বস্তুসমূহের বিবরণ সম্বলিত অধ্যায়ে বর্ণনা করবো।[১৩]

---

১০. এটাও মুস্তাহাব-পন্থা। উত্তম হচ্ছে প্রত্যেক বারই গোসল করা; কিন্তু শুধু ওযূ করাও জায়েয। আর ওযূ ছাড়াও দুরস্ত আছে। অবশ্য, মধ্যভাগে পবিত্রতা অর্জন করলে তৃপ্তি, সুস্বাস্থ্য ও ক্ষমতা- সবকিছু হাসিল হয়।

১১. অর্থাৎ একাধিক স্ত্রীর নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতেন। আর সবশেষে গোসল করতেন। প্রকাশ তো এটাই থাকে যে, তিনি মধ্যভাগে ওযূ করে নিতেন।

স্মর্তব্য যে, হুযূরের পবিত্র বিবিগণ হলেন- হযরত খাদীজা, হযরত আয়েশা, হযরত হাফসাহ্, হযরত উম্মে হাবীব, হযরত উম্মে সালামাহ্, হযরত সাওদা, হযরত যয়নাব, হযরত মায়মূনাহ্, হযরত উম্মে মাসাকীন (যয়নাব বিনতে খোযায়মাহ), হযরত জুয়ায়রিয়াহ্ (বিন্তে হা-রিস) এবং হযরত সফিয়্যাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুন্না। তাঁদের মধ্যে হযরত খাদীজার জীবদ্দশায় হুযূর অন্য কাউকে শাদী করেন নি।

স্মর্তব্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চল্লিশজন জান্নাতী পুরুষের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আর একজন জান্নাতীর মধ্যে একশ' জন পুরুষের ক্ষমতা থাকবে। সুতরাং হুযূরের মধ্যে চারহাজার পুরুষের ক্ষমতা ছিলো। তাছাড়া, হুযূরের দায়িত্বে পবিত্র বিবিদের মধ্যে সমতা রক্ষা করার বিষয়টি ওয়াজিব ছিলো না। তবুও তিনি নিজ থেকে সমতা বজায় রাখতেন।

এ কারণে হুযূর এক রাতে প্রত্যেক বিবির নিকট তাশরীফ নিয়ে গেছেন। অন্যথায় আমাদের জন্য এক বিবির পালার রাতে অন্য স্ত্রীর নিকট যাওয়া দুরস্ত নয়। কেউ কেউ বলেছেন, হয়তো হুযূর ওই রাতে যে স্ত্রীর পালায় ছিলেন, তাঁর সম্মতিক্রমে এটা সম্পন্ন করতেন। কিন্তু এ অভিমত সঠিক নয়। [মিরক্বাত ইত্যাদি]

১২. অর্থাৎ 'জানাবত' ও 'তাহরত' উভয় অবস্থাতেই পবিত্র রসনা থেকে কালেমা-ই তাইয়্যেব ও অন্যান্য ওযীফা ইত্যাদি পড়তেন। কেননা, 'জানাবত'-এর অবস্থায় শুধু পবিত্র ক্বোরআনের তিলাওয়াতই হারাম।

মজার বিষয় ঃ

আমাকে এক ব্যক্তি বললো, "জানাবতের অবস্থায় দুরূদ শরীফ পড়লে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর নাম মুবারকের প্রতি বেয়াদবী হবে। এ সম্পর্কে আপনার

اَلْفَصْلُ الثَّانِي ◆ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ جَفْنَةٍ فَارَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ اِنَّ الْمَآءَ لَا يَجْنِبُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاؤدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِيْءُ بِيْ قَبْلَ اَنْ اَغْتَسِلَ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪২১।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কোন বিবি এক বারকোষ বা জলপাত্রে গোসল করেছেন।[১৪] হুযূর তাতে ওযূ করতে চাইলেন। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমি নাপাক ছিলাম।" এরশাদ করলেন, "পানিতো না পাক হয় না।"[১৫] [তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ্] দারেমী এরই মতো এবং শরহে সুন্নাহ্য় তাঁরই থেকে, তিনি হযরত মায়মূনাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন- মাসাবীহ্'র বচন সহকারে।

৪২২।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'জানাবত' থেকে গোসল করতেন, অতঃপর আমি গোসল করার পূর্বে আমার দ্বারা তাপ হাসিল করতেন।[১৬] এটা ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী এর মতোই বর্ণনা করেছেন। আর শরহে সুন্নাহ্য় রয়েছে মাসাবীহ্'র বচন সহকারে।

অভিমত কি?" জবাবে আমি বললাম, "যদি সমুদ্রে নাপাক মানুষ গোসল করে নেয়, তবে তো অপবিত্র লোকটি পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু সমুদ্র নাপাক হয় না, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নাম-ই পাকও সমুদ্র আর আমরা হলাম অপরিচ্ছন্ন।"

তাছাড়া, যেসব নারী 'হায়য' কিংবা 'নিফাস'-এর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের জন্য মৃত্যুর সময় কলেমা ও দুরূদ শরীফ পড়ার অনুমতি রয়েছে নিঃসন্দেহে।

এ হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মৌখিক যিক্র উচ্চস্বরে করতেন; একারণেই তো তিনি (হযরত আয়েশা) শুনতে পেতেন।

স্মর্তব্য যে, সম্মানিত ক্বাদেরিয়া ও চিশতিয়া ইত্যাদি তরীক্বা মতে উচ্চস্বরে যিক্র করা উত্তম। তাঁদের দলীলও এ হাদীস শরীফ হতে পারে।

১৩. অর্থাৎ 'মাসাবীহ্'র মধ্যে ওই হাদীস শরীফ এ স্থানে ছিলো। কিন্তু মিশ্কাত প্রণেতা সেটাকে সাযুজ্যের কারণে ওইস্থানে উল্লেখ করেছেন, যা'তে এরশাদ করা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওযূ করা ব্যতীত আহার্য গ্রহণ করেছেন।

১৪. ওই বিবি হযরত মায়মূনাহ্ ছিলেন। আর 'বারকোষ'-এর মধ্যে গোসল করার অর্থ হচ্ছে- তা থেকে পানি নিয়ে গোসল করেছেন; তা'তে বসে নয়।

অর্থাৎ অবশিষ্ট পানি- হযরত মায়মূনার ব্যবহারের পর

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ وَيَاكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ اَوْ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوٰى اِبْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقْرَءُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৪২৩।। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শৌচাগার থেকে আসতেন, অতঃপর আমাদেরকে ক্বোরআন পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশ্‌ত আহার করতেন।[১৭] 'জানাবত' ব্যতীত কোন কিছু হুযূরকে ক্বোরআন পড়তে বাধা দিতো না।[১৮] [আবূ দাঊদ, নাসাঈ] আর ইবনে মাজাহ্ এর মতো বর্ণনা করেছেন।

৪২৪।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হায়য-সম্পন্না নারী ও জুনুবী ক্বোরআন থেকে কিছুই পড়বে না।[১৯] [তিরমিযী]

অবশিষ্ট পানি ছিলো; তাঁর গোসলে ব্যবহৃত পানি নয়।

১৫. অর্থাৎ স্ত্রীর ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা স্বামী ওযূ-গোসল করতে পারে।

স্মর্তব্য যে, তৃতীয় অধ্যায়ে এর নিষেধও আসছে; কিন্তু ওই নিষেধ মাকরূহ বলে বর্ণনা করার জন্য। আর এ হাদীস হচ্ছে- বৈধতা বর্ণনা করার জন্য। অর্থাৎ স্ত্রীর ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা স্বামী ওযূ কিংবা গোসল করা উত্তম নয়, কিন্তু যদি করে নেয়, তবে জায়েয।

১৬. এভাবে যে, আমার সাথে বিছানায় শুয়ে পড়তেন এবং কাপড় ইত্যাদি অন্তরাল ছাড়াই আপন শরীর মুবারক দ্বারা আমাকে স্পর্শ করতেন।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, 'জুনুবী'র শরীর মূলতঃ পবিত্র এবং তার সাথে আলিঙ্গন করা জায়েয; [যদিও শরীয়ত মতে (হুক্‌মান) অপবিত্র বলে বিবেচ্য।]

১৭. অর্থাৎ শৌচাগার থেকে তাশরীফ নিয়ে এসে ওযূ করা ব্যতীত শুধু হাত ধুয়ে কুল্লি করে ক্বোরআন শরীফও তেলাওয়াত করতেন, আহারও করতেন।

বুঝা গেলো যে, ওযূ ছাড়া তেলাওয়াতও জায়েয এবং পানাহার করাও দুরস্ত; যদিও মুস্তাহাব হচ্ছে- হাত ধু'য়ে আহার করা। এ আমল শরীফ ওই কাজটি জায়েয বলে বর্ণনা করার জন্য।

১৮. অর্থাৎ 'বৃহত্তম অপবিত্রতা'ই ক্বোরআন তেলাওয়াতকে রুখতে পারে।' 'ছোটতর অপবিত্রতা' অর্থাৎ ওযূবিহীন অবস্থায় ক্বোরআনকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ; তবে তেলাওয়াত করা জায়েয।

স্মর্তব্য যে, জুনুবীর জন্য ক্বোরআন তেলাওয়াত করা নিষিদ্ধ। কিন্তু ক্বোরআনী দো'আসমূহ দো'আ করার উদ্দেশ্যে পড়া যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিক্বহের কিতাবাদিতে দেখুন!

১৯. এখানে شَيْئًا (শাইআন) মানে পূর্ণ আয়াত। আর 'হায়যসম্পন্না'র বিধানে 'নিফাস সম্পন্না'ও রয়েছে। অর্থাৎ হায়যসম্পন্না ও নিফাসসম্পন্না নারী এবং জুনুবী ক্বোরআন করীমের পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত করবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের ইমামদের অভিমত। ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মতে, পূর্ণ আয়াত থেকে কম পরিমাণ তেলাওয়াত করাও জায়েয নয়; এক বা দু'টি শব্দ পড়ে নেয়া জায়েয মাত্র।

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَاِنِّىْ لَآ اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤدَ

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدْخُلُ الْمَلَآئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَّلَا كَلْبٌ وَّلَا جُنُبٌ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤدَ وَالنَّسَآئِىُّ

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَّا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَآئِكَةُ جِيْفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ وَالْجُنُبُ اِلَّا اَنْ يَّتَوَضَّاَ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤدَ۔

৪২৫।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "এ ঘরগুলোকে মসজিদের দিক থেকে ঘুরিয়ে দাও।[২০] কেননা, আমি হায়যসম্পন্না ও জুনুবীর জন্য মসজিদকে হালাল করি না।"[২১] [আবূ দাঊদ]

৪২৬।। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ওই ঘরে ফিরিশ্তাগণ প্রবেশ করে না, যাতে তাসভীর (আকৃতি) রয়েছে এবং না তাতে, যার মধ্যে কুকুর ও জুনুবী রয়েছে।"[২২] [আবূ দাঊদ, নাসাঈ]

৪২৭।। হযরত 'আম্মার ইবনে ইয়া-সির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তিনজন লোক এমনই রয়েছে, যাদের নিকটেও ফিরিশ্তাগণ আসে না– মৃত কাফির, খালূক্ব (যা'ফরানী রং বিশিষ্ট খুশ্বূ) মিশ্রিত ব্যক্তি এবং জুনুবী; কিন্তু ওযূ করলে।[২৩] [আবূ দাঊদ]

---

২০. প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সংখ্যক সাহাবীর ঘরগুলোর দরজা মসজিদ-ই নবভী শরীফের মধ্যে ছিলো, যেগুলোর কারণে ঘরগুলোতে আসা-যাওয়া মসজিদের ভিতর দিয়ে হতো। নির্দেশ দেওয়া হলো যেনো ওই ঘরগুলোর দরজা অন্যদিকে খোলা হয় এবং বর্তমান দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২১. অর্থাৎ যদি দরজাগুলো মসজিদের ভিতরে থাকে তাহলে জুনুবী, হায়যসম্পন্না ও নিফাসসম্পন্নারা মসজিদের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করবে; অথচ তাদের জন্য মসজিদের ভিতর বসাও হারাম। এটাই ইমাম আ'যমের মাযহাব (অভিমত)। ইমাম শাফে'ঈ প্রমুখের মতে, মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয, সেখানে অবস্থান করা হারাম।

এ হাদীস শরীফ ইমাম আ'যমের দলীল। ক্বোরআন করীমে যা এরশাদ হয়েছে– وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ (এবং না জুনুবী, মুসাফির ব্যতীত; ৪:৪৩) ওখানে عَابِرِىْ سَبِيْلٍ মানে 'মুসাফির'। অর্থাৎ জানাবতের অবস্থায় গোসল না করে নামাযের নিকটেও যেওনা। অবশ্য যদি মুসাফির হও এবং পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নাও! ওখানে মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা বুঝানো হয় নি। সুতরাং এ হাদীস এ আয়াতের পরিপন্থী নয়।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরকে বিধানাবলীর মালিক করেছেন। তিনি এরশাদ ফরমান, "আমি হালাল করি না।" বুঝা গেলো যে, হালাল ও হারাম হুযূরও করে থাকেন।সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

২২. এখানে ফিরিশ্তাগণ' মানে রহমতের ফিরিশ্তাগণ। 'তাস্ভীর' (আকৃতি) মানে প্রাণীর আকৃতি, যা বিনা প্রয়োজনে সসম্মানে রাখা হয়। আর 'কুকুর' দ্বারা বিনা প্রয়োজনে নিছক সখ করে পালিত কুকুর বুঝায়। 'জুনুবী' মানে ওই ব্যক্তি, যে শরীয়তের প্রয়োজন ব্যতিরেকে গোসল

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ اَنَّ فِى الْكِتَابِ الَّذِىْ كَتَبَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنْ لَّا يَمُسَّ الْقُرْاٰنَ اِلَّا طَاهِرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارُ قُطْنِىُّ-

وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ اِبْنِ عُمَرَ فِىْ حَاجَةٍ فَقَضٰى اِبْنُ عُمَرَ حَاجَتَهٗ

৪২৮।। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম[২৪] থেকে বর্ণিত, ওই চিঠি, যা আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইবনে হাযমকে লিখেছেন,[২৫] তা'তে এই ছিলো- 'ক্বোরআনকে শুধু পাক ব্যক্তিই স্পর্শ করবে।'[২৬] [মালিক, দারু ক্বুত্বনী]

৪২৯।। হযরত নাফি' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত,[২৭] তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমরের সাথে কোন কাজে গিয়েছি। হযরত ইবনে ওমর আপন কাজ সম্পন্ন করে নিলেন।[২৮]

ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও গোসলবিহীন অবস্থায় থাকে। সুতরাং হাদীসের উপর না এ আপত্তি আসতে পারে যে, 'কখনো টাকা-পয়সায় ফটো থাকে, যা প্রতিটি ঘরে থাকে।' না এ আপত্তিও যে, 'ক্ষেত-খামার কিংবা বাড়ী-ঘরের হিফাযতের জন্য অথবা শিকার করার কুকুর পালন করা তো জায়েয।' এ আপত্তিও আসতে পারে না যে, 'রাতের জুনুবী তো ওযূ করে রাত অতিবাহিত করতে পারে।' এও না যে, 'যদি ওই ঘরগুলোতে ফিরিশ্তারা না আসে, তবে ওই সব লোকের হিফাযত কিংবা আমলনামা কে লিপিবদ্ধ করে? অথবা তাদের প্রাণই বা কে হনন করবে?'

২৩. এখানেও ফিরিশ্তাগণ মানে রহমতের ফিরিশ্তা। 'মৃত কাফির' মানে কাফিরের দেহ, চাই সে জীবিত হোক, চাই মৃত। অর্থাৎ কাফিরদের নিকট রহমতের ফিরিশ্তাগণ আসেন না। এখানে কাফিরদের জমায়েতে নামায পড়বে না। কাফিরদেরকে ইস্তিস্ক্বার নামাযের জন্য সাথে নিয়ে যাবে না; 'খালূক্ব' এক প্রকার খুশ্বুর নাম, যাতে যা'ফরান ইত্যাদি থাকে। সেটার রং প্রকাশ পায়। পুরুষদের শুধু এমন খুশ্বু লাগানো চাই, যে খুশ্বুর রং প্রকাশ পায় না। এখানে পুরুষদের জন্য নিষেধ বুঝানো উদ্দেশ্য, নারীরা এ বিধান বহির্ভূত। [মিরক্বাত ইত্যাদি]

অনুরূপ, 'জুনুবী' মানে ওই জুনুবী, যে নাপাক থাকতে অভ্যস্থ, নামাযের সময়গুলোতেও নাপাক থাকে। সুতরাং হাদীস একেবারে স্পষ্ট। অন্যান্য হাদীসের পরিপন্থী নয়।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, রাতের বেলায় যে ব্যক্তি জুনুবী হয়, যে যদি এমনিতেই ওযূ করা ছাড়া ঘুমিয়ে পড়ে, তবে রহমতের ফিরিশ্তারা আসবে না। তাই ওযূ করে শয়ন করা চাই।

২৪. তিনি নিজে, তাঁর পিতা, পিতামহ সবাই তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার বড় আলিম। মুত্তাক্বী তাবে'ঈ। হযরত আনাস ইবনে মালিক এবং হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়র প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীসসমূহ নিয়েছেন। ৭০ বছর বয়স পান। ১৩৫ হিজরীতে ওফাত পান। তাঁর দাদা মুহাম্মদ ইবনে আমর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবদ্দশায় ১০ম হিজরীতে নাজরান ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৩ বছর বয়স পেয়েছেন। হাররার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। (৬৩ হিজরীতে।)

২৫. হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত 'আমর ইবনে হাযম আনসারীকে ইয়েমেনের এক এলাকার শাসক বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। তখন তিনি একটা নির্দেশনামা লিখে দান করেছিলেন, যা'তে ফরয, সুন্নাত ও সাদক্বাহ্ ইত্যাদি বিধানাবলী লিপিবদ্ধ ছিলো। এখানে সেটারই উল্লেখ রয়েছে।

২৬. অর্থাৎ এ ফরমাননামায় অন্যান্য বিধান ব্যতীত এ নির্দেশও ছিলো যে, ক্বোরআন মজীদকে পাক-পবিত্র মানুষই স্পর্শ করবে; সেটাকে না বে-ওযূ মানুষ স্পর্শ করবে, না জুনুবী, না হায়যসম্পন্না, না নিফাসসম্পন্না নারী।

স্মর্তব্য যে, অন্তরাল ব্যতিরেকে ক্বোরআন স্পর্শ করা ওই সবের জন্য হারাম। অবশ্য, জুয্দান কিংবা কোন কাপড় সহকারে স্পর্শ করা জায়েয। যেমন- ফিক্বহ্ শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র

وَكَانَ مِنْ حَدِيْثِهٖ يَوْمَئِذٍ اَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِيْ سِكَّةٍ مِّنَ السِّكَكِ فَلَقِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا كَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَّتَوَارٰى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ اِنَّهٗ لَمْ يَمْنَعْنِيْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ اِلَّا اَنِّيْ لَمْ اَكُنْ عَلٰى طُهْرٍ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوٗدَ۔

আর তাঁর ওই দিনের হাদীস এ ছিলো– তিনি বলেন, এক ব্যক্তি গলিগুলো থেকে একটি গলি অতিক্রম করলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেলো।[২৯] অথচ তিনি পায়খানা কিংবা প্রস্রাব করে এসেছিলেন।[৩০] সে (লোকটি) সালাম করলো। হুযূর জবাব দিলেন না– এ পর্যন্ত যে, লোকটি যখন গলিতে চোখের অন্তরাল হবার উপক্রম হলো, তখন হুযূর আপন উভয় হাত যমীনের উপর মারলেন। আর ওই দু'হাত দ্বারা আপন চেহারা মুবারক মসেহ করলেন, পুনরায় হাত মারলেন। তারপর উভয় হাতের উপর মসেহ করলেন। তারপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন।[৩১] আর এরশাদ করলেন, "তোমার সালামের জবাব দিতে শুধু এটাই রুখেছিলো যে, আমি পবিত্রতার উপর ছিলাম না।"[৩২] [আবু দাউদ]

ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে– لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (অর্থাৎ সেটাকে স্পর্শ করবে না, কিন্তু পাক-সাফ লোকেরা। ৫৬ : ৭৯)

২৭. ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, হযরত নাফি' সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের আযাদকৃত গোলাম। তাবে'ঈনের অন্তর্ভুক্ত। দায়লামের অধিবাসী। ১১৭ হিজরীতে ওফাত পান। বড় মুত্তাক্বী আলিম ছিলেন।

২৮. প্রকাশ থাকে যে, এখানে 'হাজত' মানে কোন জরুরী কাজ; শৌচকর্ম নয়, যেমন কেউ কেউ বুঝে বসেছেন। অর্থাৎ তিনি কোন কাজের জন্য গিয়েছেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম।

২৯. অর্থাৎ ঘটনাচক্রে হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। তখন সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিলো না।

৩০. প্রকাশ থাকে যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম পায়খানা কিংবা প্রস্রাব থেকে একেবারে অবসর হয়ে তাশরীফ এনেছিলেন। অর্থাৎ ঢিলা-পানি দিয়ে শৌচকর্মও সম্পন্ন করেছিলেন। কেননা, প্রস্রাব কিংবা পায়খানার পর ঢিলা দিয়ে ইস্তিন্জা করতে করতে বাজার কিংবা অলিতে-গলিতে চলা হুযূরের অভ্যাস ছিলো না। বরং বিশেষ জায়গায়-ই (প্রস্রাব) ইত্যাদি শুরু করে নিতেন। কারণ ওইভাবে চলাফেরা করা ভদ্রতার পরিপন্থী।★

৩১. যখন ওই ব্যক্তি সালাম করেছিলেন, তখন তায়াম্মুম করার উপযোগী দেওয়াল সামনে মওজুদ ছিলো না। এ কারণে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছলেন। ইত্যবসরে ওই ব্যক্তি গলির অপর প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

সুতরাং হাদীসের বিরুদ্ধে এ প্রশ্ন হতে পারে না যে, 'তাৎক্ষণিকভাবে কেন তায়াম্মুম করে নেন নি?'

★ উল্লেখ্য, এক শ্রেণীর লোককে দেখা যায় যে, গুপ্তাঙ্গে ঢিলা ব্যবহার করতে করতে শৌচাগার বা পায়খানা-প্রস্রাবের জায়গা থেকে এভাবে বের হয়ে এসে পায়চারী করে যে, তাদের বাম হাত থাকে পরনের কাপড়ের ভিতর। কেউ কেউ আবার এমন অশালীন অবস্থায় ডান হাতে সুন্নাতের পরিপন্থী অস্বাভাবিক বড় বড় মিসওয়াকও ব্যবহার করতে থাকে। এ সবই অভদ্রতা। ইসলামে এ ধরণের অভদ্রতার অবকাশ নেই।

وَعَنِ الْمُهَاجِرِبْنِ قُنْفُذٍ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ اِلَّا عَلٰى طُهْرٍ.
رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَرَوَى النَّسَائِىُّ اِلٰى قَوْلِهٖ حَتّٰى تَوَضَّأَ وَقَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ۔

৪৩০।। হযরত মুহাজির ইবনে কুনফুয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,[৩৩] তিনি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে হাযির হলেন, যখন হুযূর প্রস্রাব করছিলেন।[৩৪] তিনি সালাম করলেন, হুযূর জবাব দিলেন না। যতক্ষণ না ওযূ করলেন। তারপর তাদের নিকট অপারগতার কারণ সম্পর্কে জানালেন এবং এরশাদ করলেন, "আমি এটা পছন্দ করি নি যে, পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহ্র যিক্র করবো।[৩৫] [আবূ দাঊদ] আর ইমাম নাসা'ঈ حَتّٰى تَوَضَّأَ (শেষ পর্যন্ত ওযূ করলেন) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আর বললেন, "হুযূর যখন ওযূ করে নিয়েছেন, তখন সেটার জবাব দিয়েছেন।"

এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাঁচা দেওয়ালের উপর তায়াম্মুম করা জায়েয। এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত। তায়াম্মুমের জন্য শুধু বালু কিংবা শুকনো মাটি জরুরী নয়।

৩২. অর্থাৎ আমি তখন ওযূ-বিহীন ছিলাম। অথচ জবাবে বলতে হয়- وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ (এবং তোমাদের উপর সালাম) 'আস্-সালাম' আল্লাহ্ তা'আলার নামও; যদিও এখানে ওই অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, তবুও ওই শব্দের প্রতি সম্মান দেখানোর নিমিত্তে আমি ওযূ ছাড়া সেটা বলা উচিত মনে করি নি। হযরত শায়খ (আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহ্লভী) রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর আশি''আতুল লুম'আত-এ লিখেছেন, ওই সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর আল্লাহ্র বিশেষ নূরের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো, যার প্রভাব এ ছিলো যে, তিনি পবিত্র হওয়া ছাড়া اَلسَّلَامُ (আস্সালাম) শব্দটি মুখ মুবারক থেকে বের করেন নি। এটা একটা বিশেষ নির্দেশ বা বিধান। সুতরাং এ হাদীসের বিপক্ষে না এ আপত্তি হতে পারে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো শৌচাগার থেকে এসে ক্বোরআন পড়াতেন, দো'আসমূহ পড়তেন, ওযূ করার পূর্বে 'বিস্মিল্লাহ্' পড়তেন। আর এখানে ওযূ ছাড়া 'সালাম' শব্দটাও মুখে উচ্চারণ করছেন না।' কারণ, ওটা শরীয়তের একটা সাধারণ বিধান ছিলো, আর এটা হচ্ছে একটা বিশেষ বিধান। বস্তুতঃ শরীয়ত, ত্বরীক্বত, ফাত্ওয়া ও তাক্বওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে।

এ আপত্তিও উত্থাপিত হতে পারে না যে, 'পানি থাকাবস্থায় তায়াম্মুম দুরস্ত হয় না। অথচ হুযূর এখানে তায়াম্মুম করলেন কেন?' এ তায়াম্মুম দ্বারা নামায ইত্যাদি পড়েন নি। শুধু সালামের জবাব দিয়েছেন। জানাযার নামায চলে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় (তখন) হাতের নাগালে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা জায়েয; কিন্তু এটা দ্বারা অন্য কোন নামায পড়তে পারে না। এখানেও সালামের জবাব দেওয়ার সময় চলে যাচ্ছিলো; লোকটি চোখের অন্তরালে চলে যাচ্ছিলেন। এ কারণে এ আমল করেছেন।

মোট কথা, এ হাদীস সুস্পষ্ট। এ থেকে বুঝা গেলো যে, প্রয়োজনের তাগিদে সালামের জবাব দানে বিলম্ব করা জায়েয। আর ওই বিলম্বের কারণ জানিয়ে দিয়ে অপারগতা সম্পর্কে অবহিত করানো সুন্নাত, যাতে তার মনে কষ্ট না আসে।

৩৩. তাঁর নাম খালাফ ইবনে ওমায়র। উপাধি মুহাজির। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তুমি সত্যিকার অর্থে মুহাজির।" তিনি ক্বোরাঈশী তাইমী। মক্কা বিজয়ের দিন ঈমান এনেছেন। বসরায় বসবাস করতেন। সেখানেই ওফাত পান।

৩৪. পায়খানা-প্রস্রাবরত কাউকে সালাম করা নিষিদ্ধ। (যদি কেউ দিয়ে থাকে তবে) তার সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু শৌচকর্ম সম্পন্ন করে জবাব দিয়ে দেওয়া সমীচিন। এ হাদীস শরীফে তারই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু ওইসব সাহাবীর এ মাস্'আলা তখনো জানা ছিলো না, সেহেতু তাঁরা এমতাবস্থায় সালাম করেছেন।

৩৫. এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এখানে এতটুকু আছে যে, হুযূর ওযূ করে জবাব দিয়েছেন। কেননা, এখানে সালাম নিবেদনকারী কোথাও যাচ্ছিলেন না; বরং

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتَبِهُ ثُمَّ يَنَامُ. رَوَاهُ اَحْمَدُ۔

وَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ اِنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَه، فَنَسِىَ مَرَّةً كَمْ اَفْرَغَ فَسَاَلَنِىْ فَقُلْتُ لَاۤ اَدْرِىْ فَقَالَ لَا اُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِىَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْئَه، لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى جِلْدِهِ الْمَاۤءَ ثُمَّ يَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَتَطَهَّرُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ۔

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪৩১।। হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'জুনুবী' হতেন, তারপর শু'য়ে পড়তেন, তারপর জাগতেন।[৩৬] আবার শু'য়ে পড়তেন। [আহমদ]

৪৩২।। হযরত শো'বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু[৩৭] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা যখন অপবিত্রতা থেকে গোসল করতেন, তখন ডান হাতে বাম হাতের উপর সাতবার পানি ঢালতেন।[৩৮] তারপর শৌচকর্ম সম্পন্ন করতেন (লজ্জাস্থান ধৌত করতেন)। একবার হাতে কতবার পানি ঢেলেছেন তা ভুলে গিয়েছিলেন। তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, "আমি জানি না।" তিনি বললেন, "তোমার মা না থাকুক, তোমার জানতে কোন্ জিনিষ বাধ সাধলো?"[৩৯] তারপর নামাযের মতো ওযূ করছিলেন। অতঃপর আপন শরীরের উপর পানি প্রবাহিত করছিলেন। তারপর বলছিলেন, "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন।"[৪০] [আবূ দাঊদ]

হুযূরের নিকটেই ছিলেন। এ কারণে জবাব দানে ত্বরা করেন নি। ওযূ করেছেন। তারপর জবাব দিয়েছেন; কিন্তু ওখানে সালাম নিবেদনকারী চলে যাচ্ছিলেন। সুতরাং উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেলো।

৩৬. অর্থাৎ 'জানাবত' অবস্থায় প্রথমে ওযূ করে শুয়ে যেতেন, তারপর জাগ্রত হতেন। তারপর আবার শুয়ে পড়ার জন্য ওযূ করতেন না; প্রথম ওযূ যথেষ্ট ছিলো। কেননা, হুযূরের ঘুম মুবারক ওযূ ভঙ্গ করে না।

ফক্বীহ্গণ বলেন, আমাদের জন্যও এটা দুরস্ত যে, প্রথমে ওযূ করে শুয়ে পড়লে অতঃপর যদি জেগে যাই, তাহলে পুনরায় শয়ন করার জন্য ওযূ করার প্রয়োজন নেই। প্রথম ওযূই যথেষ্ট। [আশি''আতুল লুম্'আত]

৩৭. তিনি হলেন শো'বাহ্ ইবনে দীনার; সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম। ইমাম নাসাঈ বলেন, শো'বাহ দুর্বল। অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

৩৮. কেননা, হাতে অপবিত্রতা লেগেছিলো। আর ইসলামের প্রাথমিক যুগে অপবিত্রতা সাতবার ধোয়া হতো। তারপর 'সাত'-এর বিধান রহিত হলো; অবশ্য মুস্তাহাব হবার বিধান এখনো বলবৎ আছে। [মিরক্বাত] সুতরাং এ হাদীস ওইসব হাদীসের পরিপন্থী নয়, যেগুলোতে তিনবার হাত ধোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হতে পারে– তিনি এ আমল কখনো কখনো করতেন; সব সময় করতেন না।

৩৯. 'মা না থাকুক!' স্নেহ ভরেও বলা হয়, তিরস্কার করেও। এখানে উভয়টির সম্ভাবনা আছে। মুনিব ও ওস্তাদের অধিকার

وَعَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى نِسَآئِهٖ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِهٖ وَعِنْدَ هٰذِهٖ قَالَ فَقُلْتُ لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا تَجْعَلُهٗ غُسْلًا وَّاحِدًا اٰخِرًا قَالَ هٰذَا اَزْكٰى وَ اَطْيَبُ وَاَطْهَرُ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤُدَ

وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طُهُوْرِ الْمَرْاَةِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَزَادَ وَقَالَ بِسُؤْرِهَا وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ۔

৪৩৩।। হযরত আবূ রাফি'[৪১] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন বিবিদের মধ্যে প্রদক্ষিণ করলেন। ওই বিবির নিকটও গোসল করেছেন আর এ বিবির নিকটও। (বর্ণনাকারী) বলছেন, আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি সর্বশেষ একবার মাত্র গোসল করলেন না কেন?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "এ পদ্ধতি খুবই পছন্দনীয় এবং অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।"[৪২] [আহমদ, আবূ দাউদ]

৪৩৪।। হযরত হাকাম ইবনে 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,[৪৩] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর পবিত্রতা অর্জনের পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করতে নিষেধ করেছেন।[৪৪] [আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্] ইমাম তিরমিযী তাঁরা দু'জন থেকে কিছু পরিবর্দ্ধন করেছেন এবং বলেছেন, স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট দ্বারাও, আর বলেছেন, "এ 'হাদীস-হাসান সহীহ' পর্যায়ের।"

আছে- বিনা কারণেও তিরস্কার করার। এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, শাগরিদের আপন ওস্তাদের প্রতিটি অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা চাই, যাতে প্রয়োজনের সময় ওস্তাদকেও বলতে পারে, অন্যান্য লোকের নিকটও ওই জ্ঞান পৌঁছাতে পারে। এখানে হাত ধোয়ার সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য।

৪০. কখনো কখনো। হয়তো সাতবার ধোয়ার বিধান রহিত হবার পূর্বে অথবা ওই সময়, যখন অপবিত্র বস্তু শক্ত হয়ে যায় এবং সাতবার ধোয়া ব্যতীত ছুটে না।

৪১. তাঁর নাম আসলাম। 'কুনিয়াৎ' (উপনাম) আবূ রাফি'। তিনি ক্বিবৃতী। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম। বদর ব্যতীত সমস্ত যুদ্ধে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম-এর সাথে ছিলেন। হযরত আব্বাসের ইসলাম গ্রহণের খবর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তিনিই পৌঁছিয়েছেন। আর ওই খুশীতে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম তাঁকে আযাদ করে দেন। তাঁর অন্যান্য অবস্থা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৪২. যেহেতু প্রত্যেক বার গোসলের জন্য আবূ রাফি'ই পানি আনতেন, সেহেতু তিনি আন্দাজ করে বুঝতে পারলেন যে, হুযূর প্রত্যেকবার জানাবতের গোসল করেছেন। তখন ওই প্রশ্ন করলেন। এ ধরনের বিষয় প্রকাশ করা ও মাস্'আলা জিজ্ঞাসা করার মধ্যে না যুক্তিগতভাবে কোন ক্ষতি আছে, না শরীয়তের দৃষ্টিতে। হুযূরের প্রতিটি কর্ম মুবারক থেকে মাস্'আলাদি অনুমিত হয়।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, যদি একাধিক বার স্ত্রী-সঙ্গম করা হয়, তবে প্রত্যেকবার গোসল করে নেওয়া সুন্নাত। অবশিষ্ট আলোচনা এ অধ্যায়েই ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

৪৩. তিনি সাহাবী, গিফারী। বসরায় বসবাস করতেন। যিয়াদ প্রথমে তাঁকে বসরার, তারপর খোরাসানের শাসক নিয়োগ করেন। ৫১ হিজরীতে 'মারভ্'-এ তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে।

৪৪. এ নিষেধ 'তানযীহী'। অর্থাৎ স্ত্রীর গোসল কিংবা ওযূর

وَعَنْ حُمَيْدِنِ الْحُمَيْرِيِّ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَ سِنِيْنَ كَمَا صَحِبَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْاَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ اَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْاَةِ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلِيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ اَحْمَدُ فِيْ اَوَّلِهِ نَهَى اَنْ يَّمْتَشِطَ اَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ اَوْ يَبُوْلَ فِيْ مُغْتَسَلِهِ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ -

৪৩৫।। হযরত হুমায়দ হুমায়রী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু[৪৫] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করলাম, যে হযরত আবূ হোরায়রার মতো নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে চার বছর ছিলেন।[৪৬] তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর ব্যবহারের পর বেঁচে যাওয়া পানি দ্বারা গোসল করতে পুরুষকে নিষেধ করেছেন। অথবা পুরুষের ব্যবহারের পর বেঁচে যাওয়া পানি দ্বারা স্ত্রীকেও গোসল করতে নিষেধ করেছেন।[৪৭]
হযরত মুসাদ্দাদ এতটুকু পরিবর্দ্ধন করেছেন[৪৮] যে, 'উভয়ে এক সাথে অঞ্জলী ভরে পানি নেওয়া চাই।'[৪৯] এটা ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসা'ঈ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমদ এর প্রারম্ভে একথাও বৃদ্ধি করেছেন– "হুযূর নিষেধ করেছেন যেন আমাদের থেকে কেউ প্রতিদিন চিরুনী ব্যবহার না করি; অথবা গোসলখানায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।[৫০] এটা ইবনে মাজাহ্ আবদুল্লাহ্ ইবনে সারজিস্ থেকে বর্ণনা করেছেন।

পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা স্বামী গোসল কিংবা ওযূ করা উত্তম নয়। সুতরাং এ হাদীস শরীফ ওই হাদীসের পরিপন্থী নয়, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা একবার আপন কোন স্ত্রীর বেঁচে যাওয়া পানি দ্বারা ওযূ করেছেন, আর এরশাদ ফরমায়েছেন, "পানি জুনুব হয়না।' কেননা, ওই হাদীস বৈধতা বর্ণনা করার জন্য আর এটা তা মুস্তাহাব বলে বর্ণনা করার জন্যই।

৪৫. তিনি হলেন– হুমায়দ ইবনে আবদুর রাহমান। বসরার বাসিন্দা। হুমায়র গোত্রের লোক। উঁচু মর্যাদাশীল তাবে'ঈ। আপন যুগের বড় আলিম ছিলেন।

৪৬. ওই সাহাবী হয়তো হাকাম ইবনে 'আমর ছিলেন অথবা আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস্ অথবা আবদুল্লাহ্ ইবনে মুফাদ্দ্বাল। যেহেতু সমস্ত সাহাবী عادل (আ-দিল বা খোদাভীরু, মানবিক গুণসম্পন্ন তথা নির্ভরযোগ্য), সেহেতু সাহাবীর নাম জানা না থাকাও ক্ষতিকর নয়।

৪৭. এ নিষেধও 'তান্‌যীহী। অর্থাৎ এমনটি করা উত্তম নয়। যদি করে ফেলে তাহলে ক্ষতি নেই।

৪৮. তাঁর নাম মুসাদ্দাদ (مُسَدَّد-'দ'-এ যবর সহকারে) ইবনে মুসারহাদ। তব্'ই তাবে'ঈনের অন্তর্ভুক্ত। বসরার বাসিন্দা। ১২৮ হিজরীতে ওফাত পান।

৪৯. অর্থাৎ যদি স্বামী ও স্ত্রী এক পাত্র থেকে ওযূ কিংবা গোসল করে, তবে আগে-পরে অঞ্জলী ভরে পানি নেবে না, বরং এক সাথে নেবে, যাতে এমন না হয় যে, একে অপরের বেঁচে যাওয়া পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়েছে; যদিও পরবর্তী অঞ্জলীগুলোতে পূর্বের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হবে। তবুও তা মাফ।

৫০. গোসলখানায় প্রস্রাব করলে প্ররোচনা বা মনের সন্দেহের রোগ পয়দা হয়। বিশেষ করে যদি পানি বের হবার কোন নালী ইত্যাদি না থাকে।

আর প্রতিদিন চুল আঁচড়ানো ও সিঁথি কাটার মধ্যে আলস্য পরিলক্ষিত হয়। এ কাজটা মাঝেমধ্যে করা সুন্নাত। চুল এলোমেলো রাখাও ঠিক নয়।

****

بَابُ اَحْكَامِ الْمِيَاهِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَآءِ الدَّآئِمِ الَّذِىْ لَا يَجْرِىْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّآئِمِ وَهُوَ جُنُبٌ قَالُوْا كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهٗ تَنَاوُلاً

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ يُّبَالَ فِى الْمَآءِ الرَّاكِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

অধ্যায় ঃ পানিগুলোর বিধানাবলী[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৪৩৬।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো স্থির পানিতে, যা প্রবহমান নয়, কখনো প্রস্রাব না করে, যেহেতু অতঃপর তাতে গোসল করবে।[২] [মুসলিম, বোখারী] আর ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় আছে- এরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো জানাবতের অবস্থায় স্থির পানিতে গোসল না করে।" লোকেরা বললো, "হে আবূ হোরায়রা! তাহলে কি করবে?" তিনি বললেন, "তা থেকে নিয়ে নেবে।"[৩]

৪৩৭।। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্থির পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।[৪] [মুসলিম]

---

১. যেহেতু পানি বহু প্রকারের- বৃষ্টির পানি, হ্রদের পানি, কূপের পানি, পুকুর ইত্যাদির পানি, প্রবহমান পানি, স্থির পানি, ব্যবহৃত পানি, অব্যবহৃত পানি, পশু ও জীব-জন্তুর উচ্ছিষ্ট এবং রোদ ইত্যাদি দ্বারা উত্তপ্ত পানি, এসব পানির বিধানাবলীও পৃথক পৃথক, সেহেতু আমি পানিগুলো (مياه) বহুবচন ব্যবহার করেছি এবং 'বিধানাবলী'ও (বহুবচন এনেছি)।

২. অর্থাৎ স্বল্প পরিমাণ স্থির পানিতে প্রস্রাব করা কখনো জায়েয নয়। কেননা, তাতে পানি নাপাক হয়ে গোসল ও ওযূ ইত্যাদির উপযোগী থাকবে না। এর ফলে তার নিজেরও কষ্ট হবে, অন্য লোকেরও। তাছাড়া বেশী পরিমাণ পানিতে প্রস্রাব করাও উচিত নয়। কারণ, এতে ওই পানি নাপাক তো হবে না, কিন্তু তা পান করতে কিংবা ওযূ করতে অন্তরে ঘৃণাবোধ হবে। (রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পানি দূষিত হয়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে।) প্রথমোক্ত অবস্থায় নিষেধ 'তাহ্রীমী' (হারামের কাছাকাছি) আর শেষোক্ত অবস্থায় 'তান্যীহী'। এ হাদীস হানাফী মাযহাবের মজবুত দলীল। তা এ মর্মে যে, দু'কুল্লা পরিমাণ পানিতে নাপাকি পড়লে তা নাপাক হয়ে যায়। যদি নাপাক না হতো, তবে এ নিষেধ এতো তাকীদ সহকারে করতেন না। এর বিশ্লেষণ ইন্শা-আল্লাহু তা'আলা সামনে আসবে।

৩. অর্থাৎ ছোট হাউজ বা গর্তে যে পরিমাণ পানি ভর্তি থাকে, জুনুবী তাতে নেমে গোসল করবে না; বরং হাতের অঞ্জলী, বালতি বা পাত্র দিয়ে পানি নিয়ে পৃথক জায়গায় গোসল করবে।

এ থেকে দু'টি মাস্'আলা প্রতীয়মান হয় ঃ

এক. স্বল্প পানিতে জুনুবী নেমে গেলে তা 'ব্যবহৃত পানি' হয়ে যায়। সুতরাং 'জুনুবী' কিংবা বে-ওযূ যদি কূপের মধ্যে নেমে যায়, তবে পানি 'ব্যবহৃত' হয়ে যায়।

দুই. নাপাক মানুষ প্রয়োজনের সময় ছোট হাউয থেকে (পাক-সাফ) অঞ্জলী বা বালতি ভর্তি করে পানি নিতে পারে। এ কারণে পানি 'ব্যবহৃত' হবে না।

৪. স্থির পানি চাই দু'কুল্লা হোক কিংবা তা থেকে কম/বেশী

وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِى خَالَتِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِى وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِى وَدَعَالِى بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحُجْلَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

৪৩৮।। হযরত সা-ইব ইবনে ইয়াযীদ[৫] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার খালা নবী-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে নিয়ে গেলেন। আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ভাগিনা অসুস্থ।" হুযূর আমার মাথার উপর হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য বরকতের দো'আ করলেন।[৬] তারপর ওযূ করলেন। আমি ওযূর পানি পান করলাম।[৭] তারপর আমি হুযূরের পৃষ্ঠপেছনে দণ্ডায়মান হলাম। তখন আমি মোহর-ই নুবূয়ত দেখতে পেয়েছি, যা হুযূরের বরকতময় দু'স্কন্ধের মধ্যভাগে মশারীর কড়ার মতো ছিলো।[৮] [মুসলিম, বোখারী]

পরিমাণ হোক, তাতে পায়খানা/প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ। এমনকি তাতে থুথু কিংবা নাকটি ইত্যাদি ফেলাও মন্দ কাজ। ফক্বীহ্‌গণ বলেন, রাতে স্থির পানিতে প্রস্রাব কখনোই করবে না। কারণ, তখন তাতে জিনেরা থাকে। তারা কষ্ট দেবে। অবশ্য পুকুর ইত্যাদির এ বিধান নয়। পুকুর হচ্ছে- যদি সেটার এক কিনারা থেকে পানিতে নাড়া দেওয়া হয়, তবে অপর কিনারার পানি নড়বে না। অর্থাৎ ১০০ হাতের তল বিশিষ্ট পানি। সেটাকে 'আবে কাসীর' (বেশী পরিমাণ পানি)ও বলা হয়। এ থেকে কম পানিকে 'ক্বলীল' বা 'কম পরিমাণ পানি' বলে।

৫. তিনি আযদী; খাযালীও। ২য় হিজরীতে পয়দা হন। নিজের পিতার সাথে বিদায় হজ্জ-এ শরীক হন। তখন তাঁর বয়স ছিলো সাত বছর। অল্প বয়স্ক সাহাবী। হযরত ওমর ফারূক্বের শাসনামলে মদীনা মুনাওয়ারার বাজারের কর্তৃত্বভার তাঁর হাতে ছিলো।

৬. খুব সম্ভব তাঁর মাথায় ব্যথা ছিলো, যা হুযূরের হাত মুবারকের বরকতে আরোগ্য হয়ে যায়। ওই হাতের বরকত এই হলো যে, হযরত সা-ইবের বয়স ১০০ বছর হয়েছিলো, কিন্তু না কোন একটি চুল সাদা হয়েছে, না দাঁত পড়েছে। [মিরক্বাত]

এ থেকে বুঝা গেলো যে, রোগীদেরকে বুযুর্গদের নিকট দম-দুরূদের (ঝাঁড়ফুঁক) জন্য নিয়ে যাওয়া, আর বুযুর্গগণও রোগগ্রস্ত স্থানে হাত বুলিয়ে দেওয়া 'সুন্নাহ্' দ্বারা প্রমাণিত।

৭. হুযূরের ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানি বরকতময় কিংবা ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত পানি বরকতমণ্ডিত। দ্বিতীয় অর্থ বেশী স্পষ্ট।

সাহাবা কেরাম এ 'গাসালাহ্' (ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত পানি) শরীফ অর্জন করার জন্য হুড়োহুড়ি করতেন।

স্মর্তব্য যে, ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির মতে ওযূ কিংবা গোসলের কাজে ব্যবহৃত পানি নাপাক; তাও কিন্তু আমাদের ব্যবহৃত পানি, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যবহৃত পানি নয়। তাতো তাবাররুক ও নূরই। এমনকি হুযূরের ব্যবহৃত পানি উম্মতের জন্য পাক। [মিরক্বাত]

৮. 'মোহর-ই নুবূয়ত' হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গর্দান শরীফের নিম্নভাগে দু'স্কন্ধ মুবারকের মধ্যভাগে এক টুকরা গোশ্‌ত, যার উপর ছিলো কিছু তিল। কবুতরীর ডিম কিংবা মশারী টাঙ্গানোর কড়ার সমান গোশ্‌তের টুকরো অতীব চমকদার ও নূরানী ছিলো। তিলগুলো কালো বর্ণের। আশেপাশে লোম মুবারক। সব মিলে এ স্থান দেখতে খুব মনোরম ছিলো। নিচের দিক থেকে দেখলে পড়া যেতো- اَللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ (আল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শরীকা লাহু) (অর্থাৎ আল্লাহ এক; তাঁর কোন শরীক নেই।) আর উপরের দিক থেকে দেখলে পড়া যেতো تَوَجَّهْ حَيْثُ كُنْتَ فَإِنَّكَ مَنْصُوْرٌ (তাওয়াজ্জাহ্ হায়সু কুন্‌তা ফাইন্নাকা মান্‌সুর। অর্থাৎ আপনি মনোনিবেশ করুন যেদিকে বা যেখানে চান, নিশ্চয় আপনি তো আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত।)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَآءِ يَكُوْنُ فِىْ الْفَلَاةِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اِذَا كَانَ الْمَآءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِىْ اُخْرٰى لِاَبِىْ دَاوٗدَ فَاِنَّهٗ لَا يَنْجَسُ۔

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِىَ بِئْرٌ يُّلْقٰى فِيْهِ الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪৩৯।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওই পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যা ময়দানের জমিতে থাকে, আর সেগুলোর উপর চতুষ্পদ প্রাণী ও জন্তুগুলো আনাগোনা করে। হুযূর এরশাদ করলেন, "যখন পানি দু'কুল্লা পরিমাণ হয়, তখন তা অপবিত্রতা বহন (সহ্য) করে না।

[আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ্! আবূ দাউদের অন্য বর্ণনায় আছে, 'তা অপবিত্র হয়না।'[৯]]

৪৪০।। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরয করা হলো, এয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা কি বোদা'আহ কূপ থেকে ওযূ করবো?[১০] তা এমন কূপ ছিলো, যাতে হায়যের রক্ত মিশ্রিত কাপড়, কুকুরের গোশ্ত এবং আবর্জনাদি ফেলা হতো[১১] তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

ওটাকে 'মোহর-ই নুবূয়ত' এ জন্য বলা হতো যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতে এ মোহরকে হুযূরের 'খাতামুন্নবীয়্যীন' (সর্বশেষ নবী হবার) আলামত সাব্যস্ত করা হয়েছিলো। ওফাত শরীফের সময় এ মোহর শরীফ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো।

অবশ্য এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, বেলাদত শরীফের সময় এ মোহর ছিলো কিনা। কেউ কেউ বলেছেন, বক্ষ মুবারক বিদারণের পর ফিরিশ্তাগণ যে সেলাই করেছিলেন, সেগুলো দ্বারা মোহর সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। বিশুদ্ধ অভিমত এ যে, বেলাদতের সময় মূল মোহর মওজুদ ছিলো; কিন্তু সেটার উত্থান ওই সব সেলাইর পর হয়েছে। ইন্শা-আল্লাহ্ এর সঠিক বিশ্লেষণ কিতাবের শেষ ভাগে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ফযীলতসমূহের বিবরণে বর্ণনা করা হবে।

৯. এ হাদীস শরীফ ইমাম শাফে'ঈর দলীল- এ মর্মে যে, দু'কুল্লা (মট্কা পরিমাণ পানি) অপবিত্র বস্তু পড়লেও না পাক হয় না। তিনি 'মটকা' বলতে পাথরের মটকা বুঝান, যার পরিমাণ হয় আড়াই মশক। আর শরীয়তের পরিভাষায় এর পরিমাণ পঞ্চাশ মণ। রাফেযীরাও একথা বলে।

আমাদের ইমাম আ'যম এ হাদীসের উপর কয়েকভাবে আলোচনা করেন-

এক. এ হাদীস বিশুদ্ধ নয়; এমনকি ইমাম বোখারীর ওস্তাদ আলী ইবনে মদীনী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা) বলেন, এ হাদীস হুযূর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।

দুই. এ হাদীস সাহাবা-ই কেরামের ইজমা' বা ঐকমত্যের পরিপন্থী। কারণ, একবার ঝমঝম কূপের মধ্যে এক হাবশী পড়ে মারা গিয়েছিলো। তখন হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যোবায়র সমস্ত সাহাবীর উপস্থিতিতে কূপটি পবিত্র করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ এর বিরোধিতা করেন নি। অথচ ঝমঝমের কূপে হাজার হাজার মট্কা পানি ছিলো।

الْمَآءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهٗ شَيْءٌ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ ـ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَ نَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَآءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهٖ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ

"ওই পানি পবিত্র। সেটাকে কোন কিছুই নাপাক করতে পারে না।"[১২] [আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসা'ঈ]

৪৪১।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, (আরয করলো), "এয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা সমুদ্রে আরোহণ করি। আর আমাদের সাথে সামান্য পানি নিয়ে যাই। যদি তা দ্বারা ওযূ করে নিই, তবে পিপাসার্ত হয়ে থেকে যাবো। সুতরাং আমরা কি ওযূ করবো

তিন. ক্বুল্লা একাধিক অর্থ বিশিষ্ট শব্দ। এর অর্থ অনেক। সুতরাং পাহাড়ের চূড়া, উটের কোহান, মাথার খুলি, বড় মটকা- সবই ক্বুল্লা নামে অভিহিত হয়। তদুপরি, 'মটকা'র পরিমাণ হাদীসে পাকে নির্দিষ্ট নেই। এতোগুলো 'ইজমাল' (অস্পষ্টতা) থাকা সত্ত্বেও এ হাদীসের উপর আমল কিভাবে করা যেতে পারে?

চার. এ হাদীস শরীফ ইমাম শাফে'ঈরও বিরোধী। কেননা, তিনি বলেন, যদি দু'ক্বুল্লার মধ্যে এতো বেশী অপবিত্রতা পতিত হয়, যার কারণে পানির গন্ধ, স্বাদ ও রং বিগড়ে যায়, তবে পানি নাপাক হয়ে যায়। কিন্তু এ হাদীসের অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, তা কখনো নাপাক হয় না।

পাঁচ. এ হাদীস শরীফ এ অর্থের ভিত্তিতে অন্যান্য বহু বিশুদ্ধ হাদীসের ঘোর বিরোধী হবে। হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন, "স্থির পানিতে প্রস্রাব করো না!" আরো এরশাদ করেছেন, "যখন কুকুর পানির পাত্রে মুখ দেয় তবে পানিও নাপাক, পাত্রও অপবিত্র হয়ে যায়।" এ দু'টি হাদীসে দু'ক্বুল্লাকে পৃথক করে দেখানো হয় নি।

ছয়. لَمْ يَحْمِلْ (উঠাবেনা)-এর অর্থ এও হতে পারে যে, 'দু'মটকা'র মধ্যে পানি অপবিত্রতাকে সহ্য করতে পারে না। অর্থাৎ নাপাক হয়ে যায়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا

অর্থাৎ তাদের দৃষ্টান্ত, যাদের উপর তাওরীত অর্পণ করা হয়েছিলো, অতঃপর তারা তা বরদাশ্‌ত করে নি। সেটার নিয়ম পালন করেনি; ৬২:৫) ওরফে বলা হয়- 'অমুক ব্যক্তি মনের দুঃখ বাদারশ্‌ত করতে পারে না।'

সাত. এ হাদীসের অর্থ এও হতে পারে যে, যখন প্রবহমান পানি দু'মানুষের গড়নের সমান হয়ে প্রবাহিত হবার সুযোগ পেয়ে যায়, তবে অপবিত্র বস্তু পড়লেও নাপাক হবে না। তা হচ্ছে প্রবহমান পানি। এটা এরই মতো যে, একটা গর্ত থেকে পানি আসছে, অপরটার মধ্যে গড়িয়ে পড়ছে। উভয় গর্তের মধ্যে দু'জন মানুষের গড়নের পরিমাণ, প্রায় দশ ফুটের দূরত্ব থাকে, তবে যেহেতু এ পানি প্রবহমান, সেহেতু তা অপবিত্র বস্তু পড়লে নাপাক হবে না। এমতাবস্থায় এ হাদীসের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি আসবে না। সুতরাং ইমাম আ'যমের মাযহাব অতিমাত্রায় শক্তিশালী। এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'জা-আলহক্ব'র ২য় খণ্ড'-এ দেখুন।

১০. এ কূপ মদীনা মুনাওয়ার 'বনী সা-'ইদাহ' মহল্লায় অবস্থিত। বনী সা-'ইদাহ্ খাযরাজ-এর একটি গোত্র। আমি অধম ওই কূপেরও যিয়ারত করেছি এবং সেটার পানিও পান করেছি।

১১. অর্থাৎ এ কূপ যেনো প্রোথিত আবর্জনা ছিলো। অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারার অলি-গলি পরিচ্ছন্ন করে ময়লা-আবর্জনা সেখানে ফেলা হতো, যেমন- আমাদের এখানেও এমন গর্ত দেখা গেছে।

১২. اَلْمَآءُ -এর মধ্যে আলিফ-লাম (الف لام) عهدى। অর্থাৎ এ পানি পবিত্র। ওইসব আবর্জনার কারণে নাপাক হয় না। ইমাম শাফে'ঈর মতে তো এজন্য যে, ওই পানি দু'কুল্লার চেয়ে বেশী ছিলো। আর ইমাম আ'যমের মতে এ জন্য যে, ওই পানি প্রবহমান ছিলো। অর্থাৎ দাফনকৃত নহরের উপরই এ কূপ অবস্থিত ছিলো; যেমন মক্কা মুকার্‌রামায় 'নহর-ই যোবায়দাহ্'র উপর এবং মদীনা মুনাওয়ারায় 'নহরে যারক্বা'র উপর সমস্ত কূপ অবস্থিত, যেগুলো বাহ্যতঃ কূপ বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে চাপা পড়া নহর।

بِمَآءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُه وَالْحِلُّ مَيْتَتُه. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ-

وَعَنْ اَبِىْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَه لَيْلَةَ الْجِنِّ مَا فِىْ اَدَاوَاتِكَ قَالَ قُلْتُ نَبِيْذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَزَادَ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ اَبُوْ زَيْدٍ مَجْهُوْلٌ وَّ صَحَّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

সমুদ্রের পানি দিয়ে?"[১৩] রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "সমুদ্রের পানি পাক।[১৪] আর সেটার মৃত হালাল।"[১৫] [মালিক, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্, দারেমী]

৪৪২।। হযরত আবূ যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনাকারী, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'জিন্নাত-রজনী'তে[১৬] তাদের উদ্দেশে এরশাদ করলেন, "তোমার পাত্রে কি আছে?" তিনি বললেন, আমি আরয করলাম, "নবীয।"[১৭] হুযূর এরশাদ করলেন, "খেজুর পাক এবং পানি পবিত্রকারী।"[১৮] [আবূ দাউদ] ইমাম আহমদ ও তিরমিযী এতটুকু বর্দ্ধিত করেছেন– "তারপর তা দিয়ে ওযূ করেছেন।" ইমাম তিরমিযী বলেছেন, "আবূ যায়দ অপরিচিত।"[১৯] আলক্বামাহ্ বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী, হযরত আবদুল্লাহ্

ইমাম আ'যমের অভিমত শক্তিশালী। কেননা, দু'ক্বুল্লা কেন? শত-সহস্র মটকা (ক্বুল্লা) পানিও এতটুকু অপবিত্র বস্তু পড়লে বিগড়ে যাবে। আমাদের কূপগুলোতে যদি একটি মাত্র বিড়াল পড়ে ফুলে-ফেটে যায়, তবে পানি পঁচে যায়। সুতরাং এ হাদীস ইমাম শাফে'ঈর পরিপন্থী হবে। অবশ্য, প্রবহমান পানি যেহেতু সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, সেহেতু সেটা না-পাক হবার প্রশ্নই আসে না। এখনো 'বোদ্বা'আহ্' কূপ ইত্যাদি উঁকি মেরে দেখুন! তখন দেখবেন, পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

১৩. প্রশ্নকারীর মনে এ সংশয় ছিলো যে, সমুদ্রের পানি অতিমাত্রায় তিক্ত। পান করার উপযোগী নয়। সুতরাং এ আয়াতের আওতায় পড়ে না–

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا

(অর্থাৎ এবং আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছি, যা পবিত্রকারী; ৫:৪৮) কেননা, বৃষ্টির পানি মিঠা ও পবিত্রকারী। অথচ সমুদ্রের পানি মিঠা নয় (লোনা)। সুতরাং যুক্তির নিরীখে তা পবিত্রকারী না হওয়া চাই। (হাদীস শরীফে এর জবাব বা অপনোদন রয়েছে।)

১৪. অর্থাৎ সমুদ্রের পানির এ স্বাদ আসলী। অথবা বেশীক্ষণ স্থির থাকার কারণে কোন অপবিত্র বস্তু সেটার স্বাদকে বিগড়ে দেয় নি। সুতরাং পাকও, পবিত্রকারীও। স্মর্তব্য যে, যদি দীর্ঘদিন স্থির থাকার কারণে কূপের পানির স্বাদ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং দুর্গন্ধময় হয়ে যায়, তবুও পাক থাকবে।

১৫. হানাফী মাযহাব মতে, এর অর্থ এ যে, মাছকে যবেহ করার প্রয়োজন নেই। যদি আমাদের হাতের নাগালে এসে মরে যায় কিংবা সমুদ্রের ঢেউ সেটাকে তীরে নিক্ষেপ করে যায়, যার ফলে সেটা মরে যায়, তবে তা হালাল। কিন্তু যদি তার রোগের কারণে মরে পানির উপর ভেসে থাকে তাহলে হারাম। কারণ, তখন তো সমুদ্রের মড়া নয়; বরং রোগের মড়া। কোন কোন ইমাম এর অর্থ এটা বুঝেছেন যে, পানির প্রতিটি প্রাণী হালাল। এমন কি, বেঙ ও কচ্ছপ পর্যন্ত; কিন্তু এ অর্থ সঠিক নয়। কেননা, সামুদ্রিক মানুষ ও সামুদ্রিক শূকরকে তাঁরাও হারাম বলে জানেন। সুতরাং তাঁদেরকেও এ হাদীসের উপর আমল করার বেলায় শর্তারোপ করতে হবে।

১৬. অর্থাৎ যে রাতে জিনেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য হাযির হয়েছে আর হুযূর তাদের নিকট দ্বীনের বাণী পৌঁছানোর জন্য ইবনে মাস্'উদকে নিজের সাথে নিয়ে শহরের বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। হযরত ইবনে মাস্'উদের নিকট তাঁর অভ্যাস অনুসারে পানির লোটা ছিলো।

১৭. অর্থাৎ খেজুর ভেজা পানি (খেজুর ভিজিয়ে রাখার পর যে-ই শরবৎ হয়)। এভাবে যে, রাতে খেজুরগুলো পানিতে

بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمْ اَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَ كَانَتْ تَحْتَ اِبْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبْتُ لَهٗ وَضُوْءً فَجَآئَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاٰنِىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَتَ اَخِىْ قَالَتْ

ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "আমি জিন্নাত-রজনীতে হুযূরের সাথে ছিলাম না।"[২০] [মুসলিম]

৪৪৩।। হযরত কাব্‌শাহ বিনতে কা'ব ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা ও আনহু থেকে বর্ণিত,[২১] তিনি আবূ ক্বাতাদার পুত্রবধু ছিলেন। আবূ ক্বাতাদাহ্ তাঁর নিকট আসলেন।[২২] তখন তিনি আবূ ক্বাতাদার জন্য ওযূর পানি ঢেলে দিলেন। বিড়াল এসে তা থেকে পানি পান করতে লাগলো। তিনি সেটার জন্য পাত্রটি ঝুঁকিয়ে দিলেন, শেষ পর্যন্ত সেটা পানি পান করে নিলো। হযরত কাব্‌শাহ বলেছেন, "আবূ ক্বাতাদাহ্ আমাকে আমি তাঁর দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, "ভাতিজী! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছো?" তিনি (বর্ণনাকারীনী) বললেন,

---

ভেজানো হয় আর সকালে ওই খেজুর-ভেজা পানিটুকু নেওয়া হয়।

১৮. একথা বলে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা দ্বারা ওযূ করেছেন; যেমন- 'মাসাবীহ'র বর্ণনায় রয়েছে। এ হাদীস ইমাম আ'যমের দলীল- এ মর্মে যে, খেজুরের শরবৎ দ্বারা ওযূ করা জায়েয, এ শর্তে যে, যদি তা গাঢ় না হয়ে যায়; বরং খুব পাতলা থাকে।

১৯. অর্থাৎ তাঁর অবস্থা জানা যায় নি যে, তিনি কেমন ছিলেন? কিন্তু ইমাম ইবনে হুমাম বলেন যে, লোকটি আবূ যায়দ 'আমর ইবনে হুরায়সের আযাদকৃত গোলাম। তাঁর নিকট থেকে রাশেদ ইবনে কায়সান ও আবূ রক্বাক্ব হাদীস সংগ্রহ করেছেন। আর যে-ই বর্ণনাকারী থেকে এমন মুহাদ্দিসগণ রেওয়ায়ত গ্রহণ করেন, তিনি 'অপরিচিত' (مجهول) থাকতে পারেন না।

তাওরীশতী বলেছেন, এ হাদীস অত্যন্ত দুর্বল সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ বহু দুর্বল সনদ একত্রিত হয়ে হাদীস শক্তিশালী হয়ে যায়। উসূল-ই হাদীসের কিতাবাদি দ্রষ্টব্য।

২০. স্মর্তব্য যে, 'জিন-রাত্রি' ছয়টি। একবার হুযূর বক্বী-'উল-গারক্বাদ-এ জিন্‌দেরকে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়েছেন। তাতে হযরত ইবনে মাস'উদ হুযূরের সাথে ছিলেন। দ্বিতীয়বার মক্কা মুআয্‌যামায়। আরেকবার মদীনা মুনাওয়ারায়। এবার হযরত যোবায়র ইবনে 'আওয়াম সাথে ছিলেন। সুতরাং আলক্বামার এ বর্ণনাও বিশুদ্ধ যে, হযরত ইবনে মাস্'উদ সাথে ছিলেন না। আর ওই বর্ণনাও বিশুদ্ধ যে, তিনি সাথে ছিলেন এবং তখন 'নবীয'-এর এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অথবা আলক্বামার বর্ণনার মর্মার্থ-এ যে, হযরত ইবনে মাস্'উদ লায়লাতুল জিন্-এ হুযূরের সাথে দ্বীনের বাণী পৌঁছানোর সময় ছিলেন না। কেননা, তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন। আর তাঁর চতুর্দিকে 'হিসার' (রক্ষণাবেষ্টনী) রেখা টেনে দিয়ে বলেছিলেন যেনো সেটার আগে অতিক্রম করে না যান। অন্যান্য বর্ণনায় এমনি রয়েছে। এ থেকেই সম্মানিত সূফীগণ 'হিসার' (রক্ষা-বেষ্টনী)-এর মাসাইল অনুমান করেন। সুতরাং হযরত আলক্বামার এ হাদীস শরীফ ওই দ্বিতীয় হাদীসের পরিপন্থী নয়। [মিরক্বাত ও আশি''আহ্]

স্মর্তব্য যে, খেজুরের 'নবীয' (শরবৎ) দ্বারা ওযূ জায়েয হওয়া 'ক্বিয়াস' বা যুক্তির পরিপন্থী। কেননা, 'নবীয' স্বাভাবিক পানি নয়। অথচ ওযূ শুধু স্বাভাবিক পানি দ্বারাই হতে পারে; কিন্তু যেহেতু হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু খেজুরের 'নবীয' ব্যতীত অন্য কোন 'নবীয' দ্বারা ওযূ জায়েয নয়; যেমন কিশ্‌মিশ ইত্যাদির নবীয (কিশমিশ্ ভেজানো শরবৎ)। এ থেকে ওইসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা বলে, ইমাম-ই আ'যম হাদীস শরীফের মোকাবেলায় 'ক্বিয়াস' (অনুমান) অনুসারে কাজ করেন। না'উযুবিল্লাহ্!

এটাও স্মর্তব্য যে, খেজুরের নবীয দ্বারা ওযূ করা তখনই

فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ اَوِ الطَّوَّافَاتِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوٗدَ وَالنَّسَآئِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ-

وَعَنْ دَاوٗدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اُمِّهٖ اَنَّ مَوْلَاتَهَا اَرْسَلَتْهَا بِهَرِيْسَةٍ اِلٰى

আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তখন তিনি বললেন, "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "বিড়াল নাপাক নয়। তা তো তোমাদের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণকারী কিংবা প্রদক্ষিণকারীনীদের অন্তর্ভুক্ত।"[২৩] [মালিক, আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্, দারেমী]

৪৪৪।। হযরত আবূ দাঊদ ইবনে সালিহ্ ইবনে দীনার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর মাতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর মুনিবা তাঁকে 'হারীসাহ্' (হালুয়া জাতীয় খাদ্য) সহকারে হযরত আয়েশার নিকট প্রেরণ করলেন।[২৪]

দুরস্ত, যখন তা গাঢ় না হয়, পানির অংশ বেশী থাকে। যদি খেজুরের অংশগুলো বেশী হয়ে যায় এবং পানি গাঢ় হয়ে যায়, তবে ওযূ জায়েয নয়; তায়াম্মুম করতে হবে। আর যদি এ বেশী হওয়া নিয়ে সংশয় থাকে, তবে ওযূও করবে, তায়াম্মুমও করবে। সুতরাং ইমাম সাহেব থেকে যা বর্ণিত আছে- 'তিনি কখনো নবীয দ্বারা ওযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন, কখনো আবার ওযূ করতে নিষেধ করেছেন, তায়াম্মুম করতে বলেছেন, আর কখনো উভয়টি করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা অবস্থার ভিন্নতার কারণে দিয়েছেন।

২১. তিনি নিজেও মহিলা-সাহাবী, তাঁর পিতা কা'ব ইবনে মালিকও সাহাবী; যাঁর সম্পর্কে ওই ঘটনা প্রসিদ্ধ, যার প্রসঙ্গে সূরা তাওবায় কয়েকটা আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি (হযরত কাবশাহ্) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ ক্বাতাদার স্ত্রী।

২২. তাঁর নাম হা-রিস ইবনে রবী' আনসারী। প্রসিদ্ধ ঘোড়-সাওয়ার (অশ্বারোহী)। তাঁর পুত্রের নাম আবদুল্লাহ্।

২৩. এ হাদীস থেকে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ আলিম এ মর্মে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি না অপবিত্র, না মাকরূহ। এটা দ্বারা ওযূ করা জায়েয, মাকরূহও নয়। আমাদের ইমাম সাহেবের মতে, যদি বিড়াল-ইঁদুর কিংবা কোন নাপাক বস্তু খেয়ে মুখ পরিষ্কার না করে পানির পাত্রে মুখ দেয়, তবে পানিও নাপাক, পাত্রও নাপাক। আর যদি মুখ সাফ করে পানি পান করে যায়, তবে ওই পানি মাকরূহ। সুতরাং তা দ্বারা ওযূ করা মাকরূহ-ই তানযীহী। ইমাম আ'যম সাহেবের অভিমত মজবুত। আর ওইসব আলিমের এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা দুর্বল। কেননা, এটা হযরত আবূ ক্বাতাদার ইজতিহাদ মাত্র। হুযূর শুধু এটা এরশাদ করেছেন- 'নাপাক নয়'। অর্থাৎ সেটার দেহ নাপাক নয়। এতে একথা কোথায় রয়েছে যে, সেটার মুখের লালা এবং উচ্ছিষ্টও একেবারে পাক? দেখুন, কুকুরের শুষ্ক দেহ নাপাক নয়, কিন্তু সেটার উচ্ছিষ্ট নাপাক। ত্বাহাভী শরীফের প্রণেতা মহোদয় হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন, "যখন বিড়াল পাত্র লেহন করে খেয়ে যায়, তবে সেটাকে একবার-দু'বার ধৌত করো। তাছাড়া ওই ত্বাহাভী শরীফে আছে- সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা কুকুর, বিড়াল ও গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে ওযূ করতেন না; বরং অপরকেও তা করতে নিষেধ করতেন। এ প্রসঙ্গে আরো বহু বর্ণনা ত্বাহাভী শরীফে বর্ণিত আছে। তদুপরি, যেই পশুর গোশ্ত নাপাক ও হারাম হয়, সেটার উচ্ছিষ্টও পাক হবে না। বিড়ালের গোশ্ত নাপাক ও হারাম। সুতরাং সেটার উচ্ছিষ্টও নাপাক হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু যেহেতু এটা ঘরগুলোতে আনাগোনা করে, তাছাড়া নাপাক বস্তুগুলো থেকেও বিরত থাকে না, সেহেতু সেটার উচ্ছিষ্ট মাকরূহ, যেমন- ছোট শিশুরা, যারা অপবিত্র বস্তুগুলো থেকে বাঁচতে পারে না, যদি তারা পানিতে হাত চুবিয়ে নেয়, তাহলে ওই পানি মাকরূহ হয় মাত্র।

২৪. দাউদ ইবনে সা-লিহ মাদানী, শীর্ষ স্থানীয় তাবে'ঈ।

عَـائِشَةَ قَالَتْ فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّيْ فَاَشَارَتْ اِلَى اَنْ ضَعِيْهَا فَجَائَتْ هِرَّةٌ فَاَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ مِنْ صَلٰوتِهَا اَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ اَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ۔

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَتَوَضَّأُ بِمَا اَفْضَلَتِ الْحُمُرُ قَالَ نَعَمْ وَبِمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا. رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ۔

আমি তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম। তিনি আমাকে ইঙ্গিত করলেন, "রেখে দাও।"[২৫] অতঃপর একটি বিড়াল আসলো। তারপর সেটা তা থেকে কিছুটা খেয়ে গেলো। যখন হযরত আয়েশা নামায থেকে অবসর হলেন, তখন তিনি সেখান থেকেই খেয়েছেন, যেখান থেকে বিড়ালটি খেয়েছিলো। তিনি বলতে লাগলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "বিড়াল নাপাক নয়। তাতো তোমাদের মধ্যে প্রদক্ষিণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[২৬] আর আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। তিনি বিড়ালের পান করে বেঁচে যাওয়া পানি দিয়ে ওযূ করতেন।[২৭] [আবূ দাঊদ]

৪৪৫।। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করা হলো, "আমরা কি গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে ওযূ করবো?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "হ্যাঁ।" আর তা দ্বারাও, যাকে সমস্ত জন্তু উচ্ছিষ্ট করে রেখেছে।[২৮] [শরহে সুন্নাহ্]

আবূ ক্বাতাদাহ্ আনসারীর আযাদকৃত গোলাম। তাঁর আম্মাজানও কারো আযাদকৃত দাসী ছিলেন।

'হারীসাহ্' (هريسه) - هرس থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ- খুব চূর্ণ করা। আরবের প্রসিদ্ধ হালুয়া।

২৫. আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেছেন, অথবা মাথা নেড়ে। নামাযের মধ্যে প্রয়োজনের সময় এতটুকু হালকা ইশারা জায়েয।

২৬. এতেও হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বার ইজতিহাদ রয়েছে। হুযূর বিড়ালের দেহকে পাক বলেছেন, মুখের লালা ও উচ্ছিষ্টের কথা উল্লেখ করেন নি।

২৭. এ বাক্য ইমাম আ'যম আলায়হির রাহমাহ্র পরিপন্থী নয়। কেননা, এটা দ্বারা ওযূ করা শুধু মাকরূহ-ই তানযীহী। হুযূর সেটা বৈধতা বর্ণনা করার জন্য করেছেন। এটাও হতে পারে যে, অন্য পানি না থাকার কারণে তা দ্বারা ওযূ করা হয়েছে।

২৮. এ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, সমস্ত জন্তুর উচ্ছিষ্ট পবিত্র। ইমাম আ'যম ও ইমাম আহমদের মতে নাপাক। ইমাম আ'যমের অভিমত শক্তিশালী। আর এ হাদীস শরীফে পুকুরগুলোর পানি কিংবা প্রবহমান পানির কথা বুঝানো হয়েছে, যাতে নাপাক বস্তু পড়লেও তা নাপাক হয় না; যেমনটি তৃতীয় অধ্যায়ে আসছে। অন্যথায় এ হাদীস শরীফ ইমাম শাফে'ঈরও বিপক্ষে যাবে। কেননা, কুকুর এবং শূকরও জন্তু। সুতরাং সেগুলোর উচ্ছিষ্টও পাক হওয়া উচিত ছিলো। যেসব পশুর গোশ্ত নাপাক হয়, সেগুলোর উচ্ছিষ্টও নাপাক হওয়া চাই। কেননা, মুখের লালা গোশ্ত থেকে পয়দা হয়।

স্মর্তব্য যে, গাধার উচ্ছিষ্ট পাকই তো; কিন্তু সেটা অন্য কিছু

وَعَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ اِغْتَسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَمَيْمُوْنَةُ فِىْ قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ. رَوَاهُ النَّسَآئِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ۔

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اِنَّ عُمَرَ خَرَجَ فِىْ رَكْبٍ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتّٰى وَرَدُوْا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرٌو يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَاِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا. رَوَاهُ مَالِكٌ وَزَادَ رَزِيْنٌ قَالَ زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِىْ قَوْلِ عُمَرَ وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَهَا مَا اَخَذَتْ فِىْ بُطُوْنِهَا وَمَا بَقِىَ فَهُوَ لَنَا طَهُوْرٌ وَّ شَرَابٌ۔

৪৪৬।। হযরত উম্মে হানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা[২৯] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরত মায়মূনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা ওই বারকোষ (জলপাত্র) থেকে ওযূ করেছেন, যাতে আটার খমীরের কিছু চিহ্ন ছিলো।[৩০] [নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪৪৭।। হযরত ইয়াহ্‌য়া ইবনে আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ওই কাফেলায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যাতে হযরত 'আমর ইবনুল 'আস ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এক হাওযের তীরে উপনীত হলেন। তখন হযরত আমর বললেন, "হে হাওযের মালিক! তোমার হাওযের নিকট কি বন্যজন্তুগুলোও আসে?"[৩১] তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব বললেন, "হে হাওযের মালিক! তুমি বলবে না! কেননা, আমরা জন্তুগুলোর নিকট আর বন্য পশুগুলো আমাদের নিকট আসেই।"[৩২] [মালিক] আর রাযীন একথাটুকুও বর্দ্ধিত করেছেন এবং বলেছেন যে, কোন কোন বর্ণনাকারী হযরত ওমরের বাণীর মধ্যে এতটুকু বর্দ্ধিত করেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে, জন্তুগুলো যা পেটে করে নিয়ে গেছে, তা সেগুলোর, আর যা বেঁচে গেছে তা আমাদের। পানিও রয়েছে, পবিত্রতাও রয়েছে।[৩৩]

পাক করবে কিনা সন্দেহ আছে। কেননা, এতে সাহাবা-ই কেরামের বহু বিরোধ রয়েছে। বিনা প্রয়োজনে তা দ্বারা ওযূ করবে না। অন্য পানি পাওয়া না গেলে তা দ্বারা ওযূও করবে, এর সাথে সাথে তায়াম্মুমও করবে।

২৯. তাঁর নাম ফাখ্‌তাহ্ কিংবা 'আ-তিক্বাহ্। তিনি হযরত আলী মুরতাদ্বার সহোদরা। তাঁর ঘর থেকে হুযূরের মি'রাজ হয়েছিলো। তিনি হুবায়রাহ্ ইবনে আবী ওয়াহ্‌বের বিবাহাধীন ছিলেন। পরবর্তীতে হুযূর তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন; কিন্তু বিয়ে হতে পারে নি। তিনি ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের দিন ঈমান এনেছেন। হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর রাজত্বকালে ৫০ হিজরীর পর ওফাত পান।

৩০. অর্থাৎ শুধু চিহ্ন ছিলো। তাদ্বারা পানি না সাদা রং ধারণ করেছে, না গাঢ় হয়েছে। এমন পানি দ্বারা ওযূ করা জায়েয; মাকরূহও নয়।

৩১. অর্থাৎ যদি পশুগুলো তা থেকে পানি পান করে, তবে তা থেকে আমরা না ওযূ-গোসল করবো, না পান করবো।

وَعَنْ اَبِیْ سَعِیْدِنِ الْخُدْرِیِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِیْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ عَنِ الطُّهْرِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِیْ بُطُوْنِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طُهُوْرٌ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ-

وَعَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَا تَغْتَسِلُوْا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَاِنَّهٗ يُوْرِثُ الْبَرَصَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِیْ-

৪৪৮।। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওইসব হাওয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যেগুলো মক্কা মুকার্‌রামাহ্ ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যভাগে রয়েছে, যেগুলোতে জীব-জন্তু কুকুর ও গাধা সবই আসে। ওইগুলোতে ওযূ করা কেমন?" এরশাদ ফরমালেন, যা সেগুলো আপন আপন পেটে করে নিয়ে গেছে তা সেগুলোর, আর যা বেঁচে গেছে তা আমাদের। তা আমাদের জন্য পবিত্রকারী।[৩৪] [ইবনে মাজাহ্]

৪৪৯।। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোদের তাপে উত্তপ্ত পানি দ্বারা গোসল করো না। কারণ, তা কুষ্ঠরোগ পয়দা করে।[৩৫] [দার-ই কুত্‌নী]

'আবে ক্বলীল' (স্বল্প পানি) ও 'আবে কাসীর' (বেশী পানি)'র মধ্যে পার্থক্য তাঁর জানা ছিলো না।

৩২. অর্থাৎ যেহেতু ওই পানি 'কাসীর' (বেশী), সেহেতু কোন পশু তা থেকে পান করে গেলেও তা নাপাক হয় না। আর কোন অপবিত্র বস্তু পড়লেও তা অপবিত্র হয় না- যে পর্যন্ত না পানির স্বাদ ও রং অপবিত্র বস্তুর কারণে পরিবর্তিত হয়। এ হাদীস শরীফ উপরোল্লিখিত হাদীস-ই জাবির-এর ব্যাখ্যা এবং ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মজবুত দলীল।

৩৩. এ বাক্যেও 'আবে কাসীর' (বেশী পানি) বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এ হাদীস আমাদের দলীল; শাফে'ঈ মাযহাবের নয়। ইমাম শাফে'ঈ বলেন, "এ হাদীস স্বাভাবিক পানি (ماءِ مطلق) -এর জন্যই; চাই স্বল্প হোক, চাই বেশী।" কিন্তু এ ব্যাখ্যা পরবর্তীতে আগত হাদীসের পরিপন্থী। তাছাড়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন পানি দু'কুল্লা পরিমাণ হয়, তবে পশুগুলো পান করলে নাপাক হবে না। আর যদি পশুগুলোর উচ্ছিষ্ট পবিত্র হতো, তবে ওখানে দু'কুল্লার শর্তারোপ করা হলো কেন?

৩৪. এ হাদীস শরীফ পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ যখন পানির পরিমাণ বেশী হয়, তখন পশুগুলো পান করলে তা নাপাক হবে না।

স্মর্তব্য যে, এ হাদীস শরীফগুলোতে ওইসব হাওযের পরিমাণের কথা উল্লেখ করা হয় নি। আমাদের ইমাম আ'যমের মতে, ১০০ বর্গহাত পরিমাণ হাওযের পানি 'আবে কাসীর' (বেশী পানি), যার প্রমাণ 'বি'রই বোদ্বা'আহ্'র মাসআলাহ্। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ-ই ফরমান, যা'তে এরশাদ করা হয়েছে- একটি কূপের 'হারীম' হবে দশ হাত। অর্থাৎ এ আয়তনের মধ্যে অন্য কূপ যেনো খনন করা না হয়।

৩৫. এটা যদিও ফারূক্ব-ই আ'যমের উক্তি; কিন্তু সাহাবা-ই কেরামের উপস্থিতিতে এ অভিমত দেওয়া হয়েছে। কেউ এর উপর আপত্তি করেন নি। ফলে এ মাস্‌আলা ইজমা' সমর্থিত হয়ে গেলো।

প্রকাশ থাকে যে, এটা দ্বারা প্রত্যেক ধরনের পানি বুঝানো হয়েছে- কম হোক, কিংবা বেশী। সুতরাং হাওযের পানি যখন রোদে গরম হয়ে যায়, তখন তা দ্বারা ওযূ করা যাবে না।

****

بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ قَالَ طُهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَّغْسِلَهٗ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ۔

অধ্যায় ঃ অপবিত্রতাসমূহকে পবিত্র করা[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৪৫০।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমাদের মধ্যে কারো পাত্রে কুকুর পান করে যায়, তখন সেটাকে সাতবার ধৌত করো। [মুসলিম, বোখারী]

আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, হুযূর এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কারো পাত্রের পবিত্রতা- যখন তাতে কুকুর লেহন করে যায়, সাতবার ধৌত করা, প্রথমবার মাটি দ্বারা।[২]

---

১. এখানে অপবিত্র বস্তুগুলো দ্বারা 'প্রকৃত অপবিত্র বস্তুসমূহ' বুঝানো হয়েছে; 'হুকমী' (পরোক্ষ কারণে অপবিত্রতা) নয়। কেননা, ওই কথা ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে- ওযূ ও গোসলের আলোচনায়। যেহেতু প্রকৃত নাপাকী অনেক প্রকারের, যেমন- হালকা-পাতলা ও গাঢ় ইত্যাদি, সেহেতু 'নাজাসাত' (অপবিত্রতা) শব্দটির বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

২. এ মাযহাবই ইমাম শাফে'ঈ প্রমুখ ফক্বীহ ও বেশীরভাগ মুহাদ্দিসের। অর্থাৎ কুকুর কোন পাত্র লেহন করলে সেটাকে সাতবার ধৌত করা এবং মাটি দিয়ে মাজা তাদের মতে ফরয। আমাদের ইমাম-ই আ'যমের মতে, এর বিধান ও অন্যান্য অপবিত্র বস্তুর মতোই যে, তা ধোয়ার জন্য না সংখ্যা নির্দ্ধারিত আছে, না মাটি দ্বারা পরিষ্কার করা অপরিহার্য; বরং অপবিত্র বস্তুর চিহ্ন ও প্রভাব দূরীভূত করা জরুরী; যেমন মাটি ইত্যাদির পাত্র, যাতে শোষণ ক্ষমতা রয়েছে, তিনবার ধুতে হবে। তামা, শিশা ইত্যাদি, যাতে শোষণ ক্ষমতা থাকে না, একবার ধৌত করা কিংবা মুছে নেওয়া যথেষ্ট। এ কারণে যে, দার-ই ক্বুত্বনী হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে 'মারুফ্' সূত্র দ্বারা (যথাযথ সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে) বর্ণনা করেছেন। হুযূর এরশাদ ফরমান, "যদি কুকুর পাত্র লেহন করে যায়, তবে সেটাকে তিনবার পাঁচবার, সাতবার ধু'বে।" তাছাড়া ইবনে আরবী মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন কুকুর পাত্র লেহন করে যায়, তখন ওই (পাত্রের অবশিষ্ট) পানি ফেলে দাও। আর পাত্র তিনবার ধুয়ে নাও। তাছাড়া, দার-ই ক্বুত্বনী বিশুদ্ধ সনদে হযরত আত্বা থেকে বর্ণনা করেছেন, খোদ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এ আমল ছিলো। যখন কুকুর তাঁর থালা লেহন করে যেতো, তখন তিনি ওই পানি ফেলে দিতেন। আর থালাটি তিনবার ধুয়ে নিতেন। সুতরাং সাত বারের হাদীস 'মানসূখ' (রহিত)। আর এ উল্লিখিত হাদীসগুলো হচ্ছে 'নাসিখ' (রহিতকারী)। প্রাথমিক পর্যায়ে কুকুর পালন করা নিষিদ্ধ এবং সেগুলোকে হত্যা করা ওয়াজিব ছিলো। ওই যুগেই এ বাধ্যবাধকতাগুলো ছিলো। যখন প্রয়োজনের তাগিদে কুকুর পালন করা বৈধ সাব্যস্ত হলো এবং কুকুর নিধন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য রইলো না, তখন সাতবারের হুকুমও মানসূখ হয়ে গেলো। অনুরূপভাবে, যদি কুকুর কিংবা শূকর পাত্রে প্রস্রাব করে দেয়, তবে তিন বার ধোয়া যথেষ্ট। কুকুরের মুখের লালা তো প্রস্রাব থেকে জঘন্যতর নয়, সুতরাং তাতেও তিনবার ধুলে যথেষ্ট হওয়া চাই। এ সাতবারের নির্দেশ তেমনই, যেমন প্রাথমিক যুগে মদের পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেলা ফরয ছিলো। এরপর ওই বিধান বলবৎ থাকে নি। (বরং রহিত হয়ে গেছে।)

وَعَنْهُ قَالَ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهٖ سَجْلًا مِّنْ مَّاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِّنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَهْ مَهْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم

৪৫১।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক গ্রাম্য লোক মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে দিলো। তাকে লোকেরা ধরে ফেললো। তাঁদেরকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তাকে ছেড়ে দাও[৩] এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।[৪] কেননা, তোমরা নম্রতা বা সহজপন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছো, সমস্যায় নিক্ষেপকারী হিসেবে প্রেরিত হও নি।[৫] [বোখারী]

৪৫২।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মসজিদের মধ্যে ছিলাম। ইত্যবসরে একজন গ্রাম্য লোক আসলো এবং মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগলো। তখন হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ বললেন, "থাম্ থাম্!" রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "তাকে বাধা দিও না! ছেড়ে দাও।"[৬] লোকেরা ছেড়ে দিলেন, শেষ পর্যন্ত সে প্রস্রাব করে নিলো। তারপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

৩. অর্থাৎ তাকে মারধর করো না। কেননা, সে শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে অবগত নয়। ইসলামের প্রারম্ভিককালে মানুষ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা এবং সবার সামনে উলঙ্গ হওয়াকে দোষের মনে করতো না।

অনুরূপভাবে, সে মসজিদের নিয়মাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত ছিলোনা। বুঝা গেলো যে, অজ্ঞ লোকের প্রতি কঠোরতা করা উচিত নয়। তাকে নম্রভাবে বুঝানো চাই।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, سَجْل ও ذَنُوب সমার্থক। অর্থাৎ বালতি বড় হোক কিংবা ছোট। কেউ কেউ বলেছেন, سَجْل বলে বড় বালতিকে আর ذَنُوب বলে সাধারণ বালতিকে।

স্মর্তব্য যে, এ سَجْل-س-এর 'যবর' ج ও ل-এ জযম। আর س ও ج -এ যের এবং ل-এ شدّه সহকারে سِجِلّ -অর্থ লেখক ও মুনশী। অনুরূপ, ذَنُوب-এর ذ -এ যবর হলে অর্থ হবে বালতি। আর ذ -এর উপর পেশ হলে (ذُنُوب) তবে তা ذَنْب -এর বহুবচন হবে। আর অর্থ হবে 'গুনাহসমূহ'।

৫. স্মর্তব্য যে, ভূ-পৃষ্ঠ যদিও শুষ্ক হয়ে পাক হয়ে যায়, কিন্তু তবুও ওই জমি ধুয়ে ফেলা খুবই উত্তম। কারণ, এর ফলে নাপাকীর রং ও গন্ধ তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যায় এবং তা দ্বারা তায়াম্মুমও জায়েয হয়ে যায়।

এ হাদীস শরীফ দ্বারা একথা অপরিহার্য হয় না যে, নাপাক জায়গা (জমি) ধোয়া ছাড়া পাক হতে পারে না; যেমন- ইমাম শাফে'ঈ বলেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদ ধোয়ানো এজন্য ছিলো যে, নামাযের সময় সন্নিকটে ছিলো। জায়গা তাড়াতাড়ি শুষ্ক হয়ে পাক হতে পারতো না।

دَعَاهُ فَقَالَ لَه' اِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَالْقَذْرِ وَاِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَقِرَاْءَةِ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاَمَرَ رَجُلًا مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ فَسَنَّهُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ سَئَلَتْ اِمْرَاَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِحْدَانَا اِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اِحْدٰكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

তাকে ডেকে বললেন, "এ মসজিদগুলো প্রস্রাব ও অপবিত্রতার জন্য নয়। সেগুলো তো শুধু আল্লাহ্র যিকর, নামায ও তিলাওয়াত-ই ক্বোরআনের জন্যই। অথবা হুযূর আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেমন এরশাদ করেছেন।[৭] বর্ণনাকারী বলেন, "এবং হুযূর লোকদের থেকে একজনকে নির্দেশ দিলেন। তিনি এক বালতি পানি আনলেন, যা সেটার উপর ঢেলে দিলেন। [মুসলিম, বোখারী]

৪৫৩।। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে আরয করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! বলুন, আমাদের মধ্য থেকে যখন কারো কাপড়ে হায়যের রক্ত লেগে যায়, তখন সে কি করবে?" তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যখন তোমাদের মধ্য থেকে কারো কাপড়ে হায়য (ঋতুস্রাব)-এর রক্ত লেগে যায়, তখন তা কচলিয়ে নেবে, তারপর পানি দ্বারা ধুয়ে নেবে। তারপর তাতে নামায পড়ে নেবে।[৮] [মুসলিম, বোখারী]

অনুরূপ, মসজিদে পাক-পবিত্রতা ছাড়া পরিচ্ছন্নতাও চাই। আর এটাতো ধুয়ে ফেললেই অর্জিত হতে পারে।

৬. কেননা প্রস্রাব করা মধ্যভাগে রুখে দিলে কঠিন রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। বুঝা গেলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্পর্কেও পূর্ণ অবগত এবং উম্মতের উপর খুব দয়ালু, দয়ার্দ্র। হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন– 'মসজিদ ধুলে পরিষ্কার হয়ে যাবে, কিন্তু এ রোগ রয়ে গেলে তার ও আমাদের খুব কষ্ট হবে।'

৭. এতে দ্বীনের প্রচারকদের জন্য ধর্মপ্রচারের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে দ্বীনের প্রচারণা সচ্চরিত্র ও নম্রতা সহকারে হওয়া চাই।

৮. এ হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটা মাস্'আলা প্রতীয়মান হয়–

এক. ঋতুস্রাবের রক্ত গাঢ় অপবিত্র বস্তু (نجاست غليظ)। তাই সেটা ধোয়ার ক্ষেত্রে অতিশয়তা অবলম্বন করা চাই। এ কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ধোয়ার পূর্বে কচলানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

দুই. নাপাক কাপড় ধুতেই পাক হয়ে যায়। এজন্য শুকানো পূর্বশর্ত নয়।

তিন. এ نضح -এর অর্থ নিছক ছিটকানো নয়; বরং ধোয়া। কেননা, ঋতুস্রাবের রক্ত পানি ছিটকে দিলে পাক হয় না, খুব ধুতে হয়। সুতরাং এ হাদীস ইমাম-ই আ'যমের দলীল– এ মর্মে যে, দুগ্ধপায়ী শিশুর প্রস্রাব পানি ছিটকে দিলে পবিত্র হয় না; বরং তা ধুয়ে নেওয়া জরুরী। কেননা, সেখানেও نضح শব্দটা আসছে।

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاَثَرُ الْغُسْلِ فِىْ ثَوْبِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنِ الْاَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَبِرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَآئِشَةَ نَحْوَهُ وَفِيْهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ فِيْهِ۔

৪৫৪।। হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু[৯] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে ওই বীর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যা কাপড়ে লেগে যায়, তিনি বলেছিলেন, "আমি তা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় মুবারক থেকে ধুয়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন; অথচ ধোয়ার চিহ্ন হুযূরের কাপড়ে অবশিষ্ট থাকতো।[১০] [মুসলিম, বোখারী]

৪৫৫।। হযরত আস্ওয়াদ[১১] ও হযরত হাম্মাম[১২] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তারা হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণনাকারী, তিনি (হযরত আয়েশা) বললেন, আমি হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় মুবারক থেকে বীর্য কচলিয়ে দিতাম। [মুসলিম] আর হযরত আলক্বামা ও আসওয়াদের এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা'তে একথাও আছে যে, অতঃপর হুযূর তাতে নামাযও পড়ে নিতেন।[১৩]

---

৯. তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হার আযাদকৃত ক্রীতদাস। তিনি ফক্বীহ্ এবং তাবে'ঈও। হযরত আত্বা ইবনে ইয়াসারের ভাই। ৭৩ বছর বয়স পান। ১০৭ হিজরীতে ওফাত পান।

১০. এ থেকে কয়েকটা মাস্'আলা প্রতীয়মান হয় ঃ

এক. বীর্য নাপাক। তা নাকটি ও থুথুর ন্যায় পাক নয়; যেমনটি শাফে'ঈ মাযহাবের ইমামগণ মনে করেছেন। তা না হলে ধোয়ার প্রয়োজন হতো না।

দুই. নিজের স্ত্রীর মাধ্যমে বীর্য লেগেছে এমন কাপড় ধোয়ানো জায়েয। কেননা, এটাও এক প্রকার খিদ্মত।

তিন. নাপাক কাপড় ধোয়ার পরপরই পাক হয়ে যায়।

চার. ভেজা কাপড়ে নামায পড়া জায়েয।

১১. তাঁর নাম আস্ওয়াদ ইবনে বেলাল মুহারেবী। গোত্রের দিক দিয়ে তিনি নাখ্'ঈ। আলক্বামাহ্ ইবনে ক্বায়সের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইব্রাহীম নাখ্'ঈর মামা। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যমানা পেয়েছেন, তবে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় নি। খোলাফা-ই রাশেদীনের অন্যতম সাথী ছিলেন। ৮০ বার হজ্জ ও ওমরাহ্ করেছেন। ওফাতের সময় পর্যন্ত রোযা রেখেই গেছেন। আর প্রতি দু'রাতে এক খতম ক্বোরআন তিলাওয়াত করতেন। ৮৪ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন। [মিরক্বাত ও আশি''আহ্]

১২. তিনি নাখ'ঈ তাবে'ঈ কূফী। ৬৫ হিজরীতে ওফাত পান। হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ ও ইবনে মাস'উদ প্রমুখ সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

১৩. এ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে ইমাম শাফে'ঈ বলেছেন, বীর্য পাক; কেননা– এটা মানুষ সৃষ্টির উপাদান। এটা কীভাবে হতে পারে যে, এমন এক পাক সৃষ্টি নাপাক উপাদান থেকে পয়দা হবে?

وَعَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَجْلَسَه، رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حِجْرِه فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِه فَدَعَا بِمَآءٍ فَنَضَحَه، وَلَمْ يَغْسِلْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

৪৫৬।। হযরত উম্মে ক্বায়স বিনতে মিহসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত,[১৪] তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে, যে আহার করছিলো না, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে আনলেন। হুযূর তাকে আপন কোলে বসিয়ে নিলেন। সে তাঁর কাপড়ে প্রস্রাব করে দিলো। হুযূর পানি তলব করলেন। সেটার উপর পানি ঢেলে দিলেন। খুব উত্তমরূপে ধৌত করেন নি।[১৫] [মুসলিম, বোখারী]

আমাদের ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর মতে বীর্য নাপাক। অন্যথায় তা নির্গত (স্খলিত) হলে গোসল ওয়াজিব হতো না। অবশ্য, সহজ পন্থা হিসেবে গাঢ় শুষ্ক বীর্যকে কচলিয়ে ঝেড়ে ফেলা যথেষ্ট। যেমন স্তুপের গম, যার উপর গরু প্রস্রাব পায়খানা করে। ওগুলো ঝেড়ে পরিস্কার করে মাড়াই করে নেওয়ার ফলে পাক হয়ে যায়। এতদ্‌ভিত্তিতে এটা অপরিহার্য হয় না যে, গোবর এবং প্রস্রাবও পাক হবে।

এ যুক্তিও দুর্বল যে, 'পাক মানুষ নাপাক বীর্য থকে কীভাবে পয়দা হবে?' মায়ের দুধ, যা মানুষের প্রথম খাদ্য, ঋতুস্রাবের রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়; বরং খোদ্ বীর্যও রক্ত থেকে তৈরী হয়। তাহলে কি রক্তকেও পাক বলবেন? এটা তো আল্লাহ্র শান! তিনি নাপাককে পাক বস্তু থেকে এবং পাক বস্তুকে নাপাক বস্তু থেকে সৃষ্টি করেন। সুতরাং দার-ই 'কু্তুনী হযরত 'আম্মার ইবনে ইয়াসির থেকে বর্ণনা করেছেন– হুযূর এরশাদ করেছেন, "হে 'আম্মার পাঁচটি জিনিষ লাগলে কাপড় ধুয়ে নাও– প্রস্রাব, পায়খানা, বমি, রক্ত ও বীর্য। আর হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীস প্রসিদ্ধ, যাতে হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন, "বীর্য হচ্ছে থুথু ও নাকটির মতো, যাকে কাপড় কিংবা ঘাস দ্বারা মুছে নিলে যথেষ্ট" সে সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে– প্রথমতঃ ওই হাদীস সহীহ (বিশুদ্ধ) নয়। যদি বিশুদ্ধ বলে মেনেও নেওয়া হয়, তাহলে তা এসব হাদীস শরীফ দ্বারা হয়তো মানসূখ (রহিত), অথবা অধিকতর গ্রহণযোগ্য নয় (مرجوح)। কেননা, যদি 'মুবাহ্' ও 'হারাম'-এর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা দেখা দেয়, তবে হারামকে প্রাধান্য দিতে হয়। [ফাত্হুল ক্বাদীর, মিরক্বাত ও আশি'আহ্]

১৪. তিনি হযরত 'আকাশাহ্ ইবনে মিহসানের বোন। তিনি আসাদ গোত্রের মহিলা ছিলেন। মক্কা মু'আয্যামায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারপর হিজরত করেন।

১৫. এ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেছেন, দুগ্ধপায়ী শিশু ছেলের প্রস্রাব পবিত্র। ইমাম শাফে'ঈ বলেছেন, নাপাক তো অবশ্যই, কিন্তু শুধু পানির ছিটকে দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়; ধোয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের ইমাম সাহেবের মতে, নাজাসাত-ই গালীযাহ্ (কঠিন অপবিত্র বস্তু) ধোয়া ফরয। এখানে নাদ্বহুন (نضح) মানে 'পানি ঢালা'; ছিটানো নয়। আর لَمْ يَغْسِلْ (ধৌত করেননি) মানে অতিমাত্রায়, অতিশয়তা সহকারে ধৌত করেন নি। কেননা, এমনি শিশু ছেলের প্রস্রাব পাতলা ও কম দুর্গন্ধময় হয়। অন্যথায় এ نضح হযরত আস্মার হাদীসে ঋতুস্রাবের রক্তের প্রসঙ্গেও এসেছে। যদি এখানে এ শব্দ দ্বারা দুগ্ধপায়ী শিশু-ছেলের প্রস্রাব পাক বলে ধরে নেওয়া হয়, কিংবা ওখানে 'ছিটকে দেওয়া'র অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে তো ঋতুস্রাবের রক্তকেও পবিত্র বলে মেনে নিতে হবে! তদুপরি, ওখানে পানির ছিটকে দেওয়া যথেষ্ট বলে ধরে নিতে হবে!

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا دُبِغَ الْاِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

وَعَنْهُ قَالَ تُصُدِّقَ عَلٰى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّبِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهٖ فَقَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مِسْكَهَا ثُمَّ مَازِلْنَا نَنْبِذُفِيْهِ حَتّٰى صَارَ شَنًّا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

৪৫৭।। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, যখন চামড়া সংস্কার করে নেওয়া হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়।[১৬] [মুসলিম]

৪৫৮।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মায়মুনার দাসীকে ছাগল দান (সাদ্ক্বাহ) করা হলো। সেটা মরে গেলো। হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেটা অতিক্রম করছিলেন। তখন এরশাদ ফরমালেন, "তোমরা সেটার চামড়াটা কেন খুলে নাও নি? তোমরা সেটা সংস্কার করে ব্যবহার করতে পারবে!" লোকেরা আরয করলো, "সেটা তো মড়া?" এরশাদ ফরমালেন, সেটার গোশ্ত খাওয়া হারাম মাত্র।[১৭] [মুসলিম, বোখারী]

৪৫৯।। হযরত সাওদা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বিবি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের একটি ছাগল মারা গেলো। আমরা সেটার চামড়া সংস্কার করে নিলাম। অতঃপর আমরা তাতে রেখে নাবীয (খেজুর ভেজানো শরবৎ) বানাতাম। শেষ পর্যন্ত তা পুরানো মশক হয়ে গেলো।[১৮] [বোখারী]

১৬. অর্থাৎ মড়া পশুর চামড়া যদি রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়, কিংবা লবণ অথবা বাবলা গাছের ছালে ছিঁটিয়ে দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়, তবে পাক হয়ে যায়। মানুষ ও শূকর ব্যতীত সমস্ত প্রাণীর চামড়ার বিধান এই। চামড়া ধোয়ার প্রয়োজন নেই।

১৭. এ থেকে বুঝা গেলো যে, মড়া পশুর চামড়া সংস্কার করলে পাক হয়ে যায়। এমন কি মড়ার লোম, শুষ্ক হাড় ও পাছার হাড্ডি পাক; আহার করা ব্যতীত অন্যসব কাজে লাগানো যেতে পারে। দেখুন হাতির দাঁত, মড়া মহিষের শিং ইত্যাদি দ্বারা তৈরী চিরুণী ও কঙ্কন বানানো হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা যাহরাকে হাতির দাঁতের কঙ্কন পরিয়েছেন।

১৮. এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মরা পশুর চামড়া যদি পরিপক্কভাবে সংস্কার করে নেওয়া হয়, তাহলে তা ভিজে গেলেও নাপাক হবে না। অবশ্য, যদি রোদে শুকিয়ে সংস্কার করা হয়, তবে ভিজলে তা থেকে দুর্গন্ধও বের হবে এবং নাপাকও হয়ে যাবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِىْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهٖ فَقُلْتُ اِلْبَسْ ثَوْبًا وَاَعْطِنِىْ اِزَارَكَ حَتّٰى اَغْسِلَهٗ قَالَ اِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثٰى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَبِىْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىِّ عَنْ اَبِى السَّمْحِ قَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ.

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَطِئَ اَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْاَذٰى

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪৬০।। হযরত লুবাবাহ্ বিনতে হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা[১৯] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত হোসাইন ইবনে আলী নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে ছিলেন। ইত্যবসরে তিনি হুযূরের কাপড়ে প্রস্রাব করে দিলেন।[২০] আমি আরয করলাম, "অন্য কাপড় পরে নিন। আপনার লুঙ্গীটা আমাকে দিয়ে দিন, আমি ধুয়ে দিই।" হুযূর এরশাদ করলেন, কন্যা-শিশুর প্রস্রাব ধৌত করা হয় এবং ছেলে শিশুর প্রস্রাবের কারণে পানি ঢেলে দিতে হয়।[২১] [আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ] আবূ দাউদ ও নাসা'ঈর বর্ণনায়, আবূ সাম্‌হ থেকে বর্ণিত, হুযূর এরশাদ ফরমান, কন্যা-শিশুর প্রস্রাবের কারণে ধৌত করতে হয়, আর ছেলে-শিশুর প্রস্রাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিতে হয়।[২২]

৪৬১।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন নিজ জুতো দিয়ে নাপাক বস্তু দলিত করে,

১৯. তাঁর কুনিয়াৎ (উপনাম) উম্মুল ফাদ্বল। তিনি 'আ-মের গোত্রের মহিলা। হযরত মায়মুনাহ্র সহোদরা এবং হযরত সাইয়্যেদুনা আব্বাসের স্ত্রী। হযরত আব্বাসের বেশীর ভাগ সন্তান তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিবি খাদীজার পর নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও ফাদ্বল ইবনে আব্বাসের মতো ইসলামের গৌরবময় শাহজাদাদের মা।

২০. আশিক্বগণ বলেন, নানার কোলে প্রস্রাব করা সুন্নাত-ই হোসাইন। আর নাতি (দৌহিত্র) দ্বারা নিজের কাপড়ে প্রস্রাব করানো রসূলুল্লাহ্র সুন্নাত। শোনা গেছে যে, হযরত মুজাদ্দিদে সেরহিন্দী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু ওসীয়ৎ করেছিলেন, "আমার পর আমার এক দৌহিত্র (নাতি) ভূমিষ্ঠ হবে, ওই শিশু দ্বারা আমার কবরের উপর প্রস্রাব করিয়ে নেয়া হোক। তারপর কবরকে ধুয়ে ফেলা হোক। কেননা, সমস্ত সুন্নাতের উপর আমি আমল করেছি। দৌহিত্রের মাধ্যমে প্রস্রাব করানোর সুন্নাতটি আমল করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং এ সুন্নাত আমার কবরের উপর সম্পন্ন করানো হোক।" সুবহানাল্লাহ্! ইশক্বের ফাত্ওয়া অন্য কিছুই হয়ে থাকে।

২১. কেননা, দুগ্ধপায়ী কন্যা-শিশুর প্রস্রাব ছেলে-শিশুর প্রস্রাব অপেক্ষা বেশী দুর্গন্ধময় হয়। অনুরূপ কাপড়ের উপর প্রসারিত হয় বেশী। এ কারণে মা'মূলী পানি দিয়ে তা ধৌত হয় না। ছেলে-শিশুর প্রস্রাব এর বিপরীত। এ হাদীস ইমামে আ'যমের পরিপন্থী নয়।

২২. يُرَشُّ (পানি ঢেলে বা ছিটিয়ে দেওয়া হবে) কথাটা হযরত আবূ সাম্‌হের নিজস্ব; হুযূরের ফরমান (বাণী) নয়। তিনি আপন খেয়াল অনুসারে يُنْضَحُ অর্থ করেছেন। আমি ইতোপূর্বেও আরয করেছি- نَضْح অর্থ পানি প্রবাহিত করা; পানি ছিটিয়ে দেওয়া নয়।

স্মর্তব্য যে, আবূ সাম্‌হের নাম আয়ায (اياذ)। তিনি হুযূরের আযাদকৃত গোলাম ও খাদিম। কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন, ছোট শিশুদেরকে সাধারণত পিতা সাথে রাখেন এবং সভা-মসলিসে নিয়ে যান। এ কারণে তাদের প্রস্রাব

فَاِنَّ التُّرَابَ لَه‘ طَهُوْرٌ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَلِابْنِ مَاجَةَ مَعْنَاهُ

وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ اِنِّىْ اُطِيْلُ ذَيْلِىْ وَاَمْشِىْ فِى الْمَكَانِ الْقَذِرِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُه‘ مَا بَعْدَه‘. رَوَاهُ مَالِكٌ وَاحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالدَّارِمِىُّ وَقَالَ الْمَرْأَةُ اُمُّ وَلَدٍ لِاِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ-

وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ جُلُوْدِ

তখন মাটি তার জন্য পবিত্র করার মাধ্যম।[২৩] [আবূ দাঊদ] আর ইবনে মাজাহথথর বর্ণনায় এর অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪৬২।। হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তাঁকে কোন এক মহিলা বলেছেন, "আমার আঁচল (দামন) লম্বা এবং আমি নাপাক জায়গায় চলাফেরা করি।" তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– সেটাকে পরবর্তী জমি পাক করে দেবে।[২৪] [মালিক, আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, দারেমী] এ শেষোক্ত দু'ইমাম বলেছেন, ওই মহিলা ইব্রাহীম ইবনে আবদুর রহ্মান ইবনে 'আউফের উম্মে ওয়ালাদ'।[২৫]

৪৬৩।। হযরত মিক্বদাম ইবনে মা'দীকারিব[২৬] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন হিংস্র পশুর চামড়া পরতে

ধোয়ার বিষয়টি সহজ (শিথিল) করা হয়েছে। কন্যা-শিশুরা বেশীর ভাগ সময় মায়ের কোলেই থাকে। এ কারণে শিথিল করার প্রয়োজন ছিলো না। আল্লাহ্ই সঠিক বিষয়টি সর্বাধিক জানেন।

২৩. এখানে 'নাপাক বস্তু' মানে শুষ্ক নাপাক বস্তু। অর্থাৎ যদি জুতো কিংবা চামড়ার মোজার সাথে শুষ্ক নাপাকী লেগে যায়, তবে সামনে চলার কারণে তা ছুটে যাবে। অনুরূপ, যদি ভেজা নাপাকীও জুতো ইত্যাদির সাথে লেগে শুকে যায়, তবে তাও মাটির সাথে ঘর্ষণ খেয়ে পাক হয়ে যায়; কিন্তু ভেজা নাপাকী যতক্ষণ পর্যন্ত ভেজা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘর্ষণ দ্বারা পাক হতে পারে না। অনুরূপ প্রস্রাব কিংবা মদের মতো অপবিত্র বস্তু যদি জুতো কিংবা মোজার সাথে লেগে শুকে যায়, তবে না ধুলে তা পাক হবে না। এ হাদীস সংক্ষিপ্ত। এর তাফসীল ফিক্বহের কিতাবগুলো থেকে জেনে নিন।

২৪. এ হাদীস মুহাদ্দিসগণের মতে বিশুদ্ধ (সহীহ্) নয়। কেননা, ইব্রাহীমের উম্মে ওয়ালাদ★ অপরিচিতা। উম্মতের আলিমদের এ মর্মে ইজমা' হয়েছে যে, নাপাক কাপড় ধোয়া ছাড়া পাক হতে পারে না। যেহেতু বিশুদ্ধতার গণ্ডিতেই পৌঁছে না, অনুরূপ, উম্মতের ইজমা'ও এর বিপরীত, সেহেতু এ হাদীসের ব্যাখ্যা দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। অবশ্য, হতে পারে যে, এ হাদীসে শুষ্ক অপবিত্র বস্তুর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি কাপড়ে শুকনো গোবর ইত্যাদি লেগে যায়, তবে সামনে গিয়ে তা ঝরে পৃথক হয়ে যাবে। আর কাপড় পাক হয়ে যাবে।

২৫. তাঁর নাম হুমায়দাহ্ ছিলো। তাঁর জীবন বৃত্তান্তের কিছুই জানা যায় নি।

২৬. প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী। তিনি বনী কান্দাহ্ নামক গোত্রের লোক। সিরীয়দের প্রতিনিধি দল, যাঁরা ইসলাম গ্রহণের জন্য হুযূরের মহান দরবারে হাযির হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। হামাসে বসবাস করতেন। ৮৭ হিজরীতে সিরিয়ায় ওফাত পান।

★ 'উম্মে ওয়ালাদ' হচ্ছে ওই দাসী যাকে তার মুনিব বলেছে– 'তোমার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তুমি আযাদ।'

السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ۔

وَعَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ اَنْ تُفْتَرَشَ۔

وَعَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ اَنَّهُ كَرِهَ ثَمَنَ جُلُوْدِ السِّبَاعِ. رَوَاهُ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ اَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَّا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَّ لَا عَصَبٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ۔

এবং সেটার উপর আরোহণ করতে।[২৭] [আবূ দাঊদ, নাসাঈ]

৪৬৪।। হযরত আবুল মালীহ্ ইবনে উসামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি আপন পিতা থেকে[২৮] তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযূর হিংস্র পশুর চামড়া নিষিদ্ধ করেছেন।[২৯] [আহমদ, আবূ দাঊদ, নাসাঈ] তবে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম দারেমী এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন, 'বিছানো'।

৪৬৫।। হযরত আবুল মালীহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি হিংস্র পশুর চামড়ার বিক্রিলব্ধ অর্থকে অপছন্দনীয় জানতেন।[৩০]

৪৬৬।। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উকায়ম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত,[৩১] তিনি বলেন, আমাদের নিকট রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চিঠি এসেছে। (তাতে হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন,) "তোমরা না মৃত পশুর চামড়া কাজে লাগাও, না সেটার পাছার (লেজের উদ্গমস্থল)কে।[৩২] [তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্]

---

২৭. এজন্য নয় যে, তা নাপাক; বরং এ কারণে যে, তা থেকে গর্ব-অহংকার ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। আর এ নিষেধ 'তানযীহী'। প্রাণীর চামড়ার উপর আরোহণ করা, বসা, তা দিয়ে তৈরী পুস্তীন (পোশাক বিশেষ) পরিধান করা ইত্যাদি- সবই মাকরূহ, তাক্বওয়ার পরিপন্থী।

২৮. তাঁর নাম 'আ-মের ইবনে উসামা ইবনে ওমায়র। তিনি হুযালী, শীর্ষস্থানীয় তাবে'ঈ। তাঁর পিতা উসামা সাহাবী।

২৯. এর ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সেগুলোর উপর বসতে, আরোহণ করতে এবং সেগুলো পরতে নিষেধ করেছেন। বস্তুতঃ এ নিষেধ হচ্ছে তান্যীহী।

৩০. সংস্কারের পূর্বে; কেননা, তা নাপাক। তা বিক্রি করা বৈধ নয়। অথবা সংস্কারের পরও। এমতাবস্থায় এটা আবুল মালীহের নিজস্ব অভিমত। বস্তুতঃ সমস্ত ইমামের মতে জায়েয।

এ বর্ণনা ইমাম তিরমিযীর; কিন্তু কিতাব প্রণেতা তা পান নি। এ কারণে, তিনি এখানে সাদা রেখে দিয়েছেন।

৩১. তিনি তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত। হুযূরের যমানা পেয়েছেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করতে পারেন নি। 'বাহেলা' গোত্রের লোক কিংবা 'জুহায়না' গোত্রের। হযরত ওমর ফারূক্ব, ইবনে মাস্'উদ ও হযরত হোযায়ফার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কূফায় বসবাস করতেন। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম)

৩২. কাঁচা (সংস্কারের পূর্বে) চামড়াকে আরবীতে 'ইহাব' (اهاب) বলে। আর সংস্কারকৃত চামড়াকে বলে 'জাল্দ' (جلد)। মৃত পশুর কাঁচা চামড়াও নাপাক এবং পাছা বা

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَنْ يُّسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاؤُدَ۔

وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَّجُرُّوْنَ شَاةً لَّهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهَا الْمَآءُ وَالْقَرَظُ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ۔

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ عَلٰى

৪৬৭।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মড়া পশুর চামড়া ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন- যখন সংস্কার করা হয়।[৩৩] [মালিক, আবূ দাউদ]

৪৬৮।। হযরত মায়মূনাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ক্বোরাঈশের কিছু লোক হুযূরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলো, যারা তাদের মৃত ছাগলকে গাধার মতো টানছিলো। তাদেরকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "তোমরা যদি সেটার চামড়া খুলে নিতে (তাহলে তো উত্তম হতো)।" তারা বললো, "এটা তো মড়া।"[৩৪] তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "সেটাকে পানি ও বাবলা গাছের পাতা পাক করে দেয়।"[৩৫] [আহমদ, আবূ দাউদ]

৪৬৯।। হযরত সালামাহ্ ইবনে মুহাব্বাক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনুহু[৩৬] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাবূকের যুদ্ধে[৩৭] তাশরীফ নিয়ে গেলেন

লেজের উদ্‌গমস্থলও। অর্থাৎ না সেটা কাজে লাগানো জায়েয, না সেটার ব্যবসা করা হালাল। সংস্কার ও শুকানোর পর সব কিছু জায়েয। এমনকি মড়া পশুর শিং ও ক্ষুর ইত্যাদি, যেগুলোতে প্রাণের প্রভাব থাকে না, আর যেগুলো কাটলে সেটার কষ্টও হয় না, সেগুলো কাজে লাগানো নিঃশর্তভাবে জায়েয। এটাই সমস্ত ইমামের মাযহাব (অভিমত)।

৩৩. এ বিধান 'মুবাহ্' ও 'জায়েয' নির্দেশক; 'ওয়াজিব' নির্দেশক নয়। 'মড়া পশু' মানে শূকর ও মানুষ ব্যতীত অন্যসব প্রাণী। স্মর্তব্য যে, মড়া পশুর চামড়া তো সংস্কার কৃত হলে পাক হয়ে যায়; কিন্তু যবেহকৃত প্রাণীর কাঁচা চামড়াও পাক। প্রাণী হালাল হোক কিংবা হারাম। হাদীস শরীফ একেবারে স্পষ্ট।

৩৪. তাঁদের ধারণা ছিলো যে, ক্বোরআন-ই পাকের ফরমান- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (তোমাদের উপর হারাম রা হলো মরা)-এর মধ্যে মৃত পশুর প্রত্যেক কিছুই শামিল রয়েছে; অর্থাৎ না সেটা খাওয়া জায়েয, না সেটার কোন কিছু (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) ব্যবহার করা কোনভাবে হালাল। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা সেটাকে ফেলে দেওয়ার জন্য যাচ্ছিলো। বুঝা গেলো যে, হাদীস শরীফ ছাড়া ক্বোরআন মজীদ বুঝা অসম্ভব।

৩৫. স্মর্তব্য যে, চামড়ার পবিত্রতার জন্য তা ধোয়া ফরয নয়। সুতরাং এখানে পানি দ্বারা কাচাই হলো সংস্কার; অর্থাৎ ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া। আর 'বাবলা গাছের পাতা ও ছাল দ্বারা' মানে পরিপক্ক সংস্কার। এও হতে পারে যে, পানি দ্বারা

اَهْلِ بَيْتٍ فَاِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَاَلَ الْمَآءَ فَقَالُوْا لَه' يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ دِبَاغُهَا طُهُوْرُهَا. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤدَ۔

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ اِمْرَاَةٍ مِّنْ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَنَا طَرِيْقًا اِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ اِذَا مُطِرْنَا قَالَتْ فَقَالَ اَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ هِىَ اَطْيَبُ مِنْهَا قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهٰذِهٖ بِهٰذِهٖ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤدَ۔

কোন একজনের ঘরে । সেখানে মশক লটকানো ছিলো। তিনি পানি তলব করলেন।" তারা আরয করলো, "হে আল্লাহ্র রসূল! এটা মড়া পশুর চামড়া।" হুযূর এরশাদ ফরমান, "সেটার সংস্কারই সেটার পবিত্রতা।"[৩৮] [আহমদ, আবূ দাঊদ]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪৭০।। বনী আবদুল আশ্হালের এক মহিলা থেকে বর্ণিত,[৩৯] তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের মসজিদের রাস্তা আবর্জনাময়। যখন বৃষ্টি হবে, তখন আমরা কি করবো?"[৪০] মহিলাটি বলেছেন, অতঃপর হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "এরপর কি অন্য কোন ভাল রাস্তা নেই?" আমি বললাম, "হ্যাঁ" (আছে)। হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তাহলে সেটাই এর পরিবর্তে।[৪১] [আবূ দাঊদ]

ধোয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে এবং বিধানও হবে মুস্তাহাব নির্দেশক। অর্থাৎ চামড়াকে ধুয়ে সংস্কার করা অতি উত্তম।

৩৬. তিনি একজন সাহাবী। সিরিয়ার অধিবাসী। কেউ কেউ 'মুহাব্বাক্ব' (مُحَبَّق)-এর 'বা' (ب) তে যের পড়েছেন; কিন্তু বিশুদ্ধ হচ্ছে যবর। তাঁর নিকট থেকে হযরত হাসান বসরী প্রমুখ হাদীস শরীফ রেওয়ায়ত করেছেন।

৩৭. তাবূক হচ্ছে- মদীনা মুনাওয়ারাহ্ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। তাবূকের যুদ্ধ ৯ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। এটা হুযূরের সর্বশেষ নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ।

৩৮. ওইসব লোক তাঁদের খেয়ালে ওই মশককে নাপাক মনে করে বসেছিলেন এবং সেটার পানি পান করতেন না; বরং কাদা ইত্যাদিতে ব্যবহার করতেন। হুযূর এরশাদ করেছেন, এটা সংস্কার করার ফলে পাক হয়ে গেছে। এর পানি পান করাও জায়েয।

৩৯. ওই বিবি সাহিবার না নাম জানা সম্ভব হয়েছে, না তাঁর জীবনী; কিন্তু যেহেতু মহিলাটি সাহাবী, সেহেতু এ না জানা ক্ষতিকর নয়। কেননা, সমস্ত সাহাবী 'আদিল' বা তাক্বওয়া ও মানবিক গুণাবলীর পূর্ণাঙ্গ পায়কর। তাই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। মহান রব এরশাদ ফরমায়েছেন-
وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى (এবং আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেককে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। ৪:৯৫)

৪০. অর্থাৎ শুষ্ক মৌসুমে তো ওখানে চলাফেরা করা সহজ। আর সেখানকার নাপাক বস্তু জুতোর সাথে লাগেই না। কিন্তু বৃষ্টির সময় নাপাক বস্তুগুলো জুতোতে লেগে যায়। ওই অবস্থায় জুতোগুলো কি নাপাক হবে, না পাক?

৪১. এর অর্থ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি অপবিত্র জড়বস্তু জুতোয় কিংবা চামড়ার মোজায় লেগে যায়, তবে তা শুক্‌নো মাটিতে ঘষলে পবিত্র হয়ে যায়। ওটাই এখানে বুঝানো হয়েছে। প্রস্রাবের মতো পাতলা (তরল) নাপাক বস্তুগুলো ধোয়া ছাড়া পাক হতে পারে না। অনুরূপ, জামার আস্তীন কিংবা পাজামা ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না। সুতরাং এ হাদীস স্পষ্ট। ফিক্বহ্র মাস্আলা এর পরিপন্থী নয়।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطِئِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ-

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكُوْنُوا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ-

وَعَنِ الْبَرَآءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا بَاْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهٗ وَفِىْ رِوَايَةِ جَابِرٍ مَا اُكِلَ لَحْمُهٗ فَلَا بَاْسَ بِبَوْلِهٖ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارُ قُطْنِىُّ-

৪৭১।। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায পড়তাম এবং খোলা পায়ে চলার কারণে ওযূ করতাম না।"[৪২] [তিরমিযী]

৪৭২।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় বহু কুকুর মসজিদে আনাগোনা করতো; কিন্তু সাহাবীগণ ওই কারণে মসজিদ ধুতেন না।[৪৩] [বোখারী]

৪৭৩।। হযরত বারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "ওই পশুর প্রস্রাবে কোন ক্ষতি নেই, যার গোশ্‌ত খাওয়া যায়।" আর হযরত জাবিরের বর্ণনায় আছে যে, যার গোশ্‌ত খাওয়া যায় সেটার প্রস্রাবে কোন ক্ষতি নেই।[৪৪] [আহমদ, দারু কুত্বনী]

৪২. এর দু'টি অর্থ হতে পারেঃ

এক. পাগুলোই ধুতেন না; কেননা, তাতে নাপাক বস্তু লাগে নি। শুধু খোলা পায়ে চলাফেরা করা, তাতে শুধু ধূলিবালি লেগে গেলে তা নাপাক হয় না।

দুই. যদি পাগুলো নাপাকও হয়ে যেতো, তবে শুধু পা ধুয়ে নিতেন; ওযূ করতেন না। কেননা, ওযূ ভঙ্গ হয় হাদস (পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়া ইত্যাদি)-এর কারণে; বাহ্যিকভাবে কোন অঙ্গে নাপাক বস্তু লেগে যাবার কারণে নয়।

৪৩. এ হাদীসের ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, কুকুর মসজিদে আনাগোনা করলে মসজিদের মেঝে নাপাক হবে না। অবশ্য, কুকুরের মুখের লালা নাপাক। কিংবা কুকুর নাপাক পানিতে ভিজলে, তবে তো সেটার দেহ নাপাক হবেই। স্মর্তব্য যে, এ হাদীসে ইসলামের প্রাথমিক অবস্থাদির উল্লেখ করা হয়েছে; যখন মসজিদে নবভী শরীফে না দরজা ছিলো, না অন্য কোন অন্তরাল; না মসজিদের প্রতি সম্মান দেখানোর এতো কঠোর বিধান ছিলো। অতঃপর মসজিদে দরজাও লাগানো হয়েছে, কুকুর তো দূরের কথা, ওখানে অবুঝ শিশুকে নিয়ে আসা, নাপাক কাপড় পরে আসা, এমনকি যার শরীর থেকে দুর্গন্ধ আসছিলো কিংবা যে কাঁচা পিঁয়াজ ও রসুন খেয়েছে কিংবা মুখে দুর্গন্ধ থাকে– তার প্রবেশ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন– 'মসজিদগুলোর বিধান' শীর্ষক অধ্যায়ে এ ধরনের বহু হাদীস আসবে। সুতরাং এ-ই হাদীস দেখে এখন মসজিদগুলো খোলা রেখে দেওয়া কিংবা সেখানে যে কোন অপরিচ্ছন্ন বা নাপাককে আসতে দেওয়া দুরস্ত নয়। অবশ্য বিধান তো এ-ই যে, যদি ঘটনাচক্রে মসজিদে এমন কুকুর ঢুকে পড়ে যার দেহে তরল নাপাক বস্তু না থাকে, তবে মসজিদ ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব নয়।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَاَلْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ

অধ্যায় ঃ মোজার উপর মসেহ করা[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৪৭৪।। হযরত শুরাইহ্ ইবনে হানী[২] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব থেকে দু'মোজার উপর মসেহ করার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম।[৩] তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত

৪৪. অর্থাৎ হালাল পশুর প্রস্রাব পাক। এ হাদীসের ভিত্তিতে কোন কোন আলিম হালাল পশুর প্রস্রাবকে পাক বলে ধারণা করেছেন; কিন্তু আমাদের ইমাম সাহেবের মতে, তা নাপাক। তাঁর দলীল হচ্ছে- ওইসব হাদীস, যেগুলো 'আযাব-ই কবর' শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। হুযূর এরশাদ করেছেন- "প্রস্রাবের ছিটকে থেকে বাঁচতে থাকো। কারণ, সাধারণতঃ কবরের আযাব তা থেকে হয়।" তদুপরি, যার কবরের উপর খেজুরের তাজা শাখা পুঁতে দিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে এরশাদ করেছিলেন, "সে উটের রাখাল ছিলো।" এতে 'ক্ষতি' (حَرَج) মানে জঘন্য ক্ষতি। অর্থাৎ হারাম জানোয়ারের প্রস্রাব যেমন 'নাজাসাতে গালীযাহ্' (ঘাঢ় জঘন্য নাপাক), তেমনি এক দিরহামের সমান জায়গায় লেগে গেলে কাপড় নাপাক হয়ে যায়, হালাল জানোয়ারগুলোর প্রস্রাব তেমনি নয়; বরং তা 'নাজাসাতে খফীফাহ্' (হালকা নাপাকী), কাপড়ের এক চতুর্থাংশ পরিমাণে লাগলে কাপড় নাপাক হবে। সুতরাং এ হাদীস ইমাম-ই আ'যমের পরিপন্থী নয়।

বাকী রইলো 'ওরায়নাহ্বাসী সম্পর্কিত হাদীস; যাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উটের প্রস্রাব পান করার অনুমতি দিয়েছেন। এর বিশ্লেষণ ওই হাদীসের আলোকে করা হবে, ইন্শা-আল্লাহ্। এখানে শুধু এতটুকু আরয করছি যে, অতিমাত্রায় প্রয়োজনের সময় ঔষধ হিসেবে হারাম জিনিষ ব্যবহার করা বৈধ।

****

১. যেহেতু ওযূ হচ্ছে كل বা পূর্ণাঙ্গ দেহ স্বরূপ আর 'মসেহ' হচ্ছে جز বা একটি অঙ্গ স্বরূপ; তদুপরি, মোজার উপর মসেহ করা পদযুগল ধোয়ার স্থলাভিষিক্ত, সেহেতু এ অধ্যায় ওযূর বিবরণের পরে উল্লেখ করেছেন।

স্মর্তব্য যে, মসেহ মোজার উপর হয়, মোজার মধ্যে নয়, অনুরূপ, চামড়ার মোজার উপরই মসেহ হবে; পাতলা কাপড়ের অথবা সুতার মোজার উপর করা যাবে না। এ কারণে কিতাব-প্রণেতা على (উপর) এবং خفين (চামড়ার মোজাযুগল) লিখেছেন।

স্মরণ রাখা দরকার যে, মোজার উপর মসেহ ইঙ্গিতে ক্বোরআন শরীফ থেকে আর প্রকাশ্যভাবে অগণিত হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয়। সুতরাং এর অস্বীকার করা পথ ভ্রষ্টতাই। হযরত আনাসকে জিজ্ঞাসা করা হলো- আহলে সুন্নাত-এর 'আলামত' (চিহ্ন) কি? তিনি বললেন-

تَفْضِيلُ الشَّيْخَيْنِ وَحُبُّ الْخَتَنَيْنِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

(অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্বকে প্রাধান্য দেওয়া, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুমাকে ভালবাসা এবং দু'মোজার উপর মসেহ করা।)

খাজা হাসান বসরী বলেন, "আমি সত্তরজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। সবাই মোজার উপর মসেহ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।"

ইমাম করখী বলেন, "মসেহকে অস্বীকারকারী কাফির হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, মোজার উপর মসেহ করা মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ (প্রত্যেক যুগে অগণিত বর্ণনাকারীর হাদীসসমূহ) দ্বারা প্রমাণিত।"

স্মর্তব্য যে, হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা প্রথমে এ মসেহের কথা অস্বীকার করেছিলেন। তারপর সমস্ত সাহাবীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ও মসেহের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর 'মোজার উপর মসেহ করা থেকে আমার পা দু'টু কেটে যাওয়া উত্তম' বলে হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা থেকে যা কথিত আছে তা নিছক ভুল ও বানোয়াট।

لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّه، غَزَامَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوْكَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَه، اِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ اَخَذْتُ اُهْرِيْقُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَه، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوْفٍ ذَهَبَ يُحْسَرُ عَنْ ذَارَعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَاَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ

এবং মুক্বীম (মুসাফির নয় এমন লোক)-এর জন্য এক দিন এক রাত সাব্যস্ত করেছেন।[৪] [মুসলিম]

৪৭৫।। হযরত মুগীরাহ্ ইবনে শো'বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাবূকের যুদ্ধে শরীক হন। হযরত মুগীরাহ্ বলেন, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের পূর্বে শৌচাগারে যান। আমি হুযূরের সাথে একটা পাত্র নিয়ে গেলাম।[৫] হুযূর যখন ফিরে আসলেন, তখন হুযূরের হাত মুবারকের উপর পাত্র থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। হুযূর আপন হাত ও মুখ ধু'লেন।[৬] হুযূরের পরনে উলের জুব্বা ছিলো। তিনি তা কুনুই থেকে উপরে উঠাতে লাগলেন। কিন্তু জুব্বার আস্তীন সংকীর্ণ ছিলো।[৭] তখন তিনি আপন হাত শরীফ

২. তিনি তাবে'ঈ। হুযূরের যমানা শরীফে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা হানী সাহাবী। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কুনিয়াৎ (উপনাম) রেখেছেন 'আবূ শুরাইহ্'। হযরত আলী মুরত্বাদ্বার বিশেষ সাথীদের অন্যতম।

৩. প্রকাশ থাকে যে, তাঁর প্রশ্ন মসেহের মেয়াদকাল সম্পর্কে ছিলো; নিয়ম বা পদ্ধতি সম্পর্কে কিংবা মসেহের পক্ষে দলীলাদি সম্পর্কেও ছিলো না। জবাব থেকে তেমনি প্রকাশ পায়।

৪. অর্থাৎ মুসাফির সফররত অবস্থায় একবার মোজা পরে ধারাবাহিকভাবে তিনদিন তিনরাত যাবৎ মসহে করতে পারে; আর মুক্বীম (মুসাফির নয় এমন লোক) করতে পারবে একদিন একরাত যাবৎ।

এ থেকে কয়েকটা মাস্'আলা প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিধানাবলীর মালিক। কারণ, হযরত আলী মুরতাদ্বা এ মেয়াদকাল নির্দ্ধারণকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।

দুই. এ সময়সীমাগুলো তাদেরই জন্য প্রযোজ্য, যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক অবস্থার উপর থাকে। অর্থাৎ যেমন পরার সময়ও মুক্বীম থাকে, শেষ পর্যন্তও মুক্বীম থাকে। যদি পরার সময় তো মুক্বীম ছিলো, কিন্তু মেয়াদকাল শেষ হবার পূর্বে মুসাফির হয়ে গেলো, তখন মুসাফিরের মেয়াদকাল পূরণ করবে। অনুরূপ মুসাফির যদি মুক্বীম হয়ে যায়, তবে মুক্বীম-এর মেয়াদকাল পূরণ করবে।

তিন. মসেহের মেয়াদকাল 'হাদস' (ওযূ ইত্যাদি ভঙ্গ হওয়া)-এর সময় থেকে আরম্ভ হবে, মোজা পরার সময় থেকেও নয়; মসেহের সময় থেকেও নয়।

চার. শরীয়তের পরিভাষায় মুসাফির হচ্ছে– সে-ই, যে তিন দিনের রাস্তায় সফর করে। এর কম সফরের কারণে মুসাফির হবে না। অন্যথায় একদিনের দূরত্বের মুসাফির এ (শেষোক্ত) হাদীস অনুসারে আমল করতে পারতো না। অথচ হাদীস সব ধরনের মুসাফিরের জন্য ব্যাপক। এর বিস্তারিত আলোচনা আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' ঃ ২য় খণ্ডে দেখুন।

৫. যাতে হুযূর পানি দ্বারা শৌচকর্ম ও ওযূ সম্পন্ন করেন। বুঝা গেলো যে, বুযুর্গদের খিদমতের জন্য হাযির থাকা এবং নির্দেশ না দিলেও খিদমতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া সাহাবা-ই

تـحـتِ الـجُبَّةِ وَاَلْقَـى الْجُبَّةَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِنَا صِيَتِهٖ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ اَهْوَيْتُ لِاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَاِنِّىْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ

জুব্বার নিম্নভাগ দিয়ে বের করলেন এবং জুব্বা আপন কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিলেন।[৮] কুনুই পর্যন্ত হাত ধু'লেন। তারপর কপাল ও পাগড়ীর উপর মসেহ করলেন।[৯] তারপর আমি হুযূরের মোজা দু'টি খুলে নেয়ার ইচ্ছা করলাম। হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "ওগুলো থাকতে দাও। কেননা, আমি ওইগুলো পবিত্রাবস্থায় পরেছি।"[১০] অতঃপর তিনি ওই দু'টির উপর মসেহ করে নিলেন। অতঃপর তিনি আরোহণ করলেন এবং আমিও। আমরা লোকজনের নিকট পৌঁছলাম, যারা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।

কেরামের সুন্নাত। আর নামাযের জন্য নামাযের সময় আসার পূর্বে প্রস্তুতি নেওয়াও সুন্নাত।

৬. এ থেকে কয়েকটা মাসআলা প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. ওযূ করার ক্ষেত্রে অন্য কারো সাহায্য নেওয়া সুন্নাত, অর্থাৎ হুযূরের পবিত্র আমল থেকে প্রমাণিত।

দুই. বুযুর্গদেরকে এভাবে ওযূ করানো যে, লোটা (পানির পাত্র) খাদেমের হাতে থাকবে, সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাত। স্মর্তব্য যে, এখানে কুল্লি ও নাকে পানি দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি; কেননা, এ দু'টি 'চেহারা'র বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

৭. পশমী এবং পশম বা উলের পোশাক পরা সম্মানিত সূফীদের তরীক্বা। এ কারণে তাঁদেরকে 'সূফী' বলা হয় (অর্থাৎ صوف বা পশমী পোশাক বিশিষ্ট)। এর দলীল হচ্ছে এ-ই হাদীস।

হুযূরের আস্তীন খুব প্রশস্ত হতো। এ সংকীর্ণ আস্তীন বিশিষ্ট জুব্বা মুবারক হয়তো কোন জিহাদে গণীমত হিসেবে এসেছিলো। এখানে 'মিরক্বাত' প্রণেতা মহোদয় লিখেছেন, "এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, কাফিরদের বুননকৃত কাপড় এবং অন্য দেশের নিয়মে তৈরীকৃত পোশাক পরা জায়েয। ওইসব কাপড় নাপাক বলে শুধুশুধু সন্দেহ করো না। অবশ্য হযরত ওমর ফারূক্ব 'হায়রা'র পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন। আর এর কারণও এ ছিলো যে, শোনা গেছে যে, তারা কাপড় প্রস্রাব দ্বারা ধৌত করে। হযরত উবাই ইবনে কা'ব আরয করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এ জোড়া কাপড় আমরাও পরেছি, হুযূরও পরেছেন। তখন তিনি (হযরত ওমর) নিজ হুকুম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সুতরাং অন্য জাতির পোশাক পরা জায়েয, এ শর্তে যে, যদি তা কাফির ও ফাসিক্বদের বিশেষ আলামত না হয়।

৮. নিচে জামা এবং লুঙ্গিও ছিলো। অন্যথায় পর্দাহীনতা হতো। এ থেকে বুঝা গেলো যে, একই সময়ে জামা, আচকান (শেরোয়ানী) ইত্যাদি কয়েকটা কাপড় পরা জায়েয।

৯. 'কপাল' মানে 'মাথার সম্মুখভাগের এক চতুর্থাংশ'। এটা সাধারণত কপালের সমমাপেরই হয়ে থাকে।

স্মর্তব্য যে, হুযূর সর্বদা পূর্ণ শির মুবারকের মসেহ করতেন। মাথার এক চতুর্থাংশ মসেহ করার বিষয়টি এ হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত। এটা ফরয আর ওটা সুন্নাত।

সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পাগড়ী শরীফের উপর মসেহ করেন নি; বরং তা ধরে রেখেছিলেন, যাতে পড়ে না যায়। হযরত মুগীরাহ্ সেটাকে মসেহ মনে করেছিলেন। সুতরাং এ হাদীস হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীসের পরিপন্থী নয়। তিনি বলেছেন, পাগড়ীর উপর মসেহ করা জায়েয নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না হাত মাথার উপর বুলাবে। [মিরক্বাত]

১০. অর্থাৎ প্রথমে ওযূ করেছি, তারপর মোজা পরেছি। স্মর্তব্য যে, যদি কেউ প্রথমে পা দু'টি ধুয়ে মোজা পরে নেয়, তারপর ওযূর অন্যান্য অঙ্গ ধৌত করে, তবেও জায়েয। এ হাদীস শরীফ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন– মোজা পরার সময় আমার পদযুগল পাক ছিলো; একথা এরশাদ ফরমান নি, "আমি ওযূ সহকারে ছিলাম।"

وَيُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا اَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَاَخَّرُ فَاَوْمٰى اِلَيْهِ فَاَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مَعَهٗ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ مَعَهٗ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِيْ سَبَقَتْنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ ◆ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةَ

তাঁদেরকে হযরত আবদুর রাহমান ইবনে 'আউফ নামায পড়াচ্ছিলেন। এক রাক্'আত পড়িয়ে নিয়েছিলেন।[১১] যখন তিনি হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমন অনুভব করতে পারলেন, তখন পেছনে সরে আসতে লাগলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইশারা করলেন।[১২] হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে এক রাক'আত পেয়েছেন। যখন তিনি সালাম ফেরালেন, তখন হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। আমিও হুযূরের সাথে দাঁড়ালাম। যে-ই রাক্'আত বাকী ছিলো তা আমরা পড়ে নিলাম।[১৩] [মুসলিম]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪৭৬।। হযরত আবূ বাকারাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত,[১৪] তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর 'মুসাফিরকে তিনদিন

---

১১. এটা এজন্য হয়েছে যে, সাহাবা-ই কেরামের দলটির মনে এ ধারণা হচ্ছিলো যে, হুযূর অন্য কোথাও হয়তো নামায পড়ে নিয়েছেন; কেননা, সরকার-ই মদীনা তাঁদের থেকে দূরে ছিলেন এবং অবস্থাও সফরের মতো ছিলো।

অন্যথায় সাহাবীগণ হুযূর ছাড়া নামায পড়তেন না; যদিও সময় সংকীর্ণ হতো। অনেক বর্ণনায় এমনি উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. 'পেছনে সরে এসো না! নামায পড়াতে থাকো।'

এ থেকে কয়েকটা মাস্'আলা প্রতীয়মান হয়–

এক. সাহাবা-ই কেরাম মূল নামাযের অবস্থায় হুযূরের পা মুবারকের শব্দেরও খেয়াল রাখতেন।

দুই. সাহাবা-ই কেরাম নামাযের মধ্যে হুযূরের প্রতি আদব করতেন। এ কারণে তাঁদের নামাযের ক্ষতি হতো না; বরং পূর্ণতা হয়ে যেতো।

তিন. যদি নামাযের জামা'আত চলাকালেই হুযূর তাশরীফ নিয়ে আসতেন, তখনকার ইমামের ইমামত বাতিল হয়ে যেতো। আর তখন থেকে হুযূরই ইমাম হতেন। অন্যথায় হযরত আবদুর রহমান পেছনে সরে আসার চেষ্টা করতেন না।

চার. ওই ইমামকে যদি হুযূর ইমামত করার নির্দেশ দিতেন তবে হুযূরের প্রতিনিধি (স্থলাভিষিক্ত) হয়ে তিনি ইমামত করতেন।

পাঁচ. অধিকতর বেশী মর্যাদাবান ব্যক্তির নামায অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাবান লোকের পেছনে জায়েয।

স্মর্তব্য যে, হুযূর শুধু এ এক রাক্'আত অন্য ইমামের পেছনে পড়েছেন। অন্যসব নামায-ই নিজে পড়িয়েছেন। কারো পেছনে পড়েন নি। এমন ঘটনা হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবরের সাথেও ঘটেছিলো। হুযূর তাঁকে ইমাম হিসেবে স্থির থাকার জন্য ইঙ্গিত করেছিলেন, কিন্তু সিদ্দীক্ব-ই আকবর তা করেন নি এবং মুক্তাদী হয়ে গিয়েছিলেন। তা সিদ্দীক্ব-ই আকবরের আদব প্রদর্শন ছিলো। আর এখানে হযরত আবদুর রহমানের হুযূরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ই আল্লাহ্র নিকট প্রিয় কাজ, তবে সিদ্দীক্ব তো সিদ্দীক্বই।

اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً اِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ اَنْ يَّمْسَحَ عَلَيْهِمَا. رَوَاهُ الْاَثْرَمُ فِىْ سُنَنِهٖ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارُقُطْنِىُّ وَقَالَ الْخَطَّابِىُّ هُوَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ هٰكَذَا فِى الْمُنْتَقٰى۔

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفْرًا اَنْ لَّاَنَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهِنَّ اِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلٰكِنْ مِّنْ غَآئِطٍ وَّبَوْلٍ وَّ نَوْمٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَآئِىُّ۔

তিনরাত পর্যন্ত এবং 'মুক্বীম'কে একদিন একরাত পর্যন্ত মোজার উপর মসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন; যখন পাক-পবিত্র হয়ে (মোজাগুলো) পরবে।[১৫] [আস্‌রাম তাঁর 'সুনান'-এ ইবনে খোযায়মাহ্ ও দারু-কুত্বনী এবং খাত্তাবী বলছেন, এ হাদীস শরীফ বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট। 'মুন্তক্বা'র মধ্যেও এমনি রয়েছে।[১৬]

৪৭৭।। হযরত সাফ্‌ওয়ান ইবনে 'আস্‌সাল[১৭] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনুহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিতেন– যখন আমরা সফরে থাকি তখন যেনো আমরা তিনদিন তিনরাত যাবৎ মোজা না খুলি।[১৮] কিন্তু 'জানাবাত' (গোসল ওয়াজিব হওয়া)'র কারণে; কিন্তু পায়খানা-প্রস্রাব ও নিদ্রার কারণে, (যেনো মোজা না খুলি)।[১৯] [তিরমিযী, নাসাঈ]

১৩. এ থেকে বুঝা গেলো যে, 'মাসবূক্ব' (যে মুক্বতাদী জামাতের শুরুতে কোন রাক্'আত পায়নি) তার অবশিষ্ট রাক্'আত সম্পন্ন করার জন্য ইমাম দু'দিকে সালাম ফেরানোর পর দাঁড়াবে। فَلَمَّا سَلَّمَ (যখন ইমাম সালাম ফেরালেন) থেকে এমনি প্রতীয়মান হয়।

১৪. তাঁর নাম শরীফ নুফা'। তিনি সাক্বীফ গোত্রের লোক। প্রসিদ্ধ সাহাবী। তায়েফের যুদ্ধের সময় ঈমান আনেন। শেষ বয়সে তিনি বসরায় বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানেই ৪৯ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন।

১৫. এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা ও অনুমিত মাসআলাদি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ আলিমদের অভিমত এ যে, মুসাফির তিনদিন অপেক্ষা বেশী এবং মুক্বীম একদিনের বেশী মসেহ করতে পারে না। অবশ্য হানাফী মাযহাবের ইমামদের মতে, এ সময়সীমা 'হাদস্' (ওযূ ভঙ্গের সময়) থেকে আরম্ভ হবে।

১৬. 'মুন্তাক্বা' হচ্ছে ইবনে তাইমিয়া হাম্বলীর কিতাব। [মিরক্বাত] শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রামহাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, এটা খাত্তাবী'র লেখা।

১৭. প্রসিদ্ধ সাহাবী। 'বনী মুরাদ' নামক গোত্রের লোক। কূফায় বসবাস করেন। হুযূরের সাথে বারোটি যুদ্ধে শরীক হন।

১৮. এটা অনুমতি নির্দেশক হুকুম; ওয়াজিব নির্দেশক নয়। কেননা, মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত যাবৎ মসেহ করা জায়েয।

১৯. অর্থাৎ 'ছোটতর হাদস' (ওযূ ভঙ্গ হওয়া)'র ক্ষেত্রে মোজার উপর মসেহ করা দুরস্ত, বড়তর হাদস' (গোসল ওয়াজিব হওয়া)'র না জায়েয। গোসলের মধ্যে পা দু'টি ধোয়াও ফরয।

এ বচনে আজব ধরনের মজার বিষয় রয়েছে– اِلَّا পদটি نَفْى (অস্বীকৃতি) ভেঙ্গে ثُبُوت (স্বীকৃতি) প্রতিষ্ঠা করেছে। তারপর لٰكِنْ (কিন্তু) اِلَّا -এর ثُبُوت (স্বীকৃতি) ভঙ্গ করে نَفْى (অস্বীকৃতি) সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে 'নাহ্ভ' (আরবী ব্যাকরণ) বেত্তাগণ তুমুল বা চুলচেরা আলোচনা করেছেন।

وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفِّ وَاَسْفَلِهِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ مَعْلُوْلٌ وَسَاَلْتُ اَبَازُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَا لَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَكَذَا ضَعَّفَهُ اَبُوْ دَاوُدَ-

وَعَنْهُ اَنَّهُ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ-

وَعَنْهُ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ-

৪৭৮।। হযরত মুগীরাহ্ ইবনে শো'বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবূকের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওযূ করিয়েছি। তখন তিনি মোজার উপরে-নিচে মসেহ করেছেন।[২০] [আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্] অবশ্য, ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীস 'ব্যধিগ্রস্ত' (معلول)। আমি আবূ যার'আহ্ ও মুহাম্মদ অর্থাৎ ইমাম বোখারীকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তখন এ বুযুর্গদ্বয় বলেছেন, "সেটা সহীহ্ নয়।" তেমনিভাবে ইমাম আবূ দাউদও এটাকে 'দুর্বল' সাব্যস্ত করেছেন।[২১]

৪৭৯।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি মোজা যুগলের উপরিভাগে মসেহ করতেন।[২২] [তিরমিযী, আবূ দাউদ]

৪৮০।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওযূ করেছেন এবং মোজাযুগল ও সেণ্ডেলযুগলের উপর মসেহ করেছেন।[২৩] [আহমদ, তিরমিযী', আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্]

---

২০. এ হাদীস দুর্বল এবং ওইসব হাদীসের পরিপন্থী, যেগুলোতে শুধু উপরিভাগে মসেহ করার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং আমল করার উপযোগী নয়। মসেহ মোজার শুধু উপরিভাগে করা হবে, নিম্নভাগে নয়। যেমন- পরবর্তী হাদীসে আসছে। এটাই আমাদের ইমাম সাহেবের মাযহাব। আর হতে পারে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের পা-মুবারকের নিম্নভাগ অপর হাতে ধরে তুলছেন, আর ডান হাতে উপরিভাগে মসেহ করেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী মনে করেছেন যে, তিনি নিচেও মসেহ করেছিলেন।

২১. এ হাদীসের দুর্বলতার দু'টি কারণ রয়েছে–

এক. এর 'সনদ' (সূত্র) হযরত মুগীরাহ্ পর্যন্ত পৌছে নি; বরং সেটার বর্ণনাকারী হলেন 'ওয়াররাদ'। অর্থাৎ হযরত মুগীরার গোলাম।

দুই. এর সনদের মধ্যে সাওর ইবনে ইয়াযীদ এবং রাজা ইবনে হাইওয়াহ্র মতো বর্ণনাকারীও রয়েছেন। সাওরের সাক্ষাৎ রাজার সাথে প্রমাণিত হয় নি।

অনুরূপ, এ হাদীস হযরত মুগীরার ওই বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী, যাতে শুধু উপরিভাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং হাদীসে اضطراب (স্ববিরোধিতা)ও রয়েছে।

২২. এ হাদীস শরীফ বিশুদ্ধও, মুত্তাসিলও। এতে শুধু

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ مَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَسِيْتَ قَالَ بَلْ اَنْتَ نَسِيْتَ بِهٰذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤُدَ۔

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ اَسْفَلُ الْخُفِّ اَوْلٰى بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلَاهُ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالدَّارِمِىُّ مَعْنَاهُ۔

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪৮১।। হযরত মুগীরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মোজার উপর মসেহ করেছেন। আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "বরং তুমি ভুলে গেছো। আমাকে আমার মহামহিম রব এরই নির্দেশ দিয়েছেন।"[২৪] [আহমদ, আবূ দাঊদ]

৪৮২।। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দ্বীন-ধর্ম যদি মনগড়া হতো, তবে মোজার নিম্নভাগে মসেহ করা উপরিভাগে মসেহ করা অপেক্ষা উত্তম হতো। আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি- তিনি মোজা দু'টির উপরিভাগে মসেহ করেছিলেন।[২৫] [আবূ দাঊদ] ইমাম দারেমী এর অর্থটুকু বর্ণনা করেছেন।

মোজার উপরিভাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; নিম্নভাগের নেই। আমাদের ইমাম-ই আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হির অভিমত এটাই।

২৩. উলের কিংবা সূতার মোজাকে جراب (জোরাব) বলা হয়। এর উপর তিন অবস্থায় মসেহ করা জায়েয ঃ

এক. খুব মোটা হলে, যা বাঁধন ছাড়াই গোছার উপর লেগে থাকে; চলাফেরার সময় ঢলে পড়ে না।

দুই. সেটার শুধু তলায় চামড়া সেলাই করা হলে, যাকে 'মুনা'আল' (منعّل) বলা হয়।

তিন. যার পায়ের পিঠের উপরও চামড়া সেলাই করা হয়েছে, যাকে 'মুজাল্লাদ' (مجلد) বলা হয়।

এখানে প্রথম প্রকারের 'মোজা' বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মোটা মোজাযুগল। সূতোর মোজা হচ্ছে- যা চামড়ার মোজার উপরিভাগে, সেটার সংরক্ষণের জন্য পরা হয় অবশ্য যদি এটা (সূতোর মোজাযুগল) এতোই পাতলা হয় যে, মসেহের আর্দ্রতা এর নিম্নভাগের চামড়ার মোজা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তা হলে সেটার উপর মসেহ করা জায়েয; অন্যথায় নয়।

২৪. যেহেতু হযরত মুগীরাহ্ ইতোপূর্বে মোজার মসেহ দেখেন নি, সেহেতু এ প্রশ্ন করেছেন, বস্তুতঃ বুযুর্গদের প্রতি ভুলের সম্পর্ক নির্ণয় করা নিজেরই ভুল। এ কারণে, হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন, "তুমি আদবের পদ্ধতি ভুলে গেছো।"

এ হাদীস শরীফের শেষ বাক্য থেকে বুঝা যায় যে, মোজার উপর মসেহ ক্বোরআন শরীফ থেকেও প্রমাণিত। কেননা, وَاَرْجُلِكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ (৫:৬)-এর মধ্যে একটি ক্বিরআত اَرْجُلِ -এর 'লাম' (ل)-এ 'যের'-ও রয়েছে। সাধারণ ক্বির'আত হচ্ছে فتح (যবর) সহকারে। অর্থ এ-ই দাঁড়ালো যে, 'মোজা পরিহিত হলে মসেহ করো, আর না পরে থাকলে ধুয়ে নাও।'

এটাও হতে পারে যে, এখানে 'আল্লাহ্র নির্দেশ' মানে 'ওহী-ই খাফী' (গোপন ওহী)।

২৫. এ থেকে দু'টি মাস্'আলা বুঝা গেলো-

بَابُ التَّيَمُّمِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلٰثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلٰٓئِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا اَوْ جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَآءَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অধ্যায় ঃ তায়াম্মুম[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৪৮৩।। হযরত হুযায়ফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আমাদেরকে অন্যান্য লোকের উপর তিনটি জিনিস দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে[২]– আমাদের কাতারগুলোকে ফিরিশ্তাদের কাতারের মতো করা হয়েছে,[৩] আমাদের জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ বানানো হয়েছে[৪] এবং যখন পানি না পাই, তখন সেটার মাটিকে পবিত্রকারী করে দেওয়া হয়েছে।[৫] [মুসলিম]

এক. মোজার শুধু পিঠের উপর মসেহ হবে, তলদেশের উপর নয়। এমনি বলেছেন আমাদের ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু।

দুই. যদি যুক্তি শরীয়তের নির্দেশের বিপক্ষে যায়, তবে যুক্তি প্রত্যাখ্যাত এবং শরীয়তের নির্দেশ হবে গ্রহণযোগ্য। দেখুন, হযরত আলীর বিবেক ও যুক্তি বলছিলো যে, মোজার তলদেশে মসেহ হওয়া চাই। কারণ মাটিতে ওই অংশটিই লেগে থাকে। অপবিত্র বস্তুর সেটাই নিকটবর্তী থাকে; কিন্তু শরীয়তের নির্দেশের মোকাবেলায় তিনি নিজের অভিমত বর্জন করেছেন।

ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেছেন, যদি দ্বীন মনগড়া কিছু হতো, তা হলে আমি প্রস্রাব করার পর গোসল ওয়াজিব বলতাম আর বীর্যপাত হলে বলতাম ওযূ করতে। কেননা,প্রস্রাব সর্বসম্মতভাবে নাপাক; কিন্তু বীর্য কারো কারো মতে পাক। আর আমি কন্যাকে দিতাম পুত্রের দ্বিগুণ মীরাস বা ত্যাজ্য সম্পত্তি। কেননা, কন্যা দুর্বল। [মিরক্বাত]

****

১. 'তায়াম্মুম' (تَيَمُّم) অভিধানে 'ইচ্ছা'কে বলা হয়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন– وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ (এবং তোমরা তা থেকে অপবিত্রের প্রতি ইচ্ছা করো না; ২:২৬৭) শরীয়তের পরিভাষায়, পবিত্রতার নিয়্যত সহকারে মাটির উপর দু'বার হাত মেরে চেহারা ও দু'হাতের উপর বুলিয়ে নেওয়াকে 'তায়াম্মুম' বলা হয়।

'তায়াম্মুম' 'জানাবত'-এর কারণেও করা যায় এবং ওযূ ভঙ্গ হলেও। উভয়ের পদ্ধতিও একটি; শুধু নিয়্যতের মধ্যে পার্থক্য।

'তায়াম্মুম' শুধু মাটি ও মাটির জাতি দ্বারা হতে পারে। 'মাটির জাতি' হচ্ছে– যা মাটি থেকে পয়দা হয়; না আগুনে গলে যায়, না জ্বলে ছাই হয়ে যায়। এর মাসআলাদি ফিক্বহ শাস্ত্রে দেখুন।

২. অর্থাৎ ওই তিনটি জিনিস হচ্ছে ওইগুলো, যেগুলো আমরা মুসলিম উম্মাহ-ই লাভ করেছি। আমরা ব্যতীত অন্য কেউই তন্মধ্যে একটাও পায় নি।

স্মর্তব্য যে, এ 'তিন' সংখ্যাটি সীমাবদ্ধ করার জন্য নয়। কেননা, এ উম্মতের এ তিনটি ছাড়াও আরো বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

৩. অর্থাৎ নামাযীদের কাতারগুলো নামাযের মধ্যে এবং যোদ্ধাদের কাতারগুলো জিহাদের ময়দানে তেমনই উঁচু মানের ও উৎকৃষ্ট, যেমন আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য ফিরিশ্তাদের কাতারগুলো আল্লাহ্র দরবারে ইবাদতের সময়।

৪. অর্থাৎ প্রত্যেকটি জায়গায় নামায হতে পারে। পূর্ববর্তী উম্মতের নামাযগুলো শুধু তাদের ইবাদতখানাগুলোতেই হতে পারতো।

'ভূ-পৃষ্ঠ' (যমীন)-এর মধ্যে পাহাড়, সামুদ্রিক ও উড়োজাহাজ

وَعَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِىْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلٰوتِهٖ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَّمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ اَنْ تُصَلِّىَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ اَصَابَتْنِىْ جَنَابَةٌ وَلَا مَآءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهٗ يَكْفِيْكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ

৪৮৪।। হযরত ইমরান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি লোকাদেরকে নামায পড়িয়েছেন। যখন নামায সমাপ্ত করলেন, তখন একজন লোককে দেখতে পেলেন- সে আলাদা ছিলো, অন্যান্য লোকের সাথে নামায পড়ে নি। হুযূর এরশাদ করলেন, "ওহে অমুক! কোন্ বিষয়টি তোমাকে অন্যান্য লোকের সাথে নামায পড়তে বাধা দিলো?"[৬] লোকটি আরয করলো, "আমি জনাবতগ্রস্ত হয়েছি, পানিও নেই।" হুযূর এরশাদ করলেন, "তোমার জন্য মাটি রয়েছে।[৭] তা তোমার জন্য যথেষ্ট।"[৮] [মুসলিম, বোখারী]

৪৮৫।। হযরত 'আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট আসলেন। আর বললেন, "আমি জুনুবী হয়ে যাই এবং

ইত্যাদি সবই রয়েছে।

স্মর্তব্য যে, কঙ্করময় জায়গা, পাথরের টুকরোসমূহ, কবরস্থান, বোতখানা ও যবেহের স্থান ইত্যাদিতে নামায পড়া দুরস্ত নয়। কিন্তু এটা একটা সাময়িক কারণ। এ কারণ দূরীভূত হয়ে গেলে ওইসব জায়গায়ও নামায দুরস্ত হয়ে যায়। সুতরাং এ হাদীস শরীফ এটার পরিপন্থী নয়।

৫. 'পানি না পাওয়া' মানে তা ব্যবহার করতে না পারা। তাও হয়তো এজন্য যে, পানি মওজুদ ছিলো না, অথবা এজন্য যে, মওজুদ তো ছিলো দুশমন কিংবা কষ্টদায়ক ব্যক্তি বা প্রাণীর কারণে ব্যবহার করতে পারে নি।

'মাটি' মানে 'মাটি জাতীয় সবকিছু।' যেমন- বালি, পাথর, খনিজ লবণ, পাথরী কয়লা ইত্যাদি- সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

৬. অর্থাৎ তুমি জমা'আত সহকারে কেন নামায পড়লে না?

এ তিরস্কারমূলক প্রশ্ন থেকে বুঝা যায় যে, জমা'আত সহকারে নামায থেকে পৃথক হয়ে বসে থাকা মন্দ। এ কারণে ফক্বীহগণ বলেন, "যে ব্যক্তি জমা'আত সহকারে নামায পড়তে পারে না, সে যেনো প্রথম জমা'আতের সময় জমা'আতের স্থানে না বসে। কারণ, এটা জমা'আত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সামিল; বরং সেখান থেকে চলে যাবে।

৭. ইমাম শাফে'ঈ এখানে صعيد (সা'ঈদ)-এর অর্থ করেন 'মাটি'। তাঁর মতে তায়াম্মুম শুধু মাটি দ্বারা হতে পারে। ইমাম-ই আ'যম ও ইমাম মালিক صعيد -এর অর্থ করেন- 'ভূ-পৃষ্ঠ' مَا صَعِدَ عَلَى الْاَرْضِ (অর্থাৎ যা যমীনের উপর চড়ে)। এ কারণে ওই দু'বুযুর্গের মতে, মাটি জাতীয় প্রতিটি বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয। এ দু'বুযুর্গের দলীল হচ্ছে- বোখারী শরীফে বর্ণিত হাদীস-ই জাবির; যাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا [অর্থাৎ এবং আমার জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ (নামায পড়ার উপযোগী স্থান) ও পবিত্র করে দিয়েছেন]।

এ'তে প্রত্যেক প্রকারের যমীনকে পবিত্রকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বোখারী শরীফের এ হাদীস হচ্ছে صعيد এবং পরবর্তীতে تربت -(মাটি)'র উল্লেখ বিশিষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যা।

৮. খুব সম্ভব ওই সাহিবের 'তায়াম্মুম'-এর নিয়ম জানা ছিলো, কিন্তু এর খবর ছিলো না যে, 'তায়াম্মুম' 'জানাবত' থেকে

اُصِبِ الْمَآءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ اَمَا تَذْكُرُ اِنَّا كُنَّا فِىْ سَفَرٍ اَنَا وَاَنْتَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ وَكَفَّيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوَهٗ وَفِيْهِ قَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ اَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْاَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ۔

পানি পাই না।"[৯] তখন হযরত 'আম্মার আরয করলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমরা- আমি ও আপনি সফরে ছিলাম। আপনি তো নামায পড়েন নি, আর আমি খুব গড়াগড়ি গিয়েছি। অতঃপর নামায পড়ে নিয়েছে।[১০] তারপর আমি এটা হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে আরয করেছি। তখন হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন, "তোমার জন্য এমনি করা যথেষ্ট ছিলো- অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন বরকতময় হস্তযুগল যমীনের উপর মারলেন এবং ওই দু'টিতে ফুঁকলেন।[১১] তারপর ওই দু'টিকে মুখমণ্ডলের উপর এবং দু'হাতের উপর মসেহ করে নিলেন।[১২] [বোখারী]

মুসলিম শরীফেও এরই অনুরূপ রয়েছে। তাতে এ কথাও রয়েছে যে, তোমাদের জন্য এটা যথেষ্ট ছিলো যে, আপন হস্তযুগলকে যমীনের উপর মারতে, তারপর ফুঁকে নিতে, তারপর ওই দু'টিকে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের উপর বুলিয়ে দিতে।[১৩]

পবিত্রতা লাভের জন্যও করা যায়। এ কারণে হুযূর তাঁকে নিয়ম বা পদ্ধতি বলেন নি।

৯. এমতাবস্থায় আমি কি করবো? তিনি জবাবে বললেন, "নামায পড়ো না- যতক্ষণ না পানি পাওয়া যায়। এ কারণে যে, 'তায়াম্মুম' শুধু ওযূর প্রয়োজন হলে করা যাবে।" [মিরক্বাত]

অথবা তিনি জবাব না দিয়ে নিশ্চুপ রইলেন। কেননা, মাস্'আলা জানা ছিলো না। [আশি''আতুল লুম'আত]

স্মর্তব্য যে, হযরত আমর ইবনে মাস্'উদ 'জানাবত'-এর অবস্থায় 'তায়াম্মুম'-এ বিশ্বাসী ছিলেন না। হযরত ইবনে মাস্'উদ মাস্'আলা জানার পর তাঁর নিজস্ব অবস্থান থেকে ফিরে আসলেন। কিন্তু হযরত ওমর ফারূক্ব কোন মন্তব্য করেন নি।

১০. অর্থাৎ সফরে আমি ও আপনি 'জুনুবী' হয়ে পড়েছিলাম। পানি ছিলো না। তায়াম্মুম-এর মাস্'আলাও কারো জানা ছিলো না। আপনি তো পানির অপেক্ষায় নামাযই পড়লেন না। আর আমি গোসলের তায়াম্মুমকে গোসলের উপর অনুমান করলাম এবং সারা শরীরে মাটি মালিশ করে নিলাম।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে প্রয়োজনের সময় সাহাবা-ই কেরামও ক্বিয়াস করতেন। তাছাড়া কখনো ক্বিয়াসের ক্ষেত্রে ভুলও করে ফেলতেন। কিন্তু হুযূর তাঁদেরকে ভুলের জন্য তিরস্কার করতেন না, বরং সংশোধন করে দিতেন। কারণ, خطاء اجتہادی (ইজতিহাদে ভুল)-এর জন্য পাকড়াও নেই।

১১. যাতে তায়াম্মুম করার সময় মুখমণ্ডলে মাটি লেগে না যায়। কেননা, তায়াম্মুম-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পবিত্রতা, চেহারায় মাটি মেখে সাধু হয়ে যাওয়া নয়। এ কারণে ফক্বীহ্গণ বলেন, ফ্যাশনের খাতিরে চেহারার উপর পাউডার ইত্যাদি মালিশ করা না-জায়েয; কারণ এটা হচ্ছে 'মুস্লাহ্' বা চেহারা বিকৃতকরণ।

وَعَنْ اَبِى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتّٰى قَامَ اِلٰى جِدَارٍ فَحَتَّهٗ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهٗ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهٗ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ وَلَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهٗ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ۔

৪৮৬।। হযরত আবূ জুহাইম ইবনে হারিস ইবনে সিম্মাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত,[১৪] তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যখন হুযূর প্রস্রাব করছিলেন। আমি হুযূরকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন না, যে পর্যন্ত না তিনি দেওয়ালের নিকট গেলেন। সেটাকে তাঁর ওই লাঠি দ্বারা, যা তাঁর হাত মুবারকে ছিলো, ঘর্ষণ করলেন (চাঁচলেন)[১৫] তারপর আপন হাত মুবারক দেওয়ালের উপর লাগালেন। তারপর আপন চেহারা ও দু'হাতের উপর মসেহ করলেন।[১৬] তারপর আমার জবাব দিলেন।[১৭]

আমি এ বর্ণনা না সহীহাঈন (বোখারী ও মুসলিম)-এ পেয়েছি, না 'হুমাইদীর কিতাব'-এ; কিন্তু এটা শরহে সুন্নাহ্'য় উল্লেখ করেছেন। আর বলেছেন যে, এ হাদীস 'হাসান' পর্যায়ের।[১৮]

১২. এ প্রকাশ্য অর্থের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ ও আওযা'ঈ তায়াম্মুমে একবার হাত মারতেন। কিন্তু ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং সামনেও আসবে যে, হুযূর তায়াম্মুমে যমীনের উপর দু'বার হাত মুবারক মেরেছেন এবং এর নির্দেশও দিয়েছেন। সুতরাং এখানে মর্মার্থ বুঝানো নয়, বরং ধরন বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ জানাবতের তায়াম্মুমে যমীনের উপর গড়াগড়ি যাওয়ার প্রয়োজন নেই; শুধু মাটিতে হাত মেরে চেহারা ও দু'হাতের উপর মসেহ করা যথেষ্ট; যাতে হাদীস শরীফগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা না দেয়।

তাছাড়া, এখানে كَفَّيْن মানে হাতের তালু ও কব্জি যুগল নয়, বরং কুনুই পর্যন্ত পূর্ণ হাত (মসেহ করা)। অন্যান্য হাদীস শরীফে এমনি রয়েছে।

এ হাদীস সংক্ষিপ্ত; আর ওইসব হাদীস হচ্ছে এর তাফসীল। কখনো يد (ইয়াদ্) বলে 'কব্জিসমূহ' বুঝানো হয়। যেমন- فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا [অর্থাৎ সুতরাং তোমরা তাদের (চোর নর ও চোর নারী) হাতগুলো, তথা তাদের হাতের কব্জিগুলো কেটে দাও! ৫:৩৮]

১৩. হতে পারে- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাজে পরিণত করেও দেখিয়েছেন এবং বলেও দিয়েছেন। সুতরাং ওই দু'টি বর্ণনার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধিতা নেই।

কিছু সংখ্যক বর্ণনায় আছে- হযরত ওমর ফারুক্বের এ ঘটনা স্মরণে আসে নি এবং হযরত আম্মারকে বললেন, "হে 'আম্মার আল্লাহকে ভয় করো।"

১৪. তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী, আনসারী ও হযরত উবাই ইবনে কা'বের ভাগিনা। হযরত আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে ওফাত পান।

১৫. কেননা, দেওয়ালটির পিঠে হয়তো অপবিত্র বস্তু ছিলো, কিংবা ছিলো পোকা-মাকড়। চেঁচে নেওয়ার ফলে তায়াম্মুমের জন্য পবিত্র মাটি বের হয়ে আসলো।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, অন্য কারো দেওয়ালে তার অনুমতি ছাড়া তায়াম্মুম করে নেওয়া এবং প্রয়োজনে কিছুটা ঘষে-চেঁচে নেওয়াও জায়েয, যদি দেওয়ালের ক্ষতি না হয়।

১৬. অর্থাৎ দু'বার হাত মারলেন ঃ একবার চেহারার জন্য, আরেকবার কুনুই পর্যন্ত দু'হাতের জন্য।

১৭. স্মর্তব্য যে, শৌচকর্ম সম্পাদনরত অবস্থায় সালাম করা নিষিদ্ধ। আর যদি কেউ করে বসে, তবে জবাব দেওয়া ওয়াজিব (অপরিহার্য) নয়। হুযূরের এ জবাব দান হুযূরের

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ ◆ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَآءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَآءَ فَلْيَمَسَّهٗ بُشْرَهٗ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوٗدَ وَرَوَى النَّسَآئِيُّ نَحْوَهٗ اِلٰى قَوْلِهٖ عَشْرَ سِنِيْنَ -

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِيْ سَفَرٍ فَاَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهٗ فِيْ رَاْسِهٖ فَاحْتَلَمَ فَسَئَلَ اَصْحَابَهٗ هَلْ تَجِدُوْنَ لِيْ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ قَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪৮৭।। হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "পাক মাটি মুসলমানের ওযূর পানিই– যদিও দশ বছর যাবৎ পানি না পায়।[১৯] অতঃপর যখন পানি পাবে, তখন তা দ্বারা আপন শরীর ধুবে। কারণ, এটা নিশ্চয়ই উত্তম।"[২০] [আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ]

ইমাম নাসা'ঈ এর মতোই বর্ণনা করেছেন– তাঁর পবিত্র উক্তি 'দশ বছর' পর্যন্ত।

৪৮৮।। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে গেলাম। তখন আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির গায়ে পাথর এসে লাগলো, যা তার মাথা জখম করে ফেললো। তারপর তার স্বপ্নদোষ হলো। সুতরাং আপন সফরসঙ্গীদেরকে বললো, "তোমরা কি আমার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি পাচ্ছো?" তাঁরা বললেন, "তোমার জন্য আমরা তায়াম্মুমের অনুমতি পাচ্ছি না।

উত্তম চরিত্রের ভিত্তিতে ছিলো। এর বিস্তারিত আলোচনা 'বাবু মুখালাত্বাতিল জুনুব' (জুনুবীর সাথে মেলামেশার বিধান শীর্ষক অধ্যায়)-এ করা হয়েছে। যেমন– এখানে হুযূরের সালামের জবাব দানের জন্য তায়াম্মুম করা একটা বিশেষ অবস্থা ছিলো। বস্তুতঃ পবিত্র ও অপবিত্র উভয় অবস্থায় আল্লাহ্র যিক্র করা শরীয়তের বিধানসম্মত ছিলো। তাছাড়া, পানি থাকাবস্থায় তায়াম্মুম করা তেমনি ছিলো, যেমন জানাযার নামাযের জন্য (সময়ের স্বল্পতার কারণে) তায়াম্মুম করে নেওয়া। সুতরাং না উভয় হাদীস পরস্পর বিরোধী, না এর বিপক্ষে এ আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে যে, 'এ তায়াম্মুম জায়েয কিভাবে হলো?'

১৮. এটা কিতাব-প্রণেতার বিরুদ্ধে এ আপত্তি উত্থাপন করা যে, তিনি প্রথম অধ্যায়ে শায়খাঈন (বোখারী ও মুসলিম) ব্যতীত অন্য কিতাবের হাদীস নিয়ে এলেন কেন? ইবনে মাজাহ্ হযরত আত্বা ইবনে রবাহ থেকে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৯. এ হাদীস ইমাম-ই আ'যমের মজবূত দলীল। তা এ মর্মে যে, তায়াম্মুম ওযূর মতো নিঃশর্ত ও পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা। সুতরাং তায়াম্মুমকারী একই তায়াম্মুম দ্বারা এক ওয়াক্তের মধ্যে কয়েকটা নামাযও পড়ে নিতে পারবে। আর এক ওয়াক্তের তায়াম্মুম দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত পর্যন্ত নামায পড়তে পারবে। কেননা, সেটাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওযূ সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং যা ওযূর বিধান তা এর বিধানও।

ইমাম শাফে'ঈর মতে, তায়াম্মুম হচ্ছে পবিত্রতার সাময়িক বিকল্প (ضرورت وضو)। সুতরাং তাঁর মতে নামাযের সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায়। আর এক তায়াম্মুম দ্বারা কয়েক নামায পড়া যায় না। সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত, তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক তায়াম্মুম করতেন। আমাদের হানাফী মাযহাবের বক্তব্য হচ্ছে তাঁর এ আমল মুস্তাহাব রূপে ছিলো– যেমন ওযূর উপর ওযূ করা হয়।

২০. 'উত্তম' মানে 'আসল' (মূল)। অর্থাৎ পানি হচ্ছে

رُخْصَةً وَاَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَآءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْبِرَ بِذٰلِكَ قَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلَّا سَئَلُوْا اِذْلَمْ يَعْلَمُوْا فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَّتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلٰى جُرْحِهٖ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَآئِرَ جَسَدِهٖ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

তুমি তো পানি ব্যবহার করতে পারছো।"[২১] সে গোসল করে নিলো। অতঃপর মারা গেলো।[২২] যখন আমরা হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে হাযির হলাম, তখন তাঁকে এর খবর দেওয়া হলো। হুযূর বললেন, "তাদেরকে আল্লাহ্ ক্বতল করুন! তারা তো তাকে মেরে ফেলেছে।[২৩] যখন তারা জানতো না, তখন কেন জিজ্ঞাসা করে নিলো না? কারণ, না জানার চিকিৎসা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা।[২৪] তার জন্য তায়াম্মুম করে নেওয়া, তার জখমের উপর কাপড় বেঁধে নেওয়া, তারপর সেটার উপর হাত বুলিয়ে নেওয়া এবং শরীরের অবশিষ্ট অংশ ধুয়ে নেওয়া যথেষ্ট ছিলো।"[২৫] [আবূ দাঊদ] ইবনে মাজাহ্ হযরত আত্বা ইবনে রবাহ থেকে, তিনি হযরত আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

পবিত্রতা অর্জনের মূল উপাদান। এটা পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম সেটার স্থলাভিষিক্ত হয়। যখন আসল এসে গেলো তখন তার স্থলাভিষিক্তের অবকাশ রইলো না। সুতরাং এর অর্থ এ নয় যে, (এমতাবস্থায়) তায়াম্মুমও জায়েয; তবে ওযূ উত্তম। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا

(অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের সেদিন উৎকৃষ্ট ঠিকানা এবং হিসাবের দ্বিপ্রহরের পর উৎকৃষ্ট আরামস্থল হবে; ২৫:২৪, তরজমা– কান্যুল ঈমান)

২১. কিন্তু তাঁরা মনে করেছেন যে, তায়াম্মুম রোগীর জন্য নয়; বরং শুধু পানি পাওয়া না গেলেই তা বৈধ। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

(অর্থাৎ ... এবং এ সমস্ত অবস্থায় যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো; ৫:৬, তরজমা– কান্যুল ঈমান)

২২. এটা হচ্ছে সাহাবা-ই কেরামের তাক্বওয়া এবং খোদাভীরুতা যে, প্রাণ দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু নামায ছেড়ে দেওয়া পছন্দ করেন নি।

২৩. অর্থাৎ এসব লোক তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে গেলো। তারা যদি এমন ফাত্ওয়া না দিতো; তবে সে গোসল করে ওফাত পেতো না। আর এ 'মন্দ কামনা' (আল্লাহ্ তাদেরকে ক্বতল করুন!) বাক্যটি অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্যই।

এ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি ইজতিহাদী ভুলের কারণে প্রাণনাশ পর্যন্তও ঘটে যায়, তবুও মুজতাহিদের উপর ক্বিসাস কিংবা দিয়াৎ কোনটাই বর্তাবে না, এমনকি গুনাহ্ও হবে না। সুতরাং হযরত আলী ও আমীর মু'আবিয়া এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বার যুদ্ধগুলোতে মুসলমানদের যেই হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়ে গেছে, তজ্জন্য কারো বিরুদ্ধে পাকড়াও নেই। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)

২৪. অর্থাৎ তাদের উচিৎ ছিলো তাকে নিজেরা রায় না দেওয়া, বরং আমার নিকট আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা এবং আমার নিকট মাস্আলা জিজ্ঞাসা করা।

২৫. ইমাম আ'যমের মতে, وَيَعْصِبُ -এর واوْ (এবং) اَوْ (অথবা) অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ এ যে, যদি সে গোসল মোটেই করতে না পারতো, তবুও তায়াম্মুম করে নিতো। আর যদি মাথার উপর পানি ঢালা ক্ষতিকর হতো, তবে যখমের উপর ব্যান্ডিজ বেঁধে মসেহ করে নিতো। শরীরের অবশিষ্ট অংশ ধু'য়ে নিতো।

ইমাম শাফে'ঈ ওই واوْ কে সংযোজক অব্যয় (এবং) হিসেবে গ্রহণ করেছেন আর বলেছেন যে, এমন অবস্থায় তায়াম্মুমও

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَآءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَ الْمَآءَ فِى الْوَقْتِ فَاَعَادَ اَحَدُهُمَا الصَّلٰوةَ بِوُضُوْءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْاٰخَرُ ثُمَّ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذٰلِكَ فَقَالَ لِلَّذِىْ لَمْ يُعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَاَتْكَ صَلٰوتُكَ وَقَالَ لِلَّذِىْ تَوَضَّأَ وَاَعَادَ لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالدَّارِمِىُّ وَرَوَى النَّسَآئِىُّ نَحْوَه، وَقَدْ رَوٰى هُوَ اَبُوْ دَاوٗدَ اَيْضًا عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلاً۔

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ اَبِى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ قَالَ اَقْبَلَ النَّبِىُّ

৪৮৯।। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু'জন লোক সফরে গেলো। নামাযের সময় হলো। তাদের নিকট পানি ছিলো না। তখন তারা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নিলো। অতঃপর নামায পড়লো। তারপর ওই ওয়াক্তের অভ্যন্তরেই পানি পেয়ে গেলো। তখন উভয়ের মধ্যে একজন ওযূ করে নামায পুনরায় পড়ে নিলো, অপরজন পুনরায় পড়লো না।[২৬] অতঃপর উভয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে হাযির হলো। তারা এ ঘটনা আরয করলো। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায পুনরায় পড়ে নি তার উদ্দেশে হুযূর এরশাদ ফরমালেন, তুমি সুন্নাত পেয়ে গেছো এবং তোমার নামায যথেষ্ট হয়ে গেছে।" আর যে ব্যক্তি ওযূ করে পুনরায় পড়েছিলো, তাঁর উদ্দেশে এরশাদ ফরমায়েছেন, "তোমার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।"[২৭]

এ হাদীস শরীফ আবূ দাউদ ও দারেমী বর্ণনা করেছেন। নাসা'ঈ বর্ণনা করেছেন এর মতোই আর নাসাঈ ও আবূ দাউদ আত্বা ইবনে ইয়াসার থেকে 'মুরসাল'★ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪৯০।। হযরত আবুল জুহায়ম ইবনে হা-রিস ইবনে সিম্মাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ নিয়ে

করবে এবং ক্ষতস্থান ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ ধুবেও। কিন্তু ইমাম আ'যমের অভিমত অত্যন্ত মজবুত। কেননা, তায়াম্মুম গোসলের স্থলাভিষিক্ত। আর স্থলাভিষিক্ত ও তার 'মূল' কখনো একত্রিত হতে পারে না। তাছাড়া, মুহাদ্দিসগণের মতে এ হাদীস দুর্বলও। 'মিরক্বাত' দেখুন।

স্মর্তব্য যে, পানি সন্দেহযুক্ত হলেই গোসল ও তায়াম্মুম উভয়ই করা হয়। এর কারণ হচ্ছে- ওখানে আমাদের অজ্ঞতা- এ মর্মে যে, এ পানি পবিত্রকারী (مُطَهِّر) কিনা, ওখানে মূল ও স্থলাভিষিক্তের একত্রিত হওয়া নয়, ওখানে পবিত্রতা অর্জনের উপায় কি গোসল, না তায়াম্মুমই?

২৬. এটা হচ্ছে 'ইজতিহাদী বিরোধ'। তাঁদের মধ্যে একজনই সঠিক ছিলেন। কিন্তু কেউ কারো বিরুদ্ধে আপত্তি করেন নি। আমরা যা বলে থাকি যে, 'মাযহাব চতুষ্টয় সত্য' এ কথার অর্থ হচ্ছে 'কারো বিরুদ্ধে সমালোচনা ও আপত্তি নেই।' এর পক্ষে দলীল হচ্ছে- এ হাদীস শরীফ।

২৭. এজন্য যে, ফরয পূর্বে সম্পন্ন হয়েছিলো। সুতরাং দ্বিতীয় নামায নফল হয়ে গেলো। বস্তুতঃ নফলের সাওয়াবও পাওয়া যায়। এ অর্থ নয় যে, ইজতিহাদের দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়া গেছে। এটাতো প্রথমোক্ত ব্যক্তিই পেতে পারতো। কারণ, তাঁর ইজতিহাদ সঠিক ছিলো। ইজতিহাদে ভুল হলে একটি

مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهٖ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّهٗ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّهُمْ تَمَسَّحُوْا وَهُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيْدِ لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ ثُمَّ مَسَحُوْا بِوُجُوْهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوْا فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً اُخْرٰى فَمَسَحُوْا بِاَيْدِيْهِمْ كُلِّهَا اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاٰبَاطِ مِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ

গেলেন 'জামাল কূপ'র দিকে।[২৮] অতঃপর তিনি একজন লোকের সাক্ষাৎ পেলেন। সে সালাম করলো। হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন নি- যে পর্যন্ত না তিনি একটি দেওয়ালের নিকট তাশরীফ আনলেন। অতঃপর চেহারা ও হাত দু'টির মসেহ করলেন। তারপর তার সালামের জবাব দিলেন।[২৯] [মুসলিম, বোখারী]

৪৯১।। হযরত 'আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করছিলেন যে, সাহাবীগণ পাক মাটি দ্বারা ফজরের নামাযের জন্য তায়াম্মুম করলেন, যখন তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। সুতরাং মাটিতে আপন হাত বুলালেন। তারপর একবার আপন মুখের উপর হাত বুলিয়ে নিলেন। পুনরায় মাটির উপর হাত মারলেন। তারপর আপন হাতের তালুযুগল দিয়ে পূর্ণ হাত দু'টির কাঁধ ও বগল পর্যন্ত মসেহ করলেন।[৩০] [আবূ দাঊদ]

মাত্র সাওয়াব পাওয়া যায়। আর সঠিক ইজতিহাদের জন্য দ্বিগুণ।

২৮. 'জামাল' একটি বস্তি, যাকে 'মদীনা'ও বলা হয়। এ কূপ সেটার দিকে সম্পৃক্ত। এখন ওই বস্তির নাম বি'র-ই জামাল (জামাল কূপ) হয়ে গেছে। এখানেই হযরত আলী মুরতাদ্বা ও হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমার মধ্যে যুদ্ধ (ঐতিহাসিক জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ) সংঘটিত হয়েছিলো।

২৯. অর্থাৎ তায়াম্মুমের উল্লেখ এক্ষুনি কিছুটা পূর্বে করা হয়েছে। আর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-বিশ্লেষণ 'মুখালাত্বাতুল জুনুব' (জুনুবীর সাথে মেলামেশার বিবরণ শীর্ষক অধ্যায়)-এ করা হয়েছে।

৩০. এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম যুহ্রী বলেন, "তায়াম্মুমের মধ্যে দু'হাতের মসেহ বগল পর্যন্ত করতে হবে।" কিন্তু বিশুদ্ধ ও সঠিক অভিমত হচ্ছে এটাই যে, কুনুই পর্যন্ত মসেহ করা হবে। কেননা, তায়াম্মুম ওযূর স্থলাভিষিক্ত। আর ওযূতে হাত কুনুই পর্যন্ত ধোয়া হয়। ওই সাহাবীদের এ আমল তাঁদের ইজতিহাদেরই ফসল ছিলো; হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ থেকে নয়। তাঁরা ক্বোরআন করীমের এ আয়াত শরীফ দেখেছেন-

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ

(তখন তোমরা চেহারাগুলো ও হাতগুলো মসেহ করো; ৫:৬)

উল্লেখ্য, কোন কোন সাহাবীর ইজতিহাদ অনুসারে আমল করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য নয়; বিশেষ করে যখন মারফূ' হাদীসের বিপরীত হয়ে যায়।

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু ওযূতে বগল পর্যন্ত হাত ধুতেন। হযরত 'আম্মার ইবনে ইয়াসির গোসলের তায়াম্মুমের জন্য যমীনের উপর লুটে পড়েছিলেন (গড়াগড়ি দিয়েছিলেন)।

****

بَابُ الْغُسْلِ الْمَسْنُوْنِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَآءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অধ্যায় ঃ সুন্নাতসম্মত গোসল[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৪৯২।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ জুমু'আর জন্য আসে, সে যেনো গোসল করে নেয়।"[২] [বোখারী, মুসলিম]

---

১. غَسْلٌ (গাস্‌ল) غين -এ যবর সহকারে, মানে 'ধোয়া'। غِسْلٌ (গিস্‌ল) غين -এ যের সহকারে, মানে 'গোসল করার কিংবা ধোয়ার পানি'। غُسْلٌ (গোস্‌ল) غين -এ পেশ সহকারে মানে 'গোসল করা'।

এখানে তৃতীয় অর্থ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য।

গোসল পাঁচ প্রকার ঃ এক. ফরয, দুই. ওয়াজিব, তিন. সুন্নাত, চার. মুস্তাহাব এবং পাঁচ. মুবাহ্‌।

ফরয গোসল তিন কারণে করা হয় ঃ এক. 'হায়য' (ঋতুস্রাব)-এর কারণে, **দুই.** 'নিফাস' (প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ থেকে পবিত্র হওয়া) এবং **তিন.** 'জানাবত' (স্ত্রী সঙ্গম, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির কারণে বা যৌন উত্তেজনার ফলে বীর্যপাত জনিত কারণে শরীর নাপাক হলে তা) থেকে পবিত্র হবার জন্য।

ওয়াজিব গোসল ঃ মৃতকে যেই গোসল দেওয়া হয়।

সুন্নাত গোসল পাঁচটি ঃ এক. জুমু'আহ্‌র জন্য, **দুই** ও তিন. দু'ঈদের জন্য, চার. ইহরাম করার সময় এবং পাঁচ. আরফার দিন।

মুস্তাহাব গোসল কয়েক কারণে করা হয় ঃ এক. মৃতকে গোসল করিয়ে, **দুই.** শিঙ্গা প্রয়োগ করে দূষিত রক্ত বের করানোর পর, তিন. ইসলাম গ্রহণের সময়।

মুবাহ্‌ গোসল ঃ ঠাণ্ডার জন্য এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির জন্য গোসল করা মুবাহ্‌।

এ অধ্যায়ে সুন্নাত ও মুস্তাহাব গোসলগুলোর কথা আলোচনা করা হবে।

২. ইমাম-ই আ'যম ও বেশীরভাগ বিজ্ঞ আলিম (ইমাম)-এর মতে এ হুকুম ওয়াজিব নির্দেশক নয়; বরং সুন্নাত-নির্দেশক। আর এ হাদীস 'মান্‌সূখ' (রহিত) নয়, বরং 'মুহকাম' (বহাল ও কার্যকর)।

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (রাহিমাহুমাল্লাহ্‌)'র মতে এ হুকুম ওয়াজিব-নির্দেশক। তাঁদের মতে জুমু'আহ্‌র গোসল ওয়াজিব।

কিন্তু ইমাম আ'যম (রাহিমাহুল্লাহ্‌)'র অভিমত মজবূত (অধিকতর গ্রহণযোগ্য)। সামনে বিশুদ্ধ বর্ণনায় এমনি আসছে যে, জুমু'আহ্‌র গোসল ওয়াজিব হবার বিধান রহিত হয়ে গেছে।

মনে রাখবেন– গোসল করা জুমু'আহ্‌র নামাযের জন্য সুন্নাত। সুতরাং যাদের উপর জুমু'আহ্‌র নামায ফরয নয়, তাদের জন্য এ গোসল সুন্নাতও নয়। যেমন– এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো। কোন কোন বিজ্ঞ আলিম শব্দে 'যবর' এবং الجمعة শব্দে 'পেশ' পড়েছেন। আর হাদীসের অর্থ বলেছেন– যখন তোমাদের মধ্যে কারো নিকট জুমু'আহ্‌র দিন আসে, তখন সে যেন গোসল করে।

তাঁদের মতে জুমু'আহ্‌র গোসল শর্তহীনভাবে সুন্নাত– চাই তার উপর জুমু'আহ্‌র নামায ফরয হোক, কিংবা না-ই হোক। সুতরাং উচিৎ হচ্ছে– জুমু'আহ্‌র গোসল ওই দিন ফজরের পর করা। রাতে করে নিলে এ সুন্নাত সম্পন্ন হবে না।

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَّغْتَسِلَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهٗ وَجَسَدَهٗ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ

৪৯৩।। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "জুমু'আর দিনের গোসল প্রত্যেক বালেগের উপর ওয়াজিব।"[৩] [বোখারী, মুসলিম]

৪৯৪।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রতি সাত দিনে একদিন গোসল করা অপরিহার্য, যাতে সে তার মাথা ও দেহ ধৌত করবে।"[৪] [বোখারী, মুসলিম]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪৯৫।। হযরত সামুরাহ্ ইবনে জুন্‌দাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ওযূ করেছে, সে ভালো কাজ করেছে। আর যে গোসল করেছে, গোসল করা তো খুব ভালো।"[৫] [ইমাম আহমদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী]

---

৩. যদি 'ওয়াজিব' মানে 'প্রমাণিত' (স্থিরকৃত) হয়, তাহলে হাদীস 'মুহকাম' (বলবৎ); 'মানসূখ' (রহিত) নয়। আর যদি এর অর্থ 'অপরিহার্য' হয়, তাহলে 'মানসূখ' (রহিত)। যেমন সামনে আসছে।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, জুমু'আহ্‌র গোসল জুমু'আহ্‌র দিনের কারণেই; জুমু'আহ্‌র নামায ফরয হোক, কিংবা না-ই হোক। এ অভিমতও অনেক বিজ্ঞ আলিমের।

৪. এখানে একদিন মানে জুমু'আহ্‌র দিন। অন্যান্য বর্ণনা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয়। আর 'অপরিহার্য' দ্বারা 'আভিধানিক অপরিহার্য' বুঝায়; শরীয়তের পরিভাষায় নয়। অর্থাৎ সপ্তাহে জুমু'আহ্‌র দিন গোসল করে নেওয়া চাই, যা'তে শরীরও পরিষ্কার হয়ে যায়, কাপড়ও। আর জুমু'আহ্‌র ভিড়ের মধ্যে মুসলমানদেরও যেনো কষ্ট না হয়। যেহেতু মাথায় ময়লা ও উকুন ইত্যাদি বেশী হয়, সেহেতু বিশেষভাবে এর উল্লেখ করেছেন; অন্যথায় শরীরের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। গোসলের মধ্যে কুল্লি করা, নাকে পানি দেওয়া এবং গোটা শরীর ধোয়া আমাদের মাযহাবানুসারে ফরয। গোসলের পূর্বে ওযূ করে নেওয়া এবং ডান দিক থেকে আরম্ভ করা সুন্নাত।

৫. এ হাদীস শরীফ অধিকাংশ আলিমের পক্ষে দলীল; যাঁরা বলেন যে, জুমু'আহ্‌র গোসল ফরয কিংবা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত। এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় মুসলিম শরীফের বর্ণনায়ও, যা'তে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমু'আহ্‌র দিন গোসল করে নামাযের জন্য আসে, আমার নিকটে বসে নিরবে খোৎবা শোনে, তার দশ দিনের গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে।"

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَزَادَ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَمَنْ حَمَلَهٗ فَلْيَتَوَضَّأْ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اَرْبَعٍ مِّنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحَجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّهٗ اَسْلَمَ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّغْتَسِلَ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ۔

৪৯৬।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেয়, সে নিজেও যেনো গোসল করে।"[৬] [ইবনে মাজাহ্] ইমাম আহমদ ও তিরমিযী এটাও বর্ধিত করেছেন– 'যে ব্যক্তি মৃতের কফিন বহন করে সে যেন ওযূ করে নেয়।'[৭]

৪৯৭।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চারটি কারণে গোসল করতেন– এক. জানাবাত (গোসল ফরয হলে), দুই. জুমু'আহ্র দিন, তিন. শিঙ্গা লাগালে (দূষিত রক্ত বের করানোর পর) এবং চার. মৃতকে গোসল দেওয়ালে।[৮] [আবূ দাঊদ]

৪৯৮।। হযরত ক্বায়স ইবনে আসিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত,[৯] তিনি মুসলমান হলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন যেন পানি ও কুল গাছের পাতা দিয়ে গোসল করে নেন।[১০] [তিরমিযী ও নাসাঈ]

---

৬. ওলামা সাধারণের মতে এ হুকুম মুস্তাহাব-নির্দেশক। মৃতকে গোসল করানোর পর গোসল করে নেওয়া উত্তম; কেননা, মৃত ধোয়া পানির ছিটকে গায়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। 'জামেউল উসূল'-এর মধ্যে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে ওমায়স হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্বের ওফাতের পর তাঁকে গোসল করিয়েছেন। তারপর সাহাবা-ই কেরামকে বললেন, "আমি রোযাদার। ঠাণ্ডাও পড়ছে খুব প্রকটভাবে। আমার জন্য গোসল করা কি জরুরী?" সবাই বললেন, "না।"

৭. কফীন বহন করার কারণে নয়, বরং জানাযা নামাযের জন্য, যাতে মৃতের জন্য জানাযার স্থানে পৌঁছা মাত্রই জানাযার নামাযে শরীক হতে পারে।

৮. এখানে গোসল করা মানে 'গোসল করা'র নির্দেশ দেওয়া। অর্থাৎ এ চার কারণে গোসলের নির্দেশ দিতেন। কেননা, হুযূর কখনো কোন মৃতকে গোসল দেন নি। এটা তেমনই, যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– হুযূর হযরত মা-'ইযকে 'রাজ্ম করেছেন। অর্থাৎ 'রাজম' (পাথর মেরে হত্যা) করার নির্দেশ দিয়েছেন। (মিরক্বাত ইত্যাদি) কিন্তু ওই নির্দেশগুলোর মধ্যে 'জানাবাত'-এর গোসল ফরয, আর অবশিষ্টগুলো সুন্নাত।

যেহেতু শিঙ্গা লাগানোর সময় রক্তের ছিটকেগুলো দেহের উপর পড়ে এবং রক্ত বের হলে গরম অনুভূত হয় ও দুর্বলতা পয়দা হয়, সেহেতু এর পর গোসল করে নেওয়া উত্তম।

৯. তিনি সাহাবী, বনী তামীমের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে এসেছিলেন। ৯ম হিজরীতে ঈমান আনেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ اِنَّ نَاسًا مِّنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ جَآؤُا فَقَالُوْا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَلٰكِنَّهٗ اَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِّمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَاُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَاَ الْغُسْلُ كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِيْنَ يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُوْنَ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ اِنَّمَا هُوَ عَرِيْشٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ يَوْمٍ حَآرٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِىْ ذٰلِكَ الصُّوْفِ حَتّٰى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ اٰذٰى

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৪৯৯।। হযরত ইক্রামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,[১১] কিছু সংখ্যক ইরাকী লোক আসলো।[১২] আর বললো, "হে ইবনে আব্বাস! আপনি কি জুমু'আর দিনে গোসল করা ওয়াজিব মনে করেন?" বললেন, "না। কিন্তু এ কাজটা অত্যন্ত পবিত্রতা এবং গোসলকারীদের জন্য উত্তম। আর যে ব্যক্তি গোসল করে না, তার উপর তা জরুরীও নয়।[১৩] আমি তোমাদেরকে বলছি গোসল কিভাবে আরম্ভ হলো! লোকেরা কষ্টে ছিলো। উল পরিধান করতো। নিজেদের পিঠের উপর (বোঝা বহনের) মজদূরী করতো। তাদের মসজিদ সংকীর্ণ ছিলো, যার ছাদ নিচু ছিলো, যা নিছক কুঁড়েঘর (খড়ের ছাউনী) ছিলো।[১৪] হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক গরমের দিনে তাশরীফ আনলেন। আর লোকেরা ওই উলের মধ্যে ঘামসিক্ত ছিলো, এমনকি তাদের থেকে দুর্গন্ধ প্রবাহিত হলো,

---

ফরমান, "তিনি দিয়ার এলাকার বনবাসীদের নেতৃস্থানীয় লোক। তিনি বড় প্রজ্ঞাবান, বিবেকবান ও ইবাদতপরায়ণ ছিলেন। বসরায় বসবাস করতেন।

১০. এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইসলাম গ্রহণের সময় কলেমা পড়ার পূর্বে গোসল করা উত্তম। কোন কোন বিজ্ঞ আলিমের মতে যদি কাফির কুফরের অবস্থায় নাপাক (জুনুবী) হয়, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার উপর 'নাপাকী' (জানাবাত)-'র কারণে গোসল করা ফরয।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মাথা মুণ্ডানোরও নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ কারণেই ইসলাম গ্রহণের সময় মাথা মুণ্ডানোও সুন্নাত।

১১. তিনি বর্বর জাতি থেকে আসেন। সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার ক্রীতদাস ছিলেন। তাবে'ঈ ছিলেন। মক্কা মুকার্‌রামার অন্যতম ফিক্বহ্‌বিদ। তাঁর যুগের বড় আলিম ছিলেন। ৮২ বছর বয়স পান। ১০৭ হিজরীতে ওফাত পান।

১২. ইরাক তদানীন্তন আরব দেশের পঞ্চম প্রদেশ। দৈর্ঘ্যে আবাদান থেকে মসুল পর্যন্ত আর প্রস্থে ক্বাদেসিয়া থেকে হাল্ওয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত। এর রাজধানী বাগদাদ। কুফা ও বসরা ইরাকের প্রসিদ্ধ দু'টি শহর। কারবালা এবং নাজাফও ইরাকেরই দু'টি বস্তি।

১৩. প্রায় সব সাহাবীর এ-ই অভিমত (মাযহাব), আর বেশীর ভাগ আলিমেরও। এ গোসলকে তাঁরা সুন্নাত বলেই রায় দেন ও বিশ্বাস করেন।

১৪. তাও এমনি যে, কাঠের ঠুনি দাঁড় করিয়ে খেজুর গাছের শাখা ও পাতার ছাদ বানানো হয়েছিলো। বৃষ্টি হলে পানি টপকে পড়তো। আর অন্যান্য দিনগুলোতে রোদ। কিন্তু এ মসজিদের মর্যাদা আরশ-ই মু'আল্লা থেকেও উত্তম ছিলো। কারণ সেটার ইমাম ছিলেন নবীগণের ইমাম। সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। বুঝা গেলো যে, মসজিদের বৈশিষ্ট্য দালান দ্বারা নয়; বরং ইমামের কারণেই।

بِذٰلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الرِّيَاحَ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ اَحَدُكُمْ اَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيْبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَآءَ اللّٰهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصُّوْفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِىْ كَانَ يُؤْذِىْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ.

رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

যার কারণে পরস্পর দ্বারা পরস্পর কষ্ট পেলো। সুতরাং যখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ দুর্গন্ধ পেলেন[১৫] তখন এরশাদ ফরমালেন, "হে লোকেরা! যখন এ দিন আসে তখন গোসল করে নাও। প্রত্যেকের উচিত নিজেদের উৎকৃষ্টতম তেল ও খুশ্বু মেখে নেওয়া।"[১৬]

৫০০।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেছেন, "অতঃপর আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন[১৭] আর লোকেরা উল-পশম ছাড়া উত্তম পোশাক পরলো এবং কাজকর্ম থেকে মুক্তি পেলো।[১৮] তাদের মসজিদ প্রশস্ত হয়ে গেলো[১৯] আর ঘামের কারণে পরস্পর দ্বারা পরস্পর যে কষ্ট পেতো তাও দূরীভূত হলো।" [আবূ দাঊদ]

১৫. এ থেকে দু'টি মাস্আলা বুঝা গেলো- এক. সাহাবীগণ এর অভিযোগ করেন নি। কেননা, তাঁরা ছিলেন ধৈর্যশীলদের সরদার এবং দুই. হুযূরের আপন উম্মতদের দুঃখ-কষ্টের প্রতি খুব খেয়াল রয়েছে। তা থাকবেও না কেন? তিনি তো উম্মতদের রক্ষক, কেউ তার কষ্টের কথা উল্লেখ করুক, কিংবা না-ই করুক। সবার প্রতি হুযূরের খেয়াল রয়েছে। হুযূরের এ খেয়াল রাখা ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কারণ, মহান রব এরশাদ ফরমায়েছেন- عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (তাঁর নিকট কষ্টকর যা তোমাদেরকে কষ্ট দেয়; ৯:১২৮)।

১৬. তেল মাথায় ও শরীরে এবং খুশ্বু কাপড়ে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, মুসলমানদের মজলিসগুলোতে উত্তম পোশাক পরে যাওয়া চাই। শাদী, ওরস ও দ্বীন প্রচারের জলসাগুলো- সর্বত্র এর প্রতি খেয়াল রাখা চাই। মজলিসগুলোতে মালা ও ফুলের তোড়া দেওয়ার উত্তম প্রমাণ হচ্ছে- এই হাদীস শরীফ।

১৭. যেহেতু এ অর্থ-সম্পদ ইসলামের প্রকাশ ও মুসলমানদের বিজয়ের চিহ্ন ছিলো। সেহেতু সেটাকে 'খায়র' (মঙ্গল) বলেছেন। অন্যথায় বেশীর ভাগ দারিদ্র ধনবান হওয়া থেকে এবং ধৈর্যধারণ করা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে উত্তম।

১৮. কেননা, জিহাদগুলোতে গণীমতের প্রচুর সম্পদ হাতে এসেছে এবং মুসলমানগণ দাস-দাসীদের মালিক হয়েছেন।

১৯. 'মিরক্বাত' প্রণেতা মহোদয় বলেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওফাত শরীফের নিকটবর্তী সময়ে নিজেই মসজিদ শরীফ সম্প্রসারণ করান। 'আশি''আহ্'-য় উল্লেখ করা হয়েছে যে, অতঃপর সাইয়্যেদুনা ওমর ফারূক্ব মসজিদ-ই নববী শরীফকে সম্প্রসারিত করেছেন। তারপর হযরত ওসমান গনী আপন খিলাফতকালে অতি শানদার ও প্রশস্ত মসজিদে পরিণত করেন। 'মিহরাব-ই ওসমানী' এখনো তাঁর স্মৃতি হিসেবে মওজুদ রয়েছে।

মোট কথা হচ্ছে- ইসলামের প্রাথমিক সময়ে জুমু'আহ্র গোসল ফরয ছিলো- উপরোল্লিখিত কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে। তারপর সুন্নাত হিসেবে থেকে যায়। 'ফরয হওয়া'র বিধান রহিত হয়ে গেছে।

****

بَابُ الْحَيْضِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا اِذَا حَاضَتِ الْمَرْاَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ فَسَئَلَ اَصْحٰبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ... الْاٰيَة﴾ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْئٍ اِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْيَهُوْدَ فَقَالُوْا مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ اَنْ يَّدَعَ مِنْ اَمْرِنَا شَيْئًا اِلَّا خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَآءَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ

অধ্যায় ঃ রজঃস্রাব[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৫০১।। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় ইহুদীরা[২] যখন তাদের মধ্যে স্ত্রীর রজঃস্রাব হতো, তখন না তাদের সাথে তারা আহার করতো, না তাদেরকে ঘরে সাথে রাখতো।[৩] হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ এ মাস্‌আলা হুযূরকে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন- "লোকেরা আপনাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে।" (আল-আয়াত) হুযুর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, 'সঙ্গম' ব্যতীত সব কিছু করতে পারো।[৪] এ সংবাদ ইহুদীদের নিকট পৌঁছলো। তখন তারা বললো, এ সাহিব আমাদের ধর্মীয় কার্যাদির মধ্য থেকে কোন একটি বিষয়েও বিরোধিতা না করে ছাড়েন না।[৫] অতঃপর হযরত উসায়দ ইবনে হুদ্বায়র[৬] ও আব্বাদ ইবনে

১. সুন্নাতসম্মত গোসলের পর ফরয গোসলসমূহের উল্লেখ করছেন। 'হায়য্' (حَيْض) ও 'হাউয' (حَوْض)-এর আভিধানিক অর্থ 'প্রবাহিত হওয়া।' শরীয়তের পরিভাষায়, নারীদের মাসিক রক্তকে, যা গর্ভাশয় থেকে আসে, 'হায়য' বলা হয়। সন্তান প্রসবের পর যেই রক্তক্ষরণ হয়, তাকে 'নিফাস' বলা হয়। রোগের কারণে রক্তক্ষরণকে 'ইস্তিহাযাহ্' (সুতিকা) বলা হয়।

'হায়য'-এর সময়সীমা কমপক্ষে তিনদিন তিন রাত এবং সর্বোর্ধ্ব দশদিন দশরাত। 'নিফাস'-এর সর্বনিম্ন সময়সীমা এক মুহূর্ত এবং সর্বোর্ধ্ব চল্লিশ দিন। 'ইস্তিহাযাহ্'-র কোন সময়সীমা নেই।

'হায়য' ও 'নিফায'-এর বিধানাবলী 'জানাবত' (নাপাকী)-এর মতো। এমতাবস্থায় নামায, রোযা, ক্বোরআন শরীফ পড়া ও স্পর্শ করা এবং মসজিদে যাওয়া- সবই হারাম।

২. হযরত ইয়াক্বূব আলাইহিস সালাম-এর সন্তানদেরকে 'ইহুদী' বলা হয়। কারণ তাঁর বড় ছেলের নাম 'ইয়াহুদা' ছিলো। অথবা এ জন্য যে, তারা বাছুর পূজা থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাওবা করেছে। ক্বোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে- اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ (নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি; ৭:১৫ তরজমা- কান্‌যুল ঈমান)

মোট কথা, তাদের সম্পর্ক হয়তো তাদের পিতৃপুরুষের দিকে অথবা তাদের নেক আমলের দিকে।

৩. বেশীর ভাগ হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ প্রথা এখনো প্রচলিত আছে; কিন্তু এ কাজ খুবই কষ্টকর হয়।

৪. অর্থাৎ হায়য সম্পন্নার সাথে থাকা, বসবাস করা, তার হাতের খাদ্য আহার করা, তার সাথে শয়ন করা, বসা, বরং আলিঙ্গন করা ইত্যাদি সবই হালাল। তবে তার সাথে সঙ্গম করা অকাট্যভাবে হারাম, যার অস্বীকারকারী কাফির।

৫. অর্থাৎ তাঁর ধর্মের ভিত্তি আমাদের বিরোধিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যাকে আমরা মন্দ জ্ঞান করি, সেটাকে তিনি বৈধ বলে দেন। ইহুদীদের এ প্রলাপ ইসলাম ও ইসলামের

بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا اَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَبَنٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَرْسَلَ فِيْ اٰثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا اَنَّهٗ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَاْمُرُنِيْ فَاَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِيْ وَاَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَاْسَهٗ اِلَيَّ

বিশ্‌র[৭] হাযির হয়ে বললো, "এয়া রসূলাল্লাহ্! ইহুদীরা এমন এমন বলছে। সুতরাং আমরাও কি রজঃস্রাবসম্পন্না স্ত্রীদেরকে আমাদের সাথে থাকতে দেবো না?"[৮] তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা-ই আন্ওয়ার (রাগে) বদলে গেলো। এমন কি আমরা বুঝে নিলাম যে, হুযূর তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।[৯] তারা দু'জন চলে গেলো। তাদের পরপর হুযূরের মহান দরবারে দুধের হাদিয়া আসলো। তখন হুযূর তাদের পেছনে লোক পাঠালেন (তাদেরকে ডাকার জন্য)। অতঃপর তাদেরকে দুধ পান করালেন। তখন তারা বুঝতে পারলো যে, তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন নি। [মুসলিম শরীফ]

৫০২।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম; অথচ আমরা উভয়ে জুনুবী হতাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন, আমি লুঙ্গী বেঁধে নিতাম। তখন তিনি আমার শরীরের সাথে লাগতেন, অথচ আমি রজঃস্রাবসম্পন্না ছিলাম।[১০] আর তিনি আপন শির মুবারক আমার দিকে বের করে দিতেন

পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে অপবাদ ছিলো। ইসলাম কারো বিরোধিতায় ভালো জিনিসকে মন্দ ও মন্দ জিনিসকে ভালো বলে নি।

৬. তিনি আনসারী ও আউস গোত্রীয়। হযরত মাস'আব ইবনে ওমায়রের হাতে হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। আক্বাবার দ্বিতীয় বায়'আত'-এ শরীক ছিলেন। বদর ও অন্যসব যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন।

৭. তিনি আনসারী। 'আবদুল আশ্হাল' গোত্রের লোক। হুযূরের হিজরতের পূর্বে হযরত মাস'আবের নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। সমস্ত জিহাদে হুযূরের সাথে ছিলেন।

৮. যাতে ইহুদীদের পূর্ণাঙ্গ বিরোধিতা হয়ে যায়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, সাহাবা-ই কেরামের অন্তরগুলোতে কাফিরদের প্রতি ঘৃণা পূর্ণ মাত্রায় ছিলো। আর এ ঘৃণাবোধ পূর্ণাঙ্গ ঈমানের চিহ্ন।

৯. হুযূরের এ ক্রোধ প্রকাশ বড় উপকারের ভিত্তিতে ছিলো। তা হচ্ছে কোন নাস্ ভিত্তিক বিধান কোন সম্প্রদায়ের বিরোধিতার জন্য বদলানো যেতে পারে না। দেখো, দাড়ি রাখা, গোঁফগুলো কাটানো- ইসলামের নির্দেশ। কিন্তু এখন শিখদের বিরোধিতার জন্য দাড়ি মুণ্ডন করা যাবে না। এ থেকে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, কোন কোন বিধান প্রকাশ্য ভাষায় দেওয়া হয়, আর কোন কোন বিধান দেওয়া হয় ইঙ্গিতে।

১০. এ থেকে বুঝা গেলো যে, হায়যসম্পন্ন স্ত্রীকে স্পর্শ করা জায়েয। তবে এটা তারই জন্য, যে নিজের নাফ্সের উপর ক্ষমতাবান। যদি সঙ্গম করে ফেলার আশঙ্কা থাকে, তাহলে (স্পর্শও) করবে না। যেমন, রোযাদারের জন্য আপন স্ত্রীকে চুমু দেওয়া। এ কাজটা যুবকের জন্য মাকরূহ, বৃদ্ধের জন্য

وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَشْرَبُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَاَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِيْ حِجْرِيْ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

ই'তিকাফরত অবস্থায় । আমি তা ধুয়ে দিতাম; অথচ আমি হায়য-সম্পন্না ছিলাম ।[১১] [বোখারী, মুসলিম]

৫০৩।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, আমি হায়যসম্পন্না অবস্থায় পান করতাম, তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওই পাত্র দিয়ে দিতাম। তখন তিনি আপন মুখ মুবারক আমি যেখানে মুখ রেখে পান করেছি ওই স্থানে রেখে পান করতেন। আমি হায়যসম্পন্না অবস্থায় হাড্ডি চুষতাম, তারপর তা হুযূরকে দিতাম। তখন তিনি আপন মুখ মুবারক আমার মুখের স্থানে রাখতেন।[১২] [মুসলিম শরীফ]

৫০৪।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে হেলান দিতেন, অথচ আমি হায়যসম্পন্না হতাম। অতঃপর তিনি ক্বোরআন তিলাওয়াত করতেন।[১৩] [বোখারী, মুসলিম]

জায়েয। নিজের ঘটনা এজন্য এরশাদ করেছেন যেন বুঝা যায় যে, আমি শোনাশুনি'র ভিত্তিতে নয়, বরং অভিজ্ঞতা থেকে বলছি- আমার নিজের কর্মও তেমনি। এটা এক প্রকার প্রচারণা; সভ্যতা বিরোধী কাজ নয়। আজকাল চিকিৎসকগণ চিকিৎসা বিষয়ক কথাগুলো অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে বলে থাকেন। ক্বোরআন করীম বলছে- لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ (তাদের গোপনাঙ্গগুলোর হিফাযতকারী; ২৩:৫)। সুতরাং এটাকে সভ্যতা ও শালীনতা বিরোধী বলা বোকামী বৈ-কিছুই নয়।

১১. কেননা, হুযূরের হুজরা শরীফের দরজা মসজিদের মধ্যে ছিলো। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হতে পারে না; কিন্তু শরীরের কিছু অংশ বের করতে পারবেন। আর হায়য সম্পন্না আপন স্বামীর খিদমত করতে পারে। তার শরীরও স্পর্শ করতে পারে।

১২. এ হাদীস থেকে কয়েকটা মাস্‌আলা প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. আপন স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট খাওয়া ও পান করা বৈধ; বরং সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। ফক্বীহগণ পুরুষকে নারীর উচ্ছিষ্ট খেতে যেই নিষেধ করেন, তা পরনারীর বেলায় প্রযোজ্য। সুতরাং ওই মাস্‌আলা এ হাদীসের বিরোধী নয়।

দুই. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবন-যাপন পদ্ধতি অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বরপূর্ণ ছিলো। সুতরাং উম্মতেরও সরলতা এবং সাদাসিধে পন্থা অবলম্বন করা চাই।

তিন. হাড্ডি মুখে শোষণ করা সুন্নাত। কাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়া খৃষ্টানদের কুপ্রথা।

চার. হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা ওই সৌভাগ্যবান স্ত্রী, যাঁর মুখের লালা বহুবার হুযূরের লালা মুবারকের সাথে একত্রিত ও মিশ্রিত হয়েছে। বিশেষ করে হুযূরের ওফাত শরীফের সময় মিস্‌ওয়াকের মধ্যে। হুযূরের এই হাড্ডি শোষন করা গোশ্‌ত ছাড়ানোর জন্য ছিলো না, তাতো পূর্বেই ছাড়ানো হতো, বরং ভালবাসা প্রকাশের জন্য ছিলো।

১৩. বুঝা গেলো যে, হায়য সম্পন্না স্ত্রীর হাঁটু কিংবা কোলে

وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ اِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيْ مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَاَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ ◆ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوْ اِمْرَاَةً فِيْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ

৫০৫।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "মসজিদ থেকে আমাকে চাটাই দাও।" আমি বললাম, "আমি তো হায়যসম্পন্না। এরশাদ ফরমালেন, "তোমার হায়য তোমার হাতে নয়।"[১৪] [মুসলিম]

৫০৬।। হযরত মায়মূনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটি চাদরে নামায পড়ছিলেন, যার কিছু অংশ আমার উপর ছিলো, আর কিছু অংশ ছিলো হুযূরের উপর; অথচ আমি ছিলাম হায়যসম্পন্না।[১৫] [বোখারী ও মুসলিম]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫০৭।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি হায়যসম্পন্না স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে কিংবা স্ত্রীর পায়খানার রাস্তায় (সঙ্গম করে) অথবা গণকের নিকট যায়, সে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার উপর অবতীর্ণকে অস্বীকার করেছে।[১৬] এটা তিরমিযী, ইবনে

মাথা রেখে ক্বোরআন পড়া বৈধ। কেননা, হায়য সম্পন্নার অপবিত্রতা সাময়িক (حُكْمِي); স্থায়ী (حَقِيْقِي) নয়। মৃতকে গোসল দেওয়ানোর পূর্বে অপবিত্র বাস্তবিক (حَقِيْقِي)ও হয়। এ কারণে গোসল দেওয়ানোর পূর্বে তার নিকটে, তাকে ঢেকে দেওয়া ব্যতীত ক্বোরআন পড়া নিষিদ্ধ। সুতরাং এ হাদীস শরীফ ওই মাসআলার বিরোধী নয়।

স্মর্তব্য যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বার কোল পবিত্র ক্বোরআন ও ক্বোরআনের ধারক মাহবূবের রিহাল হয়েছিলো- তখনো এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফের সময়ও। কারণ, হুযূরের ওফাত শরীফ তাঁর কোলে হয়েছে। আর তাঁর হুজুরা শরীফ হুযূরের আখেরী বিশ্রামাগার ছিলো। সুতরাং তাঁর কোল ও তার হুজুরা শরীফ আরশ-ই আযীম অপেক্ষাও উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা ওই বরকতময় দামনে আমার মতো অনুপযুক্ত পাপীকেও স্থান দিন! আমীন!! কবির ভাষায়-

ان کا پہلو ہے نبی کی آرام گاہ
ان کے حجروں میں قیامت تک نبی ہیں جاگزین

অর্থাৎ তাঁর পার্শ্বদেশ হচ্ছে নবীর আরামের স্থান। তাঁর হুজুরায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত নবী সদয় অবস্থানকারী।

১৪. অর্থাৎ 'তোমার জন্য এমতাবস্থায় মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ। ওখানে হাত বাড়িয়ে কিছু লওয়া নিষিদ্ধ নয়। এখনো ওই মাস্আলা বলবৎ। কাজেই, হায়য সম্পন্না ও জুনুবী (যার উপর গোসল করা ফরয) মসজিদের বাইরে রয়ে মসজিদের ভিতর হাত দিয়ে কোন কিছু নিতে পারে। এ হাদীস শরীফে 'চাটাই' মানে হুযূরের মালিকানার চাটাই। মসজিদে

مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ وَفِىْ رِوَايَتِهِمَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ لاَ نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ مِنْ حَكِيْمِ الْاَثْرَمِ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ-

وَعَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ اِمْرَأَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ مَا فَوْقَ الْاِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذٰلِكَ اَفْضَلُ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَقَالَ مُحْىُ السُّنَّةِ اِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِىٍّ-

মাজাহ্, দারেমী বর্ণনা করেছেন। এ দু'জনের বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, 'গণকের কথার সত্যায়ন করলে কাফির হয়ে যাবে।' ইমাম তিরমিযী বলেন, "আমরা এ হাদীস শরীফকে শুধু হাকীম আসরাম থেকে জানি; যিনি আবূ তামীমাহ্[১৭] থেকে, তিনি হযরত আবূ হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেন।

৫০৮।। হযরত মু'আয ইবনে জবল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমার জন্য আমার স্ত্রীর সাথে (তার) হায়যসম্পন্না থাকাবস্থায় কি কাজ হালাল?" এরশাদ ফরমান, "যা লুঙ্গির উপরে হয়; আর তা থেকেও বাঁচা উত্তম।"[১৮] এটা রযীন বর্ননা করেছেন। ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ্ বলেন, এর সনদ (সূত্র) মজবুত নয়।

ওয়াক্বফকৃত চাটাই নয়। কেননা, ওয়াক্বফকৃত চাটাই ঘরে এনে সেটার উপর নামায পড়া নিষিদ্ধ।

১৫. অর্থাৎ একই চাদর আমার উপরও থাকতো, আর নামাযরত অবস্থায় হুযূরের উপরও। এ থেকে বুঝা গেলো যে, হায়যসম্পন্নার দেহ প্রকৃত নাপাক নয়। অন্যথায় এমন কাপড়, যার একাংশ নাপাকির উপর থাকে, তা শরীরের উপর রেখে কিংবা পরিধান করে নামায পড়া নিষিদ্ধ। স্মর্তব্য যে, হাদীস শরীফের এ বচনগুলো না বোখারী শরীফে আছে, না মুসলিম শরীফে; বরং এর কিছুটা বিষয়বস্তু রয়েছে বোখারী শরীফে। [মিরক্বাত]

১৬. অর্থাৎ এ তিন ব্যক্তি ক্বোরআন ও হাদীসের অস্বীকারকারী হয়ে কাফির হয়ে গেছে। স্মরণ রাখবেন এখানে শরীয়তসম্মত কুফর বুঝানো উদ্দেশ্য, যা ইসলামের বিপরীত। আর ওইসব লোক বলতে বুঝায় যারা স্ত্রীর পায়খানার রাস্তায় কিংবা হায়যসম্পন্না অবস্থায় সঙ্গম করাকে বৈধ মনে করে সঙ্গম করে এবং গণক ও নজূমীকে অদৃশ্যজ্ঞাতা জেনে তার দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করে, কিংবা অদৃশ্যের খবরাদি জিজ্ঞাসা করে। আর যদি গুনাহ্ মনে করে এ কাজগুলো সম্পন্ন করে, তবে তা হবে ফাসেক্বী, কুফর নয়। অথবা এখানে 'কুফর' মানে আভিধানিক অর্থে কুফর; অর্থাৎ অকৃতজ্ঞতা। মহান রব এরশাদ ফরমান–

وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ (এবং তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো না; ২:১৫২)

স্মর্তব্য যে, হায়যসম্পন্নার সাথে সঙ্গম করা হারাম হবার বিধান ক্বোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন– قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ (আপনি বলুন, সেটা অশুচিতা। সুতরাং তোমরা স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকো! ২:২২২) আর স্ত্রীর পায়ুতে সঙ্গম করা অকাট্যভাবে হারাম হওয়া অকাট্য ক্বিয়াস (قیاس قطعی) দ্বারা প্রমাণিত। ওই উভয়ের অস্বীকারকারী কাফির।

এ ধরণের হাদীস শরীফগুলো অকাট্যভাবে হারাম প্রমাণ করতে পারে না। এর বিস্তারিত বিবরণ এ স্থানে 'মিরক্বাত'-এ দেখুন! আর আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব ঃ ১ম খণ্ড'র 'ক্বিয়াস'-এর বিবরণ সম্বলিত অধ্যায়ে দেখুন।

মোট কথা, এ হাদীস শরীফগুলো 'যান্নী' (ظنی) আর (دلیل قطعی) (অকাট্যভাবে হারাম) প্রমাণ করার জন্য حرمت قطعی 'অকাট্য প্রমাণ'-এর দরকার।

১৭. আবূ তামীমা জাহমীর নাম 'যরীফ ইবনে মুজালিদ'। হাকীম ইবনে আস্রামকে কোন কোন মুহাদ্দিস 'দুর্বল' বলেছেন। 'যরীফ'কে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে ৯৭ হিজরীতে। ইমাম বোখারী এ হাদীসকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। (আশি''আহ্)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِاَهْلِهٖ وَ هِىَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ۔

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ دَمًا اَحْمَرَ فَدِيْنَارٌ وَاِذَا كَانَ دَمًا اَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ قَالَ اِنَّ رَجُلاً سَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

৫০৯।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন কেউ আপন স্ত্রীর সাথে তার 'হায়য' অবস্থায় সঙ্গম করে বসে, তবে সে যেন অর্দ্ধ দীনার খায়রাত করে।[১৯] [তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারেমী, ইবনে মাজাহ]

৫১০।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযূর এরশাদ করেন, 'যখন রক্ত লাল হয়, তখন এক দীনার দেবে, আর যখন রক্ত হলদে হয়, তখন দেবে অর্দ্ধ দীনার।[২০] [তিরমিযী]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫১১।। হযরত যায়দ ইবনে আসলাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[২১] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আরয করলো,

১৮. অর্থাৎ হায়যসম্পন্না স্ত্রী, যখন পায়জামা কিংবা লুঙ্গি মজবুত করে বাঁধে, তখন তাকে জড়িয়ে ধরা এবং চুম্বন-আলিঙ্গন করা দুরস্ত আছে। তবে তা থেকেও বিরত থাকা উত্তম; বিশেষ করে ওই যুবকের জন্য, যে এমতাবস্থায় নিজেকে সামলাতে পারে না।

স্মর্তব্য যে, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আমল শরীফ নিজে করা তা বৈধ বলে প্রমাণ করার জন্যই। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো মুস্তাহাব নয় এমন বরং 'মাকরূহ' কাজকে সম্পন্ন করে তা জায়েয বা বৈধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতেন। এটাও এক ধরনের ধর্মপ্রচার ছিলো। এজন্যও হুযূর সাওয়াব পেতেন।

১৯. এটা 'মুস্তাহাব নির্দেশক' হুকুম। অর্থাৎ যেহেতু সে বড় গুনাহ্ করেছে, যার কারণে সে শাস্তির উপযোগী হয়ে গেছে আর সাদ্ক্বাহ্ ও খায়রাত শাস্তি দূর করার জন্য মহৌষধ, সেহেতু এমন করবে। অন্যথায় ওই গুনাহ্র আসল কাফ্ফারা তো তাওবাই। আজকাল কোন কোন আলিম কোন কোন গুনাহ্র জন্য দান-খায়রাত করার যেই নির্দেশ দেন, তাঁদের দলীল হচ্ছে এই হাদীস। এখানে ওই ব্যক্তির কথা বুঝানো হয়েছে যে 'হারাম' জেনে ওই পাপকাজ সম্পন্ন করে। আর যদি হালাল জেনে এমনি করে, তবে তো কাফির হয়ে গেছে। সে যেনো পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে ও আপন স্ত্রীর সাথে কৃত বিবাহকে নবায়ন করে নেয়।

২০. হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার এ হাদীস 'মতন' (বচন) ও 'ইসনাদ' (সূত্র) উভয় দিক দিয়ে 'মুদ্বত্বারাব' (স্ববিরোধী); কেননা, তাঁরই কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, পাঁচ দীনার খরচ করবে। আর অন্য বর্ণনায় এসেছে- এক দীনার সাদক্বাহ্ করবে। তাছাড়া, তা সম্ভব না হলে আধা দীনার ব্যয় করবে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে- যদি হায়য-এর বেগ না থাকে, রক্তও লাল রং-এর আসছে, তবে এক দীনার খরচ করবে। আর যদি হায়য-এর বেগ খতম হয়ে যায়, রক্তের রং হলদে হয়ে যায়, তবে আধা দীনার সাদক্বাহ্ করবে।

فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ اِمْرَأَتِىْ وَهِىَ حَآئِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم تَشُدُّ عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثُمَّ شَانُكَ بَاَعْلَاهَا . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارِمِىُّ مُرْسَلاً

وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَلَمْ نَقْرَبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتّٰى نَطْهُرَ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ

بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَآئَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ

"আপন স্ত্রী থেকে তার হায়য় অবস্থায় কোন্ জিনিষ হালাল?" রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "সে তার লুঙ্গি মজুবত করে বেঁধে নেবে, তারপর লুঙ্গির উপরিভাগে তোমার কাজ।"[২২] এটা ইমাম মালিক ও দারেমী 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৫১২।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমি হায়যসম্পন্না হতাম, তখন বিছানা থেকে চাটাইর উপর নেমে আসতাম। তারপর আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসতাম না– যতদিন না আমি পবিত্র হয়ে যেতাম।[২৩] [আবূ দাউদ]

অধ্যায় ঃ ইস্‌তিহাযাহ্-পীড়িত নারী[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৫১৩।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবী

স্মর্তব্য যে, দশ দিরহামে এক দীনার হয়। আর দিরহাম হয় সাড়ে চার আনায়। সুতরাং এক দীনারে হয় প্রায় পৌণে তিন রুপী। অতএব, স্বর্ণের দর খুব চড়া থাকলে দীনারের দামও বেশী হয়ে যায়। কিন্তু এসব বিধানে ওই যুগের মূল্যমানই হিসেবের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে।

২১. তিনি মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসী। অতি উচ্চ মর্যাদাবান তাবে'ঈ। হযরত ওমর ফারুক্বের আযাদকৃত ক্রীতদাস। বড় আলিম ছিলেন। এমনকি ইমাম যয়নুল আবেদীন তাঁর মজলিস শরীফে শরীক হতেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস শরীফ গ্রহণ করতেন। [আশি''আহ্ ও মিরক্বাত]

২২. অর্থাৎ হায়যসম্পন্নার সাথে সঙ্গম করা হারাম। আর যখন সে কাপড় (লুঙ্গী) বাঁধে, তখন তাকে চুম্বন-আলিঙ্গন করা হালাল। এর আলোচনা গত হয়েছে– যুবকের জন্য নিষিদ্ধ, বৃদ্ধের জন্য মুবাহ্। কারণ, তার দিক থেকে সঙ্গম করে নেওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

২৩. অর্থাৎ আমরা সমস্ত পবিত্র বিবি হায়যসম্পন্না থাকাবস্থায় হুযূরের পাশে শয়ন করতাম না, বরং আলাদা চাটাইর উপর তাঁর বিছানা থেকে দূরে থাকতাম। এটাতো আমাদের আমল ছিলো যে, হুযূরের পাশে শয়ন করা ও বসার সাহস করতাম না। অবশ্য, যদি হুযূর-ই আন্ওয়ার নিজেই আমাদেরকে ডেকে নিতেন, তবে আমরা নির্দেশ পালন করতাম। সুতরাং এ হাদীস শরীফ পূর্বে উল্লেখিত হাদীস শরীফগুলোর বিরোধী নয়, যেগুলো দ্বারা একসাথে উঠাবসা, থাকা ও স্পর্শ করা ইত্যাদির প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, তা হুযূর-ই আন্ওয়ারের নির্দেশেই করা হতো। আর এখানে হুযূরের পবিত্র বিবিগণের নিজেদের সাহস বা দুঃসাহসের বর্ণনা এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন– এ হাদীস মানসুখ (রহিত)। আর পূর্ববর্তী `হাদীসগুলো নাসিখ (রহিতকারী)। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা শক্তিশালী।

****

১. 'ইস্তিহাযাহ্-পীড়িত নারী' হচ্ছে– যার 'ইস্তিহাযার

حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِمْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ لَا اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَاِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِىْ الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّىْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهٗ دَمٌ اَسْوَدُ

হুবায়শ্ হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে হাযির হলো।[২] আর আরয করলো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি 'ইস্তিহাযাহ্-পীড়িত মহিলা। পবিত্রই হতে পারছি না। কাজেই, আমি কি নামায ছেড়ে দেবো?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "না। এটাতো রগ,[৩] হায়য নয়। যখন তোমার হায়য আসে তখন নামায ছেড়ে দিও। আর যখন চলে যায়, তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং নামায পড়ে নেবে।"[৪] [বোখারী, মুসলিম]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫১৪।। হযরত ওরওয়াহ্ ইবনে যোবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইস্তিহাযাহ্ পীড়িত হয়ে যেতেন। তাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যখন হায়য-এর রক্ত হয়, তখন তা কালো বর্ণের রক্ত হয়,

রক্তক্ষরণ হয়। 'ইস্তিহাযাহ্' একটি রোগ, যাতে নারীর রগ খুলে গিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়। এ রক্ত 'হায়য' (রজঃস্রাব) কিংবা 'নিফাস' (প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ)-এর নয়। এর কোন সময়সীমা নেই। এমতাবস্থায় নামায, রোযা, সঙ্গম, মসজিদে প্রবেশ করা কোনটাই নিষিদ্ধ নয়; বরং তার বিধান হচ্ছে 'অপারগ' (ওযরসম্পন্না)'র মতোই। তা হচ্ছে– এক ওয়াক্তের ওযূ করে নামায পড়তে থাকবে, যদিও রক্তক্ষরণ হতে থাকে, তবে ওয়াক্বত সমাপ্ত হবার সাথে সাথে ওই ওযূও ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২. মাস্আলা জিজ্ঞাসা করার জন্য ও দ্বীন হাসিল করার জন্য। তিনি ছিলেন ফাতিমা বিন্তে হুবায়শ্ ইবনে আবদিল মুত্তালিব ইবনে আসাদ ইবনে আবদিল ওয্যা ইবনে কু্সাই ইবনে কিলাব। এ আবদুল মুত্তালিব হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পিতামহ নয়। তিনি তো আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম।

৩. অর্থাৎ গর্ভাশয়ের নিকটস্থ কোন রগ খুলে গেছে, যা থেকে এ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এটা গর্ভাশয়ের রক্ত নয়। সুতরাং এর বিধানাবলীও 'হায়য' কিংবা 'নিফাস'-এর মতো নয়।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, নারী আলিমের নিকট মাস্আলা জিজ্ঞাসা করতে এবং আলিমও মাসআলা বলতে লজ্জাবোধ করবেন না। অন্যথায় দ্বীনের প্রচার কিভাবে হবে?

৪. অর্থাৎ 'ইস্তিহাযাহ্'র রোগ আরম্ভ হবার পূর্বে তোমার যেই তারিখে 'হায়য্'-এর রক্ত আসতো, ওই তারিখগুলোই এখনো 'হায়য্'-এর বলে বিবেচনা করো। ওই দিনগুলোতে নামায ইত্যাদি ছেড়ে দাও, আর ওই তারিখগুলোর পরবর্তী রক্তকে ইস্তিহাযার বলে গণ্য করো এবং নামায ইত্যাদি আরম্ভ করে দাও। তাছাড়া, যে সব নারীর বালেগ হতেই 'ইস্তিহাযাহ্' আরম্ভ হয়ে যায়, হায়য-এর তারিখগুলো নির্দ্ধারিত হতে পারে না, তারা প্রতি মাসের প্রথম দশদিন 'হায়য'-এর গণ্য করবে, আর বাকী বিশ দিন 'ইস্তিহাযা'র। এভাবে আমল করার মধ্যেই সতর্কতা রয়েছে।

এখানে রক্ত ধুয়ে ফেলার অর্থ হচ্ছে– যদি 'হায়য'-এর রক্ত

يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَامْسِكِى عَنِ الصَّلٰوةِ فَإِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّأِىْ وَصَلِّىْ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَآئِىُّ

وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا اُمُّ سَلَمَةَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِىْ وَالْاَيَّامِ الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَهَا الَّذِىْ اَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ

যা চেনা যায়।[৫] সুতরাং যখন এ রক্তক্ষরণ হতে থাকে, তখন নামায থেকে বিরত থাকো। আর যদি অন্য রক্ত হয়, তবে ওযূ করো ও নামায পড়ো। কারণ, তাতো রগ।"[৬] [আবূ দাঊদ, নাসা'ঈ]

৫১৫।। হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক নারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে রক্ত প্রবাহিত করছিলো।[৭] তার সম্পর্কে হযরত উম্মে সালামাহ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে ফাত্‌ওয়া জিজ্ঞাসা করলেন।[৮] হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "সে যেন মাসের রাত ও দিন গুণে নেয়, যেগুলোতে এ রোগ শুরু হবার পূর্বে 'হায়য' আসতো। মাসে ততদিন নামায ছেড়ে দেবে। তারপর যখন এ দিনগুলো গত হয়ে যাবে, তখন গোসল করে নেবে অতঃপর

বুঝায়, তবে 'ধুয়ে ফেলা' মানে গোসল করে ফেলা। কেননা, 'হায়য' খতম হলে গোসল করা ফরয। আর যদি 'ইস্তিহাযা'র রক্ত বুঝায়, তবে অর্থ হবে- আপন শরীর ও কাপড় থেকে 'ইস্তহাযা'র রক্ত ধুয়ে নেবে, তারপর ওযূ করে নামায পড়ে নেবে। তাতে গোসল ওয়াজিব নয়। সুতরাং এর উপর এই আপত্তি হতে পারে না যে, 'ইস্তিহাযাহ্-পীড়িত নারী হায়য-এর পর গোসল তো অবশ্যই করবে; কিন্তু এখানে শুধু রক্ত ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন?'

৫. এটা অধিকাংশের বেলায় প্রযোজ্য সব ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ অধিকাংশ হায়য-এর রক্ত কালো বর্ণের হয়; যা চেনা যায়। অন্যথায় এ রক্ত লাল-হলদেও হয়ে থাকে এবং পার্থক্য করা মুশ্‌কিল হয়ে যায়।

৬. এর অর্থ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে ইস্তিহাযাহ চলাকালে প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথকভাবে ওযূ করে নামায পড়ে নাও। এ অর্থ নয় যে, হায়য অতিবাহিত হয়ে গেলে শুধু ওযূ করে নাও। তখন তো গোসল ফরয। সুতরাং এ হাদীস শরীফ অন্যান্য হাদীসের বিরোধী নয়।

৭. এ সম্মানিত মহিলার নাম জানা যায় নি। تُهَرَاقُ ও تُهْرِيْقُ উভয় রূপে বর্ণিত হয়েছে। ه (হা) অতিরিক্ত। تُرِيْقُ : مجهول কিংবা مضارع معروف -এর باب افعال কিংবা تُرَاقُ ছিলো।

৮. অর্থাৎ নিজে তো লজ্জার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি, হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহকে জিজ্ঞাসা করেছেন। হযরত উম্মে সালামাহ্ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে তাঁকে মাস্‌আলা বলেছেন।

স্মর্তব্য যে, ওই পবিত্র বিবিগণের বিভিন্ন অবস্থা হতো- কেউ কেউ মাস্‌আলা জানার বিষয়কে লজ্জা-শরমের উপর প্রাধান্য দিতেন, আর কেউ কেউ লজ্জার কারণে জিজ্ঞাসা করতেন না; অন্য কারো মাধ্যমে জেনে নিতেন। তাঁরা সবাই আল্লাহর প্রিয় ছিলেন। এরশাদ হয়েছে- وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى (আর আল্লাহ্ সকলের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন; ৪:৯৫)। সবার সাথে জান্নাতের এ ওয়াদা হয়ে গেছে।

لِتَسْتَشْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالدَّارِمِىُّ وَرَوَى النَّسَآئِىُّ مَعْنَاهُ.

وَعَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ يَحْىَ بْنُ مُعِيْنٍ جَدُّ عَدِىِّ اِسْمُهٗ دِيْنَارٌ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَآئِهَا الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُ فِيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّىْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ

وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ اُسْتَحَاضُ حِيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَاَتَيْتُ

কাপড়ের লেঙ্গুট বাঁধবে। তারপর নামায পড়তে থাকবে।[৯] [মালিক, আবূ দাঊদ, দারেমী] ইমাম নাসাঈ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন।

৫১৬।। হযরত 'আদী ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত[১০], তিনি আপন পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, ইয়াহ্য়া ইবনে মু'ঈন বলেন, 'আদীর দাদার নাম দীনার, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইস্তিহাযাহ্-পীড়িত নারীর প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন, সে তার 'হায়য' (ঋতুস্রাব)-এর সময়সীমার মধ্যে, যাতে তার হায়য (ঋতুস্রাব) আসতো, নামায ছেড়ে দেবে। তারপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্বতে ওযূ করবে[১১] আর রোযা রাখবে ও নামায পড়বে।[১২] [তিরমিযী, আবূ দাঊদ]

৫১৭।। হযরত হামনাহ্ বিনতে জাহ্শ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত,[১৩] তিনি বলেন, 'আমার তীব্র বেগে ইস্তিহাযাহ্ আসছিলো।[১৪] অতঃপর আমি

---

৯. অর্থাৎ ইস্তিহাযাহ্-পীড়িত নারী নিজের প্রতিটি মাসকে দু'ভাগে বিভক্ত করবে। এক ভাগকে হায়য-এ গণ্য করবে– তিন দিন থেকে দশদিন পর্যন্ত, যেভাবে ইতোপূর্বে 'হায়য' আসতো। এ দিনগুলো 'হায়য'-এর আর বাকী দিনগুলো ইস্তিহাযার।

ইস্তিহাযাহ্ পীড়িত নারীর জন্য লেঙ্গুট বাঁধার বিধান 'মুস্তাহাব নির্দেশক' এবং সতর্কতা অবলম্বনের জন্য; যাতে রক্ত পড়ে 'মুসাল্লা ও কাপড় অপবিত্র না হয়; ওয়াজিব-নির্দেশক নয়। যদি লেঙ্গুট ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়, তবে তা করবে। আর যদি কোন প্রকারে রক্ত বন্ধ না হয়, তাহলে নামায পড়তে থাকবে, যদিও রক্ত মুসাল্লার উপর পড়তে থাকে। অন্যান্য বর্ণনায় এমনি এসেছে। সমস্ত ওযর সম্পন্নের জন্য এই বিধান। যেমন নাক থেকে রক্তক্ষরণ পীড়িত ও যাদের প্রস্রাব বন্ধ হয় না, তাদের বিধান।

১০. এ আদী কূফী আনসারী। তার উপর 'রাফেযী' হবার সন্দেহ করা হয়েছে। [মিরক্বাত] কেউ কেউ বলেন, "সাবিত তার পিতার নাম।" কেউ কেউ বলেছেন, "সাবিত দাদার নাম।" আর দীনার হচ্ছে তার দাদার পিতার নাম। পিতার নাম ক্বায়স ইবনুল হাত্বীম। [আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাতা]

আদী কূফায় রাফেযীদের মসজিদের ইমাম ছিলো। ১১৬ হিজরীতে মারা যায়।

১১. অর্থাৎ গোসল তো শুধু একবার করবে 'হায়য' খতম হলে। আর ওযূ করবে প্রত্যেক নামাযের সময়; যেমনিভাবে 'ইস্তিহাযা-পীড়িত' নারীর জন্য বিধান রয়েছে। সুতরাং عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ - تَتَوَضَّأُ এর ظرف (সময়) বুঝায়, تغتسل -এর নয়। (অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের সময় ওযূ করবে, গোসল করবে না। গোসল করবে হায়য শেষ হলে একবার।)

১২. যেহেতু ইস্তিহাযাহ্-পীড়িতের জন্য রোযা নামায অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, তার উপর 'হায়য'-এর

النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَفْتِيْهِ وَاُخْبِرُهٗ فَوَجَدْتُّهٗ فِىْ بَيْتِ اُخْتِىْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَاتَاْمُرُنِىْ فِيْهَا قَدْ مَنَعَتْنِى الصَّلٰوةَ وَالصِّيَامَ قَالَ اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَاِنَّهٗ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِىْ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِىْ ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاٰمُرُكِ بِاَمْرَيْنِ اَيَّهُمَا صَنَعْتِ اَجْزَاَ عَنْكِ مِنَ الْاٰخَرِ وَاِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ قَالَ لَهَا

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে ও এর খবর দিতে হাযির হলাম। আমি আমার বোন যয়নাব বিনতে জাহ্শের ঘরে হুযূরকে পেলাম।[১৫] আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমার খুব তীব্রভাবে ইস্তিহাযাহ্ আসছে। আপনি আমাকে এ সম্পর্কে কি নির্দেশ দিচ্ছেন? আমাকে তো তা প্রত্যহ নামায ও রোযা থেকে রুখে দিয়েছে।"[১৬] হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আমি তোমার জন্য গদির উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, তা রক্ত চুষে নেবে।"[১৭] তিনি আরয করলেন, "তা তো এটা থেকে বেশী।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, তা হলে তুমি লেঙ্গুট বেঁধে নাও।"[১৮] আরয করলেন, "তা তো এটা থেকেও বেশী।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তা হলে তুমি লেঙ্গুট বেঁধে রাখো।"[১৯] আরয করলেন, "ওই রক্ত তা থেকেও বেশী। আমি তো রক্ত ঢেলেই দিচ্ছি, প্রবাহিত করেই চলেছি।"[২০] তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "আমি তোমাকে দু'টি নির্দেশ দিচ্ছি– তন্মধ্যে যেটাই করে নেবে, তা তোমার জন্য অপরটার মোকাবেলায় যথেষ্ট হবে। আর যদি উভয়টি করতে পারো, তবে তুমিই জানো।"[২১] হুযূর তার উদ্দেশে এরশাদ ফরমান,

দিনগুলোতে রোযা ক্বাযা করা জরুরী, নামাযের (ক্বাযা) নয়, সেহেতু রোযাকে নামাযের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩. তিনি হযরত উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনতে জাহ্শের বোন ও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শ্যালিকা। প্রথমে তিনি হযরত মাস্'আব ইবনে ওমায়রের বিবাহাধীন ছিলেন। তিনি শাহাদত বরণ করার পর হযরত ত্বালহা ইবনে আবদুল্লাহ্'র বিবাহাধীন হন। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম)

১৪. অর্থাৎ আমার 'ইস্তিহাযা'র রক্ত খুব বেশী আসছিলো এবং দীর্ঘদিন যাবত আসতে থাকে। شَدِيْدَةً ও كَثِيْرَةً - এর মধ্যে এ দু'এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে 'ইস্তিহাযা'কে রূপকভাবে 'হায়য' বলা হয়েছে।

১৫. অর্থাৎ ওইদিন হুযূরের অবস্থানের পালা আমার বোন যায়নাব বিনতে জাহ্শের ঘরে ছিলো। এ কারণে প্রশ্ন করা আমার জন্য আরো সহজ হয়ে গেলো।

১৬. কেননা, হযরত হামনাহ্ মনে করেছিলেন যে, 'হায়য'-এর মতো 'ইস্তিহাযাহ-পীড়িত' থাকাবস্থায়ও নামায-রোযা নিষিদ্ধ। এ দরখাস্ত বা জিজ্ঞাসাদি নিজের জ্ঞানানুসারে ছিলো।

১৭. অর্থাৎ গদি ইত্যাদির পরামর্শ এজন্য যেন রক্ত কাপড়ে না লাগে এবং কাপড় খারাপ না হয়। সুতরাং এটা হচ্ছে পরামর্শ; হুকুম নয়।

১৮. এভাবে যে, গোপনাঙ্গের সাথে মিলিয়ে নিচে গদি রাখো। এর উপর কাপড়ের লেঙ্গুট টেনে বেঁধে দাও, যাতে রক্ত টপকে না পড়ে।

১৯. এভাবে যে, নিচে রুই'র গদি থাকবে, উপরে থাকবে লেঙ্গুট। আর লেঙ্গুটের উপর তৃতীয় একটি কাপড়, যা রক্ত চুষে নিতে সাহায্য করে।

২০. ثَجّ (সাজ্জ) প্রবহমান বৃষ্টিকে বলে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন– مَآءً ثَجَّاجًا (প্রবহমান পানি)। অর্থাৎ আমার

إِنَّمَا هٰذِهٖ رَكْضَةٌ مِّنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطٰنِ فَتَحَيَّضِىْ سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ حَتّٰى اِذَا رَاَيْتِ اَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَاْتِ فَصَلِّىْ ثَلٰثًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَوْ اَرْبَعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَاَيَّامَهَا وَصُوْمِىْ فَاِنَّ ذٰلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذٰلِكَ فَافْعَلِىْ كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَآءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيْقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَاِنْ قَوِيْتِ عَلٰى اَنْ تُؤَخِّرِيْنَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِيْنَ

"এ রোগ শয়তানের ধাক্কাগুলোর মধ্যে একটা ধাক্কা।[২২] তুমি ছয় অথবা সাতদিনকে হায়যের বলে গণ্য করো, আল্লাহর জ্ঞানে।[২৩] তারপর গোসল করে নাও। তারপর যখন এটা মনে করে নিতে পারো যে, তুমি খুব পাক-সাফ হয়ে গেছো, তখন তেইশ কিংবা চব্বিশ দিন ও রাতে নামাযগুলো পড়তে থাকো, রোযা রাখো।[২৪] কারণ, এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। প্রত্যেক মাসে এভাবেই করো। যেমন সাধারণত নারীগণ আপন আপন 'হায়য' ও 'তোহ্‌র' (যথাক্রমে রজঃস্রাব ও তা থেকে পবিত্রতা)'র সময়সীমার মধ্যে (যথাক্রমে) নাপাক ও পাক থাকে।[২৫] আর যদি তুমি এটা করতে পারো যে, যোহরের নামায দেরীতে ও আসরের নামায শীঘ্র

রক্ত তেমনিভাবে বের হয়, যেমন বৃষ্টির প্রবহমান পানি, যা কোন তাদবীর বা ব্যবস্থাপনায়ই বন্ধ হয় না, না কোন জিনিষে চুষিত হয়।

২১. অর্থাৎ যদি আমার বাতলানো কাজ দু'টি করে নাও, তবে ভালো, অন্যথায় কোন একটাই যথেষ্ট। অর্থাৎ একটা অনুসারে কাজ করার জন্য 'রুখ্‌সাত' (শিথিলতা) রয়েছে, উভয়টি করার মধ্যে 'আযীমত' (দৃঢ় ও প্রাণপণ প্রত্যয়) রয়েছে।

২২. অর্থাৎ রক্তের আধিক্য শয়তানের প্রভাবাদি থেকে হয়েছে। সে তোমার গর্ভাশয়ের রগের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা মেরেছে, যার কারণে এ রোগের সৃষ্ট হয়েছে।

বুঝা গেলো যে, যেভাবে মানুষের খোঁচার আঘাতের কারণে রোগ-ব্যাধি পয়দা হয়ে যায়, মাথা ফেটে যায়, তেমনি শয়তানের প্রভাবেও কোন কোন রোগ পয়দা হয়। ক্বোরআন করীম বলছে يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (অর্থাৎ শয়তান স্পর্শ করে তাকে পাগল করে দেয়; ২:২৭৫) বুঝা গেলো যে, শয়তান মানুষকে স্পর্শ করে পাগল করে দেয়। আরো এরশাদ ফরমান- وَمَآ اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ (এবং তাকে শয়তানই ভুলিয়ে দিয়েছে; ১৮:৬৩)। বুঝা গেলো যে, শয়তানের প্রভাবে (মানুষের মধ্যে) ভুলে যাবার রোগ সৃষ্টি হয়।

অর্থ এ যে, মনের এ সন্দেহ- 'আমার উপর নামায ফরয থাকে নি', অথবা 'ইস্তিহাযাহ্‌ (রোগ) নামাযের জন্য অন্তরায়'- শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।

অথবা 'হায়য' ও 'নিফাস' (তথা ইস্তিহাযাহ) মিশ্রিত হয়ে যাওয়া, তাতে পার্থক্য করতে না পারা শয়তানের পক্ষ থেকেই।

২৩. 'ইল্‌মুল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌র জ্ঞান) মানে 'আল্লাহ্‌র হুকুম'। অর্থাৎ এ রোগের পূর্বে তোমার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র যেই নির্দেশ (বিধান) ছিলো, যেমন- মাসে এতোদিন হায়যের; যেগুলোতে নামাযসমূহ মাফ; এতোদিন পবিত্রতার, যেগুলোতে নামায ফরয।

অথবা 'ইল্‌মুল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌র ইল্‌ম) মানে আল্লাহ্‌র বাতলিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ যা কিছু মহান রব তোমাকে এ রোগের পূর্বে নিজের 'হায়য'-এর দিনগুলো ও পবিত্রতার সময়সীমা সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছিলেন, তারই প্রতি যত্নবান হও। ওই হিসাব এখনো প্রযোজ্য হবে।

২৪. অর্থাৎ যদি তোমার এ রোগের পূর্বে প্রতিমাসে ছয়দিন 'হায়য' স্থায়ী হতো, আর চব্বিশ দিন পবিত্র থাকতে, তবে এখনো ওই হিসাব রাখো। আর যদি সাত দিন 'হায়য' ও তেইশদিন 'পবিত্রতা' থাকতো, তবে ওই হিসাব এখনো রাখো।

الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَآءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ فَافْعَلِىْ وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِىْ وَصُوْمِىْ اِنْ قَدَرْتِ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذَا اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ

পড়বে, তা হলে একটা গোসল করো, আর দু'টি নামায- যোহর ও আসর একত্রে পড়ে নাও। আর যদি এটা সম্ভব হয় যে, মাগরিব দেরীতে ও এশা শীঘ্র একত্রিত করে নেবে, তাহলে তেমনি করো। তাছাড়া, ফজরের সাথে গোসল করতে পারলেও তা করো এবং রোযা রাখো যদি এর সামর্থ্য রাখো। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, উভয় কাজের মধ্যে আমার নিকট এটা পছন্দনীয়।"২৬ [আহমদ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

আর 'হায়য'-এর দিনগুলো অতিবাহিত হতেই একবার মাত্র গোসল করে নাও। আর অবশিষ্ট দিনগুলোতে প্রত্যেক নামাযের সময় ওযূ করে নামায পড়তে থাকো। এটা যথেষ্ট।

২৫. অর্থাৎ এ মাসআলায় ইস্তিহাযাহ্-পীড়িত নারী সুস্থ নারীদের মতোই হবে।

২৬. এ আমল অতিমাত্রায় উত্তমরূপে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমও, এ রোগের চিকিৎসাও। হুযূর শুধু জান ও ঈমানের চিকিৎসাকারী নন, বরং শরীরের চিকিৎসাকারীও। এ আমলের সারকথা হচ্ছে- 'ইস্তিহাযাহ্-পীড়িত নারী দৈনিক তিনবার গোসল করে নেবে- প্রথম গোসল ফজরের নামাযের জন্য; দ্বিতীয় গোসল করবে যোহরের সময়ের শেষ ভাগে। গোসল করতেই যোহরের নামায পড়ে নেবে; যোহর পড়তেই আসরের সময় এসে যাবে। তাও পড়ে নেবে। যোহরের নামায সেটার ওয়াক্বতের শেষ ভাগে পড়বে। আর আসর পড়বে সেটার ওয়াক্বতের প্রথম ভাগে। তৃতীয় গোসল মাগরিবের শেষ সময়ে করবে। ওই গোসলে মাগরিব ও এশা- উভয় নামায সম্পন্ন হয়ে যাবে; মাগরিব সেটার শেষ সময়ে আর এশা সেটার সময়সীমার প্রথম ভাগে- যেভাবে মুসাফির সফরের সময় নামাযগুলো একত্রে পড়ে থাকে।★

এ দু'নামায একত্রিকরণের হুকুম শরীয়তের অপরিহার্য বিধান নয়; সুতরাং যদি ওই নারী পাঁচ নামাযের জন্য পাঁচ বার গোসল করে, তবে তা অধিকতর ভালো। মোট কথা, এটা একটা পরামর্শ; শরীয়তে অপরিহার্য করার জন্য কোন হুকুম নয়।

আল্লাহর মুখাপেক্ষী বান্দা (আমি অধম)'র এ ব্যাখ্যা আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে এ হাদীসের মর্মার্থ অনুধাবন করাকে সহজ করে দেবে। আর এটা হানাফী মাযহাবের বিরোধীও হবে না। ইমাম-ই আ'যম ওই ধরনের নারীকে এ ইখ্‌তিয়ার দিচ্ছেন। (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

তদুপরি, এ অভিমত হযরত আলী ইবনে মাস্'উদ ইবনে যোবায়র এবং অধিকাংশ তাবে'ঈর। (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)

অর্থাৎ শুধু একবার গোসল করার চেয়ে প্রতিদিন তিনবার গোসল করা আমার নিকট পছন্দনীয়। এতে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা বেশী রয়েছে। আর, আল্লাহ্ চাইলে, আরোগ্যও লাভ হবে। সুতরাং দৈনিক পাঁচবার গোসল করার নিষেধ এ থেকে প্রমাণিত হয় না।

★ উল্লেখ্য, এ একত্রীকরণ প্রকৃত একত্রীকরণ নয়, বরং বাহ্যিকভাবেই। এক ওয়াক্বতের মধ্যে দু'নামায একত্রীকরণ নয়। কারণ, দু' নামাযের মধ্যে প্রথম নামায সেটার ওয়াক্বতের শেষ ভাগে এবং পরবর্তীটা সেটার ওয়াক্বতের প্রথম ভাগে সম্পন্ন করা হয় মাত্র। সুতরাং যে কোন মুসাফিরের জন্য একাধিক নামায এক ওয়াক্বতে একত্রিত করার প্রমাণ এ হাদীসে নেই। আরো উল্লেখ্য যে, এখানে এক গোসলে দু'নামায পড়া হবে, এক ওযূতে দু'ওয়াক্বতের নামাযের কথা বলা হয় নি। এমন রোগীর জন্য পরবর্তী ওয়াক্বতের নামাযের জন্য পৃথক ওযূ করা জরুরী হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ اَسْمَآءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِىْ مِرْكَنٍ فَاِذَا رَاَتْ صُفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَّاحِدًا وَتَغْتَسِلْ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫১৮।। হযরত আসমা বিন্‌তে ওমায়স[২৭] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ফাতিমা বিনতে আবী হুবায়শ এতো কাল থেকে ইস্তিহাযায় আছেন। ফলে নামায পড়তে পারেন নি।[২৮] রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "সুবহানাল্লাহ্![২৯] এতো শয়তানের নিকট থেকে।[৩০] সে (ফাতিমা) যেন জলপাত্রে বসে যায়।[৩১] যখন হলদে বর্ণ পানির উপর দেখতে পাবে[৩২] তখন যোহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করে নেবে,

২৭. তিনি প্রসিদ্ধ মহিলা-সাহাবী। অত্যন্ত বিবেকবুদ্ধি সম্পন্না, সতী ও ইবাদতপরায়ণা ছিলেন। প্রথমে হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিবের বিবাহাধীন ছিলেন। তাঁরই সাথে তিনি হাবশায় হিজরত করেন। তাঁর ঔরশ থেকে তাঁর গর্ভে তিন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন– আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর, মুহাম্মদ ও 'আউন। হযরত জা'ফরের শাহাদাতের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের বিবাহাধীন হন। তাঁর ঔরশ থেকে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর জন্মগ্রহণ করেন। হযরত সিদ্দীক্বের ওফাতের পর তিনি হযরত আলী মুরতাদ্বার বিবাহাধীন হন। তাঁর থেকে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আলী পয়দা হন। তাঁর নিকট থেকে হযরত ওমর, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও আবূ মূসা আশ'আরীর মতো মহামর্যাদাবান সাহাবীগণ হাদীস আহরণ করেছেন।

২৮. কেননা, তিনি মনে করেছেন যে, হায়য'-এর মতো ইস্তিহাযাহ্'ও নামাযের জন্য অন্তরায়। কিন্তু যখন 'ইস্তিহাযাহ্' বন্ধই হয় নি, তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এ ভেবে যে, কতদিন যাবত নামায থেকে বঞ্চিত থাকবেন! তখন তিনি মাস্‌আলার সমাধান জিজ্ঞাসা করলেন।

স্মর্তব্য যে, এমতাবস্থায় তাঁকে ইস্তিহাযার সময়ের নামাযগুলো ক্বাযা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এখানে সেটার উল্লেখ করা হয় নি। কেননা, মাস্‌আলার সমাধান জানা না থাকা 'ওযর' নয়। অবশ্য, এর উপর তিরস্কার করা হয় নি। কারণ, জানা না থাকার কারণে ত্রুটি হলে তা তিরস্কারযোগ্য নয়।

২৯. এ 'সুবহা-নাল্লাহ্' আশ্চর্যবোধ প্রকাশের জন্য। অর্থাৎ তোমার মতো বিবেক ও গাম্ভীর্য সম্পন্না মহিলা জিজ্ঞাসা না করে নামায ছেড়ে দিলে? আমার নিকট কিংবা ফিক্বহ্‌বিদ সাহাবীগণের নিকট মাসআলা জেনে নেওয়া উচিত ছিলো।

৩০. অর্থাৎ 'ইস্তিহাযার রোগ শয়তানী প্রভাব থেকে হয়। এর বিশ্লেষণ পূর্ববর্তী হাদীসে করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন বাতাস, পানি বরং মাটি ও খাদ্যের মধ্যে পীড়িত করে দেওয়ার প্রভাব মওজুদ রয়েছে, তখন শয়তানও প্রভাব বিস্তার করে রোগাক্রান্ত করতে পারে।

অথবা, তুমি জিজ্ঞাসা না করে নামায ছেড়ে দেওয়া শয়তানী প্রভাব এবং তারই ধোঁকার কারণে সম্পন্ন হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, আল্লাহর মাহবূব বান্দাদের উপরও শয়তানের চক্রান্ত চলে। হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে গন্দুম খাওয়ার প্রতি উৎসাহ শয়তানই দিয়েছে–فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ (অতঃপর শয়তান তাঁদের দু'জনের পদস্খলন ঘটিয়েছে; ২:৩৬)। অবশ্য, ওই মাক্ববূল বান্দাদেরকে শয়তান পথভ্রষ্ট করতে পারে না। 'গোমরাহী' (পথভ্রষ্টতা) এক জিনিষ; ফাসেক্বী অন্য জিনিষ আর ভুল করা অন্য বিষয়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

(নিশ্চয় আমার বান্দাগণ, হে শয়তান! তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; ১৭:৬৫) খোদ্ শয়তান বলেছিলো–

لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ

(নিশ্চয় আমি তাদের সবাইকে গোমরাহ করে ছাড়বো, হে আল্লাহ্! তোমার নিষ্ঠাপূর্ণ বান্দাদের ব্যতীত; ৩৮:৮২)।

৩১. অর্থাৎ পানির পাত্রের পাশে তাতে পানি ভর্তি করে বসে যাবে, যাতে তা দ্বারা যোহরের সময়ের বিদায় এবং আসরের

لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَآءِ غُسْلاً وَّاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَّاحِدًا وَ تَوَضَّأُ فِىْ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ رَوٰى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ.

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلَوٰاتُ

মাগরিব ও এশার জন্য এক গোসল আর ফজরের জন্য এক গোসল।[৩৩] এর মধ্যবর্তীতে ওযূ করতে থাকবে।"[৩৪] আবূ দাউদ এটা বর্ননা করেছেন। আর বলেছেন, মুজাহিদ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, "যখন তাদের নিকট গোসল করা কঠিন হয়ে পড়লো, তখন তাকে দু'নামায একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন।"[৩৫]

নামায পর্ব[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৫১৭।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি তা'আলা ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, পাঁচ নামায,

আগমন সম্পর্কে জেনে নেয়। (আশি''আহ্ ও মিরক্বাত ইত্যাদি) অথবা নিজে ওই পানিভর্তি পাত্রের মধ্যে বসে যাবে- ঠাণ্ডার জন্য, যাতে ওই ঠাণ্ডার কারণে রোগের বেগ কমে যায়।

৩২. অর্থাৎ পানির উপর সূর্যের কিরণগুলো হলদে হয়ে পড়তে থাকে; যাতে বুঝা যায়, এখন আসরের সময় সন্নিকটে। তখন গোসল করে যোহর ও আসরের নামায পড়ে নেবে। (মিরক্বাত ইত্যাদি)

অথবা যখন ইস্তিহাযা'র রক্তের চিহ্ন পানির উপর দেখা যায়, কারণ পানির রং হলদে হয়ে যাবে, তখন পানির পাত্র থেকে বের হয়ে আসবে।

প্রথম ব্যাখ্যার ভিত্তিতে, এ পাত্রের কাজটি সময় জানার জন্য, আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যার ভিত্তিতে, এ আমল চিকিৎসার জন্যই।

স্মর্তব্য যে, রোদ হলদে হয়ে যাওয়া এক কথা, কারণ এটা তো আসরের শেষ সময়ে হয়ে থাকে, তখন নামায মাকরূহ হয়ে যায়, আর পানির উপর সূর্যের কিরণগুলো হলদে বর্ণের হওয়ার বিষয়টি জ্ঞাত হওয়া অন্য কিছু। বস্তুতঃ এটা হয় যোহরের শেষ সময়ে। সুতরাং হাদীস শরীফখানা সুস্পষ্ট।

৩৩. অর্থাৎ প্রত্যহ তিনবার গোসল করে নেবে, যাতে আল্লাহ্ তাঁকে ইস্তিহাযাহ্ রোগ থেকে শেফা দান করেন। যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ নির্দেশ চিকিৎসা হিসেবে; শরীয়তের বিধান নয়, না ইস্তিহাযা-পীড়িত রমণীর উপর গোসল করা শরীয়ত মতে ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

৩৪. অর্থাৎ যদি এগুলো ব্যতীত অন্য সময়ে নফল কিংবা ক্বোরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির জন্য ওযূ করতে হয়, তবে শুধু ওযূ করাই যথেষ্ট, গোসল করবে না।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, এ নির্দেশ নিছক চিকিৎসার জন্য।

৩৫. অর্থাৎ হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, যিনি তাঁকে দিনে শুধু তিনবার গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন- তাঁর (পীড়িত মহিলা) অপরাগতার কারণে। নতুবা (পাঁচ ওয়াক্বতের জন্য) পাঁচবার গোসল করা আরো উত্তম ছিলো।

বুঝা গেলো যে, এ নির্দেশ চিকিৎসার জন্যই, শরীয়তের বিধান নয়। দু'নামায একত্রিত করার অর্থ- শুধু বাহ্যিকভাবে একত্রিত করা; যোহর শেষ সময়ে পড়বে, আসর পড়বে সেটার ওয়াক্বতের প্রথম ভাগে; প্রকৃত অর্থে একত্রীকরণ নয়, কারণ ইস্তিহাযাহ্-পীড়িতের জন্য নামাযগুলো একত্রিত করার পক্ষে কেউ অভিমত ব্যক্ত করেন নি।

অবশ্য, মুসাফিরের প্রসঙ্গে মতবিরোধ রয়েছে। আমাদের ইমাম-ই আ'যম সাহেবের মতে, সেও একত্রিত করতে পারে না।

****

১. 'কিতাবুস্ সালাত'। صَلٰوةٌ (সালাত) শব্দটি صَلّٰى থেকে গঠিত। এর অর্থ গোশ্‌ত ভুনন, আগুনের উপর পাকানো। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (এখন প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে; ১১১:৩)

اَلْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَآئِرُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

জুমু'আহ্ থেকে জুমু'আহ্ পর্যন্ত এবং রমযান থেকে রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ্ নিশ্চিহ্নকারী[২] যখন কবীরাগুনাহ্সমূহ থেকে বেঁচে থাকে।[৩] [মুসলিম শরীফ]

৫২০।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– বলোতো যদি তোমাদের মধ্যে কারো দরজার সামনে নহর থাকে, যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে?" তাঁরা আরয করলেন, "একেবারে ময়লা থাকবে না।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "এটা হচ্ছে পাঁচ নামাযের উদাহরণ। আল্লাহ্ ওইগুলোর বরকতে গুনাহ্গুলো নিশ্চিহ্ন করে দেন।"[৪] [বোখারী ও মুসলিম]

তাছাড়া, আগুনে গরম করে বক্র কাঠ সোজা করাকে تَصْلِيَةٌ বলে। যেহেতু নামায আপন নামাযীর নাফসকে সাধনা ও কষ্টের আগুনে জ্বালায় ও সেটাকে সোজা করে, সেহেতু নামাযকে আরবীতে صَلٰوةٌ (সালাত) বলে।

সুতরাং صَلٰوةٌ (সালাত) অর্থ– দো'আ, রহমত, রহমত নাযিল করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, নিতম্বযুগল নাড়া দেওয়া। যেহেতু এ সব ক'টি কাজ নামাযে পাওয়া যায়, সেহেতু নামাযকে 'সালাত' বলা হয়।

ইসলামে সব আমলের পূর্বে নামায ফরয হয়েছে। অর্থাৎ নুবূয়ত প্রকাশের একাদশ সালে, হিজরতের দু'বছর কয়েক মাস পূর্বে। তাছাড়া সমস্ত ইবাদত আল্লাহ্-তা'আলা যমীনে প্রেরণ করেছেন; কিন্তু নামায আপন মাহবূবকে আরশের উপর আমন্ত্রণ জানিয়ে দান করেছেন। এ কারণে কলেমা-ই শাহাদতের পর সর্বাপেক্ষা বড় ইবাদত নামায। যে ব্যক্তি নামাযকে সোজাভাবে পড়ে নামায তাকেও সোজা করে দেয়। নামাযের রহস্যাদি ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি আমার কিতাব 'আসরারুল আহকাম' এবং 'তাফসীর-ই নঈমী'ঃ প্রথম পারায় দেখুন!

নামায চার প্রকারের। যথা– এক. ফরয, দুই. ওয়াজিব, তিন. সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্ এবং চার. নফল।

২. অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্বতের নামায সগীরাহ্ গুনাহ্র ক্ষমা পাবার মাধ্যম। যদি কেউ ওই নামাযগুলোর মাধ্যমে গুনাহ্ ক্ষমা করাতে না পারে, তাহলে জুমু'আর নামায গোটা সপ্তাহ্র গুনাহ্-ই সগীরাহ্র কাফ্ফারা হয়। যদি কেউ জুমু'আর মাধ্যমেও ক্ষমা করাতে না পারে– সেটা উত্তমরূপে সম্পন্ন না করার কারণে, তবে রমযান গোটা বছরের গুনাহ্গুলোর কাফ্ফারা হয়। সুতরাং এ হাদীসের উপর এ আপত্তি হতে পারে না যে, 'যখন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্বতের নামায দ্বারা গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে গেলো তখন জুমু'আহ্ ও রমযান দ্বারা কোন্ গুনাহ্র ক্ষমা হবে?'

স্মর্তব্য যে, 'কবীরাহ্ গুনাহ্' (মহাপাপ), যেমন– 'কুফর, শিরক্, যিনা ও চুরি ইত্যাদি, অনুরূপ বান্দাদের হক্ব 'তাওবা' এবং হক্বগুলো পরিশোধ করা ব্যতীত মাফ হয় না।

৩. স্মর্তব্য যে, যেসব আমল গুনাহ্গারদের ক্ষমা পাবার মাধ্যম, সেগুলো নেক্কার বান্দাদের উচ্চ মর্যাদাদি লাভ করারও মাধ্যম। সুতরাং 'মা'সূম' (নিষ্পাপ) ও 'মাহফূয' (সংরক্ষিত) বান্দাগণ নামাযের বরকতে উচ্চ মর্যাদাদি লাভ করে থাকেন। সুতরাং হাদীসের উপর এ আপত্তি আসতে পারে না যে, 'তাহলে তো নেক্কার বান্দাদের নামায পড়ারই দরকার নেই। কারণ, নামাযগুলো তো পাপরাশির ক্ষমার জন্য। আর তাঁরা তো প্রথম থেকেই পাপশূন্য!'

৪. এখানে 'গুনাহ্গুলো' মানে 'সগীরাহ্ গুনাহ্' (ছোটখাটো

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ رَجُلاً اَصَابَ مِنْ اِمْرَأَةٍ قُبْلَةً فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَه، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِىَ هٰذَا قَالَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِىْ كُلِّهِمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ اُمَّتِىْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫২১।। হযরত ইবনে মাস্'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কোন পরনারীকে চুম্বন করে বসেছে।[৫] তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে হাযির হলো। হুযূরকে এ সম্পর্কে বললো।[৬] তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন- "দিনের পার্শ্বগুলো ও রাতের বেলায় নামায ক্বায়েম করো।[৭] নেকীসমূহ গুনাহগুলোকে দূরীভূত করে দেয়।" সে আরয করলো, "এয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কি শুধু আমারই জন্য?" এরশাদ করলেন, "আমার সমস্ত উম্মতের জন্য।"অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "আমার উম্মতের যে কেউ এ কাজটি করুক!"[৮] [বোখারী, মুসলিম]

পাপ); কিন্তু 'কবীরাহ্ গুনাহ্' (মহাপাপ) ও বান্দাদের হক্বসমূহ এর বহির্ভূত। কারণ, ওইগুলো শুধু নামায দ্বারা ক্ষমা হয় না। যেমন- ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'পাঁচ ওয়াক্বতের নামাযকে 'নহর' (সমুদ্র)-এর সাথে তুলনা করেছেন। কূপের সাথে করেন নি। এর দু'টি কারণ- এক. কূপের মধ্যে যদি প্রবেশ করা হয়, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেটার পানি গোসল করার উপযোগী থাকে না। কেননা, ওই পানি প্রবহমান নয়; কিন্তু নহরের পানি হচ্ছে প্রবহমান। প্রত্যেককে তা বিভিন্নভাবে পবিত্র করে দেয়। তেমনিভাবে নামাযও সবদিক দিয়ে পবিত্র করে দেয়, হোক না বান্দা কতোই অপবিত্র!

দুই. কূপের পানি অর্জন করতে কষ্টকর অবলম্বনের আশ্রয় নিতে হয়; বালতি ও রশির প্রয়োজন হয়। দুর্বল মানুষ পানি টেনে তুলতে পারে না; কিন্তু নহরের পানি অনায়াসে পাওয়া যায়। অনুরূপ, নামাযও অনায়াসে সম্পন্ন হয়ে যায়, যাতে বিশেষ কষ্টের কিছুই করতে হয় না। আর যখন দরজার সামনে নহর থাকে, তাহলে তো গোসলের জন্য দূরেও যেতে হয় না।

স্মর্তব্য যে, গুনাহ্ হচ্ছে হৃদয়ের আবর্জনা। আর নামায হচ্ছে হৃদয়ের আবর্জনা দূরীকরণের পানি স্বরূপ।

৫. ওই লোকের নাম আবুল ইয়ামীন। খেজুরের দোকান করতো। এক মহিলা খেজুর ক্রয় করার জন্য আসলো। তার হৃদয় তার দিকে আকৃষ্ট হলো। বললো, "ভালো খেজুর ঘরের ভিতর আছে।" এ অজুহাতে ভিতরে নিয়ে তাকে চুম্বন করলো। মহিলাটি বললো, "ওহে আল্লাহ্র বান্দা, আল্লাহ্কে ভয় করো!" লোকটা অত্যন্ত লজ্জিত হলো। এ থেকে বুঝা গেলো যে, পর নারীর সাথে একাকীত্ব বড়ই মারাত্মক। [আশি''আহ্, মিরক্বাত]

৬. সাহাবা-ই কেরাম পাপগুলো ক্ষমা করানোর জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে হাযির হতেন- এ আয়াত

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ الاية

(এবং যদি তারা কখনো নিজেদের নাফসের উপর যুল্ম করে হে হাবীব! আপনার দারবরে হাযির হয়... আল-আয়াত; ৪:৬৪) অনুসারে কাজ করে। এখনো আমরা গুনাহগারদের ক্ষমা লাভের জন্য ওই আস্তানা মুবারকে হাযির হওয়া জরুরী। এটা মনে করো না যে, তিনি শুধু মদীনা মুনাওয়ারায় থাকেন, বরং মু'মিনদের বক্ষও তাঁর রহমতের অবস্থানস্থল।

৭. 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুনে এরশাদ করলেন, "আমি আপন মহান রবের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছি।" আসরের পর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, ফজর ও যোহরের নামায দিনের এক প্রান্তের নামায, আসর ও মাগরিব আরেক প্রান্তের আর এশার নামায

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلٰوةَ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْ فِىَّ

৫২২।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হাযির হলো। তারপর আরয করলো, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আমি শাস্তির বিধানে পৌঁছে গেছি।[৯] তা আমার উপর ক্বায়েম করুন!" বর্ণনাকারী বলেন, "তাকে হুযূর কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নি।[১০] নামায উপস্থিত হলো। সে হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায সম্পন্ন করলো।[১১] যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায পূর্ণ করে নিলেন, তখন লোকটি দণ্ডায়মান হলো, আর আরয করলো, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আমি শাস্তির বিধানে পৌঁছে গেছি। আমার উপর আল্লাহ্র কিতাব ক্বায়েম করুন।"[১২]

হচ্ছে রাতের। সুতরাং এ আয়াত পাঁচ ওয়াক্বত নামাযেরই বর্ণনা বিশিষ্ট।

'যুলফ' (زلف : زلفت) থেকে গৃহীত। এর অর্থ নৈকট্য। অর্থাৎ রাতের ওই অংশ, যা দিনের নিকটে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ (এবং যখন জান্নাত নিকটবর্তী হলো; ৮১:১৩)।

৮. অর্থাৎ এ আয়াত যদিও তোমার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু সেটার বিধান ব্যাপক। যে কোন মুসলমান যে কোন সগীরাহ্ গুনাহ্ করুক, তার নামায ইত্যাদি তার ক্ষমা লাভেরই মাধ্যম।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, পরনারীর সাথে একাকী হওয়া এবং তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করা 'সগীরা গুনাহ্'। অবশ্য, এ গুনাহ্ বারংবার করলে 'কবীরাহ্' হয়ে যাবে। কেননা, 'সগীরা গুনাহ্র উপর অটল থাকা (বারবার করা) কবীরা গুনাহ্। আর 'নামায দ্বারা ক্ষমা করিয়ে নেবো'- এ ভেবে পরনারীকে জড়িয়ে ধরা, চুম্বন করা কুফর। কারণ এটা আল্লাহ্র দিক থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে বসা। বস্তুতঃ এ হাদীস শরীফ তারই জন্য প্রযোজ্য, যে ঘটনা চক্রে এমনি করে বসে। তারপর লজ্জিত হয়ে তাওবা করে নেয়। সুতরাং হাদীস শরীফের উপর এ আপত্তির সূত্রে একথা বলা যাবে না যে, 'এটা দ্বারা ওই সব কাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।'

এখানে مِنْ اُمَّتِىْ এরশাদ করায় বুঝা গেলো যে, এসব সহজ পন্থা শুধু এ উম্মতের জন্যই। পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর ক্ষমা অতি কষ্টে হতো।

৯. অর্থাৎ আমি এমন গুনাহ্ করে ফেলেছি, যা শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত শাস্তির কারণ। 'হদ্দ' (حد) বলে নির্দ্ধারিত শাস্তিকে। যেমন- যিনাকারীর জন্য 'পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা' এবং চুরির জন্য 'হাত কেটে ফেলা'। আর 'তা'যীর' হচ্ছে ওই শাস্তি, যা শরীয়তে (ইসলামী আইন) নির্দ্ধারিত নেই, বিচারক আপন রায় দ্বারা নির্দ্ধারণ করে নেন। ওই বুযুর্গ কোন মা'মূলী গুনাহ্ করেছিলেন; কিন্তু মনে করেছেন হয়তো তজ্জন্যও শরীয়তে কোন শাস্তি নির্দ্ধারিত রয়েছে। অথবা (হাদীসে বর্ণিত) 'হদ্দ' (حد) আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ সাধারণ অর্থে শাস্তি।

১০. কেননা, হুযূর-ই আন্ওয়ারের 'কাশ্ফ' দ্বারা জানা ছিলো যে, ওই লোকটি মা'মূলী গুনাহ্ করেছিলো আর জিজ্ঞাসা করলে তার অপমান হতো। এটাই হচ্ছে-দোষ-ত্রুটি গোপন করার অসাধারণ অবস্থা। [মিরক্বাত]

১১. শুধু একটি নামায। এটা আসরের নামায ছিলো। মিরক্বাত ইত্যাদিতে এমনি উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. 'হদ্দ' (নির্দ্ধারিত শাস্তি)-এর উপযোগী হই কিংবা না-ই হই, আল্লাহ্র ফরমান যা-ই হোক না কেন? 'হদ্দ' হোক কিংবা কাফ্ফারা, অথবা হোক অন্য কিছু। এ কারণে এখানে 'কিতাবাল্লাহ্' (আল্লাহ্র কিতাব ক্বায়েম করুন) বলেছেন। এটা সাহাবা-ই কেরামের ঈমানী শক্তি। কারণ অন্যান্য অপরাধী নিজের অপরাধ গোপন করে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে; কিন্তু এ হযরতগণ নিজেদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দিয়ে প্রাণের বাজি খেলে ঈমানকেই রক্ষা করেন।

كِتَابَ اللّٰهِ قَالَ اَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَلَكَ ذَنْبَكَ اَوْ حَدَّكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُّهُ لَزَادَنِىْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তুমি কি আমার পেছনে নামায পড়োনি?" লোকটি আরয করলো, "হ্যাঁ।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ্ তোমার গুনাহ্ কিংবা তোমার উপর থেকে শাস্তির বিধান ক্ষমা করে দিয়েছেন।"[১৩]

৫২৩।। হযরত ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি, 'আল্লাহ্র নিকট কোন্ কাজটি বেশী পছন্দনীয়?' হুযূর এরশাদ ফরমান, "সময় মতো নামায।"[১৪] আমি বললাম, "তারপর কোন্ কাজটি?" হুযূর এরশাদ করলেন, "মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা।" আমি আরয করলাম, "তারপর কোন্‌টি?" এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্র পথে জিহাদ।"[১৫] (বর্ণনাকারী) বলেছেন, "হুযূর আমাকে এ কথাগুলো বলেছেন। যদি আমি আরো বেশী জিজ্ঞাসা করতাম, তবে আরো বেশী বলতেন।"[১৬] [মুসলিম, বোখারী]

১৩. অর্থাৎ যে গুনাহকে তুমি 'হদ্দ' বা নির্দ্ধারিত শাস্তির উপযোগী মনে করেছিলে তা এ নামাযের বরকতে ক্ষমা হয়ে গেছে। সুতরাং এ হাদীস শরীফ দ্বারা একথা অনিবার্য হয় না যে, 'নামায দ্বারা শরীয়তের নির্দ্ধারিত শাস্তি মাফ হয়ে যায়। স্মরণ রাখবেন, সগীরাহ্ গুনাহ্র উপর কোন শাস্তি (হদ্দ) নির্দ্ধারিত নেই। আর 'ডাকাতির হদ্দ' ব্যতীত অন্য কোন হদ্দ তাওবা দ্বারা মাফ হয় না। ডাকু যদি গ্রেফতার হবার পূর্বে তাওবা করে নেয়, তবে শাস্তি হয় না। অনুরূপ, যদি কাফির যিনা করার পর মুসলমান হয়ে যায়, তবে সে 'রাজম' (পাথর নিক্ষেপের শাস্তি) ইত্যাদির উপযোগী নয়। [মিরক্বাত]

শায়খ আবদুল হক্ব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, مَعَنَا (আমাদের সাথে) থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায পড়া পাপরাশির ক্ষমার জন্য মহৌষধ। নামাযের মহত্ব ঈমানের মহত্বানুসারেই। সুবহা-নাল্লাহ্! যাঁর সাথে সম্পাদনকৃত নামায অপরাধীদের অপরাধগুলো ক্ষমা করিয়ে দেয়, ওই মহান সত্তা-কেমন হবে!

১৪. অর্থাৎ সব সময় নামাযগুলো মুস্তাহাব সময়ে সম্পন্ন করা। সম্মানিত আলিমগণ বলেছেন, "ঈমানের পর নামাযের স্থান।" তাঁদের প্রমাণ এই হাদীস শরীফ। যেসব বর্ণনায় জিহাদকে নামাযের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, তা কোন জরুরী অবস্থায়, যখন জিহাদ 'ফরয-ই আইন' হয়েছিলো এবং শত্রুদের উৎপাত বেড়ে গিয়েছিলো। অন্যথায় প্রকাশ্যতঃ বুঝা যায় যে, জিহাদ তো নামাযেরই জন্য হয়ে থাকে।

অথবা এভাবে বলা যাবে যে, হয়তো প্রশ্নকারীদের অনুসারে হুযূরের জবাব ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। কারো জন্য জিহাদ উত্তম ছিলো, কারো জন্য উত্তম ছিলো গরীবদের আহার করানো, কারো জন্য 'জিহ্বার সংরক্ষণ', কারো জন্য চুপে চুপে দান-খায়রাত করা। সুতরাং হাদীস শরীফগুলো পরস্পর বিরোধী নয়।

১৫. এ বিন্যাস সাইয়্যেদুনা আবূ মাস্'উদের অবস্থানুসারে। অন্যথায় কোন কোন বর্ণনায় এর বিপরীত কথাও বর্ণিত হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ আমি প্রশ্নই এতটুকু করেছি। স্মর্তব্য যে, মাতাপিতার খিদমতের সাথে নামাযের বহু মিল রয়েছে। যেমন- নামায মহান রবের ইবাদত; আর এ খিদমত হচ্ছে 'মুরব্বী' (লালনকারী)'র আনুগত্য। এ কারণে ক্বোরআন শরীফে এ খিদমতকে ইবাদতের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَلَهٗ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ

৫২৪।। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "বান্দা ও কুফরের মধ্যে রয়েছে নামায ছেড়ে দেওয়া।"[১৭] [মুসলিম]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫২৫।। হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "পাঁচ ওয়াক্বতের নামায আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করেছেন।[১৮] যে ব্যক্তি ওইগুলোর ওযূ উত্তমরূপে করে, সেগুলো বিশুদ্ধ সময়ে সম্পন্ন করে এবং সেগুলোর রুকূ' ও বিনয় পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন করে[১৯] তার জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে– তাকে ক্ষমা করবেন।[২০] আর যে ব্যক্তি এমন করবে না, তবে তার জন্য নেই

(অর্থাৎ আল্লাহ্ নির্দেশ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا الاية দিয়েছেন যেন তোমরা তাঁর ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করো এবং যেন মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো; ১৭:২৩)।

১৭. অর্থাৎ মু'মিন বান্দা ও কুফরের মধ্যে নামাযের দেয়াল অন্তরাল রয়েছে, যা তাকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছতে দেয় না। যখন এ অন্তরাল সরে যায়, তখন কুফর তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছানো সহজ হয়ে যায়। কারণ, এটাও সম্ভব যে, (হয়তো) বান্দা ভবিষ্যতে কুফরও করে বসবে।

স্মর্তব্য যে, কোন কোন ইমাম নামায ছেড়ে দেওয়াকে কুফর পর্যন্ত বলেছেন। কারো কারো মতে বে-নামাযী হত্যার উপযোগী, যদিও কাফির হয় না। আমাদের ইমাম (ইমাম আ'যম)-এর মতে, বে-নামাযীকে মারধর ও বন্দী করা হবে– যতদিন না সে নামাযী হয়ে যায়।

আমাদের মাযহাবানুসারে, এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে বে-নামাযী কুফরের নিকটবর্তী। অথবা তার কুফরের উপর মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। অথবা 'নামায বর্জন করা' মানে নামাযকে অস্বীকার করা। অর্থাৎ নামাযকে অস্বীকারকারী কাফির।

১৮. বুঝা গেলো যে, পাঁচ ওয়াক্বতের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায ইসলামে ফরয নেই। দু'ঈদ ও বিতরের নামায ওয়াজিব; ফরয নয়। জুমু'আর নামায ওই পাঁচ ওয়াক্বতের নামাযগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তা হচ্ছে যোহরের নামাযের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণে যার উপর জুমু'আহ্ ফরয তার উপর যোহর নেই। আর যার উপর যোহর ফরয, তার উপর জুমু'আহ্ নেই। কারো উপর যোহর ও জুমু'আহ্ উভয়ই ফরয হবে– এটা অসম্ভব; তখন তো নামায ছয়টি হয়ে যাবে। 'নযর' (মান্নাত)-এর নামায যদিও ফরয, কিন্তু তা এ হাদীসে উল্লেখিত ফরয নামাযগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়, (বরং অতিরিক্ত)।

১৯. যেহেতু রুকূ' ইসলামী নামাযের বৈশিষ্ট্যাদির অন্তর্ভুক্ত, অন্যান্য উম্মতের নামাযের মধ্যে সাধারণত রুকূ' ছিলো না, তাছাড়া, রুকূ' পাওয়া গেলে রাক'আত পাওয়া যায়, তদুপরি, রুকূ' হচ্ছে নামাযের অভ্যন্তরীণ ফরযগুলোর মধ্যে ব্যবধানকারী, সেহেতু সেটার বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

لَـهٗ عَلَى اللهِ عَهْدٌ اِنْ شَآءَ غَفَرَ لَهٗ وَاِنْ شَآءَ عَذَّبَهٗ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوٰى مَالِكٌ وَالنَّسَآئِىُّ نَحْوَهٗ.

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا ذَا اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ

আল্লাহ্‌র ওয়াদা; যদি চান ক্ষমা করবেন, যদি চান শাস্তি দেবেন।[২১] [আহমদ, আবূ দাঊদ]
ইমাম মালিক ও নাসাঈ এর মতোই বর্ণনা করেছেন।

৫২৬।। হযরত আবূ উমামাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "তোমাদের পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ো, তোমাদের মাসের রোযা রাখো, তোমাদের মালগুলোর যাকাত দাও, তোমাদের নির্দেশদাতাদের আনুগত্য করো,[২২] আপন রবের জান্নাতে প্রবেশ করো।[২৩] [আহমদ, তিরমিযী]

হৃদয়ের 'বিনয়' এক ধরনের, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর অন্য ধরনের। এর আলোচনা আমার 'তাফসীর-ই নঈমী'তে দেখুন।

২০. এভাবে যে, সগীরাহ্ গুনাহ্‌গুলো ক্ষমা করে দেবেন, কবীরাহ্ গুনাহ্ থেকে তাওবা করার এবং বান্দার হক্বগুলো পরিশোধ করে দেওয়ার তাওফীক্ব বা সামর্থ্য দান করবেন।

স্মরণ রাখবেন, নামায পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন করার অর্থ হচ্ছে নামাযের সমস্ত শর্ত (পূর্বশর্ত ও অভ্যন্তরীন ফরযগুলো) পূরণ করা হবে। ঈমানও নামাযের পূর্বশর্ত। সুতরাং হাদীসের উপর এ আপত্তি করা যাবে না যে, 'নামাযী ব্যক্তি যথেচ্ছ গুনাহ্ করতে পারে; কারণ, ক্ষমা হয়ে যাবে!' আর না এ আপত্তি করা যবে যে, 'মুনাফিক্বগণ এবং অনেক বে-দ্বীনও নামাযী ছিলো এবং রয়েছে, কিন্তু তাদের তো ক্ষমা নেই।'

২১. এ থেকে বুঝা গেলো যে, বে-নামাযী কাফির নয়, আর নামায বর্জন করা কুফর নয়। কেননা, কুফরের ক্ষমা নেই; মহান রব এরশাদ ফরমান–

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ الاية

(নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শির্ক করাকে ...আল-আয়াত; ৪:১১৬)। এ আয়াতে শির্ক মানে কুফর।

২২. 'নির্দেশদাতা' মানে 'মুসলমানদের খলীফা, ইসলামী শাসকগণ, দ্বীনের আলিমগণ– সবই। আনুগত্য মানে তাঁদের বৈধ নির্দেশাবলী পালন করা। শরীয়ত বিরোধী নির্দেশাবলী পালন করা জরুরী নয়; যেহেতু রমযানের রোযাগুলো শুধু এ উম্মতের উপর ফরয হয়েছে, সেহেতু شَهْرَكُمْ (তোমাদের মাস) এরশাদ করেছেন। 'যাকাত' রোযার পর ফরয হয়েছে। তাই সেটার উল্লেখ রোযার পর করা হয়েছে।

২৩. 'কর্মগুলো'র সম্পর্ক বান্দাদের দিকে করেছেন আর জান্নাতের করেছেন মহান রবের দিকে; যাতে বেচা ও কেনার অর্থ সুস্পষ্ট হয়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى الاية (নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন ... আল-আয়াত; ৯:১১১)।

স্মর্তব্য যে, বিভিন্ন হাদীস বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এরশাদ হয়েছে। যখন কোন ইবাদতের বিধান আসে নি তখন বলা হয়েছিলো, "যে ব্যক্তি কলেমা পড়ে নিয়েছে সে জান্নাতী হয়ে গেছে।" যখন নামায আসলো তখন নামাযেরই উপর জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে। আর যখন যাকাত এবং রোযা ইত্যাদিও এসে গেলো, তখন জান্নাতী হবার জন্য এসব কর্মের শর্তও আরোপ করা হলো। সুতরাং হাদীসগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ নেই।

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ وَكَذَا رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِي الْمَصَابِيْحِ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ.

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

৫২৭।। হযরত 'আমর ইবনে শো'আয়ব থেকে বর্ণিত, তিনি আপন পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "আপন সন্তানদেরকে নামাযের নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়, তাদেরকে নামাযের জন্য মারধর করো যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়[২৪] আর ঘুমের স্থানগুলোতে তাদেরকে পৃথক করে দাও।"[২৫] [আবু দাউদ] এভাবেই এটা শরহে সুন্নাহ্য় তাঁরই থেকে বর্ণনা করেছেন আর মাসাবীহ'র মধ্যে ইবনে মা'বাদ থেকে।

৫২৮।। হযরত বুরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "ওই অঙ্গীকার, যা আমাদের ও তাদের মধ্যে রয়েছে, তা হচ্ছে নামায।"[২৬] সুতরাং যে ব্যক্তি তা বর্জন করেছে, সে নিশ্চিতভাবে কুফর করেছে।[২৭] [আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫২৯।। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে হাযির হলো,[২৮]

২৪. এ বয়সে যদিও তাদের উপর নামায ফরয নয়, কারণ, তারা না-বালেগ, কিন্তু অভ্যাস গড়ার জন্য তাদেরকে এখন থেকে নামাযী বানাও। যেহেতু দশ বছর বয়সে ছেলেমেয়েদের বুঝ-সমঝ যথেষ্ট পরিমাণে হয়ে যায়, সেহেতু মারধর করারও নির্দেশ দিয়েছেন। مُرُوْا (নির্দেশ দাও!) থেকে বুঝা গেলো যে, ছেলেমেয়েদেরকে সাত বছরের পূর্বেও উৎসাহিত করা হবে; কিন্তু এর নির্দেশ দেওয়া হবে সাত বছর বয়সে।

২৫. অর্থাৎ ভাই-বোনদেরকে আলাদা-আলাদা বিছানার উপর শয়ন করাও। কারণ, এখন তারা 'মুরাহিক্ব' অর্থাৎ বালেগ হবার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

২৬. 'তারা' বলতে মুনাফিক্বদের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমান ও মুনাফিক্বদের মধ্যে নামাযই হচ্ছে এমন এক বিষয়, যা মুনাফিক্বদের জন্য নিরাপত্তা লাভের উপায়। কারণ, এরই কারণে আমরা তাদেরকে হত্যা করি না এবং তাদের উপর ইসলামী বিধানাবলী কার্যকর করি। এখন যেই মুনাফিক্ব নামায ছেড়ে দেবে তার কুফর প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং তারা হত্যার উপযোগী হয়ে যাবে।

২৭. অর্থাৎ নামায ছেড়ে দেবার কারণে ওই মুনাফিক্বের কুফর প্রকাশ পেয়ে গেলো। এ হাদীস এই হাদীসের ব্যাখ্যা-

فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ عَالَجْتُ اِمْرَاَةً فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَاِنِّىْ اَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُوْنَ اَنْ اَمَسَّهَا فَاَنَا هٰذَا فَاقْضِ فِىْ مَا شِئْتَ فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللّٰهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا وَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَاَتْبَعَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا فَدَعَاهُ وَتَلَا عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى

আর বললো, "এয়া রসূলুল্লাহ্! আমি মদীনার প্রান্তে এক নারীর সাথে আলিঙ্গন করে ফেলেছি এবং সঙ্গমের কাছাকাছি পৌঁছি নি। সুতরাং আমি হলাম এই। আমার সম্পর্কে আপনি যা চান রায় দিন।"[২৯] তাকে হযরত ওমর বললেন, "আল্লাহ্ তোমার দোষ গোপন রেখেছেন। আহা, তুমিও যদি তোমার দোষকে গোপন করতে!"[৩০] বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে কোন জবাব দিলেন না। ওই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে চলে যেতে লাগলো।[৩১] তার পেছনে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন লোককে তাকে ডেকে পাঠালেন এবং এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করলেন– "নামায কায়েম করো দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের বেলায়। নিশ্চয় নেক কাজগুলো গুনাহ্সমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এটা উপদেশ

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ (যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিলো সে নিশ্চয় কুফর করলো)। এর অর্থ এ নয় যে, 'বে-নামাযী কাফির।'

২৮. বেশীর ভাগ ধারণা হচ্ছে ইনি আবুল ইয়ুস্র ব্যতীত অন্য কেউ হবেন। কারণ, উভয় ঘটনার মধ্যে পার্থক্য আছে।

২৯. অর্থাৎ যিনা ব্যতীত অন্য সব কিছু করে বসেছি। এখন শরীয়তের যে শাস্তিই সাব্যস্ত হয়, আমি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত! তিনি সম্ভবতঃ এটা মনে করে এসেছেন যে, তাঁর শাস্তিও 'রাজম' (পাথর নিক্ষেপ)। কারণ, যিনার কারণগুলোও যেনো যিনাই। সুবহা-নাল্লাহ্! এটা হচ্ছে– ঈমানী শক্তি এবং আল্লাহ্র ভয়।

৩০. অর্থাৎ গোপন গুনাহ্র তাওবাও যদি গোপনভাবে করে নিতে, তবে ভালোই ছিলো। কেননা, গোপন গুনাহ্র কথা ঘোষণা করা মন্দ।

এ থেকে দু'টি মাস্আলা বুঝা গেলো–

এক. গোপন গুনাহ্র তাওবা গোপনে করবে, আর প্রকাশ্যের তাওবা প্রকাশ্যে করবে।

দুই. হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে নিজের কৃত নেক কাজগুলো পেশ করা রিয়া নয়, আর হুযূরের সামনে নিজের গুনাহ্কে ক্ষমা করানোর জন্য পেশ করা গুনাহ্ নয়। রোগী আপন রোগ চিকিৎসকের নিকট প্রকাশ করে থাকে– চিকিৎসার জন্য। এ কারণে, হুযূর তাকে এ বলে তিরস্কার করেন নি– 'তুমি আপন গুনাহ্ কেন প্রকাশ করলে?' সুতরাং হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর ওই কথা বলা যথার্থ, আর সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নীরবতাও।

৩১. এ চলে যাওয়া পলায়নের জন্য ছিলো না, বরং তিনি মনে করেছিলেন, 'হয়তো তাঁর প্রসঙ্গে কোন আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হবে, তখন তাঁকে ডেকে রায় শুনানো হবে। যদি ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন, আর শাস্তি সাব্যস্ত হলে তা সহ্য করে নেবেন।' সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে এ আপত্তি নেই যে, তিনি হুযূরকে জিজ্ঞাসা না করে কেন চলে গেলেন? কারণ, ওই কাজ তখনই নিষিদ্ধ, যখন ফিরে আসার উদ্দেশ্য না থাকে, যেমন আযানের পর মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া তখনই নিষিদ্ধ, যখন ফিরে আসার উদ্দেশ্য থাকে না। সুতরাং এ হাদীস শরীফ এ আয়াতের বিরোধী নয়– 'হুযূরের মজলিস থেকে অনুমতি না নিয়ে যেও না।'

لِلذَّاكِرِيْنَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ هٰذَا لَهٗ خَاصَّةً ؟ فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَآءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهٗ كَمَا تَهَافَتَ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِنِ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلّٰى سَجْدَتَيْنِ لَا

উপদেশ মান্যকারীদের জন্য।'[৩২] সম্প্রদায় থেকে একজন লোক আরয করলো,[৩৩] "হে আল্লাহ্র নবী! এটা কি শুধু তারই জন্য?" এরশাদ করলেন, "বরং সমস্ত মানুষের জন্য।"[৩৪] [মুসলিম]

৫৩০।। হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঠাণ্ডার মৌসুমে তাশরীফ নিয়ে গেলেন[৩৫] যখন পাতাগুলো ঝরে পড়ছিলো। তখন হুযূর একটা গাছের দু'টি ডাল ধরলেন।[৩৬] (বর্ণনাকারী) বললেন, পাতা ঝরে পড়ছিলো। বর্ণনাকারী (আরো) বললেন, হুযূর এরশাদ করলেন, "হে আবূ যার! আমি আরয করলাম, "হুযূর, আমি হাযির।" এরশাদ করলেন, "যখন মুসলমান বান্দা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নামায পড়ে, তখন তার গুনাহ্ তেমনিভাবেই ঝরে পড়ে যেমন পাতা এ গাছ থেকে ঝরে পড়লো।"[৩৭] [আহমদ]

৫৩১।। হযরত যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,[৩৮] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি এমন দু'রাক'আত নামায পড়ে,

৩২. এ আয়াতের তাফসীর এক্ষুনি, কিছু পূর্বে করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে এ গুনাহ্র জন্য কোন শাস্তি নেই। কেননা, ওটা সগীরাহ্ গুনাহ্, যা তোমার দ্বারা ঘটনাচক্রে সংঘটিত হয়ে গেছে।

স্মর্তব্য যে, হুযূর প্রথমেই এ আয়াত শুনান নি, বরং চলে যাবার পর তাকে ডেকে পাঠিয়ে হাযির করে শুনিয়েছেন। কেননা, খুব সম্ভব হুযূরের আশা ছিলো যে, হয়তো লোকটির প্রসঙ্গে অন্য কোন আয়াত অবতীর্ণ হবে।

৩৩. আবেদনকারী ছিলেন হযরত ওমর ফারূক্ব অথবা হযরত মু'আয ইবনে জবল (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)।

৩৪. কেননা, যদিও এ আয়াতের অবতরণ বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে হয়েছে, কিন্তু সেটার বচনগুলো ব্যাপকার্থক।

স্মরণ রাখবেন, এখানে اَلنَّاس (মানুষ) মানে মুসলমান। অর্থাৎ যে মুসলমান নিয়মিতভাবে নামায পড়বে, তার সগীরাহ্ গুনাহ্ মাফ হতে থাকবে।

৩৫. মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে কোন জঙ্গলে। আর সেটা ছিলো হেমন্তকাল, যখন শাখাগুলো নাড়া দিলে পাতা ঝরে যায় এবং এমনিতেও পাতা ঝরতে থাকে।

৩৬. খুব সম্ভব এ গাছ এমন কোন জঙ্গলের হবে, যেখানে গাছপালা কারো বপন করা ছাড়া জন্মে, যার ফল-ফুল, পাতা-পল্লব কোন পথিক ছিঁড়তে পারে। এটাও হতে পারে যে, ওই গাছ হুযূরের নিজস্ব ছিলো। অথবা এমন কোন লোকের ছিলো, যে হুযূরের বরকতময় কাজে সন্তুষ্ট ছিলো; অন্যথায় অন্য কারো গাছ থেকে বিনা অনুমতিতে পাতা ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলা নিষিদ্ধ। [মিরক্বাত]

৩৭. অর্থাৎ নিষ্ঠার নামায হেমন্তকালের ওই তেজস্বী হাওয়ার

يَسْهُوْ فِيْهِمَا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. رَوَاهُ اَحْمَدُ.

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا وَّ بُرْهَانًا وَّ نَجَاةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَّهٗ نُوْرًا وَّ لَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَّكَانَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ

যে দু'রাক্'আতে কিছু ভুলে নি, আল্লাহ্ তার পূর্ববর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।"[৩৯] [আহমদ]

৫৩২।। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একদিন নামাযের কথা উল্লেখ করেন, তখন এরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি সেটা নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করবে,[৪০] নামায তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আলো, প্রমাণ ও নাজাত হয়ে যাবে।[৪১] আর যে ব্যক্তি তা নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করবে না, তার জন্য না নূর হবে, না প্রমাণ, না নাজাত। আর সে ক্বিয়ামত-দিবসে ক্বারূন, ফির'আউন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফের সাথে থাকবে।"[৪২] [আহমদ, দারেমী ও বায়হাক্বী- শু'আবিল ঈমান]

মতো, যা পাতা ঝেড়ে ফেলে। ইতোপূর্বে আরয করা হয়েছে যে, এখানে 'গুনাহ্' মানে সগীরাহ্ গুনাহ্।

৩৮. তিনি জুহায়না গোত্রের লোক। কুফায় বসবাস করতেন। সেখানেই ওফাতপ্রাপ্ত হন।

৩৯. খুব সম্ভব ওই দু'রাক্'আত মানে- ওযূর নফল নামায। অন্যান্য হাদীসে একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ভুলে নি' মানে উপস্থিত-হৃদয় হওয়া। অর্থাৎ যে কেউ উপস্থিত হৃদয় সহকারে ওযূর নফল নামায সম্পন্ন করে, তার সমস্ত সগীরাহ্ গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। এখন অন্যান্য নামায ফরয ও সুন্নাত ইত্যাদি তার মর্যাদা উন্নত করবে। মোট কথা, যখন নফল নামাযের এ উপকার হয়, তখন অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব নামাযের কত বড় উপকার হবে? (তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।)

৪০. এভাবে যে, নামায সব সময় পড়বে, বিশুদ্ধভাবে পড়বে, মন লাগিয়ে নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করবে। এটাই হচ্ছে নামায ক্বায়েম করার অর্থ, যার নির্দেশ হিকমতময় ক্বোরআন বারংবার দিয়েছে- اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (নামায ক্বায়েম করো)

৪১. 'ক্বিয়ামত'-এ কবরও অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মৃত্যুও ক্বিয়ামতই। অর্থ এ যে, নামায কবরে ও পুল সিরাতের উপর আলো হবে; সাজদার স্থান তেজোদীপ্ত বিড়ির মতো চমকাবে। আর নামায এ কথার প্রমাণ বহন করবে যে, সে একজন মু'মিন, বরং আরিফ বিল্লাহ্ (আল্লাহ্র পরিচিতিসমৃদ্ধ)। অনুরূপ, এ নামায দ্বারা সে সর্বত্র নাজাত পাবে। কেননা, ক্বিয়ামতে প্রথম প্রশ্ন নামায সম্পর্কে হবে। যদি বান্দা এ প্রশ্নের জবাব দিতে সফলকাম হয়, তখন ইনশা-আল্লাহ্ সামনেও সফলকাম হবে।

৪২. উবাই ইবনে খালাফ ওই মুশরিক, যাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন নিজের হাত মুবারকে হত্যা করেছিলেন। 'মিরক্বাত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে- এতে ইঙ্গিতে এরশাদ করা হয়েছে যে, বে-নামাযীর হাশর ওইসব কাফিরের সাথে হবে। আর নামাযী মু'মিনের হাশর হবে- নবীগণ, সিদ্দীক্বগণ, শহীদগণ ও নেক্কার বান্দাদের সাথে- ইন্শা-আল্লাহ্। এতে একথা অপরিহার্য হয় না যে, বে-নামাযী কাফির হয়ে যাবে, আর নামাযী হবে নবী; বরং বে-নামাযীকে ক্বিয়ামতে ওইসব কাফিরের সাথে দণ্ডায়মান করানো হবে; যেমন কোন ভদ্রলোককে তুচ্ছ লোকদের সাথে বসতে দেওয়া তার জন্য অপমানের কারণ হয়। সুতরাং হাদীস শরীফের অর্থ সুস্পষ্ট।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهٗ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلٰوةِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا

৫৩৩।। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শক্বীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু[৪৩] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ কর্মগুলোর মধ্যে নামায ব্যতীত[৪৪] অন্য কোন কর্ম বর্জন করাকে কুফর মনে করতেন না।" [তিরমিযী]

৫৩৪।। হযরত আবুদ্দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার মাহবূব ওসীয়ৎ করেছেন,[৪৫] কোন কিছুকেই আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করো না!- যদিও তোমাকে হত্যা করা হয়, কিংবা জ্বালিয়ে ফেলা হয়, আর ফরয নামায ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিও না। সুতরাং যে ব্যক্তি সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়,

এর উপর কোন আপত্তি আসতে পারে না।

স্মর্তব্য যে, ক্বিয়ামতে প্রত্যেকের হাশর তারই সাথে হবে, যার সাথে দুনিয়ায় তার ভালবাসা ছিলো এবং যার মতো সে কাজ করতো। বে-নামাযী যেহেতু কাফিরদের মতো কাজ করে, সেহেতু তার হাশরও তাদের সাথে হবে। নামাযী লোকেরা নবী ও সিদ্দীক্বদের কর্মই সম্পন্ন করে। সুতরাং তাদের হাশরও তাঁদের সাথে হবে। এ কারণে কথিত আছে যে, ভালো মানুষের অনুসরণও ভালো, আর মন্দ লোকদের মতো কাজ করাও মন্দ।

৪৩. তিনি হলেন একজন মহা মর্যাদাবান তাবে'ঈ। হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত ওসমান ও হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম)-এর সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি বনী আক্বীল গোত্রের লোক। বসরায় বসবাস করতেন। ১০৮ হিজরীতে ইন্তিক্বাল করেন।

৪৪. কেননা, ওই যুগে নামায পড়া মু'মিনের আলামত ছিলো। আর না পড়া ছিলো কাফিরের পরিচয়। যেমন আজকাল মাথার উপর টিক্নী আর নিচে ধুতি পরা হিন্দুদের পরিচয়। এ কারণে ওইসব হযরত যাকে নামায না পড়তে দেখতেন তাকে মনে করতেন সম্ভবতঃ সে কাফির। সুতরাং এ হাদীস শরীফ থেকে একথা অপরিহার্য হয় না যে, নামায বর্জন করা কুফর, বে-নামাযী কাফির। তাছাড়া এ হাদীস ওইসব হাদীসেরও পরিপন্থী নয়, যেগুলোতে এরশাদ করা হয়েছে যে, মু'মিন জান্নাতী-যদিও হয় যিনাকারী ও চোর। অর্থাৎ সে জান্নাতের উপযোগী।

৪৫. 'ওসীয়ৎ' মানে তাকীদ-বিশিষ্ট নির্দেশ। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ (অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তাকীদী নির্দেশ দিচ্ছেন; ৪:১১) 'শির্ক না করা' মানে 'আন্তরিকভাবে শির্ক না করা'। অর্থাৎ শির্কের আক্বীদা অবলম্বন করো না। সুতরাং এ হাদীস এই আয়াতের পরিপন্থী নয়- اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ (কিন্তু যাকে বাধ্য করা হয়, অথচ তার হৃদয় থাকে ঈমান দ্বারা প্রশান্ত।) কেননা, আয়াতে কঠোরভাবে বাধ্য ব্যক্তিকে মুখে কুফরী বাক্য বলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর এখানে কুফরের আক্বীদা পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এও হতে পারে যে, আয়াতে 'অনুমতি'র (رخصت) কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর এখানে যে কোন মূল্যে অটল থাকার (عزيمت) কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদিও অপারগকে কুফরী কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সাওয়াব হচ্ছে এরই (অটল থাকার) মধ্যে। ক্বতলকে বরণ করো, তবুও মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করো না।

فَقَدْبَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَ لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهٖ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَ

তার প্রতি কোন দায়িত্ব থাকবে না[৪৬] এবং মদ্য পান করো না, কারণ তা হচ্ছে প্রত্যেক মন্দের চাবি।"[৪৭] [ইবনে মাজাহ]

অধ্যায় ঃ নামাযগুলোর সময়সীমা[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৫৩৫।। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যোহরের সময়সীমা[২] হচ্ছে– 'যখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যায়[৩] এবং মানুষের ছায়া তার গড়নের সমান হয়ে যায়[৪] যতক্ষণ না আসর এসে যায়।[৫]

---

৪৬. অর্থাৎ বে-নামাযী থেকে ইসলামের নিরাপত্তা উঠে গেছে (নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে)। তাকে শাসক কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দিতে পারেন। অথবা অর্থ এ যে, নামাযী আল্লাহ্র নিরাপত্তায় থাকে, শত শত মুসীবৎ থেকে নিরাপদে থাকে। বে-নামাযী এ মহা সম্পদ থেকে বঞ্চিত।

৪৭. কেননা, মদ বিবেককে নষ্ট করে ফেলে। অথচ বিবেকই মন্দ কার্যাদি থেকে বিরত রাখে। বিবেকহীন অবস্থায় মানুষ যে কোন কিছু করে বসে। মনে রাখবেন– আরবীতে خمر (খমর) শুধু আঙ্গুর থেকে তৈরীকৃত মদকে বলা হয়। কিন্তু এখানে প্রত্যেক নেশা-সঞ্চারক মদের কথা বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য বিষয়বস্তু থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়।

****

১. مواقيت (মাওয়া-ক্বীত) ميقات (মীক্বাত) শব্দের বহুবচন। মীক্বাত মানে সময়, যেমন ميعاد 'মী-আদ' মানে وعده (ওয়াদা) বা প্রতিশ্রুতি, ميلاد (মীলাদ) মানে ولادت (বেলাদত) বা জন্ম এবং معراج (মি'রাজ) মানে عروج 'উরূজ বা উর্ধ্বগমন। এখানে مواقيت (মাওয়াক্বীত) মানে নামাযের সময়সীমাগুলো।

নামাযের সময় তিন ধরনের – এক. মুবাহ সময়, দুই. মুস্তাহাব সময় এবং তিন. মাকরূহ সময়। নামাযের সময়গুলো এমনসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো শরীয়তই নির্দ্ধারণ করেছে; বিবেক-বুদ্ধির যেখানে কোন দখল নেই। তবে সেগুলোর মধ্যে হিকমত বা গূঢ় রহস্যাদি অবশ্যই রয়েছে। এসব হিকমত আমার কিতাব 'আস্‌রারুল আহকাম'-এ দেখুন। যেহেতু নামাযের জন্য ওয়াক্ত হচ্ছে প্রথম পূর্বশর্ত, সেহেতু 'মিশ্‌কাত শরীফ' প্রণেতা নামাযের বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সেটার কথা উল্লেখ করেছেন।

২. ظهر (যোহর) ظهور (যুহূর অর্থাৎ প্রকাশ পাওয়া) থেকে গঠিত, অথবা ظهيره (যহীরাতুন অর্থাৎ দ্বি-প্রহর) থেকে। যেহেতু মি'রাজের পর সর্বপ্রথম এই নামায প্রকাশ পেয়েছে এবং সর্বপ্রথম এটাই সম্পন্ন করা হয়েছে, তদুপরি এটা দ্বি-প্রহরেই সম্পন্ন করা হয়, সেহেতু সেটাকে যোহর (ظهر) বলা হয়।

৩. সূর্য ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত চড়তে থাকে, আর দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পশ্চিম দিকে নিচে নামতে থাকে। যেই সীমা পর্যন্ত আরোহণ করা সমাপ্ত হয় এবং এরপর থেকে নিচে নামতে আরম্ভ করে, ওই সময় হচ্ছে نصف النهار (দিনের অর্ধভাগ)। نصف النهار (দিনের অর্ধভাগ) থেকে সামনে অগ্রসর হবার নাম زوال (যাওয়াল বা হেলে পড়া)।

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرِ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ الْاَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمْسِكْ عَنِ

আর আসরের সময় থাকে যে পর্যন্ত না সূর্য হলদে রং ধারণ করে,[৬] মাগরিবের সময় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না 'শফক্ব' (পশ্চিমাকাশে শুভ্রতা) অদৃশ্য হয়ে যায়।[৭] আর এশার নামাযের সময় থাকে রাতের মধ্যবর্তী অর্ধেক পর্যন্ত[৮] এবং ফজরের নামাযের সময়সীমা থাকে ভোর উদিত হওয়া থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না সূর্য চমকে ওঠে। যখন সূর্য চমকিত হয়ে ওঠে, তখন নামায থেকে বিরত থাকো।[৯]

এ হেলে পড়ার সময়ই হচ্ছে যোহর-এর সূচনা। সেটার কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে।

৪. সূর্য হেলে পড়ার সময় 'ছায়া' সমান বা স্থির হওয়া কোন কোন দেশ ও কোন কোন সময়েই হবে। শীতকালে যেহেতু সূর্য দক্ষিণ দিকে অবস্থান করে অগ্রসর হয়, সেহেতু তখন কোন কোন স্থানে এ ছায়া ওই বস্তুর সমান হয়ে যায়, কিন্তু কোন কোন দেশে তখন ছায়া একেবারে থাকে না, থাকলেও তা থাকে অতি স্বল্প। যে সময়ে হুযূর এটা এরশাদ ফরমায়েছেন, তা সম্ভবতঃ শীতের মৌসুম ছিলো। সুতরাং এ হাদীস একেবারে স্পষ্ট। আর ওই হাদীসের বিপরীতও নয়, যেগুলোর মধ্যে এ ছায়ার পরিমাণ 'চামড়ার লম্বা টুকুরো'র সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, ওখানে গ্রীষ্মকালের উল্লেখ রয়েছে। আর এখানে রয়েছে শীতকালের কথা। এটাও হতে পারে যে, এ বাক্যে যোহরের শেষ সময়ের কথা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য, আর হাদীসের অর্থও এ-ই হবে যে, 'সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার সময় থেকে যোহর আরম্ভ হয় এবং একদণ্ড পরিমাণ ছায়া হলে তা সমাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় এ হাদীস ইমাম শাফে'ঈর দলীল। কেননা, আমাদের মাযহাবে দু'দণ্ড পরিমাণ সময় হওয়া পর্যন্ত যোহরের সময় থাকে; তাঁদের (ইমাম শাফে'ঈ) মাযহাবানুসারে এক দণ্ড পরিমাণ সময় হতেই তা শেষ হয়; কিন্তু তাঁদের এ দলীল দুর্বল। কেননা, তাতে মূল ছায়ার কথার উল্লেখ নেই। ইমাম শাফে'ঈর মাযহাবে আসলী (মূল) ছায়া ব্যতীত এক দণ্ড পরিমাণ হওয়া জরুরী।

৫. প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ বাক্য যোহরের সর্বশেষ সময়ের বিবরণ। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এটা প্রথম বাক্যের তাকীদ। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যোহর ও আসরের মধ্যখানে কোন দূরত্ব নেই। অর্থাৎ যোহর অতিবাহিত হতেই আসর এসে যায়।

৬. এটা আসরের মুস্তাহাব ওয়াক্বতের বিবরণ। অর্থাৎ রোদ হলদে বর্ণ ধারণ করার পূর্বে আসরের নামায পড়ে নেওয়া চাই। অন্যথায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সময় থাকে। মুসলিম ও বোখারীর বর্ণনাগুলোতে এমনি বর্ণিত হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, সূর্য অস্ত যাবার বিশ মিনিট পূর্বে হলদে আকার ধারণ করে।

৭. অর্থাৎ মাগরিবের সময় আরম্ভ হয় সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে। আর শেষ হয় 'শফক্ব' অদৃশ্য হলে। ইমাম আ'যমের মতে 'শফক্ব' ওই শুভ্রতার নাম, যা আসমানের পশ্চিম দিগন্তে লালচে রংয়ের পর দেখা যায়। আর ইমাম শাফে'ঈ ও সাহিবাঈন (ইমাম আবূ ইয়ূসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ)-এর মতে, লাল রংয়ের নাম 'শফক্ব'। অর্থাৎ শুভ্রতা (সাদা রং) থাকাকালীন সময়টুকু আমাদের ইমাম আ'যম সাহেবের মতে, মাগরিবেরই সময়। এ অভিমত সাইয়্যেদুনা আবূ হোরায়রা, ইমাম আওযা'ঈ এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের। আর ইমাম শাফে'ঈর মতে এ সময়টুকু এশার নামাযের। এ অভিমত হচ্ছে- সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের।

সতর্কতা হচ্ছে- শুভ্রতা প্রকাশ পাবার পূর্বে মাগরিবের নামায পড়ে নেওয়া আর শুভ্রতা দূরীভূত হবার পরে এশার নামায সম্পন্ন করা। এতে বিরোধ এড়ানো যাবে।

৮. এখানে মুস্তাহাব সময় বুঝানো উদ্দেশ্য; অর্থাৎ মুস্তাহাব হচ্ছে অর্দ্ধরাতের পূর্বে পড়ে নেবে; নতুবা এশার নামাযের সময় থাকে সোব্‌হে সাদিক্ব উদিত হওয়া পর্যন্ত।

'মধ্যবর্তী' মানে হয়তো 'মধ্যরাত' নতুবা 'মধ্যবর্তী অর্দ্ধেক'। অর্থাৎ রাতগুলো দীর্ঘও হয়, খাটোও হয় এবং মাঝারীও হয়। তোমরা মাঝারি রাতের অর্দ্ধেক সময় পর্যন্ত পড়ে নাও অথবা পূর্ণ অর্দ্ধরাত্রি পর্যন্ত পড়ো; না এর কম, না বেশী।

৯. অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত, কোন নামায পড়োনা- না নফল, না ফরয।

الصَّلٰوةِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ اِنَّ رَجُلاً سَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهٗ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِى الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهٗ فَاَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهٗ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهٗ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهٗ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ

কারণ, সূর্য শয়তানের দু'শিংয়ের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়।[১০] [মুসলিম]

৫৩৬।। হযরত বোরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,[১১] তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নামাযের সময়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হুযূর তাকে এরশাদ করলেন, "তুমি আমাদের সাথে এ দু'দিন নামায পড়ো।[১২] সুতরাং যখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়লো তখন হযরত বেলালকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি আযান দিলেন। তারপর নির্দেশ দিলেন। তিনি যোহরের তাকবীর বললেন।[১৩] তারপর তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি আসরের তাকবীর বললেন, যখন সূর্য উপরে সাফ-পরিষ্কার ছিলো।[১৪] তারপর তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি মাগরিবের তাকবীর বললেন[১৫] যখন সূর্য ডুবে গেলো। তারপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি এশার নামাযের তাকবীর বললেন– যখন "শফক্ব' চোখের অন্তরালে চলে গেলো।

এখানে দু'টি মাসআলা বুঝে নেওয়া চাই ঃ

এক. তিনটি সময়ে নামায পড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঃ ক. সূর্য-উদিত হবার সময়, খ. দুপুরে অর্থাৎ দিনের ঠিক মধ্যভাগে এবং গ. সূর্যাস্তের সময়। কারণ এ সময়গুলোতে ফরয ও নফল নামায, বরং সাজদাও হারাম। অবশ্য সূর্যাস্তের সময় আজকের আসরের নামায দুরস্ত আছে।

দুই. যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্যের মধ্যে প্রখরতা আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্যোদয়– বলে ধরে নেওয়া যাবে। অর্থাৎ সূর্য চকমিত হবার সময় থেকে বিশ মিনিট পর্যন্ত সাজদাহ্ করা হারাম।

১০. শয়তান সূর্য উদিত হবার সময় সূর্যের সামনে অর্থাৎ একজন এভাবে দাঁড়িয়ে যায় যে, সূর্য তার দু'টি শিং-এর মধ্যবর্তীতে রয়েছে বলে মনে হয়। আর সে তার অন্যান্য শয়তানকে দেখিয়ে বলে, "সূর্যের পূজারীরা তারই পূজা করছে।" বস্তুতঃ অনেক মুশরিক তখন সূর্যকেই সাজদা করে। সেটার দিকে পানি নিক্ষেপ করে তার প্রতি সম্মান দেখায়। মুসলমানদের জন্য তখন সাজদা করা হারাম; যা'তে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য না হয় আর শয়তানও একথা বলতে না পারে যে, মুসলমানগণ তাকে সাজদা করছে। স্মর্তব্য যে, সূর্য সবসময় কোথাও না কোথাও উদিত হয়, ঘুরে বেড়ায়। যেখানেই সূর্য-উদিত হচ্ছে সেখানে তখনই সে আত্মপ্রকাশ করে। এর আরো বহু ব্যাখ্যা আছে।

১১. তাঁর নাম বোরায়দা ইবনে হাসীব। 'বনী আস্লাম গোত্রের লোক। বদর ব্যতীত সমস্ত যুদ্ধে হুযূরের সাথে ছিলেন। খোরাসানে গাজী বেশে গিয়েছিলেন। মারভ-এ ওফাত পান। সেখানেই তাঁর সন্তানগণ এখনো রয়েছেন। [মিরক্বাত]

১২. যাতে তুমি প্রত্যেক নামাযের সময়সীমার শুরু ও শেষ জানতে পারো। বুঝা গেলো যে, কার্যতঃ প্রচারণা মৌখিক প্রচারণা অপেক্ষা বেশী ফলপ্রসূ। খুব সম্ভব এ প্রশ্নকারী বাইরের কোন এলাকার লোক ছিলো। অন্যথায় সাহাবা-ই কেরাম তো প্রতিটি নামায হুযূর-ই আন্ওয়ারের সাথেই সম্পন্ন করতেন।

১৩. অর্থাৎ সূর্য পশ্চিম দিকে হেলতেই কোন বিলম্ব-বিরতি ছাড়াই যোহরের আযান দেওয়ালেন। তারপর সুন্নাতগুলোর সময় দিয়ে তাকবীর (ইক্বামত) বলার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং এ হাদীস শরীফ থেকে একথা অপরিহার্য হয় না যে,

ثُمَّ اَمَرَه، فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا اَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِىْ اَمَرَه، فَاَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ بِهَا فَاَنْعَمَ اَنْ يُّبْرِدَبِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اٰخِرَهَا فَوْقَ الَّذِىْ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاَسْفَرَبِهَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقْتُ صَلٰوتِكُمْ بَيْنَ مَارَاَيْتُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

তারপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি ফজরের তাকবীর বললেন– যখন ভোর উদিত হলো। অতঃপর যখন দ্বিতীয় দিন হলো, তখন তাঁকে নির্দেশ দিলেন। তারপর যোহরকে ঠাণ্ডা করলেন; বরং সেটাকে খুব ঠাণ্ডা করলেন।[১৬] আর আসর তখনই পড়লেন, যখন সূর্য উপরে ছিলো। তবে ওই সময় থেকে দেরী করলেন, যা গতকাল ছিলো।[১৭] আর মাগরিব পড়লেন 'শফক্ব' অদৃশ্য হবার পূর্বে[১৮] এবং এশা পড়েছেন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হবার পর। আর ফজর পড়লেন– ভোর খুব উজ্জ্বল হলে। তারপর এরশাদ ফরমালেন, "কোথায় নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী?" ওই লোকটি আরয করলো. "আমি, এয়া রসূলাল্লাহ্!" তখন এরশাদ করলেন, "তোমাদের নামাযের সময়গুলো হচ্ছে এর মধ্যবর্তী সময়, যা তোমরা দেখে নিলে।[১৯] [মুসলিম]

আযানের পরক্ষণে তাৎক্ষণিকভাবে তাকবীর (ইক্বামত) বলা হয়েছিলো। মাগরিব ব্যতীত বাকী সব নামাযের আযান ও তাকবীরের মধ্যে বিরতি থাকা চাই। এ কারণে এখানে ثُمَّ (অতঃপর) এরশাদ হয়েছে। বুঝা গেলো যে, তাকবীর (ইক্বামত) আযানের কিছুক্ষণ পরে বলা হয়েছে।

১৪. অর্থাৎ আসরের সময় হতেই আসরের আযান দেওয়ালেন– ছায়া দু'দণ্ড দীর্ঘ হবার পরক্ষণে, যেমন পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে ইন্শা-আল্লাহ্। সূর্য সাফ ও উজ্জ্বল হওয়া থেকে একথা অনিবার্য হয় না যে, ছায়া এক দণ্ড দীর্ঘ হতেই আযান হয়েছে। দু'দণ্ড হলেও সূর্য সাফ ও উজ্জ্বল থাকে।

১৫. অর্থাৎ মাগরিবের আযান সমাপ্ত হতেই তাকবীর বলেছেন। যেহেতু এ আযান ও তাকবীর মিলিতভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে, সেহেতু শুধু তাকবীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ যোহর সেটার সময়সীমার শেষ প্রান্তে সম্পন্ন করেছেন, যখন গরম একেবারে শেষ হয়ে যায়। সময় খুব ঠাণ্ডা হয়েছে। খুব সম্ভব এটা গরমের মৌসুম ছিলো। অন্যথায় শীতকালে তো সবসময়ই ঠাণ্ডা থাকে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, আজ যোহর ছায়া একদণ্ড হবার অনেকক্ষণ পরে সম্পন্ন করেছেন। অন্যথায় এক দণ্ড ছায়া পর্যন্ত তীব্র গরম থাকে। সুতরাং এ হাদীস ইমাম আ'যমের দলীল হতে পারে।

১৭. এখানেও মুস্তাহাব সময়-এর উল্লেখ রয়েছে। যদিও আসরের সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে, কিন্তু হুযূর সূর্য হলদে হওয়ার পূর্বে আজকের আসর পড়ছেন– 'মাকরূহ হওয়া' থেকে বাঁচার জন্য।

১৮. এ থেকে বুঝা গেলো যে, মাগরিবের সময় সূর্যাস্ত থেকে আরম্ভ হয়ে 'শফক্ব' অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত থাকে। এ অভিমত আমাদের ইমাম-ই আ'যমের। ইমাম শাফে'ঈ ও মালেক রাহিমাহুমাল্লাহ্'র মতে, মাগরিবের সময় শুধু মাগরিবের নামায সম্পন্ন করতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত। এ হাদীস আমাদের ইমামের মজবুত দলীল। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু)।

১৯. ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে কোন কোন নামাযের মুস্তাহাব সময়গুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে– মুস্তাহাব সময়ের শুরু ও শেষ এটাই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِیْ ◆ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَمَّنِیْ جِبْرَئِیْلُ عِنْدَ الْبَیْتِ مَرَّتَیْنِ فَصَلّٰی بِیَ الظُّهْرَ حِیْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلّٰی بِیَ الْعَصْرَ حِیْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَیْءٍ مِثْلَهٗ وَصَلّٰی بِیَ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫৩৭।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, দু'বার হযরত জিব্রাঈল বায়তুল্লাহ্র নিকট আমার ইমামত করেছে।[২০] সুতরাং আমাকে যোহর পড়িয়েছে- যখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে এবং ছায়া চামড়ার ফিতার সমান হয়েছে।[২১] আর আমাকে আসর পড়িয়েছে- যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া সেটার সমান হয়েছে[২২] এবং আমাকে মাগরিব পড়িয়েছে-

সুতরাং হাদীসের বিপক্ষে কোন আপত্তি নেই।

২০. অর্থাৎ শবে মি'রাজের ভোর থেকে জিব্রাঈল আমীন দু'দিন আমাকে নামায পড়িয়েছেন। সর্বপ্রথম যোহরের নামায পড়িয়েছেন।

স্মর্তব্য যে, হযরত জিব্রাঈল আমীন হুযূরের ওস্তাদ নন; বরং খাদিম। এ নামায পড়ানো আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছানোর জন্য ছিলো, এটা পৌঁছানোর দায়িত্ব ছিলো, যা তিনি পালন করেছেন। কখনো মুক্তাদী ইমাম অপেক্ষা উত্তম হন। হুযূর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের পেছনে ফজরের নামায পড়েছেন; অথচ হুযূর নবী ছিলেন, তিনি উম্মত। তাছাড়া এ ইমামত থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, নফল নামায সম্পন্নকারীর পেছনে ফরয নামায সম্পন্ন করা দুরস্ত আছে। কেননা, আজ এ নামাযগুলো হযরত জিব্রাঈলের উপর ফরয হয়ে গিয়েছিলো। যখন মহান রব তাঁকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তা ফরয হয়ে গেছে।

এ ঘটনা বায়তুল্লাহ্র দরজার একেবারে নিকটে ঘটেছিলো, যেখানে এখনো লোকেরা নফল নামায পড়ে। এখানে হাউযের মতো জায়গা নিচু। কাবা শরীফকে গোসল দেওয়ানোর সময় এখানেই ঝমঝম ভর্তি করা হয়।

এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত জিব্রাঈলের এ শিক্ষা প্রদান উম্মতের জন্য ছিলো, হুযূরের জন্য ছিলো না। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-তো নামাযের পদ্ধতি ও সেগুলোর সময়সীমা আগে থেকে জানতেন। সর্বপ্রথম ওহী যখন আসলো তখন তিনি হেরা পর্বতের গুহায় ই'তিকাফরত ছিলেন। তা'ছাড়া মি'রাজে যাবার সময় বায়তুল মুক্বাদ্দাসে সমস্ত রসূলকে নামায পড়িয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বায়তুল মা'মূর'-এ সমস্ত ফিরিশ্তাকে নামায পড়িয়েছিলেন। তিনি তো নবীগণ ও ফিরিশ্তাকুলের ইমাম। কিন্তু উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া হয়- বিধানাবলী অবতীর্ণ হবার পর।

২১. অর্থাৎ ওইদিন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাবার সময়টুকুতে মানুষের ছায়া জুতোর (চামড়ার) ফিতার সমান ছিলো। কেননা, গরমের মৌসুম ছিলো। এ ছায়া মৌসুমগুলো অনুসারে কমে-বাড়ে।

স্মর্তব্য যে, এখানে 'ছায়া' মানে সাধারণ মানুষের ছায়া; হুযূরের ছায়া নয়; হযরত জিব্রাঈলেরও নয়। কারণ, তাঁরা উভয়ই নূর। নূরের ছায়া থাকে না। হুযূরের ছায়া ছিলো না; যদিও সমগ্র বিশ্বের উপর হুযূরের ছায়া রয়েছে। এ প্রসঙ্গে গবেষণালব্ধ আলোচনা আমার 'রেসালা-ই নূর'-এ দেখুন।

২২. এ হাদীস থেকে ইমাম শাফে'ঈ ও সাহেবাঈন এ মর্মে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, এক দণ্ডের পরিমাণ ছায়া হয়ে গেলে আসরের সময় হয়ে যায়। আমাদের ইমাম-ই আ'যমের মতে, দু'দণ্ড হয়ে গেলে (আসরের নামাযের) সময় হয়; কিন্তু এ হাদীস তাঁদেরও বিপরীত; কেননা, এখানে 'মূল ছায়া'র উল্লেখ নেই; অথচ ওইসব বুযুর্গের মতেও আসরের সময় 'মূলছায়া' (سایۂ اصلی) ব্যতীত এক দণ্ড হয়ে গেলেই হয়ে থাকে। বাস্তব কথা হচ্ছে- সময়সীমাগুলোর বর্ণনা সম্বলিত এ হাদীস 'মানূসূখ' (রহিত)। যেমনিভাবে ওইদিন প্রতিটি নামায দু দু'রাক'আত ছিলো, তেমনি ওই দিন নামাযগুলোর সময়সীমাও এই ছিলো। পরবর্তীতে নামাযগুলোর রাক'আত যেমন বর্দ্ধিত হয়েছে তেমনিভাবে নামাযের সময়সীমাও পরিবর্তিত হয়েছে। ইন্শা-আল্লাহ্ এর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে। আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' : দ্বিতীয় খণ্ডেও দেখুন। এর 'নাসিখ'

الْـمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّآئِمُ وَصَلّٰى بِىَ الْعِشَآءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلّٰى بِىَ الْـفَـجْـرَ حِيْـنَ حَـرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّآئِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلّٰى بِىَ الـظُّهُـرَ حِيْـنَ كَانَ ظِلُّه' مِثْلَه' وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّه' مِثْلَيْهِ وَصَلّٰى بِىَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِىَ الْعِشَآءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ صَلّٰى بِىَ الْـفَـجْـرَ فَـاَسْـفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَآءِ مِنْ قَبْلِكَ

যখন রোযাদার ইফতার করে।[২৩] আমাকে এশা পড়িয়েছে যখন 'শফক্ব' অদৃশ্য হয়েছে।[২৪] আর আমাকে ফজর পড়িয়েছে– যখন রোযাদারের উপর পানাহার হারাম (নিষিদ্ধ) হয়।[২৫]

অতঃপর যখন আগামীকাল হলো, তখন আমাকে যোহর তখনই পড়িয়েছে, যখন বস্তুর ছায়া সেটার সমান হয়ে গেলো।[২৬] আর আমাকে আসর তখন পড়িয়েছে– যখন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হয়েছে[২৭] এবং আমাকে মাগরিব পড়িয়েছে– যখন রোযাদার ইফতার করে।[২৮] আর আমাকে এশা রাতের এক তৃতীয়াংশ নাগাদ পড়িয়েছে এবং আমাকে ফজর পড়িয়েছে ফজরকে উজালা করে। তারপর আমার দিকে ফিরলো এবং আরয করলো, "হে মুহাম্মদ মোস্তফা![২৯] এগুলো আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের সময়।[৩০]

(রহিতকারী) হাদিসগুলোর উল্লেখও আসছে।

২৩. অর্থাৎ আজকাল যে সময়ে ইফতার করা হয় ওই সময়ে মাগরিব পড়িয়েছেন, অর্থাৎ সূর্য ডুবতেই। অন্যথায় ওই দিন না রোযা ফরয ছিলো, না ইফতার ছিলো। রোযা ফরয হয়েছে হিজরতের পরে। সুতরাং হাদীসের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি নেই।

২৪. এর অর্থ হচ্ছে সেটাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সূর্যাস্তের লালিমার পর ওই শুভ্রতাকে 'শফক্ব' বলে। সেটা অদৃশ্য হবার পরক্ষণে এশার সময় হয়ে যায়। সেটাই এখানে বুঝানো হয়েছে। এমনি বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়ে আসছে।

২৫. এর অর্থও সেটাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আজকাল যখন ভোর হওয়ার সাথে সাথে রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়, তখন ফজরের নামায পড়িয়েছেন। অন্যথায় তখন না রোযা ছিলো, না সেহেরী ও ইফতার।

২৬. প্রকাশ তো এটাই হয় যে, আজ যোহরের নামায ওই সময়টুকুতে পড়িয়েছেন যখন গতকাল আসরের নামায পড়েছিলেন। অর্থাৎ এক দণ্ড ছায়া হয়ে গেলে। সুতরাং এ হাদীস মানসূখ হবার উপর সবাই একমত। কারো মাযহাব এটা নেই যে, যোহরের শেষ ও আসরের প্রথমভাগ একটি মাত্র সময়। সবার মতে, যোহরের পর আসরের সময় হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে আনুমানিক সময় বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রায় একদণ্ড ছায়া ছিলো। এক দণ্ডের কিছুটা পূর্বে।

কোন কোন ইমাম বলেছেন, যোহরের নামায শেষ হবার পর এক দণ্ড হয়েছে, আরম্ভ হবার পর হয় নি। কেউ কেউ বলেছেন, আসল ছায়া সহকারে এক দণ্ড বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গতকাল আসরের নামায পড়িয়েছেন এক দণ্ড হলে– আসল ছায়া ব্যতীত। আর আজ আসল ছায়া সহকারে একদণ্ড হলে যোহরের নামায পড়িয়েছেন। মোট কথা, এ হাদীস 'মুশকালাত' পর্যায়ের। বাস্তব কথা হচ্ছে এটা মানসূখ (রহিত)।

২৭. এ হাদীস (খবর)ও সর্বসম্মতভাবে 'মানসূখ'। কেননা, সবার মতে, আসরের সময়সীমা সূর্য অদৃশ্য হলেই শেষ হয়, ছায়া দ্বিগুণ হলে হয় না; বরং ইমাম আ'যমের মতে, তখন আসর আরম্ভ হয়।

২৮. অর্থাৎ মাগরিব উভয় দিনে একই সময়ে পড়িয়েছেন। ইমাম শাফে'ঈ ও ইমাম মালিকের অভিমত এটাই। কিন্তু আমাদের মাযহাবানুসারে, এ হাদীস মানুসূখই। পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর দ্বিতীয় দিন মাগরিব 'শফক্ব' (মতান্তরে, সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশের শুভ্রতা) অদৃশ্য হবার কিছু পূর্বে পড়িয়েছেন। যদি মাগরিবের সময় শুধু মাগরিবের নামায সম্পন্ন করার পরিমাণই হতো, তবে এ বিলম্বের কি-ই

وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاو'دَ وَالتِّرْمِذِىُّ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ' عُرْوَةُ اَمَا اِنَّ جِبْرِئِيْلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلّٰى اَمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ

আর এ সময়সীমাগুলোর মধ্যবর্তী সময়ই হচ্ছে নামাযের সময়।[৩১] [আবূ দাঊদ, তিরমিযী]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫৩৮।। হযরত ইবনে শিহাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত,[৩২] হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয আসরের নামায কিছু দেরী করে পড়েছেন।[৩৩] তখন তাঁকে 'ওরওয়া বলেছেন, হযরত জিব্রাঈল অবতরণ করেছেন। তিনি হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে নামায পড়েছেন। অতঃপর তাঁকে

বা অর্থাৎ আর এ হাদীস এর পরবর্তীরই। কেননা, আজকালতো ইসলামের প্রথম নামাযই সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২৯. এ বাক্য হুযূর বিনয়রূপে নিজের পবিত্র ভাষায় এরশাদ ফরমাচ্ছেন। অন্যথায় হযরত জিব্রাঈল অতিমাত্রায় আদব সহকারে আরয করছিলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! হে আল্লাহ্র হাবীব!" যেমনিভাবে, আজকাল কোন আলিম বলেন, আমাকে অনুষ্ঠানের আয়োজকগণ বলেছেন– তুমিও কিছু বলো। অথচ অনুষ্ঠানের আয়োজকগণ (পরিচালক) আদব সহকারে আরয করে থাকেন। হযরত জিব্রাঈল কীভাবে শুধু নাম শরীফ নিয়ে আহ্বান করতে পারেন? এটাতো ক্বোরআনের নির্দেশের বিরোধী। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন– لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ (তোমরা রসূলের আহ্বানকে করো না... আল-আয়াত; ২৪:৬৩)

৩০. অর্থাৎ এসব নামায থেকে যে নবী যে নামাযই পড়েছেন, তিনি এ সময়েই পড়েছেন।

স্মর্তব্য যে, কোন নবীকেই এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায একত্রে দেওয়া হয় নি। একত্রে এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রদত্ত হওয়া হুযূরের উম্মতেরই বৈশিষ্ট্য। সুতরাং হাদীস পরিষ্কার; বরং আবূ দাঊদ, বায়হাক্বী ও ইবনে আবী শায়বাহ্ বলেন, হুযূর এরশাদ করেছেন, "এশার নামায তোমাদের পূর্বে কোন উম্মত পড়ে নি।" হতে পারে, এ নামায কোন কোন নবী পড়েছেন; কিন্তু তাঁদের উম্মতের উপর ফরয হয় নি। যেমন তাহাজ্জুদের নামায আমাদের হুযূরের উপর ফরয ছিলো; আমাদের উপর ফরয নয়। ইমাম ত্বাহাভী হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণনা করেছেন, ফজরের নামায হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম পড়েছেন– যখন তাওবা ক্ববূল হয়েছে, যোহরের নামায হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম পড়েছেন– যখন হযরত ইসমাঈলের 'ফিদিয়া' (বিনিময়ে দুম্বা) এসেছিলো। আসরের নামায হযরত ওযায়র আলায়হিস সালাম পড়েছেন– যখন একশ' বছর পর তিনি জীবিত হয়েছেন, মাগরিবের নামায হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম পড়েছেন– তাঁর তাওবা ক্ববূল হলে। কিন্তু তিনি নিয়্যত করেছিলেন চার রাক্'আতের; তিন রাক্'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিয়েছেন। কারণ, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং তিন রাক্'আতই রয়ে গেছে। এশার নামায আমাদের হুযূরই পড়েছেন। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলায়হিমুস্ ওয়াসাল্লাম) কেউ কেউ বলেছেন, (এশার নামায) হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম পড়েছেন– যখন তিনি আগুন আনার জন্য তূর পর্বতে গিয়েছিলেন এবং মঙ্গলসহকারে 'নুবূয়ত' নিয়ে এসেছেন। অতঃপর বিবি সাহেবাকে সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় পেয়েছেন– ততক্ষণে সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ্ই সর্বাপেক্ষা ভালো জানেন।

৩১. প্রকাশ থাকে যে, ওই দু'দিন হযরত জিব্রাঈলের সাথে শুধু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামই নামায পড়েছেন। ওইগুলোতে সাহাবীগণ সাথে ছিলেন না; যেমন 'উম্মতী' (আমার উম্মত) দ্বারা প্রতীয়মান হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খোদ্ নামায পড়ার হুকুম দিচ্ছিলেন। অথবা হুযূর 'নফল' হিসেবে হযরত জিব্রাঈলের সাথে পড়েছিলেন আর পরবর্তীতে সাহাবীগণকে পড়াতে থাকেন।

স্মর্তব্য যে, মি'রাজের ভোরে ফজরের নামায না পড়া হয়েছে, না ক্বাযা করা হয়েছে। কেননা, কানূন বর্ণনা করার পূর্বে আমল (কাজে পরিণত) করার উপযোগী হয় নি। মি'রাজের রাতে নামায ফরয হয়েছে। আর প্রথমে যোহর পড়ানো

عُمَرُ اَعْلَمْ مَا تَقُوْلُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ فَاَمَّنِىْ فَصَلَّيْتُ مَعَهٗ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهٗ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهٗ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهٗ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهٗ يَحْسِبُ بِاَصَابِعِهٖ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত ওমর[৩৪] বললেন, "যা বলছো বুঝেসুঝে বলো, হে ওরওয়া!"[৩৫] তিনি বললেন, আমি বশীর ইবনে আবূ মাস্'উদকে বলতে শুনেছি, তিনি আবূ মাস্'উদকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলছিলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি,[৩৬] "হযরত জিব্রাঈল অবতরণ করলো। সে আমার ইমামত করলো, আর আমি তার সাথে নামায পড়লাম। অতঃপর তার সাথে নামায পড়েছি, তারপর তার সাথে নামায পড়েছি, অতঃপর তার সাথে নামায পড়েছি"– আপন আঙ্গুলগুলোর উপর পাঁচটি নামায গণনা করছিলেন।[৩৭] [মুসলিম, বোখারী]

হয়েছে। সুতরাং আজ চারটা নামায হলো। তারপর পাঁচ। এর বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'তাফসীর-ই নঈমী' ইত্যাদিতে দেখুন।

৩২. এটা ইমাম যুহ্রীর উপনাম (কুনিয়াৎ)। তাঁর নাম 'মুহাম্মদ'। উপনাম আবূ বকর ও ইবনে শিহাব। প্রসিদ্ধ তাবে'ঈ।

৩৩. অর্থাৎ নিয়ম অপেক্ষা বেশী দেরীতে পড়েছেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয খলীফাদের পঞ্চম সত্য খলীফা। (মিরক্বাত) পঞ্চম এজন্য বলা হয়েছে যে, হযরত ইমাম হাসান খিলাফত থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অবস্থাদি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৩৪. সুব্হা-নাল্লাহ্! কী আদব! হযরত ওরওয়া এ কথা বলেন নি, "হুযূরকে নামায পড়িয়েছেন; বরং বলেছেন, "সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়িয়ে দেখিয়েছেন।" হযরত ওরওয়া হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বার ভাগিনা, হযরত আসমার পুত্র। তাঁর বাগানের কূপের পানি আমি অধমও পান করেছি।

৩৫. অর্থাৎ হে ওরওয়া! এটা কিভাবে হতে পারে যে, হযরত জিব্রাঈল হুযূরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবেন? মহান রব তো এরশাদ ফরমাচ্ছেন– لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ (আল্লাহ্ ও রাসূলের আগে বেড়ে যেও না; ৪৯:১)। তোমার এ খবরতো আমার নিকট ক্বোরআনের বিরোধী মনে হচ্ছে।

৩৬. স্মর্তব্য যে, হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়র নিজেও সাহাবী। তবুও সনদ সহকারে হাদীস বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা, "আমি নিজেও এ হাদীস হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। আমি ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীও শুনেছেন। আর তাঁদের নিকট থেকে অন্যান্য মুসলমানও। মোট কথা, সাক্ষ্য হিসাবে এ সনদ (সূত্র) পেশ করেছেন, অন্যথায় যখন সাহাবী নিজে হুযূর থেকে হাদীস শুনে নেন, তখন তাঁর আর সনদ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

৩৭. হযরত ওরওয়া এখানে নামাযের সময়গুলো উল্লেখ করেন নি। কেননা, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মধ্যে এর উপর কোন সন্দেহ ছিলো না; তাঁর মধ্যে সন্দেহ ছিলো– হযরত জিব্রাঈল হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নামায কিভাবে পড়াতে পারেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো ইমামুল আউয়ালীনা ওয়াল আ-খিরীন (পূর্ব ও পরবর্তী সবারই ইমাম)। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে যাবার পথে সমস্ত নবীকে নামায পড়িয়েছেন। বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এ ওইসব মুক্বতাদীর মধ্যে হযরত জিব্রাঈল, মীকাঈল বরং শোভাযাত্রার সমস্ত ফিরিশ্তা মি'রাজের ওই দুলহা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে ছিলেন। আজ হযরত জিব্রাঈল ইমাম কিভাবে হয়ে গেলেন?

এ কারণে, সনদ সহকারে শুধু নামায পড়ানোর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আমি ইতোপূর্বে আরয করেছি যে, মি'রাজের নামায ইশ্ক্বের নামায ছিলো, শরীয়তের নামায ছিলো না। অন্যথায় পূর্ববর্তী নবীগণ এ নামায পড়তেন না। কারণ, ওফাতের পর শরীয়তের বিধানাবলীর কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। বস্তুতঃ এটা ইশ্ক্বের নামায ছিলো। আর শরীয়তের বিধানাবলী আনয়নকারী ছিলেন হযরত জিব্রাঈল। হুযূর

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهٖ اَنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلٰوةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهٗ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ اَنْ صَلُّوْا الظُّهْرَ اِنْ كَانَ الْفَيْئُ ذِرَاعًا اِلٰى اَنْ يَّكُوْنَ ظِلُّ اَحَدِكُمْ مِّثْلَهٗ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَمَا يَسِيْرُ الرَّاكِبُ

৫৩৯।। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আপন গর্ভণরদেরকে লিখেছেন, "আমার নিকট সমস্ত কাজের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নামায।[৩৮] যে ব্যক্তি সেটার সংরক্ষণ করেছে এবং সেটা নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করেছে, সে নিজের দ্বীনকে সংরক্ষণ করেছে। আর যে ব্যক্তি সেটা বিনষ্ট করে বসেছে, সে নামায ব্যতীত অন্যান্যগুলোকে আরো বেশী বিনষ্ট করবে।[৩৯] তারপর লিখেছেন, 'যোহর তখন পড়ো যখন ছায়া এক গজ হয়ে যায়,[৪০] আর ততক্ষণ পর্যন্ত পড়ো, যখন প্রত্যেকের ছায়া সমান হয়ে যায়।[৪১] আর আসর তখন পড়ো, যখন সূর্য উঁচু, সাদা ও সাফ থাকে, এতটুকু সময় থাকতে যেন আরোহী অতিক্রম করতে পারে

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-ই হযরত জিব্রাঈলকে ইশ্‌ক্ব শিক্ষা দিয়েছেন। আর শরীয়তের বিধান এনেছেন হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمْ

৩৮. অর্থাৎ সরকারী কার্যক্রম ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা নামাযের পরে। যখন নামাযের সময় এসে যায়, তখনই সমস্ত কাজ ওইভাবে রেখে দাও।

এ থেকে দু'টি মাস্‌আলা প্রতীয়মান হয়-

এক. ইসলামী রাষ্ট্রের সুলতানের উচিত প্রজাদের ধর্মীয় অবস্থাদিও নিয়ন্ত্রণ করবেন, শুধু দুনিয়ার উপর দৃষ্টি রেখে ক্ষান্ত হবেন না।

দুই. বড়দেরকে নিয়ন্ত্রণ করো, ছোটরা নিজে নিজেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে। এ কারণে, তিনি শাসকদের (গভর্ণরগণ)-কে বিশেষভাবে সম্বোধন করেছেন।

৩৯. 'হিফয' (সংরক্ষণ করা) মানে নামাযকে শুদ্ধভাবে পড়া আর 'মুহাফাযাহ্' (যত্নবান হওয়া) মানে সর্বদা ও বিশুদ্ধ সময়ে পড়া। এ ফরমান থেকে বুঝা গেলো যে, নিয়মিতভাবে নামায পড়া যেমন সমস্ত নেকীর দরজা খুলে দেয়, তেমনি নামায বর্জন করাও গুনাহর দরজাগুলো খুলে দেয়। মহান রব এরশাদ ফরমান-

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ الاية

(নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।... আল-আয়াত; ২৯:৪৫)

৪০. 'ছায়া' মানে সাধারণ মানুষের ছায়া। 'গজ' মানে শরীয়ত সম্মত গজ (একহাত)। অর্থাৎ ২৪ আঙ্গুল অথবা দেড় ফুট। হুযূরের এ ফরমান ওই মওসুম অনুসারে, যখন চিঠি লিখেছিলেন। ওই সময় ওই দেশে একহাত পরিমাণ ছায়া হলে হয়তো যোহর আরম্ভ হতো; অন্যথায় বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন এলাকায় যোহরের সময় ভিন্ন ভিন্ন হতে থাকে।

৪১. এ ধরনের সমস্ত হাদীস ইমাম শাফে'ঈর দলীল- এ মর্মে যে, যোহরের সময় এক দণ্ড হলে শেষ হয়ে যায়। ইমাম আ'যমের মতে- দু'দণ্ড পর্যন্ত যোহরের সময় থাকে। তাঁর মতে 'এক দণ্ড'র হাদীসগুলো 'মানসূখ' (রহিত)। সেগুলোর নাসিখ' (রহিতকারী) হচ্ছে ওইসব হাদীস, যেগুলো পরবর্তী অধ্যায়ে আসছে। হযরত ওমরের এ ফরমান 'মুস্তাহাব' সময়ের বিবরণের জন্য। অর্থাৎ উত্তম হচ্ছে যোহরের নামায এক দণ্ডের অভ্যন্তরে পড়ে নাও। আমাদের মাযহাবের অভিমতও এটাই যে, যোহর এক দণ্ডের অভ্যন্তরে পড়ে নেবে। আর আসর পড়বে দু'দণ্ড হবার পর। অন্যথায় প্রকাশ্য অর্থের ভিত্তিতে এ হাদীস ইমাম শাফে'ঈরও বিরোধী হবে। কেননা, তাঁর মতেও আসল ছায়া ব্যতীত এক দণ্ড ছায়া হওয়া চাই। আর এখানে 'আসল ছায়া'র উল্লেখ নেই।

فَرْسَخَيْنِ اَوْ ثَلٰثَةً قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبَ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَآءَ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُه‘ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُه‘ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُه‘ وَالصُّبْحَ وَالنُّجُوْمُ بَادِيَةٌ مُّشْتَبِكَةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ قَدْرُ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلظُّهْرُ فِى الصَّيْفِ ثَلٰثَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى خَمْسَةِ اَقْدَامٍ وَفِى الشِّتَاءِ خَمْسَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى سَبْعَةِ اَقْدَامٍ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوٗدَ وَالنَّسَآئِىُّ

সূর্য ডুবার পূর্বে দু' কিংবা তিন ক্রোশ।[৪২] মাগরিব তখনই পড়বে, যখন সূর্য ডুবে যাবে। আর এশা পড়বে তখন, যখন 'শফক্ব' (মতান্তরে সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশের শুভ্রতা) অদৃশ্য হয়ে যাবে, রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত।[৪৩] সুতরাং যে ব্যক্তি এশার পূর্বে শয়ন করে, আল্লাহ্ করুন- তার যেনো চোখ দু'টি না ঘুমায়। যে শয়ন করে তার চোখ যেন না ঘুমায়, যে শয়ন করে তার চোখ যেন না ঘুমায়।[৪৪] আর ফজর পড়ো, যখন তারাগুলো চমকিত হয়, পরস্পর মিলিত হয়।[৪৫] [ইমাম মালিক]

৫৪০।। হযরত ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নামাযের সময়সীমা যোহর গ্রীষ্মকালে তিন কদম থেকে পাঁচ কদম পর্যন্ত আর শীতকালে পাঁচ কদম থেকে সাত কদম পর্যন্ত ছিলো।[৪৬] [আবূ দাউদ, নাসাঈ]

---

৪২. অর্থাৎ সূর্য ডুবার ৫০ (পঞ্চাশ) মিনিট পূর্বে; কেননা, বিশ মিনিট পূর্বে সূর্য হলদে হয়ে যায়। এটাই মাকরূহ সময়। এর আধ ঘন্টা পূর্বে আসর আরম্ভ করা চাই। এতটুকু দেরী করলে আরোহী দু/তিন ক্রোশ অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে।

৪৩. এখানেও 'মুস্তাহাব' ওয়াক্বতের উল্লেখ রয়েছে। অন্যথায় মাগরিবের সময় 'শফক্ব' (সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশের শুভ্রতা) অস্ত যাওয়া পর্যন্ত থাকে। আর এশার নামাযের সময় থাকে সোব্হে সাদিক্ব পর্যন্ত। কিন্তু মুস্তাহাব হচ্ছে মাগরিব সূর্যাস্তের সাথে সাথে পড়ে নেওয়া; আর এশা রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে পড়া।

৪৪. হযরত ফারূক্ব-ই আ'যমের এ বদ-দো'আ ক্রোধ প্রকাশের জন্য। স্মর্তব্য যে, এশার নামাযের পূর্বে শুয়ে পড়া আর এশার পর বিনা কারণে জাগ্রত থাকা সুন্নাত বিরোধী কাজ এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। তবে নামাযের পূর্বে শুয়ে নামাযই না পড়া; অনুরূপ, এশার পর জাগ্রত রয়ে ফজরের নামায ক্বাযা করে ফেলা হারাম। কেননা, হারামের সব মাধ্যমও হারাম।

৪৫. অর্থাৎ ফজর অন্ধকারে পড়ো। এ হাদীস ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির দলীল। ইমাম আ'যমের মতে, ফজর উজালা করে পড়া চাই। ইমাম সাহেবের দলীলাদি পরবর্তী অধ্যায়ে আসছে। আর নামাযের সময়গুলোর বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'জা'আল-হক্ব' : ২য় খণ্ডে দেখুন!

৪৬. অর্থাৎ হুযূর গ্রীষ্মকালে যদি যোহরের নামায বিলম্ব না করে পড়তেন, তাহলে তখনই পড়তেন, যখন মাঝারী গড়নের মানুষের ছায়া তিন কদম পর্যন্ত লম্বা হয়ে যায়। আর যদি দেরীতে পড়তেন, তবে তখনই পড়তেন, যখন মানুষের গড়নের ছায়া পাঁচ কদম হয়ে যেতো। আর শীতকালে যদি বিলম্ব ছাড়া পড়তেন, তবে পড়তেন পাঁচ কদম পর্যন্ত ছায়া দীর্ঘ হলে। আর দেরীতে পড়লে সাত কদম পর্যন্ত দীর্ঘ হলে পড়তেন। কেননা, গ্রীষ্মের মোকাবেলায় শীতকালে 'আসল ছায়া' দীর্ঘতর হয় এ সময়সীমা আরব দেশের সময় অনুসারে। অন্যান্য দেশে এটা কার্যকর হতে পারে না; কেননা; জায়গার প্রস্থ যে পরিমাণ বেশী হবে, ওই পরিমাণ ছায়াও দীর্ঘ হবে।

****

بَابُ تَعْجِيْلِ الصَّلٰوةِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبِىْ عَلٰى اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهٗ اَبِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْاُوْلٰى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ اَحَدُنَا اِلٰى رِحْلِهٖ فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ

অধ্যায় ঃ বিলম্ব না করে নামায পড়া[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৫৪১।। হযরত সাইয়্যার ইবনে সালামাহ্[২] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা হযরত আবূ বারযাহ্ আসলামীর নিকট গেলাম।[৩] তাঁকে আমার পিতা বললেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরয নামাযগুলো কিভাবে পড়তেন?" তিনি বললেন, "দুপুরের নামায, যাকে তোমরা 'প্রথম' বলো, তখনই পড়তেন, যখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যায়।[৪] আর আসর পড়তেন, অতঃপর আমাদের মধ্য থেকে একজন লোক মদীনা মুনাওয়ারার দূরপ্রান্তে তার ঘরে পৌঁছে যেতো, অথচ সূর্য (তখনো) পরিষ্কার থাকতো।[৫] এবং তা আমি ভুলে গেছি

১. স্মরণ রাখবেন যে, ইমাম আ'যমের মতে, মাগরিবের নামায সবসময় এবং যোহরের নামায শীতকালে শীঘ্র (বিলম্ব না করে) পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব। অর্থাৎ সময় আসতেই নামায আরম্ভ করে দেওয়া চাই। এ দু' নামায ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত নামায কিছুটা দেরী করে পড়া মুস্তাহাব। ইমাম সাহেবের মতে, নামায শীঘ্র পড়ার অর্থ হচ্ছে- ওয়াক্বত আরম্ভ হতেই নামায পড়ে নেবে; দেরী করবে না।

কোন কোন ইমামের মতে, মুস্তাহাব হচ্ছে- নামাযের সময় আসতেই তা পড়ে নেওয়া; কিন্তু এশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করা সবার মতেই মুস্তাহাব।

মোট কথা হচ্ছে- এশায় দেরী করা এবং মাগরিবে দেরী না করা, অনুরূপ শীতকালে যোহরের নামায দেরী না করে শীঘ্র পড়ে নেওয়ার উপর সবার ঐকমত্য রয়েছে; আর অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে।

২. তিনি প্রসিদ্ধ তাবে'ঈ, বসরার অধিবাসী এবং 'তামীম' গোত্রের লোক। অনেক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছেন।

৩. তাঁর নাম নাফ্লাহ্ ইবনে ওবায়দ। তিনি সাহাবী। হুযূরের ওফাত শরীফের পর মুসলমানগণ দূর-দূরান্তর থেকে সাহাবীগণের সাক্ষাত ও তাঁদেরকে মাসআলা-মাসাইল জিজ্ঞাসা করার জন্য আসতেন। এ পরম্পরায় তাঁর উপস্থিতিও ছিলো।

৪. অর্থাৎ যোহর ওয়াক্বতের প্রারম্ভে পড়ে নিতেন। এখানে শীতকালীন যোহর বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত হচ্ছে, হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন, "যোহর ঠাণ্ডা' করে পড়ো। কেননা, দুপুরের তাপ হচ্ছে দোযখের উত্তেজনা।" সুতরাং এ হাদীস না পরবর্তী হাদীসের সাথে বৈপরীত্ব রাখে, না হানাফী মাযহাবের বিপরীত।

৫. অর্থাৎ সূর্যাস্তের প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পূর্বে এবং সূর্যের কিরণ হলদে বর্ণ ধারণ করার আধ ঘন্টা পূর্বে 'আসর' পড়তেন। প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে নামায সম্পাদন করে নিতেন। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে মানুষ অনায়াসে মদীনা মুনাওয়ারার শেষ প্রান্তে পৌঁছুতে পারে। এ অধম আধ ঘন্টার মধ্যে পদব্রজে মসজিদ-ই ক্বোবা শরীফে পৌঁছে যেতাম। সুতরাং এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, হুযূর ছায়া এক দণ্ড হবার অভ্যন্তরে সম্পন্ন করতেন! এ হাদীস আমাদের বিপক্ষে নয়।

مَا قَالَ فِى الْمَغْرِب وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُّؤَخِّرَ الْعَشَآءُ الَّتِى تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثُ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَه وَيَقْرَءُ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ وَفِى رِوَايَةٍ وَّ لاَ يُبَالِىْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَآءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثُ بَعْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

মাগরিব সম্পর্কে তিনি যা কিছু বলেছেন, আর হুযূর এশার নামায, যাকে তোমরা 'আতামাহ্' বলে থাকো, দেরীতে পড়াকে পছন্দ করতেন।[৬] এর পূর্বে শয়ন করা এবং এরপর কথাবার্তায় রত হওয়াকে অপছন্দ করতেন।[৭] আর ফজরের নামায তখন শেষ করতেন, যখন মানুষ তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারতো, অথচ তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত পর্যন্ত পড়তেন।[৮] অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি এশার নামাযকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এর পূর্বে শয়ন করা এবং এরপর কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন।'' [মুসলিম, বোখারী]

৬. 'শরীয়ত'-এ এ নামাযের নাম 'এশা'। কিন্তু গ্রাম্য লোকেরা 'আতামাহ্' বলে। অর্থাৎ উটনীর দুধ দোহনের সময়কার নামায। স্মর্তব্য যে, নামাযের ওই নামই উল্লেখ করা চাই, যা শরীয়ত নির্দ্ধারণ করেছে। 'যোহর'কে 'পেশী' (অগ্রিম), "আসর'কে 'দীগার' (পরবর্তী) 'মাগরিব'কে 'শাম' (সান্ধ্যাকালীন) এবং 'এশা'কে 'খুফ্‌তা' (আঁধারের) নামায বলা, যেমন পাঞ্জাবে প্রচলন রয়েছে, মন্দই।

এখানে 'দেরী করা' মানে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করা বুঝায়। অন্যান্য বর্ণনায় এমনি এসেছে।

৭. এর ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। 'কথাবার্তা' মানে পার্থিব অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা। এটাই মাকরূহ। সুতরাং দ্বীনী জলসাগুলো ও দ্বীনী কিতাবাদি পর্যালোচনা এশার নামাযের পর নিষিদ্ধ নয়।

মোট কথা হচ্ছে– এশার পর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। ভোরে তাড়াতাড়ি উঠে যাও।

৮. অর্থাৎ ফজর এতো শীঘ্র আরম্ভ করতেন যে, ষাট কিংবা একশ' আয়াত পড়ে নামায শেষ করার পরও এতটুকু ভোর আলোকিত হতো যে, আপন সাথীকে চেনা যেতো। এটা ওইসব ইমামের দলীল, যাঁদের মতে ফজর অন্ধকারে পড়া মুস্তাহাব। ইমাম আ'যমের মতে, এ অন্ধকার মসজিদেরই ছিলো, সময়ের নয়। কেননা, মসজিদ-ই নববী শরীফ অত্যন্ত গভীর, বাইরের আলো সেখানে অনেক দেরীতে পৌঁছে।

যদি একথা মেনেও নেওয়া হয় যে, ওই অন্ধকার ওয়াক্তেরই ছিলো, তবে তা হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই বিশেষ বরকতময় আমল। হুযূরের নির্দেশ সামনে আসছে। হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন– "ফজর উজালা করে পড়ো। কারণ, এর সাওয়াব বেশী।" নিয়ম হচ্ছে– যখন হুযূরের 'বাণী' ও 'কর্ম' শরীফের মধ্যে পরস্পর ভিন্নতা দেখা যায়, তখন 'বাণী' শরীফকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ, 'আমল' (কর্ম) শরীফে এর সম্ভাবনা থাকে যে, তা হুযূরের জন্য খাস ছিলো।

স্মর্তব্য যে, এমন কোন হাদীস নেই, যাতে অন্ধকার থাকতে ফজরের নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভোরকে উজালা করে নামায সম্পন্ন করার নির্দেশ সম্বলিত বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সাহাবীগণ সাধারণতঃ ফজর উজালা করেই পড়তেন। হযরত আলী ক্বম্বরকে বলতেন, "হে ক্বম্বর! খুব উজালা করো, খুব উজালা করো।" (ত্বাহাভী)

হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর যখন ফজর সম্পন্ন করে নিতেন তখন মনে হতো যেনো সূর্য এক্ষুনি উদিত হচ্ছে। (বায়হাক্বী) ইব্রাহীম নাখ'ঈ বলছেন, "ফজর ও আসরকে উজালা অবস্থায় পড়ার বেলায় সাহাবা-ই কেরামের যেমন ঐকমত্য রয়েছে, তেমিন অন্য কোন মাস্‌আলায় খুব কমই দেখা যায়। (ত্বাহাভী ও খুস্‌রু)

আমি অধম 'জা-আল হক্ব' : ২য় খণ্ডে ফজর উজালা করে পড়ার পক্ষে ২৯টি হাদীস পেশ করেছি। এমনকি দায়লামীর বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছি, যাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ صَلٰوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَ اِذَا قَلُّوْا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَآئِرِ سَجَدْنَا عَلٰى ثِيَابِنَا اِتِّقَاءَ الْحَرِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهٗ لِلْبُخَارِيِّ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

৫৪২।। হযরত মুহাম্মদ ইবনে 'আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, যোহর দ্বিপ্রহরে পড়তেন, আসর পড়তেন যখন সূর্য পরিস্কার থাকতো, মাগরিব পড়তেন যখন সূর্য ডুবে যেতো এবং এশা যখন মানুষ বেশী হতো, তখন দেরী না করে পড়ে নিতেন, যখন কম সংখ্যক হতো, তখন দেরীতে পড়তেন। আর ফজর পড়তেন অন্ধকারে।[৯] [মুসলিম, বোখারী]

৫৪৩।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে যোহর পড়তাম, তখন গরম থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের কাপড়ের উপর সাজদা করতাম।[১০] [মুসলিম, বোখারী] বচনগুলো বোখারীর।

৫৪৪।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন গ্রীষ্মের তাপ বেশী হয় তখন নামায ঠাণ্ডা করে পড়ো।" আর বোখারীর এক বর্ণনা হযরত আবূ সা'ঈদ থেকে রয়েছে– "যোহর ঠাণ্ডা করে পড়ো।[১১] কেননা, গরমের প্রখরতা দোযখের উত্তেজনা থেকে আসে।"[১২]

আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি ফজর আলোর মধ্যে পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কবর ও অন্তরে আলো পয়দা করবেন।"

৯. এর ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, যদি সময়ের মধ্যে অবকাশ থাকে, তবে মানুষের জমায়েতের প্রতি লক্ষ্য রাখা যাবে। সময় রেলের মতো হবে না। তা হচ্ছে নামাযী আসুক কিংবা না-ই আসুক, নামায পড়ে নেওয়া হবে! দেখুন, হুযূরের আমল- হুযূর মানুষ কম হলে এশার নামায দেরীতে পড়তেন।

১০. এ তাপ মেঝের হতো, সময়ের নয়। সরকার-ই মদীনা যোহর ঠাণ্ডা করে পড়তেন। কিন্তু মেঝে উত্তপ্ত থেকে যেতো; যেমন এখানো হেরমাঈন শরীফাঈনে দেখা যায়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, নামাযী আপন পরিহিত কাপড়ের উপর প্রয়োজনে সাজদা করতে পারে। এটাই ইমামে আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হির অভিমত।

১১. এ হাদীস ওইসব হাদীসের ব্যাখ্যা, যেগুলোর মধ্যে

وَاشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِىْ الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِىْ الصَّيْفِ اَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِىِّ فَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سَمُوْمِهَا وَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيْرِهَا

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ

আগুন আপন রবের দরবারে অভিযোগ করেছিলো। বলেছিলো, "হে আমার রব! আমার একাংশকে অপরাংশ গ্রাস করে ফেলেছে।" তখন মহান রব দু'টি প্রশ্বাসের অনুমতি দিলেন- একটি শীতকালে, অপরটি গরমের মৌসুমে। এ দু'টি হচ্ছে ওই প্রখর গরম ও প্রকট ঠাণ্ডা, যাকে তোমরা অনুভব করে থাকো।[১৩] বোখারীর এক বর্ণনায় এমনও আছে যে, যে প্রকট তাপ তোমরা পাও তা হচ্ছে দোযখের গরম শ্বাস থেকে। আর তোমরা যে প্রকট শীত পাও তা হচ্ছে সেটার ঠাণ্ডা প্রশ্বাস থেকে। [মুসলিম, বোখারী]

৫৪৫।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আসর ওই সময় পড়তেন যখন সূর্য উপরে ও সাফ-পরিষ্কার থাকতো।

বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দ্বি-প্রহরে যোহরের নামায পড়তেন। তিনি এটা বলেছেন যে, সেখানে শীতকালের যোহর বুঝানো হয়েছে। গরমের মৌসুমে যোহর ঠাণ্ডা করে পড়ার নির্দেশ তাকীদ সহকারে দেওয়া হয়েছে। এ থেকে হানাফী মাযহাবের দু'টি মাসআলা প্রমাণিত হয়। প্রথমটা হচ্ছে- গরমের মৌসুমের যোহর ঠাণ্ডা করে পড়া সুন্নাত।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে- যোহরের সময় ছায়া দু'দণ্ড হওয়া পর্যন্ত থাকে। কেননা, এক দণ্ড পর্যন্ত সর্বত্র, বিশেষ করে আরবে খুব তাপ থাকে। অনুরূপ বোখারী, আবূ দাউদ, বায়হাক্বী, ত্বাহাভী, তিরমিযী ইত্যাদি হযরত আবূ যার গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক সফরে যোহর তখন পড়েছেন, যখন টিলাগুলোর ছায়া পড়ে গিয়েছিলো। বস্তুতঃ টিলার ছায়া এক দণ্ড হবার পর পড়ে যায়। অনুরূপ, বোখারী শরীফে হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'ইহুদীগণ ওইসব মজদূরের মতো, যারা সকাল থেকে যোহর পর্যন্ত এক 'ক্বীরাত্ব'-এর বিনিময়ে কাজ করে। খ্রিস্টানগণ হলো ওইসব মজদূর, যারা যোহর থেকে আসর পর্যন্ত এক 'ক্বীরাত'-এর বিনিময়ে মেহনত করে, আর তোমরা হলে ওই মজদূর, যারা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দু'ক্বীরাত'-এর বিনিময়ে কাজ করে থাকে। তোমাদের কাজ কম, মজদূরী বেশী।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, আসরের সময় যোহরের তুলনায় কম। অন্যথায় এ উদাহরণ দুরস্ত হতো না। যদি এক দণ্ডের পরপরই আসর আরম্ভ হয়ে যেতো, তবে সেটার সময়সীমা যোহরের সমান; বরং গ্রীষ্মকালে তদপেক্ষা কিছু বেশী হয়ে যাবে।

এ মাসআলায় ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আরো বহু দলীল রয়েছে। যদি আগ্রহ থাকে, তবে আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব ; ২য় খণ্ড'-এর এ অধ্যায় দেখুন!

১২. স্মর্তব্য যে, দার্শনিকদের মতে, তাপ সূর্যের নিকট থেকে আসে; কিন্তু সূর্যের মধ্যে তাপ এসেছে দোযখ থেকে। হতে পারে, গরম সূর্য থেকেও আসে এবং দোযখের উত্তেজনার কারণেও। যদিও গরমের মৌসুমে কোন কোন পাহাড় ও কোন কোন স্থানে ঠাণ্ডা (শৈত্য) থাকে; কিন্তু এটা এর বিরোধী নয়। যেমন সূর্যের তাপ এক, কিন্তু সেটার প্রভাবের প্রকাশ ঘটে পৃথিবীর উপর বিভিন্নভাবে। কোথাও শীত; কোথাও গরম। এখানেও অনুরূপ- আগুনের উত্তেজনার মনোনিবেশ যেদিকে বেশী সেখানে গরম, যেখানে কম সেখানে শীত। সুতরাং এ হাদীসের বিপক্ষে না আর্যদের, না

فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِىْ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِىْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَمْيَالٍ اَوْ نَحْوِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا .رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(এতটুকু সময়ে যে,) যাত্রাকারী মদীনা মুনাওয়ারার শেষ প্রান্তে ওই সময়ে পৌঁছে যেতো যে, তখনোও সূর্য উপরে থাকতো, অথচ মদীনা মুনাওয়ারার কোন কোন প্রান্ত চার মাইল কিংবা তদনুরূপই ছিলো।[১৪] [বোখারী, মুসলিম]

৫৪৬।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "এটা হচ্ছে মুনাফিক্বের নামায- সে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত যখন তা হলদে রং ধারণ করবে এবং শয়তানের দু'শিং-এর মধ্যভাগে এসে যাবে তখন দাঁড়িয়ে চারবার ঠোঁট মারবে, তাতে আল্লাহ্‌র সামান্য যিক্‌রই করে।"[১৫] [মুসলিম]

খ্রিস্টানদের কোনরূপ আপত্তি হতে পারে, না চাক্‌ড়ালভীদের।

১৩. অর্থাৎ দোযখ যখন উপরের দিকে নিঃশ্বাস ফেলে তখন পৃথিবীতে সাধারণতঃ শীতের জোর থাকে, আর যখন নিচের দিকে নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন সাধারণতঃ গরমের প্রখরতা হয়।

স্মর্তব্য যে, এ হাদীস শরীফ একেবারে প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহৃত; কোনরূপ ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা জীবন ও অনুভূতি দান করেছেন। ক্বোরআন করীম বলছে-

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ (সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও যমীন ক্রন্দন করে নি। ৪৪:২৯, তরজমা- কান্‌যুল ঈমান)

অর্থাৎ কাফিরদের মৃত্যুতে আসমান ও যমীন ক্রন্দন করে না। সুতরাং মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে ক্রন্দন করে। আরো এরশাদ হচ্ছে- وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

(এবং কতেক এমনও আছে, যেগুলোর আল্লাহ্‌র ভয়ে গড়িয়ে পড়ে। ২:৭৪) অর্থাৎ কোন কোন পাথর আল্লাহ্‌র ভয়ের কারণে পতিত হয়।

সুতরাং চাকড়ালভীদের উচিত এ হাদীস শরীফগুলোর বিরুদ্ধে আপত্তি করার পূর্বে এ আয়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা।

১৪. এ হাদীস শরীফ থেকে না এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আসর ছায়া দু'দণ্ড হবার পূর্বে পড়তেন এবং না এও যে, আসর ওয়াক্বতের প্রারম্ভে পড়ে নিতেন। হানাফী সময়ে (সূর্যাস্ত থেকে ৫০ মিনিট পূর্বে) আসর পড়ে এতোদূরে অনায়াসে চলে যেতে পারে। ত্বাহাভী শরীফে আছে- হযরত আবূ হোরায়রা তখনই আসর পড়তেন, যখন রোদ উঁচু পাহাড়ের উপর দৃষ্টিগোচর হতো। আর সাইয়্যেদুনা ফারুক্ব-ই আ'যম তাঁর গভর্ণরদের প্রতি লিখেছেন যে, সাহাবা-ই কেরাম আসরের নামায দেরীতে পড়তেন।

১৫. এ হাদীস শরীফ থেকে তিনটি মাসআলা বুঝা গেলো ঃ

এক. দুনিয়াবী কাজ কারবারে মগ্ন হয়ে আসরের নামায দেরীতে পড়া (মাকরূহ ওয়াক্বতে) মুনাফিক্বদের আলামত।

দুই. সূর্যাস্তের বিশ মিনিট পূর্বে মাক্‌রূহ-ওয়াক্বত। মুস্তাহাব সময়ে আসর পড়া চাই।

তিন. রুকূ' ও সাজদাহ্ অতি প্রশান্তভাবে সম্পন্ন করা চাই। হুযূর তাড়াহুড়ার সাজদাকে মোরগের ঠোঁট মারার সাথে উপমা দিয়েছেন। কারণ, সেটা দানা আহার করার জন্য তাড়াতাড়ি ঠোঁট মেরে থাকে।

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَلَّذِىْ يَفُوْتُه، صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُه، وَمَالُه، . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَرَكَ صَلٰوةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه، .رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَاِنَّه، لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِه .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৫৪৭।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যার আসরের নামায চলে গেলো তার যেনো ঘর-বাড়ি ও মাল-সামগ্রী লুণ্ঠিত হয়ে গেলো।"[১৬] [মুসলিম, বোখারী]

৫৪৮।। হযরত বুরায়দাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দেয়, তার আমল বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।"[১৭] [বোখারী]

৫৪৯।। হযরত রাফি' ইবনে খদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মাগরিবের নামায সম্পন্ন করছিলাম। অতঃপর আমাদের মধ্যে একজন লোক এমন সময় ফিরে আসতো, যখন সে আপন তীর পতিত হবার স্থান দেখে নিতো।[১৮] [মুসলিম, বোখারী]

৫৫০।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ এশার নামায 'শফক্ব' (সূর্যাস্তের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমাকাশের শুভ্রতা) অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশের মধ্যবর্তী সময়ে পড়তেন।[১৯] [মুসলিম, বোখারী]

১৬. অর্থাৎ যেমন ওই ব্যক্তি এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার প্রতিকার করা যেতে পারে না, তেমনি আসর বর্জনকারী ও প্রতিকার অযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এর কারণ পরবর্তী হাদীসে আসছে।

১৭. খুব সম্ভব, 'আমল' (কর্ম) মানে ওই পার্থিব কাজ, যার কারণে সে আসরের নামায ছেড়ে দিয়েছে। 'বাজেয়াপ্ত' হওয়া মানে ওই কাজের বরকত শেষ হয়ে যাওয়া। অথবা অর্থ এ যে, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দেওয়ায় অভ্যস্থ হয়ে যায়, তার জন্য এ আশংকা করা যায় যে, সে কাফির হয়ে মরবে, যার কারণে তার সব কর্ম বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এর এ অর্থ নয় যে, আসর ছেড়ে দেওয়া কুফর ও ধর্মত্যাগ করা (মুরতাদ্ হওয়া)।

স্মরণ রাখবেন, আসরের নামাযকে ক্বোরআন করীম 'মধ্যবর্তী' নামায বলে আখ্যায়িত করে সেটার প্রতি খুব

وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَآءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ اللّٰهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلٰوةِ فَصَلّٰى قُلْنَا لِاَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِى الصَّلٰوةِ قَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ

৫৫১।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়তেন। তারপর মহিলারা আপন আপন চাদর জড়ানো অবস্থায় ফিরে যেতো। অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেতো না।[২০] [মুসলিম, বোখারী]

৫৫২।। হযরত ক্বাতাদাহ্[২১] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও যায়দ ইবনে সাবিত সাহারী খেয়েছেন। যখন সাহারী খেয়ে নিলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযের দিকে উঠলেন এবং নামায পড়ে নিলেন। আমরা হযরত আনাসকে বললাম, "এ দু' বুযুর্গ সত্তার সাহারী খাওয়া সমাপ্ত করা ও নামাযে মশ্‌গুল হওয়ার মধ্যে কতটুকু ব্যবধান ছিলো?" তিনি বললেন, "এতটুকু যে, কেউ

তাকীদ দিয়েছেন। তাছাড়া, তখন রাত ও দিনের ফিরিশ্‌তাগণ একত্রিত হন। তদুপরি, এ সময়টা হচ্ছে মানুষের ভ্রমণ-বিনোদন ও ব্যবসাকে চাঙ্গা করারই। এ কারণে বেশীর ভাগ মানুষ আসরের নামাযের ক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শন করে। এ সব কারণে ক্বোরআন শরীফও আসরের উপর খুব জোর দিয়েছে; হাদীস শরীফও।

১৮. অর্থাৎ মাগরিবের নামায পড়ে নেওয়ার পর এতটুকু উজালা থাকতো যে, ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীর যেখানে গিয়ে পড়তো, সে স্থান পর্যন্ত দেখা যেতো। সমস্ত ইমামের এর উপর ঐকমত্য রয়েছে যে, মাগরিবের নামায সব সময় ওয়াক্বতের প্রারম্ভে পড়া চাই।

১৯. যদি তাড়াতাড়ি (অবিলম্বে) পড়তেন, তবে 'শফক্ব' অদৃশ্য হবার পরক্ষণে পড়তেন। কারণ, এর পূর্বে এশার ওয়াক্বতই হয় না। সুতরাং এ হাদীস মারফূ' হাদীসের পর্যায়ে পড়ে। [অর্থাৎ এ হাদীসের 'সনদ' বা সূত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়।]

২০. এ অন্ধকার হয়তো মসজিদের ছিলো, কারণ মসজিদে নবভী শরীফ খুব গভীর ছিলো অথবা ওয়াক্বতের। কেননা, হুযূর করীম ফজরের নামায ওয়াক্বতের প্রারম্ভে সম্পন্ন করতেন– ওইসব নামাযী মহিলার কারণে, যাতে অন্ধকার থাকতেই তাঁরা ঘরে চলে যেতে পারেন। তারপর মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হলো। তখন থেকে এ বিধানও বদলে গেলো। প্রথমোক্ত অবস্থায় এ হাদীস 'মুহকাম' (বলবৎ) এবং আমাদের জন্য আমল করার যোগ্য। আর শেষোক্ত অবস্থায় এ কাজ তদানীন্তনকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছিলো; আর তা হুযূরের বৈশিষ্ট্যাদির অন্তর্ভুক্ত। আমরা এর ব্যাখ্যা এ জন্য দিলাম যে, সামনে ফজরের নামায উজালা করে পড়ার নির্দেশ সম্বলিত হাদীস শরীফ আসছে। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ কর্মগত হাদীস ওই বাণীগত হাদীসের বিপরীত হবে না। খুব সম্ভব এ মহিলাগণ সালাম ফেরানোর সাথে সাথে দো'আর পূর্বেই চলে যেতেন। فَتَنْصَرِفُ -এর ف থেকে একথা বুঝা যাচ্ছে। আর পুরুষরা যেতেন দো'আর পর, যাতে মহিলাগণ ও পুরুষগণের মিশ্রণ না ঘটে।

স্মর্তব্য যে, হযরত ওমর ফারূক্ব মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা এর সমর্থন করেছেন। আর বলেছেন, "যদি হুযূর-ই আন্‌ওয়ারও আজকালের অবস্থাদি দেখতেন, তবে নারীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন।"

خَمْسِينَ اٰيَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ اُمَرَآءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اَوْيُؤَخِّرُوْنَ عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَامُرُنِىْ قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারবে।[২২] [বোখারী]

৫৫৩।। হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন তোমাদের উপর এমন শাসকগণ তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করবে, যারা নামাযগুলোকে হাতছাড়া করে দেবে? কিংবা ওইগুলোর ওয়াক্বত থেকে পিছিয়ে দেবে?"[২৩] আমি আরয করলাম, "আমাকে আপনি কি নির্দেশ দিচ্ছেন?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "নামায আপন ওয়াক্বতে পড়ে নেবে।" যদি তাদের সাথেও পাও, তবে পুনরায় পড়ে নেবে, তখন তা তোমার জন্য নফল হবে।"[২৪] [মুসলিম]

আফসোস্ ওইসব লোকের উপর, যারা এ যুগে নারীদেরকে বে-পর্দা অবস্থায় সিনেমা ও বাজারগুলোতে প্রেরণ করে থাকে!

২১. তিনি অন্যতম প্রসিদ্ধ তাবে'ঈ। তিনি উৎকৃষ্টতম 'হাফেয' ও 'মুফাস্‌সির' ছিলেন। মাতৃগর্ভ থেকে অন্ধ ছিলেন। তাঁর স্মরণ শক্তি ছিলো অস্বাভাবিক ধরনের। তিনি 'সাদূস' গোত্রের লোক ছিলেন। বসরায় বসবাস করতেন। ১১৭ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন। তাঁর নিকট থেকে হযরত খাজা হাসান বসরীর মতো বুযুর্গগণ হাদীসের রেওয়ায়তসমূহ গ্রহণ করেছেন।

২২. অর্থাৎ সাহারী একেবারে শেষ সময়ে খেয়েছেন। আর ফজর পড়েছেন একেবারে প্রাথমিক সময়ে। 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, "সাহারী ও ফজরের নামাযে শুধু এতটুকু ব্যবধান রাখা হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো। কেননা তিনি দ্বীনের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মা'সূম (পবিত্র) ছিলেন। হুযূর সাহারী ও নামাযের সময় সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানেন। কিন্তু আমাদের জন্য শুধু এতটুকু ব্যবধানে ফজরের নামায পড়া জায়েয নয়। কেননা, এটা সম্ভব যে, আমরা সময় চিনতে ভুল করে সাহারীর সময় অতিবাহিত করে খেয়ে নেবো, কিংবা নামায ওয়াক্বত আসার পূর্বে পড়ে নেবো।

স্মর্তব্য যে, ফজর বিলম্ব না করে পড়ার হাদীসগুলো হচ্ছে 'আমলী' (হুযূরের কর্মগত হাদীস)। কিন্তু 'ক্বাওলী' (বাণীগত) হাদীস একটাও নেই। অবশ্য, ফজর দেরী করে পড়ার 'ক্বাওলী হাদীস' বহুল সংখ্যায় মওজূদ রয়েছে। সুতরাং হানাফী মাযহাব অত্যন্ত মজবুত।

২৩. এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ তা'আলা হুযূরকে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান দান করেছেন। দেখুন, হুযূর এখানে হযরত আবূ যার গিফারীর দীর্ঘ জীবনের সংবাদও দিয়েছেন। আর ভবিষ্যতের বে-পরোয়া শাসকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠারও। অর্থাৎ হে আবূ যার! খোলাফা-ই রাশেদীনের পর তুমি জীবিত থাকবে। আর এমন বে-পরোয়া ও যালিম শাসকদের শাসনামল পাবে যে, তুমি তাদেরকে বিশুদ্ধ সময়ে নামাযগুলোও পড়াতে পারবে না।

২৪. এ বাক্য থেকে অনেক ফিক্বহ্ বিষয়ক মাসআলা জানা গেলো। যেমন–

এক. জমা'আতের আশায় নামাযকে মুস্তাহাব-ওয়াক্বত থেকে পেছানো যাবে না; বরং একাকী পড়ে নেওয়া হবে।

দুই. যদি শাসক বিশুদ্ধ সময়ে জমা'আত হতে না দেয়, তবে মসজিদে অথবা ঘরে নিজের নামায আলাদাভাবে পড়ে নেবে। যেমন, আজকাল হাজীদেরকে নজদী শাসকদের কারণে এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

তিন. যদি যালিম শাসকের সামনে বাধ্য হয়ে সত্যের কলেমা (সত্য কথা) বলতে না পারো, তাহলে গুনাহ্‌গার হবে না।

চার. নামায একাকী পড়ে নেওয়ার পর যদি জমা'আত পাওয়া যায়, তবে নফল-নামাযের নিয়্যত করে তাতে শরীক

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَدْرَكَ اَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِّنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهٗ وَاِذَا اَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهٗ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৫৫৪।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি সূর্য উদিত হবার পূর্বক্ষণে এক রাক'আত পেলো, সে ফজর পেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার পূর্বক্ষণে আসরের এক রাক্'আত পেলো, সে আসর পেয়ে গেলো।"[২৫] [মুসলিম, বোখারী]

৫৫৫।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে আসরের এক রাক্'আত পেলো সে তার নামায পূর্ণ করে নেবে। আর যখন সূর্য উদিত হবার পূর্বক্ষণে ফজরের এক রাক'আত পেলো, তবে সে যেনো আপন নামায পূর্ণ করে নেয়।[২৬] [বোখারী]

হয়ে যাবে। তবে এ বিধান শুধু যোহর ও এশার বেলায় প্রযোজ্য। কারণ, ফজর ও আসরের পর নফল পড়া মাকরূহ আর মাগরিবের নামায তিন রাক'আত। (তিন রাক'আতের নফল নেই।)

পাঁচ. যদি যালিম শাসকের সাথে নামায না পড়লে নির্যাতন ও কষ্ট পাবার আশঙ্কা থাকে, তবে বাধ্য হয়ে তাদের পেছনে নামায পড়ে নেবে। কিন্তু ওই নামায পুনরায় পড়ে নেবে। আজকাল আহলে সুন্নাত হেরেমাঈন শরীফাঈনে এমন অবস্থার সম্মুখীন হন।

ছয়. নফল আদায়কারীদের নামায ফরয আদায়কারীদের পেছনে জায়েয আছে।

সাত. যদি বাদশার নিয়োজিত ইমাম বদ-মাযহাব হয়, আর কোন সাচ্চা মুসলমান তার জমা'আতের সময় সেখানে আটকা পড়ে যায়, তবে বাধ্য হওয়ার অবস্থার ন্যায় তা সম্পন্ন করে নেবেন বৈ-কি।

২৫. অর্থাৎ এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যদি ফজরের নামাযের মধ্যভাগে সূর্য বের হয়ে আসে কিংবা আসরের নামায পড়াকালে সূর্য অস্ত যায়, তবে নামায হয়ে গেলো। এর বিশ্লেষণ পরবর্তী হাদীসে আসছে।

২৬. কেননা, সে নামাযের ওয়াক্বত পেয়ে গেছে এবং তার এ নামায 'আদায়' হবে; 'কাযা' বলে গণ্য হবে না। স্মরণ রাখবেন, এ প্রসঙ্গে পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহ রয়েছে। এ হাদীস থেকে তো বুঝা গেলো যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায দুরস্ত আছে; কিন্তু অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই ওয়াক্বতগুলোতে নামায পড়তে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। সুতরাং শরীয়ত সম্মত 'ক্বিয়াস'-এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে; যা ওইগুলোর মধ্যে এক ধরনের হাদীসকেই প্রাধান্য দেবেন।

'ফাইয়্যাদ্ব' ফয়সালা দিয়েছেন- এমতাবস্থায় ওই দিনের আসরের নামায দুরস্ত হবে। কিন্তু ফজর ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, আসরের সময় সূর্যাস্তের পূর্বে মাকরূহ সময়েও আসে। অর্থাৎ সূর্য হলদে হয়ে যাওয়া। সুতরাং এর আরম্ভও

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا اَنْ يُّصَلِّيَهَا اِذَا ذَكَرَهَا وَ فِيْ رِوَايَةٍ لاَ كَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذٰلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقْظَةِ فَاِذَا نَسِيَ اَحَدُكُمْ صَلٰوةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا

৫৫৬।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায়, কিংবা তা না পড়ে অলসভাবে ঘুমিয়ে পড়ে,[২৭] তবে সেটার কাফ্ফারা হচ্ছে- যখনই স্মরণ হয় তখন পড়ে নেবে; অন্য বর্ণনায় আছে- সেটার কাফ্ফারা এটা ব্যতীত অন্য কিছু নেই।[২৮] [মুসলিম, বোখারী]

৫৫৭।। হযরত আবূ ক্বাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঘুমানোর মধ্যে ত্রুটি নেই, ত্রুটি হচ্ছে শুধু জাগ্রত হবার মধ্যে।[২৯] সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামায পড়তে ভুলে যায়, কিংবা তা থেকে অলস হয়ে ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে যখন স্মরণ হবে, তখন পড়ে নেবে;

হয়েছে মাকরূহ ওয়াক্বতে; আর শেষও হয়েছে 'না-ক্বিস' (মাকরূহ) সময়ে। কিন্তু ফজরের সময়ের শেষাংশটিও 'কামিল' (পরিপূর্ণ)। সুতরাং আলোচ্য অবস্থায় নামায আরম্ভ করা হয়েছে 'কামিল' (পরিপূর্ণ) ওয়াক্বতে; কিন্তু সমাপ্ত হলো 'না-ক্বিস' (মাকরূহ) সময়ে। সুতরাং আসরের সময় এ হাদীস অনুসারে আমল করা হবে, আর ফজরের সময় আমল করা হবে নিষেধের হাদীস অনুসারে। এর আরো বহু বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' : ২য় খণ্ডে দেখুন!

মোটকথা, সূর্যোদয়ের সময় কোন নামাযই দুরস্ত নয়। আর সূর্যাস্তের সময় ওই দিনের আসর জায়েয হবে; যদিও মাকরূহ।

২৭. এভাবে যে, এমনিতে শয়ন করেছে, ঘুমানোর উদ্দেশ্য ছিলো না। ইত্যবসরে, চোখে ঘুম এসে গেছে। নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে ঘুম ভাঙ্গলো, তবে সে ওযরসম্পন্ন। কিন্তু যদি জেনে বুঝে নামায না পড়ে শুয়ে গেলো, কিংবা রাতে কোন ওযর ছাড়াই দেরীতে শয়ন করলো, যার কারণে ফজরের সময় চোখ খুললোনা, তাহলে সে গুনাহ্গার। মহান রব নিয়্যত ও ইচ্ছা সম্পর্কে জানেন। এ কারণে এশার নামাযের পর তাড়াতাড়ি শুয়ে যাবার বিধান রয়েছে। সুতরাং এ হাদীস শরীফ থেকে বর্তমানকার ফাসিক্ব ও নামাযের ক্ষেত্রে বে-পরোয়া লোকেরা তাদের পক্ষে দলীল গ্রহণ করতে পারে না।

২৮. অর্থাৎ যেভাবে রোযা অনাদায়ী থেকে গেলে কখনো কাফ্ফারা দিতে হয় আর যেভাবে কখনো হজ্জের ফরযাদি ছুটে গেলো কাফ্ফারা অপরিহার্য হয়ে যায়, তেমনি নামাযে হবে না। এতে শুধু ক্বাযার বিধান রয়েছে।

اِذَا ذَكَرَ (যখন স্মরণ হয়) থেকে দু'টি মাস্আলা বুঝা গেলোঃ

এক. ছুটে যাওয়া নামায যদি একেবারে স্মরণেই না আসে, তাহলে মানুষ গুনাহ্গার নয়।

দুই. স্মরণ আসলে দেরী করবে না; তাৎক্ষণিকভাবে ক্বাযা সম্পন্ন করে নেবে। তখন দেরী করা গুনাহ্। কেননা, জীবনের কোন ভরসা নেই। সমস্ত ইবাদতের অবস্থা এ-ই।

স্মর্তব্য যে, এখানে শুধু 'যিক্র' ও 'স্মরণে আসা' উভয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। জাগ্রত হবার কথা উল্লেখ করা হয় নি। কেননা, ক্বাযা স্মরণ হলেই ওয়াজিব হয়; নিছক জাগ্রত হলে হয় না। যদি জাগ্রত হবার পর স্মরণে না আসে, তাহলে ক্বাযা নেই।

২৯. অর্থাৎ যদি নামাযের সময় ঘটনাচক্রে চোখ না খোলে এবং নামায ক্বাযা হয়ে যায়, তাহলে গুনাহ্ নেই। গুনাহ্ হয় তখনই, যখন মানুষ জাগ্রত থাকে, আর জেনে বুঝে নামায ক্বাযা করে।

فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلٰثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا اَلصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

যেহেতু মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন– "আমার স্মরণ আসতেই নামায কায়েম করো।"[৩০] [মুসলিম]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫৫৮।। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "হে আলী! তিনটি বিষয়ে দেরী করো না; নামায, যখন এসে যায়,[৩১] জানাযা, যখন তৈরী হয়ে যায় এবং কন্যা যখন তার সম-সম্প্রদায়ের পাত্র পাওয়া যায়।"[৩২] [তিরমিযী]

৫৫৯।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ওয়াক্বতের প্রারম্ভে নামায আদায় করার মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে। আর ওয়াক্বতের শেষ ভাগে রয়েছে আল্লাহ্র ক্ষমা।[৩৩] [তিরমিযী]

স্মর্তব্য যে, যদি সময়মতো চোখ না খোলা নিজের ত্রুটি বা অলসতার কারণে হয়, তবে গুনাহ্ রয়েছে। যেমন, রাতে বিনা কারণে দেরীতে শয়ন করা, যার ফলে সূর্য বেশ উপরে উঠলে ঘুম ভাঙ্গে, নিশ্চিতভাবে গুনাহ্।

৩০. অর্থাৎ 'যখন আমার কথা স্মরণ হয়, তখন নামায পড়বে।' এ আয়াতের আরো বহু ব্যাখ্যা আছে। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মজবুত তাফসীর হচ্ছে তাই, যা খোদ্ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন।

স্মর্তব্য যে, এখানে একথা বলেন নি, "যখন নামাযের কথা স্মরণে এসে যায়, তখন পড়ে নাও।" বরং বলেছেন, "যখন আমার কথা স্মরণ হবে তখন পড়বে। সুতরাং বুঝা গেলো যে, যে ব্যক্তি খোদাকে স্মরণ রাখে সে নামায ভুলতে পারে না। আর যে ব্যক্তি নামায নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করে, সে ইন্‌শা-আল্লাহ্ খোদা থেকে গাফিল হতে পারে না। এ আয়াতের আরো বহু তাফসীর আমার 'তাফসীর-ই নুরুল ইরফান'-এ দেখুন!

৩১. অর্থাৎ যখন নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্বত এসে যায়, তখন দেরী করো না। সুতরাং এ হাদীস না হানাফীদের পরিপন্থী, না শাফে'ঈদের জন্য সহায়ক, না অন্যান্য হাদীসের বিরোধী। কেননা, এশার নামায সবার মতে দেরীতে পড়া চাই।

৩২. اَيِّمٌ মূলতঃ اَيْوِمٌ ছিলো। وَاوْ - ى হয়ে এ ى ى -এর মধ্যে مدغم হয়ে গেছে। اَيِّمٌ স্বামীবিহীন বালেগা নারীকে বলা হয়; চাই কুমারী হোক, কিংবা বিধবা হোক। অর্থাৎ যখন কন্যার জন্য উপযুক্ত আত্মীয়তার সুযোগ হয়ে যায়, তখন অকারণে বিয়ে দিতে দেরী করো না। কারণ তাতে হাজারো ফিৎনা রয়েছে।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, যদি মাকরূহ ওয়াক্বতে জানাযা আসে, তবুও সেটার জন্য নামায পড়ে নিতে হবে। এটা হানাফীদের মাযহাব (অভিমত)।

নিষিদ্ধ হচ্ছে– যদি জানাযা প্রথমে তৈরী হয়; কিন্তু নামায পড়া হয় মাকরূহ সময়ে। সুতরাং এ হাদীস এর পরিপন্থী নয় যে, 'হুযূর করীম সূর্য উদিত হবার সময়, অস্ত যাবার সময় এবং দ্বি-প্রহরে জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।'

৩৩. ওয়াক্বতের প্রারম্ভ দ্বারা মুস্তাহাব-ওয়াক্বতের প্রারম্ভ বুঝানো হয়েছে। আর ওয়াক্বতের শেষ ভাগ মানে মাকরূহ

وَعَنْ اُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلٰوةُ لِاَوَّلِ وَقْتِهَا. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ لَا يُرْوَى الْحَدِيْثُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِىِّ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةً لِوَقْتِهَا الْاٰخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ .

৫৬০।। হযরত উম্মে ফারওয়াহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আযর করা হলো, "কোন্ কাজটি উত্তম?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "ওয়াক্বতের প্রারম্ভে নামায পড়া।"[৩৪] [আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ] ইমাম তিরযিমী বলেন, এ হাদীস শুধু আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর 'ওমারী থেকে বর্ণিত। বস্তুতঃ তিনি হাদীস বিশারদদের মতে মজবুত (নির্ভরযোগ্য) নন।[৩৫]

৫৬১।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন নামাযই সেটার শেষ সময়ে দু'বারও পড়েন নি এ পর্যন্ত যে, হুযূরকে আল্লাহ্ তা'আলা ওফাত শরীফ দিয়েছেন।[৩৬] [তিরমিযী]

ওয়াক্বত। অর্থাৎ মুস্তাহাব ওয়াক্বত আরম্ভ হতেই নামায পড়ে নেওয়া আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। আর মাকরূহ্ ওয়াক্বতে নামায পড়লে উচিত ছিলো জঘন্য গুনাহ্ হওয়া আর ওই নামাযকেও ক্বাযা হিসেবে ধরে নেওয়া। কিন্তু মহান রব ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার এ ব্যাখ্যা দ্বারা এ হাদীস শরীফ ওই হাদীস শরীফের বিরোধী হয় না, যা'তে হুযূর এরশাদ করেছেন "এশা দেরীতে পড়ো।"

৩৪. অর্থাৎ মুস্তাহাব-ওয়াক্বতের প্রারম্ভে নামায পড়া, যেমন বারংবারই আরয করা হয়েছে। স্মর্তব্য যে, ফযীলতের বর্ণনায় বিভিন্ন ধরনের হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'উৎকৃষ্টতম আমল' হচ্ছে 'জিহাদ', কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 'মাতাপিতার সেবা'; কিন্তু তবুও সেগুলো পরস্পর বিরোধী নয়। কেননা, নিঃশর্তভাবে উৎকৃষ্টতা ওয়াক্বতের প্রারম্ভে নামায পড়ার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু কোন জরুরী অবস্থায় 'জিহাদ' কিংবা 'মাতাপিতার খিদমত' উত্তম হয়ে যায়। হতে পারে- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ ভিন্ন ভিন্ন জবাব জিজ্ঞাসাকারীদের অবস্থা অনুসারে ছিলো। কাউকে বলেছেন, "তোমার জন্য জিহাদ উত্তম।" কাউকে বলেছেন, "তোমার জন্য মাতাপিতার সেবা উত্তম।" চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র রোগীর অবস্থানুসারে দেওয়া হয়।

৩৫. তাঁর নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে হাফস ইবনে আ-সিম ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব। তিনি বড় ইবাদতপরায়ণ, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং খোদাভীরু ছিলেন; কিন্তু স্মরণশক্তি ছিলো একটু দুর্বল। ১৭১ হিজরীতে ওফাত বরণ করেছেন। তাঁর ভাই ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে ওমর বড় নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন।

স্মর্তব্য যে, এ হাদীস শরীফ অনেক সনদ (সূত্র) দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে حسن لغيره (ভিন্ন সূত্রে গ্রহণযোগ্য)। [মিরক্বাত ও আশি''আহ্]

৩৬. এ হাদীস অতি জটিল। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বহুবার বহু নামায ওয়াক্বতের শেষভাগে পড়েছেন। কেননা, হযরত জিব্রাঈল আমীন দ্বিতীয় দিন সমস্ত নামায হুযূরের সাথে ওয়াক্বতের শেষ ভাগে পড়েছেন। তারপর কয়েকবার হুযূর নামাযের শেষ ওয়াক্বত বাতলানোর জন্য সাহাবা কেরামকে একদিন ওয়াক্বতের প্রারম্ভে পড়িয়েছেন, আরেকদিন ওয়াক্বতের শেষভাগে পড়িয়েছেন। খন্দক্বের যুদ্ধে পাঁচ ওয়াক্বতের নামায ক্বাযা

وَعَنْ اَبِیْ اَیُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا یَزَالُ اُمَّتِیْ بِخَیْرٍ اَوْ قَالَ عَلَی الْفِطْرَةِ مَالَمْ یُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ اِلٰی اَنْ تَشْتَبِکَ النُّجُوْمُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ الدَّارِمِیُّ عَنِ الْعَبَّاسِ.

وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰی اُمَّتِیْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ یُّؤَخِّرُوا الْعِشَآءَ اِلٰی ثُلُثِ اللَّیْلِ اَوْ نِصْفِهٖ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِیُّ وَابْنُ مَاجَةَ۔

৫৬২।। হযরত আবূ আইয়ুব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মত কল্যাণের উপর, অথবা বলেছেন, 'ফিত্বরাত' (সৃষ্টিগত স্বাভাবিক অবস্থা)র উপর থাকবে–[৩৭] যতদিন পর্যন্ত মাগরিবকে আকাশের তারাগুলো পরস্পর গেঁথে যাওয়া পর্যন্ত পিছিয়ে না দেয়।[৩৮] [আবূ দাঊদ] ইমাম দারেমী হযরত আব্বাসের সূত্রে এটা বর্ণনা করেছেন।

৫৬৩।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যদি এ আশঙ্কা না থাকতো যে, আমি আপন উম্মতের উপর কষ্ট ঢেলে দিচ্ছি, তবে তাদেরকে হুকুম দিতাম– এশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ কিংবা অর্দ্ধেক পর্যন্ত দেরী করে পড়তে।"[৩৯] [আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্]

করে পড়েছেন। তা'রীসের রাতে ফজরের নামায ক্বাযা করে পড়েছেন। একবার ফজরের একেবারে শেষ সময়ে হুযূরের চোখ মুবারক খুলেছে। তিনি খুব তাড়াতাড়ি নামায আদায় করেছেন। আর এরশাদ করেছেন, "আমি মহান রবকে স্বপ্নে দেখেছি। তাঁর সাথে কথোপকথনে মশগুল ছিলাম।..." সুতরাং এ হাদীসের ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া অপরিহার্য। অথবা এসব ঘটনা হযরত উম্মুল মু'মিনীনের জ্ঞানে আসে নি। অথবা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার ঘটনাবলী তিনি উল্লেখ করছেন না।

অথবা– অর্থ এ যে, আমার সাথে শাদী হবার পর আমার ঘরে হুযূর কোন নামায ওয়াক্বতের শেষ ভাগে পড়েন নি। তাছাড়া এ হাদীস মজবুতও নয়। সুতরাং ইমাম তিরমিযী বলেছেন, "এর সনদ 'মুত্তাসিল' নয়।" মুহাদ্দিস মীরাক বলেন, "এ হাদীসে চিন্তা-ভাবনা (تَامُّل) করার অবকাশ রয়েছে।"

৩৭. 'ফিত্বরাত' মানে 'ইসলাম' অথবা নবীগণের সুন্নাত অথবা ইসলামের স্থায়ী সুন্নাত।

৩৮. এ থেকে বুঝা গেলো যে, মাগরিবে এতটুকু দেরী করা মাকরূহ, যখন তারাগুলো খুব চমকিত হয়ে ওঠে। আর সমস্ত তারা প্রকাশ পেয়ে ঘন হয়ে যায়; যেমন রাফেযী (শিয়া)-দের মাগরিবের সময়। এ হাদীস ইমাম আ'যমের দলীল। তাঁর মতে, 'শফক্ব' হচ্ছে 'শুভ্রতা'র নাম, পশ্চিমাকাশের লালচে রং-এর (নাম) নয়। শুভ্রতার সময় মাগরিবের সময় থাকে। কেননা, তারাগুলোর পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া ও ঘন হয়ে যাওয়া লালচে রং থাকাকালে হয় না, শুভ্রতার সময়ই হয়ে থাকে।

ওই সময়কে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের শেষ সময় স্থির করেছেন। এটাকে 'মাগরিবকে বিলম্ব করা' বলেছেন; 'ক্বাযা' বলেন নি।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছাক্রমে আহলে সুন্নাত কল্যাণের উপর রয়েছেন এবং থাকবেন; কেননা, তাঁরা মাগরিব অবিলম্বে পড়ে নেন।

৩৯. اَوْ نِصْفِهٖ (অথবা অর্দ্ধরাত পর্যন্ত...)-এর মধ্যে বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয়েছে– হুযূর কি এক তৃতীয়াংশ বলেছেন, না অর্দ্ধেক বলেছেন? এ হাদীস ওইসব হাদীসের ব্যাখ্যা, যেগুলোতে ওয়াক্বতের প্রারম্ভে নামায পড়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এ হাদীস বলেছে যে, ওখানে 'ওয়াক্বতের

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْتِمُوْا بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلٰى سَآئِرِ الْاُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا اُمَّةٌ قَبْلَكُمْ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ الثَّالِثَةِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالدَّارِمِىُّ

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهٗ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالدَّارِمِىُّ وَلَيْسَ عِنْدَ النَّسَائِىِّ فَاِنَّهٗ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ۔

৫৬৪।। হযরত মু'আয ইবনে জবল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ওই নামাযকে দেরীতে পড়ো। কেননা, তোমাদেরকে সেটার কারণে সমস্ত উম্মতের উপর বুযুর্গী দেওয়া হয়েছে। তোমাদের পূর্বে এ নামায অন্য কোন উম্মত পড়েনি।"[৪০] [আবূ দাঊদ]

৫৬৫।। হযরত নো'মান ইবনে বশীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এ নামায অর্থাৎ আখেরী এশার নামাযের সময় সম্পর্কে খুব অবগত আছি। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ নামায তৃতীয় তারিখের রাতের চাঁদ ডুবে যাবার সময় পড়তেন।[৪১] [আবূ দাঊদ, দারেমী]

৫৬৬।। হযরত রাফি' ইবনে খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ফজর আলোকিত করে পড়ো; কেননা, এর সাওয়াব বড়।"[৪২] [তিরমিযী, আবূ দাঊদ, দারেমী][৪৩] আর নাসাঈর নিকট এটা নেই– 'সেটার সাওয়াব বড়।'

প্রারম্ভ' মানে 'মুস্তাহাব ওয়াক্তের প্রারম্ভ' বুঝানো উদ্দেশ্য ছিলো। অর্থ এ যে, যদি উম্মতের উপর কষ্টকর হবার আশংকা না হতো, তবে আমি এশার নামাযকে এতোটুকু দেরী করাকে ফরয সাব্যস্ত করতাম যেনো সেটার পূর্বে এশা পড়া জায়েযই না হতো। এখন এ বিলম্ব তো সুন্নাত; ফরয নয়।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে শরীয়তের বিধানাবলীর মালিক ও ইখতিয়ারপ্রাপ্ত। তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে যা চান ফরয করেন, যা চান ফরয করেন না। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য আমার কিতাব 'সালতানাত-ই মোস্তফা' দেখুন। এ কথাও বুঝা গেলো যে, হুযূর উম্মতের উপর এমনই দয়ালু ও দয়ার্দ্র যে, ইবাদতগুলোতেও উম্মতের আরামের প্রতি খেয়াল রাখেন।

৪০. অর্থাৎ যেহেতু এশার নামায তোমরাই পেয়েছো, সেহেতু সেটা দেরীতে পড়ো, যাতে তোমরা নামাযের জন্য অপেক্ষার সাওয়াব লাভ করতে পারো, আর যেন এর পরে বেশী কথাবার্তা বলার সময় না থাকে; (বরং) তাৎক্ষণিকভাবে ঘুমিয়ে পড়তে পারো।

এ হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হুযূরের উম্মত সমস্ত উম্মত অপেক্ষা উত্তম। এ শ্রেষ্ঠত্বের বহু কারণও রয়েছে। তন্মধ্যে একটা হচ্ছে এশার নামায লাভ করা।

স্মর্তব্য যে, এশার নামায আমাদের পূর্বে অন্য কোন উম্মতের উপর ফরয ছিলো না। অবশ্য কোন কোন নবী নফল হিসেবে তা পড়ছিলেন। সুতরাং এ হাদীস শরীফ ওই হাদীসের বিপরীত নয়, যাতে হযরত জিব্রাঈল আরয করছিলেন, এ সময়গুলো আপনার ও আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের নামাযগুলোর ওয়াক্তই। আর না ওই বর্ণনার বিপরীত,

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُنْحَرُ الْجُزُوْرُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعِشَآءِ الْاٰخِرَةِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهٗ فَلَا نَدْرِيْ اَشَيْءٌ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫৬৭।। হযরত রাফি' ইবনে খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আসরের নামায হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে পড়তাম। তারপর উট জবাই করা হতো। তারপর সেটাকে দশভাগে ভাগ করা হতো। তারপর তা রান্না করা হতো। আমরা সূর্যাস্তের পূর্বে ভুনাকৃত গোশ্ত আহার করে নিতাম।[৪৪] [মুসলিম, বোখারী]

৫৬৮।। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক রাতে আখেরী এশার নামাযের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অপেক্ষায় অনেক্ষণ বসেছি।[৪৫] তিনি তখনই তাশরীফ এনেছেন, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে, অথবা তারও পরে। আমরা জানতাম না কোন্ কাজ

যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সীনা উপত্যকা থেকে এসে আপন স্ত্রী হযরত সফূরাকে সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় পেয়ে এশার নামায পড়েছেন।

৪১. এ সময় শীতকালে রাত প্রায় সাড়ে নয়টা হয়। যেমনটি অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়।

৪২. এ হাদীস ইমাম আ'যমের মজবুত দলীল এ মর্মে যে, ফজর উজালা করে পড়া চাই। স্মর্তব্য যে, অন্ধকারের মধ্যে ফজর পড়ার কর্মগত হাদীসসমূহ তো রয়েছে; কিন্তু বাণীগত হাদীস একটিও নেই। ওইসব হাদীসে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, হয়তো তা মসজিদেরই অন্ধকার ছিলো, ওয়াক্বতের ছিলো না। কিন্তু এ হাদীসে তো এ ধরনের ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার কোন অবকাশই নেই।

এ কারণেই সাহাবা-ই কেরাম ফজর উজালা করে পড়তেন। অনেক হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত। আমি ওই হাদীস শরীফগুলো আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব': ২য় খণ্ডে সংকলন করেছি।

এ হাদীসের প্রতি সমর্থন দু'টি বিষয় থেকে পাওয়া যায়ঃ

এক. মুসলিম ও বোখারী সাইয়্যেদুনা ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সসাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুয্দালিফার ফজরের নামায প্রতিদিনের সময় অপেক্ষা পূর্বে পড়েছেন। সুতরাং হুযূর যদি ভোর হতেই ফজর পড়তেন তবে আজ মুয্দালিফায় কোন্ সময়ে পড়েছেন? তিনি কি ওয়াক্বত শুরু হবার পূর্বে পড়ে নিয়েছেন? সুতরাং এ হাদীসের এ-ই অর্থ হবে যে, প্রতিদিন তিনি উজালা করে পড়তেন, আজ পড়েছেন অন্ধকারে। এটাই হচ্ছে হানাফীদের মাযহাব।

দুই. ফজরের নামায অনেক বিষয়ে মাগরিবের নামাযের বিধানভুক্ত। মাগরিবে উজালা থাকা সুন্নাত। সুতরাং এখানেও উজালাই থাকা চাই। অবশ্য ওখানে উজালা থাকে ওয়াক্বতের প্রারম্ভে আর ফজরে শেষ ওয়াক্বতে। এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা 'জা-আল হক্ব'-এর মধ্যে দেখুন।

৪৩. ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীস 'হাসান-সহীহ্'। তাছাড়া, এ হাদীস ইবনে মাজাহ্, বায়হাক্বী, আবূ দাঊদ ত্বায়ালিসী এবং ত্বাবরানীতেও আছে।

৪৪. অভিজ্ঞতা সাক্ষী আছে যে, আরববাসীগণ পশু যবেহ করতে ও গোশ্ত কেটে তৈরী করতে খুব চালু ও পটু। আমি (অধম) নিজেও তা আপন চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। সুতরাং দু'দণ্ডের পর আসর পড়ে এসব কাজ সুন্দরভাবে সমাধা করা

شَغَلَه، فِىْ اَهْلِهٖ اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُوْنَ صَلٰوةً مَا يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا اَنْ يَّثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِىْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِّنْ

হুযূরকে আপন ঘরে ব্যস্ত রেখেছে, না অন্য কোন কারণ ছিলো?[৪৬] যখন তাশরীফ আনলেন তখন এরশাদ করলেন, "তোমরা এমন এক নামাযের জন্য অপেক্ষা করছো, যার জন্য তোমরা ব্যতীত অন্য কোন ধর্মাবলম্বী অপেক্ষা করছে না।[৪৭] যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে এ নামায এ-ই সময়েই পড়াতাম।[৪৮] তারপর মুআয্যিনকে নির্দেশ দিলেন। তিনি নামাযের তাকবীর বললেন এবং তিনি নামায পড়লেন। [মুসলিম]

৫৬৯।। হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ্[৪৯] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযগুলো তোমাদেরই নামাযের মতো পড়তেন।[৫০]

যায়। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। এ মৌসুমে আসরের সময় থাকে প্রায় দু'ঘন্টা। সুতরাং এ হাদীস্ শরীফ দ্বারা এক দণ্ডের পর আসর পড়া মোটেই প্রমাণিত হয় না। তাছাড়া যুবক-উটের গোশ্ত তাড়াতাড়ি গলে যায়। কোন কোন অভিজ্ঞ বাবুর্চি এতোই তাড়াতাড়ি গলিয়ে নেয় যে, পাকিস্তানী কসাই ও বাবুর্চি এতটুকু কাজ গোটা দিনেও সমাধা করতে পারে না।

৪৫. স্মর্তব্য যে, নামায পড়াও ইবাদত এবং নামাযের জন্য অপেক্ষা করাও; বিশেষ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য অপেক্ষা করা উৎকৃষ্টতম ইবাদত। এ থেকে সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুম-এর আদব জানা যায়। তাঁরা না কখনো হুযূরকে ডাকতেন, না নামাযীদের একত্রিত হবার খবর দিতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, যিনি ভালভাবে অবগত। তাঁকে আবার খবর দেওয়ার প্রয়োজন কি? তাছাড়া, ক্বোরআন করীম এ আহ্বানকারীদেরকে বিবেকহীন সাব্যস্ত করেছে।

এরশাদ হচ্ছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

(নিশ্চয় ওইসব লোক, যারা আপনাকে হুজুরাসমূহের বাইরে থেকে আহ্বান করে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ...। ৪৯:৪, তরজমা- কান্যুল ঈমান)

সাহাবা-ই কেরাম হুযূরকে নামাযের জন্য জাগাতেনও না।

৪৬. কেননা, না হুযূর দেরী করার কারণ বলেছেন, না বে-আদবী হবার ভয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করেছি। এ থেকে বুঝা গেলো যে, মুরীদের মুর্শিদকে প্রতিটি কথা জিজ্ঞাসা করা উচিৎ নয়; বরং ধৈর্যধারণ করা চাই। হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে বলেছিলেন, "তুমি আমার কোন কাজের উপর প্রশ্ন করবে না।"

৪৭. অর্থাৎ তোমাদের এ অপেক্ষা করাও ইবাদত। আর এ অপেক্ষায় এ পর্যন্ত জাগ্রত থাকা, মসজিদে বসা, কষ্ট সহ্য করা- সবই ইবাদত। এতো বেশী ইবাদতের সমষ্টি কোন নবী ও তাঁর উম্মতের ভাগ্যে জুটে নি। এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে কোন কোন আলিম বলেছেন, এশা আসর অপেক্ষাও উত্তম।

৪৮. প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ এশার নামায দেরীতে পড়া হয়েছে। 'নামায পড়ানো' মানে তাদেরকে এ সময়ে নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া।

৪৯. তিনি নিজেও সাহাবী। তাঁর পিতাও সাহাবী। তিনি হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের ভাগিনা। কুফায় বসবাস করতেন। ৬৪ হিজরী অথবা ৬৬ হিজরীতে ওফাত পান।

৫০. এতে তাবে'ঈদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। ওই হযরতগণ তাঁকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

صَلٰوتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلٰوتِكُمْ شَيْئًا وَّ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلٰوةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلٰوتِكُمْ شَيْئًا وَّ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلٰوةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى مَضٰى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَاَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَ اَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ وَاِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِىْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلٰوةَ وَلَوْ لَا ضُعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لَاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ-

কিন্তু এশার নামায তোমাদের নামায অপেক্ষা কিছুটা দেরীতে পড়তেন।[৫১] আর নামাযকে হালকা করে পড়তেন।[৫২] [মুসলিম]

৫৭০।। হযরত আবূ সা'ঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এশার নামায পড়েছি। সুতরাং হুযূর তাশরীফ আনলেন না– যতক্ষণ না রাতের প্রায় অর্দ্ধভাগ অতিবাহিত হয়ে গেছে।[৫৩] তারপর এরশাদ ফরমালেন, "নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকো।" সুতরাং আমরা আপন আপন জায়গায় বসে রইলাম। তারপর এরশাদ করলেন, লোকেরা নামায পড়ে নিয়েছে এবং আপন আপন বিছানায় চলে গেছে।[৫৪] আর তোমরা নামাযেই রয়েছো– যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্য অপেক্ষা করছিলে। আর যদি দুর্বলদের দুর্বলতা এবং রুগ্নদের রোগ না থাকতো, তবে আমি এ নামাযকে অর্দ্ধরাত পর্যন্ত পেছনে সরিয়ে নিতাম।"[৫৫] [আবূ দাউদ, নাসাঈ]

ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের সময়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিলেন। তখন তিনি এ জবাব দিচ্ছিলেন। তা হচ্ছে– তোমরা নামাযগুলো বিশুদ্ধ সময়েই পড়ছো। হুযূরও এ-ই সময়গুলোতে পড়তেন।

৫১. স্মর্তব্য যে, এশার নামাযকে 'আতামাহ্' বলা নিষিদ্ধ। হযরত জাবির হয়তো এ নিষেধ সম্পর্কে তখনো জানতেন না, নতুবা তারা এশার মানে বুঝতেন না। 'আতামাহ' বললে বুঝে যেতো। যেমন, পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলের লোকেরা আসরকে 'দীগার' এবং এশাকে 'খুফ্তা' বললেই বুঝতে পারে।

৫২. অর্থাৎ যখন নামায পড়াতেন, তখন হালকা করতেন; আর নিজস্ব একাকী নামায খুব লম্বা করে পড়তেন। যেমন তাহাজ্জুদের নামায ইত্যাদি। আর এটাও বেশীর ভাগ সময়ের কথা। অন্যথায় কখনো হুযূর মাগরিবের নামাযে 'সূরা আ'রাফ' পড়েছেন। কিন্তু যতো দীর্ঘই হতো না কেন সাহাবা-ই কেরামের নিকট তা হালকাই অনুভূত হতো।

৫৩. এখানে নামায পড়া মানে পড়ার ইচ্ছা করা। সাহাবা-ই কেরামের নিয়ম এ ছিলো যে, হুযূর যতো দেরীতেই তাশরীফ আনতেন না কেন, তাঁরা না হুযূরকে নামাযের জন্য ডাকতেন, না একাকী পড়ে নিতেন, না আপন জামা'আত আলাদা করে কায়েম করে নিতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, হুযূরের সাথে ক্বাযা পড়া আলাদাভাবে 'আদা' (اداء ওয়াক্তের অভ্যন্তরে) পড়া অপেক্ষা উত্তম।

৫৪. প্রকাশ তো এটাই যে, ওইসব লোক মানে ওইসব মুসলমান, যারা আপন আপন মসজিদে এশা পড়ে নিয়েই, অথবা ওইসব নারী ও শিশু, যারা আপন আপন ঘরে এশা পড়ে শুয়ে গেছে; 'আহলে কিতাব' নয়। কেননা, তাদের দ্বীনে এশা ছিলোই না।

৫৫. شَطْرُ اللَّيْلِ (অর্দ্ধরাত্রি) মানে 'প্রায় অর্দ্ধরাত্রি' অর্থাৎ রাতের এক-তৃতীয়াংশ। اَخَّرْتُ (আমি অবশ্যই পিছিয়ে নিতাম) থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূরকে নামাযগুলো আগে-পিছে করার ইখ্তিয়ার দেওয়া হয়েছে। তিনি আল্লাহ্র

وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ اَشَدُّ تَعْجِيْلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ-

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ. رَوَاهُ النَّسَآئِىُّ

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ بَعْدِىْ اُمَرَآءُ يُشْغِلُهُمْ اَشْيَاءُ عَنِ الصَّلٰوةِ لِوَقْتِهَا حَتّٰى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوْا

৫৭১।। হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মোকাবেলায় যোহর তাড়াতাড়ি (আগেভাগে) পড়তেন। আর তোমরা আসর হুযূর অপেক্ষা তাড়াতাড়ি পড়ে থাকো।[৫৬] [আহমদ, তিরমিযী]

৫৭২।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, যখন গ্রীষ্মকাল হতো, তখন নামায ঠাণ্ডা করে পড়তেন। আর যখন শীতকাল হতো তখন তাড়াতাড়ি (বিলম্ব না করে) পড়ে নিতেন।[৫৭] [নাসাঈ]

৫৭৩।। হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "আমার পর তোমাদের উপর এমন এমন শাসক নিয়োজিত হবে, যাদেরকে কিছু জিনিষ ওয়াক্বত মতো নামায পড়তে বাধা সৃষ্টি করবে।[৫৮] এমনকি তাদের ওয়াক্বত অতিবাহিত হয়ে যাবে। সুতরাং (তখন) তোমরা নামায পড়ে নেবে

দানকক্রমে শরীয়তের বিধানাবলীর মালিক। একথাও প্রতীয়মান হয় যে, যদিও নামাযের জন্য অপেক্ষা করা নিঃশর্তভাবে ইবাদত, কিন্তু মসজিদে বসে অপেক্ষা করা বড়তর ইবাদত। এ কারণে, এমতাবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করানো নিষিদ্ধ।

৫৬. এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, আসরের নামায ওয়াক্বত আরম্ভ হতেই পড়বে না। কিছুক্ষণ দেরীতে পড়বে। যদি হুযূর ওয়াক্বত আরম্ভ হতেই পড়তেন, তবে এ সব হযরত এর পূর্বে কিভাবে পড়তে পারতেন? সুতরাং এ হাদীস ইমাম আ'যমের আসর দেরীতে পড়ার পক্ষে মজবুত দলীল। হযরত উম্মে সালামাহ্ তাঁদেরকে বলছেন, "যদি তোমরা সুন্নাতের অনুসরণ করতে চাও, তবে আসরের নামায দেরীতে পড়ো।"

৫৭. 'নামায' দ্বারা যোহরের নামায বুঝানো হয়েছে। জুমু'আহ্ও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন বোখারী শরীফে সুস্পষ্টভাবে এ মর্মে বর্ণনা রয়েছে। এ হাদীস ইমাম আ'যমের মজবুত দলীল। এ মর্মে যে, যোহর ও জুমু'আহ্ গ্রীষ্মকালে দেরীতে পড়বে। আর যোহরের ওয়াক্বত ছায়া দু'দণ্ড হওয়া পর্যন্ত থাকে। কেননা, ঠাণ্ডা পয়দা হয় এক দণ্ডের পর। এ হাদীস ওইসব হাদীসের ব্যাখ্যা করে দিয়েছে, যেগুলোতে যোহর তাড়াতাড়ি পড়ার উল্লেখ রয়েছে। এ কথাও বলে দিয়েছে যে, সাহাবা-ই কেরামের, গরমের কারণে যোহরের নামাযে কাপড়ের উপর সাজদা করা ফরশের কারণে ছিলো, সময়ের গরমের কারণে ছিলো না। 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, এ হাদীস ওইসব হাদীসের জন্য 'নাসিখ' (রহিতকারী); কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে- ওইগুলোর ব্যাখ্যা বর্ণনাকারী (নাসিখ বা রহিতকারী নয়)।

৫৮. এতে সম্বোধন সাহাবা-ই কেরামকে করা হয়েছে। আর এ'তে অদৃশ্যের সংবাদ রয়েছে। বস্তুতঃ এ সংবাদ হুবহু বাস্তবায়িতও হয়েছে। সুতরাং ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়া

الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اُصَلِّىْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ-

وَعَنْ قُبَيْصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِىْ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ فَهِىَ لَكُمْ وَهِىَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوْا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقِبْلَةَ.

رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

সময়মতো।[৫৯] একজন সাহাবী আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাদের সাথেও কি আমরা নামায পড়ে নেবো?" এরশাদ ফরমালেন, "হ্যাঁ"।[৬০] [আবূ দাঊদ]

৫৭৪।। হযরত ক্বোবায়সাহ্ ইবনে ওয়াক্বক্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার পর তোমাদের উপর এমন এমন শাসক নিয়োজিত হবে, যারা নামাযের ক্ষেত্রে দেরী করবে। তখন তা তোমাদের জন্য মঙ্গল ও তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে।[৬১] তোমরা তাদের সাথে নামায পড়তে থাকো- যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কা'বার দিকে নামায পড়ে।[৬২] [আবূ দাঊদ]

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং হাজ্জাজ ইবনে ইয়ূসুফের যুগে এমন এমন শাসক নিয়োজিত হয়েছে, যারা নামাযগুলোতে আলস্য করতো। আর মাকরূহ ওয়াক্বতগুলোতে নামায পড়তো। তদুপরি, তাদের ব্যতীত ইমামগণও নামায পড়াতে পারতেন না। এটাই হচ্ছে- হুযূরের ইল্‌মে গায়ব। এখন তো শাসকদের সাথে নামাযের সম্পর্কই নেই। তারা মসজিদের রাস্তাও দেখে নি; তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাক্রমে কিছুটা ব্যতিক্রমও থাকতে পারে।

৫৯. অর্থাৎ তাদের কারণে তোমরা নামায মাকরূহ ওয়াক্বতে পড়ো না; বরং নিজ নিজ ঘরে কিংবা মসজিদে একাকী কিংবা নিজেদের জমা'আত আলাদাভাবে ক্বায়েম করে মুস্তাহাব সময়ে পড়ে নেবে।

৬০. যাতে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারো। কেননা, তোমরা যদি তাদের সাথে নামাযগুলোতে শামিল না হও, তবে তারা তোমাদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে তোমাদের উপর নির্যাতন চালাবে।

৬১. এ কারণে যে, তোমরা পৃথকভাবে মুস্তাহাব ওয়াক্বতে নামায পড়ে নেবে, অতঃপর তাদের সাথেও নফলের নিয়্যাতে শরীক হয়ে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। আর তারা ফরযই ওইসব মাকরূহ সময়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা লাভবান থাকবে, আর তারা থাকবে ক্ষতিগ্রস্ত। আর যদি তোমরা সঠিক সময়ে আলাদা নামায পড়তে না পারো, তাদের সাথেই পড়তে বাধ্য হয়ে যাও, তবে ওযরগ্রস্ত হবার কারণে তোমরা গুনাহ্‌গার হবে না।

৬২. 'শরহে আকবার'-এ মোল্লা আলী ক্বারী লিখেছেন, এমনসব স্থানে কা'বার দিকে নামায পড়ার অর্থ হচ্ছে- বিশুদ্ধ আক্বীদার মুসলমান হওয়া; নিছক নামাযে কা'বার দিকে মুখ করে নেওয়া নয়। ওই যুগে মুনাফিক্বগণ এবং আজকাল মির্যায়ী ও চাকড়ালভী (আহলে ক্বোরআন) প্রমুখ মুরতাদ্দ সম্প্রদায় সবাই নামাযে কা'বার দিকে মুখ করে নেয়; অথচ তাদের পেছনে ইক্বতিদা করলে নামায সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায়। যখন নাপাক কাপড় পরিধানকারীর পেছনে নামায হয় না, তখন নাপাক আক্বীদা ও নাপাক অন্তরসম্পন্ন লোকের পেছনে নামায কিভাবে শুদ্ধ হবে?

হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে- যতক্ষণ পর্যন্ত ওইসব শাসকের আক্বীদা খারাপ না হয়, শুধু আমল খারাপ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পেছনে নামায পড়ে নাও। এ কারণে ফক্বীহ্‌গণ বলেছেন, ফাসিক্বকে ইমাম বানিও না। কিন্তু যদি (নিজে নিজে) বনে যায়; তবে তার পেছনে নামায পড়ে নাও। এর উৎস প্রমাণ হচ্ছে এই হাদীস।

স্মর্তব্য যে, যেই ফাসিক্ব খোদ্ নামাযের অভ্যন্তরে কোন হারাম কাজ সম্পন্ন করতে থাকে, তখন তার পেছনে নামায দুরস্ত হবে না। যদি পড়ে নেওয়া হয়, তবে পুনরায় পড়া ওয়াজিব। প্রথমোক্তটার উদাহরণ হচ্ছে- চোর ও যিনাকারীর পেছনে নামায পড়া। কেননা, তারা তো নামাযের অভ্যন্তরে এসব কাজ সম্পন্ন করছে না।

শেষোক্তটির উদাহরণ- দাড়ি মুণ্ডিত কিংবা রেশমী অথবা স্বর্ণখচিত পোশাক পরিহিত অথবা মদের নেশাগ্রস্তের পেছনে

وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَنَّهٗ دَخَلَ عَلٰى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ فَقَالَ اِنَّكَ اِمَامُ عَامَّةٍ وَّ نَزَلَ بِكَ مَاتَرٰى وَيُصَلِّىْ لَنَا اِمَامُ فِتْنَةٍ وَ نَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلٰوةُ اَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَاِذَ اَحْسَنَ النَّاسُ فَاَحْسِنْ مَعَهُمْ وَاِذَا اَسَاءُوْا فَاجْتَنِبْ اِسَاءَتَهُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ-

بَابُ فَضَائِلِ الصَّلٰوةِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ

৫৭৫।। হযরত ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু[৬৩] থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওসমানের নিকট গেলেন- যখন তিনি অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন।[৬৪] আরয করলেন, "আপনি জনসাধারণের ইমাম, আর আপনার উপর ওই মুসীবত অবতীর্ণ হয়েছে, যা আপনি দেখছেন। আর আমাদেরকে ফিৎনার ইমাম নামায পড়াচ্ছে।[৬৫] আমরা এতে ক্ষতি মনে করছি।" তিনি বললেন, "নামায মানুষের সমস্ত আমল থেকে উত্তম আমল। সুতরাং লোকেরা যদি ভালো কাজ করে, তখন তোমরাও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো,[৬৬] আর যখন মন্দকর্ম করে, তখন তোমরা তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে থাকো।" [বোখারী]

অধ্যায় ঃ নামাযের ফযীলতসমূহ[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৫৭৬।। হযরত ওমারাহ্ ইবনে রুয়াইবাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি,

---

নামায পড়া। সুতরাং ফক্বীহগণের ফাত্ওয়াগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ নেই।

৬৩. তিনি এক মর্যাদাবান তাবে'ঈ। ক্বোরাঈশী, যুহরী কিংবা নওফলী। হুযূরের যমানায় পয়দা হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বালেগ হবার পূর্বে হুযূরের ওফাত হয়ে গেছে।

৬৪. মিশরের বিদ্রোহীরা তাঁকে খিলাফত থেকে অপসারণ করার কিংবা শহীদ করার কু-মৎলবে তাঁর ঘর এভাবে অবরোধ করেছিলো যে, তিনি কয়েক ওয়াক্তের নামাযের জন্য মসজিদ-ই নবভী শরীফে আসতে পারেন নি। তাঁর ঘরে এক ফোঁটা পানিও যেতে পারে নি। তাঁর শাহাদতের এ ঘটনা অতি দীর্ঘ। কিছুটা কিতাবুল মানাক্বিব' (জীবন চরিত পর্ব)-এ বর্ণনা করা হবে। ইন্শা-আল্লাহ্! হযরত ওবায়দুল্লাহ্ কোন মতে তাঁর ঘরে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

৬৫. অর্থাৎ 'খলীফাতুল মুসলেমীন' তো আপনি। নামায পড়ানোর অধিকার তো আপনার অথবা আপনার নিয়োজিত ইমামেরই ছিলো। কিন্তু এখন বিদ্রোহীরা মসজিদে নবভী শরীফে নিজেদের ইমাম নিয়োগ করেছে। আমরা তার পেছনে নামায পড়বো কিনা?

উল্লেখ্য, বিদ্রোহীদের নিয়োজিত ইমামের নাম- কিনানাহ্ ইবনে বশীর ছিলো।

৬৬. অর্থাৎ সৎকার্যাদিতে তাদের সাথী হয়ে যাও। কিন্তু তাদের মন্দ কার্যাদিতে শরীক হয়ো না; না তাদেরকে সাহায্য করবে। নামায তো সৎকর্ম। তাদের পেছনে পড়ে নাও। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যদি মন্দ আক্বীদাসম্পন্ন লোকের মন্দ আক্বীদা কুফর পর্যন্ত না পৌঁছে, আর সে ইমাম বনে যায়, তবে তার পেছনে, নামায পড়ে নেবে। ফক্বীহগণ এটাই বলে থাকেন। এটাই এ হাদীসের মর্মার্থ। অর্থাৎ প্রত্যেক নেক্কার ও পাপীর পেছনে নামায পড়তে পারো।

****

১. যদিও 'কিবাতুস্ সালাত' (নামায পর্ব)-এর প্রারম্ভে

لَنْ يَّلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلّٰى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِىْ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ

"ওই ব্যক্তি আগুনে কখনো প্রবেশ করবে না, যে সূর্য উদিত হওয়া ও অস্ত যাবার পূর্বেকার নামাযগুলো পড়ে।" অর্থাৎ ফজর ও আসর।[২] [মুসলিম]

৫৭৭।। হযরত আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি দু'ঠাণ্ডা নামায পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩] [বোখারী, মুসলিম]

৫৭৮।। হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে রাত ও দিনের ফিরিশ্তাগণ পালাক্রমে আসে এবং ফজর ও আসরের নামাযগুলোতে সমবেত হয়ে যায়।[৪] তারপর যারা তোমাদের মধ্যে রাত অতিবাহিত করে তারা ঊর্ধ্বলোকে চলে যায়।[৫]

নামাযের ফযীলতসমূহের বর্ণনাও এসেছে, কিন্তু সেখানে ছিলো নামাযের ফযীলতসমূহের বিবরণ আর এখানে রয়েছে নামাযের সময়গুলোর ফযাইল। এ কারণে সেটার পৃথক অধ্যায় নির্ণয় করেছেন এবং এ অধ্যায় 'বাবুল আওক্বাত' (নামাযের সময়গুলোর বিবরণ শীর্ষক অধ্যায়)-এর পর সন্নিবিষ্ট করেছেন।

২. এর দু'টি অর্থ হতে পারে–

এক. ফজর ও আসরের নামায নিয়মিতভাবে সম্পন্নকারী স্থায়ীভাবে থাকার জন্য দোযখে যাবে না; গেলেও সাময়িকভাবে যা'বে। সুতরাং এ হাদীস এ-ই হাদীসের পরিপন্থী নয়, যাতে এরশাদ হয়েছে– কিছুলোক ক্বিয়ামতে নামায নিয়ে হাযির হবে, কিন্তু তাদের নামায হক্ব প্রাপকদের মধ্যে বন্টন করানো হবে।

দুই. ফজর ও আসরের নামায নিয়মিতভাবে সম্পন্নকারীদেরকে ইন্শা-আল্লাহ্! অন্যান্য নামাযেরও সামর্থ্য দেওয়া হবে এবং সমস্ত গুনাহ্ থেকে বাঁচারও। কেননা, এই নামাযগুলোই বেশী ভারী। যখন এ দু'টির প্রতি যত্নবান হয়ে নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন ইন্শা-আল্লাহ্! অন্যান্য নামাযও নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করবে। সুতরাং এ হাদীসের উপর এ আপত্তি নেই যে, 'নাজাতপ্রাপ্তির জন্য শুধু এ দু'নামাযই যথেষ্ট। কাজেই অন্যান্য নামাযের প্রয়োজন কি?'

স্মর্তব্য যে, দু'নামাযের মধ্যে দিন ও রাতের ফিরিশ্তাগণ সমবেত হয়। তাছাড়া, এ দু'টি নামায দিনের দু'প্রান্তের। তদুপরি, এ দু'নামায নাফসের উপর ভারী। কারণ, ফজর হচ্ছে ঘুমানোর সময় এবং আসর হচ্ছে কাজ-কারবার চাঙ্গা করার। সুতরাং এ দু'টি নামাযের মর্যাদাও বেশী।

৩. 'ঠাণ্ডা নামাযগুলো' মানে হয়তো ফজর ও এশা অথবা ফজর ও আসর। অন্যান্য ব্যাখ্যা এ-ই মাত্র করা হয়েছে।

৪. এখানে ফিরিশ্তাগণ মানে হয়তো আমল লিপিবদ্ধকারী দু'জন ফিরিশ্তা। অথবা মানুষের হিফাযতকারী ষাটজন ফিরিশ্তা। প্রত্যেক না-বালেগের সাথে ষাটজন ফিরিশ্তা

بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ جُنْدُبِ نِ الْقَسْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهٖ بِشَيْءٍ فَاِنَّهٗ مَنْ يَّطْلُبُهٗ مِنْ ذِمَّتِهٖ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهٗ عَلٰى وَجْهِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ اَلْقُشَيْرِىُّ بَدَلَ الْقَسْرِىِّ۔

তাদেরকে তাদের রব জিজ্ঞাসা করেন; অথচ তিনি তাদের চেয়েও বেশী জানেন (বলেন), "তোমরা আমার বান্দাদেরকে কোন্ অবস্থায় রেখে এসেছো?[৬]" তারা বলেন, "আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি। আর যখন আমরা তাদের নিকট পৌঁছেছিলাম, তখনও তারা নামায পড়ছিলো।"[৭] [মুসলিম, বোখারী]

৫৭৯।। হযরত জুন্দাব কুসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে নেয়, সে আল্লাহ্র নিরাপত্তার মধ্যে থাকে।[৮] (অর্থাৎ তাঁর নিরাপত্তায় চলে যায়)। সুতরাং তোমাদেরকে যেনো আল্লাহ্ আপন নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন পাকড়াও না করেন।[৯] কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে আপন অঙ্গীকারের জন্য পাকড়াও করবেন, তখন তাকে পাকড়াও করবেনই এবং তাকে অধোঃমুখে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।" [মুসলিম] আর 'মাসাবীহ্'র কোন কোন কপিতে কুসারী'র স্থলে 'কুশাইরী' রয়েছে।

থাকেন। আর বালেগের সাথে থাকেন বাষট্টি জন। এ কারণে নামাযের সালাম ও অন্যান্য সালামে তাঁদেরও নিয়্যত করা হয়। ওইসব ফিরিশ্তার ডিউটি পরিবর্তিত হতে থাকে। দিনে ও রাতে। কিন্তু ফজর ও আসরে পূর্ববর্তী ফিরিশ্তাগণ চলে যেতে পারেন না; যতক্ষণ না পরবর্তী ডিউটির ফিরিশ্তাগণ এসে যান, যাতে আমাদের ইবাদতের শুরু ও শেষভাগের পক্ষে সাক্ষী বেশী হয়।

৫. তাঁদের হেড কোয়ার্টারের দিকে, যেখানে তাঁদের অবস্থান।

৬. এ প্রশ্ন হয়তো ওই ফিরিশ্তাদেরকে সাক্ষী বানানোর জন্য, নতুবা নামাযগুলোর মহত্ব তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করার জন্য। কেননা, মানব জাতিকে সৃষ্টি করার সময় ফিরিশ্তাগণ বলেছিলেন, "হে রব! আপনি ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ও রক্তপাতকারীদেরকে কেন প্রতিনিধিত্ব দিচ্ছেন?"

বুঝা গেলো যে, প্রশ্ন করা না জানার প্রমাণ নয়। যদি হুযূর কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে তা থেকেও হুযূর জানেন না বলে প্রমাণিত হয় না।

৭. এর অর্থ হয়তো এ যে, ফিরিশ্তাগণ নামাযীদের দোষ গোপন করেন- আশপাশের নেকীগুলো উল্লেখ করেন এবং মধ্যবর্তী গুনাহ্গুলো সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকেন!

অথবা অর্থ এ যে, 'হে মুনিব! যে সব বান্দার শুরু ও শেষ এমনি উন্নত হয়, সেসব বান্দার এ দু'এর মধ্যবর্তী আমলগুলোও ভালো হবে। যে দোকানের প্রাথমিক বেচাকেনা ভালো হয়, সে দোকানে সব সময় বরকত বা কল্যাণই বিরাজ করে।

৮. অর্থাৎ ফজরের নামায সম্পন্নকারী আল্লাহ্র নিরাপত্তার মধ্যে তেমনিভাবে থাকে, যেমন কর্তব্যরত সিপাহী সরকারের নিরাপত্তায় থাকে। তার প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করলে তা সরকারের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামিল হয়।

স্মর্তব্য যে, কলেমার নিরাপত্তা এক রকম, নামাযের নিরাপত্তা

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَ الصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَّسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَا سْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَا سْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ وَلَاَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلٰوةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَآءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

---

৫৮০।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যদি লোকেরা জানতে পারে আযান ও প্রথম কাতারে কি সাওয়াব রয়েছে,[১০] তাহলে লটারী দেওয়া ব্যতীত সেটা পেতো না। তখন লটারীই দিতো।[১১] আর যদি জানতো দুপুরের নামাযের মধ্যে কি সাওয়াব রয়েছে, তবে সেটার দিকে দৌড়ে আসতো।[১২] আর যদি জানতো এশা ও ফজরের নামাযে কি সাওয়াব রয়েছে, তবে ওই দু'টি নামাযের প্রতি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে হলেও পৌঁছে যেতো।"[১৩] [মুসলিম, বোখারী]

৫৮১।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "মুনাফিক্বদের নিকট ফজর ও এশা ব্যতীত ভারী অন্য কোন নামায নেই।[১৪] যদি তারা জানতো ওই দু'টি নামাযে কি সাওয়াব রয়েছে তবে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে হলেও ওই দু'টিতে পৌঁছে যেতো।" [মুসলিম, বোখারী]

অন্য রকম। সুতরাং হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী নয়।

৯. অর্থাৎ এমন যেনো না হয় যে, তোমরা নামাযীকে কষ্ট দেবে এবং আল্লাহ্র বাদশাহীতে বিদ্রোহী হয়ে গ্রেফতার হয়ে যাবে।

১০. যদিও আমি এ উভয়ের ফযীলত অনেক বর্ণনা করে ফেলেছি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও যথাযথ বর্ণনা দেওয়া যায় নি। তাতো দেখলেই বুঝা যাবে। বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্র ওয়াস্তে আযান ও তাকবীর বলা আর নামাযের প্রথম কাতারে, বিশেষ করে ইমামের পেছনে দাঁড়ানো খুব ভালো, যার উৎকৃষ্টতা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

১১. অর্থাৎ প্রত্যেকে চাইতো এ কাজটি আমিই করবো। তখন তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যেতো; যার ফয়সালা হতো লটারীর মাধ্যমে।

বুঝা গেলো যে, সৎ কাজে প্রতিযোগিতারূপী ঝগড়া করাও ইবাদত। আর লটারী দিয়ে ওই ঝগড়া মীমাংসা করা পছন্দনীয়।

১২. অর্থাৎ যোহর ও জুমু'আর নামায যদিও দেরীতে হয়, কিন্তু তজ্জন্য তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া চাই, যাতে প্রথম কাতারে স্থান পাওয়া যায়। এটা খুবই উত্তম। মদীনা পাকে যোহরের নামাযের জন্য লোকেরা সকাল এগারটা থেকে রওনা হয়ে মসজিদ শরীফে পৌঁছতে থাকেন। বিশেষ করে জুমু'আর দিনে।

১৩. অর্থাৎ যদি পায়ে চলার শক্তি না থাকে, তবে পাছার উপর ভর করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পৌঁছে যেতো। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ওযরগ্রস্তের উপর যদিও মসজিদে হাযির হওয়া জরুরী নয়; কিন্তু তবুও পৌঁছে গেলে সাওয়াব পাবে। এখানে এশাকে 'আতামাহ্' নিষেধ আসার পূর্বে বলা হয়েছে।

১৪. কেননা, মুনাফিক্বগণ নিছক লোকদেখানোর জন্য নামায পড়ে। অন্যান্য ওয়াক্তগুলোতে যেনতেনভাবে পড়ে নেয়, কিন্তু এশার সময় ঘুমের জোর আর ফজরের সময় ঘুমের তৃপ্তি তাদেরকে উম্মাদ করে তোলে। নিষ্ঠা ও ইশ্ক্ব সমস্ত মুশ্কিলকে সহজ করে দেয়। তাতো তাদের মধ্যে নেইই। সুতরাং এ নামাযগুলো তাদের নিকট খুবই ভারী।

وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَآءَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّه‘. رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلٰوتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ وَتَقُوْلُ الْاَعْرَابُ هِىَ الْعِشَآءُ وَقَالَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلٰوتِكُمُ الْعِشَآءِ فَاِنَّهَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ الْعِشَآءُ فَاِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْاِبِلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৫৮২।। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জমা'আত সহকারে পড়লো, সে যেনো অর্দ্ধরাত ইবাদতে দণ্ডায়মান রইলো, আর যে ফজরের নামায জমা'আত সহকারে পড়ে সে যেনো গোটা রাত নামায পড়লো।[১৫] [মুসলিম]

৫৮৩।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "গ্রাম্য লোকেরা তোমাদের মাগরিবের নামাযের নামের উপর যেনো বিজয়ী না হয়ে যায়।" বর্ণনাকারী বলেন, "গ্রাম্য লোকেরা সেটাকে 'এশা' বলতো।[১৬] আরো এরশাদ ফরমায়েছেন, "গ্রাম্য লোকেরা যেনো তোমাদের এশার নামাযের নামের উপর বিজয়ী না হয়ে যায়। কেননা, তা আল্লাহ্র কিতাবে 'এশা' নামে খ্যাত।[১৭] আর গ্রাম্য লোকেরা উটের দুধ দোহন করার কারণে দেরী করে।[১৮] [মুসলিম]

এ থেকে বুঝা গেলো যে, যে মুসলমান ওই দু'টি নামাযে আলস্য করে, তারা মুনাফিক্বদের মতো কাজ করে।

১৫. এর দু'টি অর্থ হতে পারে–

এক. জমা'আত সহকারে এশার নামাযের সাওয়াব অর্দ্ধরাতের ইবাদতের সমান। আর জমা'আত সহকারে ফজরের নামাযের সাওয়াব বাকী অর্দ্ধরাতের ইবাদতের সমান। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দু'নামায জমা'আত সহকারে পড়ে নেয়, সে গোটা রাত ইবাদতের সাওয়াব পায়।

দুই. এশার জমা'আতের সাওয়াব অর্দ্ধরাতের সমান আর ফজরের জামা'আতের সাওয়াব গোটা রাতের সমান। কেননা, এ নামায এশার নামায অপেক্ষা বেশী ভারী (কষ্টসাধ্য)। প্রথমোক্ত অর্থ বেশী গ্রহণযোগ্য। 'জমা'আত' মানে প্রথম তাকবীর পাওয়া। এটা কোন কোন আলিমের অভিমত।

১৬. عِشَاء عَشِىٌّ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ রাতের বেলা। এ কারণে রাতের আহারকে আরবীতে عَشَاء ('আশা) বলা হয়। অর্থাৎ রাতের প্রথম নামায, অথবা রাতের খাদ্য আহার করার সময়ের নামায। কেননা, এতে পার্থিব কাজের দিকে সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে, সেটাকে অপছন্দ করেছেন।

১৭. ক্বোরআন শরীফে এরশাদ হয়েছে–

مِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ (এশার নামাযের পর; ২৪:৫৮)। এ থেকে বুঝা গেলো যে, মহান রবের প্রদত্ত নাম বদলানো অতি মন্দ। এ থেকে ওইসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা চাই, যারা খ্রিস্টানদের অনুসরণে নিজেদেরকে 'মোহাম্মেডান' বলে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের দ্বীনের নাম ইসলাম আর আমাদের নাম 'মুসলিমীন' রেখেছেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে– هُوَسَمّٰكُمُ مُسْلِمِيْنَ (তিনি তোমাদের নাম মুসলিমীন

وَعَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰـهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ مَلَاَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ ◆ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

৫৮৪।। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের দিন এরশাদ করেছেন,[১৯] "তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী অর্থাৎ আসরের নামায পড়তে বাধা দিয়েছে। আল্লাহ্ তাদের ঘর ও কবরগুলোকে আগুনে ভর্তি করে দিন!"[২০] [মুসলিম, বোখারী]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫৮৫।। হযরত ইবনে মাস্'উদ ও হযরত সামুরাহ্ ইবনে জুনদাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "মধ্যবর্তী নামায হচ্ছে আসরের নামায।"[২১] [তিরমিযী]

রেখেছেন; ২২:৭৮)। আরো এরশাদ ফরমান– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (নিশ্চয় দ্বীন আল্লাহ্র নিকট ইসলামই; ৩:১৯)।

১৮. অর্থাৎ ওইসব লোক এশার নামাযকে 'আতামাহ্' এজন্য বলে যে, 'আতম' (عتم) মানে রাতের ঘন অন্ধকার। বস্তুতঃ নামায হচ্ছে 'নূর' (জ্যোতি)। 'আলো'কে 'অন্ধকার' বলা মন্দই।

তাছাড়া, ওইসব লোক তখন তাদের উটগুলোর দুধ দোহন করতো। সুতরাং এর অর্থ হলো– উটের দুধ দোহন করার সময়ের নামায। এতেও ইবাদতকে আদত (অভ্যাস)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তাই নিষিদ্ধ।

১৯. এ যুদ্ধের নাম 'আহযাবের যুদ্ধ'। যেহেতু এ জিহাদে হযরত সালমান ফার্সীর পরামর্শের কারণে মদীনা মুনাওয়ারার হেফাযতের জন্য এর আশেপাশে খন্দক খনন করা হয়েছিলো, সেহেতু এর নাম 'খন্দকের যুদ্ধ' হয়েছে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এ যুদ্ধ ৫ম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে কিন্তু ইমাম বোখারীর গবেষণা অনুসারে হয়েছে– ৪র্থ হিজরীতে। এ খন্দক খনন করতে পনর কিংবা বিশ দিন সময় লেগেছে। তখন ক্বোরাঈশ, গাত্বফান এবং ইহুদীগণ, মোট কথা সবধরনের কাফিরগণ মিলিত হয়ে মুসলমানদের উপর চড়াও হয়েছিলো। এ কারণে ওই যুদ্ধকে আহযারের যুদ্ধ বলা হয়। অর্থাৎ সব ধরনের কাফিরদের হামলা। মুসলমানদের উপর তখনকার সময় অত্যন্ত সংকটের ছিলো। তাঁরা অতি পরিশ্রম করে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রয়ে খন্দক খনন করেছেন। এমনকি কোন কোন দিন বেশী ব্যস্ততার কারণে নামাযও ক্বাযা হয়ে গেছে।

২০. অর্থাৎ তাদের হামলার কারণে আমাদেরকে খন্দক খনন করতে হয়েছে। এতে ব্যস্ত হয়ে যাবার কারণে আমাদের নামাযগুলো, বিশেষ করে, আসরের নামায ক্বাযা হয়ে গেছে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, 'সালাত-ই ভুসত্বা' (মধ্যবর্তী নামায), যার জন্য ক্বোরআন শরীফে খুব তাকীদ দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে আসরের নামাযই। বেশীরভাগ ইমামের এ-ই অভিমত। আমাদের ইমাম-ই আ'যমও একথাই বলেছেন।

স্মর্তব্য যে, উহুদের যুদ্ধে হুযূর শারীরিকভাবে খুবই আহত হন; কিন্তু ওখানে হুযূর কাফিরদেরকে এ অভিশাপ করেন নি। এখানে নামায ক্বাযা হবার কারণে এ অভিসম্পাত করেছেন। বুঝা গেলো যে, হুযূরের নিকট নামায প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় ছিলো।

তাছাড়া, এ অভিসম্পাত দ্বারা ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিলো; বাস্তবিক পক্ষে অভিসম্পাত করা উদ্দেশ্য

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا، قَالَ تَشْهَدُهٗ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ۔

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ قَالَا اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الظُّهْرِ. رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْهُمَا تَعْلِيْقًا۔

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّىْ صَلٰوةً اَشَدَّ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا فَنَزَلَتْ :

৫৮৬।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন, "ফজরের নামায হাযির হবার সময়।" তিনি এরশাদ ফরমান, "এতে রাত ও দিনের ফিরিশ্‌তাগণ হাযির হয়।"[২২] [তিরমিযী]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫৮৭।। হযরত যায়দ ইবনে সাবিত এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, "মধ্যবর্তী নামায হচ্ছে যোহর।"[২৩] ইমাম মালিক হযরত যায়দ থেকে এবং ইমাম তিরমিযী ওই দু'জন থেকে 'তা'লীক্ব' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[২৪]

৫৮৮।। হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায দ্বি-প্রহরে পড়তেন।[২৫] হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের নিকট কোন নামায এর চেয়ে বেশী কঠিন ছিলো না। তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে,

ছিলো না। এ কারণেই খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন কোন কাফির পরবর্তীতে ঈমান নিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছে। যদি অভিসম্পাত উদ্দেশ্য থাকতো, তবে তাদের মধ্যে কারো ভাগ্যে ঈমান জুটতো না।

স্মর্তব্য যে, এ যুদ্ধে শুধু একবার আসরের নামায ক্বাযা হয়েছিলো। আরেকবার চার ওয়াক্তের নামায। সুতরাং বোখারী ও তিরমিযী'র বর্ণনার মধ্যে পরস্পর বিরোধ নেই।

২১. কেননা, এ নামায দিন ও রাতের নামাযগুলোর মধ্যবর্তীই। তাছাড়া, ওই ওয়াক্বতে দিন ও রাতের ফিরিশ্‌তাগণ একত্রিত হন। অনুরূপ, তখন পার্থিব কাজ-কারবার জোরেশোরে হতে থাকে। এ কারণে এর প্রতি তাকীদ বেশী করা হয়েছে। বেশীর ভাগ সাহাবীর অভিমত এটাই।

২২. এ ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে- ক্বোরআন মজীদে 'ক্বোরআন-ই ফজর' দ্বারা 'ফজরের নামায' এবং 'মাশহুদ' দ্বারা 'দিন ও রাতের ফিরিশ্‌তাদের হাযির হবার সময়' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু ফজরের সময় দু'ধরনের ফিরিশ্‌তা একত্রিত হন, সেহেতু সেটা অত্যন্ত যত্নসহকারে নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করতে থাকো। বুঝা গেলো যে, যে নামাযে আল্লাহ্‌র দরবারে মাক্ববূল বান্দা থাকে, ওই নামায বেশী ক্ববূল হয়।

যেসব লোক বলেন যে, বুযুর্গদের মাযারসমূহের পাশে নামায বেশী উত্তম, তাঁরা এ কারণেই বুযুর্গদের আস্তানার পাশে মসজিদসমূহ নির্মাণ করেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে এ-ই আয়াত।

২৩. কেননা, তা দিনের মধ্যভাগে সম্পন্ন করা হয়। খুব সম্ভব ওই বুযুর্গগণ আভিধানিক অর্থ অনুসারে সেটাকে মধ্যবর্তী নামায বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁদের নিকট পূর্বোল্লেখিত

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى، وَقَالَ اِنَّ قَبْلَهَا صَلٰوتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلٰوتَيْنِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوٗدَ۔

وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهٗ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ وَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُوْلَانِ الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الصُّبْحِ. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّا وَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّ ابْنِ عُمَرَ تَعْلِيْقًا۔

وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ غَدَا اِلٰى صَلٰوةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْاِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا اِلَى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ اِبْلِيْسَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ۔

"সমস্ত নামাযের প্রতি, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি যত্নবান হও।" আরো এরশাদ ফরমান, "এর পূর্বে দু'রাক'আত নামায আছে। এরপরেও দু'রাক'আত নামায রয়েছে।"[২৬] [আহমদ, আবূ দাউদ]

৫৮৯।। হযরত মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি জানতে পেরেছেন যে, হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলছিলেন, "মধ্যবর্তী নামায হচ্ছে ফজরের নামায।"[২৭] [মুআত্তা] আর ইমাম তিরমিযী এটা হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে ওমর থেকে 'তা'লীক্ব' সূত্রে (সনদ উল্লেখ না করে) বর্ণনা করেছেন।

৫৯০।। হযরত সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের দিকে গেলো, সে ঈমানের ঝাণ্ডা নিয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি ভোরেই বাজারের দিকে গেলো, সে শয়তানের ঝাণ্ডা নিয়ে গেলো।"[২৮] [ইবনে মাজাহ্]

মারফূ' হাদীস পৌঁছে নি। 'মধ্যবর্তী নামায' সম্পর্কে সাহাবা-ই কেরামের বড় মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, "তা হচ্ছে ফজরের নামায, কারো কারো মতে, যোহরের নামায, কারো কারো ধারণা মতে, মাগরিব কিংবা এশা। কিন্তু আসরের নামায বলে যেই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে তাই প্রাধান্য পেয়েছে।

২৪. 'সনদ' ছাড়া হাদীস বর্ণনা করাকে 'তা'লীক্ব (تعليق) বলা হয়। যেমন ইমাম তিরমিযী বলেছেন, "হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ এটা বলেছেন।"

২৫. অর্থাৎ শীতকালে। আর যদি গ্রীষ্মকালে পড়েন, তবে তাও জায়েয বলে বর্ণনা করার জন্য পড়েন। কেননা, পূর্ববর্তী হাদীসগুলোর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযূর শীতকালে যোহর বিলম্ব না করে পড়তেন আর গ্রীষ্মকালে পড়তেন দেরী করে।

২৬. এ থেকে বুঝা গেলো যে, 'মধ্যবর্তী নামায' হচ্ছে– যোহরের নামায। এটাও একটা অভিমত। খুব সম্ভব হযরত সাবিত এটা তাঁর ইজতিহাদ থেকে বলেছেন। অর্থাৎ দিন ও রাতের একেকটি নামায যোহরের পূর্বে রয়েছে– এশা ও ফজর, আর একেকটি নামায রয়েছে যোহরের পর– আসর ও মাগরিব।

২৭. এসব বুযুর্গের মতে 'ভুস্ত্বা' মানে শ্রেষ্ঠতম। যেমন– এরশাদ হয়েছে– وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا (এবং অনুরূপ, তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠতম উম্মত করেছি; ২:১৪২) অর্থাৎ যেহেতু এ নামায বহু কারণে অন্যান্য নামায

بَابُ الْاَذَانِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوْا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَاكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فَاُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُّوْتِرَ الْاِقَامَةَ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ فَذَكَرْتُهٗ لِاَيُّوْبَ فَقَالَ اِلَّا الْاِقَامَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

অধ্যায় ঃ আযান[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৫৯১।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ আগুন ও ঘন্টা বাজানোর কথা উল্লেখ করেছেন। তখন ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কথা উল্লেখ করা হলো।[২] অতঃপর হযরত বেলালকে নির্দেশ দেওয়া হলো যেনো আযানের কলেমাগুলো দু'বার করে বলেন এবং তাকবীরের বলেন একবার করে।[৩]

ইসমা'ঈল বলেন, "আমি এটা আইয়ূবের নিকট উল্লেখ করেছি।" তখন বললেন, "ইক্বামত ব্যতীত।"[৪] [মুসলিম, বোখারী]

থেকে উত্তম, সেহেতু মধ্যবর্তী (শ্রেষ্ঠতম) নামায এটাই।

স্মর্তব্য যে, যেহেতু হযরত আলী মুরতাদ্বা খোদ্ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, 'মধ্যবর্তী নামায আসর', সেহেতু এখানে ফজরকে 'ভুস্ত্বা' বলা অন্য অর্থে হবে। সুতরাং তাঁর এ কথার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কারণ হযরত শের-ই খোদা প্রথমে এটা বলেছিলেন, তারপর পূর্ববর্তী মারফূ' হাদীস শুনে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

২৮. অর্থাৎ মানুষের দু'টি দল- 'হিয্বুল্লাহ্' (আল্লাহ্র দল) ও 'হিয্বুশ্ শয়তান' (শয়তানের দল)।

উভয়ের পরিচয় হচ্ছে- 'রাহমানী দল'-এর লোকেরা দিনের প্রারম্ভ নামায ও আল্লাহ্র যিক্র দ্বারা করেন। আর 'শয়তানী দল'-এর লোকেরা আরম্ভ করে বাজার ও দুনিয়াবী কাজ-কারবার দ্বারা।

স্মর্তব্য যে, পার্থিব কাজ-কারবার নিষিদ্ধ নয়; কিন্তু ভোরে উঠতেই এমন হওয়া যে, না আল্লাহ্র নাম, না তাঁর ইবাদত; বরং ওইগুলোতে লেগে যাওয়াই শয়তানী কাজ।

****

১. আযানের আভিধানিক অর্থ ঘোষণা দেওয়া এবং সাধারণভাবে জানিয়ে দেওয়া। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন, اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ (আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা; ৯:৩)। আরো এরশাদ ফরমান, فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ (একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করলো; ৭:৪৪)।

শরীয়তের পরিভাষায়, বিশেষ শব্দাবলী দ্বারা নামাযের জন্য ঘোষণা দেওয়ার নাম হচ্ছে- আযান। সর্বপ্রথম আযান হযরত জিব্রাঈল আমীন মি'রাজের রাতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে দিয়েছেন, যখন হুযূর সমস্ত নবীকে নামায পড়িয়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে হিজরতের পর, প্রথম হিজরী সালে আযান আরম্ভ হয়েছে। এর ঘটনা সামনে আসছে। [দুররে মুখ্তার]

স্মর্তব্য যে, আযান পঞ্জেগানা নামায ও জুমু'আহ্ ব্যতীত অন্য কোন নামাযের জন্য সুন্নাত নয়। নামায ব্যতীত নয় জায়গায় আযান বলা মুস্তাহাব- এক. (নবজাত) শিশুর কানে, দুই. আগুন লাগলে ওই সময়, তিন. যুদ্ধে, চার. জিন্দের দাপটপূর্ণ উৎপাতের সময়, পাঁচ. দুঃখিত ও ছয়. ক্রোধান্বিত লোকের কানে, সাত. মুসাফির যখন রাস্তা ভুলে যায়, আট. মুমূর্ষ ব্যক্তির পাশে এবং নয়. মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের পাশে। [দুররে মোখ্তার ও শামী]

'মিরক্বাত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আলী মুরতাদ্বা

وَعَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ اَلْقٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهٖ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ

৫৯২।। হযরত আবূ মাহযূরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,[৫] তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট স্বয়ং আযান উপস্থাপন করেছেন। (আর এরশাদ করেছেন) এভাবে বলো, আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশ্হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ আশ্হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্। তারপর

বলেন, একদিন হুযূর আমাকে পেরেশান অবস্থায় দেখতে পেলেন। এরশাদ ফরমালেন, "আলী! নিজের কানে কারো মাধ্যমে আযান বলিয়ে নাও। নামাযের আযান ইসলামের বিশেষ আলামত। যদি কোন মানবগোষ্ঠী আযান ছেড়ে দেয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যেতে পারে।"

স্মর্তব্য যে, ইমাম আ'যমের মতে, আযান ও তাকবীর (ইক্বামত) এক সমান। 'তাকবীর' (ইক্বামত)-এ শুধু 'ক্বাদ্ ক্বা-মা-তিস্ সালাত' বেশী।

২. অর্থাৎ হিজরতের পর নামায সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়ার কোন নিয়ম ছিলো না। আন্দাজ করে মুসলমানগণ মসজিদে একত্রিত হয়ে যেতেন এবং জমা'আত হয়ে যেতো। যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো, তখন সাহাবীগণ নামায সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা ভাবলেন। কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন- 'নামাযের সময় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হোক।' এর উপর আপত্তি হলো। কারণ, এটা ইহুদীদের প্রথা। কেউ কেউ বললেন, 'ঘন্টা বাজানো হোক।' এর উপরও আপত্তি হলো। কারণ, সেটা খ্রিষ্টানদের প্রথা। তারা তাদের উপাসনার সময় হলে ঘন্টা বাজায়। ইসলামী ঘোষণা এর চেয়ে স্বতন্ত্র হওয়া চাই। স্মর্তব্য যে, কিছু কিছু ইহুদী তাদের উপাসনার সময় হলে শিঙ্গা কিংবা বিউগল বাজাতো আর কেউ কেউ আগুন জ্বালাতো। এখানে তাদের একটি দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. এ হাদীস ওইসব লোকের দলীল, যারা তাকবীরের (ইক্বামত) কলেমা একবার করে বলে। যেমন, শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারীরা এবং বর্তমানকার (সালাফী) ওহাবীরা। কিন্তু তাদের এ দলীল অত্যন্ত দুর্বল। কেননা, এখানে আযানে 'তারজী'-এর উল্লেখ নেই। অথচ এসব হযরত আযানে তারজী'র পক্ষে অভিমত দিয়ে থাকেন। তাছাড়া, এ হাদীস শরীফ থেকে একথা অপরিহার্য হয় যে, তাকবীর (ইক্বামত)-এর সমস্ত কলেমা একেকবার করে বলা হোক! অথচ এসব হযরতও 'আল্লাহু আকবার' চারবার এবং 'ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালাত' দু'বার বলে থাকেন। প্রকাশ থাকে যে, এখানে 'আযান' ও 'তাকবীর' মানে শরীয়তের পরিভাষার 'আযান' নয়; আভিধানিক 'ঘোষণা দেওয়াই।' অর্থাৎ হুযূর ওই সময় এ নির্দেশই দিয়েছিলেন যেন হযরত বেলাল মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে বারংবার নামাযের ঘোষণা দেন।

আর যখন মুসাল্লীগণ মসজিদে একত্রিত হয়ে যান এবং জমা'আত কায়েম হতে থাকে, তখন মসজিদে উপস্থিত সবাইকে একত্রিত করার জন্য একবার বলে দেন, "উঠো! জমা'আত প্রস্তুত।" অন্যথায় শরীয়তসম্মত আযান তো হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ প্রমুখ সাহাবী স্বপ্নে দেখেছিলেন। তাঁরা তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পেশ করেছেন। তখন সর্বপ্রথম তা ফজরের নামাযের সময় দেওয়া হয়েছিলো। সুতরাং এ হাদীস শরীফ ওইসব বুযুর্গের পক্ষে দলীল কখনো হতে পারে না।

৪. অর্থাৎ তাকবীর-এর সমস্ত কলেমা একবার করে বলা হবে; কিন্তু 'ক্বাদ্ ক্বা-মাতিস্ সালাত' দু'বার। এখনো এ হাদীস সালাফী-ওহাবীদের দলীল হতে পারে না; কেননা,এখানে اِلَّا الْاِقَامَةَ (ইক্বামত ব্যতীত) বাক্যাংশটি বর্ণনাকারী আইয়ূবের নিজস্ব কথা; হুযূরের পবিত্র শব্দাবলী

تَعُوْدُ فَتَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

ফিরে আসলে বলবে- আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্, আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্। আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্।[৬] হাইয়্যা আলাস্ সোয়ালা-হ্, হাইয়্যা আলাস সোয়ালা-হ্। হাইয়্যা আলাল ফালা-হ্, হাইয়্যা আলাল ফালা-হ্। আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্।[৭] [মুসলিম]

নয়। তাছাড়া; 'আল্লাহু আকবর' চার বার বলার বর্ণনা এখনো আসে নি।

৫. তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁর নাম সামুরা কিংবা আউস অথবা সালমান কিংবা সালমা। তিনি তাঁর উপনাম (কুনিয়াত)-এ প্রসিদ্ধ হন। তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য বিবরণ ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

৬. এর নাম হচ্ছে- তারজী' অর্থাৎ আযানে 'আশ্‌হাদু'-এর বাক্যগুলো প্রথমে দু'বার আস্তে বলা তারপর উচ্চস্বরে দু'বার বলা। এটা শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারীদের মতে সুন্নাত; হানাফীদের মতে নয়। দলালাদি এক্ষুনি আসছে।

৭. এ হাদীস সালাফী-ওহাবীদের চূড়ান্ত দলীল এমর্মে যে, আযানে তারজী' আছে। ইমাম-ই আ'যম বলেছেন, "আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দের স্বপ্নে যে ফিরিশ্‌তা আযানের তা'লীম দিয়েছেন, তাতে তারজী' ছিলো না। তাছাড়া, খোদ্ আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ যখন ওই স্বপ্ন নবী পাকের মহান দরবারে পেশ করেছেন, তখন তাতেও তারজী' ছিলো না। তদুপরি, হযরত বেলাল, যিনি সমস্ত মুআয্‌যিনের ইমাম, তাঁর আযানেও তারজী'র কথা উল্লেখ করা হয় নি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম, যিনি মসজিদে নবভী শরীফের নায়েবে মুআয্‌যিন ছিলেন, তাঁর আযানেও তারজী' ছিলো বলে বর্ণিত হয় নি। হযরত সা'দ ক্বোরাযী, মসজিদে ক্বোবার মুআয্‌যিন-এর আযানেও তারজী'র কথা উল্লেখ করা হয় নি। বাকী রইলো আবূ মাহযূরার হাদীস। তাঁর বর্ণনাগুলোর মধ্যে ভীষণ স্ববিরোধিতা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে 'ইদ্বত্বিরাব' (পরস্পর ভিন্নতা) রয়েছে। ইদ্বত্বিরাব ও ই'তিরাদ্ব বিশিষ্ট হাদীস অনুসারে আমল করা যায় না। সুতরাং ইমাম ত্বাবরানী ওই আবূ মাহযূরা থেকে যে আযান উদ্ধৃত করেছেন, তাতেও তারজী' নেই। ইমাম ত্বাহাভী আবূ মাহযূরার আযানে দু'বার আল্লাহু আকবর-এর কথা উল্লেখ করেছেন। আর এখানে তারজী'রও উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া, সাহাবা-ই কেরাম আবূ মাহযূরার বর্ণনা অনুসারে আমল করেন নি। সুতরাং হযরত আলী, হযরত বেলাল, হযরত সাওবান, হযরত সালমাহ্ ইবনে আক্ওয়া' প্রমুখ (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হুম) আযান ও তাকবীরের কলেমাগুলো দু'বার করে বলতেন ও বলতে নির্দেশ দিতেন। 'ইনায়াহ্ শরহে হিদায়াহ্'য় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবূ মাহযূরার মধ্যে কুফরের যুগে তাওহীদ ও রিসালতের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা ছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আযান দেওয়ার নির্দেশ পেলেন। তখন তিনি লজ্জার কারণে শাহাদত-এর কলেমাগুলো আস্তে আস্তে বলে গেলেন। তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আবার জোরে শোরে বলো।"

'ফাত্‌হুল ক্বাদীর'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবূ মাহযূরা শাহাদতের বাক্য দু'টির 'মদ্দ' বাদ দিয়ে বলেছিলেন। এ কারণে তাঁকে এ কলেমাগুলো পুনরায় বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমার এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে হযরত আবূ মাহযূরার হাদীসে না 'তা'আ-রুদ্ব' থাকবে, না 'ইদ্বত্বিরাব।' কেননা, তারজী' বিশিষ্ট বর্ণনাগুলোতে বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর অন্যসব বর্ণনায় সাধারণ অবস্থাদির কথা। (সুতরাং সাধারণ অবস্থার বর্ণনা সম্বলিত হাদিসগুলোই আমলের বেশী উপযোগী হবে।) এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' : দ্বিতীয় খণ্ডে দেখুন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ اَنَّه كَانَ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَآئِىُّ وَالدَّارِمِىُّ-

وَعَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَه الْاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَّ الْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَآئِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَاِبْنُ مَاجَةَ-

وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ سُنَّةَ الْاَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَاسِه

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫৯৩।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় আযান দু' দু'বার ছিলো এবং তাকবীর ছিলো একেক বার– এটা ব্যতীত যে, মুআয্যিন বলতো, "ক্বাদ্ ক্বা-মাতিস্ সালাত', ক্বাদ্ ক্বা-মাতিস্ সালাত।"[৮] [আবূ দাঊদ, নাসায়ী, দারেমী]

৫৯৪।। হযরত আবূ মাহযূরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আযানের উনিশটা কলেমা শিক্ষা দিয়েছেন। আর তাকবীরের সতের কলেমা।[৯] [আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ্]

৫৯৫।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আমাকে আযানের সুন্নাত শিক্ষা দিন।[১০] (বর্ণনাকারী) বলেছেন, অতঃপর হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার সম্মুখ ভাগের উপর হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন।[১১]

---

৮. অর্থাৎ আযানের কলেমাগুলো দু' দু'বার বলা হতো। আর ইক্বামতের কলেমাগুলো একেকবার। স্মরণ রাখবেন, এ হাদীস যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে হয়তো, তা মানসূখ, নতুবা ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া অপরিহার্য। বিরুদ্ধবাদীরা এটা দ্বারা কখনো তাদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কেননা, তারা আযানের উভয় শাহাদতের মধ্যে তারজী'তে বিশ্বাসী, যাতে এ দু'টি কলেমা চার চার বার বলা হয়; অথচ এখানে এসেছে আযানের সমস্ত কলেমা দু'দু'বার বলা হতো। তাছাড়া, তাঁরা ইক্বামতের মধ্যে প্রথমে তাকবীর চারবার এবং শেষভাগে দু'বার বলেন, কিন্তু এখানে এসেছে ইক্বামতের সমস্ত কলেমা একেকবার। অনুরূপ, যদি তাকবীরের কলেমাগুলো একেকবার হতো, তবে সাহাবা-ই কেরাম হুযূরের পর এ আমল ছেড়ে দিতেন না।

বায়হাক্বী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী মুরতাদ্বা এক ব্যক্তিকে দেখেছেন যে, সে ইক্বামতের কলেমাগুলো একবার করে বলছে, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। আর বললেন, "সেগুলোকে দু'দু'বার বলো! তোমার মা মরে যাক! দু'দু'বার বলো!"

এখন দু'টি পন্থা আছে– হয়তো এ হাদীসকে 'মানসূখ' বলে মেনে নেবে; যার 'নাসিখ' (রহিতকারী) হচ্ছে পরবর্তী হাদীস; নতুবা সেটার এ ব্যাখ্যা দেওয়া হবে যে, এটা কোন স্থায়ী আমল (কাজ) ছিলো না, বরং কখনো কোন কারণবশতঃ করা হয়েছিলো। অথবা 'আযান' ও ইক্বামত'-এর আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হবে। যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. হানাফীদের মতে, আযানের কলেমা হচ্ছে পনরটি। আর ইক্বামতের সতেরোটি। এ হাদীস ইক্বামতের কলেমাগুলো দু' দু'বার হবার পক্ষে হানাফীদের মজবুত দলীল। কেননা, যদি এর কলেমাগুলো একবার করে হতো, তবে কলেমা হতো তেরটি, সতেরোটি হতো না। সুতরাং এ হাদীস পূর্ববর্তী

قَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ،حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ،حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَاِنْ كَانَ صَلٰوةُ الصُّبْحِ قُلْتَ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ ـ

وَعَنْ بِلَالٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُثَوِّبَنَّ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ اِلَّا

এরশাদ ফরমালেন, তুমি বলবে, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার– উচ্চ স্বরে।" তারপর বলবে, "আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্, আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্। আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্– নিম্নস্বরে।" তারপর 'শাহাদত' সহকারে আপন আওয়াজকে উঁচু করে।[১২] আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্, আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্! আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্, হাইয়্যা আলাস্ সোয়ালাহ্, হাইয়্যা আলাস্ সোয়ালাহ্। হাইয়্যা আলাল ফালাহ্, হাইয়্যা আলাল ফালাহ্। যদি ফজরের নামায হয়, তাহলে এটাও বলে নাও– 'আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান্ নাওম, আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান্ নাওম।' আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলা-হা-ইল্লাল্লাহ্। [আবূ দাউদ]

৫৯৬।। হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, "তাসভীব' করো না[১৩]

হযরত ইবনে ওমরের হাদীসের জন্য 'নাসিখ'। বাকী রইলো আযানের উনিশ কলেমা। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি দু'শাহাদতের কলেমাগুলো ক্ষীনস্বরে বলেছিলেন। এ কারণে পুনরায় উচ্চস্বরে বলানো হয়েছে। ওই দিন উনিশ কলেমা বলেছেন। সুতরাং এ হাদীস পূর্ববর্তী হযরত ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থী নয়।

১০. প্রকাশ থাকে যে, 'সুন্নাত' মানে শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাত। সুতরাং এটা ইমাম আ'যমের দলীল– এ মর্মে যে, আযান সুন্নাত। অবশ্য, যেহেতু সেটা দ্বীনের অনিবার্য আলামত, সেহেতু তা ছেড়ে দিলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে।

১১. স্নেহের ভিত্তিতে, তাঁর মধ্যে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দেখে। বুঝা গেলো যে, হুযূরের নিকট শিক্ষার্থী অত্যন্ত প্রিয়।

১২. এতে ওই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হতে পারে না, যা আমি উপস্থাপন করেছি, তা হচ্ছে– এখানেও ঘটনাচক্রে তারজী' হয়েছে। কেননা, এখানে তো তারজী'র নিয়ম বলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইতোপূর্বে আরয করা হয়েছে যে, হযরত আবূ মাহযূরার হাদীসগুলো 'মুদ্বতারিব' ও 'মুতা'আ-রিদ্ব' বা পরস্পর বিরোধী আর সাহাবা-ই কেরামের আমল হচ্ছে স্বপ্নের আযান অনুসারে, যা ফিরিশ্‌তা শিক্ষা দিয়েছেন। তাছাড়া, সেটা হযরত বেলালের আযানেরও বিরোধী।

فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ الرَّاوِىُّ لَيْسَ هُوَ بِذٰلِكَ الْقَوِىُّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ.

وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْاٰكِلُ مِنْ اَكْلِهٖ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهٖ وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهٖ وَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى

ফজরের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযে।"[১৪] [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ] ইমাম তিরমিযী বলেন, মুহাদ্দিসগণের মতে আবূ ইস্রাঈল বর্ণনাকারী মজবুত (নির্ভরযোগ্য) নয়।[১৫]

৫৯৭।। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলালকে বললেন, "যখন তুমি আযান বলো, তখন থেমে থেমে বলো। আর যখন তাকবীর বলো তখন তাড়াতাড়ি বলো।[১৬] আর তোমার আযান ও ইক্বামতের মধ্যভাগে এতটুকু ব্যবধান রাখো, যেন আহারকারী আপন আহার করা থেকে, পানকারী তার পান করা থেকে এবং শৌচকর্ম সম্পন্নকারী যখন শৌচকর্ম সম্পন্ন করতে যায়,[১৭] তখন যেনো তা সম্পন্ন করে নিতে পারে। আর কাতারে দাঁড়াবে না যতক্ষণ না

সুতরাং তদনুসারে আমল করা সম্ভবপর নয়। [মিরক্বাত ইত্যাদি]

১৩. এটা হচ্ছে অভ্যন্তরীন 'তাসভীব' (অর্থাৎ নামাযের জন্য আহ্বানের পর আহ্বান)। ফজর ব্যতীত অন্য কোন আযানের ক্ষেত্রে বলা 'বিদ'আত-ই সাইয়্যিআহ্' (মন্দ বিদ্'আত)। অবশ্য, আযান ও ইক্বামতের মধ্যখানে 'তাসভীব'কে পরবর্তী আলিমগণ 'মুস্তাহাব' মনে করেছেন। (ফিক্বহ্র কিতবাদি, মিরক্বাত]

এ 'তাসভীব'-এর জন্য শব্দাবলী নির্দ্ধারিত নেই। মুসলমান যা চাইবে নির্দ্ধারণ করে নেবে। কোন কোন স্থানে 'আস্‌সালাতু ওয়াস্ সালামু আলায়কা এয়া রসূলাল্লাহ্' পড়ে নেয়। এটাও ঠিক আছে। কারণ, এটা দুরূদও, তাস্‌ভীবও।

১৪. অর্থাৎ 'আস্-সালাতু খায়রুম মিনান্ নাওম' (ঘুম থেকে নামায ভালো) অন্য কোন আযানে বলো না। হযরত আলী মুরতাদ্বা এক মুআয্‌যিনকে এটা বলতে শুনেছেন। আর বলেছেন, "এ বিদ্'আতী (নব আবিষ্কৃত মন্দ কাজ সম্পন্নকারী)-কে মসজিদ থেকে বের করে দাও।"

১৫. মিরক্বাত প্রণেতা বলেছেন, সে রাফেযী (শিয়া) ছিলো। সে 'সাহাবা-ই কেরাম' বিশেষ করে হযরত ওসমানের ঘোর শত্রু ছিলো।

স্মর্তব্য যে, আলিমগণ এ অভ্যন্তরীণ 'তাসভীব'-কে মাকরূহ মনে করেন। তবে তা এ দুর্বল হাদীসের কারণে নয়, বরং অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীসের কারণে।

১৬. সমস্ত ইমামের এর উপর আমল রয়েছে। আযানের কলেমাগুলোর মধ্যে মদ্দ্ ও তাশ্‌দীদ-এর প্রতি যত্নবান হওয়া ও কলেমাগুলোর মধ্যে ফাঁক দেওয়া হয়, কিন্তু তাকবীরের মধ্যে ত্বরা করতে হয়। এ পার্থক্যের যুক্তিগত হিকমত বা রহস্য বুঝা যায় নি। তবুও এটা যেহেতু সরকার-ই দু'জাহানের ফরমান, সেহেতু তা শির ও চোখের উপর। হতে পারে, যেহেতু তাকবীরের মধ্যে মসজিদে উপস্থিত ওই মুসল্লীদেরকে একত্রিত করা হয়, যাঁরা আগে থেকে প্রস্তুত, সেহেতু তাঁদেরকে দেরীক্ষণ যাবত অবগত করানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু আযানের মধ্যে অলস-উদাসীনদেরকে খবর দেওয়া হয়। সুতরাং তাতে দেরীক্ষণ যাবত আওয়াজ পৌঁছাতে হয়।

১৭. এ ব্যবধান রাখা মাগরিবের আযান ব্যতীত অন্যান্য নামাযে প্রযোজ্য। মাগরিবের আযানের অব্যবহিত পরে তাকবীর আরম্ভ করে দিতে হয়।

স্মর্তব্য যে, আযান ও তাকবীরের মধ্যে এ ব্যবধান এতটুকু হওয়া চাই যেনো বে-ওযূ ব্যক্তি ইস্তিঞ্জা ও ওযূ করে চার

تَرَوْنِى. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ ـ وَقَالَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُوْلٌ ـ

وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ أَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أُذِّنَ فِى صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَأَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ ـ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ

আমাকে দেখবে।[১৮] এটা ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। আর বলেছেন, "এটা আমি আবদুল মুন'ইমের বর্ণিত হাদীস বলে জানি। বস্তুতঃ এটা অপরিচিত সনদ।"[১৯]

৫৯৮।। হযরত যিয়াদ ইবনে হা-রিস সুদাঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত,[২০] তিনি বলেন, আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেছেন, "আযান বলো!" আমি আযান বললাম। তারপর হযরত বেলাল তাকবীর বলতে চাইলেন। তখন হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "তোমার সুদাঈ ভাই আযান বলেছে। যে আযান বলবে, সে-ই তাকবীর বলবে।"[২১] [তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৫৯৯।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুসলমানগণ মদীনা মুনাওয়ারায় আসলেন,

---

রাক'আত সুন্নাত পড়তে পারে। আমাদের এখানে পনর মিনিটের ব্যবধান করা হয়। কোথাও কোথাও আধ ঘন্টারও।

১৮. ওই যুগে নিয়ম এ ছিলো যে, সাহাবা-ই কেরাম কাতারবন্দি হয়ে বসে যেতেন। হুযূর আপন হুজুরা মুবারকে তাশরীফ রাখতেন। 'মুকাব্বির' (মুআয্যিন) দাঁড়িয়ে তাকবীর (ইক্বামত) আরম্ভ করতেন। যখন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' পর্যন্ত পৌঁছতেন, তখন হুযূর হুজুরা মুবারক থেকে বাইরে তাশরীফ আনতেন এবং সাহাবা-ই কেরামকে দেখতে পেতেন। ফক্বীহগণ বলেন, নামাযী কাতারে 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বলার সময় দণ্ডায়মান হবে। তাঁদের দলীল হচ্ছে এই হাদীস। তাছাড়া ওই হাদীস, যা মিশকাত শরীফে মুসলিম ও বোখারীর বর্ণনার সূত্রে ২/৩ পৃষ্ঠার পর 'বাবুল মসজিদ'-এর কিছু পূর্বে আসছে।

১৯. আল্লামা ইবনে হাজর বলেছেন, সেটাকে হাকিম সহীহ্ বলেছেন। শায়খ আবদুল হক্ব বলেন, এ হাদীসের বহু সমর্থক হাদীস (شواهد) রয়েছে। এর সর্বশেষ বাক্য لَاتَقُوْمُوْا الخ (তোমরা দাঁড়িও না...) মুসলিম এবং বোখারীতেও রয়েছে। তাছাড়া এর উপর উম্মতের আমলও রয়েছে। সুতরাং এ হাদীস হাসান লি-গাইরিহী (পরোক্ষ কারণে গ্রহণযোগ্য)।

২০. সুদা' (صُدَاء) ইয়েমেনের একটা গোত্র। সেটার প্রতি সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাঁকে 'সুদাঈ' বলা হয়। তিনি বসরাবাসীদের মধ্যে গণ্য। তিনি হুযূরের পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এক/আধবার হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে আযানও বলেছেন।

২১. অর্থাৎ তাকবীর বলা আযানদাতার প্রাপ্য। শর্তব্য যে, ইমাম আ'যমের মাযহাব হচ্ছে- মুআয্যিনের অনুমতিক্রমে অন্য কেউ ইক্বামত বলতে পারে। তাছাড়া যদি একথা জানা থাকে যে, মুআয্যিন অন্য কেউ তাকবীর বললে নারায হবেন না, তাহলেও জায়েয। কেননা, বর্ণনাদিতে এসেছে যে, বহুবার হযরত বিলাল আযান দিয়েছেন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম তাকবীর বলেছেন। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। সুতরাং এ হাদীস ওই সময়ের

يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ لِلصَّلٰوةِ وَلَيْسَ يُنَادِىْ بِهَا اَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِتَّخِذُوْا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ اَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُّنَادِىْ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلٰوةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهٖ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلٰوةِ طَافَ بِىْ وَاَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِىْ يَدِهٖ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ قُلْتُ

তখন একত্রিত হয়ে নামাযের সময়গুলোর আন্দাজ করে নিতেন। নামাযগুলোর জন্য আযান কেউ দিতেন না। একদিন এ সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। কেউ কেউ বললেন, "খ্রিস্টানদের ঘন্টার মতো (ঘন্টা) বানিয়ে আনো।" কেউ কেউ বললেন, "ইহুদীদের বিউগলের মতো তৈরী করে আনো।" তখন হযরত ওমর বললেন, "কাউকে নামাযের জন্য আহ্বান করতে কেন পাঠাচ্ছেন না?"[২২] তখন হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "বেলাল ওঠো, নামাযের জন্য ডাকো।"[২৩] [মুসলিম, বোখারী]

৬০০।। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আবদি রাব্বিহী[২৪] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'নাকূস' (ঘন্টা বিশেষ) বানানোর নির্দেশ দিতে চাইলেন, যাতে তা নামাযের জমা'আতের জন্য লোকদের উদ্দেশে বাজানো হবে,[২৫] তখন স্বপ্নে একজন লোক আমার নজরে পড়লো, যে নিজের হাতে নাকূস (ঘন্টা) তুলে ধরেছিলো। আমি বললাম, "হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি কি 'নাকূস' বিক্রি করছো? সে বললো, সেটা দিয়ে তুমি কি করবে?" আমি বললাম,

জন্য প্রযোজ্য, যখন মুআয্যিন নারায হন। সুতরাং উভয় হাদীস বিশুদ্ধ।

২২. মহল্লাগুলোতে গিয়ে ডেকে আসবে– আর বলবে اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ (নামায সমেবতকারী অথবা হে মুসলমানগণ! নামায পড়ার জন্য জমা'আত প্রস্তুত হয়েছে)। এটা ওই শরীয়ত নির্দেশিত প্রসিদ্ধ আযান ছিলো না, যা এখন প্রচলিত। তা'তো হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দের স্বপ্নের বর্ণনানুসারে বলানো হয়েছে; যেমন পরবর্তী হাদীসে আসছে। সুতরাং হাদীস শরীফগুলোতে পারস্পরিক বিরোধ নেই। এ কারণে, তিনি আরয করেছিলেন– اَوَلَا تَبْعَثُوْنَ (পাঠাচ্ছেন না কেন)?

২৩. মুসলমানদের মহল্লাগুলোতে গিয়ে। এ হাদীসের ভিত্তিতে কোন কোন ইতিহাসবেত্তা ধোঁকা খেয়েছেন। তাঁরা আযানকে হযরত ওমরের অভিমত মনে করেছেন। এ ক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে তাই, যা এক্ষুনি বর্ণনা করা হয়েছে।

২৪. তিনি আন্সারী, খায্রাজী। দ্বিতীয় বায়'আত-ই আক্বাবায় সত্তরজন আনসারীর সাথে তিনিও ছিলেন। বদরসহ সমস্ত যুদ্ধে হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। তিনি নিজেও সাহাবী, তাঁর পিতামাতাও সাহাবী। তাঁর উপাধি 'সাহিব-ই আযান' (আযানের স্বপ্নদ্রষ্টা)। কারণ তাঁরই স্বপ্নের ভিত্তিতে ইসলামে আযান প্রবর্তিত হয়েছে। প্রথম হিজরীতে তিনি এ স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর দ্বিতীয় হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়েছে।

نَدْعُوْ بِهٖ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهٗ بَلٰى قَالَ فَقَالَ تَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَكَذَا الْاِقَامَةُ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهٗ بِمَارَاَيْتُ فَقَالَ اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْشَآءَ اللّٰهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَاَلْقِ عَلَيْهِ مَارَاَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهٖ فَاِنَّهٗ اَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ

তা দিয়ে আমরা নামাযের জন্য ডাকবো।"[২৬] সে বললো, "আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু বলে দেবো না?"[২৭] আমি বললাম, "হ্যাঁ, কেন বলবে না?" "তিনি বললেন, লোকটি বললো, 'আল্লাহু আকবর...' শেষ পর্যন্ত। আর এভাবে তাকবীর (ইক্বামত)ও।[২৮] যখন ভোর হলো, তখন আমি হুযূর-ই আনুওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্রতম দরবারে হাযির হলাম। তারপর যা কিছু দেখছিলাম সবই হুযূরের পবিত্র দরবারে আরয করলাম। হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা (অনুগ্রহ)ক্রমে এ স্বপ্ন সত্য।[২৯] তুমি বেলালের সাথে দাঁড়িয়ে যাও! যা কিছু স্বপ্নে দেখেছো তাকে বলতে থাকো অতঃপর সে আযান দেবে। কেননা, সে তোমার চেয়ে উচ্চ আওয়াজ সম্পন্ন।"[৩০] অতঃপর আমি হযরত বেলালের সাথে দণ্ডায়মান হলাম।

তখন তাঁর বয়স হয় ৬৪ বছর। তাঁকে মদীনা-ই পাকে দাফন করা হয়েছে।

২৫. এখানে 'নির্দেশ' মানে 'নির্দেশ দানের ইচ্ছা করা'। যেমন- মিরক্বাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে। বুঝা যাচ্ছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় ইচ্ছা 'নাক্ব ূস' (ঘন্টা) বাজানোর পক্ষে হয়েছিলো। খুব সম্ভব সেটা সাময়িক ইচ্ছা ছিলো। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে ওহী আসবে না ততক্ষণের জন্য নাকূস দ্বারা নামাযের জন্য আহ্বানের কাজ সমাধা করা হবে। অন্যথায় হুযূর মি'রাজের রাতে ফিরিশ্তাদের নিকট আযান শুনেছিলেন। 'মিরক্বাত'-এর এ-ই স্থানে তেমনি উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬. এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ জাগ্রহতাবস্থায় যে ধারণায় থাকে স্বপ্নেও তা-ই করে এবং বলে। তিনিও স্বপ্নে নাক্ব ূস দেখে নামাযের কথা স্মরণ করলেন। সূফীগণ বলেছেন, "যে খেয়ালের মধ্যে জীবন যাপন করবে, ওই খেয়ালের মধ্যে মৃত্যু বরণ করবে এবং হাশরের ময়দানে ওঠবে।"

স্মর্তব্য যে, মহামহিম রব অন্যান্য বিধানের মতো হুযূরের উপর আযানের ওহী প্রেরণ করেন নি; বরং সাহাবা-ই কেরামের স্বপ্নকে মধ্যভাগে রেখেছিলেন যাতে মানুষ ওইসব হযরতের মহত্ব বুঝতে পারে। আর লোকেরা জানে যে, যখন ওইসব বুযুর্গের স্বপ্ন তেমনি, তখন তাঁদের জাগ্রতাবস্থার বিধানাবলী কেমন পবিত্র হবে!

দেখুন, আযানের মতো ইসলামী চিহ্ন বা বিধান সাহাবা-ই কেরামের স্বপ্নের ফসল। তাঁদের ঘুমের উপর আমাদের মতো লাখো লোকের জাগ্রতাবস্থা উৎসর্গ হোক!

২৭. যাতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে সামঞ্জস্যও না হয়, আর নামাযের জন্য আহ্বানের সাথে সাথে আল্লাহ্র যিক্র এবং নামাযের প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি হয়ে যায়; তদুপরি, আওয়াজও অর্থহীন না হয়।

২৮. এ হাদীস ইমাম আ'যমের মজবুত দলীল- এ মর্মে যে, আযানে তারজী' নেই। আর তাকবীরের কলেমাগুলো একেকটা নয়। কেননা, আযানের ভিত্তি হচ্ছে এই স্বপ্ন। তদুপরি, এটা অনুসারে সাহাবা-ই কেরাম আমল করেছেন।

স্মর্তব্য যে, ইক্বামতের মধ্যে 'ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালাত' সংযোজন করা আর ফজরের আযানের মধ্যে 'আস্সালাতু খায়রুম মিনান্ নাওম'-এর সংযোজন হুযূরের ইজতিহাদী নির্দেশে হয়েছে।

২৯. কেননা, আমিও এ আযান মি'রাজে ফিরিশ্তাদের মুখে শুনেছিলাম। হে আবদুল্লাহ্! মহান রব তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়ে আমাকে ইঙ্গিতে বলেছেন, "হে হাবীব! ওই ফিরিশ্তাদের মুখে শ্রুত আযান কেন বলাচ্ছেন না?"

فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهٖ فَقَالَ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهٖ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهٗ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ مَا اُرِىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالدَّارِمِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرِ الْاِقَامَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لٰكِنَّهٗ لَمْ يُصَرِّحْ قِصَّةَ النَّاقُوْسِ۔

আমি তাঁকে বলতে লাগলাম। আর তিনি আযান দিতে রইলেন।[৩১] (বর্ণনাকারী) বললেন, "এ আযান হযরত ওমর তাঁর ঘরে শুনতে পান। অতঃপর চাদর হেঁচড়িয়ে টানতে টানতে বের হলেন। আর আরয করতে লাগলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাঁরই শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমিও তেমনি স্বপ্ন দেখেছি, যেমন তিনি দেখেছেন।"[৩২] হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "আল্লাহ্‌রই কৃতজ্ঞতা।" [আবূ দাউদ, দারেমী, ইবনে মাজাহ] কিন্তু ইবনে মাজাহ্ তাকবীর (ইক্বামত)-এর কথা উল্লেখ করেন নি। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, "এ হাদীস সহীহ্ (বিশুদ্ধ)।' কিন্তু তিনি 'নাকূস'-এর ঘটনা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন নি।[৩৩]

স্মর্তব্য যে, এখানে 'ইন্‌শা-আল্লাহ্' বাক্যটি বরকত হাসিলের জন্য; সন্দেহ থাকার কারণে নয়। যেমন– মহান রব এরশাদ ফরমায়েছেন–

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ

(নিশ্চয় নিশ্চয় তোমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, যদি আল্লাহ্ চান। ৪৮:২৭, তরজমা– কান্‌যুল ঈমান)

এ হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা গেলো যে, মু'মিনের স্বপ্ন, বিশেষ করে, যখন নবূয়ত দ্বারা সেটার সত্যায়ন হয়ে যায়, ওহীর বিধানসম্মত হয়ে যায়। এরপর নবীর স্বপ্নের প্রসঙ্গে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম স্বপ্নে দেখে আপন সন্তানকে যবেহ করার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন।

স্বপ্ন তিন প্রকার। যথা– এক. প্রবৃত্তির কল্পনাগুলো, দুই. শয়তানী প্ররোচনাদি এবং তিন. রব্বানী ইলহাম (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সৃষ্ট প্রেরণা)। প্রথম দু'ধরনের স্বপ্নকে বলে اَضْغَاثُ اَحْلَام (আদ্বগাসু আহ্‌লাম)। এগুলো মিথ্যা হয়ে থাকে। আর তৃতীয় প্রকারের স্বপ্ন হচ্ছে– 'রু'ইয়া-ই সাদেক্বাহ্' (সত্য স্বপ্ন)। স্বপ্নের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ– ইন্‌শা-আল্লাহ্ 'কিতাবুর রু'ইয়া'য় করা হবে।

৩০. এ থেকে দু'টি মাস্‌আলা প্রতীয়মান হয় ঃ এক. আযানের মধ্যে উচ্চস্বরই পছন্দনীয়। সুতরাং লাউড স্পিকারে আযান দেওয়া অতি উত্তম। এবং দুই. একজন আযানের শব্দাবলী বলা আর অপরজন তা উচ্চস্বরে বলাও জায়েয।

৩১. অর্থাৎ আমি ওই আযানই হযরত বেলালকে বলেছি, যা ফিরিশ্‌তার মুখে শুনেছিলাম। তাতে তারজী' ছিলো না।

বুঝা গেলো যে, ইসলামের প্রথম আযান তারজী'-বিহীন ছিলো। আর সাইয়্যেদুনা বিলাল শেষ পর্যন্ত এ আযানই দিতে থাকেন।

৩২. বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত ওমর ফারূক্ব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ-এর স্বপ্ন কাশ্‌ফ দ্বারা জেনে নিয়েছেন অথবা তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দকে ফিরিশ্‌তার সাথে কথোপকথন করতে স্বপ্নযোগে দেখেছিলেন। কেননা, তখনো তাঁকে কেউ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দের স্বপ্নের কথা বলে নি।

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এটা প্রকাশ পায় যে, হযরত ওমর 'কাশ্‌ফ' দ্বারা তা জানতে পারেন।

৩৩. 'মিরক্বাত' প্রণেতা এখানে বলেছেন, ওই রাতে দশ জনেরও অধিক সংখ্যক সাহাবী প্রায় এ স্বপ্নই দেখেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এজন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করেন।

وَعَنْ اَبِیْ بَكْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِیِّ صلى الله عليه وسلم لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ اِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلٰوةِ اَوْ حَرَّكَهٗ بِرِجْلِهٖ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ

وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهٗ اَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَآءَ عُمَرَ يُؤْذِنُهٗ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهٗ نَائِمًا فَقَالَ الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ فَاَمَرَهٗ عُمَرُ اَنْ يَّجْعَلَهَا فِىْ نِدَاءِ الصُّبْحِ. رَوَاهُ فِى الْمُوَطَّا۔

৬০১।। হযরত আবূ বাকারাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত,[৩৪] তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ফজরের নামাযের জন্য বের হলাম। তখন তিনি যেই নিদ্রারত লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাকে নামাযের জন্য ডেকে দিচ্ছিলেন, অথবা আপন পা মুবারক দিয়ে নাড়া দিচ্ছিলেন।[৩৫] [আবু দাউদ]

৬০২।। হযরত মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তাঁর নিকট এ হাদীস পৌঁছেছে যে, হযরত ওমর ফারূক্বের দরবারে মুআয্যিন ফজরের নামাযের কথা জানানোর জন্য হাযির হলেন।[৩৬] তাঁকে শয়নরত অবস্থায় পেলেন। তিনি বললেন, "নামায ঘুম অপেক্ষা উত্তম।" তাঁকে হযরত ওমর ফারূক্ব নির্দেশ দিলেন যেন এ বাক্যটা ফজরের আযানেরই অন্তর্ভূক্ত করেন।[৩৭] [মুআত্বত্বা]

ইবনে ক্বাইয়্যেম 'কিতাবুর রূহ্'-এর মধ্যে লিখেছেন, মুসলমানদের স্বপ্নগুলোর সমাবেশ মুসলমানদের জমায়েতের মতোই গ্রহণযোগ্য। এর পক্ষে এই হাদীস শরীফ উপস্থাপন করেছেন।

৩৪. তাঁর নাম নুফায়' ইবনে হারিস। উপনাম আবূ বাকারাহ্। তিনি সাক্বীফ গোত্রের লোক। প্রসিদ্ধ সাহাবী।

৩৫. অর্থাৎ রাস্তায় যাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া গেলো, তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে কিংবা আপন পা শরীফ দিয়ে নাড়া দিয়ে নামাযের জন্য জাগ্রত করেছিলেন।

এ থেকে কয়েকটা মাস্আলা বুঝা গেলো ঃ

এক. আযানের পর বিশেষ কোন পন্থায় নামাযের জন্য অবগত করানো জায়েয। এটা যেনো বিশেষ তাস্ভীব।

দুই. নামাযের নাম নিয়ে জাগ্রত করাও জায়েয। কেউ কেউ বলে থাকে, "জাগানোর পর নামাযের নাম নাও! এর পূর্বে নিও না।" এটা ভুল কথা।

তিন. নিজের চেয়ে ছোটকে আপন পা দ্বারা নাড়া দিয়ে জাগানো দুরস্ত আছে। সৌভাগ্যবান ওইসব লোক, যাঁদের গায়ে হুযূরের পা মুবারকের স্পর্শের সৌভাগ্য হয়েছে। কবির ভাষায়- خوابیدہ کو ٹھوکر سے جگائے جاتے —

(ঘুমন্ত অলসকে লাথি মেরেই জাগ্রত করা হয়।)

সম্মানিত সূফীগণের অভিজ্ঞতা হচ্ছে- হুযূর আপন খাস গোলামদেরকে এখনো আপন পা মুবারকের বরকতময় স্পর্শ দ্বারা জাগিয়ে থাকেন। এটা তারা অনুভবও করে থাকেন। আল্লাহ্ পাক নসীব করুন!

৩৬. খুব সম্ভব এ ঘটনা হযরত ওমর ফারূক্বের খিলাফত কালের। আর এ মু'আয্যিন হযরত বেলাল নন, অন্য কোন বুযুর্গ ছিলেন। কেননা, হযরত বেলাল হুযূরের ওফাত শরীফের পর দামেস্কে চলে গিয়েছিলেন। হযরত ওমর ফারূক্বের আমলে সেখানেই তাঁর ওফাত হয়।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইসলামের সুলতান, কাযী ও আলিম-ই দ্বীন প্রমুখকে মুআয্যিন বিশেষভাবে নামাযের জন্য ডাকতে পারেন। সাধারণ মানুষের জন্য তা নিষিদ্ধ। তাদের জন্য আযানই যথেষ্ট।

৩৭. অর্থাৎ এ বাক্য ফজরের আযানের অংশ। সেটাকে শুধু আযানেই সংযোজন করবে, এর বাইরে নয়। অন্যান্য-সময়ে অন্য কোন বাক্য বা শব্দ ব্যবহার করে জাগাবে কিংবা

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِبْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِلَالًا اَنْ يَّجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ قَالَ اِنَّهٗ اَرْفَعُ لِصَوْتِكَ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ۔

بَابُ فَضْلِ الْاَذَانِ وَاِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

৬০৩।। হযরত আবদুর রাহমান ইবনে সা'দ ইবনে আম্মার ইবনে সা'দ, মুআয্‌যিন-ই রসূল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত,[৩৮] তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলালকে নির্দেশ দিলেন যেনো আপন আঙ্গুলগুলো কানের ভিতর প্রবেশ করিয়ে নেয়। (তিনি আরো) বললেন, "এ কাজ তোমার আওয়াজকে উঁচু করবে।"[৩৯] [ইবনে মাজাহ্]

অধ্যায় ঃ আযান ও মুআয্‌যিনের জবাব দেওয়ার ফযীলত[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৬০৪।। হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, "আযানদাতা মানুষ ক্বিয়ামতের দিন লম্বা গর্দান বিশিষ্ট হবে।"[২] [মুসলিম]

অবহিত করবে। সুতরাং হাদীসের উপর এ-ই আপত্তি আসে না যে, 'এ বাক্যতো হুযূরের যমানা থেকে ফজরের নামাযের আযানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে। আজ অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ কি?' এর আরো ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যাই উত্তম।

৩৮. এ সা'দ হলেন ক্বোরাযী; যিনি হুযূরের যমানায় মসজিদ-ই ক্বোবার মুআয্‌যিন ছিলেন। আর হুযূরের ওফাত শরীফের পর হযরত বেলালের স্থলে তিনি মসজিদ-ই নবভী শরীফের মুআয্‌যিন হন।

স্মর্তব্য যে, হযরত সা'দ কোরাযীও সাহাবী। আর হযরত 'আম্মার ইবনে সা'দ তাবে'ঈ'। আবদুর রহমান ইবনে সা'দের অবস্থাদি জানা যায় নি। (আশি''আহ)

৩৯. অর্থাৎ আঙ্গুলগুলো কানে প্রবেশ করালে আওয়াজ উঁচু হয়ে বের হয়। বস্তুতঃ আযানে উঁচু আওয়াজ চাই; এ কারণে প্রবেশ করিয়ে নাও।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, শিশুর কানে আযান বলার সময় আঙ্গুলগুলো কানে লাগানো সুন্নাত নয়। তেমনিভাবে ইক্বামতের সময়। অনুরূপ,এমন প্রতিটি স্থানেও যেখানে উচ্চস্বর কাম্য নয়। কিন্তু যদি লাউড স্পিকারে আযান বলা হয়, তবুও আঙ্গুলগুলো লাগিয়ে নেবে। কারণ, এখানেও আওয়াজকে উঁচু করা কাম্য। কবরের উপর আযান দিলে সেখানেও কানে আঙ্গুল প্রবেশ করাবে। কারণ, সেখানেও উচ্চস্বর কাম্য। এ আযানের আওয়াজ শুনে শয়তানগণ পলায়ন করে।

****

১. আযান দেওয়ার ফযীলত অগণিত। বাস্তব কথা হচ্ছে- আযান অপেক্ষা ইমামত উত্তম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনো আযান দেন নি। যেসব বর্ণনায় হুযূর আযান দিয়েছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে, ওখানে আযানের নির্দেশ দেওয়াই উদ্দেশ্য।

আযানের জবাব কার্যতও রয়েছে, মুখেও দেওয়া যায়। কার্যত

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهٗ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّاْذِيْنَ فَاِذَا قُضِىَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يُخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

৬০৫।। হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়,[৩] তখন শয়তান গুহ্যদ্বার দিয়ে বাতাস ছুঁড়তে ছুঁড়তে পলায়ন করে, যাতে আযান শুনতে না পায়।[৪] অতঃপর যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন এসে যায় এ পর্যন্ত যে, যখন নামাযের জন্য 'তাসভীব'[৫] (আহ্বান) করা হয়, তখন পালিয়ে যায়। যখন 'তাসভীব' (আহ্বান) শেষ হয়, তখন এসে যায়, যাতে মানুষের মনে প্ররোচনা দিতে পারে। আর বলে, "অমুক অমুক জিনিষ স্মরণ কর,[৬] যে সব জিনিষের কথা তার স্মরণ ছিলো না– এ পর্যন্ত যে, মানুষ জানে না সে কতো রাক্'আত পড়েছে।"[৭] [মুসলিম, বোখারী]

জবাব তো মসজিদে হাযির হয়ে যাওয়া আর মৌখিক জবাব হচ্ছে আযানের কলেমাগুলোর পুনরাবৃত্তি করা।

বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে– প্রথমে আযান শুনে দুনিয়াবি কথাবার্তা বন্ধ করে নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া। আর মুখে এর জবাবে আযানের কলেমাগুলো উচ্চারণ করা ওয়াজিব। অবশ্য আহারকারী, শৌচকর্ম সম্পন্নকারী, ইল্মে দ্বীন শিক্ষাদাতা এ নির্দেশ বহির্ভূত।

২. অর্থাৎ ঘাড় লম্বা ও মাথা উঁচু হবে। অথবা মাথা তুলে মহান রবের রহমতের অপেক্ষা করবে। অথবা গড়ন খুব উঁচু হবে; ফলে দূর থেকে চেনা যাবে। এ অর্থ নয় যে, তাদের দেহ ছোট আকারের হবে এবং শুধু গর্দানগুলো লম্বা হবে। কারণ, এটা দৃষ্টিকটু হয়।

কোন কোন ব্যাখ্যাকারী اعناق -কে যের বিশিষ্ট করে اِعْنَاق পড়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে দ্রুত গতিসম্পন্ন ও দীর্ঘ কদমবিশিষ্ট হওয়া। অর্থাৎ মুআয্যিন জান্নাতের দিকে দ্রুতগতিতে দৌড়ে দৌড়ে লম্বা লম্বা কদম রেখে অগ্রসর হবে। অন্যান্য লোকের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৩. চাই নামাযের দিকে ডাকার জন্য দেওয়া হোক, কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে দেওয়া হোক! যেমন শিশুর কানে, কিংবা দাফনের পর কবরের নিকট ইত্যাদি। لِلصَّلٰوةِ (নামাযের জন্য) এ জন্য এরশাদ করেছেন যেন কেউ এখানে আযানের আভিধানিক অর্থই প্রযোজ্য বলে মনে না করে।

৪. এখানে পলায়ন করার প্রকাশ্য অর্থই বুঝানো উদ্দেশ্য। আর আযানে শয়তান তাড়ানোর প্রভাব রয়েছে। এ কারণে মহামারী ছড়িয়ে পড়লে আযান দেওয়ানো হয়। কারণ, এ মহামারী জিন্দের প্রভাবে ছড়ায়। শিশুদের কানে আযান দেওয়ানো হয়। কারণ, তার জন্মের সময় শয়তান উপস্থিত থাকে, যার আঁচড় খেয়ে শিশু কান্না করে। দাফনের পর কবরের শিরপ্রান্তে আযান দেওয়ানো হয়। কেননা, সেটা মৃতের পরীক্ষা ও শয়তানের বিভ্রান্ত করার সময়। আযানের বরকতে শয়তান পলায়ন করবে। তাছাড়া, মৃতের হৃদয়ে শান্তি আসবে, নূতুন ঘরে (কবরে) মন বসবে, মুন্কার ও নাকীরের প্রশ্নাবলীর জবাব স্মরণ হবে। এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' ঃ প্রথম খণ্ডে দেখুন।

'গুহ্যদ্বার দিয়ে বাতাস ছাড়া'র অর্থ তার চূড়ান্ত পর্যায়ের অবমাননা ও ভীত হওয়া। এমনি অবস্থায় ভীত-সন্ত্রস্থ ব্যক্তি পায়ুপথে বাতাস ছুঁড়তে ছুঁড়তে পলায়ন করে।

৫. এখানে 'তাসভীব' মানে 'ইক্বামত' বা তাকবীর বলা। এতেও আযানের মতো প্রভাব রয়েছে।

৬. এখানে 'বস্তুগুলো' মানে নামাযের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন খেয়ালাদি। অভিজ্ঞতায় প্রকাশ পেয়েছে যে, নামাযে ওইসব কথা স্মরণ হয়, যেগুলো নামাযের বাইরে স্মরণ হয় না।

وَعَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِالْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَّ لَا اِنْسٌ وَّ لَا شَىْءٌ اِلَّا شَهِدَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ۔

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهٗ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوْا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِىْ

৬০৬।। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "মুআয্যিনের আওয়াজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যে কোন জিন্, মানব এবং অন্যান্য জিনিষই শুনতে পাবে (প্রত্যেকে) ক্বিয়ামত দিবসে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।"[৮] [বোখারী]

৬০৭।। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যখন তোমরা মুআয্যিনের আযান শুনবে, তখন তোমরাও সেভাবে বলো, যেভাবে সে বলছে।[৯] তারপর আমার উপর দুরূদ প্রেরণ করো। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ প্রেরণ করে আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত প্রেরণ করেন।[১০] অতঃপর আল্লাহর নিকট থেকে আমার জন্য ওসীলা চাও, তা হচ্ছে জান্নাতে এমন এক জায়গা, যার উপযুক্ত হচ্ছে-

---

এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে মানুষের অন্তরের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি দিয়েছেন- মানুষের পরীক্ষার জন্য। যতো চেষ্টাই করা হোক না কেন, ওইসব প্ররোচনা থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং উচিত হচ্ছে- প্ররোচনাগুলোর পরোয়া না করা। নামায পড়তে থাকবে। মাছির উপদ্রবের কারণে আহার ছেড়ে দিও না।

৭. ফিক্বহশাস্ত্রের মাস্আলা হচ্ছে- যদি প্রথমবার এ ঘটনার সম্মুখীন হয়, তাহলে প্রথম থেকে পুনরায় নামায পড়বে। আর যদি এমনি ঘটতেই থাকে, তবে কম রাক'আতই গণ্য করবে। যেমন, যদি এ সন্দেহ হয় যে, চার রাক'আত পড়লো, না তিন রাক'আত! তখন তিন রাক্'আতই বিবেচনায় আনবে।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, কখনো কখনো উত্তম অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম উত্তমের প্রভাব বেশী হয়। দেখো, নামায তেলাওয়াত-ই ক্বোরআন এবং রুকূ' ও সাজদার কারণে শয়তান পলায়ন করে না। পলায়ন করে আযানের কারণে। অথচ আযান অপেক্ষা নামায উত্তম। হুযূর এরশাদ ফরমাচ্ছেন, "ওমরের নিকট থেকে শয়তান পলায়ন করে।" অথচ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব উত্তম।

৮. আরয করবে, "মুনিব! সে মুসলমান, নামাযী। আমি তাকে আযান দিতে দেখেছি। কলেমা-ই শাহাদত পড়তে শুনেছি।" হাদীস শরীফটি একেবারে প্রকাশ্য অর্থে রয়েছে, কোন প্রকার ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'আলা প্রাণীকুল ও জড় পদার্থসমূহকে বুঝার ও শোনার শক্তি দান করেছেন। তন্মধ্যে প্রত্যেকটার প্রমাণ হচ্ছে ক্বোরআন করীমের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ।

'মিরক্বাত'-এ এখানে একটা হাদীস শরীফ উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে এরশাদ হয়েছে- প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে বলে, "তোমার উপর দিয়ে কি আল্লাহ্র যিক্‌রকারী কোন বান্দাও অতিক্রম করেছে?" যখন সেগুলোর মধ্যে কোনটা বলে, "হ্যাঁ"। তখন সব ক'টি খুশী হয়। সুতরাং উচ্চ রবে দেওয়া চাই, যাতে সাক্ষী বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায়। খুব সম্ভব ফিরিশ্তাগণও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

اِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَئَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ

আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে মাত্র একজনই। আমি আশা করি, তিনি আমিই।[১১] সুতরাং যে আমার জন্য 'ওসীলা চাইবে, তার জন্য আমার সুপারিশ অনিবার্য।"[১২] [মুসলিম]

৬০৮।। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যখন মুআয্যিন বলবে- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ বলবে, 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবার', তারপর মুআয্যিন বলবে, 'আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্', সেও বলবে, 'আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্', আর মুআয্যিন বলবে, 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলাল্লাহ্', এ-ও বলবে, 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্', তারপর মুআয্যিন বলবে, 'হাইয়্যা আলাস্ সোয়ালাহ্', সে বলবে, "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্',[১৩] তারপর মুআয্যিন বলবে,

'মানব' মানে সাধারণ মানুষ।

৯. এ থেকে বুঝা গেলো যে, আযানের কলেমাগুলোর সব ক'টিই পুনরায় বলবে- 'হাইয়্যা আলাস্ সোয়ালাহ্' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' এবং 'আস্‌সালাতু খায়রুম্ মিনান্ নাউম'ও। পরবর্তী হাদীস শরীফে আসছে- 'হাইয়্যা আলাস্ সোয়ালাহ্' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' শুনলে 'লা-হাওলা' পড়বে। উচিত হচ্ছে- উভয়টি বলবে, যাতে উভয় হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়।

১০. এ থেকে বুঝা গেলো যে, আযানের পর দুরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত। কোন কোন মুআয্যিন আযানের পূর্বেই দুরূদ শরীফ পড়ে নেন। এতেও ক্ষতি নেই। তাদের দলীল হচ্ছে- এই হাদীস।

'শামী' প্রণেতা বলেছেন যে, ইক্বামতের সময় দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত। স্মরণ রাখবেন, আযানের পূর্বে কিংবা পরে উচ্চস্বরে দুরূদ শরীফ পাঠ করাও জায়েয; বরং সাওয়াবের কাজ। বিনা কারণে সেটাকে নিষিদ্ধ বলতে পারবে না।

১১. স্মর্তব্য যে, 'ওসীলাহ্' উপকরণ ও মাধ্যম অবলম্বন কল্লাকে বলা হয়; যেহেতু এখানে পৌঁছানো মহান রবের বিশেষ নৈকট্যেরই কারণ, সেহেতু সেটাকে 'ওসীলাহ্' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ- 'আমি আশা করি' বিনয় প্রকাশের জন্যই। অন্যথায় ওই স্থানটা হুযূরের জন্যই নির্দ্ধারিত হয়েছে। [মিরক্বাত, আশি''আহ্]

আর আমাদের হুযূরের জন্য ওসীলাহ্ প্রার্থনা করা তেমনি, যেমন ফক্বীর ধনী লোকের দরজার গিয়ে ডাক দেওয়ার সময় তাঁর জান ও মালের জন্য দো'আ করে থাকে, যাতে ভিক্ষা পায়। আমরা হলাম ভিখারী, আর হুযূর হলেন দাতা। হুযূরের জন্য দো'আ করাও খাবার পাওয়ার একটা পদ্ধতি মাত্র।

১২. অর্থাৎ আমি ওয়াদা করেছি যে, তার জন্য সুপারিশ অবশ্যই করবো। এখানে 'সুপারিশ' মানে 'বিশেষ শাফা'আত বা সুপারিশ'। অন্যথায় হুযূর প্রত্যেক মু'মিনের জন্য সুপারিশকারী।

হুযূরের সুপারিশ অনেক প্রকারের। সুপারিশের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং সেটার প্রকারভেদ আমার কিতাব 'তাফসীর-

حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِیْنَ یَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِالْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِالَّذِیْ وَعَدْتَّهٗ حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِیْ یَوْمَ الْقِيٰمَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ-

'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' তখন সে বলবে, "লা-হাওলা ওয়ালা-কু্ওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্', তারপর মুআয্যিন বলবে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', তখন সেও বলবে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', অতঃপর মুআয্যিন বলবে, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্' তখন সেও সত্য অন্তরে বলবে, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৪] [মুসলিম]

৬০৯।। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি আযান শোনার সময় এ কথা বলে- হে আল্লাহ্! এ পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও শাশ্বত নামাযের রব! হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দান করো ওসীলা ও বুযর্গী আর তাঁকে ওই 'মাক্বাম-ই মাহমুদ' (প্রশংসিত স্থান)-এর উপর আসীন করো, যার তুমি ওয়াদা করেছো',[১৫] তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।[১৬] [বোখারী]

ই নাঈমী': তৃতীয় খণ্ডে দেখুন।

১৩. প্রকাশ থাকে যে, 'মুআয্যিন' মানে 'নামাযের জন্য আযানদাতা'। কেননা, অন্যান্য আযানের জবাব দেওয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়।

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ' মানে ওই মুসলমান, যে আযানের জবাব দিতে সক্ষম। সুতরাং নামাযরত ব্যক্তি ও শৌচকর্মে রত ব্যক্তি প্রমুখ এ বিধান বহির্ভূত। উত্তম হচ্ছে জবাব দাতা, 'হাইয়্যা আলাস্ সোয়ালাহ্' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' উভয় কলেমাও বলবে, 'লা-হাওলা'ও বলবে। এতে এ হাদীস অনুসারেও কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে, পূর্বোল্লেখিত হাদীস অনুসারেও। এমনি মুহূর্তে 'লা-হাওলা' বলা এজন্য যে, এর ফলে শয়তান দূরে থাকবে এবং নামাযে উপস্থিত হওয়া সহজ হবে।

১৪. প্রকাশ থাকে যে, مِنْ قَلْبِهٖ -এর সম্পর্ক 'সমগ্র জবাব'-এর সাথেই। অর্থাৎ আযানের পূর্ণাঙ্গ জবাব সাচ্চা অন্তরে দেবে। কেননা, নিষ্ঠা ব্যতীত কোন ইবাদত ক্বূল হয় না।

যদি 'জান্নাত' মানে ওই জান্নাত হয়, যা ক্বিয়ামতের পর পাওয়া যাবে, তবে دَخَلَ ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ কালের অর্থে ব্যবহৃত বলে বিবেচ্য হবে। আর যদি 'জান্নাত' মানে 'দুনিয়ার জান্নাত' হয়, অর্থাৎ ইবাদতসমূহের সামর্থ্য ও উত্তম জীবন, তবে ওই دَخَلَ - مَاضِی (অতীতকাল)-এর অর্থে ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ অর্থাৎ আল্লাহ্কে যে ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে (৫৫:৪৬) ঃ একটি দুনিয়ায়, অপরটি পরকালে। [মিরক্বাত]

১৫. স্মর্তব্য যে, জান্নাতে হুযূরের বিশেষ স্থানের নাম 'ওসীলাহ্'। আর ক্বিয়ামতে হুযূরের বিশেষ স্থানের নাম 'মাক্বাম-ই মাহমূদ'। এটা হচ্ছে ওই স্থান, যেখানে হুযূরকে দুলহা বানানো হবে, আর সমস্ত পূর্ব ও পরবর্তী, কাফির ও মু'মিন, নবী ও রসূল, বরং খোদ্ মহান বিশ্ব-রব হুযূরের এমন প্রশংসাদি করবেন, যেগুলো আজ আমাদের ধারণা-কল্পনারও

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُغِيْرُ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْاَذَانَ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا اَمْسَكَ وَاِلَّا اَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوْا اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ رَاعِيْ مِعْزًى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ

৬১০।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজর উদয় হলে যুদ্ধের হামলা করতেন,[১৭] আযানের প্রতি কান মুবারক লাগাতেন। যদি আযান শুনে নিতেন, তবে তা থেকে বিরত থাকতেন। অন্যথায় হামলা করতেন।[১৮] এক ব্যক্তিকে এ কথা বলতে শুনলেন, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার"। হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এ লোকটা 'ফিত্ব্রাত'-এর উপর রয়েছে। তারপর সে বললো, "আশহাদু আল্-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্।" তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তুমি আগুন থেকে বের হয়ে গেছো।" সাহাবা-ই কেরাম তার দিকে দেখলেন, দেখলেন সে মেষ-ছাগলের রাখাল ছিলো।[১৯] [মুসলিম]

৬১১।। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মুআয্যিনের আযান শুনে একথা বলে—

অতীত। ওই স্থান, জানিনা কেমন মহান ও শানদার হবে, যার ঘোষণা মহান রব ক্বোরআন শরীফে এরশাদ করেছেন এবং আমাদেরকে প্রত্যেক আযানের পর সেটার জন্য দো'আ-প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? ওই স্থানের উপর হুযূর 'শাফা'আত-ই কুব্‌রা' (বৃহত্তম সুপারিশ) করবেন। আর এখান থেকে হুযূরের বরকতময় হাতে শাফা'আতের দরজা খুলবেন।

১৬. অর্থাৎ এ দো'আর বরকতে ঈমানের উপর মৃত্যু তার ভাগ্যে জুটবে আর সে আমার সাধারণ ও বিশেষ সুপারিশের উপযোগী হবে।

'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, আযানের পর দো'আ অত্যন্ত ক্বূবূল হয়। সুতরাং বিপদগ্রস্তের উচিত ওই সময় দো'আ করা। এ কারণে মুসলমাণগণ এ দো'আর সাথে এটাও বলে থাকে وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ (এবং হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাঁর সুপারিশ দান করুন!)

১৭. যখন জিহাদের মধ্যে কাফিরদের এলাকার উপর শাহী ভঙ্গিতে হামলা করতেন তখন ভোর বেলায় আযানের জন্য অপেক্ষা করতেন। কেননা, এ সময় ইবাদত ক্বূবূল হবার এবং আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হবারই। আর জিহাদও ইবাদত।

১৮. বুঝা গেলো যে, আযান মুসীবতসমূহ দূরীভূত করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আযানের শব্দ থেকে এটা নির্ণয় করতেন যে, এটা মুসলমানদের বস্তি, যেখানে মুসলমানগণ স্বাধীনভাবে তাদের ইবাদতগুলো পালন করছে। কাফিরদের প্রভাব নেই। সুতরাং এখানে জিহাদের প্রয়োজন নেই। কেননা, জিহাদ করা হয় কাফিরদের জোর ও দাপট ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য। কাফিরদের জোর করে মুসলমান বানানোর জন্য নয়।

১৯. হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই রাখাল সম্পর্কে কয়েকটা সাক্ষ্য দিয়েছেন—

এক. এখন সে সাচ্চা মুসলমান। দুই. তার শেষ নিঃশ্বাস ঈমানের উপর বের হবে, তিন. তার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَلَهٗ ذَنْبُهٗ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَآءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর খাস বান্দা ও তাঁর রসূল; আমি আল্লাহ্‌র রাবূবিয়াত, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত এবং দ্বীন-ই ইসলাম-এর উপর সন্তুষ্ট", তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[২০] [মুসলিম]

৬১২।। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "প্রতি দু'আযানের মধ্যভাগে নামায রয়েছে।[২১] প্রতি দু'আযানের মধ্যভাগে নামায রয়েছে।[২২] অতঃপর তৃতীয়বারে এরশাদ করেছেন, "রয়েছে তার জন্য, যে চায়।"[২৩] [মুসলিম, বোখারী]

বুঝা গেলো যে, হুযূর সবার অন্তরের অবস্থাও জানেন এবং সবার শেষ পরিণতি সম্পর্কেও অবগত আছেন। থাকবেন নাও কেন? 'লওহ-ই মাহফূয' তো হুযূরের সামনে রয়েছে।

২০. প্রকাশ থাকে যে, দো'আ আযানের পূর্বে পড়া হবে– যখন মু'আয্যিনের আযানের আওয়াজ কানে আসে; কেননা, মধ্যভাগে এ দো'আ পড়লে আযানের জবাব দিতে অসুবিধা হবে।

২১. 'দু' আযান' মানে আযান ও ইক্বামত। যেমন চাঁদ ও সূর্যকে 'ক্বামারাঈন' (দু'চাঁদ) বলা হয় এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও ওমর ফারূক্বকে 'ওমরাঈন' এবং হযরত হাসান ও হোসাঈনকে 'হাসানাঈন' বলা হয়।

অথবা 'আযান' মানে অবগত করানো। আযান তো নামাযের সময় সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য দেওয়া হয়। আর 'ইক্বামত' জমা'আতের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য। উভয় অবস্থায় হাদীস শরীফের বিপক্ষে আপত্তি নেই।

২২. হয়তো صَلٰوة (সালাত) মানে দো'আ। অর্থাৎ আযান ও তাকবীরের মধ্যভাগে দো'আ প্রার্থনা করো। কারণ, এটা দো'আ ক্বুবূল হবার সময়। অথবা صَلٰوة (সালাত) মানে নামায। অর্থাৎ আযান ও ইক্বামতের মধ্যভাগে নফল নামায পড়ো; কারণ, সময়টি উত্তম। সুতরাং এ সময়ে নামাযও উত্তম। তাছাড়া, এর ফলে নামাযে আলস্য আসবে না। মানুষ জমা'আতের এতটুকু পূর্বে মসজিদে পৌঁছবে যেন ওযূ করে নফল পড়ে 'তাকবীর-ই উলা' (প্রথম তাকবীর) পেতে পারে।

স্মর্তব্য যে, হানাফী মাযহাবের ইমামদের মতে, এ বিধানে মাগরিব নেই। কারণ, মাগরিবের আযানের পর নফল পড়া মাকরূহ। ফরযের পর পড়তে পারে। যেমন– হযরত বোরায়দা আস্‌লামীর বর্ণনায় এসেছে– প্রতি দু'আযানের মধ্যভাগে নামায রয়েছে خَلَا صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ (মাগরিবের নামায ব্যতীত) [মিরক্বাত ইত্যাদি]

২৩. অর্থাৎ এ নামায মুআয্যিনের বিশেষত্ব নয়; বরং যে মুসলমানই চায় পড়তে পারে। অথবা এ নামায ফরয নয়, যা ছেড়ে দিলে জঘন্য পাপ হবে।

স্মর্তব্য যে, ফজর ও যোহরের পূর্বের সুন্নাতগুলো হচ্ছে– 'মুআক্কাদাহ্', যা ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস অত্যন্ত খারাপ। আসর ও এশার পূর্বেকার নামায 'গায়র-ই মুআক্কাদাহ্, (মুআক্কাদাহ্ নয়); মাগরিবের পূর্বে নিষিদ্ধ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيُّ ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَ الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَاالتِّرْمِذِىُّ وَالشَّافِعِىُّ وَفِىْ اُخْرٰى لَهٗ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهٗ بَرَآئَةٌ مِّنَ النَّارِ .رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَ اِبْنُ مَاجَةَ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৬১৩।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইমাম হচ্ছে যামিন।[২৪] আর মুআয্যিন হচ্ছে আমানতদার।[২৫] হে আল্লাহ্! ইমামদেরকে হিদায়ত দান করো এবং মুআয্যিনদেরকে ক্ষমা করো।[২৬] [আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, শাফে'ঈ][২৭] অন্য বর্ণনায় বচনগুলো মাসাবীহ্র।

৬১৪।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি সাত বছর যাবৎ শুধু সাওয়াবের জন্য আযান দেয়, তার জন্য আগুন (দোযখ) থেকে মুক্তি লিখে দেওয়া হয়।"[২৮] [তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্]

২৪. অর্থাৎ ইমাম মোক্তাদীদের নামাযের যিম্মাদার এবং নিজের নামাযের সাথে তাদের নামাযও সামিল করে নেয়। এ কারণে, ইমামের ক্বিরআত মুক্তাদীর ক্বিরআতের সামিল। ইমামের সাহ্ভ (ভুল) হলে মুক্তাদীর উপর সাজদাহ্-ই সাহ্ভ ওয়াজিব হয় এবং মুক্বীম ইমামের পেছনে মুসাফির পূর্ণ নামায পড়বে। ইমাম শুধু নিজের জন্য দো'আ করবেন না, বরং 'বহুবচন' শব্দাবলী ব্যবহার করে দো'আ-প্রার্থনা করবেন।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, নফল নামায সম্পন্নকারীর ইমামতিতে ফরয নামায সম্পাদনকারীর নামায জায়েয নয়। কেননা, ফরয নামায নফল নামায অপেক্ষা উত্তম। আর উত্তমের অধীনে এর নিম্নতর বস্তু আসতে পারে; কিন্তু নিম্নতর বস্তুতে উচ্চতর আসতে পারে না। অনুরূপ, যদি মুক্তাদীর নামায ইমামের নামায থেকে ভিন্নতর হয়, তবে জায়েয নয়। কেননা, কোন নামায সেটার ভিন্নতর নামাযকে নিজের অধীনে নিতে পারে না। সুতরাং আসরের নামায সম্পন্নকারীর পেছনে যোহরের ক্বাযা সম্পন্ন করা যেতে পারে না। এটাও বুঝা গেলো যে, ইমামের নামায ভঙ্গ হয়ে গেলে মুক্তাদীদের নামাযও ভঙ্গ হয়ে যাবে। মোট কথা, এ হাদীস শরীফ অনেক মাস্আলায় ইমাম আ'যমের দলীল।

২৫. অর্থাৎ মানুষের নামাযসমূহ ও রোযাগুলো তার নিকট যেন আমানত বা গচ্ছিত বস্তু। এ থেকে বুঝা গেলো যে, আযান দেওয়ার চেয়ে ইমামত উত্তম। তা হবেও না কেন? ইমাম হুযূর মোস্তফার খলীফা। আর মুআয্যিন হচ্ছে হযরত বেলালের স্থলাভিষিক্ত। এটাই আমাদের মাযহাব।

২৬. এ থেকেও 'ইমামত' (ইমাম হওয়া)'র আযান দেওয়ার উপর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাচ্ছে। কেননা, 'মাগফিরাত' অপেক্ষা 'হিদায়ত' উত্তম। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! ইমামদেরকে নামাযের মাস্আলাদি শিক্ষা করার এবং বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করার হিদায়ত দাও। কারণ, তাঁদের নামাযের সাথে অনেকের নামায সম্পৃক্ত।

আর মু'আয্যিন কখনো ওয়াক্তের মধ্যে ধোঁকাও খেতে পারে। তাকে হে আল্লাহ্! ক্ষমা করে দাও।

২৭. যদিও ইমাম শাফে'ঈ একজন ইমাম এবং ইমাম তিরমিযী প্রমুখ তাঁর অনুসারী, কিন্তু যেহেতু তাঁর লিখিত হাদীস গ্রন্থাবলী ইমাম শাফে'ঈর কিতাবাদি অপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধ, সেহেতু তাঁর উল্লেখ প্রথমে করেছেন। দেখুন, ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম ইমাম মালিকের ছাত্র, কিন্তু তাঁদের (ইমাম বোখারী ও মুসলিম) কিতাবগুলো অধিকতর নির্ভরযোগ্য। [মিরক্বাত]

২৮. অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিনা বেতনে সাত বছর যাবত আযান

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَّاعِىْ غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِّلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلٰوةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلٰوةَ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَبْدٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَّهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَ رَجُلٌ

৬১৫।। হযরত ওক্ববাহ্ ইবনে 'আমের[২৯] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "তোমাদের রব ওই মেষ চরানোর রাখালের প্রতি সন্তুষ্ট, যে পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় থাকে, আমাদের আযানগুলো দেয় এবং নামায পড়ে।"[৩০] আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান,[৩১] "আমার এ বান্দাকে দেখো,[৩২] সে আযান দেয়, নামায ক্বায়েম করে এবং আমাকে ভয় করে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।"[৩৩] [আবূ দাঊদ, নাসাঈ]

৬১৬।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ক্বিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তি মুশ্কের টিলাসামূহের উপর থাকবে– এক. ওই ক্রীতদাস, যে আল্লাহ্র হক্ব ও আপন মুনিবের হক্ব আদায় করতে থাকে, দুই. ওই ব্যক্তি, যে কোন সম্প্রদায়ের ইমামত করে এবং তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং তিন. ওই ব্যক্তি,

দেয়, তার জন্য মহান রব জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের পরওয়ানা (পাসপোর্ট-ভিসা) লিপিবদ্ধ করে দেন, যা ক্বিয়ামতে তাকে দেওয়া হবে। এর ফলে সে নির্দ্বিধায় দোযখ অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কোন কোন মু'আয্যিন এটা স্থির করে নেয় যে, আমরা বেতন নেবো মসজিদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কাজের জন্য, আযান দেবো আল্লাহ্র ওয়াস্তে। তাদের দলীল হচ্ছে এ-ই হাদীস শরীফ। ইন্শা-আল্লাহ্, অবশ্যই এর ফয়য (কল্যাণ) পাবে।

২৯. তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী। হযরত আমীর মু'আবিয়ার পক্ষ থেকে ওক্ববাহ্ ইবনে আবূ সুফিয়ানের ওফাতের পর মিশরের গভর্ণর নিযুক্ত হন। তারপর হযরত আমীর মু'আবিয়া তাঁকে অপসারিত করেন। ৫৮ হিজরীতে তিনি ওফাত পান।

৩০. অর্থাৎ দুনিয়ার ঝগড়া-ফ্যাসাদ থেকে দূরে অবস্থান করে। নিজের জীবিকা নিজে উপার্জন করে। নামায যদিও একাকী পড়ে, কিন্তু পড়ে আযান দিয়ে।

বুঝা গেলো যে, পাঁচ ওয়াক্বতের নামাযের জন্য আযান যে কোন অবস্থাতেই দেবে, যদিও জঙ্গলে একাকী নামায পড়ে। 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন যে, আযানের বরকতে জিন্ এবং ফিরিশ্তাগণও তার সাথে নামায পড়েন। আর সে জমা'আতের সাওয়াব পেয়ে যায়।

'তাকবীর'-এর প্রসঙ্গে মতবিরোধ রয়েছে; কিন্তু সঠিক অভিমত হচ্ছে– তাকবীরও বলবে। কেননা, আযান ও তাকবীরের মধ্যে নামাযের জন্য অবগত করানো ছাড়াও বহু উপকারিতা রয়েছে।

৩১. ফিরিশ্তাদেরকে, নবী ও ওলীগণের রূহগুলোকে বরং হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকেও। [মিরক্বাত]

৩২. বুঝা গেলো যে, ফিরিশ্তাগণ এবং নবী ও ওলীগণের রূহের মধ্যে এ শক্তি রয়েছে যে, এক স্থানে রয়ে সমগ্র বিশ্বকে দেখে নেয়। মহান রব তাঁদেরকে বলেন, "এ পাহাড়ে

يُنَادِىْ بِالصَّلٰوَاتِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُلَهٗ مَدٰى صَوْتِهٖ وَيَشْهَدُ لَهٗ كُلُّ رَطْبٍ وَّ يَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلٰوةِ يُكْتَبُ لَهٗ خَمْسٌ وَّ عِشْرُوْنَ صَلٰوةً وَّ يُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى النَّسَائِىُّ اِلٰى قَوْلِهٖ كُلُّ رَطْبٍ وَّ يَابِسٍ وَقَالَ وَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلّٰى-

যে প্রতিটি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান দেয়।[৩৪] [তিরমিযী] আর বলেছেন, এ হাদীস 'গরীব'* পর্যায়ের।

৬১৭।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "মু'আয্যিনকে তার কণ্ঠস্বরের শেষ প্রান্ত অনুসারে ক্ষমা করা হয়[৩৫] এবং তার পক্ষে প্রতিটি ভেজা ও শুক্নো বস্তু সাক্ষ্য দেবে। আর নামাযে উপস্থিত হয় এমন লোকের জন্য পঁচিশ নামায লিপিবদ্ধ করা হয়[৩৬] এবং দু'নামাযের মধ্যবর্তী গুনাহ্ নিশ্চিহ্ন করা হয়।" [আহমদ, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ] ইমাম নাসাঈ 'প্রতিটি ভেজা ও শুক্নো' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন আর বলেছেন, "মু'আয্যিন সমস্ত নামাযীর সমান সাওয়াব পায়।"[৩৭]

গোপন বান্দাকে দেখো।" এ থেকে 'হাযির-নাযির'-এর মাসআলার সমাধান পাওয়া গেলো।

৩৩. এ থেকে কয়েকটা মাস্আলা প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. কখনো কখনো দুনিয়া থেকে পৃথক থাকা, পার্থিব কাজকর্মে মশগুল হয়ে যাওয়া থেকে উত্তম।

দুই. কখনো একাকী ইবাদত প্রকাশ্যে ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, প্রকাশ্যে ইবাদত করার মধ্যে রিয়া'র আশঙ্কা থাকে। একাকী ইবাদতে তা নেই।

তিন. মুসল্লী একজন হলেও নিজের নামাযের জন্য আযান ও তাকবীর (ইক্বামত) বলবে। কিন্তু মহল্লার মসজিদের আযান মহল্লাবাসীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

চার. ফিরিশ্তা, নবী ও ওলীগণ আমাদের হৃদয়ের নিষ্ঠা ও রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত এবং সেগুলো দেখেন। মহান রব। اُنْظُرُوْا (দেখো!)-এর পর يَخَافُ (ভয় করে) এরশাদ করেছেন।

পাঁচ. আল্লাহর মাক্ববুল বান্দাগণ মানুষের পরিণতি সম্পর্কে অবগত। মহান রব তাঁদেরকে মাগফিরাত কিংবা শাস্তির খবর দিয়ে দিয়েছেন।

৩৪. হাদীস শরীফটি একেবারে প্রকাশ্য অর্থের উপর রয়েছে। কোন প্রকার ব্যাখার প্রয়োজন নেই। ক্বিয়ামতে সর্বপ্রথম সব লোক দণ্ডায়মান হবে। এ কারণে সেটাকে ক্বিয়ামত বলে। তারপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকবে! কেউ থাকবেন আরশ-ই আ'যমের ছায়ায়, কেউ থাকবেন চেয়ারের উপর, আর এ তিনটি দল থাকবেন মুশ্কের পাহাড়গুলোর উপর। সবাই তাদেরকে দেখবেও, তাদের খুশ্বুরও ঘ্রাণ নেবে। যেহেতু দুনিয়ায়ও তাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছে, সেহেতু সেখানেও মানুষ তাদের দ্বারা উপকৃত হবে।

স্মর্তব্য যে, 'ইমামের প্রতি সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি'র অর্থ হচ্ছে ইমামের তাক্বওয়া ও চরিত্রের উপর মুসলমানগণ সন্তুষ্ট থাকবে। বে-দ্বীন কিংবা বদ-দ্বীন লোকদের অসন্তুষ্টি মোটেই বিবেচ্য নয়। যেমন সরকারী চাকুরে। যে কর্তব্য কাজও সম্পাদন করে, নামাযও নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করে, সেও ওইসব গোলাম (ক্রীতদাস)-এর অন্তর্ভুক্ত, যারা মুনিব ও মহান রবের হক্ব আদায় করে।

★ হাদীস-ই গরীব ঃ কোন সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হলে তাকে 'হাদীস-ই গরীব' বলে। মুক্বাদ্দামা-ই মিশ্কাত।

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِجْعَلْنِىْ اِمَامَ قَوْمِىْ قَالَ اَنْتَ اِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلٰى اَذَانِهٖ اَجْرًا. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ۔

وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقُوْلَ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ

৬১৮।। হযরত ওসমান ইবনে আবিল 'আস[৩৮] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম করে দিন।" হুযূর এরশাদ করলেন, "তুমি তাদের ইমাম।[৩৯] আর তাদের মধ্যেকার দুর্বল ব্যক্তিটিকে মুক্বতাদী জানো[৪০] এবং এমন কোন মু'আয্যিন নিয়োগ করো, যে তার আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয় না।"[৪১] [আহমদ, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ]

৬১৯।। হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন– মাগরিবের আযানের সময় এটা পাঠ করে নাও[৪২]ঃ "হে আল্লাহ্! এটা তোমার রাতের আগমন এবং তোমার দিনের বিদায়ের সময়। আর এ গুলো তোমার আহ্বানকারীদের আওয়াজ।

৩৫. অর্থাৎ যে পরিমাণ তার কণ্ঠস্বর উঁচু হবে, ওই পরিমাণ তার মাগফিরাতও বেশী হবে। নিঁচু স্বরে যে আযান দেয়, তার শুধু কবীরাহ্ গুনাহ্ মাফ হয়। আর উঁচু স্বরে যে আযান দেয়, তার সগীরাহ্ ও কবীরাহ্ উভয় প্রকারের গুনাহ্ মাফ হয়।

এ অর্থও হতে পারে যে, মু'আয্যিনের আযানের বরকতে ওই স্থান পর্যন্তের গুনাহ্গারদের ক্ষমা হয়, যে স্থান পর্যন্ত তার আওয়াজ পৌঁছে। কারণ, এটা তাদের সবার পক্ষে সুপারিশ করবে।

৩৬. অর্থাৎ মসজিদে জমা'আত সহকারে নামায পড়ার সাওয়াব একাকী ও ঘরে নামায পড়ার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশী।

স্মর্তব্য যে, এখানে পঁচিশগুণ এরশাদ হয়েছে। অন্য বর্ণনায় ২৭ গুণও এরশাদ হয়েছে। কোন কোন বর্ননায় ৫০০ গুণও এরশাদ রয়েছে। কেননা, যেমন মসজিদ, যেমন জমা'আত এবং যেমন ইমাম তেমনি সাওয়াব। যেসব সৌভাগ্যবান লোক মসজিদ-ই নবভী শরীফে সাহাবা-ই কেরামের জমা'আতের সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে নামাযসমূহ সম্পন্ন করেছেন, তাঁদের একটি মাত্র সাজদাহ্ অন্যান্য লোকের সহস্র-কোটি নামায অপেক্ষাও উত্তম।

৩৭. অর্থাৎ তাঁর আযান শুনে যত লোক মসজিদে এসে কিংবা আপন ঘরে নামায পড়ে, তাদের সবার মোট সাওয়াব মু'আয্যিন পেয়ে থাকে। কারণ, সে তাদের সবার পথপ্রদর্শক হলো। আর ওইসব লোক আপন আপন নামাযের সাওয়াব পাবে।

৩৮. তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী। সক্বীফ গোত্রের লোক। হুযূর তাঁকে তায়েফের শাসক নিয়োগ করেন। হযরত ওমর ফারূক্বের খিলাফতের প্রাথমিক সময় পর্যন্ত সেখানকার শাসক ছিলেন। অতঃপর হযরত ওমর ফারূক্ব তাঁকে সেখান থেকে বদলী করে ওমান ও বাহরাইনের গভর্ণর নিয়োগ করেন।

৩৯. এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইমাম হিসেবে নিয়োগ করা এবং বদলী করার ক্ষমতা ইসলামী সুলতানেরও রয়েছে। আর তাঁর নিয়োগকৃত ইমামকে সম্প্রদায়ের লোকেরা অপসারিত করলে তিনি অপসারিত হতে পারেন না। দেখুন ফিক্বহ্ শাস্ত্রের কিতাবাদি।

৪০. অর্থাৎ এটা মনে রেখে নামায পড়াবে যে, আমার মুক্বতাদীদের মধ্যে কেউ দুর্বল এবং রোগাক্রান্তও রয়েছে। হাল্কা করে নামায পড়াবে।

৪১. এ থেকে কয়েকটা মাস্আলা বুঝা গেলো ঃ

فَاغْفِرْلِىْ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤدَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ-

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَوْ بَعْضِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ بلالًا اَخَذَ فِى الْاِقَامَةِ فَلَمَّا اَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا وَقَالَ فِىْ سَائِرِ الْاِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ عُمَرَ فِى الْاَذَانِ .رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤدَ-

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ-

তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।"[৪৩] [আবূ দাঊদ এবং বায়হাক্বী 'দাওয়াত-ই কবীর'-এর মধ্যে এটা বর্ণনা করেছেন।]

৬২০।। হযরত আবূ উমামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, অথবা অন্য কোন সাহাবী থেকে, তিনি বলেন, হযরত বেলাল তাকবীর (ইক্বামত) বলতে আরম্ভ করলেন। যখন তিনি বললেন, 'ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালাত, তখন হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ্ সেটাকে স্থির ও স্থায়ী রাখুন।" আর অবশিষ্ট তাকবীরগুলোতেও তা বলেছেন, যা হযরত ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু)'র আযানের হাদীস-এ উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৪] [আবূ দাঊদ]

৬২১।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী দো'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না।"[৪৫] [আবূ দাঊদ, তিরমিযী]

এক. মুআয্যিন রাখা ও অপসারিত করার অধিকার ইমামের রয়েছে, দুই. আযান দিয়ে পারিশ্রমিক লওয়া জায়েয, কিন্তু না লওয়া উত্তম। কারণ, হুযূর এখানে পারশ্রমিক লওয়াকে হারাম বলেন নি; বরং বলেছেন তালাশ করে কোন আল্লাহ্র ওয়াস্তে আযানদাতা নিয়োগ করো।

স্মর্তব্য যে, ওই যুগে দ্বীনী কর্মের উপর পারিশ্রমিক লওয়া নিষিদ্ধ থাকলেও তা ছিলো ওই যুগের অবস্থানুসারে। এখন নিষিদ্ধ নয়। অন্যথায় সমস্ত দ্বীনী কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। দেখুন, হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু ব্যতীত বাকী সব খলীফা খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য পারিশ্রমিক নিয়েছেন; অথচ খিলাফত হচ্ছে- অধিকতর বড় ইমামত। তাছাড়া, হযরত ওমর ফারূক্ব তাঁর যুগে যোদ্ধা ও শাসকদের বেতন নির্দ্ধারণ করেছেন। অথচ জিহাদও ইবাদত এবং ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক নিয়োজিত হয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করাও।

৪২. হয়তো আযানের প্রথম আওয়াজ শুনতেই অথবা আযানের পর। দ্বিতীয় অর্থ বেশী প্রকাশ্য (নির্ভরযোগ্য)।

৪৩. যেহেতু সন্ধ্যার সময়ও দো'আ ক্বূল হবার, আর আযান হওয়াও। এ কারণে বিশেষভাবে ওই সময়ের জন্য এ দো'আ এরশাদ করা হয়েছে।

'আহ্বানকারীগণ' মানে মু'আয্যিনগণ। অর্থাৎ ওই মুআয্যিনদের ওই আওয়াজগুলোর বরকতে আমাকে ক্ষমা করো!

বুঝা গেলো যে, অন্য লোকের ইবাদতের ওসীলা নিয়ে দো'আ-প্রার্থনা করা জায়েয। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে, "হে আল্লাহ্! তোমার হাবীবের সাজদাগুলোর ওসীলায় আমাকে ক্ষমা করো।"

৪৪. এ থেকে বুঝা গেলো যে, আযানের মতো ইক্বামতেরও জবাব দেওয়া যেতে পারে। আর 'ক্বাদ্ ক্বা-মাতিস্ সালাত' বলার সময় এ দো'আ করা চাই।

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ اَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ اَلدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَاسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَفِىْ رِوَايَةٍ وَتَحْتَ الْمَطَرِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالدَّارِمِىُّ اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ وَتَحْتَ الْمَطَرِ ـ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَاِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ ـ

৬২২।। হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "দু'টি দো'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না, কিংবা খুব কমই প্রত্যাখ্যাত হয়- এক. আযানের সময়কার দো'আ[৪৬] এবং দুই. জিহাদের সময়কার দো'আ, যখন একে অপরকে ক্বতল করতে থাকো।"[৪৭] অপর এক বর্ণনায় এসেছে- বৃষ্টির সময়কার দো'আও।[৪৮] [আবূ দাঊদ, দারেমী] তবে দারেমী বৃষ্টির কথা উল্লেখ করেন নি।

৬২৩।। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আরয করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! মুআয্‌যিনরা তো আমাদের আগে চলে যাবে।"[৪৯] রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "তারা যা বলে, তোমরাও তা বলে নাও।[৫০] যখন বলা শেষ করবে, তখন চেয়ে নাও। তোমাকেও দেওয়া হবে।"[৫১] [আবূ দাঊদ]

স্মর্তব্য যে, বর্ণনাকারীর একথা বলা- 'কোন সাহাবী বলেছেন, হাদীসকে দুর্বল করো না। কেননা, সমস্ত সাহাবী 'আদিল' দ্বীনের উপর অটল, উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য। তাক্বওয়া ও মানবতার গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত। কেউ ফাসিক্ব নন।

৪৫. প্রকাশ তো এটাই থাকে যে, এটা দ্বারা আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী পূর্ণ সময়ের কথা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর অভ্যন্তরে যে কোন দো'আই করা হোক, কবূল হবে। কিন্তু উত্তম হচ্ছে আযান শেষ হবার সাথে সাথেই দো'আ করা, যাতে পরবর্তী হাদীস অনুসারে কাজ সম্পন্ন হয়। কোন সাহাবী আরয করলেন, "হুযূর! আমরা তখন কিসের জন্য দো'আ করবো?" এরশাদ করলেন, "দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা ও সুস্থতা চাও।"

৪৬. অর্থাৎ মুআয্‌যিন আযান শেষ করার সাথে সাথে; আযানের মধ্যবর্তী সময়ে নয়। কারণ, তাতো আযানের জবাব দেবার সময়।

৪৭. অর্থাৎ ক্বতল ও রক্তপাত ঘটানোর সময়ের অভ্যন্তরে, যখন ধর্মীয় যোদ্ধা কাফিরদেরকে ক্বতল করতে থাকেন এবং কাফিরদের হাতে শহীদ হতে থাকেন। কারণ, তা হচ্ছে উৎকৃষ্টতম ইবাদত। يُلْحِمُ - اِلْحَام থেকে গৃহীত। এর অর্থ গোশ্‌ত কর্তন করা অর্থাৎ ক্বতল করা।

৪৮. কেউ কেউ হাদীসে পাকের শব্দ تَحْتَ (নিচে) শব্দটির কারণে বলেছেন, "বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে ভিজে ভিজে দো'আ করবে। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে বৃষ্টির সময় যে কোন স্থানে রয়ে দো'আ করলে তা কবূল হবে; বিশেষ করে রহমতের বৃষ্টি; যা অপেক্ষা করা ও দো'আ-প্রার্থনার পর বর্ষিত হয়।

৪৯. অর্থাৎ ক্বিয়ামতে আমরা তাদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবো না। কেননা, সমস্ত ইবাদতে আমরা এবং তারা সমান। কিন্তু আযানে তারা আমাদের থেকে আগে।

বুঝা গেলো যে, দ্বীনী কার্যাদিতে ঈর্ষা (ভাল অর্থে) করা জায়েয বরং কখনো ইবাদতও।

৫০. এ থেকে বুঝা গেলো যে, আযানের সমস্ত কলেমা মুআয্‌যিনের সাথে সাথে বলবে। এমনকি 'হাইয়্যা 'আলাস্ সোয়ালাহ্', 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্'ও। কিন্তু ওই দু'টির সাথে 'লা-হাওলা'ও পড়ে নেবে। এর বিশ্লেষণ ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطٰنَ اِذَا سَمِعَ النِّدَآءَ بِالصَّلٰوةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ الرَّاوِيُّ وَ الرَّوْحَاءُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى سِتَّةٍ وَّ ثَلٰثِيْنَ مِيْلاً . رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ اِنِّىْ لَعِنْدَ مُعٰوِيَةَ اِذْ اَذَّنَ مُؤَذِّنُه، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُه، حَتّٰى اِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَلَمَّا

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৬২৪।। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে এরশাদ করতে শুনেছি, শয়তান যখন নামাযের আযান শোনে তখন পালিয়ে যায়,[৫২] 'রূহা' পর্যন্ত পৌঁছে যায়।[৫৩] বর্ণনাকারী বলেছেন, 'রূহা' মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে ৩৬ মাইলের দূরত্বে অবস্থিত।[৫৪] [মুসলিম]

৬২৫।। হযরত আলক্বামাহ্ ইবনে ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত,[৫৫] তিনি বলেন, আমি হযরত মু'আবিয়ার নিকট ছিলাম। তখন তাঁর মু'আয্যিন আযান দিলেন। হযরত মু'আবিয়াও তা-ই বলেছেন, যা মুআয্যিন বলেছে, এ পর্যন্ত যে, যখন সে 'হাইয়্যা আলাস্ সোয়ালাহ্' বললো, তখন তিনি বলেছেন, 'লা-হাওলা ওয়ালা-ক্বু ওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্।' অতঃপর যখন

---

৫১. অর্থাৎ যে দো'আই চাও, করো! উত্তম হচ্ছে প্রথমে হুযূরের জন্য ওসীলাহ্ প্রার্থনা করবে। তারপর নিজের জন্য দো'আসমূহ; যাতে সমস্ত হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়। সাধারণত মুসলমানগণ 'ওসীলাহ্'র পর এ দো'আর মধ্যে একথাও বলে ফেলে- وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ (এবং আমাদেরকে তাঁর সুপারিশ দান করো।)

ওহাবীরা এটা বলতে বাধা দেয়। আর বিদ্'আত' বলে আখ্যায়িত করে তাতে বাধা দেয়। সম্ভবত তাদের হুযূরের সুপারিশের দরকার হবে না! তারা যেনো এ হাদীস শরীফ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কারণ, এখানে سَلْ (চাও) শব্দটি শর্তহীনভাবে এরশাদ করা হয়েছে।★

৫২. প্রকাশ থাকে যে, এখানে 'শয়তান' মানে 'ইবলীস'। যে জিন্দের সর্বোচ্চ পুরুষ। এটাও হতে পারে যে, তা দ্বারা 'সাথী-শয়তান' বুঝায়, যে প্রত্যেক মানুষের সাথে থাকে। অথবা সমস্ত শয়তান বুঝায়।

৫৩. অর্থাৎ নামাযী থেকে ততদূরে পালিয়ে যায়, যতটুকু দূরত্ব মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে 'রূহা' পর্যন্ত রয়েছে।

৫৪. এখানে বর্ণনাকারী মানে আবূ সুফিয়ান ত্বালহা ইবনে নাফি' মক্কী। তিনি বলেন যে, 'রূহা' মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে মক্কার দিকে ২৬ মাইল, অর্থাৎ (প্রায়) ১২ ক্রোশ। (এক ক্রোশ = দুই মাইল অপেক্ষা কিছু বেশী।)

এ থেকে শয়তানের গতি-ক্ষমতা বুঝা যায়। সে চোখের পলক মারতেই ২৬ মাইল আসা-যাওয়া করতে পারে। তা পারবেও না কেন? সেতো আগুনের তৈরী। আগুনের গতি দেখতে চাইলে আজকালকার বিদ্যুতের গতি দেখে নাও। যখন আগুনের এমন গতি হয়, তখন আল্লাহ্র ওলীগণ এবং

★ ফিক্বহ্ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব সগীরীতে আযানের দো'আ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ্দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াস্ সোয়ালা-তিল ক্বা-ইমাতি, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসী-লাতা ওয়াল ফদ্বী-লাতা ওয়াদ্ দারাজতার্ রাফী-'আতা ওয়াব্'আস্হু মাক্বা-মাম্ মাহমূ-দানিল্লাযী-'ওয়া'আত্তাহ্। ওয়ারযুক্বনা-'শাফা-'আতাহু ইয়াউমাল ক্বিয়া-মাহ্; ইন্নাকা-লা তুখ্লিফুল মী-'আদ।

قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَقَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذٰلِكَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِىْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ النَّسَائِىُّ-

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَاَنَا وَاَنَا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ -

'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বললো, তখন তিনি বললেন, "লা-হাওলা ওয়ালা ক্বূওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আযী-ম।"[৫৬] এরপর তা-ই বললেন, যা মুআয্যিন বলেছে। তারপর বললেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এটাই বলতে শুনেছি।" [আহমদ]

৬২৬।। হযরত আবূ হোয়ারায় রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। ইত্যবসরে হযরত বেলাল আযান দিতে দণ্ডায়মান হলেন। তিনি যখন নিশ্চুপ হলেন, তখন আল্লাহ্র রসূল (হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে ওইভাবে বলবে, যা সে বলেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৫৭] [নাসাঈ]

৬২৭।। হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মু'আয্যিনকে উভয় শাহাদত বলতে শুনতেন, তখন এরশাদ ফরমাতেন, "এবং আমিও এবং আমিও।"[৫৮] [আবূ দাঊদ]

সম্মানিত নবীগণের মতো নূরী সত্তাগুলোর গতির কথা বলার অপেক্ষাই রাখে না। ক্বোরআন করীম এরশাদ করেছে- বনী ইস্রাঈলের ওলী আসিফ ইবনে বরখিয়াহ্ চোখের পলক মারার পূর্বেই সুদূর ইয়েমেন থেকে বিলক্বীসের সিংহাসন সিরিয়ায় নিয়ে এসেছেন। মি'রাজের রাতে সমস্ত নবী বায়তুল মুক্বাদ্দাসে হুযূরের পেছনে নামায পড়েছেন, হুযূর বিদ্যুৎ-গতিসম্পন্ন বোরাক্বের উপর সাওয়ার হয়ে চোখের পলক মারার সমান সময়ের মধ্যে আসমানগুলোর উপর পৌঁছেছেন। সুতরাং এ নবীগণ আগে ভাগে পৌঁছে সেখানে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য হাযির ছিলেন। এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' ঃ ১ম খণ্ডে দেখুন।

৫৫. তিনি লায়সী (লায়স গোত্রীয়)। হুযূরের যুগে পয়দা হয়েছেন। হযরত শায়খ বলেছেন, তিনি তাবে'ঈ। কিন্তু 'মিরক্বাত'-এ আছে- তিনি সাহাবী। খন্দকের যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগে মদীনা-ই পাকে ওফাত পান।

৫৬. অর্থাৎ 'হাইয়্যা আলাস্ সোয়ালাহ্' ও ফালাহ্' শোনার পর শুধু 'লা-হাওলা...' পড়লেন। অর্থাৎ (আযানের এ) কলেমাগুলো পুনরায় বলেন নি। কিছু সংখ্যক আলিমের অভিমত এটাই; কিন্তু বেশী শক্তিশালী অভিমত হচ্ছে- এ কলেমাগুলোও পুনরায় বলেছেন এবং লা-হাওলা শরীফও পড়েছেন; যেমন ইতোপূর্বে আরয করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, হয়তো হুযূর 'হাইয়্যা আলাস্ সোয়ালাহ্' শোনার পরও পূর্ণ 'লা-হাওলাই' পড়েছেন; কিন্তু বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্ত করেছেন।

৫৭. প্রকাশ থাকে যে, এতে আযানের জবাব-এর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান এনে এ কলেমাগুলো পুনরায় বললে সে জান্নাতী। যদি কাফির ঠাট্টা স্বরূপ আযানের

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَذَّنَ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَاْذِيْنِهٖ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَّ لِكُلِّ اِقَامَةٍ ثَلٰثُوْنَ حَسَنَةً . رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ

وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ

৬২৮।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি বার বছর আযান দেবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।[৫৯] আর প্রতিদিন তার আযানের পরিবর্তে ষাটটি নেকী ও তাকবীর (এক্বামত)'র পরিবর্তে ত্রিশটা নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে।"[৬০] [ইবনে মাজাহ্]

৬২৯।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমাদেরকে মাগরিবের আযানের সময় দো'আ করার হুকুম দেওয়া হতো।"[৬১] [বায়হাক্বী, দা'ওয়াত-ই কবীর]

শব্দগুলোর অবতারণা করে, তবে তার কুফর আরো জঘন্য হবে। এতে ইঙ্গিতে একথা বলা হয়েছে যে, যখন আযানের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির এমন সাওয়াব, তখন আযান দিলে কেমন সাওয়াব হবে?

৫৮. অর্থাৎ আমিও আল্লাহ্‌র একত্ব ও আপন রিসালতের সাক্ষ্য দিচ্ছি। স্মর্তব্য যে, আমরা তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য শুনেই দিচ্ছি, আর হুযূর দিচ্ছেন দেখে। কেননা, হুযূর মহান রবের যাত ও সিফাত এবং অদৃশ্য জগতকে স্বচক্ষে দেখেছেন। তাছাড়া, হুযূরের নুবূয়তের ইল্‌ম আমাদের জন্য 'ইল্‌মে হুযূরী'। কেননা, রিসালত হুযূরের নিজস্ব গুণ। তাছাড়া, হুযূরের কলেমা এটাও ছিলো– 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল'। এটাও বলতেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল।' অর্থাৎ হুযূর কখনো ওইভাবে কলেমা পড়তেন, কখনো এভাবেও বলতেন। যদি আমরা বলি যে, 'আমি আল্লাহ্‌র রসূল' তবে তো কাফির হয়ে যাবো। একটা কলেমা হুযূরের জন্য ঈমানের কলেমা। কিন্তু আমাদের জন্য কুফর। 'আত্তাহিয়্যাত'-এর মধ্যেও আমরা পড়ি– 'আস্‌সালামু আলায়কা আইয়্যুহান নাবিয়্যু।' (অর্থাৎ হে নবী! আপনার উপর সালাম।) হুযূর কখনো এমনও পড়তেন, আবার কখনো পড়তেন– 'আস্‌সালামু আলাইয়্যা।' [মিরক্বাত]

৫৯. প্রথমে সাত বছর আযান দেওয়ার জন্য দোযখ থেকে নাজাত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো, এখানে বার বছরের বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। কেননা, আযানে যেমন নিষ্ঠা, তেমনি সেটার জন্য সাওয়াব। হযরত বেলাল এক আযানের জন্য ওই সাওয়াব পাবেন, যা সারা দুনিয়ার মু'আয্‌যিনগণ গোটা জীবনের আযানগুলোর বিনিময়েও পাবে না। হতে পারে যে, প্রথমে বার বছরের আযানের জন্য জান্নাতের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে, তারপর রহমতকে প্রশস্ত করে সাত বছরের আযানের জন্য এ ওয়াদা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এ হাদীস, প্রথম হাদীস (অর্থাৎ সাত বছরের বর্ণনা সম্বলিত হাদীস) দ্বারা মান্‌সূখ (রহিত)।

৬০. অর্থাৎ 'তাকবীর' (ইক্বামত)-এর সাওয়াব আযানের অর্দ্ধেক। কেননা, তাকবীর শুধু মসজিদে উপস্থিত মুসাল্লীদের জন্য। আর আযান হচ্ছে– সমস্ত লোকের জন্য। তাছাড়া, তাকবীর (ইক্বামত) বলা সহজ, আযানে কষ্ট আছে। সাওয়াব কষ্ট অনুসারে পাওয়া যায়। 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, এ সাওয়াব বার বছর যাবত আযানদাতার জন্য খাস নয়, বরং যে কেউই নিষ্ঠা সহকারে আযান বলবে, সেও ইন্‌শা-আল্লাহ্ এ সাওয়াব পাবে এবং আযান ও ইক্বামতের জবাবদাতাও ইনশা-আল্লাহ্ এ সাওয়াবের উপযোগী হবে। যেমন পূর্ববর্তী হাদীসগুলো থেকে জানা গেছে।

৬১. খুব সম্ভব এটা দ্বারা ওই দো'আর কথা বুঝানো হয়েছে, যা হযরত উম্মে সালামাহ্‌র বর্ণনায় গত হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, কেউ কেউ আযানের দো'আয় হাত উঠাতে নিষেধ করে। বস্তুতঃ এটা (নিষেধ করা) দুরস্ত নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত ক্বোরআন-হাদীস ইত্যাদি থেকে নিষেধ প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিষেধ করার কি অধিকার আছে? প্রত্যেক

بَابٌ فِيهِ فَصْلَانِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بِلَالًا يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىْ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ وَكَانَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ رَجُلًا اَعْمٰى لَا يُنَادِىْ حَتّٰى يُقَالَ لَهٗ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

একটি বিশেষ অধ্যায়, যাতে দু'টি পরিচ্ছেদ রয়েছে[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৬৩০।। **হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "বেলাল রাতে আযান দেয়, (ওদিকে) তোমরা পানাহার করতে থাকো[২] যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়।" (বর্ণনাকারী) বলেন, "ইবনে উম্মে মাকতূম অন্ধ লোক ছিলেন। তিনি আযান দিতেন না, যতক্ষণ না তাঁকে বলা হতো, "ভোর হয়ে গেছে, ভোর হয়ে গেছে।"[৩]** [মুসলিম, বোখারী]

প্রকারের দো'আয় হাত উঠানো সুন্নাত বলে প্রমাণিত। যেমন- দো'আসমূহের বিবরণ সম্বলিত অধ্যায়ে আসবে ইন্‌শা-আল্লাহ্! নামাযের দো'আগুলো ব্যতীত। সেখানে নামাযে মশগুল থাকার কারণে হাত উঠাতে পারে না। মোল্লা আলী ক্বারী 'মিরক্বাত'-এর মধ্যে আহারের পরবর্তী দো'আয় হাত উঠাতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু এর কারণ এটা বলেছেন যে, হতে পারে তখনো কোন লোক আহাররত আছে। তখন তারা লজ্জা পাবে- এ ভেবে যে, 'সবাই খেয়ে উঠে গেছে, আমরা এখনো খাচ্ছি।' এটাও তাঁর নিজস্ব অভিমত। এর কারণ এটাই; শরীয়তের বিশেষ কোন নিষেধের কারণে নয়।

****

১. যেহেতু এ অধ্যায়ে আযান সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনাসম্বলিত হাদীস আসবে, সেহেতু লিখক এ অধ্যায়ের শিরোনাম স্থির করেন নি।

২. খুব সম্ভব সর্বদা ফজরের দু'টি আযান হতো- একটা তাহাজ্জুদ ও সাহারীর জন্য, দ্বিতীয়টা ফজরের নামাযের জন্য। প্রথম আযান হযরত বিলাল দিতেন, আর দ্বিতীয়টি দিতেন সাইয়্যেদুনা ইবনে উম্মে মাক্তূম। এখনও মদীনা মুনাওয়ারায় তাহাজ্জুদের আযান হয়। যেহেতু এ দু'টি আযানের আওয়াজ ও সম্পাদনের নিয়মের মধ্যে পার্থক্য করা হচ্ছিলো, সেহেতু মানুষের মধ্যে সংশয় থাকতো না।

৩. এ থেকে কয়েকটা মাসআলা বুঝা গেলো ঃ

এক. আযান শুধু নামাযের জন্য খাস নয়, অন্যান্য উদ্দেশ্যেও দেওয়া যেতে পারে। দেখুন, সাইয়্যেদুনা বিলালের এ আযান সাহারীর জন্য জাগানোর নিমিত্তে দেওয়া হতো।

দুই. ফজর কিংবা অন্য কোন নামাযের আযান যদি সময়ের পূর্বে হয়ে যায়, তবে সময় হলে পুনরায় তা বলতে হবে। দেখুন, সাইয়্যেদুনা বিলালের আযান যথেষ্ট বলে সাব্যস্ত করা হয় নি। ইমাম আ'যমের মায্হাব এটাই। ইমাম শাফে'ঈর মতে আযান ফজরের সময় হবার পূর্বে দেওয়াও জায়েয- এই হাদীস শরীফের ভিত্তিতে; কিন্তু এ দলীল দুর্বল; অন্যথায় দ্বিতীয়বার আযানের কি প্রয়োজন ছিলো?

তিন. অন্ধকে আযানের জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে, যখন তাকে সময় সম্পর্কে অবগতকারী কেউ থাকে।

চার. এক মসজিদে দু' বা দু'এর বেশী মুআয্যিনও থাকতে পারে।

পাঁচ. সাহারীর জন্য জাগানোর নিমিত্ত আযান দেওয়াও জায়েয; বরং সুন্নাত (হুযূরের পবিত্র নির্দেশলব্ধ আমল) থেকে প্রমাণিত; অবশ্য এটা তখনই দেওয়া যাবে, যখন লোকেরা ওই আযান দ্বারা সংশয়ে না পড়ে। অন্যথায় মোটেই দেওয়া যাবে না। আমাদের দেশে আযান দেওয়া সোবহে সাদেক্ব হবার চিহ্ন। যদি এখানে সাহারীর জন্য আযান দেওয়া হয়, তবে কেউ কেউ ফজর হয়ে গেছে সন্দেহ করে সাহারী খেতে পারবে না, অথবা দ্বিতীয় আযানকে প্রথম আযান মনে করে দিনে (সোবহে সাদিক্বের পর) সাহারী আহার করে রোযা বিনষ্ট করে ফেলবে। এ কারণে, বর্তমানে অবশ্যই তদনুযায়ী আমল করা যাবে না। অনেক কিছু

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ وَّلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ وَلٰكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيْرَ فِي الْاُفُقِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَفْظُهٗ لِلتِّرْمِذِيِّ۔

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِّيْ فَقَالَ اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

৬৩১।। হযরত সামুরাহ্ ইবনে জুন্দাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদেরকে যেনো সাহারী থেকে না বেলালের আযান রুখে, না দীর্ঘ ফজর; কিন্তু (রুখবে) আসমানের কিনারায় প্রসারিত 'ফজরই'।[৪] [মুসলিম] এর বচনগুলো তিরমিযীর।

৬৩২।। হযরত মালিক ইবনে হুয়াইরেস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত,[৫] তিনি বলেন, "আমি ও আমার এক চাচাতভাই হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে হাযির হলাম।[৬] তিনি এরশাদ করলেন, "যখন তোমরা উভয়ে সফর করো, তখন আযান ও তাকবীর বলো। আর তোমাদের মধ্যে বড়জন ইমামত করবে।[৭] [বোখারী]

সাহাবা-ই কেরামের যুগে দুরস্ত (বৈধ) ছিলো, কিন্তু এখন নিষিদ্ধ। দেখুন, ওই যুগে জুতো পরে মসজিদে প্রবেশ করা এবং জুতো সহকারে নামায সম্পন্ন করার প্রচলন ছিলো; এখন নিষিদ্ধ। পাকা দালান নির্মাণ করা নিষিদ্ধ ছিলো, এখন জায়েয (বৈধ)। ক্ষেত-খামার করতে লোকদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু এখন জরুরী। যাকাতের ব্যয়স্থল ছিলো আটটি, এখন সাতটি। অবস্থার পরিবর্তনের কারণে জরুরী (সাময়িক) বিধানাবলীও বদলে যায়।

৪. ভোর দু'টি– সাদিক্ব ও কাযিব। সোব্হে কাযির হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিমাকাশে চিতাবাঘের লেজের মতো লম্বা সাদা রেখার মতো দেখায়, যা প্রকাশ পাবার পর অদৃশ্য হয়ে যায়। এ কারণে কিছুক্ষণ পর দক্ষিণ ও উত্তরাকাশে শুভ্রতা প্রকাশ পায়, যা পরবর্তীতে প্রসারিত হয়ে যায়। এর নাম সোবহে সাদিক্ব। তখন থেকেই দিন আরম্ভ হয়।

সুবহা-নাল্লাহ্! হুযূর একটি শব্দ 'মুস্তাত্বীল' এরশাদ করে শত শত মাসআলা বলে দিলেন।

৫. তাঁর নাম মালিক, কুনিয়াৎ (উপনাম) আবূ সুলায়মান, বনী-লায়স নামক গোত্রের লোক। একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে হুযূরের বরকতময় দরবারে হাযির হন। বিশ দিন হাযির রইলেন। বসরায় বসবাস করতেন। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিকের যুগে ৭৪ হিজরীতে সেখানেই ওফাত পান।

৬. বিদায় নেয়ার জন্য। বিশ দিন যাবৎ অবস্থান করার পর জানতে পারলেন যে, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে রওনা হবার প্রাক্কালে নবী পাকের পবিত্রতম দরবারে হাযির হওয়া সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাত। এখনো হাজীগণ মক্কা মুকাররামাহ্ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় 'তাওয়াফ-ই বিদা' (বিদায়ী তাওয়াফ) করেন। আর মদীনা পাক থেকে বিদায়ী যাত্রা করার প্রাক্কালে 'সালাম-ই- বিদা' (বিদায়ী সালাম) পেশ করেন।

৭. অর্থাৎ আযান ও তাকবীর (ইক্বামত) যে কেউ বলে দিলে চলবে; কিন্তু ইমামত করবে বড়জনই। সফরের শর্ত এজন্য আরোপ করা হয়েছে যে, সফরের কোন স্থান নির্দিষ্ট থাকে না। মসজিদগুলোতে যেই ইমাম নিয়োজিত থাকবেন তিনিই ইমামত করবেন। ছোট হোক কিংবা বড় হোক। যেমন– অন্যান্য বর্ণনায় রয়েছে। 'বড়'-এর সংজ্ঞায় বহু তাফসীল রয়েছে– জ্ঞানে বড়, ক্বোরআনের ক্বিরআতে বড়, তাক্বওয়া ও পরহেযগারীতে বড়, বয়সে বড়।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, আযান অপেক্ষা ইমামত উত্তম। একথাও বুঝা গেলো যে, সফরেও যথাসম্ভব জমা'আত সহকারে নামায সম্পন্ন করা চাই। তা'ছাড়া যদি

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ وَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَسَارَ لَيْلَةً حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْكَرٰى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ اِكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلّٰى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَاَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اِسْتَنَدَ بِلَالٌ اِلٰى

৬৩৩।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা তেমনিভাবে নামায পড়ো যেমন আমাকে নামায পড়তে দেখেছো।[৮] যখন নামাযের সময় হয়, তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বড়জন ইমামত করবে।[৯] [মুসলিম, বোখারী]

৬৩৪।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন,[১০] তখন রাতভর পথ অতিক্রম করছিলেন। যখন হুযূরের ঘুম আসতে লাগলো, তখন রাতের শেষ ভাগে যাত্রাবিরতি করলেন। আর হযরত বেলালকে বললেন, "রাতে আমাদের হেফাযত করো।[১১] হযরত বেলালের পক্ষে যতটুকু সম্ভব হলো, নামায পড়তে থাকেন।[১২] নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর যখন ভোর সন্নিকটে আসলো, তখন হযরত বেলালও আপন সাওয়ারীর সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন

দু'জন লোকও হয়, তবুও জমা'আত কায়েম করবে; পৃথক পৃথক নামায পড়বে না।

কোন কোন আলিম এ হাদীসের ভিত্তিতে আযানকে 'ফরয' বলেছেন; কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে আযান দেওয়া সুন্নাত। অবশ্য, দ্বীনের শি'আর বা অনিবার্য চিহ্ন; যাতে বাধা দিলে জিহাদ করা ওয়াজিব।

৮. সুব্হা-নাল্লাহ্! এ কেমন ঈমান সঞ্জীবকারী কলেমা। অর্থাৎ আমি ও আমার কার্যাদি ক্বোরআনের সবাক ব্যাখ্যা। মহান রব শুধু নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন, সম্পন্ন করার পদ্ধতি বলেন নি। এরশাদ করা হচ্ছে– নামায কায়েম করো। এর তাফসীর বা কার্যতঃ ব্যাখ্যা হলাম আমি এবং আমার কর্ম। সমগ্র ক্বোরআনের অবস্থা এটাই। কবি বলেন–

تیری سیرت کو ہم قرآن کی تفسیر کہتے ہیں

(অর্থাৎ আপনার কর্মপদ্ধতিকেই আমরা ক্বোরআনের তাফসীর বলে থাকি।)

৯. অর্থাৎ আযান ও নামায উভয়টি যেনো (নির্দ্ধারিত) সময়ের মধ্যে হয়। সুতরাং কোন আযান সময়ের পূর্বে দেওয়া বৈধ নয়। (হানাফী মাযহাব) 'আকবার' (বড়জন)-এর তাফসীর এখনই করা হয়েছে।

১০. মদীনা মুনাওয়ারার দিকে। এ যুদ্ধ ৭ম হিজরীর মুহাররাম মাসে সংঘটিত হয়েছে। প্রায় ১৭ দিন মুসলমানগণ খায়বার অবরোধ করে রেখেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা শানদার বিজয় দান করেছেন। খায়বার মদীনা-ই পাক থেকে ৩ মানযিল দূরত্বে অবস্থিত।

১১. এ রাতের নাম 'তা'রীস-রাত্রি'। আর এ ঘটনার নামও 'তা'রীস'-এর ঘটনা। 'তা'রীস' (تعریس) মানে শেষ রাতে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য যাত্রাবিরতি করা। এ থেকে বুঝা গেলো যে, বুযুর্গদের জন্য আপন খাদিমদের থেকে সেবা গ্রহণ করা বৈধ। তাছাড়া, দাস-দাসীদেরকে নিজেদের রক্ষী হিসেবে নিয়োগ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

رَاحِلَتِهٖ مُوَجِّهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى رَاحِلَتِهٖ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا بِلَالٌ وَّ لَا اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ حَتّٰى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَوَّلَهُمْ اِسْتِيْقَاظًا فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اَىْ بِلَالُ فَقَالَ بِلَالٌ اَخَذَ بِنَفْسِىْ الَّذِىْ اَخَذَ بِنَفْسِكَ قَالَ اِقْتَادُوْا فَاقْتَادُوْا

পূর্বদিকে মুখ করে। সাওয়ারীর সাথে হেলান দেওয়ার অবস্থায় তাঁর চোখে ঘুম এসে গেলো।[১৩] অতঃপর না হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন, না বেলাল, না অন্য কোন সাহাবী। শেষ পর্যন্ত তাঁদের গায়ে রোদ স্পর্শ করলো।[১৪] তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভয় পেয়ে গেলেন। আর এরশাদ ফরমালেন, "হে বেলাল!"[১৫] তখন হযরত বেলাল আরয করলেন, "আমার প্রাণ তিনিই নিয়ে গেছেন, যিনি আপনার প্রাণ মুবারক নিয়ে গেছেন।"[১৬] এরশাদ ফরমালেন, "যানবাহনগুলো চালাও!" সাহাবীগণ তাঁদের যানগুলোকে কিছুদূর চালালেন।[১৭]

১২. অর্থাৎ যত নফল নামায এ রাতে তাঁর অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ ছিলো এবং যেগুলো পড়ার সামর্থ্যও তাঁর ছিলো, তিনি ততটুকু পড়েছেন।

১৩. অর্থাৎ তাঁর নিয়্যত কিন্তু ঘুমানোর ছিলো না, বরং বসে ভোর উদয় হচ্ছে কিনা দেখারই ইচ্ছা ছিলো। এ কারণে তিনি শয়ন করেন নি; বরং বসা অবস্থায় ছিলেন। আর মুখও করেছিলেন পূর্বদিকে। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন যে, তিনি নিজ ক্ষমতার বাইরে চলে গেলেন। সুতরাং একথা বলা যাবে না যে, তিনি সরকারী নির্দেশের বিরোধিতা করেছেন।

১৪. অর্থাৎ রোদের গরমের কারণে জাগ্রত হলেন। স্মর্তব্য যে, হুযূরের বরকতময় চোখ দু'টি ঘুমাতো, হৃদয় মুবারক জাগ্রত থাকতো। কিন্তু ভোর, অন্ধকার ও উজালা দেখা চোখের কাজ; হৃদয়ের নয়। সুতরাং এ ঘটনা এ হাদীসের বিরোধী নয়।

স্মর্তব্য যে, হুযূরের নিদ্রা আলস্য পয়দা করে না। সুতরাং ঘুমের কারণে হুযূরের ওযূ ভাঙ্গতো না। আজ নামায আলস্যের কারণে ক্বাযা হয় নি, বরং মহান রব আপন প্রিয়জনকে নিজের দিকে মনোনিবেশ করিয়ে নিয়েছেন এবং এদিক থেকে মনোযোগকে সরিয়ে নিয়েছেন, যা'তে উম্মতগণ ক্বাযা নামায পড়ার বিধানাবলী জানতে পারে। সুতরাং হাদীসের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

১৫. তুমি এ কি করলে? আমাদেরকে নামাযের জন্য জাগালে না কেন? এ থেকে বুঝা গেলো যে, নামায ক্বাযা হয়ে গেলে ভীত হয়ে পড়াও সুন্নাত এবং ইবাদত, যার জন্য বড় সাওয়াব পাওয়া যায়।

১৬. অর্থাৎ যে প্রজ্ঞাময় রব আপনাকে এ সময় জাগতে দেন নি, তিনিই আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন। এ বাক্যে এ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে–

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا

(অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রাণগুলোকে ওফাত প্রদান করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যারা মৃত্যুবরণ করে না তাদেরকে তাদের নিদ্রার সময়; ৩৯:৪২, তরজমা– কান্‌যুল ঈমান)

সুবহানাল্লাহ্! কতোই মুবারক জবাব। অর্থাৎ আমাদের এ নিদ্রারত রয়ে যাওয়া 'শয়তানী' কিংবা 'নাফসানী' (রিপুর কু-প্রবৃত্তিগত) নয়, বরং 'রাহমানী' (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই)। এতে ঈমান ও ইসলামের স্বার্থ রয়েছে।

১৭. অর্থাৎ এ মরুভূমি থেকে চলো! নামায সামনে পড়বো। কেননা, তখন সূর্য উদিত হচ্ছিলো। তখন নামায পড়া জায়েয ছিলো না। কিছুদূর এগিয়ে গেলে সফরও কিছুটা কমে যাবে। আর মাকরূহ ওয়াক্বতও অতিবাহিত হয়ে যাবে। আরবে ঠাণ্ডার সময়েই লোকেরা সফর করে থাকেন।

স্মর্তব্য যে, সূর্য চমকিত হবার বিশ মিনিট পর নামায পড়া বৈধ হয়। এ হাদীস ইমাম-ই আ'যমের মজবুত দলীল। এ মর্মে যে, সূর্য উদিত হবার সময় না ফরয নামায পড়া জায়েয, না নফল নামায। ইমাম শাফে'ঈর মতে তখন

رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى بِهِمِ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّلٰوةَ فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ قَدْ خَرَجْتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَاْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ

তারপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওযূ করলেন। আর হযরত বেলালকে নির্দেশ দিলেন। তিনি নামাযের জন্য তাকবীর (ইক্বামত) বললেন। তারপর (হুযূর) তাঁদেরই সবাইকে ফজরের নামায পড়ালেন। যখন নামায পূর্ণ করে নিলেন, তখন এরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায়, তখন স্মরণ আসতেই তা পড়ে নেবে।" আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান, "আমার স্মরণ আসতেই নামায কায়েম করো।"[১৮] [মুসলিম]

৬৩৫।। হযরত আবূ ক্বাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন নামাযের তাকবীর (ইক্বামত) বলা হয়, তখন দণ্ডায়মান হবে না, যতক্ষণ না আমাকে বের হতে দেখতে পাও।"[১৯] [মুসলিম, বোখারী]

৬৩৬।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন নামাযের তাকবীর বলা হয়, তখন দৌড়ে এসো না, বরং হেঁটে প্রশান্তি সহকারে এসো।[২০] যা পেয়ে যাও তা-ই পড়ে নাও। আর যা বাদ পড়ে

ফজরের ক্বাযা পড়া জায়েয।

১৮. অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত অবস্থায় নামায ক্বাযা হয়ে গেলে গুনাহ্ হয় না। স্মর্তব্য যে, এখানে নামাযের আযানও দেওয়া হয়েছে এবং তাকবীর (ইক্বামত)ও, সুন্নাত নামাযও পড়া হয়েছে। আর জমা'আত সহকারে নামাযও। সুতরাং এ হাদীস শরীফ থেকে অনেক ফিক্বহী মাস্আলার সমাধান পাওয়া গেলো।

১৯. অর্থাৎ "তাকবীরের সময় কাতারে প্রথম থেকে দাঁড়িয়ে যেও না; ববং যখন আমাকে হুজুরা শরীফ থেকে বের হতে দেখো তখনই দণ্ডায়মান হও।" এতে নামাযের জন্য দাঁড়ানোর সাথে সাথে হুযূরের জন্য ক্বিয়াম-ই তা'যীমী (হুযূরের সম্মানার্থে দাঁড়ানো)ও হয়ে যেতো। হুযূর করীম 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বলার সময় হুজুরা শরীফ থেকে বাইরে তাশরীফ আনতেন। এখনো সুন্নাত হচ্ছে এটাই যে, মুক্বতাদী কাতারে বসে তাকবীর (ইক্বামত) শুনবে, আর 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বলার সময় দাঁড়াবে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইমামের অনুপস্থিতিতে ইক্বামত বলা জায়েয, যখন চিহ্নাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম তাশরীফ আনয়নকারী। এর আলোচনা কিছুটা পূর্বে করা হয়েছে।

২০. অর্থাৎ জমা'আত (না পাবার) আশঙ্কা করে দৌড়ে এসো না। কারণ, এতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার এবং আঘাত পাবার আশঙ্কা থাকে।

স্মর্তব্য যে, মহান রব যে এরশাদ করেছেন–
فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ (ফাস্'আউ ইলা-যিক্রিল্লা-হি। ৬২:৯)

فَاتِمُّوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ يَعْمِدُ اِلَى الصَّلٰوةِ فَهُوَ فِىْ صَلٰوةٍ

وَ هٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِىْ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ عَرَّسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِطَرِيْقِ مَكَّةَ وَوَكَّلَ بِلَالًا اَنْ يُّوْقِظَهُمْ لِلصَّلٰوةِ فَرَقَدَ بِلَالٌ وَرَقَدُوْا حَتّٰى اسْتَيْقَظُوْا وَ قَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ فَقَدْ فَزِعُوْا فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّرْكَبُوْا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِىْ وَقَالَ اِنَّ هٰذَا

তা পূরণ করে নাও।"[২১] [মুসলিম, বোখারী] মুসলিমের বর্ণনায় আছে– "কেননা, যখন কেউ নামাযের ইচ্ছা করে, তখন সে নামাযের মধ্যে হয়ে যায়।"[২২]

এ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৬৩৭।। হযরত যায়দ ইবনে আস্‌লাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত,[২৩] তিনি বলেন, এক রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কার রাস্তায়[২৪] অবতরণ করলেন। আর হযরত বেলালকে এজন্য নিয়োগ করলেন যেন তাঁদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দেন। তখন হযরত বেলাল ও অন্য সব সাহাবী ঘুমিয়ে পড়লেন।[২৫] আর তখনই জাগ্রত হলেন, যখন তাঁদের উপর সূর্য চমকাচ্ছিলো। লোকেরা ভীত অবস্থায় জাগ্রত হলেন। তাঁদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন যেন আরোহণ করেন যে পর্যন্ত না ওই মরুভূমি থেকে দূরে বের হয়ে যান। আর এরশাদ ফরমালেন, "এ মরুভূমিতে

তাতে 'সা'ঈ' মানে দৌড়ানো নয়; বরং জুমু'আর নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ নেই।

২১. এ থেকে কয়েকটা মাস্‌'আলা বুঝা গেলো–

এক. জমা'আতে শামিল হবার জন্য শান্তভাবে আসা মুস্তাহাব। দৌড়ানো মুস্তাহাবের পরিপন্থী; হারাম নয়। সুতরাং ফারূক্বে আ'যমের একদিন দৌড়ে গিয়ে রুকূ'তে শামিল হওয়া না-জায়েয ছিলো না।

দুই. জমা'আতের শেষাংশ পাওয়া গেলে জমা'আত পাওয়া যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি জুমু'আহ্‌র নামাযের 'আত্তাহিয়্যাত' পেয়ে যায়, সে জুমু'আহ্‌র নামায পড়বে।

তিন. মুক্বতাদী এসে যেই রাক'আতে মিলিত হবে, সংখ্যা হিসেবে সেটা তার জন্য প্রথম রাক্‌'আত আর ক্বিরআত অনুসারে শেষ রাক্‌'আত।

২২. অর্থাৎ যখন থেকে সে নামাযের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, তখন থেকে সে নামাযের সাওয়াব পেতে থাকবে। সুতরাং ত্বরা কেন করবে? কেন হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে? কেন আঘাত ভোগ করবে? বরং প্রশান্তভাবে আসবে এবং যা পাবে তা সম্পন্ন করবে।

স্মর্তব্য যে, যদি 'তাকবীর-ই উলা' কিংবা রুকূ' পাওয়ার জন্য কিছুটা সবেগে আসে, এতো সবেগে নয় যে, (পড়ে গিয়ে) আঘাত প্রাপ্ত হবার আশঙ্কা থাকে, তাহলে ক্ষতি নেই। যেমন– ফারূক্ব-ই আ'যম তেমনি করেছেন বলে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২৩. তিনি হযরত ওমর ফারূক্বের আযাদকৃত ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তাবে'ঈ, বড় আলিম ও মুত্তাক্বী।

২৪. 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, 'তা'রীস'-এর এটা দ্বিতীয় ঘটনা। কেননা, প্রথম ঘটনা খায়বার ও মদীনা মুনাওয়ারার

وَادٍ بِهٖ شَيْطَانٌ فَرَكِبُوْا حَتّٰى خَرَجُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِىْ ثُمَّ اَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّنْزِلُوْا وَاَنْ يَّتَوَضَّؤُا وَاَمَرَ بِلَالًا اَنْ يُّنَادِىَ لِلصَّلٰوةِ اَوْ يُقِيْمَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ رَاٰى مِنْ فَزَعِهِمْ فَقَالَ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَآءَ لَرَدَّهَا اِلَيْنَا فِىْ حِيْنٍ غَيْرِ هٰذَا فَاِذَا رَقَدَ اَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِعَ اِلَيْهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِىْ وَقْتِهَا ثُمَّ

শয়তান রয়েছে।[২৬] লোকেরা আরোহণ করলেন। শেষ পর্যন্ত ওই মরুভূমি থেকে বের হয়ে গেলেন। তারপর হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে নির্দেশ দিলেন যেনো নেমে যান এবং ওযূ করে নেন। আর হযরত বেলালকে নির্দেশ দিলেন যেনো নামাযের তাকবীর কিংবা আযান বলেন।[২৭] অতঃপর হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে নামায পড়ালেন।[২৮] অতঃপর অবসর হলেন এবং তাঁদের ভয়-ভীতি দেখলেন। এরপর এরশাদ করলেন, "হে লোকেরা! আল্লাহ্ আমাদের রূহগুলো কব্জ করে নিয়েছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে সেগুলোকে অন্য সময় ফিরিয়ে দিতেন।[২৯] যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ঘুমিয়ে পড়ার কারণে নামায পড়তে না পারো কিংবা তা ভুলে যাও তারপর ভীত হয়ে সেটার দিকে আসো, তবে সেটাকে তেমনিভাবে পড়বে, যেমন সেটার ওয়াক্বতের মধ্যে পড়তে।[৩০] তারপর

মধ্যবর্তী স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো। আর এটা হয়েছে মদীনা মুনাওয়ারাহ্ ও মক্কা মু'আয্‌যামাহ্র মধ্যবর্তী স্থানে।

'শায়খ' আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, খুব সম্ভব ঘটনা তো ওটাই। কিন্তু এখানে বর্ণনাকারীর ধোঁকা হয়ে গেছে যে, তিনি মক্কা মু'আয্‌যামার পথে মনে করেছেন।

২৫. যদি এটা খায়বারের ঘটনা হয়, তবে হযরত বিলাল উটের পিঠের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। আর শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ নিয়মানুসারে শয়ন করে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুমিয়ে পড়েন।

আর যদি দ্বিতীয় ঘটনা হয়, তবে হযরত বিলালও শয়ন করে ঘুমিয়েছিলেন। তবে ঘুমানোর ইচ্ছা ছিলো না, কোমর সোজা করার জন্য শুয়েছিলেন। ইত্যবসরে চোখে ঘুম এসে গেলো।

২৬. এর ব্যাখ্যা হচ্ছে তা-ই যা ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ মরুভূমিতে এখন সূর্য উদিত হচ্ছে শয়তানের শিংগুলোর মধ্যবর্তীতে। এখন নামায পড়া মাকরূহ। কিছুটা আগে চলো। সফরও কমে আসবে, সূর্যও উপরে উঠে যাবে। এ অর্থ নয় যে, 'এখানে এ মরুভূমিতে যেহেতু শয়তান আছে, যে আমাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, সেহেতু এখানে নামায পড়ো না।' কেননা, শয়তান সব সময় মানুষের সাথে থাকে। তাছাড়া শয়তানের কারণে নামায না পড়া যুক্তিসঙ্গতও নয়। অবশ্য, বোত্‌খানা ও শরাবখানায় নামায পড়া এজন্য মাকরূহ যে, সেখানকার প্রতিটি স্থানই গুনাহ্ শির্ক ও কুফরেরই। শৌচাগার ও গোসলখানায় নামায পড়া মাকরূহ। কারণ ওই স্থান অপবিত্র বস্তুরই; এজন্য নয় যে, সেখানে শয়তান আছে।

২৭. প্রকাশ থাকে যে, এখানে اَوْ (অথবা) وَاوْ (এবং) অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ যেনো আযান এবং তাকবীর (ইক্বামত) বলে। আর যদি 'সন্দেহ' (অথবা) অর্থে হয়, তবে এ সন্দেহ বর্ণনাকারীরই। অর্থাৎ আমার স্মরণ নেই– আমার শায়খ (ওস্তাদ) কি আযানের কথাও উল্লেখ করেছেন, না তাক্বীরের কথা।

২৮. বুঝা গেলো যে, যদি গোটা জনগোষ্ঠীর নামায ক্বাযা হয়ে যায়, তবে ক্বাযা জমা'আত সহকারে করা হবে। আর তজ্জন্য আযান এবং ইক্বামতও বলা হবে।

২৯. অর্থাৎ ইচ্ছা করলে তিনি ক্বিয়ামতের দিনে উঠাতেন। এটাতো তাঁর দয়া যে, আজই জাগ্রত করেছেন। ঘুম মৃত্যুর ছোট বোন। সুতরাং এ ক্বাযার জন্য ভয় করো না। এতে

اُلتَفَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ اَتٰى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّىْ فَاَضْجَعَهٗ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُهْدِئُهٗ كَمَا يُهْدَاُ الصَّبِىُّ حَتّٰى نَامَ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَاَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الَّذِىْ اَخْبَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَابَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا

হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের দিকে ফিরলেন আর এরশাদ করলেন, "শয়তান বেলালের নিকট আসলো যখন সে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলো। তারপর তাকে শুইয়ে দিলো, এরপর তাকে মৃদুমৃদু চাপড়াচ্ছিলো যেমনিভাবে শিশুদেরকে চাপড়ানো হয়। শেষ পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে পড়লো।"[৩১] অতঃপর নবী করীম রাঊফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলালকে ডাকলেন। তখন হযরত বেলাল হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তেমনিভাবে খবর দিলেন (ঘটনা বর্ণনা করলেন) যেমন হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বকে খবর দিয়েছিলেন।[৩২] হযরত আবূ বকর বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্য রসূল।"[৩৩] (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) [ইমাম মালিক 'মুরসাল' সূত্রে এটা বর্ণনা করেছেন।]

মহান রবের বহু হিকমত বা রহস্য রয়েছে।

৩০. বেশীরভাগ হানাফীর এ অভিমত যে, 'জাহরী' নামাযের ক্বাযাও জাহরীভাবে করা হবে। (অর্থাৎ উচ্চস্বরে ক্বিরআত সম্বলিত নামাযের ক্বাযাও উচ্চস্বরে ক্বিরআত সহকারে করা হবে।) আর 'খাফী' (নিম্নস্বরে ক্বিরআত বিশিষ্ট নামায)-এর ক্বাযাও নিরবে ক্বিরআত সহকারে সম্পন্ন করা হবে। তাঁদের দলীল হচ্ছে এ-ই হাদীস শরীফ।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, সফরের নামায যদি ঘরে ক্বাযা করে, তবে ক্বসরই পড়বে। আর যদি ঘরের নামায সফরে ক্বাযা করে, তবে পূর্ণাঙ্গই পড়বে। তাছাড়া, ফজরের নামায যদি সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পূর্বে পড়ে তাহলে সুন্নাতও ক্বাযা দেবে।

৩১. উভয় জাহানের সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালের সাফাই বর্ণনা করছেন, "সে আমার নির্দেশের বিরোধিতা করে নি। যা কিছু ঘটেছে তা শয়তানের কর্মতৎপরতার কারণে ঘটেছে। বিলাল নির্দোষ।"

এ থেকে কয়েকটা মাস্'আলা বুঝা গেলো –

এক. ভোর বেলায় শয়তান মানুষকে তেমিনভাবে চাপড়ায়, যেভাবে মা তার সন্তানকে ঘুম পাড়ানোর সময় চাড়পিয়ে থাকেন। তখন 'লা-হাওলা' পড়ে উঠে যাওয়া চাই।

দুই. শয়তান কখনো কখনো মাক্ববূল বান্দাদের উপরও তার প্ররোচনা ও নিদ্রা ঢেলে দেয়। কিন্তু তাঁদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। সুতরাং এ হাদীস এ আয়াতের পরিপন্থী নয়– اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

[নিশ্চয় যারা আমার বান্দা, তাদের উপর (হে শয়তান!) তোর কোন ক্ষমতা নেই। ১৭:৬৫, তরজমা– কান্যুল ঈমান]

তিন. হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘুমন্ত অবস্থায়ও মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং শয়তানের কর্মকাণ্ড দেখেন। দেখুন! মহান রব এখানে হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সূর্যোদয়ের দিক থেকে মনযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যে ঘটনা হযরত বিলালের সাথে ঘটেছে তা প্রত্যক্ষ করছিলেন। যেই মাহবূবের নিদ্রা শরীফে এমনই অবগতি রয়েছে, তাঁর জাগ্রতাবস্থার কী অবস্থা হবে? মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন, عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক; ৯:১২৮) বুঝা গেলো যে, তিনি উম্মতের রক্ষক। তিনি আপন প্রতিটি উম্মতের প্রত্যেক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াক্বিফহাল।

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِىْ اَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صِيَامُهُمْ وَصَلَاتُهُمْ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ۔

بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلٰوةِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَافِىْ

৬৩৮।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "মুআয্যিনদের ঘাড়ের সাথে মুসলমানদের দু'টি জিনিষ ঝুলন্ত রয়েছে- তাদের রোযাগুলো ও নামাযগুলো।"[৩৪] [ইবনে মাজাহ্]

অধ্যায় ঃ মসজিদগুলো ও নামাযের স্থানসমূহ[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৬৩৯।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন,[২] তখন সেটার কোণায় কোণায় দো'আ প্রার্থনা করেছেন

স্মর্তব্য যে, এখানে হযরত বিলালের ঘুমিয়ে পড়ার কারণ ছিলো শয়তান; কিন্তু নিদ্রার স্রষ্টা হলেন আল্লাহ্! এ কারণে এখন কিছুটা পূর্বে এই হাদীসে এ নিদ্রাকে মহান রবের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর এখানে করা হয়েছে শয়তানের দিকে। আমি অধমের এ বর্ণনা থেকে বহু আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে সংশয় দূরীভূত হয়ে যাবে।

৩২. অর্থাৎ আমি নামায পড়ছিলাম। শয়তান আমাকে চাপড়ালো। আমি শুয়ে পড়লাম। এ থেকে বুঝা গেলো যে, বেশীরভাগ সময় সাহাবা-ই কেরাম শয়তানের কর্মকাণ্ড অনুভব করতে পারতেন; বরং কখনো কখনো শয়তানকে তার কু-কর্মকাণ্ড চালাতে দেখতেও পেতেন; তাকে ধরেও ফেলতেন। আর সে তাঁদের হাত থেকে ছুটতে পারতো না, ক্ষমা চেয়ে পালিয়ে যেতো। যেমন- এ মিশ্কাত শরীফেই বর্ণনা এসেছে ও আসবে।

৩৩. অর্থাৎ আজ আমি আপনার রিসালত নিজের চোখে দেখে নিয়েছি। দেখে সাক্ষ্য দিচ্ছি। বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অদৃশ্য জ্ঞান (ইল্মে গায়ব) তাঁর রিসালত ও নুবূয়তের প্রমাণ বহন করে। যে কেউ হুযূরের জ্ঞানকে অস্বীকার করে সে নেপথ্যে হুযূরের নুবূয়তকে অস্বীকার করে। এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' ১ম খণ্ডে দেখুন!

৩৪. অর্থাৎ মু'আয্যিন মুসলমানদের নামায ও রোযা উভয়েরই যিম্মাদার। কারণ, আযান দ্বারা সাহারী ও ইফ্তার আর আযান দ্বারাই নামাযগুলো সম্পন্ন করা হয়। যদি আযানগুলো বিশুদ্ধ বা যথাসময়ে দেয়, তবে মানুষের রোযা ও নামাযগুলো দুরস্ত হবে। সবার সাওয়াব তারাও পাবে। আর যদি ভুল সময়ে দেয়, তবে সবার রোযা ও নামায বরবাদ হবে। আর সবার গুনাহ্র বোঝাও তাদের উপর বর্তাবে।

'মিরক্বাত' প্রণেতা এখানে একটি হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করেছেন- হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন- জান্নাতে প্রথমে নবীগণ প্রবেশ করবেন, তারপর বাইতুল্লাহ্র মুআয্যিন অর্থাৎ বিলাল, তারপর বাইতুল মুক্বাদ্দাসের মুআয্যিন, তারপর অন্যসব মুআয্যিন।

****

১. مسجد (মসজিদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ- 'সাজদার স্থান।' কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় ওই স্থানই 'মসজিদ', যা নামাযের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সমগ্র পৃথিবী আমার জন্য মসজিদ। এর অর্থ হচ্ছে- প্রত্যেক স্থানে নামায পড়া বৈধ। পূর্ববর্তী দ্বীনগুলোতে শুধু ইবাদতখানাগুলো ব্যতীত অন্য কোথাও নামায হতো না।

نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتّٰى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِىْ قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ-

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ ابْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ وَبِلَالُ بْنُ رِبَاحٍ فَاَغْلَقَهَا

এবং নামায পড়েন নি[৩] যতক্ষণ না সেখান থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন। যখন বাইরে তাশরীফ আনলেন, তখন দু' রাক্'আত নামায কা'বার সামনে পড়লেন।[৪] আর এরশাদ ফরমালেন, "এটা হচ্ছে ক্বেবলা।"[৫] [বোখারী] ইমাম মুসলিম তাঁরই থেকে, হযরত উসামা ইবনে যায়দের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৬৪০।। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং উসামা ইবনে যায়দ, ওসমান ইবনে আবী ত্বালহা হাজাবী[৬] ও বেলাল ইবনে রিবাহ্ কা'বায় প্রবেশ করলেন এবং নিজের উপর কা'বা('র দরজা) বন্ধ করে নিলেন[৭]

(এখানে) 'নামাযের স্থানসমূহ' মানে ওইসব জায়গা, যেখানে নামায মাকরূহ হয় কিংবা মাক্রূহ নয়। স্মর্তব্য যে, ঘরে নির্মিত মসজিদ উত্তম, কিন্তু ওয়াক্ফ নয়।

২. অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন সর্বপ্রথম কা'বা শরীফ থেকে বোত বের করা হয়েছে। তারপর সেটাকে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে। তারপর হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

স্মর্তব্য যে, কা'বা মু'আয্যামাহ্ ও মসজিদ-ই হারাম শরীফ সমস্ত মসজিদ, বরং আল্লাহ্র আরশ অপেক্ষাও বেশী মর্যাদাবান। [মিরক্বাত]

৩. বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে- হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই দিন সেখানে নামায পড়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস এ খবর পান নি। কেননা, তিনি তখন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর সাথে ছিলেন না। সামনে হযরত বিলালের বর্ণনা আসছে যে, হুযূর সেখানে নামায পড়েছেন। আর তিনি ওই সময় পর্যন্ত হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর সাথে ছিলেন। তাঁর খবর দেওয়া স্বচক্ষে দেখে, আর ইনি খবর দিচ্ছেন শুনে। তাছাড়া, এ বর্ণনায় নামায পড়ার অস্বীকৃতি রয়েছে, আর ওখানে রয়েছে পড়ার পক্ষে প্রমাণ। এমনি ধরনের পরস্পর বিরোধের সময় প্রাধান্য ইতিবাচকেরই হয়ে থাকে।

৪. কেননা, কা'বার দিকে মুখ করে, ওদিকে পিঠ দিয়ে নয়, না করট ফিরিয়ে।

৫. অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত কা'বা সমস্ত মুসলমানের জন্য ক্বেবলা হয়ে গেছে; কখনো রহিত হবে না। এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এ দিকেও হচ্ছে যে, কা'বার প্রতিটি অংশই ক্বেবলা। সমগ্র কা'বা নামাযীর সামনে থাকা জরুরী নয়। কা'বার ভিতরে নামাযী কোন অংশের দিকে পিঠ দেন, আর কোন অংশের দিকে মুখ করেন। কিন্তু নামায বিশুদ্ধ হয়ে যায়।

স্মর্তব্য যে, কা'বা হচ্ছে সেখানকার ফাঁকা জায়গার নাম, যা যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত; দেয়ালগুলোর নামও নয়। দেখুন, পাহাড়ের উপর কিংবা ভূ-গর্ভস্থ তলার ভিতর নামায পড়ার অবস্থায় কা'বার দেওয়াল নামাযীর সামনে থাকবে না, কিন্তু নামায দুরস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং এ হাদীস শরীফ হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের পরিপন্থী নয়।

৬. তিনি আবদারী, ক্বোরাঈশী, হাজাবী। বনী শায়বাহ্'র লোক। কা'বা শরীফের চাবির ধারক। মক্কা বিজয়ের দিন হুযূর তাঁকে কা'বার চাবি দিয়ে বললেন- خُذُهَا خَالِدَةً تَالِدَةً অর্থাৎ এ চাবি সব সময়ের জন্য নিয়ে যাও! সুতরাং এখনো পর্যন্ত কা'বার চাবি তাঁরই বংশধরদের মধ্যে রয়েছে। আর ইন্শা-আল্লাহ্ ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে; না কখনো তাঁর বংশ নিঃশেষ হবে, না কোন যালিম বাদশাহ্ তাঁদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে। ইয়াযীদ ও হাজ্জাজের মতো যালিমরাও এ চাবিতে হাত লাগায় নি। তিনি (হযরত ওসমান ইবনে ত্বালহা) ৪২ হিজরীতে ওফাতপ্রাপ্ত হন।

عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِيْنَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَّسَارِهٖ وَعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَثَلٰثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَآئَهٗ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

এবং তাতে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। যখন বাইরে তাশরীফ আনলেন তখন আমি হযরত বেলালকে বললাম, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কি করেছেন?" তিনি বললেন, একটি স্তম্ভ নিজের বামে, দু'টি স্তম্ভ নিজের ডানে, তিনটি স্তম্ভ নিজের পেছনে রাখলেন। কা'বা ওইদিন ছয়টি স্তম্ভের উপর (স্থাপিত) ছিলো। তারপর নামায পড়লেন।[৮]

৬৪১।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার এ মসজিদে এক নামায অন্যান্য মসজিদে হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম– মসজিদে হারাম ব্যতীত।[৯] [মুসলিম, বোখারী]

৭. হযরত বিলাল কিংবা হযরত ওসমান ভিতর থেকে খিল লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষের ভিড় না হয়ে যায়; এজন্য নয় যে, কা'বার দরজা বন্ধ না করলে তাতে নামায বৈধ হতো না; যেমন শাফে'ঈগণ বুঝে নিয়েছেন।

৮. অর্থাৎ কা'বার দরজা দিয়ে প্রবেশ করে সম্মুখস্থ দেওয়ালের নিকটে পৌঁছেছেন; এতে তিনটি স্তম্ভ পিঠ মুবারকের পেছনে রয়ে গেলো। আর ওই দেওয়াল সন্নিকট হয়ে গেলো। তারপর নামায পড়েছেন।

এ রেওয়ায়ত থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'বার ভিতর নামায পড়েছেন। সাইয়্যেদুনা হযরত বিলাল চোখে দেখা ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

এ ঘটনা মক্কা বিজয়ের দিনেরই। এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, কা'বার মধ্যে যে কোন নামাযই বৈধ– ফরয হোক, কিংবা নফল হোক। এটাই হানাফীদের মাযহাব, ইমাম মালিকের মতে কা'বার মধ্যে নফল জায়েয, ফরয নয়। ইমাম শাফে'ঈর মতে যদি কা'বার দরজা খোলা থাকে, তবে দরজার দিকে মুখ করে নামায জায়েয নয়। কিন্তু ইমাম আ'যমের অভিমত অত্যন্ত মজবুত। আর এ হাদীস এরই পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে যে, হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাতে নামায পড়েছেন এবং কোন বিশেষ নামায ও জায়গার এমন কোন শর্তারোপ করেন নি যে, কা'বার মধ্যে অমুক নামায কিংবা অমুক অংশে নামায জায়েয নেই।

মজার বিষয়ঃ 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন– ওসমান ইবনে ত্বালহা বলেন, মক্কা বিজয় ও হিজরতের পূর্বে আমি সোমবার ও বৃহস্পতিবার কা'বা শরীফ খুলতাম। একদিন হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সহনশীলতা প্রদর্শন করলেন। আর বললেন, "হে ওসমান! অনতিবিলম্বে ওই সময় আসছে, যাতে তুমি এ চাবি আমার হাতে দেখতে পাবে। আর আমি যাকে ইচ্ছা দেবো।" আমি বললাম, "যদি তেমনি হয়, তবে তো ক্বোরাঈশ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কা'বা অপমানিত হয়ে যাবে।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "না। কা'বার মহান রবের শপথ! কা'বা ওই দিনই সম্মান লাভ করবে।" আমার কিন্তু ইয়াক্বীন হয়েছিলো যে, তেমনি ঘটবেই; কারণ, ওই পবিত্র মুখের কথা বিফল হয় না। এমনকি যখন হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'ওমরাতুল ক্বাযা'র জন্য বায়তুল্লাহ্ শরীফে, ৭ম হিজরীর যিলক্বদ মাসে তাশরীফ এনেছিলেন, আর আমি হুযূরের সত্য চেহারা দেখতে পেলাম, তখন আমার অন্তরের অবস্থা বদলে গেলো এবং আমার অন্তরে ঈমান এসে গেলো। সুযোগের সন্ধানে ছিলাম। কিন্তু হুযূরের মহান দরবারে হাযির হতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত হুযূর

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৪২।। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনটির দিকে হাওদা বাঁধা যাবে না– এক. মসজিদে হারাম. দুই. মসজিদে আক্বসা এবং তিন. আমার এ মসজিদ।[১০] [মুসলিম, বোখারী]

মদীনা মুনাওয়ারায় চলে গেলেন। কিন্তু আমার এ অবস্থা ছিলো– যেমন কবি বলেছেন–

وہ دکھا کے شکل جو چل دیے تو دل انکے ساتھ رواں ہوا
نہ وہ دل ہے نہ وہ دلربا رہی زندگی سو وہ بار ہے

অর্থাৎ তিনি যখনই আপন সূরত দেখিয়ে চলে গেলেন, তখন আমার হৃদয় তাঁর সাথে রওনা হয়ে গেলো।

হৃদয় আপন প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ ব্যতিরেকে বাঁচতে পারে না, বরং তখন জীবনই একটা বোঝায় পরিণত হয়।

একদিন আমার মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলো। তখন আমি অন্ধকারে মুখোশ পরে মক্কা থেকে পালিয়ে গেলাম। পথিমধ্যে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ এবং 'আমর ইবনুল আসের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাঁদের অবস্থাও আমার মতোই ছিলো। সুতরাং আমরা তিনজন মদীনা মুনাওয়ারায় হাযির হলাম। আর পবিত্রতম হাতে বায়'আত করে মুসলমান হয়ে গেলাম। তারপর মক্কা বিজয়ের দিন, যা ৮ম হিজরীর রমযান মাসে হয়েছে, আমরা তিনজন হুযূর-ই আন্ওয়ারের সাথে মক্কায় আসলাম। তখন হুযূর-ই আন্ওয়ার আলায়হিস্ সালাম আমার নিকট থেকে চাবি তলব করলেন। হযরত আব্বাস চাইলেন– চাবি তাঁকে দেওয়া হোক! আমি ভয়ের কারণে চাবি প্রার্থনা করতে পারলাম না। আমার ওই ঘটনা স্মরণ ছিলো। আর আমি মনে করেছিলাম যে, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চাচার মোকাবেলায় আমার মতো অনাত্মীয়ের কি-ই বা মর্যাদা! কিন্তু শাহী বদান্যতার সামনে ক্বোরবান হয়ে যাই! তিনি এরশাদ ফরমালেন, "হে আব্বাস! যদি তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে চাবি আমাকে দাও!" চাবি পবিত্রতম হাতে নিয়ে এরশাদ ফরমালেন, "ওসমান কোথায়?" আমি আরয করলাম, "হুযূর আমি হাযির।" এরশাদ ফরমালেন, "নাও! এ চাবি সব সময় তোমাদের মধ্যেই থাকবে।" এতদ্ভিত্তিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا

(অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন– আমানতসমূহ যাদের, তাদেরকে অর্পণ করো।৪:৫৮, তরজমা– কান্যুল ঈমান)

তারপর গোটা জীবন এ চাবি ওসমানের নিকট রইলো। ওফাতের সময় তিনি আপন ভাই শায়বাহ্ ইবনে ত্বালহাকে দান করলেন।

৯. অর্থাৎ মসজিদে নবভী শরীফে এক নামায, কা'বাতুল্লাহ্ ব্যতীত অবশিষ্ট গোটা দুনিয়ার মসজিগুলোতে হাজার নামায অপেক্ষাও উত্তম।

স্মর্তব্য যে, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদ শুধু সেটাই নয়, যা হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর পবিত্র যাহেরী জীবদ্দশায় ছিলো; বরং পরবর্তীতে তাতে যেসব পরিবর্দ্ধন করা হয়েছে সেগুলোও হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর মসজিদই। এর প্রতিটি অংশে পঞ্জেগানা নামাযের এ-ই মর্যাদা হবে; যদিও ওই অংশে, যা নবী করীমের যমানায় মসজিদ ছিলো, বিশেষ করে জান্নাতের টুকরার নামায অধিকতর উত্তম। তাছাড়া, যে পরিমাণ রওযা-ই আত্বহার থেকে বেশী নিকটে হবে ওই পরিমাণ সাওয়াব বেশী হবে। কেননা, হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর নৈকট্যেরই তো সমস্ত বাহার।

স্মর্তব্য যে, মসজিদে নবভীর নামায সাওয়াবের মধ্যে বায়তুল্লাহ্ শরীফের নামায অপেক্ষা যদিও কম হয়, কিন্তু মর্যাদাও নৈকট্যের মধ্যে সেখানকার নামায অপেক্ষাও বেশী। কেননা, ওখানে নৈকট্য কা'বার সাথে, আর এখানে নৈকট্যতো তাঁরই সাথে, যিনি কা'বাকে ক্বেবলা বানিয়ে দিয়েছেন। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের পরও মুহাজির ও আনসারগণ মদীনা মুনাওয়ারাতেই থেকে যান আর এখানকার নামাযকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَ مِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৪৩।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, 'আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান[১১] জান্নাতের বাগানগুলোর মধ্যে একটি বাগান।[১২] আর আমার মিম্বর আমার হাওযের উপর অবস্থিত।[১৩] [মুসলিম, বোখারী]

'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, শুধু নামাযের জন্য এ বৃদ্ধি নয়, বরং মদীনা মুনাওয়ারার প্রত্যেক ইবাদতেরই এ অবস্থা। ক্বাযী আয়ায, মোল্লা আলী ক্বারী ও শামী প্রমুখ বলেন, হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববর (রওযা) শরীফের অভ্যন্তরীণ অংশ, যা হুযূরের পবিত্রতম শরীর মুবারকের সাথে লেগেছে, তা কা'বা-ই মু'আয্‌যামাহ্ এবং আরশ-ই আ'যম অপেক্ষা উত্তম।

১০. অর্থাৎ এ মসজিদগুলো ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে এজন্য সফর করে যাওয়া যে, সেখানে নামাযের সাওয়াব বেশী, নিষিদ্ধ; যেমন কেউ কেউ জুমু'আহ্ পড়ার জন্য বদায়ূন থেকে দিল্লী যেতো, যাতে সেখানকার জামে মসজিদে সাওয়াব বেশী পায়। এটা ভুল। প্রত্যেক জায়গার মসজিদগুলো সাওয়াবের মধ্যে সমান। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হাদীস শরীফ একেবারে স্পষ্ট।

ওহাবীরা এর অর্থ এটা মনে করেছে যে, এ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের দিকে সফর করাই হারাম; সুতরাং ওরস, কবর-যিয়ারত ইত্যাদির জন্য সফর হরা হারাম। যদি এ অর্থ হয়, তবে ব্যবসায়, চিকিৎসা, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ ও ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা ইত্যাদি কাজের জন্য সফর করা হারাম হবে এবং রেলওয়ে (ইত্যাদি)'র বিভাগগুলো অকেজো হয়ে যাবে আর এ হাদীস শরীফও ক্বোরআনের পরিপন্থী হয়ে যাবে এবং অন্যান্য হাদীসেরও। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

(অর্থাৎ সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ করে দেখো, কী পরিণাম হয়েছে অস্বীকারকারীদের; ৩:১৩৭, তরজমা- কান্‌যুল ঈমান) 'মিরক্বাত' প্রণেতা এখানে এবং আল্লামা শামী 'ক্বরসমূহের যিয়ারত' শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেন, যেহেতু এ তিন মসজিদ ব্যতীত সমস্ত মসজিদ সমান, সেহেতু অন্যান্য মসজিদের দিকে সফর করা নিষিদ্ধ। অবশ্য, আল্লাহ্‌র ওলীগণের কবরগুলো ফুয়ূয ও বরকাতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং কবরসমূহের যিয়ারতের জন্য সফর করা জায়েয। এ মূর্খ অজ্ঞ লোকেরা কি সম্মানিত নবীগণের ক্বর শরীফগুলোর দিকে সফর করতেও নিষেধ করবে?

১১. কোন কোন বর্ণনায় আছে– 'আমার ক্বর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান।' কোন কোন বর্ণনায় আছে– 'আমার হুজুরা ও মুসাল্লার মধ্যবর্তী স্থান।' কিন্তু সবকটির অর্থ একটি– কেননা, হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ঘর মুবারক, হুজুরা শরীফ এবং কবর-ই আন্‌ওয়ার একই জায়গায় আর মুসাল্লা অর্থাৎ 'মিহরাবুন্নবী' ও 'মিম্বর শরীফ' একেবারে মিলিত। যেমন– যিয়ারতকারীরা জানেন।

১২. অর্থাৎ এ স্থান প্রথমে জান্নাতের বাগান ছিলো, সেখান থেকে আনা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম খলীল আলায়হিস্ সালামকে জান্নাতের 'হাজরে আস্‌ওয়াদ' (কালো পাথর) দান করেছেন, আর আপন হাবীবের জন্য জান্নাতের বাগান প্রেরণ করেছেন।

অথবা এ জায়গা কাল ক্বিয়ামতে হুবহু জান্নাতের বাগান হবে। অথবা যে ব্যক্তি এখানে এসে গেছে, সে যেনো জান্নাতের বাগানে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ এর বরকতে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অথবা এ স্থান জান্নাতের বাগানের মুখোমুখি অবস্থিত। স্মর্তব্য যে, হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র যিক্‌রের গোলাকার বৈঠকগুলো ও মু'মিনের কবরকে জান্নাতের বাগান বলেছেন। ওখানেও বহু ব্যাখ্যা রয়েছে।

১৩. এখানেও ওই ব্যাখ্যাবলী রয়েছে– এ স্থান প্রথমে আমার হাউযের উপর ছিলো। সেখান থেকে এখানে আনা হয়েছে। অথবা ভবিষ্যতে হাউযের কিনারায় থাকবে। অথবা এখনো হাউযের কিনারায় রয়েছে। অথবা এখন হাউজের কিনারার মুখোমুখি অবস্থিত। অথবা যে ব্যক্তির সেটায় চুমু খাওয়ার সৌভাগ্য হলো, সে যেনো আমার হাউজের উপর (পাশে) পৌঁছে গেলো।

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِىْ مَسْجِدَ قُبَآءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَا شِيًا وَّ رَاكِبًا وَّ يُصَلِّىْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسْجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৬৪৪।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম রাঊফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শনিবার মসজিদ-ই ক্বোবা শরীফে[১৪] পদব্রজে ও আরোহণ করে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং তাতে দু'রাক্'আত নামায পড়তেন।[১৫] [মুসলিম, বোখারী]

৬৪৫।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "নগরগুলোর মধ্যে মহান রবের নিকট প্রিয় জায়গা হচ্ছে মসজিদগুলো এবং সর্বাপেক্ষা খারাপ জায়গা হচ্ছে সেখানকার বাজারগুলো।"[১৬] [মুসলিম]

স্মর্তব্য যে, 'মিম্বর' মানে 'মিম্বরের স্থান।' ওখানে মিম্বর যেমনি থাকুক না কেন! তাছাড়া, কা'বার কালো পাথর ও রুকনে ইয়ামানী এবং মদীনা তাইয়্যেবার এ জায়গা যদিও জান্নাত থেকে এসেছে, কিন্তু সেখানকার ওই ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য বিলীন করে দেওয়া হয়েছে।

১৪. 'ক্বোবা' এমন এক বস্তি, যা মদীনা তাইয়্যেবাহ্ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। ওখানকার মসজিদের নাম 'ক্বোবা'। ওই স্থানে হুযূর আলায়হিস্ সালাম হিজরতের দিন মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনার পূর্বে সদয় অবস্থান করেছেন। আর এই মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মাণ করা হয়েছে। ক্বোরআনে করীমে এ মসজিদের বড় বড় ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আমি অধম বহুবার সেখানকার যিয়ারত করেছি।

১৫. কোন কোন বর্ণনায় এসেছে- যে ব্যক্তি মদীনা পাক থেকে ওযূ করে মসজিদ-ই ক্বোবায় যাবে, সেখানে দু'রাক'আত নফল নামায পড়বে, সে ওমরার সাওয়াব পাবে। এখনো হাজীগণ প্রমুখ শনিবার এ আমল করেন।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, বুযুর্গদের মসজিদগুলো এবং তাঁদের অবস্থানের জায়গাগুলো বরকতময়। সেগুলোর যিয়ারতে সাওয়াব রয়েছে। কেননা, মসিজদ-ই ক্বোবা আনসার-এর মসজিদ। আর ওই হযরতগণ আল্লাহ্র দরবারে মাক্ববূল ছিলেন। সেখানে কপালগুলো ঘর্ষণ করা ও সাজদা করা ক্ববূল হবার মাধ্যম।

হুযূর খাজা-ই আজমীর ক্বুদ্দিসা সিররুহু লাহোরে এসে হযরত দাতা সাহেবের পা মুবারকের দিকে গিয়ে চিল্লা করেছেন। সেটা এ হাদীস শরীফ থেকেই গৃহীত হয়েছে। ড. ইকবাল কতোই সুন্দর বলেছেন-

سید ہجویری مخدوم امم ÷ مرقد او پیر سنجر را قدم

অর্থাৎ সাইয়্যেদ হাজভীরী (দাতা গঞ্জে বাখ্শ) রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হলেন উম্মতের মাখদুম (যাঁর সেবা করা হয়।) তাঁর কবর শরীফে চিল্লা করার জন্য সঞ্জরের পীর (হযরত খাজা গরীব নাওয়ায) তাশরীফ এনেছেন।

স্মর্তব্য যে, যেখানে বুযুর্গদের কদম পড়ে যায়, ওই জায়গা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বরকতময় হয়ে যায়। এখন ক্বোবায় আনসার নেই। কিন্তু সেটার আভিজাত্য ও মর্যাদা আগের মতোই রয়ে গেছে। কবি বলেন-

بگفتا من گل ناچیز بودم ولیکن مدتے با گل نشستم

অর্থাৎ মাটির ঢিল বলছে- 'আমি তো অধম কাদা মাটিই ছিলাম। কিন্তু আমি কিছুদিন ফুলের সাথে ছিলাম। (তাই আমার মধ্যে এতো খুশবু।)

১৬. কেননা, মসজিদগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ সময় আল্লাহ্র যিকরের জন্য হাযিরা দেওয়া হয়। আর বাজারগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ সময় মিথ্যা, ধোঁকাবাজি ও গীবৎ ইত্যাদিই চলে; যদিও কখনো কখনো মসজিদগুলোতেও জুতো চোর যায় আর বাজারগুলোতে আল্লাহ্র ওলীগণও চলে যান। এ কারণে এরশাদ হয়েছে- তোমরা ওইসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হও, যাদের দেহ বাজারে থাকলেও মন থাকে মসজিদে। তাদের

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهٗ نُزُلَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

৬৪৬।। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে ঘর বানাবেন।"[১৭] [মুসলিম, বোখারী]

৬৪৭।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি সকাল কিংবা সন্ধ্যায় মসজিদে যাবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের আতিথ্যের সামগ্রী তৈরী করবেন।"[১৮] [মুসলিম]

অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যাদের দেহ মসজিদে থাকলেও হৃদয়-মন থাকে বাজারে।

স্মর্তব্য যে, এখানে 'শহরগুলো' মানে সাধারণ শহরসমূহ; মদীনা মুনাওয়ারাহ্ ও মক্কা মুকার্‌রামাহ্ ওইগুলো থেকে আলাদা। সেকানকার তো অলিগলি ও বাজার ইত্যাদি পর্যন্ত– সবকিছুই আল্লাহ্র নিকট প্রিয়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন– وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (এবং ওই নিরাপদ শহরের শপথ! ৯৫:৩) আরো এরশাদ ফরমাচ্ছেন– لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ [আমি (আল্লাহ্) এ (মক্কা) নগরীর শপথ করছি; ৯০:১] এটা হবেও না কেন? এ দু'টিই তো মাহবূবের নগরী।

کھائی قرآن نے خاک گذر کی قسم
اس کف پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام

অর্থাৎ ঃ ক্বোরআন-ই করীম ওই মাটির শপথ করেছে, যার উপর দিয়ে নবী-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অতিক্রম করেছেন। ওই পায়ের তালু মুবারকের মর্যাদার প্রতি লাখো সালাম।

১৭. মসজিদ নির্মানকারীদের জন্য জান্নাতে এমন ঘর বানানো হবে, যা সেখানকার অন্যান্য ঘর অপেক্ষা তেমনি উৎকৃষ্ট হবে, যেমন মসজিদ দুনিয়ার অন্যান্য ঘর অপেক্ষা উত্তম। অন্যথায় জান্নাতের ঘরগুলোর এখানকার ঘরগুলোর সাথে কিসের সম্পর্ক?

স্মর্তব্য যে, পূর্ণাঙ্গ মসজিদ বানানো এবং মসজিদের নির্মাণ কাজে চাঁদা দেওয়া– উভয়ের জন্য এই সুসংবাদ; এ শর্তে যে, তা যেনো লোক দেখানোর জন্য না হয়; আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হয়। এ কারণে আলিমগণ মসজিদে নিজের নাম লিখতে নিষেধ করেন। কারণ, তাতে 'রিয়া' (লোকদেখানো)'র আশঙ্কা থাকে। অবশ্য যদি দো'আ চাওয়ার উদ্দেশ্য হয়, তবে ক্ষতি নেই। [মিরক্বাত]

এ-ই হাদীসের ভিত্তিতে সাহাবা-ই কেরাম এবং ইসলামী বাদশাহগণ নিজেদের স্মৃতি হিসেবে মসজিদসমূহ রেখে গেছেন। মসজিদ বড় হোক কিংবা ছোট হোক, কাঁচা হোক কিংবা পাকা– সাওয়াব নিষ্ঠা অনুসারে পাওয়া যাবে।

১৮. সকাল-সন্ধ্যা মানে সর্বদা। অর্থাৎ যে সবসময় নামাযের জন্য মসজিদে যেতে অভ্যস্থ হবে, সে সব সময় জান্নাতী রিয্‌ক্ব পাবে। نُزُل (নুযুল) ওই খাবারকে বলে, যা অতিথির জন্য তৈরী করা হয়। যেহেতু তাতে পূর্ণাঙ্গ আড়ম্বর থাকে এবং মেঝবানের যোগ্যতানুসারে হয়, সেহেতু 'জান্নাতী খাবার'কে 'নুযুল' বলা হয়েছে। অন্যথায় জান্নাতী লোকেরা সেখানে মেহমান (অতিথি) হবেন না, মালিকই হবেন।

وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْظَمُ النَّاسِ اَجْرًا فِى الصَّلٰوةِ اَبْعَدُهُمْ فَاَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَّالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِّنَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَاَرَادَ بَنُوْا سَلِمَةَ اَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ بَلَغَنِىْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ يَا بَنِىْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ وَدِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

৬৪৮।। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "লোকদের মধ্যে নামাযের বড় সাওয়াব অর্জনকারী হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যার পথ দীর্ঘ হয়; তারপর ওই ব্যক্তি, যার পথ দীর্ঘ হয়;[১৯] আর যে ব্যক্তি নামাযের জন্য অপেক্ষা করে- শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে পড়ে, তার সাওয়াব ওই ব্যক্তির চেয়েও বেশী, যে নামায পড়ে অতঃপর শুয়ে যায়।"[২০] [মুসলিম, বোখারী]

৬৪৯।। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদের আশে-পাশে কিছু ঘরবাড়ি খালি হয়ে গেলে বনূ সালিমাহ্ চাইলেন[২১] মসজিদের নিকটে এসে বসবাস করতে।[২২] এ খবর হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পেলেন। তখন তিনি তাঁদের উদ্দেশে এরশাদ করলেন, "আমি খবর পেলাম যে, তোমরা মসজিদের নিকটে এসে বসবাস করতে চাচ্ছো?" তাঁরা আরয করলেন, "হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, আমরা তো এ ইচ্ছা করেছি।" তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "ওহে বনূ সালিমাহ্! নিজেদের ঘরগুলোতেই থাকো। তোমাদের পদাঙ্কগুলো লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। তোমরা তোমাদের ঘরগুলোতেই থাকো, তোমাদের পদাঙ্কগুলো লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।"[২৩] [মুসলিম]

---

১৯. অর্থাৎ যার ঘর আপন মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত হয়, তারপর সে মসজিদে জমা'আত সহকারে নামায পড়ে, সে তার পদাঙ্কের সংখ্যানুসারে সাওয়াব পাবে; এ অর্থ নয় যে, মহল্লার মসজিদ ছেড়ে শুধু শুধু দূরবর্তী মসজিদে চলে যাবে। অবশ্য যদি মহল্লার মসজিদের ইমাম বদ-আক্বীদা সম্পন্ন হয়, তবে অন্য মসজিদে যেতে পারে।

২০. একাকী নামায পড়ে, কিংবা অন্য ইমামের পেছনে জমা'আত সহকারে নামায পড়ে। কেননা, প্রথম জমা'আতের সাওয়াব বেশী। প্রথম জমা'আত হচ্ছে তা-ই, যা মসজিদের ইমামের সাথে পড়া হয়। অবশ্য যদি ওই ইমাম মাকরূহ ওয়াক্বতে নামায পড়ে, তাহলে একাকী পড়ে নেবে। যেমন- পূর্ববর্তী হাদীসসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে।

২১. এটা আনসারের একটা গোত্র। তাঁদের ঘর মসজিদ-ই নববী শরীফ থেকে বহু দূরে অবস্থিত ছিলো।

২২. অর্থাৎ ওইসব বুযুর্গ এ চেষ্টা করেন নি যে, তাঁরা নিজেদের মহল্লায় আলাদা মসজিদ বানিয়ে নেবেন; বরং হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে নামাযের জন্য নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে দেওয়া এবং মহল্লা খালি করে দেওয়াকেই পছন্দ করে নিয়েছেন।

وَعَنْ اَبِىْ هُـرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ، اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ

৬৫০।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সাতজন লোক এমন রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ওইদিন আপন ছায়ায় রাখবেন,[২৪] যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না– ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্,[২৫] ওই যুবক, যে আল্লাহ্র ইবাদতে যৌবনকাল অতিবাহিত করে,[২৬] ওই ব্যক্তি, যার অন্তর সে যখন মসজিদ থেকে বের হয়েছে তখন থেকে মসজিদের দিকে লেগে থাকে, যতক্ষণ না মসজিদে ফিরে আসে,[২৭] ওই দু'ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্র জন্য ভালবাসে; উভয়ে একত্রিত হলে ওই ভালবাসার ভিত্তিতে হয় এবং পৃথক হলেও ভালাবাসার ভিত্তিতে হয়,[২৮] ওই ব্যক্তি, যে একাকিত্বে আল্লাহ্কে স্মরণ করলে (তখন) তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়।[২৯] ওই ব্যক্তি, যাকে ডাকে বংশীয়া

---

২৩. তোমাদের আমলনামায় সাওয়াবের জন্য। কেননা, মসজিদের দিকে প্রত্যেক ক্বদমই ইবাদত। অথবা তোমাদের এ কষ্টের কথা হাদীস শরীফের কিতাবগুলোতে এবং আলিমদের লেখনীগুলোতে লিপিবদ্ধ করা হবে, ওয়া-'ইযগণ এর উপর ওয়ায করবেন, যাঁরা তোমাদের এ ঘটনা শুনে দূর থেকে মসজিদে আসবে তাদের সবার সাওয়াব তোমরাও পাবে।

স্মর্তব্য যে, ঘর মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত হওয়া পরহেযগারদের জন্য সাওয়াবেরই কারণ হয়; কারণ তাঁরা দূর থেকে মসজিদে আসবেন; কিন্তু অলসগণ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ, তারা দূরত্বের কারণে ঘরে নামায পড়ে নেবে। সুতরাং এ হাদীস শরীফ ও-ই হাদীস শরীফের পরিপন্থী নয়, যাতে এরশাদ হয়েছে– 'বরকতশূন্য হচ্ছে ওই ঘর, যাতে আযানের শব্দ আসে না।' অর্থাৎ অলসদের জন্য ঘরের দূরত্ব বরকতশূন্যতাই।

২৪. অর্থাৎ আপন রহমতের ছায়ায়, কিংবা আরশে আ'যমের ছায়ায়, যাতে ক্বিয়ামতের রোদ থেকে রক্ষা পায়।

২৫. অর্থাৎ ওই মু'মিন বাদশাহ্ ও শাসকগণ, যাঁরা প্রজাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করেন। কেননা, দুনিয়া তাঁদের ছায়ায় থাকতো। সুতরাং এঁরা ক্বিয়ামতে মহান রবের ছায়ায় থাকবেন। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ ওইসব থেকে উত্তম। এ কারণে তাঁর কথা সবার আগে উল্লেখ করা হয়েছে। ন্যায় বিচারক শাসকগণও এ সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত।

২৬. অর্থাৎ যৌবনে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে; এবং মহান রবকে স্মরণ রাখে। যেহেতু যৌবনকালে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মজবুত এবং নাফ্স গুনাহ্র দিকে ঝুঁকে পড়ে, সেহেতু ওই বয়সের ইবাদত বার্দ্ধক্যের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। কবি বলেন–

در جوانی توبہ کردن سنت پیغمبری ست

وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار

অর্থাৎ ঃ যৌবনকালে তাওবা করা পয়গাম্বর আলায়হিস্ সালাম-এর সুন্নাত। বার্দ্ধক্যে তো যালিম নেকড়ে বাঘও খোদাভীরু হয়ে যায়।

২৭. সূফীগণ বলেছেন, মু'মিন মসজিদে তেমনি হয়, যেমন মাছ পানিতে থাকাবস্থায় হয় আর মুনাফিক্ব থাকে তেমনি, যেমন পাখি পিঞ্জারাবদ্ধ থাকে। এ কারণে নামাযের পর বিনা কারণে তাৎক্ষণিকভাবে সমজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়া ভালো নয়। আল্লাহ্ সামর্থ্য দিলে মসজিদে প্রথমে এসো এবং পরে বের হও। আর যখন বাইরে থাকো, তখন কান যেনো আযানের দিকে লেগে থাকে, 'কবে আযান হবে এবং মসজিদে যাবো'।

২৮. অর্থাৎ যাকে ভালবাসলে মহান রব সন্তুষ্ট থাকেন, তাকে ভালোবাসে, আর যার প্রতি ঘৃণা বোধ থাকলে মহান রব

حَسَبٍ وَّ جَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفٰهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلٰى صَلَاتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ وَفِىْ سُوْقِهٖ خَمْسًا وَّ عِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَ ذٰلِكَ اَنَّهٗ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهٗ اِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ

সুন্দরী মেয়ে আর সে বলে 'আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি।'[৩০] আর ওই ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে, এমনকি তার বাম হাত জানে না, তার ডান হাত কি দিয়েছে।[৩১] [মুসলিম, বোখারী]

৬৫১।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, পুরুষের জমা'আত সহকারে নামায তার ঘর কিংবা বাজারের নামাযের উপর পঁচিশ গুণ বেশী সাওয়াব রাখে।[৩২] আর এটা এজন্য যে, যখন সে ওযূ করে অতঃপর উত্তমরূপে করে, তারপর মসজিদের দিকে চলে যায়,[৩৩] নামায ব্যতীত অন্য কিছু তাকে নিয়ে যায় না, তাহলে যে ক্বদমই সে রাখবে,

সন্তুষ্ট থাকেন তাকে ঘৃণা করে। বে-দ্বীন ও বদ্-আমল সন্তানদেরকে ঘৃণা করা, আর মুত্তাক্বী অনাত্মীয়কে ভালোবাসা ইবাদত। কবি বলেন–

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد
فدائے ایک تن بیگانہ کآشنا باشد

অর্থাৎঃ হাজার আত্মীয়ও যদি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কহীন হয়, তবে তারা আমার নিকট অনাত্মীয়, অপরিচিত। আর খোদাভীরু যদি মাত্র একজনও হয়, তবে সে আমার পরম আত্মীয়, পরম বন্ধু।

অনুরূপ, ঘনিষ্ট বন্ধুর আক্বীদাভ্রষ্টতার কথা জানতে পারার সাথে সাথে তার নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া এবং প্রাণের শত্রুরও তাক্বওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথে তার বন্ধু হয়ে যাওয়া উত্তম আমল।

২৯. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয় ও হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইশক্ব ও মুহাব্বতের মধ্যে কান্নাকাটি করে। একাকিত্বের শর্তারোপ এ জন্য করা হয়েছে যে, সবার সামনে কান্না করার মধ্যে 'রিয়া' বা লোক দেখানোর আশঙ্কা থাকে।

৩০. অর্থাৎ খোদ এমন নারী তার নিকট ব্যভিচারের কামনা করে, আর সে এমন নাজুক সময়ে নিছক আল্লাহ্‌র ভয়ে বেঁচে যায়। এটা অতি কঠিন কাজ। এ কারণে মহান রব হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর এমন মুবারক কাজের প্রশংসা ক্বোরআন মজীদে করেছেন। আল্লাহ্ নসীব করুন!

স্মর্তব্য যে, এমনি নাজুক সময়ে নারীকে এ কথা বলে দেওয়া 'রিয়া' নয়, বরং দ্বীনী বার্তা পৌঁছিয়ে দেওয়াই। অর্থাৎ "আমি মহান রবকে ভয় করি, তুমিও ভয় করো।"

৩১. এখানে 'নফলী সাদ্‌ক্বাহ্'র কথা বুঝানো হয়েছে। ফরয সাদ্‌ক্বাহ্ ও চাঁদা দেওয়ার সময় নফল সাদ্‌ক্বাহ্ প্রকাশ্যভাবে দেওয়া মুস্তাহাব। সুতরাং এ হাদীস শরীফ এ আয়াতের বিপরীত নয়– اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ (অর্থাৎ যদি তোমরা সাদক্বাহসমূহ প্রকাশ্যে দাও, তবে তা কতোই উত্তম; ২:২৭১)

৩২. এখানে বাজার মানে দোকান, বাজারের মসজিদ নয়, কোন কোন মসজিদে ২৫ গুণ বেশী সাওয়াব, কোন কোন মসজিদে ২৭ গুণ বেশী, কোন কোন মসজিদে ৫০০ গুণ বেশী। যেমন মসজিদ, যেমন জমা'আত ও যেমন ইমাম তেমনি সাওয়াব। সুতরাং হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী নয়। যে কেউ নিজের ঘরে জমা'আত করিয়ে নেয়, সেও মসজিদের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে।

৩৩. বুঝা গেলো যে, ঘর থেকে ওযূ করে মসজিদে যাওয়া সাওয়াবের কাজ। কেননা, এ পায়ে হাঁটা বা যাওয়াও

خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَتْ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَاِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَا نْتَظَرَ الصَّلٰوةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهٗ وَزَادَ فِىْ دُعَآءِ الْمَلَآئِكَةِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

وَعَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

তজ্জন্য তার একটা মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, একটি গুনাহ্র ক্ষমা হবে,[৩৪] তারপর যখন নামায পড়বে, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার নামাযের জায়গায় থাকবে, ফিরিশ্তাগণ ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য এভাবে দো'আ করতে থাকবে– "হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করে দাও! হে আল্লাহ্ তাকে দয়া করো!"[৩৫] আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ নামাযের জন্য অপেক্ষা করে, ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই থাকে। এক বর্ণনায় এসেছে, হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন, "যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে, তখন নামাযই তাকে রুখে থাকে।"[৩৬] আর ফিরিশতাদের দো'আর মধ্যে এতটুকু বেশী আছে, "হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করে দাও! হে আল্লাহ্! তার তাওবা কবূল করো।' যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেখানে কষ্ট দেয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওযূ ভঙ্গ করে না।"[৩৭] [মুসলিম, বোখারী]

৬৫২।। হযরত আবূ উসায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে আসে, তখন বলবে, "হে আল্লাহ্! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।" আর যখন বের হবে তখন বলবে, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার অনুগ্রহ চাচ্ছি।"[৩৮] [মুসলিম]

ইবাদত। আর ইবাদত ওযূ সহকারে হওয়া উত্তম। কেউ কেউ রোগী দেখার জন্যও ওযূ সহকারে যায়।

৩৪. এটা গুনাহ্গারদের জন্য। নেক্কারদের জন্য প্রত্যেক ক্বদমের বিনিময়ে দু'টি নেকী ও দু'টি মর্যাদা বুলন্দ হয়। কেননা, যে জিনিষ দ্বারা গুনাহ্গারদের গুনাহ্ মাফ হয়, তা দ্বারা যাঁদের গুনাহ্ নেই তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৩৫. খুব সম্ভব, এখানে 'সালাত' মানে 'পরকালীন রহমত' আর 'দয়া' (রহম্) মানে 'পার্থিব' রহমত। অথবা 'সালাত' মানে 'খাস রহমত'। আর 'রহমত' মানে 'আম রহমত'। তাছাড়া এর আরো বহু ব্যাখ্যা হতে পারে।

৩৬. অর্থাৎ নামাযের জন্য অপেক্ষা করা ব্যতীত অন্য কোন কারণে মসজিদে বসে না, সে যেন নামাযের মধ্যে থাকে। এ কারণে তখন আঙ্গুলগুলো মটকানো নিষিদ্ধ।

৩৭. অর্থাৎ ফিরিশ্তাদের এ দো'আ তখন পর্যন্ত পাওয়া যাবে, যতক্ষণ না সে নামাযীকে নির্যাতন করবে এবং না সেখানে বাতাস ছেড়ে ওযূ ভঙ্গ করবে।

স্মর্তব্য যে, ই'তিকাফকারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য মসজিদে বাতাস বের করা নিষিদ্ধ। ই'তিকাফকারী যেহেতু মসজিদেই

وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اِلَّا نَهَارًا فِى الضُّحٰى فَاِذَا قَدِمَ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَّنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৫৩।। হযরত আবূ ক্বাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে আসে, তখন বসার পূর্বে দু'রাক'আত নামায পড়ে নেবে।[৩৯] [মুসলিম, বোখারী]

৬৫৪।। হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখনই সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন দিনে চাশ্তের সময়ই ফিরে আসতেন। সুতরাং যখন ফিরে আসতেন, তখন মসজিদ থেকে আরম্ভ করতেন; সেখানে দু'রাক্'আত নামায পড়তেন, তারপর সেখানেই কিছুক্ষণ বসতেন।[৪০] [মুসলিম, বোখারী]

৬৫৫।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো জিনিষ তালাশ করতে শুনে,[৪১] তখন বলবে, "খোদা যেনো তোমাকে ওই জিনিষ ফিরিয়ে না দেন।" কারণ মসজিদগুলোকে এ জন্য বানানো হয় নি।[৪২] [মুসলিম]

থাকে, সেহেতু তার জন্য মাফ।

৩৮. আবূ দাঊদ ইত্যাদির বর্ণনায় এসেছে যে, মসজিদে কদম রাখার সময় বলবে- বিস্মিল্লাহি ওয়াস্সালামু আলা রসূলিল্লাহ্! (আল্লাহ্র নামে আরম্ভ এবং আল্লাহ্র রসূলের উপর সালাম।) তারপর এ দো'আ পড়ে নেবে। স্মর্তব্য যে, মুসলমান মসজিদে শুধু ইবাদতের জন্য আসে। আর বেশীর ভাগ সময় জীবিকার তালাশে মসজিদ থেকে বের হয়। সুতরাং আসার সময় রহমত এবং যাবার সময় অনুগ্রহ চাইতে থাকবে। [মিরক্বাত ইত্যাদি]

৩৯. এ নফল হচ্ছে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'; যা মসজিদে প্রবেশের সময় পড়া হয়- যখন মাক্রূহ ওয়াক্ত না হয়। সুতরাং ফজর ও মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামাযে এ নফল পড়া মুস্তাহাব। স্মর্তব্য যে, এ বিধান সাধারণ মসজিদগুলোর জন্য। মসজিদে হারামের জন্য এ নফলগুলোর স্থলে তাওয়াফ করা উত্তম। আর এ বিধান খতীব ব্যতীত অন্যান্যের জন্য। খতীব জুমু'আর দিনে মসজিদে আসতেই খোত্বা পড়বেন।

৪০. এ হাদীস থেকে তিনটা মাস্আলা বুঝা গেলো-

এক. সফর থেকে ঘরে দিনের বেলায় ফিরে আসা চাই। কিন্তু এটা ওই যুগের জন্য ছিলো, যখন নিজের আগমনের খবর পূর্ব থেকে দিতে পারতো না। এখন যেহেতু তার ও চিঠি দ্বারা আগেভাগে খবর দেওয়া সম্ভব, সেহেতু রাতে আসলেও কোন ক্ষতি নেই। ঘরের লোকেরা তার জন্য অপেক্ষা করবে ও তৈরী থাকবে।

দুই. ঘরের কাছে এসে প্রথমে মসজিদে আসবে এবং তাতে আগমনের নফল পড়বে- যদি মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়। অন্যথায় সেখানে শুধু কিছুক্ষণ বসবে।

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى مِنْهُ الْاِنْسُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَّكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৫৬।। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি এ দুর্গন্ধময় বৃক্ষ থেকে কিছু আহার করে, সে যেনো আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে।[৪৩] কেননা, ফিরিশ্‌তাগণও তা থেকে কষ্ট পায়, যা থেকে মানুষ কষ্ট পায়।"[৪৪] [মুসলিম, বোখারী]

৬৫৭।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ্। এর কাফ্‌ফারা হচ্ছে তা মাটিতে পুঁতে ফেলা।"[৪৫] [মুসলিম, বোখারী]

তিন. ঘরে আসার পূর্বে মসজিদে কিছুক্ষণ বসবে এবং লোকজনের সাথে সেখানেই সাক্ষাৎ করবে।

৪১. চিৎকার করে, শোরগোল করে, যার কারণে নামাযীদের নামাযগুলোতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। কেননা, নীরবে হারানো জিনিষ মসজিদে তালাশ করে নেওয়া নিষিদ্ধ নয়। যেমন– হাদীসের মর্মার্থ থেকে সুস্পষ্ট হয়।

৪২. অর্থাৎ মসজিদগুলো পার্থিব কথাবার্তা বলার ও শোরগোল করার জন্য নির্মিত হয় নি। এ গুলোতো নামায ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র করার জন্য নির্মিত হয়েছে। উত্তম হচ্ছে ওই শোরগোলকারীকে শুনিয়ে বলা, যাতে সে তা থেকে বিরত হয়।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, মসজিদে ভিক্ষা করা ও অন্য কোন ধরনের পার্থিব কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ; বরং কোন কোন আলিম বলছেন, "মসজিদের ভিখারীকে ভিক্ষা দিও না; কারণ, তা হবে গুনাহ্‌র কাজে সহায়তা করা।" হযরত আলী মুরতাদ্বা নামাযরত অবস্থায় যে ভিখারীকে আংটি দান করছেন, খুব সম্ভব ওই ভিখারী মসজিদের বাইরে ছিলো। নতুবা হয়তো তিনি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও নামায পড়ছিলেন।

স্মর্তব্য যে, বিবাহ, দ্বীনী ওয়ায, না'ত খানি ও ইসলামের বিচারকের মীমাংসা প্রদান– এ সব কিছুই দ্বীনী কাজ। সুতরাং ওইগুলো মসজিদে জায়েয। এগুলো সম্পর্কে হাদীসমূহ বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য, জমা'আত চলাকালে, যখন প্রথম জমা'আত চলতে থাকে তখন যেন এসব কাজ করা না হয়, যাতে নামাযের ক্ষতি না হয়। এ কাজগুলো পরবর্তীতে করা হবে।

৪৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাঁচা পেঁয়াজ কিংবা কাঁচা রসুন খায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যেন কোন মসজিদে না আসে। সুতরাং হুক্কা পান করে, কাঁচা মূলা কিংবা দুর্গন্ধময় বস্তু আহার করেও যেনো মসজিদে না আসে।

তাছাড়া, যার কাপড়চোপড় কিংবা মুখ থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায় সেও যেনো মসজিদে না আসে। অপবিত্র মুখের বিধানও এটাই।

স্মর্তব্য যে, সমগ্র দুনিয়ার মসজিদগুলো হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই। সুতরাং আমাদের 'মসজিদ' (مَسْجِدَنَا) এরশাদ করা সঠিক। এটা দ্বারা শুধু মসজিদ-ই নবভী শরীফ বুঝায় না, যেমন পরবর্তী বিষয়বস্তু থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। কোন কোন বর্ণনায় مَسْجِدَنَا (আমাদের মসজিদ)-এর পরিবর্তে اَلْمَسَاجِد (মসজিদগুলো) এসেছে।

৪৪. অর্থাৎ যদিও মসজিদ মানুষশূন্য হয়, তবুও সেখানে দুর্গন্ধ সহকারে যাবে না। কারণ, সেখানে রহমতের ফিরিশ্‌তারা সব সময় থাকেন। তাঁরা এর দুর্গন্ধ দ্বারা কষ্ট পাবেন।

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ اَعْمَالُ اُمَّتِىْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُّ فِىْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُّ فِىْ مَسَاوِىْ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِى الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَا يَبْصُقْ اَمَامَهُ فَاِنَّمَا يُنَاجِى اللّٰهَ مَا دَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَّمِيْنِهٖ فَاِنَّ عَنْ يَّمِيْنِهٖ

৬৫৮।। হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "আমার সামনে আমার উম্মতের ভালো-মন্দ কর্ম পেশ করা হয়েছে।[৪৬] তখন আমি তাদের ভালো কাজগুলো থেকে একটা পেয়েছি– কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে ফেলে দেওয়া, আর তাদের মন্দ কাজগুলোর মধ্যে পেয়েছি ওই থুথু ফেলাকে, যা মসজিদে সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু তা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয় নি।[৪৭] [মুসলিম]

৬৫৯।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ নামাযে দাঁড়ায়, সে যেনো তার সামনে থুথু না ফেলে। কারণ, সে যতক্ষণ নামাযের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র সাথে কথোপকথন করতে থাকে, না ডান দিকে থুথু ফেলবে। কারণ ওইদিকে

স্মর্তব্য যে, মসজিদের ফিরিশ্‌তাগণ হচ্ছেন রহমতের ফিরিশ্‌তা। তাঁদের স্বভাব নাজুক এবং তাঁদের সম্মান বেশী। সুতরাং হাদীসের বিরুদ্ধে এ আপত্তি করা যাবে না যে, 'ফিরিশ্‌তারা তো প্রত্যেক মানুষের সাথে থাকেন। সুতরাং কখনোই এসব বস্তু না খাওয়া চাই?' কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সঙ্গেকার ফিরিশ্‌তাদের স্বভাব অন্য ধরনের করে পয়দা করেছেন।

আলিমগণ বলেছেন, মুসলমানদের কোন জমায়েতে দুর্গন্ধময় মুখ কিংবা কাপড় নিয়ে যাওয়া উচিত নয়; যাতে মানুষ কষ্ট না পায়।

৪৫. এ থেকে বুঝা গেলো যে, মসজিদের পাকা ফরশ এবং সেখানকার চাটাই ও মুসাল্লাগুলোর উপর কখনো থু থু ফেলবে না। কেননা, সেখানে তা দাফন করতে পারবে না। এটা ওই মসজিদগুলোর জন্য বিধান ছিলো, যেখানে ফরশ কাঁচা ছিলো। আর তাও একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই– যখন নামাযে কাঁশি এসে যায় এবং বাইরে যাবার সুযোগ না পায়। বিনা কারণে সেখানে থুথু ফেলা নিষিদ্ধ। আর অবমাননা করার উদ্দেশ্যে সেখানে থুথু ফেলা কুফর।

৪৬. অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার যে উম্মত যে-ই ভালো কিংবা মন্দ কাজ করবে, সবই আমাকে দেখানো হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন প্রতিটি উম্মত ও তার প্রতিটি আমল (কর্ম) সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টি মুবারক আলো-আঁধার, প্রকাশ্য-গোপন এবং অস্তিত্বসম্পন্ন-অস্তিত্বহীন– সবকিছু দেখতে পায়। যাঁর চোখ মুবারকে مَا زَاغَ (বিচ্যুত হয়নি)'র সুরমা রয়েছে, তাঁর দৃষ্টি আমাদের স্বপ্ন এবং কল্পনা অপেক্ষাও বেশী গতিসম্পন্ন। আমরা স্বপ্ন ও কল্পনায় প্রত্যেক জিনিষকে চোখে দেখে নিই। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন প্রত্যক্ষ দৃষ্টি মুবারক দিয়ে প্রতিটি জিনিষ দেখে নেন। সূফীগণ বলেন যে, এখানে 'কর্মসমূহ'-এর মধ্যে হৃদয়ের কর্মসমূহও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের

مَلَكًا وَّلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهٖ اَوْتَحْتَ قَدَمِهٖ فَيَدْفِنُهَا وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ سَعِيْدٍ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَآئِهِمْ مَسَاجِدَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ফিরিশ্‌তা রয়েছে। সে থুথু ফেলবে বাম দিকে কিংবা পায়ের নিচে; তারপর সেটা পুঁতে ফেলবে। আর হযরত আবূ সা'ঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর বর্ণনায় আছে- 'সে আপন বাম পায়ের নিচে থথু ফেলবে।'[৪৮] [মুসলিম, বোখারী]

৬৬০।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হুযূরের ওই রোগের সময় এরশাদ করেছেন, যা থেকে তিনি ওঠেন নি,[৪৯] "ইহুদী ও খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত করুন! তারা তাদের পয়গাম্বরদের কবরগুলোকে সাজদার স্থান করে নিয়েছে।"[৫০] [মুসলিম, বোখারী]

হৃদয়গুলোর প্রত্যেক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত আছেন। এর বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'জা'আল হক্ব': ১ম খণ্ড-এ দেখুন!

৪৭. سُوْءٌ - مَسَاوِئُ -এর বহুবচন। এর অর্থ মন্দ কাজ। যেমনিভাবে سَعْىٌ - مَسَاعِى-এর বহুবচন। এর ى হচ্ছে ء -এর পরিবর্তে। 'রাস্তা' মানে 'মুসলমানদের রাস্তা'। অর্থাৎ যে রাস্তা দিয়ে মুসলমান অতিক্রম করে কিংবা অতিক্রম করতে পারে, সেই রাস্তা থেকে কাঁটা, ইট-পাথর দূরীভূত করা সাওয়াবের কাজ; হিংস্রপ্রাণী, জিন্ ও প্রতিপক্ষ কাফির রাষ্ট্রের কাফিরদের রাস্তা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। ওইসব ক্ষতিকর কাফিরের পথে তো কাঁটা ও গোলা-বারুদ বিছানো, তাদের পুল ভেঙ্গে দেওয়া, ডায়নামেট বসিয়ে উড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি- সবকিছু ইবাদতের সামিল। কেননা, জিহাদে এসব কিছুই ঘটে থাকে।

৪৮. এ হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটা মাসআলা বুঝা যায় ঃ

এক. আল্লাহ্‌র রহমত নামাযীর প্রতি বিশেষভাবে এগিয়ে আসে।

দুই. নামাযের মধ্যে থাকাবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে ডানে-বামে মুখ ফেরাতে পারে; কেননা, এ থুথু ফেলার জন্য মুখ ফেরানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

তিন. ডান হাতের ফিরিশ্‌তা অর্থাৎ সৎকর্মগুলো লিপিবদ্ধকারী বাম হাতের ফিরিশ্‌তা অপেক্ষা উত্তম। 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, "ডান পার্শ্বস্থ ফিরিশ্‌তা হলেন- শাসক আর বাম পার্শ্বস্থ ফিরিশ্‌তা হলেন শাসিত। ডান পার্শ্বস্থ হলেন- রহমতের ফিরিশ্‌তা, আর বাম পার্শ্বস্থ হলেন ক্রোধের।

চার. বড়দের প্রতি আদবও বড়।

৪৯. অর্থাৎ ওফাত শরীফের অসুস্থতায়। সুতরাং এ হাদীস মুহকাম বা বলবৎ হলো; মানসুখ বা রহিত হলো না।

৫০. এভাবে যে, তাঁদের কবরগুলোর দিকে সাজদা করতে লাগলো; বরং কেউ কেউ ওই কবরগুলোর পূজা করতে আরম্ভ করেছিলো। এ উভয় কাজ শির্ক। অথবা তাঁদের কবরগুলোকে ধূলিস্যাৎ করে মসজিদের ফরশের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে এবং সেটার উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করেছে। এটাও হারাম। কারণ, এটা কবরের অবমাননার সামিল।

স্মর্তব্য যে, বুযুর্গদের আস্তানাগুলোর পাশাপাশি মসজিদ বানানো এবং বরকতের জন্য তাতে নামায পড়া ক্বোরআন শরীফ ও বহু হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত। সূরা 'কাহ্‌ফ'-এ এরশাদ হয়েছে- لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مَّسْجِدًا অর্থাৎ মুসলমানগণ বলেছে আমরা 'আসহাব-ই কাহ্‌ফ'-এর গুহার পাশে মসজিদ নির্মাণ করবো। (১৮:২১) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা-ই আনওয়ার এবং বেশীরভাগ সাহাবীর মাযারগুলোর পাশে মসজিদ রয়েছে। এগুলো খোদ্ সাহাবীগণ কিংবা নেক্কার লোকেরা নির্মাণ করেছেন। এখন আল্লাহ্‌র ওলীগণের মাযারের পাশে মুসলিম

وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَآئِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّيْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلٰوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৬১।। হযরত জুন্দাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, "খবরদার! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীগণ ও সৎকর্মপরায়ণদের কবরগুলোকে সাজদার স্থান বানিয়ে নিতো। খবরদার! তোমরা কবরগুলোকে সাজদার স্থান বানিয়ে নিও না! আমি তোমাদেরকে তা করতে নিষেধ করছি।"[৫১] [মুসলিম]

৬৬২।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "নিজেদের কিছু নামায নিজেদের ঘরের জন্য নির্দ্ধারণ করো।''[৫২] এবং ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিয়ো না।"[৫৩] [মুসলিম, বোখারী]

সাধারণ মসজিদ নির্মাণ করে থাকে। মাক্ববূল বান্দাদের নিকটে নামায বেশী ক্ববূল হয়। মসজিদ-ই নবভী শরীফে এক নামাযের সাওয়াব পঞ্চাশ হাজার। তাও হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নৈকট্যের কারণে। মহান রব ইস্রাঈলী পাপীদেরকে বলেছিলেন- اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ

অর্থাৎ তোমরা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দরজায় সাজদারত অবস্থায় প্রবেশ করো এবং সেখানে গিয়ে তাওবা করো (২:৫৮)। নবীগণ আলায়হিমুস সালাম-এর কবর শরীফগুলোর বরকতে তাওবা ক্ববূল হবে। হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালাম-এর ঘটনা বর্ণনা করছেন- هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ

অর্থাৎ সেখানে বিবি মরিয়মের পাশে দাঁড়িয়ে যাকারিয়া (আলায়হিস্ সালাম) পুত্র-সন্তানের জন্য দো'আ করলেন [৩:৩৮]। এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, বুযুর্গদের নৈকট্যে তাওবা ও দো'আ বেশী ক্ববূল হয়। এটাও স্মরণযোগ্য যে, কবরের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ; কিন্তু যদি কবরের কিছুটা উপরে পিলার তৈরী করে ফরশ বানানো হয় তবে সেখানে নামায পড়া জায়েয- মাকরূহও নয়। সুতরাং কা'বাতুল্লাহ্র মাতাফ (তাওয়াফের জন্য নির্দ্ধারিত জায়গা)-এর মধ্যে ৭০ জন নবীর মাযার রয়েছে, যেগুলোর উপর তাওয়াফ ও নামায চলছেই। তাছাড়া, কা'বার ছাদের নালার (মীযাব) নিচে হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর মাযার শরীফ রয়েছে, যেখানে দিন-রাত নামায পড়া হচ্ছে। সেখানেও কারণ এটাই। [মিরক্বাত ও আশি''আহ্]

৫১. শায়খ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'লুম'আত'-এ উল্লেখ করেছেন, যদি কবর নিশ্চিহ্নও হয়ে যায়, কিন্তু প্রসিদ্ধ হয় যে, সেখানে কবর ছিলো, সেখানেও নামায পড়বে না; কিন্তু বুযুর্গদের কবরের পাশে নামায পড়া, যাতে তাঁর রূহের সাহায্য নিয়ে নামাযকে বেশী গ্রহণযোগ্য করা হয়, তাহলে সেটা অত্যন্ত উত্তম কাজ। [লুম'আত]

৫২. এভাবে যে, ফরয নামায মসজিদে পড়ো এবং সুন্নাত ও নফল ঘরে এসে পড়ো। অথবা পাঁচ ওয়াক্বতের নামায মসজিদে পড়ো, আর তাহাজ্জুদ ও চাশ্ত ইত্যাদির নামায ঘরে পড়ো। যাতে নামাযের নূর ঘরগুলোতে থাকে এবং নারী ও শিশুদের মধ্যে তোমাদেরকে দেখে নামাযের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ঘরের নামাযে 'রিয়া' কম থাকে।

৫৩. অর্থাৎ কবরস্থানের মতো সেগুলোকে নামায শুন্য রেখো না। অথবা ঘরগুলোতে মৃত দাফন করো না।

স্মরণ রাখবেন, ঘরের মধ্যে দাফন হওয়া হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই বৈশিষ্ট্যাদির অন্যতম। তাছাড়া, হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهٗ وَاَخْبَرْنَاهُ اَنَّ بِاَرْضِنَا بِيْعَةً لَّنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طُهُوْرِهٖ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهٗ لَنَا فِىْ اِدَاوَةٍ وَاَمَرَنَا فَقَالَ اُخْرُجُوْا فَاِذَا اَتَيْتُمْ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৬৬৩।। **হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যভাগে ক্বেবলা।"**[৫৪] [তিরমিযী]

৬৬৪।। **হযরত ত্বাল্ক্ব ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রতিনিধিরূপে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসলাম।**[৫৫] **তখন আমরা হুযূরের বায়'আত গ্রহণ করলাম এবং হুযূরের সাথে নামায পড়লাম।**[৫৬] **আর আমরা হুযূরকে খবর দিলাম, আমাদের ভূ-খণ্ডে আমাদের গীর্জা রয়েছে। আমরা হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম থেকে হুযূরের ওযূতে ব্যবহৃত পানি চাইলাম। তখন তিনি পানি তলব করলেন, ওযূ করলেন, কুল্লি করলেন। তারপর এ পানি একটি পাত্রে পুরে নিলেন এবং আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন আর এরশাদ ফরমালেন, "যাও,**[৫৭] **যখন পৌঁছবে**

আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে হযরত সিদ্দীক্ব ও হযরত ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা এ সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অন্য লোকদেরকে শহরের বাইরে কবরস্থানেই দাফন করা চাই। কেউ কেউ নিজের নির্মিত মসজিদ কিংবা মাদ্রাসায় নিজের কবরের জায়গা রাখে এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। তারা এ হাদীসের (নিষেধের) আওতায় পড়ে না। কারণ, এর ফলে ওই জায়গা কবরস্থান হয়ে যায় না। قُبُوْرًا শব্দের মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। তাদের কবরগুলো খনন করে লাশ বের করাও না-জায়েয, কারণ, দাফন করার পর মৃতকে বের করা জায়েয নয়।

اِلَّا لِحَقٍّ آدَمِيٍّ (তবে কোন মানুষের হক্ব সংশ্লিষ্ট ব্যাপার হলে তা এর ব্যতিক্রম)।

৫৪. এ হাদীস শরীফ মদীনাবাসীদের বেলায় প্রযোজ্য। কেননা, সেখানে কা'বা দক্ষিণে অবস্থিত। আমাদের এখানে ক্বেবলা পশ্চিম দিকে।

এ থেকে ইঙ্গিতে একথা বুঝা গেলো যে, যদি নামাযীর মুখ ৪৫ ডিগ্রী থেকে কম পরিমাণ কা'বা থেকে ফিরে যায় তাহলে নামায হয়ে যায়। কারণ, এমতাবস্থায় সে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তীতে থাকবে।

৫৫. অর্থাৎ আপন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে তাদের সবার পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং বিধানাবলী শোনার জন্য এসেছি।

৫৬. এ বায়'আতকে ইসলামের বায়'আত বলা হয়। আজকাল সাধারণত 'বায়'আগুলো বায়'আত-ই তাওবা'ই হয়ে থাকে। বায়'আতের বাস্তবতা (হাক্বীক্বত) হচ্ছে কোন মাক্ববূল বান্দার মাধ্যমে মহান রবের সাথে কিছু অঙ্গিকার করা।

'বায়'আত' চার প্রকার। এর বিস্তারিত বিবরণ আমার কিতাব **'শানে হাবীবুর রহমান'** (উর্দু)-এ দেখুন! হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায পড়া বড় নি'মাতই। এ কারণে এ সব হযরত সেটাকে গর্বের সাথে বর্ণনা করেন।

৫৭. প্রকাশ থাকে যে, এ পানি হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর (ওযূর) বরকতময় অঙ্গগুলো ধোয়া পানি ছিলো। তাতে

اَرْضِكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ وَانْضِحُوْا مَكَانَهَا بِهٰذَا الْمَآءِ وَ اتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا قُلْنَا اِنَّ الْبَلَدَ بَعِيْدٌ وَالْحَرُّ شَدِيْدٌ وَالْمَآءُ يُنْشَفُ فَقَالَ مُدُّوْهُ مِنَ الْمَآءِ فَاِنَّهٗ لَا يَزِيْدُهٗ اِلَّا طَيِّبًا. رَوَاهُ النَّسَآئِيُّ

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَآءِ الْمَسْجِدِ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ يُّنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ۔

তোমাদের জন্মভূমিতে, তখন তোমাদের গীর্জা ভেঙ্গে ফেলো এবং ওই স্থানে এ পানি ছিঁটিয়ে দাও।[৫৮] আর সেটাকে মসজিদ বানিয়ে নাও।" আমরা আরয করলাম, "আমাদের শহর দূরে অবস্থিত। গরম খুব তীব্র। পানিটুকু শুকে যাবে।"[৫৯] এরশাদ ফরমালেন, "এর সাথে আরো পানি মিশাতে থাকো, আর তা থেকে বরকতই বাড়বে।"[৬০] [নাসাঈ]

৬৬৫।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরগুলোতে মসজিদ বানাতে এবং সেগুলোকে পাক সাফ ও খুশ্‌বুদার রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৬১] [আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

বিশেষ করে আরো একটি কুল্লিও করে দেওয়া হয়েছিলো। এটাও হতে পারে যে, ওযূর পানির কিছুটা অবশিষ্ট ছিলো। আর তাতে কুল্লি করে দেওয়া হয়েছে, যা বরকতের জন্য তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছে। বুঝা যাচ্ছে যে, ওইসব হযরত হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্‌সালাম-এর তাবারুরুকগুলোকে অপ্রকাশ্য ভাণ্ডার জানতেন। এ কারণে, বিনয় সহকারে চাইতেন।

৫৮. যাতে সেটার বরকতে বিগত কুফরের অপবিত্রতা দূরীভূত হতে থাকে এবং ভবিষ্যতে তোমাদের নামাযগুলো বেশী ক্ববূল হয় আর তোমাদের এ মসজিদ অন্যান্য মসজিদ অপেক্ষা উত্তম হয়। কেননা, তাতে আমার তাবারুরুক পৌঁছেছে।

৫৯. অর্থাৎ আমরা পথিমধ্যে বরকতের জন্য পানও করবো, যাতে মসজিদের সাথে সাথে আমাদের হৃদয়গুলোও আলোকিত হয়ে যায় এবং গরমের কারণেও শুকে যাবে।

৬০. এ হাদীস থেকে কতিপয় মাস্'আলা বুঝা গেলোঃ

এক. যে জিনিষের সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় শরীর লেগে যায় তা তাবারুরুক (বরকতময়) হয়ে যায়। সুতরাং মদীনা মুনাওয়ারার মাটি তাবারুরুকও, শেফাও।

দুই. সরকার-ই কায়েনাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওযূতে ব্যবহৃত পানি অভ্যন্তরীণ (আত্মিক) অপবিত্রতাও দূরীভূত করে দেয়।

তিন. যেই মসজিদে 'মুখ্‌তার-ই কুল' 'খতম-ই রুসুল' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর তাবারুরুক থাকে, তা অন্যান্য মসজিদ অপেক্ষা উত্তম। কোন কোন মসজিদে সাইয়্যেদ-ই আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চুল শরীফ রাখা হয়েছে। তাঁদের দলীল হচ্ছে এই হাদীস শরীফ।

চার. বুযুর্গদের তাবারুকগুলো অন্য কোন শহরে নিয়ে যাওয়া কিংবা প্রেরণ করা সুন্নাত-ই সাহাবা। কেউ কেউ ওরসসমূহের লঙ্গর (ডাল-রুটি) দূর-দূরান্তরে প্রেরণ করেন। তাঁদের দলীলও হচ্ছে এ-ই হাদীস শরীফ।

'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, "হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কার আমীর থেকে ঝমঝমের পানি মদীনা মুনাওয়ারায় তলব করতেন। এখনো ঝমঝমের পানি বিভিন্ন দেশে পৌঁছে থাকে।

পাঁচ. তাবারুরুকের সাথে যে জিনিষ মিশে যায় তাও তাবারুরুক হয়ে যায়। এখনো ঝমঝমের পানির সাথে অন্য পানি মিশিয়ে পান করানো হয়।

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآ اُمِرْتُ بِتَشْئِيْدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৬৬৬।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "আমাকে মসজিগুলোতে কারুকার্য করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি।"[৬২] হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মতো মসজিদগুলোতে কারুকার্য করবে।"[৬৩] [আবূ দাঊদ]

৬৬৭।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ক্বিয়ামতের চিহ্নগুলোর মধ্যে এটাও রয়েছে যে, লোকেরা মসজিদগুলোতে বাবুয়ানা দেখাবে, গর্ব করবে।"[৬৪] [আবূ দাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, ইবনে মাজাহ]

ছয়. মুসলমান কাফিরদের উপসানালয় ভাঙ্গতে পারে না। যদি কাফিরগণ মুসলমান হয়ে নিজেরাই তাদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলে সেখানে মসজিদ বানিয়ে নেয়, তবে জায়েয।

৬১. এটা দ্বারা মসজিদ-ই বায়ত (ঘরের মসজিদ)-এর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঘরের মধ্যে কোন কামরা কিংবা কোণ্ নামাযের জন্য রাখা হবে; যেখানে পার্থিব কোন কাজ করা হবে না, ওই জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হবে এবং সুবাসিত রাখার প্রতি যত্নবান হবে। আমরা আমাদের বুযুর্গদেরকে এটা করতে দেখেছি। এখন এটার প্রচলন উঠে যাচ্ছে।

কোন কোন আলিম বলেছেন, 'এটা দ্বারা মহল্লার মসজিদ-এর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে মুসলমানদের কয়েকটা ঘর থাকবে, সেখানে একটা মসজিদও বানিয়ে নেওয়া হবে। পাঞ্জাবে কূপের পাশে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তাঁদের দলীল হচ্ছে– এই হাদীস শরীফ।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, মসজিদগুলোতে খুশ্‌বুদার বস্তু জ্বালানো, আতর লাগানো মুস্তাহাব।

৬২. এটা দ্বারা অবৈধ কারুকার্য; যেমন ফটো ও ছবি দ্বারা সাজানো, কিংবা বাবুয়ানা সাজসজ্জার কথা বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয় না। মোট কথা, যে কোন অবস্থায় বৈধ সাজসজ্জা, যা নিষ্ঠার সাথে হয়, সাওয়াবের কারণ হয়।

৬৩. অর্থাৎ যেমন খ্রিস্টান ও ইহুদীরা তাদের ইবাদতখানাগুলোকে বিভিন্ন ফটো এবং মানব-গড়নসম আয়না দ্বারা সজ্জিত করে। ক্বিয়ামতের সন্নিকটে মুসলমানরাও মসজিদগুলোকে ওইগুলো দ্বারা সজ্জিত করবে, অন্যথায় মসজিদকে সুন্দর করা সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাত। সুতরাং হযরত ওমর ফারূক্ব মসজিদ-ই নবভী শরীফকে সুসজ্জিত করেছেন। তাঁর পরবর্তীতে হযরত ওসমান গণী সেটার দেওয়ালগুলোকে রং-চুনা দিয়ে খুব কারুকার্য করেছেন, ছাদে সেগুন গাছের কাঠ লাগিয়েছেন। হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম বায়তুল মুক্বাদ্দাসে এতোই আলোকসজ্জা করেছিলেন যে, তাতে নারীরা তিন মাইল পর্যন্ত চরখায় ওই আলোতে সূতা কাটতো। এর বিস্তারিত বিবরণ আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' ১ম খণ্ড'-এ দেখুন।

৬৪. এ হাদীস এবং হযরত ইবনে আব্বাসের পূর্ববর্তী বাণী এ নিষেধের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। অর্থাৎ না-জায়েয জিনিষগুলো দিয়ে মসজিদকে সাজানো কিংবা গর্ব-অহংকারও রিয়ার পন্থায় মসজিদকে সাজানো নিষিদ্ধ। মুসলমানগণ মসজিদগুলোতে আলোকসজ্জা করে, পতাকা ইত্যাদি লাগায়। কেউ কেউ এ হাদীসের ভিত্তিতে তাতে বাধা দেয়, এটা ভুল। যখন বিয়ে-শাদীতে আমাদের ঘর সজ্জিত হয়, তাহলে বরকতময় দিনগুলোতে আল্লাহ্র ঘর কেন সজ্জিত হবে না?

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عُرِضَتْ عَلَيَّ اُجُوْرُ اُمَّتِيْ حَتّٰى الْقَذَاةِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوْبُ اُمَّتِيْ فَلَمْ اَرَ ذَنْبًا اَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اَوْ اٰيَةٍ اُوْتِيْهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاؤد

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاؤدَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاَنَسٍ-

وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ

৬৬৮।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন, "আমার সামনে আমার উম্মতের সাওয়াব পেশ করা হয়েছে; এমনকি ওই আবর্জ্জনারও, যাকে মানুষ মসজিদ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে।[৬৫] আর আমার সামনে আমার উম্মতের গুনাহ্ও পেশ করা হয়েছে। তখন আমি এ থেকে বড় কোন গুনাহ্ দেখি নি যে, কোন এক ব্যক্তিকে ক্বোরআনের সূরা কিংবা আয়াত দেওয়া হয়, তারপর সে তা ভুলে বসে।"[৬৬] [তিরমিযী, আবূ দাঊদ]

৬৬৯।। হযরত বোরায়দাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "ওইসব লোককে ক্বিয়ামত দিবসে পূর্ণ আলোর সুসংবাদ দাও, যারা অন্ধকারে মসজিদে যায়।[৬৭] [তিরমিযী, আবূ দাঊদ] আর ইবনে মাজাহ্ সেটাকে হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ ও হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

৬৭০।। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদ্রী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যখন তোমরা কাউকে মসজিদের খোঁজ খবর নিতে দেখতে পাও[৬৮]

---

৬৫. এ থেকে বুঝা গেলো যে, মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া, সেটার দেওয়ালগুলো এবং ছাদগুলো মেরামত করা অতি উত্তম কাজ।

৬৬. এভাবে যে, তা বারংবার পড়ে না, নামাযগুলোতে পড়ে না, তাই ভুলে যায়। যদি কেউ বার্ধক্যের কারণে, কোন আয়াত স্মরণ রাখতে না পারে, তাহলে হয়তো অপরাধী (গুনাহ্গার) হবে না।

স্মর্তব্য যে, 'গুনাহ্-ই কবীরাহ্' ও 'গুনাহ্-ই আযীম'-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। এ ভুলে যাওয়া হচ্ছে- 'গুনাহ্-ই আযীম' 'গুনাহ্-ই কবীরাহ্' নয়। সুতরাং এ হাদীস শরীফ ওইসব হাদীসের পরিপন্থী নয় যেগুলোতে এরশাদ হয়েছে, সবচেয়ে বড় অর্থাৎ গুনাহ্-ই কবীরাহ্ হচ্ছে শির্ক।

৬৭. অর্থাৎ যে সব লোক বৃষ্টি ও অন্ধকারময়ী রাতগুলোতে মসজিদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে না, তাদেরকে মহান রব পুল-সেরাত্বের উপর, যেখানে ঘন অন্ধকার বিরাজিত, আলো দান করবেন, তাদের কপালগুলো বিড়ির (টর্চ) মতো চমকাতে থাকবে। মোট কথা, দুনিয়ার অন্ধকারের কষ্ট পরকালে কাজে আসবে।

৬৮. এভাবে যে, প্রত্যেক নামাযের জন্য সেখানে হাযির হয়, সেটাকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে, সংস্কার-মেরামতের দিকে

الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَه' بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لَنَا فِي الْاِخْتِصَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصٰى وَلَا اخْتَصٰى، اِنَّ خَصَاءَ اُمَّتِي الصِّيَامُ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِي السِّيَاحَةِ قَالَ اِنَّ سِيَاحَةَ اُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ

তখন তার ঈমানের সাক্ষ্য দিয়ে দাও।[৬৯] কেননা, মহান রব এরশাদ ফরমান, "মসজিদগুলোকে ওই ব্যক্তিই আবাদ করে, যে আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখে।"[৭০] [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারেমী]

৬৭১।। হযরত ওসমান ইবনে মায্'উন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদেরকে 'খাসি' (অণ্ডকোষ-কর্তিত) হয়ে যাবার অনুমতি দিন।[৭১] হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি 'খাসি' হয় কিংবা 'খাসি' করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৭২] আমার উম্মতের 'খাসি হওয়া' হচ্ছে রোযা পালন করা।"[৭৩] অতঃপর আরয করলেন, "আমাদেরকে যাযাবর হয়ে যাবার অনুমতি দিন!" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আমার উম্মতের 'যাযাবর হওয়া' হচ্ছে- আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা।"[৭৪] আরয করলেন,

খেয়াল রাখে, বৈধ কারুকার্য ও সাজসজ্জায় মশগুল থাকে, সেখানে বসে দ্বীনী মাসাইল বর্ণনা করে, সেখানে দরস দেয়- এসবই মসজিদের খবরাখবর নেওয়ার সামিল।

৬৯. কেননা, এসব বস্তু ঈমানের চিহ্ন। স্মর্তব্য যে, এ সাক্ষ্য তেমনি, যেমন কারো পোশাক ও আকৃতি দেখে আমরা তাকে মু'মিন মনে করি ও বলি।

'সাক্ষ্য' মানে অকাট্য ফয়সালা নয়। সুতরাং এ হাদীস শরীফ 'বাবুল ঈমা-নি বিল্ক্বদর' ('তাক্বদীরের উপর ঈমান' শীর্ষক অধ্যায়)-এর হাদীসগুলোর পরিপন্থী নয়, যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা এক আনসারী শিশুকে, যে মারা গিয়েছিলো, জান্নাতের পাখি বলেছেন। হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম তাঁকে নিষেধ করলেন। আর এরশাদ করলেন, "তুমি কি জানো? সে কোথায় যাবে?" তাছাড়া, যদি কারো কুফর প্রকাশ্য হয় আর সে মসজিদের সেবা করে, তাকে মু'মিন বলা যাবে না। যেমন- ওই যুগের নামাযী-মুনাফিক্ব আর এ যুগের নামাযী ও মসজিদগুলোর খিদমতগার মির্যায়ী (ক্বাদিয়ানী)। সুতরাং এ হাদীস শরীফ এ-ই আয়াতের পরিপন্থী নয়- اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ (যেন কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায়; ৪৯:২)

অথবা قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ (অর্থাৎ নিশ্চয় তোমরা তোমাদের ঈমানের পর কাফির হয়ে গেছো; ৯:৬৬)

৭০. এ আয়াতের দু'টি তাফসীর ঃ

এক. মসজিদগুলো আবাদ করার তাওফীক্ব (সামর্থ্য) সাধারণতঃ মু'মিনরাই পেয়ে থাকে।

দুই. মসজিদ বানানো ও আবাদ করার অধিকার শুধু মু'মিনদেরই রয়েছে, কাফিরদের নয়। এ কারণে মুনাফিক্বদের মসজিদ-ই দ্বিরার ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিলো। 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, "এখানে মসজিদ আবাদ করার মধ্যে মসজিদগুলোতে আলোকসজ্জা করা, মসজিদকে সাজানো- সবই রয়েছে।

৭১. আমাকে ও আমার মতো ওই মিসকীনদেরকে, যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, 'খাসি' হয়ে যাবার অনুমতি দিন, যাতে আমরা যিনা করতে না পারি। এটা মহান রবকে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভয় করার আলামত।

'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো যেনো তাঁরা বিয়ে করার অনুপযোগী হয়ে যান। কেননা, বিবাহ হচ্ছে পার্থিব অস্থিরতার মূল। তাই তাঁরা 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করে জীবনাতিপাত করবেন।

ائْذَنْ لَنَا فِىْ التَّرَهُّبِ فَقَالَ اِنَّ تَرَهُّبَ اُمَّتِىَ الْجُلُوْسُ فِىْ الْمَسَاجِدِ اِنْتِظَارَ الصَّلٰوةِ. رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ۔

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ اَنْتَ اَعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ

"আমাদের সংসার ত্যাগী হবার অনুমতি দিন।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আমার উম্মতের জন্য 'সংসার ত্যাগ' হচ্ছে নামাযের অপেক্ষায় মসজিদগুলোতে বসে থাকা।"[৭৫] [এটা শরহুস্ সুন্নাহ্য় বর্ণনা করেছেন।]

৬৭২।। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "আমি আমার রবকে সর্বোত্তম সূরতে দেখেছি।"[৭৬] মহান রব আমাকে বললেন, "নৈকট্যধন্য ফিরিশ্‌তাগণ কোন্ বিষয়ে বাদানুবাদ করছে?"[৭৭] আমি আরয করলাম, "মুনিব, তুমিই জানো।" তিনি বললেন, তখন

---

৭২. এ কারণে যে, তারা মানুষের প্রজনন পদ্ধতিকে বন্ধ করে। বস্তুতঃ মানুষের স্থায়িত্বের মধ্যে ইসলামের স্থায়িত্ব রয়েছে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যৌন-শক্তি বিনষ্টকারী ঔষধ সেবন করা হারাম। তাছাড়া, নারীদের জরায়ু বের করে ফেলা কিংবা তাদেরকে সন্তান প্রজননে অক্ষম করে দেওয়াও হারাম– যখন যিনা করার উদ্দেশ্যে হয়, কিংবা প্রজনন বন্ধ করার জন্য হয়। [মিরক্বাত]

৭৩. কেননা, রোযা দ্বারা মনের কু-প্রবৃত্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। বুঝা গেলো যে, যেসব লোক বিবাহ করতে পারে না, সে যেনো নিজেকে 'না-মর্দ' (নপুংসক) করে না ফেলে; বরং রোযা রাখে।

৭৪. কারণ, মুজাহিদ জিহাদের অবস্থায় মাতৃভূমিও ছেড়ে দেয় এবং সফরের পাথেয়ও সাথে নিয়ে বেড়ায়। বুঝা গেলো যে, বিনা কারণে মাতৃভূমি ছেড়ে মরিয়া হয়ে ঘুরে বেড়ানো নিষেধ। সাময়িকভাবে দুনিয়ায় ভ্রমণ করা, যেমন আল্লাহ্র কোন কোন ওলী সম্পর্কেও এমনি বর্ণিত হয়েছে, নিষিদ্ধ নয়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন– قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ (হে হাবীব! আপনি বলুন! তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো; ২৭:৬৯)।

৭৫. تَرَهُّب - رهب থেকে গৃহীত। এর অর্থ ভয়। যেমন– كَانُوْا يَتَرَهَّبُوْنَ (তারা ভয় করছিলো)। আর পরিভাষায় আল্লাহ্র ভয়ে সৃষ্টির নিকট থেকে পালিয়ে পাহাড়ের চূড়া কিংবা গুহার কোণে বসে ইবাদত করাই হচ্ছে 'তারাহ্হুব' (تَرَهُّب)। এ থেকে গঠিত হয়েছে– رهبانيت (বৈরাগ্য) ও راهب (রাহিব বা) 'বৈরাগী', সংসার ত্যাগী। অর্থাৎ নামাযের জন্য অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা হচ্ছে দুনিয়া ত্যাগ করা। কারণ, তখন মানুষ তার সন্তান-সন্ততি থেকে পৃথক হয়ে যায়। বিগত দ্বীনগুলোতে সংসার ত্যাগ করা বড় ইবাদত ছিলো। আমাদের ইসলামে তা হারাম। ইসলাম চায়– এক হাতে দ্বীন অর্পণ করবে, আরেক হাতে দুনিয়া। আল্লাহ্র প্রদত্ত শক্তি অকেজো করে ফেলা পূর্ণতা নয়, বরং সেটাকে বিশুদ্ধ স্থানে ব্যয় করাই হচ্ছে পূর্ণতা।

৭৬. অর্থাৎ তখন আমার নিজের সূরত (আকৃতি) খুব ভালো ছিলো। এখানে আল্লাহ্র সূরত-এর কথা বলা উদ্দেশ্য নয়; যেমন– বলা হয় 'আমি উত্তম পোশাকে শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি।' অর্থাৎ সাক্ষাতের সময় আমার পোশাক ভালো ছিলো; অন্যথায় মহান রব সূরত (আকার-আকৃতি) থেকে পবিত্র।

স্মর্তব্য যে, হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে তাশরীফ আনয়ন করা মানবীয় সূরতেই। আর মহান রবের সাথে সাক্ষাৎ করা নূরী সূরতে, মানুষের ঘরের পোশাক এক ধরনের হয়, আর অফিস-আদালতের হয় অন্য ধরনের।

এটা খুব সম্ভব, মি'রাজের ঘটনার উল্লেখ। কেউ কেউ স্বপ্নের দীদার (সাক্ষাৎ) বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু প্রথম

كَفَّه، بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَتَلَا: وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوَه، عَنْهُ

মহান রব আপন কুদরতের হাত আমার দু'স্কন্ধের মধ্যভাগে রাখলেন, যার শৈত্য আমি আমার বক্ষে পেয়েছি।৭৮ তখন যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে ওই সবকিছু জেনে নিলাম।"৭৯ আর এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেছেন– "আমি এভাবে ইব্রাহীমকে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব দেখাই, যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।"৮০ দারেমী এটা 'মুরসাল'★ সূত্র বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিযীর বর্ণনা এরই অনুরূপ তাঁরই থেকে।

অভিমতটা বেশী শুদ্ধ। এ কারণে, আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের কথা প্রমাণিত হলো।

সঠিক অভিমত হচ্ছে– হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম এ-ই চক্ষুযুগলে মহান রবের দীদার করেছেন। মহান রবের এরশাদ– لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (তাঁকে চক্ষুগুলো দেখতে পারবে না; ৬:১০৪) দীদার (সাক্ষাৎ)'র অস্বীকৃতি প্রকাশ করছে না, বরং দৃষ্টির আওতাভুক্ত করে দীদার করার অস্বীকৃতি প্রকাশ করছে। এ হাদীসের সমর্থন এ আয়াত শরীফ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى (চক্ষু না লক্ষ্যচ্যুৎ হয়েছে, না ভ্রষ্ট হয়েছে; ৫৩:১৭)-ই করছে।

আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমার কিতাব 'শানে হাবীবুর রহমান' (উর্দু)-তে দেখুন।

৭৭. অর্থাৎ সেগুলো কোন্ কর্ম, যেগুলো নিয়ে যেতে ও আল্লাহ্‌র মহান দরবারে পেশ করতে ফিরিশ্‌তারা ঝগড়া করছে? ওই ফিরিশ্‌তা বলছে, "আমি নিয়ে যাবো", আর এ ফিরিশ্‌তা বলছে, "আমি নিয়ে যাবো।" এ বাক্যের আরো কতিপয় ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু বেশী গ্রহণযোগ্য হচ্ছে এটাই।

৭৮. অর্থাৎ মহান রব আপন রহমতের হাতকে আমার পিঠের উপর রেখেছেন। আর সেটার কল্যাণের ধারা আমার বুক ও হৃদয়ের উপর গিয়ে পৌঁছেছে।

৭৯. 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, এ হাদীস শরীফ হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশস্ত জ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রমাণ। মহান রব হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে সাত আসমান বরং ঊর্ধ্বজগতের সবকিছুর এবং সপ্তযমীন ও সেগুলোর নিম্নদেশের অণু-পরমাণু এবং বিন্দু-বিন্দু, বরং মাছ এবং ষাঁড়, যেগুলোর উপর যমীন স্থির রয়েছে– ওই সবের সামগ্রিক জ্ঞান দান করেছেন। 'শায়খ' বলেছেন, "এটা দ্বারা সমস্ত সামগ্রিক (كلى) ও পুংখানুপুংখ (جزئى) জ্ঞান দান করার কথা বুঝানো হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবকে পূর্ববর্তী, বর্তমানকার এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে এমন প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান দিয়েছেন। কেননা, যমীনের উপর মানুষের আমলগুলো এবং আসমানের উপর ওইসব আমলের জন্য ফিরিশ্‌তাদের এ বাদানুবাদগুলো ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, যেগুলো হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আজ স্বচক্ষে দেখছেন।

এ হাদীসের সমর্থন ক্বোরআনের বহু আয়াত করছে। যে সব আয়াতে ইল্‌মের অস্বীকৃতি রয়েছে, ওখানে ইল্‌ম-ই যাতী (স্বত্বাগত জ্ঞান) বুঝানো উদ্দেশ্য। এর বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব'-এ দেখুন।

৮০. অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ্ আপন খলীলকে 'মালাকূত' দেখিয়েছেন, অনুরূপ আমি জানতে পেরেছি যে, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শুধু মাস্'আলা বলা হয় নি। মাস্'আলা তো মৌলভীদেরকেও বলে দেওয়া হয়; বরং সমগ্র খোদায়ী (সৃষ্টিজগত) দেখানো হয়েছিলো; অন্যথায় হুযূর আলায়হিস্ সালাম এ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করতেন না।

★ মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদের শেষ ভাগে, তাবে'ঈর পরে বর্ণনাকারী উল্লেখ করা হয় না। যেমন– তাবে'ঈর কথা, "হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন"। – মুক্বাদ্দামা-ই শায়খ-ই দেহলভী।

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَّ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَّ زَادَ فِيْهِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِىْ فِيْمَ
يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ نَعَمْ فِىْ الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمَكْثُ فِىْ
الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَاِبْلَاغُ
الْوُضُوْءِ فِىْ الْمَكَارِهِ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ
خَطِيْئَتِهٖ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ

হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত মু'আয ইবনে জবল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম থেকে বর্ণিত, এতে এতটুকু অতিরিক্তও রয়েছে, মহান রব এরশাদ করেছেন- "হে মুহাম্মদ! তুমি কি জানো- নৈকট্যধন্য ফিরিশ্‌তাগণ কোন্ বিষয়ে বাদানুবাদ করছে?"[৮১] আমি আরয করলাম, "হাঁ! কাফ্‌ফারাগুলো সম্পর্কে।"[৮২] আর কাফ্‌ফারাগুলো হচ্ছে নামাযের পর কিছুক্ষণ অবস্থান করা, জামা'আতগুলোর দিকে পদব্রজে চলা এবং অসহনীয় সময়ে পূর্ণাঙ্গ ওযূ করা।[৮৩] আর যে ব্যক্তি এটা করবে সে কল্যাণ সহকারে জীবন যাপন করবে, কল্যাণ সহকারে মৃত্যুবরণ করবে[৮৪] এবং নিজের পাপরাশি তেমনিভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তাকে আজই তার মা প্রসব করেছে।[৮৫] আর এরশাদ ফরমাচ্ছেন,[৮৬] "হে মুহাম্মদ! যখন আপনি নামায পড়ে নিন, তখন বলুন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে চাই-

৮১. 'নৈকট্যধন্য ফিরিশ্‌তাগণ' মানে 'আমলসমূহ উপস্থাপনকারী ফিরিশ্‌তাগণ'। অর্থাৎ কর্মব্যবস্থাপক ফিরিশ্‌তাগণ।

৮২. অর্থাৎ হাঁ, এখন তোমার দান ও বদান্যতায় সবকিছু জানি। বুঝা গেলো যে, মহান রব বলে দেন নি, বরং সবকিছু দেখিয়েই দিয়েছিলেন।

৮৩. অর্থাৎ ওই তিনটি নেকীর কারণে আল্লাহ্ তা'আলা 'গুনাহ্-ই সগীরাহ্' ক্ষমা করে দেন। ওইগুলোর ব্যাখ্যাবলী গত হয়েছে।

৮৪. এর সমর্থন এ আয়াত থেকে পাওয়া যায়-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً الاٰية

[অর্থাৎ যে বক্তি সৎকর্ম করেছে- পুরুষ হোক কিংবা নারী এবং সে হয় মু'মিন তবে অবশ্যই আমি তাকে উত্তম জীবনে জীবিত রাখবো। (আল-আয়াত ১৬:৯৭, তরজমা- কান্যুল ঈমান]

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস বলেন, হালাল রিযক্ব, অল্পে তুষ্টি, অদৃষ্টের উপর সন্তুষ্টি, ইবাদতে তৃপ্তি এবং আনুগত্য ও ইবাদতগুলোর সামর্থ্য লাভ করা- পবিত্র (উত্তম) জীবন। আর ঈমানের উপর শেষ নিঃশ্বাস বের হওয়া, মৃত্যুর সময় তাওবা, ফিরিশ্‌তারা প্রাণবায়ু বের করার সময় জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া, বরং সেখানকার ফুল এনে ঘ্রাণ গ্রহণ করানো, ওফাতের পর পর মুসলমানগণ তাকে ভালো বলে স্মরণ করা- উত্তম মৃত্যু। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে নসীব করুন! এটা মহান রবের প্রতিশ্রুতি, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। কখনো এটার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

৮৫. তার সমস্ত সগীরাহ্ গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। এতে গুনাহ্-ই কবীরাহ্ও অন্যের হক্ব বা প্রাপ্যের কথা বুঝানো হয় নি। এ কারণে (خَطِيْئَتِهٖ) (তার গুনাহ) এরশাদ করেছেন।

৮৬. অর্থাৎ প্রত্যেক নামায সম্পন্ন করে নেওয়ার পরক্ষণে করো; নামাযের অভ্যন্তরে এ দো'আ প্রার্থনা করে নিও না। যেমন- হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন-

اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ

অর্থাৎ যখন তোমরা জানাযার নামায পড়ে নাও, তখন মৃতের

فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ فَاِذَا اَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ قَالَ وَالدَّرَجَاتُ اِفْشَآءُ السَّلَامِ وَاِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلٰوةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ . وَلَفْظُ هٰذَا الْحَدِيْثِ كَمَا فِى الْمَصَابِيْحِ لَمْ اَجِدْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِلَّا فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ۔

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ

ভালো কাজ করা, মন্দগুলো পরিহার করা এবং মিস্‌কীনদের প্রতি ভালবাসা।[৮৭] সুতরাং যখন তুমি তোমার বান্দাদেরকে ফিৎনার মধ্যে ফেলতে চাও, তখন তুমি আমাকে তোমার দিকে, ফিৎনার মধ্যে না ফেলে ডেকে নাও।''[৮৮] এরশাদ করলেন, "মর্যাদাগুলো হচ্ছে সালাম প্রসারিত করা, আহার করানো এবং রাতের বেলায় নামায পড়া, যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে।"[৮৯] এ হাদীসের শব্দগুলো যেমনিভাবে 'মাসাবীহ্'র মধ্যে রয়েছে, আমি তেমন আবদুর রহমানের বর্ণনায় পাই নি; কিন্তু শরহে সুন্নাহ্‌র মধ্যে পেয়েছি।

৬৭৩।। হযরত আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে, যাদের দায়িত্বভার আল্লাহ্‌র বদান্যতার দায়িত্বে রয়েছে[৯০] ঃ এক. ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য বের হলো, সে আল্লাহ্‌র বদান্যতার দায়িত্বে রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মৃত্যু এসে যায়। মৃত্যু হলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, অথবা

জন্য অন্তরের নিষ্ঠার সাথে দো'আ করো। উভয় ইবারত এক সমান (সমার্থক)।

৮৭. যদিও 'মিসকীনদের প্রতি ভালবাসাও সৎকার্যাদির অন্তর্ভুক্ত ছিলো; কিন্তু সেটা ওইসব থেকে উত্তম। কারণ, এটা হচ্ছে ঈমানের মাধ্যম। এ কারণে, এটাকে পৃথক করে উল্লেখ করেছেন।

'মিস্‌কীনগণ' মানে নবীগণ, ওলীগণ এবং সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানগণ। কারণ, এসব হযরত হৃদয়ের মিসকীন ও বিনয়ী। 'ফক্বীর' ও 'মিসকীন' শব্দ দু'টির মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।

৮৮. কারণ এ সময়ে জীবিত থাকা থেকে মৃত্যু উত্তম। স্মর্তব্য যে, পার্থিব বিপদাপদকে ভয় করে মৃত্যুর জন্য দো'আ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু ঈমানী বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যু কামনা করা জায়েয। সুতরাং এ হাদীস মৃত্যু কামনা করার নিষেধ বর্ণনাকারী হাদীসগুলোর বিরোধী নয়।

৮৯. অর্থাৎ উল্লেখিত তিনটি আমল পাপ মার্জনার মাধ্যম ছিলো। আর এ আমলগুলো মর্যাদাদি বৃদ্ধি পাবার মাধ্যম।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, তাহাজ্জুদের নামায, ক্ষুধার্তদের পেট ভরানো এবং প্রত্যেককে সালাম করা অতি উত্তম কর্ম।

৯০. অর্থাৎ তাদের সাওয়াব ও বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলার বদান্যতার দায়িত্বে রয়েছে। অথবা এসব লোক আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব ও নিরাপত্তায় থাকে। যেমনিভাবে সরকারী চাকুরে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় সরকারের নিরাপত্তায় থাকে– তাকে অপমানিত করা সরকারের সাথে মোকাবেলা করার সামিল, তেমনিভাবে ওইসব লোকের সাথে ঝগড়া করা মহান রবের সাথে মোকাবেলা করার নামান্তর বৈ-কি।

يَرُدَّهٗ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهٗ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَا يَنْصِبُهٗ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلٰوةٌ عَلٰى اَثَرِ صَلٰوةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِيْ عِلِّيِّيْنَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ

সাওয়াব ও গণীমতের মাল সহকারে ফিরিয়ে আনবেন।[৯১] দুই. অপর এক ব্যক্তি সে-ই, যে মসজিদের দিকে চলতে থাকে, সেও আল্লাহ্‌র বদান্যতার দায়িত্বে থাকে এবং তিন. অন্য একব্যক্তি হচ্ছে সে-ই, যে আপন ঘরে 'সালাম' সহকারে প্রবেশ করে, সেও আল্লাহ্ তা'আলার বদান্যতার দায়িত্ব রয়েছে।[৯২] [আবূ দাঊদ]

৬৭৪।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের জন্য নিজ ঘরে ওযূ করে বের হয়, তার সাওয়াব ইহরাম বাঁধে এমন হাজীর মতোই,[৯৩] আর যে ব্যক্তি চাশ্‌তের নামাযের জন্য বের হয়, অর্থাৎ এ নামাযই তাকে বের করে, তবে তার সাওয়াব ওমরাহ্ পালনকারীর মতোই।[৯৪] আর নামাযের পর অন্য নামায, যার মধ্যভাগে কোন অনর্থক কথা বলা হয় না, তার লিপি রয়েছে 'ইল্লিয়্যীন'-এর মধ্যে।"[৯৫] [আহমদ, আবূ দাঊদ]

৯১. অর্থাৎ যদি মারা যায় তবে শহীদ হয়, আর যদি জীবিত ফিরে আসে, তবে হেরে আসলে শুধু সাওয়াব এবং জিতে আসলে সাওয়ার ও গনীমতের মাল-সামগ্রী উভয়ই নিয়ে আসলো।

৯২. বুঝা গেলো যে, ঘরে প্রবেশ করার সময় সালাম করা বড়ই উত্তম কাজ। এতে ঘরে একতা থাকে, রিয্‌ক্বের মধ্যে বরকত এবং সৎকর্মের সামর্থ্য লাভ করা যায়।

এমনকি যদি খালি ঘরে প্রবেশ করে, তবে এভাবে বলবে, 'আস্‌সালামু আলায়কা আইয়্যুহান নাবিয়্যু"। (হে নবী! আপনাকে সালাম)! এর অর্থ এটাও করা হয়েছে যে, তৃতীয় ওই ব্যক্তি, যে নিরাপদে আপন ঘরে অবস্থান করে, বিনা কারণে মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করে না; যেমন অন্য হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে।

৯৩. কেননা, হাজী কা'বায় যায়, আর এ ব্যক্তি যায় মসজিদে। এ দু'টিই আল্লাহ্‌র ঘর। হাজী হজ্জের ইহরাম বাঁধে। আর এ ব্যক্তি নামাযের নিয়্যতে ঘর থেকে বের হয়। আর যেমন হজ্জ বিশেষ তারিখগুলোতে সম্পন্ন করা হয়, কিন্তু হাজী ঘর থেকে বের হবার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সব সময় সাওয়াব পায়; তেমনিভাবে নামাযের জমা'আত যদিও বিশেষ সময়ে হবে, কিন্তু নামাযী বের হওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যেই থাকে।

৯৪. স্মর্তব্য যে, চাশ্‌তের নামায ও অন্যান্য নফল নামায যদিও ঘরের মধ্যে উত্তম, কিন্তু যদি ঘরের কার্যাদি ও ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচির কারণে মসজিদে পড়ে, তবেও উত্তম। এখানে এটাই উদ্দেশ্য। কোন কোন আলিম বলেন, চাশ্‌তের নামায মসজিদে উত্তম। তাদের দলীল হচ্ছে এই হাদীস শরীফ।

৯৫. এর দু'টি অর্থ হতে পারে ঃ

এক. ফরযের পরপর নফল ও সুন্নাতগুলো পড়বে; মধ্যভাগে পার্থিব কাজ করবে না।

দুই. পঞ্জেগানা ফরয নামাযগুলোর মধ্যভাগেও এটা ভেবে গুনাহ্‌র কার্যাদি থেকে বাঁচবে– 'আমি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে

وَعَنْ اَبِی هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَارِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قِيْلَ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتَى الْمَسْجِدَ لِشَیْءٍ فَهُوَ حَظُّهٗ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ

৬৭৫।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা জান্নাতের বাগানগুলোর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করো, তখন কিছুটা আহার ভোগ করে নাও।[৯৬] আরয করা হলো, "হুযূর! জান্নাতের বাগানগুলো কি?" এরশাদ ফরমালেন, "মসজিদগুলো।" আরয করা হলো, "আহার ভোগ করা কি? হে আল্লাহ্র রসূল!" এরশাদ ফরমালেন, "সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার' বলা।"[৯৭] [তিরমিযী]

৬৭৬।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি মসজিদে যে জিনিষের জন্য আসবে, সেটা তার অংশ হবে।"[৯৮] [আবূ দাঊদ]

পবিত্র র'য়ে মহান রবের দরবারে হাযির হবো।' তাহলে তার কর্মগুলো 'ইল্লিয়্যীন'-এর মধ্যে লিপিবদ্ধ হবে। 'ইল্লিয়্যীন' হচ্ছে সপ্তম আসমানের উপরে স্থাপিত দপ্তর। যেখানে নেককার লোকদের সৎকার্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়; যেহেতু এটা উঁচু জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে, সেহেতু সেটাকে 'ইল্লিয়্যীন' বলা হয়।

৯৬. অর্থাৎ যদি তোমরা মসজিদগুলোতে নামাযের জন্য না-ও যাও, বরং তেমনিভাবে সেখান থেকে অতিক্রম করে যাও, তবুও কিছু পড়ে নাও; কেননা, বাগানে গিয়ে কিছু না খেয়ে ফিরে আসা বঞ্চিত থাকার সামিল। বিশেষ করে যখন বাগানের মালিক দানশীল হয়।

৯৭. জান্নাতে দৈহিক খাদ্য থাকবে এবং স্থায়ী ফলমূলও থাকবে। সেগুলোর উপর কোন বাধা-বিপত্তি নেই। তেমনিভাবে মসজিদগুলোতে আল্লাহ্র যিকরের রূহানী খাদ্যাবলী রয়েছে, যেগুলো বিলীন হবার নয়। এ কারণে সাইয়্যেদুনা আলী মুরতাদ্বা বলেন, "যদি মহান রব আমাকে জান্নাত ও মসজিদে যাবার মধ্যে ইখতিয়ার দেন, তবে আমি জান্নাতের স্থলে মসজিদকে বেছে নেবো।" আলিমগণ বলেন, "যে ব্যক্তি তখন মসজিদে যায়, যখন নফল নামায মাকরূহ হয়, তখন এ কলেমাগুলো পড়ে নেবে সে ইন্শা-আল্লাহ্, 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'-এর সাওয়াব পাবে। একটি হাদীস শরীফে আছে যে, মি'রাজের রাতে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর দরবারে আরয করলেন, "আপনার উম্মতকে আমার সালাম বলবেন" আর বলুন, "জান্নাতের বহু যমীন খালি পড়ে আছে, সেখানে চারা লাগিয়ে এসো! সেখানকার চারা হচ্ছে- এ কলেমাগুলো, "সুবহানাল্লাহি...।" [মিরক্বাত]

৯৮. অর্থাৎ মসজিদে যে নিয়্যতে যাবে তাই পাবে। জুতো চুরি করতে গেলে জুতোই পাবে, আর যদি সেখানে ভিক্ষা করতে যাও, তবে সর্বদা ভিক্ষাই করতে থাকবে। আর যদি নামায ও আল্লাহ্র যিক্রের জন্য যাও, তাহলে সাওয়াব পাবে। অধম বলছি- যে ব্যক্তি মসজিদ-ই নবভী শরীফে এজন্য যায় যে, আমি হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে পেয়ে যাবো, তাহলে ইন্শা-আল্লাহ্, হুযূরকে পাবে; ওইসব মসজিদেও আল্লাহ্-রসূলের সন্তুষ্টির নিয়্যত করো, ইন্শা-আল্লাহ্! তা পাবে।

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِىْ رِوَايَتِهِمَا قَالَتْ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَكَذَا اِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ بَدَلَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ لَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِمُتَّصِلٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ فَاطِمَةَ الْكُبْرٰى

৬৭৭।। হযরত ফাতিমা বিনতে হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত,[৯৯] তিনি তাঁর দাদী হযরত ফাতিমাতুল কুব্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হা থেকে বর্ণনা করেন,[১০০] তিনি বলেন, হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করতেন।[১০১] আর বলতেন, "হে আমার মহান রব আল্লাহ্! আমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।" আর যখন বের হতেন, তখন হুযূর মোস্তফার উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করতেন আর বলতেন, "হে আমার রব! আমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও। আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজা খুলে দাও।"[১০২] [তিরমিযী, আহমদ, ইবনে মাজাহ] তাঁরা দু'জনের বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, "তিনি বলেন, তিনি যখন মসজিদে যেতেন, অনুরূপ যখন বের হতেন, তখন সালাত ও সালাম-এর স্থলে এটা বলতেন, "বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্ সালামু 'আলা রসূলিল্লাহি।[১০৩] (আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ এবং দুরূদ ও সালাম আল্লাহ্‌র রসূলের উপর)।" ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এর সনদ 'মুত্তাসিল'★ পর্যায়ের নয়। ফাতিমা বিনতে হোসাঈন ফাতিমা-ই কুব্‌রাকে জীবদ্দশায় পান নি।[১০৪]

৯৯. তাঁর উপাধি হচ্ছে 'ফাতিমা-ই সোগরা' (ছোটতর ফাতিমা)। ইমাম হোসাঈনের সাহেবযাদী ইমাম যায়নুল আবেদীনের বোন; হোসাঈন ইবনে হাসান ইবনে আলীর বিবাহাধীন ছিলেন। তাঁর ওফাতের পর আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে ওসমান ইবনে আফ্‌ফান-এর বিবাহাধীন হন। ইনি অতি সম্মানিত তাবে'ঈ ছিলেন। অর্থাৎ সাহাবা-ই কেরামের সঙ্গপ্রাপ্ত।

১০০. তাঁর উপাধি 'ফাতিমা-ই কুবরা'। হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম-এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা। হযরত খাদিজাতুল কুব্‌রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মাহে রমযান, ২য় হিজরীতে সাইয়েদুনা আলী মুরতাদ্বার বিবাহাধীন হন এবং যিলহজ্জ মাসে স্বামীর ঘরে চলে যান। তাঁর পবিত্র গর্ভে দু'পুত্র ও তিন কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন- হাসান, হোসাইন, যায়নাব, উম্মে কালসূম ও রুক্বাইয়্যাহ্। হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর ওফাতের ছয়মাস পরে ওফাত পান। বয়স পান ২৮ বছর। হযরত আলী গোসল দিয়েছেন। হযরত আব্বাস কিংবা আবূ বকর সিদ্দীক্ব জানাযার নামায পড়ান। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হা বলেছেন, "আমি ফাতিমা অপেক্ষা বেশী সত্যবাদীনী আর দেখি নি।"

১০১. এ থেকে দু'টি মাস্‌আলা বুঝা গেলো ঃ

★ মুত্তাসিল ঃ হাদীস বর্ণনাকারীগণ ( ) থেকে কোন একজন বর্ণনাকারীও যদি সনদের কোন স্তর থেকে বাদ না পড়েন, তাহলে ওই হাদীসকে 'মুত্তাসিল' বলে। মুক্বাদ্দামা-ই মিশ্‌কাত।

وَعَنْ عَمْرِوابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِى الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالْاِشْتِرَآءِ فِيْهِ وَاَنْ يَّتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فِى الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ۔

৬৭৮।। হযরত আমর ইবনে শো'আয়াব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন,[১০৫] তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কবিতা পাঠ করতে[১০৬] ও সেখানে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন।[১০৭] আর লোকেরা জুমু'আর দিন মসজিদে নামায সম্পন্ন করার পূর্বে বৃত্তাকার হয়ে বসতেও নিষেধ করেছেন।[১০৮] [আবূ দাউদ, তিরমিযী]

এক. মসজিদে যাবার সময় দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত। শেফা শরীফে আছে– শূন্য ঘর ও মসজিদে প্রবেশ করার সময় পড়বেন– 'আস্সালামু আলায়কা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু'। (হে নবী! আপনার উপর সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত ও বরকতসমূহ।) এবং দুই. হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেও নিজের উপর দুরূদ শরীফ পড়তেন। কখনো বলতেন, "সাল্লাল্লাহু 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া সাল্লাম।" আর কখনো বলতেন, "সাল্লাল্লাহু আলাইয়্যা ওয়াসাল্লাম।" (আল্লাহ্ আমার উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন!)

১০২. এ দু'বাক্যের ব্যাখ্যা এ অধ্যায়ের প্রথমভাগে করা হয়েছে। হুযূর আলায়হিস্ সালাম গুনাহ্সমূহের ক্ষমা চাওয়া হয়তো আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অথবা ওই গুনাহ্গুলো মানে আপন উম্মতের ওইসব গুনাহ্, যেগুলো ক্ষমা করানো হুযূরের বদান্যতার দায়িত্বে রয়েছে। যেমন– মুক্বাদ্দমার উকিল বলেন, "আমার মুক্বাদ্দমা।" এর উৎকৃষ্ট ও তৃপ্তিদায়ক ব্যাখ্যা আমার 'তাফসীর-ই নঈমী'তে 'সূরা-ই ফাত্হ'র لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ (লিয়াগ্ফিরা লাকাল্লা-হু)-এর ব্যাখ্যায় দেখুন।

১০৩. সুন্নাত হচ্ছে– এ শব্দগুলো এখনো বলা যাবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হুযূরের নূরানী উপস্থিতি সব জায়গায় রয়েছে, অন্যথায় অনুপস্থিতকে সালাম কীভাবে দেওয়া যাবে? প্রত্যেক নামাযী 'আত্তাহিয়্যাত'-এর মধ্যে পড়ে 'আস্সালামু আলায়কা আইয়্যুহান নাবিয়্যু!' (হে নবী আপনাকে সালাম)।

১০৪. কেননা, হযরত ফাতিমা কুব্রার ওফাতের সময় তাঁর (এ ফাতেমা সোগ্রা) পিতা ইমাম হোসাঈনের বয়স মাত্র আট বছর ছিলো। সুতরাং কোন বর্ণনাকারীর নাম ছুটে গেছে, যিনি হযরত ফাতিমা যাহ্রার নিকট শুনেছেন। 'মিরক্বাত'-এ আছে– ওই বর্ণনাকারী হলেন খোদ্ তাঁর পিতা ইমাম হোসাঈন। সুতরাং ইবনে মারদ্ওয়াইহ্ এ হাদীসের সনদ এমনি বর্ণনা করেছেন– 'ফাতিমা বিন্তিল হোসাঈন হযরত হোসাঈন থেকে, তিনি হযরত ফাতিমা-ই কুব্রা থেকে (বর্ণনা করেছেন)।'

১০৫. তাঁর দাদার নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল 'আস। তিনি সাহাবী। তাঁর কথা ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০৬. 'কবিতা' মানে মন্দ কিংবা পার্থিব অশ্লীল প্রেমজনিত কবিতা। আল্লাহ্র হামদ, হুযূর মোস্তফার না'ত, ওলীগণের জীবনী, ওয়ায-নসীহত, কাফিরদের মন্দ কার্যাদির বিবরণ সম্বলিত কবিতাদি পড়া জায়েয বরং সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাত। সুতরাং আলোচ্য হাদীস এর বিপরীত নয় যে, হুযূর মসজিদে হযরত হাস্সানের জন্য মিম্বর বিছিয়ে দিতেন, যার উপর দাঁড়িয়ে তিনি হুযূরের না'ত (প্রশংসা) ও কাফিরদের মন্দ কার্যাদির বর্ণনা সম্বলিত কবিতা পাঠাবৃত্তি করতেন। আর হুযূর তাঁর জন্য দো'আ করতেন। তা'ছাড়া হযরত হাস্সান ও কা'ব ইবনে যুহায়র মসজিদে নবভী শরীফে হুযূরের সামনে না'তখানি করতেন। এর আলোচনা, ইন্শা-আল্লাহ্ 'বাবুল্ শো'আরা' (কবিদের বর্ণনা সম্বলিত অধ্যায়)-এ আসবে।

১০৭. কেননা, এটা পার্থিব কাজ-কারবার, যা মসজিদে নিষিদ্ধ। আজকাল মসজিদ-ই হারাম শরীফে কা'বার গিলাফ ও কিতাবাদি রেখে বিক্রি করা হয়। এটাও নিষিদ্ধ। অবশ্য, ই'তিকাফকারী ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদে কাজ-কারবারের কথাবার্তা বলতে পারে। তবে সেখানে মাল-সামগ্রী আনতে পারবে না।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَّبِيْعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوا لَا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَاِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يُّنْشِدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لَا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ

وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُسْتَقَادَ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْ يُنْشَدَ فِيْهِ الْاَشْعَارُ وَاَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ سُنَنِهٖ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْاُصُوْلِ فِيْهِ عَنْ حَكِيْمٍ وَفِى الْمَصَابِيْحِ عَنْ جَابِرٍ-

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ

৬৭৯।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন তোমরা ওই ব্যক্তিকে দেখো, যে মসজিদে বেচাকেনা করছে, তখন তাকে বলে দাও- আল্লাহ্ যেনো তোমার ব্যবসায় লাভ না দেন।"[১০৯] আর যখন তোমরা সেখানে কাউকে হারানো জিনিষ তালাশ করতে দেখো, তখন বলে দাও- "আল্লাহ্ করুন যেনো তোমার জিনিষটা পাওয়া না যায়।"[১১০] [তিরমিযী, দারেমী]

৬৮০।। হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ক্বিসাস নিতে,[১১১] সেখানে কবিতা পাঠ করতে এবং সেখানে হদ্দ (শরীয়ত নির্দ্ধারিত শাস্তি) ক্বায়েম করতে নিষেধ করেছেন।[১১২] [আবূ দাউদ] 'জামে'উল উসূল'-এ হযরত হাকীম থেকে এবং মাসাবীহ্র মধ্যে হযরত জাবির থেকে বর্ণিত।

৬৮১।। হযরত মু'আবিয়া ইবনে ক্বোর্রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত,[১১৩] তিনি আপন পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই দু'টি গাছ অর্থাৎ

---

১০৮. তখন সেখানে কাতার করে বসা উচিত। অবশ্য নামাযের পর ওয়ায ইত্যাদি শোনার জন্য বৃত্ত বানিয়ে বসা জায়েয। কেননা, তখন নামাযের জন্য অপেক্ষা করা হয় না।

১০৯. বুঝা গেলো যে, পাপ কাজের উপর বদ-দো'আ দেওয়া জায়েয। উত্তম হচ্ছে তাকে শুনিয়ে বদ-দো'আ দেওয়া, যাতে শরীয়তের বিধানের প্রচারও হয়ে যায়।

'বেচাকেনা' মানে 'বেচাকেনার কথাবার্তা বলাও, মাল সামগ্রী হাযির করে বিক্রি করাও।

১১০. এর ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে। অর্থাৎ চিৎকার করে তালাশ করা।

১১১. কেননা, এতে রক্ত ইত্যাদি দ্বারা মসজিদ খারাপ হয়ে যাবে।

১১২. খুব সম্ভব 'হদ্দগুলো' মানে 'আল্লাহ্র হক্বসমূহের শাস্তিগুলো'। যেমন- চুরি ও যিনার শাস্তি। 'ক্বিসাস' ছিলো বান্দার হক্বের শাস্তি।

স্মর্তব্য যে, মসজিদে ক্বাযী (বিচারক) মুকাদ্দমাগুলো শুনতে পারেন, কিন্তু শাস্তি দেওয়া হবে মসজিদের বাইরে।

১১৩. তাঁর নাম মু'আবিয়া ইবনে ক্বোররা ইবনে আয়াস ইবনে হিলাল। নুদবাহ্ গোত্রের লোক, বসরায় অবস্থানকারী প্রসিদ্ধ তাবে'ঈ। ঐতিহাসিক উষ্ট্রের যুদ্ধে পয়দা হন। সত্তরজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। ১১৩ হিজরীতে ওফাতপ্রাপ্ত হন।

يَعْنِى الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَقَالَ مَنْ اَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ اٰكِلِيْهِمَا فَاَمِيْتُوْهُمَا طَبْخًا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ-

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِى الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَفِى الْحَمَّامِ وَفِىْ مَوَاطِنِ الْاِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّٰهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

পিঁয়াজ ও রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। আর এরশাদ করেছেন, "যে এগুলো খাবে, সে যেনো আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে।"[১১৪] আরো এরশাদ করেছেন, "যদি সেগুলো তোমাদের অবশ্যই খেতে হয়, তবেও সেগুলো রান্না করে মেরে ফেলো।"[১১৫] [আবূ দাঊদ]

৬৮২।। হযরত আবূ সা'ঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "সমগ্র পৃথিবী মসজিদ- কবরস্থান ও গোসলখানা (শৌচাগার) ব্যতীত।"[১১৬] [আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও দারেমী]

৬৮৩।। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাত জায়গায় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন- আবর্জ্জনার স্থান, যবেহখানা, কবরস্থান,[১১৭] রাস্তার মধ্যভাগে,[১১৮] গোসলখানায়, উষ্ট্র বাঁধার স্থানে,[১১৯] এবং কা'বা শরীফের ছাদের উপর।[১২০] [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

১১৪. এ বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রসূন খাওয়া হারাম নয়, বরং খেয়ে দুর্গন্ধময় মুখ নিয়ে মসজিদে আসা হারাম- চাই সেখানে নামাযী থাকুক কিংবা না-ই থাকুক। কেননা, সেখানে তো ফিরিশ্‌তা সব সময় থাকেন।

১১৫. যাতে সেগুলোর দুর্গন্ধ দূরীভূত হতে থাকে। কেননা, দুর্গন্ধই হচ্ছে নিষেধের কারণ। ইতোপূর্বে আরয করা হয়েছে যে, এ বিধান প্রতিটি মসজিদেরই; বরং প্রতিটি দ্বীনী মজলিসেও এর প্রতি খেয়াল রাখা চাই।

১১৬. অর্থাৎ ইসলামে সর্বত্র নামায জায়েয। কবরস্থানে নামায তখনই না-জায়েয, যখন কবর নামাযীর সামনে থাকে। সুতরাং কবরস্থানের মসজিদগুলোতে নামায জায়েয। অনুরূপ, গোসলখানায় গোসল করার জায়গায়, যেখানে ময়লা-আবর্জ্জনা থাকে, নামায পড়া নিষিদ্ধ। যদি সেটার কোন পবিত্র কোণায় নামায পড়া হয়, তাহলে ক্ষতি নেই।

১১৭. আবর্জ্জনার স্থানে ও যবেহের জায়গায় ময়লা-আবর্জ্জনা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। এ কারণে সেখানে নামায হবেই না। কবরস্থানের আলোচনা এখন করা হয়েছে।

১১৮. অর্থাৎ যেখানে জনসাধারণ চলাচল করে সেখানে নামায পড়ো না! কারণ, সেখানে নামাযীর মধ্যে একাগ্রতা থাকবে না এবং চলাচলকারীদের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। মসজিদেও দরজার সামনে কিংবা দরজার নিকটে পড়বে না। কারণ, এতে আগমন ও প্রস্থানকারীদের কষ্ট হবে। স্তম্ভের আড়াল গ্রহণ করে কিংবা এক কোণে নামায পড়া চাই।

১১৯. চাই সেখানে উট বাঁধা হোক- কিংবা না-ই হোক। কেননা, উটের রাখাল উটের আড়ালে প্রস্রাব করে। যদি উট

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوْا فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ-

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَآئِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ-

৬৮৪।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "ছাগল বাঁধার জায়গায় নামায পড়ো এবং উট বাঁধার জায়গায় নামায পড়ো না।"[১২১] [তিরমিযী]

৬৮৫।। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন কবরগুলোর যিয়ারতকারী নারীদের উপর[১২২] এবং কবরগুলোর উপর মসজিদ নির্মাণকারীগণ ও চেরাগ প্রজ্জ্বলনকারীদের উপর।[১২৩] [আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈ]

বাঁধা অবস্থায় থাকে তবে তো সেটার প্রস্রাব করার কিংবা প্রস্রাবের ছিটকে পড়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে বিশেষভাবে উটের উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় প্রতিটি অপবিত্র যমীনের উপর নামায পড়া নিষিদ্ধ।

১২০. কেননা, সেখানে বিনা প্রয়োজনে আরোহণ করাই নিষিদ্ধ। কারণ এতে আল্লাহ্‌র কা'বার প্রতি অবমাননা করা হয়। এ নামাযে তো (কা'বার) অবমাননা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং নামায মাকরূহ। এ-ই বিধান প্রত্যেক মসজিদেরই। সুতরাং যে মসজিদের উপরের তলা নির্মিত হয় না, সেটার ছাদের উপর বিনা প্রয়োজনে আরোহণ করা নিষিদ্ধ এবং সেখানে নামায পড়া মাকরূহ। এ নিষেধের কারণ এ নয় যে, এ স্থানে কা'বা নেই। বস্তুত সেখানকার আসমান পর্যন্ত মহাশূন্য কা'বাই। (বরং কা'বার প্রতি অবমাননার আশঙ্কাই এর কারণ)। সুতরাং এ হাদীস হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের পরিপন্থী নয়।

১২১. কেননা, মেষ-ছাগলের স্থানে বেশীরভাগ সময় নাপাক হয় না। কারণ, সেখানে মেষের রাখাল প্রমুখ প্রস্রাব করে না। তাছাড়া, নামাযের মধ্যভাগে প্রস্রাবের ছিটকে আসার সম্ভাবনা কম থাকে। কেননা, মেষ নিচু গড়নের হয়; তাছাড়া, প্রস্রাব করার সময় সেটা আরো নিচের দিকে ঝুঁকে যায়। আর মেষ-ছাগল খুলে গেলে নামাযী ওইগুলোর পায়ের নিচে দলিত হবার সম্ভাবনাও থাকে না। এসব বিষয় উটের আস্তাবলে নেই। তাই সেখানে নামায পড়া যাবে না।

স্মর্তব্য যে, হাদীসের অর্থ হচ্ছে- ছাগলের আস্তাবলে মুসাল্লা বিছিয়ে নামায পড়তে পারে; কিন্তু উটের আস্তাবলে তা কোন মতেই পারা যায় না।

কেউ কেউ বলেন, উটের জন্ম শয়তান থেকে হয়েছে। সুতরাং তার নিকট নামায পড়া নিষেধ। কিন্তু একথা ভুল। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজে উটের পিঠের উপর নফল নামায পড়েছেন। উট বরকতময় পশু, নবীগণের যানবাহন। উটের গোশ্‌ত আহার করা যায় ও সেটার দুধ পান করা হয়। বাহন ও মাল-সামগ্রী স্থানান্তরের কাজে আসে। উটের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অগণিত উপকার আছে। চামড়া দিয়ে পাত্র ও লোম দিয়ে মূল্যবান কার্পেট বানানো হয়। অতি মা'মুলী খাদ্য খেয়ে অতি উত্তম সেবা উপস্থাপন করে। এ কারণে, মহান পবিত্র আল্লাহ্ সেটাকে তাঁর কুদরতের নিদর্শন করেছেন। যেমন- তিনি এরশাদ ফরমায়েছেন- وَاِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (এবং উটের দিকে দেখো- কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে; ৮৮:১৭)

১২২. অধিকাংশ আলিম বলেন, এ বিধান রহিত। এর রহিতকারী 'কবরসমূহের যিয়ারত' শীর্ষক অধ্যায়ে আসছে। হুযূর সরকার-ই মদীনা এরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদেরকে কবরগুলোর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। اَلَا فَزُوْرُوْهَا (এখন যিয়ারত করতে থাকো।) কেননা, তা দ্বারা নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। কিন্তু সঠিক অভিমত হচ্ছে- নারীরা কবরগুলোর যিয়ারতে যাওয়া নিষেধ। কারণ, তারা সেখানে গিয়ে হয়তো সাজদা করবে,

www.YaNabi.in

وَعَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ اِنَّ حِبْرًا مِّنَ الْيَهُوْدِ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اَىُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ فَسَكَتَ عَنْهُ فَقَالَ اَسْكُتُ حَتّٰى يَجِئَ جِبْرَئِيْلُ فَسَكَتَ وَجَاءَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَ فَقَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ اَسْئَلُ رَبِّىْ

৬৮৬।। হযরত আবূ উমামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইহুদী আলিম নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে আরয করলো, "কোন্ ভূ-খণ্ডটি উত্তম?" হুযূর নীরব রইলেন।[১২৪] অতঃপর এরশাদ করলেন, "আমি জিব্রাঈল আসা পর্যন্ত নীরব থাকবো।" সুতরাং নীরব রইলেন[১২৫] এবং হযরত জিব্রাঈল হাযির হলেন। হুযূর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আরয করলেন, "যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি প্রশ্নকারী অপেক্ষা বড় আলিম নন।[১২৬] কিন্তু আমি আপন রবকে জিজ্ঞাস করবো।"[১২৭]

নতুবা কান্না করবে, বুক চাপড়াবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা একদা আপন ভাই আবদুর রাহমানের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি তাঁর যিয়ারতও করে ফেলেছেন। এটা কবরের নিকট যাওয়া ছিলো না; বরং কবরই পথে আসা ছিলো।

স্মর্তব্য যে, এখানে সাধারণ কবরগুলো বুঝানো উদ্দেশ্য। হুযূরের পবিত্রতম রওযায় হাযির হওয়া প্রত্যেক হজ্জ পালনকারী নর-নারীর উপর ওয়াজিব। মহান রব এরশাদ ফরমান- وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ (এবং যদি তারা যখনই নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করে...; ৪:৬৪)-এর বিশ্লেষণ ইন্শা-আল্লাহ্, 'যিয়ারাতুল ক্বুবূর' শীর্ষক অধ্যায়ে আসবে।

১২৩. কবরের উপর এভাবে মসজিদ নির্মাণ করা হারাম যে, কবরের কাঠামোটি মসজিদের ফরশের ভিতর এসে যাবে, আর লোকেরা সেটার উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়বে; অথবা এভাবে যে, কবর নামাযীর সামনে থাকবে, কারণ, প্রথমোক্ত অবস্থায় মু'মিনের কবরের অবমাননা হয়, আর শেষোক্ত অবস্থায় কবরের দিকে সাজদা দিতে হয়। তাছাড়া, কবরের কাঠামোর উপর চেরাগ জ্বালানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ তাতে আগুন রয়েছে। মু'মিনের কবরকে আগুন থেকে বাঁচানো চাই। তদুপরি, এটা অপচয়ও; বিনা প্রয়োজনে তেল জ্বালানোও (যা অপচয়ের সামিল)। অবশ্য, যদি যে চেরাগ জ্বালায় তার এ উদ্দেশ্য থাকে যে, তা থেকে কবরের মধ্যে আলো যাবে, তবে তা তো ভ্রান্ত বিশ্বাসই। কেননা, কবরের ভিতর আলো তো মদীনা-ওয়ালে আক্বার সঠিক সূর্যের আলোর বিম্বগুলো থেকে আসে। আল্লাহ্ পাক এর সৌভাগ্য দিন! তবে বুযুর্গদের কবরের পাশে মসজিদ বানানো নবীগণের সুন্নাত, সাহাবীগণের সুন্নাত এবং ক্বোরআন মজীদ থেকে প্রমাণিত। যেমন- ইতোপূর্বে আরয করা হয়েছে। আর বুযুর্গদের মাযারের পাশে এ উদ্দেশ্যে চেরাগ জ্বালানো, যাতে যিয়ারতকারীদের সুবিধা হয় এবং এর আলোতে ক্বোরআনখানি হবে, তাহলে জায়েয; বরং সাওয়াবও। আজও হুযূরের রওযা-ই আন্ওয়ারের উপর এমন আলীশান আলো থাকে যে, সুবহা-নাল্লাহ্! তা দেখে ঈমান আলোকিত হয়ে যায়। এসব কারণেই অলংকার-সমৃদ্ধ ভাষাবিদদের সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম عَلَيْهَا (সেগুলোর উপর) এরশাদ করেছেন। অর্থাৎ মূল কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ ও চেরাগ জ্বালানো নিষেধ। অবশ্য এর নিকটে জায়েয।

'বাবুদ্ দাফন' (দাফন শীর্ষক অধ্যায়)-এ আসবে- হুযূর এক মৃতকে রাতে দাফন করিয়েছেন। তখন সেখানে চেরাগ জ্বালানো হয়েছিলো। বুঝা গেলো যে, প্রয়োজনের তাগিদে এটা জায়েয। এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' : প্রথম খণ্ড-এ দেখুন।

১২৪. প্রকাশ থাকে যে, এ নীরবতা না জানার কারণে নয়, যেমন পরবর্তী ইবারত থেকে বুঝা যাচ্ছে; বরং আজ আপন 'মাহবূবিয়াৎ' দেখানোই উদ্দেশ্য; আর এ সুবাদে হযরত জিব্রাঈলকে মি'রাজ করানোও।

১২৫. এ ইবারত বলছে যে, এ নীরবতার মধ্যে কোন রহস্য ছিলো; অন্যথায়- এ মাস্আলা ইজতিহাদের মাধ্যমেও বলা যেতো।

১২৬. অর্থাৎ এ কথোপকথন চলছিলো। ইত্যবসরে মহান রব এরশাদ ফরমান, "হে জিব্রাঈল! আজ যাও! কিছু পাবে।" মজার ব্যাপার হচ্ছে- মহান রব এ মাস্আলা বলে পাঠান নি। আর হযরত জিব্রাঈল আমীনও নিজের কোন অজ্ঞতার

تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ثُمَّ قَالَ جِبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ دَنَوْتُ مِنَ اللهِ دُنُوًّا مَّادَنَوْتُ مِنْهُ قَطُّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَا جِبْرَئِيلُ قَالَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ سَبْعُوْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُوْرٍ فَقَالَ شَرُّ الْبِقَاعِ اَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا. رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهٖ عَنِ ابْنِ عُمَرَ-

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ جَآءَ مَسْجِدِىْ هٰذَا لَمْ يَاْتِ اِلَّا لِخَيْرٍ يَّتَعَلَّمُهٗ اَوْ يُعَلِّمُهٗ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ

তারপর জিব্রাঈল বলতে লাগলেন, "হে মুহাম্মদ মুস্তফা! আমি আজ আল্লাহ্‌র এতোই নৈকট্যে পৌঁছেছি যে, ইতোপূর্বে এতো নিকটে কখনো পৌঁছি নি।"[১২৮] হুযূর এরশাদ ফরমান, "হে জিব্রাঈল! কতো নিকটে পৌঁছেছো?" আরয করলেন, "আমার ও মহান রবের মধ্যে শুধু সত্তর হাজার নূরের পর্দা রয়ে গিয়েছিলো।"[১২৯] মহান রব এরশাদ করেছেন, "সর্বাপেক্ষা খারাপ জায়গা হচ্ছে বাজার আর সর্বাপেক্ষা উত্তম জায়গা হচ্ছে মসজিদগুলো।"এটা ইবনে হাব্বান তাঁর সহীহ্‌'র মধ্যে হযরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ৬৮৭।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে আসবে, শুধু এজন্যই আসবে যে, ভাল জিনিষ শিখবে কিংবা শিখাবে, তবে সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর মর্যাদায় আসীন হবে।[১৩০]

কথাও স্বীকার করেন নি; বরং আরয করলেন, এ প্রসঙ্গে আমার জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশী নয়। তিনি জ্ঞানের অধিক্যকে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ যদিও এটা আপনারও জানা আছে, আমারও, কিন্তু এখন বলার অনুমতি নেই। এতে কিছু রহস্য আছে।

১২৭. নিজের অবস্থানে গিয়ে; এখানে বসে নয়।

১২৮. এটা এ গোটা হাদীসের মর্মার্থ। অর্থাৎ এখনো ওই মজলিস গরমই ছিলো। ইত্যবসরে হযরত জিব্রাঈল গিয়ে ফিরে এসেছেন এবং এ পয়গাম এনেছেন।

স্মর্তব্য যে, সব সময় হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম মহান রবের নিকট থেকে প্রেরিত হয়ে হুযূরের মহান দরবারে আসতেন। আজ মাহবূবের নিকট থেকে প্রেরিত হয়ে মহান রবের নিকট গিয়েছেন। বস্তুতঃ প্রিয়পাত্রের প্রেরিতও প্রিয় হয়ে থাকে। এ কারণে, মহান রব তাঁকে 'সিদ্‌রাহ্'রও আগে কোথাও ডেকে নেন; কিন্তু মি'রাজে এর আগে বাড়েন নি। কারণ, ওখানে হাবীব ও মাহবূবের একান্ত একাকীত্বের সময় ছিলো। খাদেমদের তখন আলাদা থাকাই সমীচিন ছিলো। এখানে 'মিরক্বাত' প্রণেতা বড় মজার বিষয় বর্ণনা করেছেন। এ সমগ্র কাহিনী হযরত জিব্রাঈলের সম্মান বাড়ানোর জন্যই ছিলো।

১২৯. অর্থাৎ ইতোপূর্বে লাখো পর্দা (অন্তরাল) থাকতো। কিন্তু আজ এক লাখেরও কম সংখ্যায় রয়েছে মাত্র।

'শায়খ' (হযরত আবদুল হক্ব দেহলভী) বলেছেন, এ পর্দাগুলো সৃষ্টের অনুসারে, স্রষ্টার অনুসারে নয়। অর্থাৎ সৃষ্ট জগৎ হেজাবের অন্তরালে থাকে, স্রষ্টা নন। যেমন- অন্ধলোক থেকে সূর্য গোপন থাকে। কিন্তু পর্দা থাকে তার চোখের উপর, সূর্যের উপর নয়। স্মর্তব্য যে, আমরা অন্ধকারের হেজাবে আছি, আর ফিরিশ্‌তারা আছেন নূরানী হেজাবে।

১৩০. অর্থাৎ মসজিদ-ই নবভী শরীফে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া অন্য কোথাও শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া

فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَمَنْ جَآءَ لِغَیْرِ ذٰلِکَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ اِلٰی مَتَاعِ غَیْرِهٖ.
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَیْهَقِیُّ فِیْ شُعَبِ الْاِیْمَان

وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یَأْتِیْ عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَکُوْنُ حَدِیْثُهُمْ فِیْ مَسَاجِدِهِمْ فِیْ اَمْرِ دُنْیَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ فَلَیْسَ لِلّٰهِ فِیْهِمْ حَاجَةٌ. رَوَاهُ الْبَیْهَقِیُّ فِیْ شُعَبِ الْاِیْمَانِ-

وَعَنِ السَّآئِبِ بْنِ یَزِیْدَ قَالَ کُنْتُ نَآئِمًا فِی الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِیْ رَجُلٌ

আর যে ব্যক্তি এটা ব্যতীত অন্য কোন কাজে আসবে সে ওই ব্যক্তির মতোই, যে অন্য কারো মালের দিকে তাকায়।''[১৩১] [ইবনে মাজাহ] আর এটা ইমাম বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমান'-এ বর্ণনা করেছেন।

৬৮৮।। হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "মানুষের উপর একটা যুগ এমনই আসবে যে, তাদের পার্থিব কথাবার্তা মসজিদগুলোতে হবে। তোমরা তাদের মজলিসে বসবে না।[১৩২] আল্লাহ্র এমন লোকদের প্রয়োজন নেই।"[১৩৩] [বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান]

৬৮৯।। হযরত সা-ইব ইবনে ইয়াযীদ[১৩৪] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে ঘুমাচ্ছিলাম। তখন কেউ আমাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করলো।

অপেক্ষা উত্তম। যেমন, এখানকার এক নামায পঞ্চাশ হাজারের সমান, তেমনিভাবে এখানে একটা সবক পড়া ও পড়ানো পঞ্চাশ হাজার সবকের সমান- হুযূরের নৈকট্যের বরকতে। এ কারণে কোন কোন আলিম মসজিদে নবভী শরীফে ওয়ায করতে ও দরস দিতে চেষ্টা করেন।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, মসজিদগুলোতে ইল্‌মে দ্বীনের মাদ্‌রাসা কায়েম করা জায়েয। ইমাম বোখারী হেরম শরীফে বোখারী শরীফ লিখেছেন।

১৩১. অর্থাৎ যেমন ওই দৃষ্টিকারী কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, তেমনি এ লোকটিও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

স্মর্তব্য যে, এখানে 'কল্যাণ' মানে কোন পার্থিব কাজ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মসিজদ-ই নবভী শরীফে শুধু ইমারত ও সৌন্দর্য দেখার জন্য যায়, কোন ইবাদতের নিয়্যত করে না, সে বড় হতভাগা। এ 'অন্যকাজ' মানে 'হুযূরের দীদার বা সাক্ষাৎ' নয়; কারণ, এটাতো সেখানে হাযির হবার মূল উদ্দেশ্য।

স্মর্তব্য যে, হাজী হুযূরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারায় যায়। তারই জন্য হুযূরের সুপারিশের ওয়াদা রয়েছে। যেমন- হুযূর এরশাদ ফরমান-

مَنْ زَارَ قَبْرِیْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِیْ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমার রওযার যিয়ারত করলো, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব (অপরিহার্য) হলো।" আর যেই হতভাগা শুধু ওই মসজিদ দেখতে যায়, সে এ সুপারিশ থেকে বঞ্চিত। সুতরাং এ হাদীস শরীফ তাদের প্রমাণ নয়, যারা আমাদের বিপক্ষে।

১৩২. বিজ্ঞ আলিমগণ বলেছেন, মসজিদে পার্থিব বৈধ কথাবার্তাও নেকীগুলোকে বরবাদ করে দেয়। 'দুনিয়া'র শর্তারোপ থেকে বুঝা গেলো যে, সেখানে দ্বীনী কথাবার্তা বলা জায়েয।

১৩৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের উপর দয়া করবেন না। অন্যথায় মহান রবের কোন বান্দার প্রয়োজন নেই। তিনি কোন প্রকার প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

১৩৪. তিনি অত্যন্ত অল্পবয়স্ক সাহাবী। তিনি আপন পিতার সাথে বিদায় হজ্জ-এ হুযূরের পবিত্রতম দরবারে হাযির হন।

فَنَظَرْتُ فَاِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِذْهَبْ فَائْتِنِىْ بِهٰذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتُمَا اَوْ مِنْ اَيْنَ اَنْتُمَا قَالَ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَاَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ اَصْوَاتَكُمَا فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَنٰى عُمَرُ رَحْبَةً فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تُسَمَّى الْبُطَيْحَآءَ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَّلْغَطَ اَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا اَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَلْيَخْرُجْ اِلٰى هٰذِهِ الرَّحْبَةِ. رَوَاهُ فِى الْمُوَطَّا.

আমি দেখলাম, তিনি হযরত ওমর ফারূক্ব ছিলেন।[১৩৫] তিনি বললেন, "যাও, ওই দু'জনকে আমার নিকট নিয়ে এসো।" আমি ওই দু'জনকে নিয়ে আসলাম অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা কে? কিংবা কোত্থেকে এসেছো?" তারা বললো, "আমরা তায়েফের অধিবাসী।" তিনি বললেন, "যদি তোমরা মদীনাবাসী হতে, তবে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম।[১৩৬] রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে কণ্ঠস্বরকে উঁচু করছো!"[১৩৭] [বোখারী]

৬৯০।। হযরত মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর মসজিদের কোণে একটা চত্বর তৈরী করেছিলেন, যাকে 'বাত্বহা' বলা হতো।[১৩৮] আর বলে দিয়েছেন, "যে ব্যক্তি কথা বলতে কিংবা কবিতা-ক্বসীদা আবৃত্তি করতে, কিংবা উচ্চস্বরে কিছু বলতে চায়, সে যেনো এ চত্বরের দিকে বেরিয়ে যায়।"[১৩৯] [মুআত্তা]

তখন তাঁর বয়স সাত বছর ছিলো।

১৩৫. হযরত সা-ইবের, মসজিদ-ই নবভী শরীফে শয়ন করা হয়তো এজন্য ছিলো যে, তিনি মুসাফির ছিলেন। অথবা তিনি ই'তিকাফের নিয়্যত করে নিতেন। অথবা তিনি তা জায়েয মনে করতেন। কোন কোন আলিম মসজিদে শয়ন করাকে মাকরূহ বলে থাকেন; আর কেউ কেউ বলেন- জায়েয; মাকরূহ নয়।

হযরত ফারূক্ব-ই আ'যম তাকে আওয়াজ দিয়ে জাগান নি- পবিত্র মসজিদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে।

১৩৬. মসজিদ-ই নবভী শরীফে উচ্চস্বরে কথা বলার কারণে। কেননা, মদীনাবাসী এখানকার আদাব বা নিয়মাবলী সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা পরদেশী; মাসাআলা-মাসাইল সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল নও।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, শাসক ছোটখাটো (সগীরাহ্) গুনাহ্র জন্যও নিজের পক্ষ থেকে ধমক স্বরূপ শাস্তি দিতে পারেন। অনুরূপ, যেখানে জ্ঞানের আলো কম পৌঁছেছে, কিংবা মোটেই পৌঁছে নি, সেখানকার লোকদেরকে না জানার জন্য ওযরসম্পন্ন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যথায় না জানা ওযর নয়।

স্মর্তব্য যে, তায়েফ হিজাযের প্রসিদ্ধ শহর। মক্কা মু'আয্যামাহ্ থেকে তিন 'মানযিল' দূরে অবস্থিত। সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের মাযার শরীফ সেখানে রয়েছে। আমি যিয়ারত করেছি।

১৩৭. 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, মসজিদ-ই নবভী শরীফের মর্যাদা অন্যান্য মসজিদ অপেক্ষা বেশী। কেননা, হুযূর আপন কবর শরীফে জীবিত। ওখানে হুযূরের বরকতময় দরবার রয়েছে। সেটার প্রতি আদব করা চাই। ওই দু' হযরত উচ্চস্বরে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলছিলেন। অন্যথায়, মসজিদে শিক্ষা গ্রহণ করা ও প্রদান করা এবং আল্লাহ্র যিক্র ও না'ত শরীফ ইত্যাদি উঁচু স্বরে করা যায়,

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتّٰى رُئِيَ فِي وَجْهِهٖ فَقَامَ فَحَكَّهٗ بِيَدِهٖ فَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِي الصَّلٰوةِ فَاِنَّمَا يُنَاجِيْ رَبَّهٗ وَاِنَّ رَبَّهٗ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ اَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهٖ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهٖ ثُمَّ اَخَذَ طَرَفَ رِدَآئِهٖ فَبَصَقَ فِيْهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَقَالَ اَوْ يَفْعَلُ هٰكَذَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

৬৯১।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্বেবলার দিকে নাক্‌টি দেখতে পান।[১৪০] তা তাঁর নিকট অপছন্দনীয় বোধ হলো; এমনকি ওই অপছন্দের চিহ্ন চেহারা-ই আন্‌ওয়ারে দেখা গিয়েছিলো। তারপর হুযূর ওঠে তা নিজ হাত মুবারকে চেঁচে তুলে ফেললেন।[১৪১] অতঃপর এরশাদ ফরমালেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযে দণ্ডায়মান হয়, তখন সে আপন রবের সাথে কথা বলে, আর তার মহান রব তার ও ক্বেবলার মধ্যভাগে থাকেন।[১৪২] সুতরাং কেউ যেনো ক্বেবলার দিকে কখনো থুথু না ফেলে, কিন্তু বাম দিকে কিংবা পায়ের নিচে (ফেলতে পারবে)[১৪৩] তারপর আপন চাদরের কোণা হাতে নিলেন। অতঃপর তা'তে থুথু ফেললেন। তারপর সেটা ঘষে নিলেন। (আর) বললেন, "অথবা এমনি করো।"[১৪৪] [বোখারী]

যদি নামাযীদের অসুবিধা না হয়।

১৩৮. কেননা, সেটার ফরশ ছিলো কাঁচা। 'বাত্বহা' (بطحا) মানে কঙ্করময়ী ভূ-খণ্ড। এ জায়গা মসজিদের বাইরের অংশে ছিলো; ভিতরের অংশে নয়। অন্যথায় সেটার নিয়মাবলীও মসজিদের মতো হতো।

১৩৯. 'কবিতা' (شعر) মানে পার্থিব কবিতাদি। 'শোর-চিৎকার' মানেও পার্থিব কথাবার্তা, উঁচুস্বরে কথাবার্তা বলা। অন্যথায়, না'ত শরীফ ও উচ্চরবে যিক্‌র করা মসজিদের ভিতর জায়েয। মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-ই কেরাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর খুব উঁচু স্বরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতেন।

১৪০. অর্থাৎ ক্বেবলার দেওয়ালে। এটা দ্বারা 'মিহরাব' বুঝায় না। কেননা ওই যুগে মসজিদগুলোতে মিহরাব ছিলো না। 'মিহরাব' হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয আবিষ্কার করেছেন- যখন ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে তিনি মদীনা মুনাওয়ারার শাসক নিয়োজিত হয়েছিলেন। যেখানে বর্তমানে 'মিহরাবুন্নবী' নির্মিত হয়েছে, তা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নামায পড়ার জায়গা ছিলো।

১৪১. এ থেকে দু'টি মাস্‌'আলা প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. মসজিদে আবর্জনা ফেলা নবী করীমের অসন্তুষ্টির কারণ। দুই. মসজিদকে নিজ হাতে পরিষ্কার করা হুযূরের সুন্নাত।

এ কারণে ওলামা-মাশাইখ, বরং ইসলামী বাদশাহ্ কখনো কখনো নিজ হাতেও মসজিদ পরিষ্কার করতেন।

১৪২. অর্থাৎ তাঁর বিশেষ রহমত (দয়া) সামনে থাকে। তাছাড়া, কা'বাও সামনে। কেউ কেউ নামায ছাড়া অন্যসময়ও কা'বার দিকে থুথু ফেলতে নিষেধ করতেন।

১৪৩. এটাও ওইখানে, যেখানে মসজিদের ফরশ কাঁচা হয়, যার ফলে থুথু ঢেকে দেওয়া যায়। পাকা ফরশে অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ। কারণ, এতে মসজিদ অপরিচ্ছন্ন হয়। এমন অবস্থার জন্য সামনে দিক-নির্দেশনা আসছে।

১৪৪. এ কাজ মসজিদের পাকা ফরশগুলো এবং মূল্যবান মুসাল্লাগুলোর উপরও করা যায়।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চাদর পরা হুযূরের সুন্নাত। আর নামাযের মধ্যে এতটুকু (সামান্য) কাজ প্রয়োজনের তাগিদে জায়েয।

وَعَنِ السَّائِبِ ابْنِ خَلَّادٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ رَجُلًا اَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِقَوْمِهٖ حِيْنَ فَرَغَ لَا يُصَلِّيْ لَكُمْ فَاَرَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَنْ يُّصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَاَخْبَرُوْهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ اَنَّهٗ قَالَ اِنَّكَ قَدْ اٰذَيْتَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ۔

৬৯২।। হযরত সা-ইব ইবনে খাল্লাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি হুযূর-ই আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের একজন ছিলেন।[১৪৫] তিনি বললেন, এক ব্যক্তি সম্প্রদায়ের ইমামতি করলেন। সে ক্বেবলার দিকে থুথু ফেলে বসলো। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা দেখছিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই সম্প্রদায়কে বললেন, "ভবিষ্যতে এ ব্যক্তি তোমাদেরকে নামায পড়াবে না।"[১৪৬] এরপর সে তাদেরকে নামায পড়াতে চাইলো। তখন লোকেরা তাকে বাধা দিলেন। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। সে এ ঘটনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে আরয করলো। হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "হাঁ।" অবশ্য, আমার ধারণা হচ্ছে– হুযূর একথাও এরশাদ করেছেন, "তুমি আল্লাহ্ ও রসূলকে কষ্ট দিয়েছো।"[১৪৭] [আবূ দাঊদ]

১৪৫. যেহেতু তিনি সাহাবী কি-না সে সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে আর ইনি কিছুটা অপ্রসিদ্ধও বটে, সেহেতু কিতাবের লেখক এ ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর কুনিয়াৎ (উপনাম) আবূ সাহ্‌ল। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসী। হযরত ওমর ফারূক্বের খিলাফতামলে ইয়েমেনের শাসক ছিলেন।

১৪৬. কেননা, সে কা'বার প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারী। এ কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বলেনও নি। কারণ, সে সম্বোধনের উপযুক্তই রইলো না। যখন কা'বার প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারী ইমামত করার উপযুক্ত নয়, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারী এবং হুযূরের শানে অশালীন প্রলাপকারী ইমামতির উপযুক্ত কিভাবে হতে পারে? এ থেকে যেনো ওইসব লোক শিক্ষা গ্রহণ করে, যারা কোনরূপ অনুসন্ধান ছাড়াই যে কোন ফাসিক্ব (পাপাচারী) ও বেয়াদবকে ইমাম বানিয়ে নেয়। স্মর্তব্য যে, এ ইমাম সাহাবী ছিলেন। কিন্তু ঘটনা চক্রে এ ভুল হয়ে গেছে। তারপর তাওবা করে নিয়েছেন। কেননা, কোন সাহাবীই ফাসিক্ব নন। যখন ঘটনাচক্রে ভুল করার কারণে ইমামত থেকে অপসারণ করা হয়েছে, তখন জেনেশুনে বেয়াদবী প্রদর্শনকারীকে অবশ্যই অপসারণ করা হবে। হুযূর একথা এরশাদ করা– 'যে কোন নেক্‌কার ও ফাসিক্বের পেছনে নামায পড়ে নাও' ওই স্থানের জন্য প্রযোজ্য, যখন সে ইমাম হয়ে যায়, আর আমরা তাকে অপসারিত করার ক্ষমতা রাখি না।

এ হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসাল্লীগণ (জনগোষ্ঠী) ও বাদশাহ্ ইমামকে ইমামত থেকে অপসারণ করতে পারেন।

১৪৭. 'কেননা, তোমার এ কাজ আমাকে কষ্ট দেয়ার মাধ্যম। বস্তুতঃ আমাকে কষ্ট দেওয়া মহান রবকে কষ্ট দেওয়ার কারণ হয়।' এর মর্মার্থ হচ্ছে এটাই। কেননা, তিনি হুযূরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য এ কাজ করেন নি। অন্যথায় একাজ কুফর ও ধর্মত্যাগই হতো। আর তাকে পুনরায় মুসলমান করতে হতো।

প্রকাশ থাকে যে, ওই লোকটা হয়তো তাওবা করে নিয়েছে এবং পুনরায় তাকে ইমামের পদে বহাল করা হয়েছিলো।

مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ لَا اَدْرِىْ قَالَهَا ثَلٰثًا قَالَ فَرَاَيْتُهٗ وَضَعَ كَفَّهٗ بَيْنَ كَتِفَىَّ حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ اَنَامِلِهٖ بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَتَجَلّٰى لِىْ كُلُّ شَىْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيْمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ فِى الْكَفَّارَاتِ قَالَ وَمَاهُنَّ قُلْتُ مَشْىُ الْاَقْدَامِ اِلَى

"আমি আরয করলাম, মুনিব! আমি হাযির!" এরশাদ ফরমালেন, "নৈকট্য ধন্য ফিরিশ্‌তাগণ কোন্ বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ করছে?" আমি আরয করলাম, "আমার জানা নেই।"[১৫৪] এটা তিনবার এরশাদ করেছেন। হুযূর এরশাদ করলেন, "আমি মহান রবকে দেখেছি যে, তিনি আপন রহমতের হাত আমার স্কন্ধযুগলের মধ্যভাগে রাখলেন; ফলে আমি তাঁর ওই রহমতের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগের শৈত্য আমার বক্ষে পেলাম।[১৫৫] অতঃপর প্রত্যেক কিছু আমার সামনে প্রকাশ পেলো এবং আমি চিনে নিলাম।[১৫৬] অতঃপর এরশাদ ফরমালেন, "হে মুহাম্মদ!" আমি আরয করলাম, "ওহে আমার রব! আমি হাযির।" তিনি এরশাদ ফরমালেন, "নৈকট্যধন্য ফিরিশ্‌তাগণ কোন্ বিষয়ে বাদানুবাদ করছে?" আমি আরয করলাম, "কাফ্‌ফারাগুলোর মধ্যে।" এরশাদ ফরমালেন, "ওই কাফ্‌ফারাগুলো কি কি?"[১৫৭] আমি আরয করলাম, "জমা'আতগুলোর দিকে পদব্রজে যাওয়া।

১৫৪. কেননা, এখনো পর্যন্ত তুমি আমাকে সেটার জ্ঞান দান করো নি। এর ব্যাখ্যা এক্ষুনি প্রথম পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

১৫৫. রহমতের হাত ও আঙ্গুলের অগ্রভাগের ওই অর্থই প্রযোজ্য, যা মহান রবের মহা-মর্যাদার উপযোগী। অর্থাৎ রহমত, ক্বুদরত ও মনযোগের হাত। যেমন বলা হয়- 'অমুক কাজে সরকারের হাত আছে।' অর্থাৎ তাঁর বদান্যতা ও মনযোগ রয়েছে। শৈত্য পাওয়া'র অর্থ হচ্ছে- রহমতের প্রভাব হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

১৫৬. এর ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। অর্থাৎ উর্ধ্ব ও অধঃজগতের এবং অদৃশ্য ও দৃশ্য জগতের প্রতিটি অণু আমার সামনে শুধু উদ্ভাসিতই হয় নি, বরং আমি প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে চিনে নিয়েছি। 'ইল্‌ম' (জানা) ও 'মা'রিফাত' (চেনা)'র মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। জমায়েত দেখে জেনে নেওয়া যে, এখানে দু'লক্ষ মানুষ উপবিষ্ট রয়েছে। এটা 'ইল্‌ম' (জানা)। আর তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সমস্ত অবস্থা জেনে নেওয়া হচ্ছে- 'মা'রিফাত' (চেনা)।

এ থেকে কয়েকটা মাস্'আলা জানা গেলো ঃ

এক. হুযূরের ইল্‌ম সর্বব্যাপী (كلى); সমগ্র বিশ্বকে ঘিরে রয়েছে।

দুই. হুযূরের এ জ্ঞান অধ্যয়ন করে উপার্জিত নয়, বরং লাদুন্নী (সরাসরি খোদা-প্রদত্ত)।

তিন. হুযূরের জ্ঞান ও হিদায়ত ক্বোরআনের উপর মওক্বূফ নয়, তিনি ক্বোরআন নাযিল হবার পূর্বেও জ্ঞানী ও আমলকারী ছিলেন।

তাজাল্লী বা উদ্ভাসিত হওয়া এক জিনিষ, বয়ান বা বর্ণনা করা ও সুস্পষ্ট হওয়া অন্য কিছু। এখানে হুযূরকে প্রতিটি বস্তু দেখানো হয়েছে এবং ক্বোরআনে বলে দেওয়া হয়েছে। এ কারণে এখানে تجلى (তাজাল্লী) এরশাদ হয়েছে। আর ওখানে এরশাদ হয়েছে- تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ (প্রত্যেক কিছুর বিবরণ; ১৬:৮৯)। সুতরাং হাদীস শরীফটির বিরুদ্ধে এ আপত্তির অবকাশ নেই যে, 'যখন সমস্ত বস্তু হুযূর সরকার-ই দু'আলমকে আজ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন ক্বোরআন অবতীর্ণ করার লাভ কি?'

১৫৭. প্রথম বার এ প্রশ্ন হুযূরকে ইল্‌ম (জানানো) অর্থাৎ উদ্‌গ্রীব করার জন্য ছিলো। আর এখন এ প্রশ্ন শিক্ষা দেওয়ার পর পরীক্ষা লওয়ার জন্যই, যাতে সবাই জানতে পারে যে, মাহবূব শিখে ভুলে যান নি। ওই শিক্ষাদাতাও কামিল (পরিপূর্ণ) আর এ শিক্ষা গ্রহণকারীও 'কামিল' (পূর্ণতা সম্পন্ন)।

الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوسُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلٰوٰتِ وَاِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ حِيْنَ الْكَرِيْهَاتِ قَالَ ثُمَّ فِيْمَ قُلْتُ فِى الدَّرَجَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ قُلْتُ اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِيْنُ الْكَلَامِ وَالصَّلٰوةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ سَلْ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَغْفِرَ لِىْ وَتَرْحَمَنِىْ وَاِذَا اَرَدْتَّ فِتْنَةً فِىْ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِىْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ وَاَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

নামাযগুলোর পর মসজিদে বসা এবং অপছন্দনীয় অবস্থাগুলোতে পূর্ণাঙ্গ ওযূ করা।"[১৫৮] এরশাদ ফরমালেন, "তারপর কোন্ কোন্ বিষয়ে বাদানুবাদ করছে?" আমি আরয করলাম, "মর্যাদাগুলোর মধ্যে।" এরশাদ ফরমালেন, "ওইগুলো কি কি?" আমি আরয করলাম, "আহার করানো, নম্রভাবে কথাবার্তা বলা এবং যখন লোকেরা ঘুমায় তখন নামায পড়া।"[১৫৯] এরশাদ ফরমালেন, "কিছু চেয়ে নাও।" তিনি বললেন, আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহ্! আমি চাই- সৎকার্যাদি করা, মন্দাকার্যাদি পরিহার করতে থাকা এবং মিসকীনদেরকে ভালবাসা, আর এটাও যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে, আমার উপর দয়া করবে। আর যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ে ফিৎনা পাঠাতে চাও, তখন তুমি আমাকে ফিৎনায় আক্রান্ত হবার পূর্বে ওফাত দিয়ে দাও এবং আমি তোমার মহান দরবারে তোমার ভালবাসা কামনা করছি। যে তোমাকে ভালবাসে তার ভালবাসা এবং ওই আমলের প্রতি ভালবাসা, যা আমাকে তোমার ভালবাসার নিকটস্থ করে দেয়।"[১৬০] অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

---

স্মর্তব্য যে, বড় ছাত্রকে বড় শিক্ষক মহোদয় নিজেই পড়িয়ে থাকেন।

১৫৮. এ সবের ব্যাখ্যা এক্ষুনি করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মসজিদে পদব্রজে যাওয়া উত্তম। এমনিতে ওযূ তো সব সময় পূর্ণাঙ্গরূপে করা চাই; কিন্তু শীতের মৌসুমে, বিশেষ করে যখন পানিও ঠাণ্ডা হয়, বিশুদ্ধভাবে ওযূ করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ।

১৫৯. এর ব্যাখ্যাও ইতোপূর্বে করা হয়েছে। কোন কোন বুযুর্গের আস্তানায় যেই লঙ্গর স্থাপন করা হয়, যেখান থেকে সবসময় মানুষ খাবার পায়, তার দলীল হচ্ছে এই হাদীস শরীফ। মুসলমানদের সাথে নম্র কথা আর কাফির ও মুনাফিক্বদের সাথে কঠোরতার সাথে কথা বলা সাওয়াবের কাজ। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (অর্থাৎ তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করো।) সুতরাং এ হাদীস শরীফ এ আয়াতের বিপরীত নয়।

১৬০. এ সবের ব্যাখ্যা একটু পূর্বে করা হয়েছে। এ থেকে দু'টি মাস্'আলা প্রতীয়মান হয়-

এক. প্রদান তো মহান রবই করেন, কিন্তু তিনি চান- 'বান্দা আমার নিকট প্রার্থনা করুক! চাইলেই তো আমি দেবো। এ চাওয়া আমার বন্দেগীর চিহ্ন হোক।' এ কারণে এরশাদ হয়েছে, "মাহবূব' কিছু চাও।"

দুই. আমরা তো গুনাহ্ই করবো, মহান রব সামর্থ্য দান করলেই নেক্ কাজ করতে পারি। পাথর তো নিজেই নিচের দিকে পতিত হবে। কেউ নিক্ষেপ করলে উপরের দিকে যাবে।

স্মর্তব্য যে, এসব দো'আ আমাদেরকে শেখানোর জন্যই; অন্যথায় হুযূর এসব নি'মাত আগে থেকেই হাসিল করেছেন। তাছাড়া, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে ভালবাসা স্থাপন করতে

وَسَلَّمَ اِنَّهَا حَقٌّ فَادْرِسُوْهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوْهَا. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَسَئَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، قَالَ فَاِذَا قَالَ ذٰلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّىْ سَائِرَ الْيَوْمِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ

"এ স্বপ্ন সত্য। এ দো'আগুলো কণ্ঠস্থ করে নাও। তারপর অপরাপরকে শিক্ষা দাও।"[১৬১] [আহমদ, তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, "এ হাদীস 'হাসান সহীহ' পর্যায়ের। আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলকে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বললেন, "এটা সহীহ্ হাদীস।"

৬৯৪।। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনুল আস্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন, "আ'উযু বিল্লাহিল 'আযীম। ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম। ওয়া সুলত্বোয়ানিহিল ক্বাদীম। মিনাশ্ শায়ত্বোয়ানির রাজীম।" (অর্থাৎ আমি আশ্রয় নিচ্ছি মহান আল্লাহ্‌র, তাঁর সম্মানিত সত্তার এবং তাঁর চিরস্থায়ী বাদশাহী ও ক্ষমতার– ধিকৃত শয়তান থেকে।)[১৬২] এরশাদ ফরমান, যখন মু'মিন এটা বলে নেয়, তখন শয়তান বলে, "এ লোকটি সারাটি দিন আমার প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকবে।"[১৬৩] [আবূ দাউদ]

৬৯৫।। হযরত আত্বা ইবনে ইয়াসার[১৬৪] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "হে আল্লাহ্! আমার কবরকে বোত্ বানিয়ো না, যাকে পূজা করা হয়।[১৬৫]

চায় সে যেন তাঁর প্রিয়দের সাথে ভালবাসা স্থাপন করে।

১৬১. অর্থাৎ নিজেও শিক্ষা করো, অন্য লোকদেরকেও শিক্ষা দাও। কেননা, এসব স্বপ্ন তোমাদের জন্যই।

১৬২. বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে দো'আর ওসীলা (মাধ্যম) বানানো জায়েয। আর প্রত্যেকে যেনো মহান রবের নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কেউ যেনো নিজেকে নিরাপদ মনে না করে। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নিষ্পাপ ছিলেন। আর জান্নাত হচ্ছে একটি অতি সংরক্ষিত স্থান। এতদ্‌সত্ত্বেও সেখানে তার ষড়যন্ত্র চরিতার্থ হয়ে গেলো। সুতরাং আমরা কিসে গণ্য? না আমরা নিজেরা নিরাপদ, না আমাদের ঘর তার থেকে নিরাপদ।

১৬৩. বুঝা গেলো যে, শয়তান দো'আগুলোও জানে। সেগুলোর প্রভাব সম্পর্কেও জানে। 'তাফসীর-ই কবীর' প্রণেতা বলেছেন, শয়তান প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কাজ সম্পর্কে অবগত।

এ কারণে সে প্রত্যেক সৎকাজে বাধা দেয়; প্রত্যেক গুনাহ্ সম্পন্ন করায়; বরং প্রত্যেকের ইচ্ছা সম্পর্কেও অবগত। এ কারণে প্রত্যেককেই পথভ্রষ্ট করে। যখন এ ফ্যাসাদীর জ্ঞানের-এ অবস্থা, তখন বিশ্ব-সংস্কারকের জ্ঞানের অবস্থা কী হবে! এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও শয়তানের প্রতিটি অবস্থা এবং প্রতিটি কথা সম্পর্কে অবগত আছেন।

اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَآءِ هِمْ مَسَاجِدَ ـ رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا

وَعَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الصَّلٰوةَ فِيْ حِيْطَانٍ قَالَ بَعْضُ رُوَاتِهٖ يَعْنِى الْبَسَاتِيْنَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهٗ

ওই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্‌র কঠোর ক্রোধ আপতিত হয়েছে, যারা তাদের নবীগণের কবরকে সাজদার জায়গায় পরিণত করেছে।"[১৬৬] [ইমাম মালিক এটা 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।]

৬৯৬।। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর নবী-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাগানগুলোতে নামায পড়তে ভালবাসতেন।[১৬৭] কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, অর্থাৎ 'বোস্তান' বা বাগানসমূহ।[১৬৮] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীস 'গরীব পর্যায়ের'। আমরা এটাকে শুধু

১৬৪. তিনি প্রসিদ্ধ তাবে'ঈ, হযরত উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হার আযাদকৃত ক্রীতদাস। ৮৪ বছর জীবদ্দশায় ছিলেন। ৯৪ হিজরীতে ওফাত পান।

১৬৫. সুবহা-নাল্লাহ্! হুযূরের এ দো'আ এমনিভাবে ক্বূল হয়েছে যে, প্রতি বছর লাখো মূর্খ ও জ্ঞানী লোক যিয়ারতের জন্য যায়, কিন্তু না কেউ ক্ববর-ই আন্‌ওয়ারকে সাজদা করে, না কেউ সেটার দিকে নামায পড়ে, এটা এ-ই দো'আর প্রভাব।

স্মর্তব্য যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা হযরত ওযায়র ও হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর দু'একটি মু'জিযা শুনে তাঁদেরকে খোদা কিংবা খোদার পুত্র বলে বসেছে এবং তাঁদের উপাসনা করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু মুসলমান হাজার হাজার মু'জিযা শুনে বরং স্বচক্ষে দেখেও হুযূরকে না খোদা বলেন, না খোদার পুত্র। মূর্খ মুসলমানদেরও এই আক্বীদা বা বিশ্বাস যে, عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ (তিনি আল্লাহ্‌র খাস বান্দা ও তাঁর রসূল)। এটা হুযূরের ওই দো'আরই বরকত।

মজার বিষয় যে, কেউ কেউ এ হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এ কথা বলে বেড়ায় যে, কবরগুলোর প্রতি সম্মান দেখানো, বছর বছর সেখানে যাওয়া, সমবেত হয়ে সেগুলোর যিয়ারত করা, সেখানে আলোকসজ্জা করা সবই শির্ক। কেননা, তা নাকি ক্ববরপূজা ও ক্ববরকে বোত বানানো। কিন্তু এটা একেবারে ভুল কথা। কেননা, এসব দীর্ঘ ১৩০০ বছরাধিক কাল থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা-ই আন্‌ওয়ারেও হয়ে আসছে। সেখানে প্রতি বছর যিয়ারতকারীদের ভিড় জমে যায়। হাত বেঁধে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম পড়া হয়। রাতের বেলায় ঈমান তাজাকারী আলো জ্বলে। সমস্ত বিজ্ঞ আলিম, নেক্‌কার-বুযুর্গ লোকই এসব কাজ করে থাকেন। ফক্বীহগণ বলেন, রওযা-ই আন্‌ওয়ারে সালাম পাঠ করার জন্য এভাবে হাত বেঁধে দাঁড়াবে, যেভাবে নামাযে দণ্ডায়মান হয়। যদি এগুলোর মধ্যে কোন কাজ শির্ক হতো, তবে হুযূরের রওযা-ই আক্বদাসের নিকট তা কখনো সম্পন্ন হতো না। কেননা, হুযূরের দো'আ ক্ববূল হয়েছে। পক্ষান্তরে, ওইসব মূর্খের কথিত ব্যাখ্যায় একথা অনিবার্য হয়ে যাবে যে, হুযূরের দো'আ মহান রব একেবারে না-মঞ্জুর করে দিয়েছেন। সুতরাং আলোচ্য হাদীস শরীফ ওরস জায়েয হওয়া সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের পক্ষে মজবুত দলীলই। বস্তুতঃ হাদীস শরীফ বুঝার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান, বিবেক ও ইশ্‌ক্ব-মুহাব্বত।

১৬৬. এভাবে যে, তারা ওইসব কবরের উপাসনা করতে থাকে, কিংবা সেগুলোর প্রতি নামায পড়তে আরম্ভ করে। প্রথমোক্ত কাজটি শির্ক, আর শেষোক্তটা হারাম।

স্মর্তব্য যে, যদি ঘটনাচক্রে মসজিদের ভিতর কবর থেকে যায়, তাহলে নামাযী ও কবরের মধ্যভাগে পূর্ণাঙ্গ অন্তরাল থাকা চাই; যেমন– মসজিদ-ই নবভী শরীফে রওযা-ই আত্বহার রয়েছে; যার চতুপার্শে নামায সম্পন্ন করা হয়। অথচ রওযা-ই আন্‌ওয়ার-এর চতুর্পাশে দেওয়ালের অন্তরাল রয়েছে। এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

১৬৭. অর্থাৎ নফল নামায দেয়ালগুলোর পেছনে কিংবা বাগানের মধ্যে সম্পন্ন করা উত্তম বলে জানতেন। যাতে বাগানে অবস্থানকারীরা অনায়াসে, নির্দ্বিধায় নফলসমূহ বরং প্রয়োজনে ফরযগুলোও পড়তে পারে। অন্যথায় ফরযগুলো মসজিদে পড়া উত্তম।

اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْحَسَنِ ابْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُهُ -

وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهٖ بِصَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهٗ فِىْ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بَخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلٰوةً وَصَلٰوتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يَجْمَعُ فِيْهِ بَخَمْسِ مِائَةِ صَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى بَخَمْسِيْنَ اَلْفَ صَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهٗ فِىْ مَسْجِدِىْ بَخَمْسِيْنَ اَلْفَ صَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلٰوةٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ -

হাসান ইবনে আবূ জা'ফরের হাদীস থেকেই জানি। তাঁকে ইয়াহিয়া ইবনে সা'ঈদ প্রমুখ 'দুর্বল' বলেছেন।[১৬৯]

৬৯৭।। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, পুরুষের নামায আপন ঘরে একটি মাত্র নামায, মহল্লা বা গোত্রের মসজিদে পঁচিশ নামায, যে মসজিদে জুমু'আহ্ পড়ানো হয়, তাতে এক নামাযে পাঁচশ' নামায, মসজিদে আক্বসায় এক নামাযে পঞ্চাশ হাজার নামায, আমার মসজিদেও এক নামাযে পঞ্চাশ হাজার নামায এবং মসজিদে হারামে এক নামাযে এক লক্ষ নামায।[১৭০] [ইবনে মাজাহ্]

---

১৬৮. অর্থাৎ হাদীস শরীফে যেই حِيْطَان (হী-ত্বান) শব্দটি এসেছে সেটা حَائِط (হা-ইত্ব) শব্দের বহুবচন। হা-ইত্ব দেওয়ালকেও বলা হয় এবং বাগানকেও। কেননা, সেটা দেওয়ালে ঘেরা থাকে। এখানে 'বাগান' অর্থে ব্যবহৃত।

১৬৯. আবূ হাতিম বলেন, হাসান দো'আ ক্ববূল হয় এমন বুযুর্গ ব্যক্তি ও বড় ইবাদতপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু ইবাদতে বেশী মশগুল থাকার কারণে হাদীস শরীফ কণ্ঠস্থ রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছিলো।

১৭০. 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, হাদীস শরীফের মর্মার্থ হচ্ছে- ঘরে নামায সম্পন্ন করলে এক নামাযের সাওয়াব এক নামাযের সমান পাওয়া যাবে। মহল্লার মসজিদে এক নামাযের সাওয়াব ঘরের পঁচিশ নামাযের সমান, জামে মসজিদে এক নামাযের সাওয়াব মহল্লার মসজিদের পাঁচশ' নামাযের সমান। মসজিদ-ই বায়তুল মুক্বাদ্দাস, যা ইসলামের প্রথম ক্বেবলা ছিলো, সেখানকার এক নামায জামে মসজিদের পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান, মসজিদে নবভী শরীফের এক নামায বায়তুল মুক্বাদ্দাসে পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান আর বায়তুল্লাহ্ শরীফের এক নামায মসজিদ-ই নবভী শরীফে এক লক্ষ নামাযের সমান। কিন্তু স্মর্তব্য যে, এ সাওয়াবগুলোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বাকী রইলো- গ্রহণযোগ্যতা ও আল্লাহর নৈকট্য। এর অবস্থা এ যে, মসজিদ-ই নবভী শরীফের এক নামায বায়তুল্লাহ্ শরীফের পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান। এ কারণে, মুহাজিরগণ ও আনসার মসজিদ-ই নবভী শরীফের নামাযকে মনেপ্রাণে ভালবাসতেন। কবি বলেন-

مہاجر چھوڑ کے کعبہ بسے آکر مدینہ میں
مدینہ ایسی بستی ہے مدینہ ایسی بستی ہے

অর্থাৎ মুহাজির-সাহাবীগণ কা'বা ছেড়ে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে বসবাস করতে থাকেন। মদীনা এমন এক বস্তি, মদীনা এমন এক বস্তি (জনপদ)।

বুঝা গেলো যে, হুযূরের নিকটে ইবাদতগুলোর সাওয়াব বেড়ে যায়। এ কারণেই মসজিদে নবভী শরীফে কাতারের বাম দিকের অংশ ডান দিক অপেক্ষা উত্তম। কেননা, তা রওযা-ই পাকের নিকটে।

স্মর্তব্য যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত নামাযগুলোর অবস্থা এই। কিন্তু হুযূরের পেছনে নামাযগুলোর সাওয়াব ও গ্রহণযোগ্যতা

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ اَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ عَامًا ثُمَّ الْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدًا فَحَيْثُ مَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلٰوةُ فَصَلِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

৬৯৮।। হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহ্র রসূল, পৃথিবী-পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদ নির্মিত হয়েছে?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "মসজিদ-ই হারাম।"[১৭১] আমি আরয করলাম, "তারপর কোন্টি?" এরশাদ করলেন, "তারপর মসজিদ-ই আক্বসা।"[১৭২] আমি বললাম, "এ দু'এর মধ্যে কতদিনের ব্যবধান ছিলো?" এরশাদ ফরমালেন, "চল্লিশ বছর।"[১৭৩] এখন সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠই তোমাদের জন্য মসজিদ। যেখানেই নামাযের সময় এসে যায়, সেখানে পড়ে নাও।"[১৭৪] [মুসলিম, বোখারী]

আমাদের ধারণা ও অনুমানের বাইরে।

১৭১. কেননা, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্র নির্দেশে, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আরয করার ফলে পৃথিবীতে আসা মাত্রই এ মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

১৭২. 'আক্বসা' (اقصى) মানে অতি দূরে। যেহেতু বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মসজিদ কা'বা মু'আয্যামাহ ও মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে বহুদূরে অবস্থিত, সেহেতু সেটাকে 'আক্বসা' বলা হয়।

১৭৩. স্মর্তব্য যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম খানা-ই কা'বার এবং হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম বায়তুল মুক্বাদ্দাসের বুনিয়াদ রাখেন নি; বরং পূর্বেকার বুনিয়াদের উপর ইমারত নির্মাণ করেছেন। এ দু'জন পয়গাম্বরের মধ্যে এক হাজার বছরেও বেশী ব্যবধান রয়েছে।

এ হাদীসে হয়তো ওই মসজিদ দু'টির বুনিয়াদের কথা উল্লেখ রয়েছে; কারণ, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তাওবা ক্বূল হবার সাথে সাথে কা'বাতুল্লাহ্র বুনিয়াদ রেখেছেন। এর চল্লিশ বছর পর যখন তাঁর সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো এবং তারা ছড়িয়ে পড়লো, তখন তাদের মধ্যে কেউ তখন বায়তুল মুক্বাদ্দাসের বুনিয়াদ রেখেছেন; কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, খোদ হযরত আদম আলায়হিস্ সালামই কা'বার চল্লিশ বছর পর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের বুনিয়াদ রেখেছেন। অথবা অন্য কোন বিশেষ নির্মাণের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন, কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণের চল্লিশ বছর পর হযরত ইয়াক্বূব আলায়হিস্ সালাম বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পুনঃনির্মাণ করেন।

এখানে 'মিরক্বাত' প্রণেতা কা'বা নির্মাণের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে কোন অবস্থাতেই এ হাদীসের বিপক্ষে এ আপত্তির সুরে একথা বলা যাবে না যে, 'কা'বা ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম নির্মাণ করেছেন আর বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করেছেন হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম। উভয় বুযুর্গের মধ্যখানে হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং ওই দু'নির্মাণ কাজের মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান কিভাবে হলো?' যেমন হাদীস অস্বীকারকারীগণ বিভ্রান্তির সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

১৭৪. অর্থাৎ ইসলামে প্রত্যেক জায়গায় নামায পড়া জায়েয। যবেহের জায়গা ও কবরস্থান ইত্যাদিতে নামায নিষিদ্ধ– এক বাহ্যিক ও সাময়িক কারণেই।

****

بَابُ السَّتْرِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ◆ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهٖ فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَىْءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِى

অধ্যায় ঃ সতর ঢাকা[১]

প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ৬৯৯।। হযরত ওমর ইবনে আবূ সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,[২] তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হযরত উম্মে সালামাহ্র ঘরে একটি মাত্র কাপড়ে জড়িয়ে এমতাবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি যে, তিনি আপন বরকতময় স্কন্ধযুগলের উপর সেটার দু'কিনারা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।[৩] [বোখারী, মুসলিম]

৭০০।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো এভাবে এক কাপড়ে নামায না পড়ে যে, তার স্কন্দযুগলের উপর কোন কাপড়ের কোন অংশ থাকবে না।"[৪] [মুসলিম, বোখারী]

৭০১।। তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে একথা এরশাদ করতে শুনেছি, যে কেউ এক কাপড়ে নামায পড়বে, সে যেনো তার কাপড়ের দু'কিনারা এদিকে ও ওদিকে ঝুলিয়ে দেয়।[৫] [বোখারী]

---

১. শরীরের ওই অংশ, যা ঢাকা নামাযের মধ্যে ফরয, তাকে সতর বলে। পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর। আর নারীর জন্য মাথা থেকে পা পর্যন্ত– চেহারা, কব্জিযুগল পর্যন্ত হাত এবং গোড়ালী পর্যন্ত পদযুগল ব্যতীত। যদি সতরের কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশ নামাযের মধ্যে তিন তাসবীহ্ পরিমাণ সময় যাবৎ খোলা থাকে তাহলে নামায মোটেই হবে না।

এ কিতাবের প্রণেতা মহোদয় এ অধ্যায়ে মুস্তাহাব পোশাক ও মাক্রূহ পোশাকের কথাও উল্লেখ করবেন।

২. তিনি ক্বোরাঈশী, মাখযূমী। হুযূরের সৎপুত্র। হযরত উম্মে সালামাহ্র সন্তান। ২য় হিজরীতে হাবশা নামক স্থানে পয়দা হন। হুযূরের ওফাতের সময় তাঁর বয়স ৯ বছর ছিলো। আবদুল মালিক ইবনে মারোয়ানের শাসনামলে ৮৩ হিজরীতে ওফাত পান।

৩. এভাবে যে, একটি কাপড়ে মাথা মুবারক থেকে পা মুবারক পর্যন্ত ঢেকে নিয়েছিলেন। আর কাপড়টির ডান কোণা বাম কাঁধের উপর এবং বাম কোণা ডান কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

বুঝা গেলো যে, এক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয, মাকরূহ নয়– এ শর্তে যে, কাঁধ ইত্যাদি যদি খোলা না থাকে; যদিও

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ خَمِيْصَةٍ لَّهَا اَعْلَامٌ فَنَظَرَ اِلٰى اَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هٰذِهٖ اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ وَائْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَةِ اَبِىْ جَهْمٍ فَاِنَّهَا اَلْهَتْنِىْ اٰنِفًا عَنْ صَلٰوتِىْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِىِّ قَالَ كُنْتُ اَنْظُرُ اِلٰى عَلَمِهَا وَاَنَا فِى الصَّلٰوةِ فَاَخَافُ اَنْ يُّفْتِنَنِىْ

৭০২।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম লতা-গুল্মবিশিষ্ট চাদর পরে নামায পড়েছেন।[৬] তিনি এর লতা-গুল্মের দিকে এক নজর দেখলেন। যখন নামায শেষ করলেন তখন এরশাদ ফরমালেন, আমার এ চাদর আবূ জাহ্মের নিকট নিয়ে যাও এবং আবু জাহ্ম থেকে 'ইন্‌বিজানিয়াহ্' চাদর নিয়ে এসো![৭] এ চাদর আমাকে এখন নামায থেকে বিরত রেখেছে। [মুসলিম, বোখারী] বোখারীর বর্ণনায় আছে- "হুযূর এরশাদ করেছেন- আমি এ লতা-গুল্ম নামাযে দেখছিলাম। আমার আশঙ্কা হলো তা আমার নামায বিনষ্ট করে ফেলবে কিনা।[৮]

মুস্তাহাব হচ্ছে তিনটি কাপড়ে নামায পড়া- টুপি কিংবা আমামা, জামা ও লুঙ্গি কিংবা পায়জামা।

৪. খোলা পেট, খোলা পিঠ ও খোলা কাঁধে নামায পড়া নিষিদ্ধ। কেউ কেউ শুধু লুঙ্গি বা পায়জামা পরে নামায পড়ে। এটা মাকরূহ; বরং ইমাম আহমদের মতে, নামায মাকরূহ-ই তাহরীমী হবে, তা পুনরায় পড়া ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

৫. অর্থাৎ ডান কিনারা বাম কাঁধের উপর এবং বাম কিনারা ডান কাঁধের উপর। যদি কিনারা ছোট হয়, তবে নামায মোটেই হবে না; কারণ সতর খোলা থাকবে। আর যদি হাত দিয়ে ধরে থাকে, তবে নামায মাকরূহ হবে। কারণ এমতাবস্থায় হাত বাঁধতে পারবে না।

৬. আরবীতে 'খামীসাহ্' লতা-গুল্মের নক্শা বিশিষ্ট চাদরকেই বলা হয়; কিন্তু আলাদা চিহ্নাবলীর উল্লেখ বিশেষ অবস্থার ভিত্তিতে (تَجْرِيْدًا) করা হয়েছে।

এটা উলের তৈরী কালো চাদর ছিলো, যা আবূ জাহ্ম হাদিয়া স্বরূপ হুযূরের পবিত্রতম দরবারে পেশ করেছিলেন। তা পরে সরকার-ই মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন।

৭. 'ইন্‌বিজানিয়াহ্' সিরিয়ার একটি বস্তির নাম; যেখানে সাদা কাপড় তৈরী হয়। ওই বস্তির দিকে এটা সম্পৃক্ত; যেমন, আমাদের এখানে (উপমহাদেশে) ভাগলপুর কিংবা ঢাকার মলমল কাপড়, অথবা লায়েলপুরের লট্‌ঠা প্রসিদ্ধ। যেহেতু চাদর ফেরৎ দেওয়া আবূ জাহমের নিকট অপছন্দনীয় ঠেকতো, সেহেতু তার মন রক্ষার জন্য এটার পরিবর্তে অন্য চাদর তলব করলেন।

আবূ জাহ্ম কোরাঈশী' আদাভী, প্রসিদ্ধ সাহাবী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি সম্মান দেখাতেন। কারণ তিনি কোরাঈশ বংশীয় বুযুর্গ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৮. এভাবে যে, নামাযের মধ্যে আমার ধ্যান সেটার লতা-গুল্মের নকশার দিকে যাবে এবং পূর্ণাঙ্গ একাগ্রতা ও বিনয় থাকবে না।

সম্মানিত সূফীগণ বলেন, পোশাকের প্রভাব হৃদয়ের উপর পড়ে। বিশেষ করে সাফ ও আলোকোজ্জ্বল হৃদয় তাড়াতাড়ি এ প্রভাব গ্রহণ করে বসে। যেমন- সাদা কাপড়ের উপর কালো দাগ মা'মুলী হলেও দূর থেকে নজরে পড়ে।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের মেহরাব সাদা হওয়া উত্তম; যাতে নামাযীর ধ্যান ওইদিকে আকৃষ্ট না হয়।

কোন কোন সূফী কারুকার্যকৃত মুসাল্লার পরিবর্তে সাদাসিধে চাটাইর উপর নামায পড়াকে উত্তম মনে করেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে- এ-ই হাদীস শরীফ।

স্মর্তব্য যে, এ সবই আপন উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই। বস্তুতঃ হুযূর মোস্তফার পবিত্র হৃদয়ের অবস্থাদি ভিন্ন ভিন্ন। কখনো কাপড়ের লতা-গুল্মের নকশা দ্বারা কায়মনোবাক্যে বিনয় কমে যাবার আশঙ্কা করেন, কখনো জিহাদের ময়দানে তরবারিগুলোর ছায়ায় নামায পড়েন; অথচ একাগ্রতার মধ্যে

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهٖ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَمِيطِىْ عَنَّا قِرَامَكِ هٰذَا فَاِنَّهٗ لَا يَزَالُ تَصَاوِيْرُهٗ تَعْرِضُ لِىْ فِىْ صَلٰوتِىْ رَوَاهُ الْبُخَارِى

وَعَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ اُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهٗ ثُمَّ صَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهٗ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهٗ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِىْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ ◆ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ

৭০৩।। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশার একটা পর্দা ছিলো, যা দ্বারা ঘরের একটি কোণ্ ঢেকে রেখেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এরশাদ করলেন, "আমাদের থেকে তোমার এ পর্দা সরিয়ে নাও! কেননা, এর ফটোগুলো নামাযের মধ্যে আমার সামনে এসে যায়।"[৯] [বোখারী]

৭০৪।। হযরত ওক্ববাহ্ ইবনে-আমির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে রেশমী ক্বাবা (জামা বিশেষ) হাদিয়া স্বরূপ পেশ করা হলো। তিনি তা পরলেন।[১০] অতঃপর তাতে নামায পড়লেন। এরপর নামায সমাপ্ত করতেই কঠোরভাবে তা খুলে ফেললেন- সেটা অপছন্দ করে। তারপর এরশাদ করলেন, "এটা পরহেয্গার (খোদাভীরুদের) জন্য শোভা পায় না।"[১১] [মুসলিম, বোখারী]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

◆ ৭০৫।। হযরত সালমাহ্ ইবনে আক্ওয়া'[১২] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমি শিকারী মানুষ।[১৩]

কোন পরিবর্তনই আসে না। কখনো বাশারিয়াত (মানবীয়তা)'র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, কখনো 'নূরানিয়াত'-এর আলো উদ্ভাসিত হয়।

৯. প্রকাশ থাকে যে, সম্ভবতঃ এগুলো প্রাণী নয় এমন কিছুর নকশা ছিলো। আর যদি প্রাণীর ফটোও হতো, তবুও তা আগ্রহ ও সম্মান প্রদর্শনার্থে ছিলো না, যাতে সেটার উপর মাকরূহ হবার বিধান বর্তাতো।

স্মর্তব্য যে, দেওয়ালগুলোর উপর পর্দা চড়ানো জায়েয। যদিও তা উত্তম নয়। সুতরাং এ হাদীস নিষেধ সম্বলিত বর্ণনার পরিপন্থী নয়।

শায়খ (আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী) বলেন, এ ঘটনা নিষেধ আসার পূর্বেকার ছিলো। আর এটাও হতে পারে যে, আলমারী কিংবা থাকের উপর জিনিষপত্রের হেফাযতের জন্য চড়ানো হয়েছিলো; যেমন- এখনো প্রয়োজনের তাগিদে করা হয়, কপাটের পরিবর্তে মোটা কাপড় কিংবা পর্দা টাঙ্গানো হয়।

১০. 'ফার্রূজ' বলে ওই আচকান (শেরোয়ানী)কে, যার ফাটল পেছনের দিকে খোলা থাকে। এ ক্বাবা (আচকান) দাওমাতুল জানদালের বাদশাহ আকীদর অথবা আলেক্সান্দ্রিয়ার বাদশাহ্ হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। হুযূর তা পরেছিলেন তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য।

কেউ কেউ বলেছেন, ঘটনাটা নুবূয়ত প্রকাশের পূর্বেকার ছিলো। হুযূর তখনো বিভিন্ন নামায পড়তেন। কিন্তু বেশী বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে- রেশম হারাম হবার পূর্বেকার ঘটনা ছিলো। অন্যথায়, হারাম হবার পর হুযূর কখনো রেশম পরেন নি। স্মর্তব্য যে, পুরুষের জন্য রেশম-পোকার উৎপাদিত রেশম দ্বারা বুননকৃত কাপড় পরা নিষিদ্ধ।

اَصِيْدُ اَفَاُصَلِّىْ فِى الْقَمِيْصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْبِشَوْكَةٍ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوَى النَّسَائِىُّ نَحْوَهٗ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّىْ مُسْبِلٌ اِزَارَهٗ قَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ وَذَهَبَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ اَمَرْتَهٗ اَنْ يَّتَوَضَّأَ قَالَ اِنَّهٗ كَانَ صَلّٰى وَهُوَ مُسْبِلٌ اِزَارَهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ صَلٰوةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ اِزَارَهٗ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ-

সুতরাং আমি কি এক কাপড়ে নামায পড়তে পারবো?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "বোতাম লাগিয়ে দিও, যদিও কাঁটা দিয়ে হয়।"[১৪] [আবূ দাঊদ] নাসাঈ এরই মতো বর্ণনা করেছেন।

৭০৬।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক পরনের কাপড় (গোড়ালীর নিচে পর্যন্ত) ঝুলিয়ে নামায পড়ছিলো।[১৫] হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "যাও, ওযূ করো!" সে গেলো, ওযূ করলো। ফিরে এলো। একব্যক্তি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আপনি তাকে ওযূ করার জন্য কি কারণে নির্দেশ দিয়েছেন?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "সে পরনের কাপড় (গোড়ালীর নিচে পর্যন্ত) ঝুলিয়ে নামায পড়ছিলো। আল্লাহ্ ওই ব্যক্তির নামায কবূল করেন না, যে পরনের কাপড় ঝুলিয়ে থাকে।"[১৬] [আবূ দাঊদ]

সামুদ্রিক কিংবা সনের কৃত্রিম রেশম হালাল।

১১. সুব্হা-নাল্লাহ্! এটাই হচ্ছে হুযূরের সুস্থ স্বভাব মুবারক (فطرت سليمه)- তখনো রেশম হারাম হয় নি, অথচ পবিত্র স্বভাবে আগে থেকেই ঘৃণাবোধ!

১২. তিনি আস্লামী (আসলাম গোত্রের লোক)। মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসী। কুনিয়াৎ (উপনাম) 'আবূ মুসলিম।' তিনি ওইসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা 'বায়'আত-ই রিদ্বওয়ান'-এর সময় পুনরায় বায়'আত গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ বাহাদুর, পদাতিক বাহিনীতে যুদ্ধ করায় অদ্বিতীয় ছিলেন। বয়স পান ৮০ বছর। ৭৪ হিজরীতে মদীনা পাকে ওফাত পান।

১৩. আর শিকার করতে গিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। লুঙ্গি দৌড়ের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

১৪. এ থেকে কয়েকটা মাস্'আলা প্রতীয়মান হয়-

এক. লম্বা জামায় লুঙ্গি-পায়জামা ব্যতীত নামায পড়া জায়েয।

দুই. জামার বোতাম লাগিয়ে রাখা পছন্দনীয় সুন্নাত (سنت مستحب)। আর যদি বুকের পার্শ্ব দিয়ে সতর দেখা যায়, তাহলে (বোতাম লাগানো) ওয়াজিব।

তিন. নামাযে নিজের থেকেও সতর গোপন করা ফরয। এ থেকে বহু ফিক্বহী মাস্'আলা অনুমিত হতে পারে।

১৫. অর্থাৎ ফ্যাশন ও অহঙ্কারের ভঙ্গিতে তার লুঙ্গি গোড়ালীর নিচে পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিলো; যেমন, আজকাল চৌধুরী-মাতব্বরদের লুঙ্গি তেমনি হয়ে থাকে। এটা মাকরূহ-ই তাহরীমী। যদি ফ্যাশন হিসেবে না হয়, তবে ক্ষতি নেই। যেমন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পেটের উপর লুঙ্গি আটকে থাকতো না; ঢলে নেমে যেতো। যার ফলে লুঙ্গি গোড়ালীর নিচে পর্যন্ত ঝুলে পড়তো। হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হলো। হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তুমি ফ্যাশনকারী অহঙ্কারীদের অন্তর্ভুক্ত নও।" সুতরাং এ হাদীস শরীফ সেটার পরিপন্থী নয়।

১৬. লুঙ্গি গোড়ালীর নিচে ঝুলালে ওযূ ওয়াজিব হয় না। এখানে ওযূর নির্দেশ দেওয়া হয়তো এজন্য ছিলো যে, এর কারণে ওই ব্যক্তির মনে এ ঘটনা স্মরণ থাকবে এবং ভবিষ্যতে কখনো গোড়ালীর নিচে ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরবে না।

وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ حَآئِضٍ اِلَّا بِخِمَارٍ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ

وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا سَئَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتُصَلِّى الْمَرْاَةُ فِىْ دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا اِزَارٌ قَالَ اِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّىْ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَقَفُوْهُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ وَاَنْ يُّغَطِّىَ

৭০৭।। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বালেগা নারীর নামায দু'পাট্টা ব্যতীত ক্বূল হয় না।"[১৭] [আবূ দাঊদ, তিরমিযী]

৭০৮।। হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন– নারী লুঙ্গী ব্যতীত জামা (কামীস) ও দু'পাট্টা পরে নামায পড়তে পারে কিনা। হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "যদি জামা এত লম্বা হয় যে, তা তার পায়ের পিঠ ঢেকে নেয়।"[১৮] [আবূ দাঊদ] একটি জমা'আত সেটাকে হযরত উম্মে সালামাহ্র উপর মওক্বূফ করেছেন।[১৯]

৭০৯।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযে কাপড় গোড়ালীর নিচে লটকাতে[২০] এবং পুরুষের মুখ ঢাকতে

কেননা, কিছুটা শাস্তি দিয়ে দিলে কথা স্মরণে থাকে; অথবা এজন্য যে, তাঁর হৃদয়ে ফ্যাশন-প্রীতি ও অহঙ্কার ছিলো। বাহ্যিক পবিত্রতার মাধ্যমে হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হবে। হাত-পা ধুয়ে নিলে হৃদয় থেকে গর্ব-অহঙ্কারও ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কোন কোন সূফী বলেন, পবিত্র পোশাকে থাকা, পবিত্র বিছানায় শয়ন করা এবং সব সময় ওযূ সহকারে থাকা অন্তরের পরিচ্ছন্নতার উত্তম উপায়। এ সবের দলীল হচ্ছে– এ-ই হাদীস শরীফ।

১৭. خمار - خمره থেকে গৃহীত। এর অর্থ ঢাকা। এ কারণে মদকে আরবীতে خمر (খমর) বলা হয়। কারণ, সেটা বিবেক-বুদ্ধিকে ঢেকে ফেলে। 'ই-মামা (পাগড়ি)-কেও خمار (খেমার) বলা হয়ে থাকে। আলোচ্য হাদীসে মাথা ঢাকে এমন কাপড়ের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন– দু'পাট্টা, চাদর কিংবা বড় রুমাল।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বালেগা নারীর সতর হচ্ছে মাথা, যা নামাযের মধ্যে ঢাকা ফরয। সুতরাং এমন পাতলা দু'পাট্টায় নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হবে না, যাতে মাথা দেখা যায়। এ বিধান আযাদ নারীর জন্য প্রযোজ্য, ক্রীতদাসীর মাথা সতর নয়।

১৮. নারীর পায়ের পিঠ সতর নয়। সেটা নামাযের মধ্যে গোপন করা (ঢাকা)ও ফরয নয়। পায়ের কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত ঝুলে পড়ে এমন কাপড় পায়ের গোছা যুগলকে পূর্ণাঙ্গভাবে ঢেকে নেবে।

১৯. অর্থাৎ সেটাকে হযরত উম্মে সালমাহ্র নিজস্ব উক্তি বলে সাব্যস্ত করেছেন; হুযূরের বরকতময় বাণী সাব্যস্ত করেন নি। কিন্তু এ ধরনের 'মাওকূফ' হাদীস মারফূ' হাদীসে গণ্য হয়। কেননা, এমন বিধান বিবেক-বুদ্ধি থেকে বলা যায় না।

২০. কাপড় মাথা কিংবা কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া

الرَّجلَ فاهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ فَاِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّوْنَ فِيْ نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهِ

নিষেধ করেছেন।[২১] [আবূ দাউদ, তিরমিযী]

৭১০।। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস[২২] রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "ইহুদীদের বিরোধিতা করো, তারা না জুতো নিয়ে নামায পড়ে, না মোজাগুলোতে।"[২৩] [আবূ দাউদ]

৭১১।। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীদের নামায পড়াচ্ছিলেন।

এবং সেটার উভয় কিনারা এমনিতে ঝুলতে ছেড়ে দেওয়াকে আরবীতে 'সদল' (سدل) বলে। আচকান কিংবা কোট বোতাম না লাগিয়ে পরে নেওয়াও 'সদল'-এর সামিল। 'সদল' নামাযের মধ্যে মাকরূহ। নিচে অন্য কোন কাপড় না থাকলে তো মাকরূহ-ই তাহ্রীমী; অন্যথায় 'তানযীহী'। কেননা, এতে কাপড় সামলানোর মধ্যে মন লেগে থাকে; ফলে নামাযে একাগ্রতা অর্জিত হয় না।

২১. হাত দিয়ে কিংবা কাপড় দিয়ে। কেননা, যদি নামাযে মুখের উপর হাত কিংবা কাপড় রাখা হয়, তবে ক্বিরআত বিশুদ্ধ হতে পারে না।

কেউ কেউ বলেছেন, পাগড়ির 'শামলাহ্' (পেছনের দিকে ঝুলন্ত বাড়তি অংশ) মুখের উপর জড়িয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। কারণ, এটা ইহুদীদের কাজ। অবশ্য, যার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, অথবা দুর্গন্ধযুক্ত ঢেকুর আসছে, তার জন্য জায়েয।

২২. তিনি আনসারী। হযরত হাস্সানের ভ্রাতুষ্পুত্র। 'কুনিয়াৎ' আবূ ইয়া'লা। সিরিয়ায় বসবাস করতে থাকেন। ৭৫ বছর বয়সে ৫৮ হিজরীতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ওফাত পান।

২৩. অর্থাৎ ইহুদীগণ জুতো কিংবা মোজা পরে নামায পড়া বৈধ বলে মনে করে না। তোমরা জায়েয বা বৈধ মনে করো।

স্মর্তব্য যে, মোজা পরে নামায সম্পন্ন করা সুন্নাত। কিন্তু জুতো যদি পবিত্র হয় এবং এতোই নরম হয় যে, সাজদায় অসুবিধা হয় না অর্থাৎ পায়ের আঙ্গুলগুলো বাঁকা হয়ে ক্বেবলামুখী হতে পারে, তবে সেগুলো পরে নামায পড়া জায়েয। উল্লেখ্য, আমাদের দেশের জুতোগুলো নামায পড়ার উপযোগী নয়। তাছাড়া, বর্তমানকার লোকেরা সাহাবা-ই কেরামের মতো আদব সম্পন্ন নয়। যদি তাদেরকে জুতো পরে নামায পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে মুসাল্লা ও মসজিদগুলোকে অপবিত্রতায় ভর্তি করে দেবে। এ কারণে, এখন জুতো খুলে নিয়েই মসজিদে আসা ও নামায পড়া চাই। [মিরক্বাত ও শামী]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বে-দ্বীন লোকদের বিরোধিতার জন্য জায়েয কাজ অবশ্যই করা চাই। যেমন এ যুগে মীলাদ শরীফ ও গিয়ারভী শরীফ। 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেছেন, যেহেতু এখন আমাদের এলাকায় ইহুদী নেই, সেহেতু বর্তমানে জুতো পরিহিত অবস্থায় নামায পড়ার প্রয়োজন নেই।

স্মর্তব্য যে, মসজিদ কিংবা নামাযের প্রতি আদব করার জন্য জুতো খুলে ফেলা ক্বোরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

(হে মূসা! সুতরাং তুমি আপন জুতো খুলে ফেলো, নিশ্চয় তুমি পবিত্র উপত্যাকা 'তুওয়া'র মধ্যে এসেছো। ২০:১২, তরজমা– কান্যুল ঈমান) অর্থাৎ হে মূসা! তুমি সম্মানিত উপত্যকায় রয়েছো, জুতো খুলে ফেলো।

কোন কোন আদবসম্পন্ন মুরীদ তাঁর মুর্শিদের শহরে জুতো

اِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَّسَارِهٖ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ الْقَوْمُ اَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوتَهٗ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوْا رَاَيْنَاكَ اَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَاَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ اَتَانِيْ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا اِذَا جَآءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَاِنْ رَاٰى فِيْ

হঠাৎ তিনি জুতো খুলে ফেললেন এবং নিজের বাম পাশে রেখে দিলেন।[২৪] যখন লোকেরা এটা দেখলেন, তখন তাঁরাও আপন আপন জুতোগুলো খুলে ফেললেন।[২৫] অতঃপর যখন হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপ্ত করলেন, তখন বললেন, "তোমাদেরকে জুতো খুলতে কে উদ্বুদ্ধ করলো?" তাঁরা আরয করলেন, "আমরা আপনাকে জুতোগুলো খুলে ফেলতে দেখেছি। সুতরাং আমরাও আমাদের জুতো খুলে ফেলেছি।" হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "হযরত জিব্রাঈল আমার নিকট আসলো। আমাকে বললো, তাতে নাপাক বস্তু রয়েছে।[২৬] যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে আসে, তখন সে যেনো দেখে নেয়। যদি সে জুতোগুলোতে অপবিত্রতা দেখতে পায়,

পরে না। ইমাম মালেক মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্র ভূমিতে কখনো ঘোড়ায় কিংবা অন্য কোন যানবাহনে আরোহণ করেন নি। তাঁদের আদব প্রদর্শনের পক্ষে দলীল হচ্ছে এ-ই আয়াত। আলোচ্য হাদীস শরীফ এ আয়াতের পরিপন্থী নয়।

২৪. এ সব কাজই সামান্য নড়াচড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে গেছে। অন্যথায় 'আমলে কাসীর' (বেশী কাজ) নামায ভঙ্গ করে দেয়।

২৫. এ থেকে দু'টি মাস্'আলা প্রতীয়মান হয় ঃ

এক. হুযূরের অনুসরণ যে কোন অবস্থাতেই করা যাবে; কারণ বা রহস্য বুঝে আসুক কিংবা না-ই আসুক। দেখুন, সাহাবা-ই কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জুতোযুগল খুলে ফেলতে দেখা মাত্র কোন কারণ অনুসন্ধান করা ছাড়াই তাঁদের জুতোগুলো খুলে ফেলেছেন। আর সরকার-ই দু'আলম হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও এ অনুসরণের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন নি।

দুই. সাহাবা-ই কেরাম নামাযে সাজদার জায়গার পরিবর্তে তাঁদের ঈমানের স্থান অর্থাৎ হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখতেন। অন্যথায় তাঁরা হুযূরের এ পবিত্র কর্ম সম্পর্কে জানলেন কি করে? যেমন– হেরম শরীফের নামাযী নামাযে কা'বা দেখে থাকেন, তেমনি হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম-এর পেছনে নামায সম্পন্নকারী নামাযে হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন।

২৬. থুথু ও নাকটি ইত্যাদি ঘৃণ্য বস্তু; অপবিত্র বস্তু নয়। অন্যথায় নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব হতো। কেননা, যদি নাপাক কাপড় ও নাপাক জুতো নিয়ে নামায আরম্ভ করে দেওয়া হয়, তারপর তা জানতে পারে, তবে ওই নামায পুনরায় পড়তে হয়।

ঘটনা এ ছিলো যে, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মনে করেছেন– ওইসব জিনিষ পবিত্র, ওইগুলো নিয়ে নামায পড়লে ক্ষতি হবে না। মহান রব জিব্রাঈল আমীনকে এ বলে পাঠালেন– 'প্রিয়, তোমার উঁচু মর্যাদার এটাও পরিপন্থী। তোমার পোশাক পাকও হওয়া চাই, পরিচ্ছন্নও হওয়া চাই।' সুতরাং আলোচ্য হাদীস শরীফের বিরুদ্ধে না এ আপত্তি আসতে পারে যে, 'হুযূর নামায পুনরায় পড়ালেন না কেন?' না এ আপত্তি হতে পারে যে, 'হুযূরের কি নিজের জুতোগুলোরও খবর ছিলো না? তা যদি হয়, তবে অন্যান্যদের খবর কিভাবে রাখবেন?' যে-ই শাহানশাহ ভূ-পৃষ্ঠের উপর দাঁড়িয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের আযাব দেখে নেন এবং ক্ববরের শাস্তির কারণও জেনে নেন, আর যিনি একথা এরশাদ ফরমালেন, "নামায বিশুদ্ধভাবে পড়ো! আমার নিকট তোমাদের রুকূ', সাজদা এবং হৃদয়ের একাগ্রতার কথাও গোপন নয়", তাঁর সামনে নিজের

نَعْلَيْهِ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالدَّارِمِى

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَلَا عَنْ يَّسَارِهٖ فَتَكُوْنَ عَنْ يَّمِيْنِ غَيْرِهٖ اِلَّا اَنْ لَّا يَكُوْنَ عَلٰى يَسَارِهٖ اَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَوْ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ.

তবে তা যেনো মুছে ফেলে এবং তাতে নামায পড়ে নেয়।"২৭ [আবূ দাউদ, দারেমী]

৭১২।। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামায পড়বে, তখন সে তার জুতো না তার ডান দিকে রাখবে, না বাম দিকে। অন্যথায় তা অন্য কারো ডানদিকে হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তার বাম দিকে কেউ না থাকে।২৮ ওইগুলোকে নিজের উভয় পায়ের মধ্যভাগে রাখবে।" অপর এক বর্ণনায় আছে, "নতুবা ওইগুলো পরিধান করেই নামায পড়ে নেবে।"২৯ [আবূ দাউদ] ইবনে মাজাহ্ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন।

বরকতময় জুতোযুগলের খবর কিভাবে গোপন থাকবে?

এ হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহান রব আপন হাবীবের প্রতিটি কাজেরই তত্বাবধান করেন। কেননা, তিনি নিজেই এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا

(অর্থাৎ হে মাহবূব! আপনি আপন রবের আদেশের উপর স্থির থাকুন! কারণ, নিশ্চয় আপনি আমার রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছেন; ৫২:৪৮, তরজমা– কান্যুল ঈমান)

একথাও বুঝা গেলো যে, সাহাবা-ই কেরাম মূল নামাযের মধ্যে হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাজগুলো দেখতেন এবং হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করতেন।

২৭. আমি ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি– হুযূর-ই আন্ওয়ার ও সাহাবা-ই কেরাম নরম পাদুকা (সেণ্ডেল) পরতেন, যাতে সাজদা অনায়াসে করা যেতো আর ইহুদীদের বিরোধিতাও হয়ে যেতো। আমাদের দেশের জুতোগুলো পরে নামায পড়া জায়েয নয়।

এ থেকে বুঝা যায় যে, জুতো মুছে নিলে পবিত্র হয়ে যায়, যখন গাঢ় ও কড়া ধরনের (دلدار) অপবিত্রতা লেগে থাকে। কিন্তু প্রস্রাব ইত্যাদি লাগলে ধোয়া ব্যতীত পবিত্র হবে না।

২৮. যেহেতু ডান দিকে রহমতের ফিরিশ্তা রয়েছেন, যিনি আমাদের নেকীগুলো লিখছেন, আর নামাযে তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করছেন, সেহেতু তাঁর প্রতি আদব প্রদর্শন করে না ওদিকে থুথু ফেলবে, না জুতো রাখবে। অবশ্য যদি ডান দিকে দূরে জুতো রাখে, তবে কোন ক্ষতি নেই।

২৯. যদি পবিত্র ও নরম হয়। স্মরণ রাখবেন– জুতো পরে ও জুতোর উপর নামায পড়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি তলায় অপবিত্রতা থাকে এবং তা খুলে নিয়ে সেটার উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ে নেয়, তাহলে জায়েয। কারণ, এমতাবস্থায় জুতো পোশাক রইলো না, বরং নামাযের জায়গা হলো, যার উপরিভাগে অপবিত্রতা না থাকলে যথেষ্ট; যেমন কাঠের মোটা তক্তা, যার নিম্নস্থ পিঠে নাপাক বস্তু থাকে।

৩০. এ থেকে বুঝা গেলো যে, যদি যমীন ও নামাযীর মধ্যভাগে কোন জিনিষ অন্তরাল থাকে, তাহলে নামায দুরস্ত হয়। সম্মানিত ফক্বীহগণ বলেন, চাটাই এবং যে জিনিষ ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়। সেটার উপর নামায পড়া উত্তম। কেননা, তাতে বিনয় প্রকাশ পায়। আর ইমাম মালিকের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকা যায়। কারণ, তাঁর মতে ভূমি থেকে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছুর উপর সাজদা করা মাকরূহ।

৩১. হয়তো জায়েয বলে বর্ণনা করার জন্য নতুবা ওই সময়

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ◆ عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْرِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی النَّبِیِّ ﷺ فَرَأَیْتُهٗ یُصَلِّیْ عَلٰی حَصِیْرٍ یَسْجُدُ عَلَیْهِ قَالَ وَرَأَیْتُهٗ یُصَلِّیْ فِیْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهٖ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَیْبٍ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ رَاَیْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ یُصَلِّیْ حَافِیًا وَمُتَنَعِّلًا رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤٗدَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ قَالَ صَلّٰی جَابِرٌ فِیْ اِزَارٍ قَدْ عَقَدَهٗ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِیَابُهٗ مَوْضُوْعَةٌ عَلَی الْمِشْجَبِ فَقَالَ لَهٗ قَائِلٌ تُصَلِّیْ فِیْ اِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ اِنَّمَا صَنَعْتُ ذٰلِکَ لِیَرَانِیْ اَحْمَقُ مِثْلُکَ وَاَیُّنَا کَانَ لَهٗ ثَوْبَانِ عَلٰی عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◇ ৭১৩।। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলাম। তখন হুযূরকে চাটাইর উপর নামায পড়তে দেখলাম। তিনি সেটার উপর সাজদা করছিলেন।[৩০] তিনি বলেন, "আমি হুযূরকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি।"[৩১] [মুসলিম]

৭১৪।। হযরত আমর ইবনে শো'আয়ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে খোলা পায়ে এবং জুতো পরে নামায পড়তে দেখেছি।[৩২] [আবূ দাউদ]

৭১৫।। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত জাবির শুধু চাদর পরে নামায পড়েছেন, যাকে তিনি গ্রীবার দিকে বেঁধেছিলেন।[৩৩] অথচ তাঁর কাপড়গুলো খুঁটির উপর রেখেছিলেন। কেউ তাঁকে বললো, "আপনি কি একটি মাত্র চাদরে নামায পড়েন?"[৩৪] তখন তিনি বললেন, "আমি এমনি এজন্যই করলাম যেন আমাকে তোমার মতো বোকা লোকেরা দেখতে পাও।[৩৫] নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় কার নিকট দু'টি কাপড় ছিলো?"[৩৬] [বোখারী]

অন্য কাপড় ছিলো না; অন্যথায় সুন্নাত হচ্ছে- তিন কাপড়ে নামায পড়া- জামা, পায়জামা ও 'ইমামা (পাগড়ি)।

জড়ানোর পদ্ধতি হচ্ছে- চাদরের ডান কিনারা বাম কাঁধের উপর থাকবে, আর বাম কিনারা থাকবে ডান কাঁধের উপর থাকবে।

৩২. অর্থাৎ কখনো এমন করতেন। এ উভয় কাজ একই নামাযে হতো না।

৩৩. অর্থাৎ মাথা থেকে পদযুগল পর্যন্ত একটি মাত্র চাদরে জড়িয়ে ছিলেন। মাথা ও কাঁধ ইত্যাদি কোনটাই খোলা ছিলো না। সুতরাং আজকালকার ফ্যাশন-পূজারীরা এ হাদীস শরীফ থেকে খোলা মাথায় কিংবা খোলা কাঁধে নামায পড়ার পক্ষে দলীল গ্রহণ করতে পারে না।

৩৪. এ প্রশ্ন আশ্চর্য বোধ প্রকাশ করার জন্য। এ আশ্চর্যবোধ থেকে বুঝা যায় যে, ওই যুগে একটি চাদরে নামায পড়ার

وَعَنْ اُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ قَالَ الصَّلٰوةُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اِنَّمَا كَانَ ذَاكَ اِذَا كَانَ فِى الثِّيَابِ قِلَّةٌ فَاَمَّا اِذَا وَسَّعَ اللّٰهُ فَالصَّلٰوةُ فِى الثَّوْبَيْنِ اَزْكٰى - رَوَاهُ اَحْمَدُ

৭১৬।। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক কাপড়ে নামায পড়া সুন্নাত।[৩৭] আমরা এমনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে করতাম; অথচ আমাদেরকে তজ্জন্য দোষারোপ করা হতো না। হযরত ইবনে মাস'উদ বলেন, "এটা তখনই ছিলো, যখন কাপড় কম ছিলো; কিন্তু যখন আল্লাহ্ প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন দু'কাপড়ে নামায পড়া উত্তম।"[৩৮] [আহমদ]★

নিয়ম বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। সমস্ত সাহাবী তিন অথবা দু'কাপড়ে নামায পড়তে অভ্যস্থ ছিলেন।

৩৫. নির্বোধ (বোকা) এজন্য বলেন যে, ওই লোকটি সাহাবীর উপর আপত্তি করার ক্ষেত্রে ত্বরা করেছে। যদি বুযুর্গদের কোন কাজ অশোভন মনে হয়, তবে অপেক্ষা করা চাই; হয়তো তিনি নিজেই সেটার কারণ বলে দেবেন। এ আদব মাশা-ইখ ও হক্ব্বানী আলিমদের দরবারেরও। [আশি''আতুল লুম'আত]

৩৬. অর্থাৎ "যদি শুধু একটি কাপড়ে নামায জায়েয না হতো, তবে এ দারিদ্রের যুগে আমাদের মধ্যে কারো নামাযই বিশুদ্ধ হতো না।" অর্থাৎ 'আমার এ কাজ বৈধতা বর্ণনা করার জন্যই, আলস্যের কারণে নয়।'

৩৭. এখানে 'সুন্নাত' মানে 'আভিধানিক অর্থে সুন্নাত'; অর্থাৎ কর্মপন্থা। অথবা অর্থ এ যে, এর বৈধতা সুন্নাত থেকে প্রমাণিত। সুতরাং তাঁর এ কথা এবং সাইয়্যেদুনা ইবনে মাস'উদের কথার মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা নেই।

৩৮. অর্থাৎ এক কাপড়ের স্থলে দু'কাপড়ে নামায সম্পন্ন করা উত্তম। কোন কোন হাদীস শরীফে আছে- পাগড়ি সহকারে নামায পাগড়ি বিহীন নামায অপেক্ষা সত্তরগুণ বেশী উত্তম। সুতরাং তিন কাপড়ে নামায পড়া যে উত্তম তা সহজে অনুমেয়। কেননা, ওই হাদীস শরীফে কামীজ ও পায়জামার উল্লেখ এসেছে। আর এ হাদীসে পাগড়ির কথা এসেছে। উভয়ের উপর আমল রয়েছে।★

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

****

تمت بالخير

★ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।